ITIHAS ANUSANDHAN - 14

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০০, কলিকাতা

প্রকাশক : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০১২

বর্ণ সংস্থাপনায় : লেজার ও প্রিন্ট
২৩৭ / জে, মানিকতলা মেন রোড
কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪

মুদ্রণ :
জেনিথ অফসেট
২০ বি, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১৪

সূচীপত্র

বিভাগীয় সভাপতিদের অভিভাষণ

১। পথের শেষ কোথায় - গণপতি সুব্বাইয়া ১
২। মধ্যযুগে বাংলার ধর্মীয় সাধনার ঐতিহ্য - অতীশ দাশগুপ্ত ৭
৩। সমাজ সংস্কার - উনিশ শতকের পিতৃতন্ত্র ও জাতিপ্রথা বিরোধী আন্দোলন
- তনিকা সরকার ২০
৪। ভারত - চীন সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও পূর্বোত্তর ভারত - হরপ্রসাদ রায় ৩২

বিভাগ ঃ প্রাচীন ভারত

১। প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য বিকাশের নির্ণায়ক উপাদানসমূহ ঃ
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক - সুরজিৎ কুমার ধর। ৩৯
২। গ্রীক অধিকৃত বাহ্লীক দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি - সুচন্দ্রা ঘোষ । ৪৮
৩। প্রাচীন ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থা ঃ সিন্ধু সভ্যতা থেকে মৌর্য্য যুগ - সৈকত মন্ডল ৫১
৪। মলহারের মুদ্রা ও বাণিজ্য - সুস্মিতা বোস মজুমদার ৫৭
৫। কলিঙ্গ, উৎকল, ওড্র এবং ওড়িশার সন্ধানে ঃ
ইতিহাস আশ্রয়ী ভূগোল - রাজকুমার জাজোদিয়া ৫৯
৬। বিলুপ্ত বন্দর চন্দ্রকেতুগড় - গৌরীশংকর দে ৬২
৭। বৈদিক যুগে কালী - সঙ্গীতা চৌধুরী ৭৪
৮। দেবী দুর্গা ঃ তাঁর উদ্ভব ও অস্তিত্ব - সুমিত বিশ্বাস ৭৯
৯। প্রাক্ গুপ্ত বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের আর্বিভাব - সরিতা ক্ষেত্রী ৮৭
১০। প্রাক্ - গুপ্ত যুগে বঙ্গে মগ্ ব্রাহ্মণ - মলয় কুমার দাস ৯০
১১। জাতকে প্রকৃতি বর্ণনা - কাকলী রায় ৯৭
১২। প্রাচীন ভারতে নবগ্রহমূর্তি ও পাল যুগের একটি অনন্য শনি প্রতিমা -
রাজশ্রী মুখোপাধ্যায় ১০৩
১৩। তমলুকের দেবী বর্গভীমা - শুভজিৎ দাশগুপ্ত ১১০
১৪। পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনের ধর্মীয় প্রেক্ষাপট - শম্ভুনাথ কুণ্ডু ১১৫
১৫। আবাস থেকে মঠ আদি মধ্যকালীন পূর্ব ভারতে একটি বৈষ্ণব ধর্ম
প্রতিষ্ঠান - কৃষ্ণেন্দু রায় ১১৯
১৬। হিউয়েন - সাঙ - এর ভারত - বিবরণে গাছপালা, ফুলফল - শুভ্রদীপ দে ১২৪

১৭। জম্বুদ্বীপ প্রাচীন সভ্যতার মাতৃভূমি - রাজীব দে ১৩০
১৮। মৃচ্ছকটিক - এর আলোকে ব্রাহ্মণদের সামাজিক অবস্থান -
দূর্বা আইন ১৩৬
১৯। বৈধব্যে আহার্য রীতি - শর্মিষ্ঠা আঢ্য ১৪০
২০। মৌর্যযুগের কোষ্ঠাগার - সুদর্শনা চৌধুরী ১৪৬
২১। মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতিতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর
অবদানের নিরীক্ষা - অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় ১৫২
২২। শূদ্রায়ন ঃ ঐতিহাসিক বির্তকের ক্রমবিকাশ - স্বাতী সেনগুপ্ত ১৬৪
২৩। মালাকার জাতির উদ্ভব - চন্দ্রকান্ত মালাকার ১৭১

বিভাগ ঃ মধ্যযুগের ভারত

২৪। মেদিনীপুর ইতিহাসের সমন্বয়ী প্রেক্ষাপট - অরবিন্দ মাইতি ১৭৫
২৫। আর্যাসপ্তশতী কাব্যে প্রাচীন বাঙালী নারী - শাহানারা হোসেন ১৮০
২৬। মধ্যযুগের বাংলায় 'টেরাকোটা' - শিল্পের নতুন ধারা - প্রণব রায় ১৮৪
২৭। বিজয়নগর শহরের উত্থান ও পতন ঃ একটি সমীক্ষা - অনিরুদ্ধ রায় ১৯২
২৮। মুদ্রা হিসাবে কড়ি - শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২
২৯। ওড়িশায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম - নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ২০৮
৩০। মেদিনীপুরে বৈষ্ণবীয় মঠ ও মন্দির - রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ২১৩
৩১। মুঘলযুগে মেদিনীপুরের জমিদার - রাজর্ষি মহাপাত্র ২২০
৩২। মেদিনীপুরের লোক জীবন ও সংস্কৃতিতে দেবী শীতলা - তুষার মাইতি ২২৭
৩৩। উত্তর বাংলায় লৌকিক সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকে সুফী -
পীর - ফকির - একটি সমীক্ষা - বিষ্ণুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৩৩
৩৪। অষ্টাদশ শতকের বাংলা ঃ সমৃদ্ধি না অবক্ষয় - ফনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২৩৭

বিভাগ ঃ আধুনিক ভারত

ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক - উত্তর যুগের সমাজ ও রাজনীতি

৩৫। উনিশ শতকের বাংলার কেরানী ও তাদের জগৎ - অনামিকা নন্দী ২৪৫
৩৬। বেঙ্গলপ্যাক্ট ১৯২৩ ঃ হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার তৎকালীন সমাধান
সূত্র - নির্মাল্যশংকর চক্রবর্তী ২৪৯
৩৭। "বঙ্গীয় আইন সভায়" বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন (সংশোধনী) বিল ১৯৩৭ ও
আইন ১৯৩৮ - জাহানারা বেগম ২৫১
৩৮। পার্বতীবাঈ ভোর - বোম্বাই - এর সুতাকল শ্রমিক আন্দোলনের একজন নেত্রী
- মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় ২৫৬

৩৯। অশ্বিনী কুমার দত্ত ঃ স্বদেশী আন্দোলন - ঈশিতা চট্টোপাধ্যায় ২৬২
৪০। কাকদ্বীপে তেভাগা আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ঃ একটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক সমীক্ষা - শ্রীদাম গিরি ২৭০
৪১। ব্রিটিশ ভারতে গোসাবায় স্যার ডানিয়েল হ্যামিল্টন প্রবর্তিত এক টাকার নোট ও একটি সমীক্ষা - সুধন্য কুমার মন্ডল ২৭৪
৪২। ঔপনিবেশিক কারা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় হিজলী জেলের সংঘর্ষ - মনোজ ত্রিপাঠী ২৮০
৪৩। বিভাগপূর্ব বাংলার রাজনীতি এবং মুসলিম লীগ জাতীয় রক্ষীবাহিনী ১৯৩৭-১৯৪৭ - বিশ্বরূপ ঘোষ ২৮৭
৪৪। ছিন্নমূল ছেলেবেলা ঃ বাংলায় দেশভাগ জনিত পরিস্থিতির একটি দিক - ত্রিদিব সন্তপা কুন্ডু ২৯৩
৪৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির লাইন পরিবর্তন ঃ বিভিন্ন দলিলের আলোকে এক বিশ্লেষণ - অমিতাভ চন্দ্র ২৯৭
৪৬। ভারতবর্ষে জাতিসত্বার প্রশ্ন ঃ কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমবিকাশ - দেবনারায়ণ মোদক ৩০৮
৪৭। চারু মজুমদারের 'আটটি দলিল' - একটি পর্যালোচনা - চন্দন বসু ৩২০
৪৮। ভারতীয় পরিবেশের সংকটের প্রেক্ষিতে চোরাশিকার ও সংরক্ষণ আইন ঃ স্বাধীনতাউত্তর যুগ - মহুয়া সরকার ৩২৪
৪৯। ত্রিপুরি কংগ্রেস ঃ একটি পর্যালোচনা - গিরিশচন্দ্র মাইতি ৩২৮
৫০। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে চট্টগ্রাম - মোহম্মদ আলী চৌধুরী ৩৩৭

আঞ্চলিক ইতিহাস ঃ মেদিনীপুর

৫১। ইতিহাস অনুসন্ধানে মৌখিক ইতিহাস ঃ মেদিনীপুর জেলায় একটি যৌথ ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রাথমিক রিপোর্ট - নিবেদিতা ভৌমিক, পূরবী বসু, অমল মাইতি, নবেন্দু বেরা, অচিন্ত্য আচার্য্য ৩৪৫
৫২। মুখের কথায় ইতিহাস ঃ দাঁতনে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন - শঙ্কর কুমার দাস ৩৫৩
৫৩। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার প্রথম শহীদ - রাসবিহারী মিশ্র ৩৫৮
৫৪। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সুতাহাটা ঃ মুখের কথায় - ভবতোষ পাত্র ৩৬১
৫৫। কন্টাই স্টেশন রোড (বেলদা) থেকে কাঁথি ঃ একটি অসমাপ্ত রেলপথ প্রকল্প (১৯১৪ - ৩৪) - বিমলকুমার শীট ৩৬৮
৫৬। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম - জয়দীপ পন্ডা ৩৭৬
৫৭। ইতিহাস চর্চায় মেদিনীপুরের লোকায়ত গান - শ্যামল বেরা ৩৮৪
৫৮। মন্দির নির্মাণে মেদিনীপুরের তাম্বুলী সম্প্রদায়ের ভূমিকা - চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী ৩৮৮

৫৯। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বাসভূমি পরিবৃত্তিকরণ ঃ গ্রাম বাণেশ্বর চক দোর (দুবনান) পরগনা - একটি প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান - তেজোময় দাস ৩৯২
৬০। মেদিনীপুরের ডোম সম্প্রদায়ের বিবর্তন - শ্যামাপদ ভৌমিক ৩৯৭
৬১। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাস রচনা - অভিজিৎ গুহ ৪০৬

আঞ্চলিক ইতিহাস ঃ মেদিনীপুর ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল

৬২। মুর্শিদাবাদে আঞ্চলিক সংবাদপত্রের বিকাশ ঃ উনিশ শতক ও পরবর্তী যুগ - অনিরুদ্ধ দাস ৪১৬
৬৩। বিংশ শতাব্দীতে গোবরডাঙার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা - সুখেন্দু দাশ ৪২১
৬৪। আসামের একটি ছোট জনজাতি "দেউরী" - কিছু প্রাথমিক অনুসন্ধান - জলি বাগচী ৪২৫
৬৫। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে চাকমা উপজাতি - অমরেন্দ্র নাথ বর্দ্ধন ৪৩০
৬৬। সামাজিক প্রেক্ষাপট ও অপরাধ প্রবণতা ঃ বর্ধমান কারাগারের ওপর এক সমীক্ষা - মহুয়া পাত্র ৪৩৪
৬৭। বোলান গানে হিন্দু - মুসলমান সমন্বয় - অসীম কুমার পাল ৪৩৭
৬৮। হাওড়া জেলার মুসলিম বিবাহ ঃ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের একটি দিক - শেখ মকবুল ইসলাম ৪৪৩
৬৯। ব্রিটিশ বৈষম্যমূলক নীতি ও নরমপন্থীদের সক্রিয় প্রতিবাদ - প্রসঙ্গ ঃ তাবকেশ্বরের রেলপথ বিস্তার ১৮৮৫ শুভ্রাংশু রায় ৪৫২
৭০। স্বদেশী আন্দোলন ঃ হুগলী জেলা - সুভাষ সেন ৪৫৫
৭১। বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী (১৯১৩- ১৯১৭) - সতী দত্ত ৪৬৪
৭২। বাংলায় লবণ তৈরী ও স্বাধীনতা সংগ্রামে লবণ সত্যাগ্রহ - পুষ্পরঞ্জন সরকার ৪৭১
৭৩। বালুরঘাট মহকুমায় আগষ্ট আন্দোলন - কমলেশ চন্দ্র দাস ৪৭৭

নারী ইতিহাস ঃ সমাজ - সংস্কৃতি - রাজনীতি

৭৪। স্বাধীনতা সংগ্রামী রাণী শিরোমনি - তপতী পাত্র ৪৮৩
৭৫। গানেওয়ালি থেকে গায়িকা ঃ পটভূমি ঔপনিবেশিক বাংলা - জাহানারা রায়চৌধুরী ৪৮৮
৭৬। হারানো ছেলেবেলা ঃ উনিশ শতকের বঙ্গরমণীদের জীবনে -অরুন্ধতী রায় ৪৯৪

৭৭। নারী শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিবেদিতা - সব্যসাচী ভট্টাচার্য ৫০১
৭৮। উনিশ শতকে পত্র পত্রিকা সম্পাদনায় বঙ্গনারী - মৃদুচ্ছন্দা পালিত ৫০৪
৭৯। আশালতা সিংহের উপন্যাসে নারী - ভাবনা - অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১০
৮০। বিংশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকের বাঙালী নারী ঃ শরৎচন্দ্রের লেখায় - গার্গী নাগ ৫১৮

চিন্তা - চেতনার ইতিহাস ঃ প্রেক্ষিত ঃ সমাজ ও সংস্কৃতি

৮১। প্রসঙ্গ ঃ বাঙালির দর্শন চর্চার ইতিহাস - এন এইচ এম আবু বকর ৫২২
৮২। ডেভিড ড্রামন্ডের শিক্ষাদর্শ ও চিন্তাধারা ঃ ডিরোজিওর উপর প্রভাব - ভবতোষ কুন্ডু ৫৩০
৮৩। লিয়েবেদেফের পূর্বে বাংলা নাটক ও নাট্য - নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪১
৮৪। মীর মশাররফ হোসেনের রচনাবলীতে সমকালীন সামাজিক ইতিহাসের উপাদান - মোশররফ হোসাইন ভূঁইয়া। ৫৪৯
৮৫। দেলোয়ার হোসেনের দার্শনিক চিন্তাভাবনা ঃ প্রসঙ্গ উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ - এম. শফিকুল আলম ৫৫৯
৮৬। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথেব চিন্তামানসে ঔপনিষাদিক প্রভাব - তপতী দাশগুপ্ত ৫৭৩
৮৭। বাংলার নবজাগরণে বিদ্যাসাগরের অবদান - অশ্রুরঞ্জন পান্ডা ৫৭৮
৮৮। ঔপনিবেশিক বাংলায় লোকায়ত চিকিৎসা ও জনমানসে তার প্রভাব - সুব্রত পাহাড়ী ৫৮১
৮৯। ঔপনিবেশিক যুগের বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রভাব ঃ দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩০ - ৪৭) - সুস্নাত দাশ ৫৯৩
৯০। উনিশ শতকের শহরের বাংলা গান ও তার পরিবর্তন - সুপর্ণা ভট্টাচার্য ৬০৬
৯১। ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিকতাও স্ববিরোধ ঃ প্রসঙ্গ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, ব্যারাকপুর - দীপাঞ্জন দত্ত ৬১১
৯২। ভগৎ সিং - এর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা - প্রগতি মাইতি ৬১৪
৯৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারতের জাগ্রত বিবেক ঃ মডার্ণ রিভিউ এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় - চৈতালী চৌধুরী ৬২১
৯৪। চিত্তরঞ্জনের রাষ্ট্রদর্শন ও সমাজচিন্তা - মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় ৬২৭
৯৫। যুক্তির পথে যাত্রা ঃ প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ - সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ৬৩৪

বিভাগ ঃ ভারত - বর্হিভূত

৯৬। নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব - একটু ভেবে দেখা - বিমান সমাদ্দার ৬৪২

৯৭। মিনোয়ান লিপি ও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব - দোয়েল দে ৬৪৭
৯৮। প্রাসঙ্গিকতা ও আদর্শনিষ্ঠার আলোকে ইসলামে নারীর অবস্থান -
শুকুর আলি মন্ডল ৬৫১
৯৯। নানকার বিদ্রোহের স্বরূপ, কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণ ও পরিণতি -
এ. টি. এম. আতিকুর রহমান ৬৫৮
১০০। কমনওয়েলথ্ দেশগুলির ডাকটিকিটের ইতিহাস - প্রবীর কুমার লাহা ৬৬৬
১০১। বাংলাদেশের পার্বত্য-চট্টগ্রামে চাকমা উপজাতির রাজনৈতিক অবস্থান -
স্নেহাশিস ঘোষ ৬৭২
১০২। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রত্যন্ত এলাকায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি -
স্বপ্না ভট্টাচার্য (চক্রবর্ত্তী) ৬৭৫
১০৩। থাই ইতিহাসে নারী ও বারবনিতা পেশা বিবর্তনে ধর্মীয় প্রভাব ঃ
একটি পর্যালোচনা - লিপি ঘোষ ৬৭৯
১০৪। ভারত - থাই সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কয়েকটি দিক ঃ
একটি পর্যালোচনা - শোভনা মুখোপাধ্যায় ৬৮৪
১০৫। থাই রাজতন্ত্র ও বৌদ্ধধর্ম ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা -
তপতী রায় চৌধুরী ৬৯০
১০৬। না হওয়া, অথচ কল্পনাসম্ভব ইতিহাস - সাবির আহমেদ ৬৯৫

প্রাচীন ভারত বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ

পথের শেষ কোথায়

গণপতি সুব্বাইয়া

বিদগ্ধ সহকর্মিবৃন্দ ও বন্ধুগণ,

মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশোভন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠেয় পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের পঞ্চদশ বার্ষিক সমাবেশে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস শাখার সভাপতি মনোনয়ন ক'রে আপনারা আমায় যে সম্মান দিয়েছেন, তার জন্য আমি অভিভূত বোধ করছি। বিগত কয়েক বৎসর ধ'রে ইতিহাস সংসদ নিজেকে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক মণ্ডলীর সব থেকে প্রামাণ্য ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে। বিশেষ কোন কারণ না-থাকলেও, প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এই সংসদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমার প্রায় কোন যোগাযোগই ছিল না; তা সত্ত্বেও, আমি একান্তভাবে জানি, এই সুযোগদান তাঁদের সৌজন্য ও সহৃদয়তারই প্রকাশ।

আমাদের দেশে যখন কারও কর্মজীবন নিজের জন্মগত অঞ্চলের বাইরে কাটে, তা সবসময় খুব একটা সুখের হ'য় না। কারণ, একই সঙ্গে দুই অঞ্চলের মানুষ হিসেবে সুযোগ পাওয়ার পরিবর্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে উভয় অঞ্চলেই একজন বহিরাগত ব'লে পরিগণিত হয়। আমার জন্মস্থান তামিলনাড়ু রাজ্যের ত্রিরুনেলভেলি জেলার একটি ছোট গ্রাম থেকে আমি পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলাম ঠিক পঁচিশ বছর আগে, আমার পূজনীয় শিক্ষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগের অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতীর কাছে গবেষণা করতে। সময়ক্রমে আমার গবেষণা শেষ হ'ল, কিন্তু, আমি ফিরে গেলাম না; তখন থেকেই এই রাজ্য হয়ে উঠল আমার কর্মস্থান। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ তার বাৎসরিক সমাবেশে প্রাচীন ইতিহাস বিভাগের সভাপতি ক'রে আমায় স্বীকৃতি দিলেন যে আমি এখানকারই মানুষ। সংসদের কর্তৃপক্ষের কাছে আমায় এই সত্তা-পরিচয় দানের জন্য আমি বিশেষ বাধিত বোধ করছি।

আরও একটি কারণে আমি অভিভূত বোধ করছি। আমার নিজের বিবেচনায়, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে আমার কাজ, সংসদ মহানুভবতায় যে সম্মান আমায় দিয়েছেন তার তুলনায়, নিতান্তই কিঞ্চিৎকর। তা সত্ত্বেও এই আমন্ত্রণ গ্রহণে সাহস করেছি একটি বিশেষ কারণে। আমার ধারণায়, আমাদের বৃত্তিতে আজ যে-সংকটময় পরিস্থিতি উপস্থিত, তার প্রতি আমার অগ্রজ এবং গুণীসতীর্থদের দৃষ্টি আকর্ষণের এর থেকে ভালো আর কোন উপলক্ষ আমি পেতাম না। এই সংকট এতই গভীর ও উদ্বেগজনক যে ইতিহাস গবেষণার-বিশেষ ক'রে আমার বিশেষায়ণ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার-পদ্ধতি ও প্রগতির

ক্ষেত্রে প্রায় এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। আমি স্বীকার করি, আমার এই পরিস্থিতির বিপন্নবোধ, অনেকেই হয়ত বলবেন, আমার চর্চাক্ষেত্রে আমার অদক্ষতারই সূচক। কিন্তু সেই সাফাই গাওয়ার জন্যেই যে আমি এই দায়িত্ব স্বীকার করেছি তা নয়। আমি বরং যুক্তি দেব যে যতদিন না আমরা এই সমস্যাগুলি বোঝার চেষ্টা করব, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা ব্যাখ্যা ও বোঝার সব চেষ্টাই অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী হয়ে থাকবে।

আমরা সকলেই জানি, বিতর্কের মধ্য দিয়েই ইতিহাসের সমৃদ্ধি; কিন্তু ১৯৯৮ যে বছরটি সদ্য শেষ হ'ল—আমাদের দেশে শুধু ঐতিহাসিকদেরই নয়, ইতিহাস গবেষণার প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেও এক বিষণ্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, হয়ে উঠেছে এক তিক্ত ও অনুচিত বিবাদের বিষয়। প্রথমেই বলা যায়, আমাদের দেশের ঐতিহাসিকেরা আজ নিজেদের এক সুস্পষ্ট দুবিধা মার্গে বিভক্ত হতে দিয়েছেন ঃ 'মন্দির' ঐতিহাসিক ও 'মসজিদ' ঐতিহাসিক। এর অন্তর্লীন ধারণাটি হ'ল যে, কোন যথার্থ ঐতিহাসিক হয় 'মন্দির' নয়ত 'মসজিদ' মার্গের এবং সেখানে কোন তৃতীয় অবস্থানের সুযোগ নেই। তাদের আত্মবিচারে মন্দির মার্গের ঐতিহাসিক তাঁরা যাঁরা নিজেদের দেখেন জাতীয়তাবাদী হিসাবে, আর অন্য মার্গাবলম্বীরা নিজেদের প্রচার করেন যুক্তিবাদী অসাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক হিসেবে। এই দুই পক্ষই পরস্পরের প্রতি আরও বেশি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের মধ্যে সংলাপ প্রায় অসম্ভব, অথবা খুব মৃদুভাবে বললে বলা যায়, পরস্পরের প্রতি এক নেতিবাচক অনুযোগ-অভিযোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এই দুই মার্গের ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রায় বিপরীত, এমনকি যুযুধান, পার্থক্যের মৌলিক কারণটি কী? এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চ থেকেই গতবছর ২৭ মার্চ সমাবর্তন ভাষণে অধ্যাপক ইরফান হবিবকে শুরু করতে হয়েছিল এই সতর্কবাণী উচ্চাবণ ক'রে যে "It has become obvious that after fifty years of Independence we are at a critical turning point, a moment of decision for the whole nation. The time has surely arrived, therefore, for all of us to reflect once again on the process of the creation of our nation and its essential elements."[1] যে ঐতিহাসিকরা অতীত নিয়ে কাজ করছেন, বর্তমান যে সময় হতে পারে সমগ্র দেশের পক্ষে এক সিদ্ধান্তের মুহূর্ত, তাঁর পক্ষে কেন বা কী ক'রে হয়ে উঠতে পারে সমস্যার কারণ? ১৯৯৬ তে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত তাঁর চিন্তা উদ্বেগকারী আভা মাইতি স্মারক বক্তৃতায় অধ্যাপক অমর্ত্য সেন এই প্রশ্নেরই একটি সুচারু উত্তর দিয়েছিলেন ঃ

"...the past becomes a particularly sharp battle ground when contemporary debates invoke the past to define a collectivity and to allege the centrality of some particular features and the unimportance of others. This is very much the situation in india today."[2]

ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলসত্তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'কয়েকটি নির্বাচিত বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্রীয় এবং অন্যগুলিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা'র এই চেষ্টাই সবথেকে বেশি আমাদের

দেশের ঐতিহাসিকদের দুই বিবদমান শিবিরে বিভক্ত করেছে। এই শিবিরবাসীরা কখনো নিজেদের কখনো অন্যদের নানা অভিধায় ভূষিত করেছেন : 'মন্দির' বনাম 'মসজিদ' বা 'জাতীয়তাবাদী' বনাম 'যুক্তিবাদী' বা 'সাম্প্রদায়িক' বনাম 'অসাম্প্রদায়িক'। তীক্ষ্ণ মতপার্থক্য বা বিতর্ক এমনিতে কোন ভয়ের কাবণ নয়; কারণ তর্ক বিতর্কই ঐতিহাসিকের প্রধান উপাদান, যেগুলি ছাড়া ইতিহাসচর্চায় কোন যথার্থ প্রগতি ঘটতে পারে না। তাহলে এই বিশেষ মতপার্থক্য কেন এমন নঙর্থক ও নিরোধক অভিঘাত হানল আমাদের দেশের ঐতিহাসিক গবেষণায়?

এ-প্রশ্নের কোন সহজ ও সরল উত্তর নেই। প্রথমত, এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে পদ্ধতিচিন্তা এবং ইতিহাস গবেষণায় তার ভূমিকার মৌলিক বিষয়টি। অমর্ত্য সেন থেকে আবার উৎকলন করি :

"The interpretations of history and of culture are peculiarly mediated by the positional features of observation and interpretation."[3]

তার মানে ঐতিহাসিক গবেষণায় একাধিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্থান থাকতে পারে। এবং প্রতিটি অবস্থান ঠিক ক'রে দেয় তার দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার থেকে নিষ্পন্ন সিদ্ধান্ত। এই 'অবস্থানগত মাত্রাভেদ' কে কেবলমাত্র 'মন্ময়তা' ব'লে বর্জন করা যায় না, কারণ যে কোন **অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গীর** বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, তাঁর মতে, মৌলিকভাবে **নৈর্ব্যক্তিক**। অধ্যাপক সেন তাই একে বলেছেন 'অবস্থানগত তন্ময়তা'; আর ঐতিহাসিক প্রকরণ আরও ভালোভাবে বুঝতে জরুরী হ'ল অবস্থানগত নৈর্ব্যক্তিক বোধকে 'বাস্তবসিদ্ধ যুক্তি' দিয়ে যাচাই ক'রে নেওয়া। কেন? অধ্যাপক সেন থেকে আবার উদ্ধৃত করি :

"...a good deal of the debate on the identities in contemporary Indian call for more explicit reference to practical reason rather than pure epistemology, even when armed with positionally objective visions."[4]

অতীত ব্যাখ্যায় 'বাস্তবসিদ্ধ যুক্তি'র ভূমিকা বিষয়ে একটু পরে আসছি। আমাদের কাছে আশু প্রয়োজনের হ'ল, আমাদের দেশের ঐতিহাসিকদের অগ্রণী প্রতিষ্ঠানগুলি এ-কথা মেনে নিতে চাইছেন না যে অতীতের প্রতি নৈর্ব্যক্তিক ও তন্ময় একাধিক দৃষ্টিকোণও নেওয়া সম্ভব। আমাদের দেশের ইতিহাস-বিদ্যাচর্চা তাই এক গভীর অসুখে আক্রান্ত। এই প্রসঙ্গে শ্রী রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাঋদ্ধ পর্যবেক্ষণ উদ্ধারযোগ্য :

"A proprietorial attitude towards knowledge has become the bane of history writing in India today.

The crisis is not one of ideology but of an attitude to knowledge. Knowledge can be liberating ; it can be creative because it fosters difference and debate. Knowledge is also power ; it can lead to control, to the stifling of debate, to sterility."[5]

এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে আমাদের ছোটবেলায় পড়া পাঁচ অন্ধ মানুষের হস্তীদর্শনের আখ্যানটি। প্রতিটি অন্ধই হাতীটির দেহের একটি অংশ স্পর্শ করে হাতীটি বিষয়ে এক প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেছিল। তারপর থেকেই প্রত্যেকে ভাবত যে তার স্পর্শজনিত সেই অভিজ্ঞতাই হাতীটির সত্য পরিচয় ও যথার্থ আকার।

দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রটিও এর থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়। মজার ব্যাপার, 'মন্দির' বা 'মসজিদ' মার্গের ঐতিহাসিকেরা কেবল একে অপরকেই সেইভাবে দেখেন না, এমনকি তাঁদের উভয়ের থেকে ভিন্ন মার্গের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর ঐতিহাসিকদেরও সেইভাবে দেখে থাকেন। এই দুই ধারার ঐতিহাসিকেরা সকলকেই তাঁদের তৈরী করা সেই মানদণ্ডে বিচার করতে চান। উদাহরণস্বরূপ, আর্য/বৈদিক সভ্যতাকে ভারতীয় ভূমিকা পালন করে না; (খ) প্রচুর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলস্বরূপ এক প্রভূত অর্থভিত্তিক অর্থনীতি; (গ) নগরকেন্দ্রের বিস্তার; (ঘ) বর্ণপ্রথার সম্পূর্ণ অঙ্গীকার, যেখানে উচ্চশ্রেণীর মানুষেরাই হ'য়ে উঠলেন উদ্বৃত্তের উপভোক্তা। দ্বিতীয় বা সামন্তপর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তাহ'লে হ'ল : (ক) আপেক্ষিকভাবে দুর্বল রাজার অধীনে এক বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থা; (খ) ভূম্যধিকারী মধ্যবর্তীদের এক শক্তিশালী শ্রেণীর উদ্ভব, যার ফলে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক গঠনে এল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন; (গ) বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থার আশঙ্কাজনক অবক্ষয়; (ঘ) আত্মনির্ভরশীল গ্রামীণ অর্থনীতির উদ্ভব ও সংঘবদ্ধতা ইত্যাদি।

অনেক ঐতিহাসিকই বেশ কয়েকটি বিষয়ে এই সিদ্ধান্তগুলির তথ্যগত ভিত্তিতে গভীর সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া যদি আমরা তর্কের খাতিরে মেনেও নিই যে, এই সিদ্ধান্তগুলি যথার্থ, তাহ'লে মনে রাখা প্রয়োজন, প্রাক্-সামন্তপর্বে এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধানত প্রকাশ পেয়েছিল গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার সমতলে। সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবে এই অনুমানগুলির গ্রাহ্যতা এখনও পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচিত হয় নি। তার একটা কারণ অবশ্য হতেই পারে যে, গঙ্গা-যমুনা সমতলে প্রাক্ সামন্তপর্বের যে ঐতিহাসিক চিত্র আমরা পাই, তা সমশতাব্দীর দক্ষিণ ভারতের পরিস্থিতি থেকে অনেকটাই ভিন্ন।

এসব সত্ত্বেও কোন কোন পন্ডিত অবশ্য এমন সিদ্ধান্ত থেকেও নিবৃত্ত হ'ন নি যে, "the best description of society and polity in medieval South India would be that it was feudal."[৬] এমনকি "South India had not experienced an earlier classical society in the pre-feudal phase" এবং "forces that brought about the transition to feudal society (in south india) have not been isolated and analysed by historians"[৭] স্বীকার ক'রে নিয়েও তাঁরা এমন দাবী করেছেন। তবু গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল ব'লেই দক্ষিণভারতেও একইভাবে সামন্ততন্ত্র—অন্তত তার দক্ষিণ ভারতীয় রূপে উদ্ভূত হয়েছিল, এ দাবী মেনে নিতে হয়।

এই পটভূমিতেই আমরা পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের মতো আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে মুখ ফেরাই—যেন তারা ভারতীয় ইতিহাসের কেন্দ্র মেনে নিতে যাঁরা রাজী তাঁরাই একমার্গের পরীক্ষায় ঐতিহাসিকের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। আর অন্য মার্গাবলম্বীরা তত্ত্বকে যে-কোন মান পর্যন্ত লঘু করেও এই উপমহাদেশে এক বিশেষ ধরনের সামন্ততন্ত্র যে দেশের একবিশেষ সময়পর্বে প্রচলিত ছিল, একথা মানতে এবং তা

নিয়ে তর্ক করতে উদ্যত। এইভাবে ঐতিহাসিকদের সামনে এসে পড়ে এক হবস্‌ন নির্বাচনের বিকল্প : হয় উত্তপ্ত কড়াইতে পড়ো বা আগুনে, নয়ত ভারতীয় ইতিহাসচর্চার প্রেক্ষাপট থেকে চিরকালের জন্য নির্বাসিত হও। দক্ষিণ ভারতের এক প্রবীণ ঐতিহাসিকের ভাগ্যে যা ঘটেছিল, এই প্রসঙ্গে তার উদাহরণ দিয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। প্রায় দুই দশক ধ'রে এই ঐতিহাসিকটি প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রধান ব'লে পরিগণিত হওয়ার সম্মান ও সুযোগ পেয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিবাদী মার্গের ঐতিহাসিকদের একান্ত গোষ্ঠীর মধ্যে। এক অর্থে দক্ষিণ ভারতের বৃত্তিজীবী ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম সামন্তবাদের ধারণা নির্মাণ ও প্রয়োগ করেছিলেন প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। কিন্তু যে-দিন তিনি 'মন্দির' 'মসজিদ' বিবাদে তাঁর সতীর্থ অসাম্প্রদায়িক মার্গের বন্ধুদের থেকে ভিন্নতর মত প্রকাশ করলেন, অচিরেই তাঁকে সঁপে দেওয়া হ'ল 'মন্দির' মার্গে।

অথচ, তাদের পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রত্যক্ষ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এই দুই মার্গের ঐতিহাসিকেরা একই উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে থাকেন। অন্ততপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার চর্চায় এটিই বিশেষভাবে সত্য। দুই মার্গের অনুগামীদের কাছেই গঙ্গা উপত্যকার সমতলভূমিতে কী ঘটেছিল তাই হ'ল ভারতীয় ইতিহাসের পরিবর্তন ও প্রবহমানতা পরিমাপের মানদন্ড। লক্ষ করার মতো, এই বিষয়টি বিশদ করার অপেক্ষা রাখে, কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গী যে-ঐতিহাসিকেরা নিজেদের যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক পন্থা-অনুসারী ব'লে মনে করেন, তাদের একাংশও মানেন।

এই ঐতিহাসিকেরা সামন্ততন্ত্রের সূচনা সময়গতভাবে নির্দেশ করেন প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি এবং একে দেখেন পূর্ববর্তীযুগে প্রধান ধারাগুলির বিলয় বা বৈপরীত্যের পরিণতি হিসাবে। প্রথম পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল : (ক) এক শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেখানে স্থাবর সম্পত্তির অধিকার ক্ষমতার কাঠামোয় কোন বিশেষ ইতিহাস চর্চার এই সমস্যাগুলির সমাধানে আরও জরুরী ও ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। যদিও অন্য প্রসঙ্গে, বিখ্যাত আমেরিকান ভারত তত্ত্ববিদ ড্যানিয়েল এইচ. এইচ. ইঙ্গল্‌স্ যা বলেছিলেন তা এই প্রসঙ্গেও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

"How does one bring the diverse facts of literature, of society, of religion as one finds them in different ages and areas, into a single understandable system ?...It may be said of course that systemising is just what we should not yet do, for it has been the experience of sciences, social as well as natural, to begin with description and to come to systems only when they are fully grown. But still one must be aware of an ultimate goal, and one yawns for it. Personally I tend to think of such a goal as a system of history, for such has been my training.[8]

ইতিহাসচর্চার বিবরণাত্মক রচনাপদ্ধতিকে আদৌ ইতিহাস হিসাবে বিবেচনা না-করার বর্তমান প্রবণতাকে বাধা দিতেই হবে। আর উৎসাহ দিতে হবে ভারতীয় ইতিহাসতত্ত্বে

আঞ্চলিক চর্চার। তার মানে হ'ল এই মুহূর্তে আমাদের আশু প্রয়োজন, বিশাল ও উজ্জ্বল সাধারণীকরণের পথ ছেড়ে উপমহাদেশের প্রতিটি প্রধান অঞ্চলের এক সুশৃঙ্খল অধ্যয়ন করা। আঞ্চলিক ইতিহাস ও সভ্যতার প্রতি গুরুত্ব মানেই সংকীর্ণ বা জাতীয়তা-বিরোধী হওয়া নয়। আমরা সকলেই জানি, সাম্প্রতিক কালের উপজাতীয় বা আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সত্তা আবিষ্কারে এক প্রবল জোয়ার এসেছে, তারাও অতীতেই শিকড় সন্ধান করছেন। হেসে উড়িয়ে দিয়ে বা জোর ক'রে, এই সত্তা পরিচয়ের শক্তি বা উপকরণগুলিকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু বর্তমান বৃত্তিজীবী ঐতিহাসিকদের এই সংগোষ্ঠীর মতো প্রতিষ্ঠান থেকে যুক্তিবাদী বিচার ধারা প্রয়োগ ক'রে বিভিন্ন অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গীর পরীক্ষা করা যেতে পারে। এখানেই অতীত ব্যাখ্যায় অধ্যাপক অমর্ত্যসেন কথিত "বাস্তবসিদ্ধ যুক্তি"র বিশেষ ভূমিকা। কারণ তার ফলেই আমরা পারব ঃ "to assess the different views in terms of their respective implications for action and to evaluate them in that light."[৯] কিন্তু মৌলিক প্রশ্নটি হল ঃ আমরা কী মানতে রাজি আছি যে ব্যাখ্যানেরও বিভিন্ন বিকল্প অবস্থান থাকতে পারে, যেগুলি একই সঙ্গে তন্ময় ও গ্রাহ্য ?

ধৈর্যধ'রে শোনবার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

সূত্র-নির্দেশ

1. ইরফান হাবিব, তৃতীয় সমাবর্তন বক্তৃতা, ১৯৯৮ পৃ. ১।
2. অমর্ত্য সেন, **অন ইন্টারপ্রেটিং ইন্ডিয়াস পাস্ট**, কলিকাতা ১৯৯৬, পৃ. ১।
3. **তদেব**, পৃ. ৫।
4. **তদেব**, পৃ. ৯।
5. রুদ্রাংশু মুখার্জী, 'ফ্যাক্ট এন্ড ফ্যাক্সন', **দ্য টেলিগ্রাফ**, ডিসেম্বর ২৫, ১৯৯৮।
6. কেশবন, ভেলুথৎ, **দ্য পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার অব্ আর্লি মিডিয়াভ্যাল সাউথ ইন্ডিয়া**, নয়া দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ২৬৬।
7. **তদেব**, পৃ. ২৬৭।
8. মিলটন সিঙ্গার, (সম্পাদিত), **কৃষ্ণ ঃ মিথ্‌স্, রাইট্‌স্, এ্যাটিটি উড্‌স**, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১০; এ ড্যানিয়েল এইচ. এইচ. ইঙ্গল্‌স্ কৃত ভূমিকা।
9. অমর্ত্য সেন, **পূর্বোক্ত**, পৃ. ৭।

মধ্যযুগের ভারত বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ

মধ্যযুগে বাংলার ধর্মীয় সাধনার ঐতিহ্য

অতীশ দাশগুপ্ত

বাংলার ধর্মীয় সাধনার সামগ্রিক ইতিবৃত্ত অদ্যাপি স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। যা এখনও পড়ানো হয় তা হল সামাজিক ইতিহাসের ভগ্নাংশ হিসেবে বিভিন্ন ধর্মের কিছু বক্তব্য এবং ধর্মপ্রচারকদের জীবনীর বিক্ষিপ্ত বর্ণনা। তার মধ্যে অধিকাংশ স্থান অধিকার করে থাকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পরিধিতে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের নিজস্ব 'নবজাগরণ'-সংক্রান্ত ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মসূচী যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশকে শহরাঞ্চলে রূপায়িত হয়েছিল। এর ফলে বাঙালী মধ্যবিত্তের চেতনায় একটি ধারনা এখনও বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের আগে অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলার ধর্মীয় সাধনার ইতিহাস প্রধানত নানাবিধ কুসংস্কার ও যুক্তিহীন লোকাচারে আকীর্ণ ছিল এবং সে যুগের ধর্মীয় দর্শনের গভীরতার অনুসন্ধান ফলপ্রসূ হবে না। আসলে বৃটিশ শাসকরা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে খুব যত্নসহকারে যে মনোভাব বাংলার শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে প্রসারিত করতে চেয়েছিল তার মূল কথা হল ইংরেজি শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবেই বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল 'মধ্যযুগীয় অন্ধকার' থেকে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছিল। শুধু বৃটিশ শাসকরা নয়, ইংরেজ ইতিহাসবিদ্ ও ইংরেজি-শিক্ষিত দেশীয় পন্ডিতদেরও বাংলার তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মসাধনার ইতিবৃত্ত-সংক্রান্ত চিন্তায় যথেষ্ট ভারসাম্যহীনতা রয়েছে। এঁরা ইউরোপের 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' মধ্যযুগের ইতিহাস পড়েছিলেন এবং নিজেদের দেশের ইতিবৃত্তের ক্ষেত্রে সেই পুঁথিগত বিদ্যা যান্ত্রিকভাবে আরোপ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই ভারসাম্যহীনতা ও যান্ত্রিক চিন্তার পিছুটান অতিক্রম করার প্রয়োজনে আমরা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় জোর দেব প্রাক্-বৃটিশকালের বাঙালীর ধর্মসাধনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিবর্তনের বিশ্লেষণে।

সেই বিশ্লেষণ করার সময় আমাদের আরেকটি সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও সতর্ক থাকতে হবে। প্রাক্-বৃটিশ যুগের ধর্মীয় ঐতিহ্য নিয়ে যে গবেষণাগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাতে সেই ঐতিহ্যের স্বকীয়তা অনুসন্ধানের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কিভাবে বাংলার হিন্দুরা উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের অনুসারী হতে পেরেছিল অথবা, পক্ষান্তরে, বাংলার মুসলমানরা কিভাবে মধ্যপ্রাচ্যের শরিয়তী অনুশাসনের প্রতি আনুগত্য দেখাতে পেরেছিল। এই সীমাবদ্ধতার কারণও ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের

আবর্তের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। বৃটিশ শাসকরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তকে ঔপনিবেশিক শাসনপ্রসূত সীমিত সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করে দিতে পেরেছিল। ১৯৪৭ সালের আসন্ন ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে এই ইঁদুর-দৌড় আরও তীব্র হয়েছিল। বাংলার ধর্মীয় ঐতিহ্যকে হিন্দু ও মুসলমানের বিভাজনের তীক্ষ্ণতায় উপস্থাপিত করার তাগিদ বৃটিশ শাসনসৃষ্ট সেই সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতার আবিলতায় নিহিত ছিল।

এই আবিলতায় হারিয়ে গিয়েছিল বাংলার নিজস্ব মানব ধর্মের স্বকীয় ঐতিহ্য যার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল আত্মোপলব্ধির দর্শন ও সমন্বয়বাদের সহিষ্ণু সাধনা। আমরা সেই ঐতিহ্যের মূল প্রসঙ্গগুলি অনুধাবনে সচেষ্ট হব বর্তমান আলোচনার স্বল্প পরিসরে। প্রাক্-বৃটিশ সময়কালকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রকোষ্ঠে দ্বিধাবিভক্ত করলে আলোচ্য ঐতিহ্যের প্রবহমানতা ক্ষুণ্ণ হবে। তবে আজকের নির্দ্ধারিত অধিবেশনের শিরোনামে একধরনের গতানুগতিক দিক্‌নির্দেশ রয়েছে। তাই আমাদের একপ্রকার মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। বাংলার ধর্মীয় ঐতিহ্যের উন্মেষ যে শতাব্দীগুলিতে প্রস্ফুটিত হয়েছিল সেই তথাকথিত প্রাচীন যুগের সাধনার চালচিত্র আমরা প্রথমে উপস্থাপিত করব সংক্ষিপ্তভাবে এবং সেই সূত্র ধরে আমাদের মূল আলোচনা প্রসারিত হবে তথাকথিত মধ্যযুগের সময়সীমায়। বাংলার ধর্মীয় সাধনার গতিশীলতা অব্যাহত রেখে আমাদের কথোপকথন শেষ হবে বৃটিশ ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশের দ্বারপ্রান্তে এসে।

বাংলার ধর্মের ইতিহাস প্রাক্-বৈদিক। অর্থাৎ, বহিরাগত আর্যরা ভারতীয় উপমহাদেশে এসে প্রধানত উত্তর ভারতে বেদ-ভিত্তিক যে হিন্দু ধর্মের প্রসার ঘটালো, বাংলার ধর্মীয় ঐতিহ্যের সূত্রপাত হয়েছিল তার আগে। বৈদিক হিন্দুরা বাংলার অধিবাসীদের ব্রাত্য এবং বেদ-বিরোধী বলে অভিহিত করেছিল। তীর্থযাত্রার প্রসঙ্গ ছাড়া বঙ্গ ও মগধে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, এই ছিল তৎকালীন বেদপন্থীদের বিধান। কিন্তু ক্রমশ বৈদিক হিন্দুধর্মে পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে এবং সেই পরিবর্তনে বাংলার প্রাক্-বৈদিক ধর্মীয় দর্শনের অবদান কম ছিল না। বেদের প্রথম দিকে যা দেখি তা হল ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে যাগ-যজ্ঞ, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল ইহজীবনে ধনজন, গো-অশ্ব ও শস্য-সম্পদ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এবং পরলোকে স্বর্গগমনের অভীপ্সা। বৈদিক যুগের প্রথম পর্যায়ে সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের প্রতি আর্যদের বিশেষ চিন্তার উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়নি। ক্রমে বেদান্ত বা উপনিষদের যুগে আত্মা-পরমাত্মা প্রভৃতির তত্ত্ব বড় হয়ে উঠল। তখন ধনজনের কামনার স্থানে এল বৈরাগ্য, স্বর্গের সঙ্গে আর্যরা চাইল মুক্তি। আগের যুগের ইপ্সিত বস্তুগুলি একেবারে দূরে সরে গেল না, তবে মানুষের মহত্ত্ব উপস্থাপিত হল। মানুষের পারস্পরিক মৈত্রীর সূত্রে ভক্তিসাধনার উন্মেষ ঘটলো। জানার চেষ্টা হল যে, সত্য কি ? বলা হল যে,

বাহ্যিক প্রয়োজনের তাগিদে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে তার মাধ্যমে কি সৃষ্টির রহস্য জানা যাবে? সে তো অন্ধকারে নীহারে আবৃত।

এর উত্তর ঋক্, সাম, যজু তিন বেদে পাওয়া গেল না। অথর্ব বেদেই সেই উত্তরের ইঙ্গিত পাওয়া গেল—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ সবই এই মানুষের মধ্যে প্রতিধ্বনিত। মানুষের মধ্যেই মৃত্যু ও অমৃত, তার শিরায় শিরায় স্পন্দিত হচ্ছে সব সমুদ্রের উচ্ছ্বাস। অথচ অথর্ব বেদকে সেকালের উত্তর ভারতের বৈদিক হিন্দু সমাজ, বিশেষত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা, আমলই দিতে চাইত না। বেদান্ত বা উপনিষদের যুগে এসে মানুষের মধ্যেই ব্রহ্মকে সংস্থিত করার যে দার্শনিক প্রয়াস তা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করল। ধর্মীয় দর্শনের জগতে এই যে উত্তরণ সাধিত হল তার পিছনে বাংলার প্রাগার্য ধর্মীয় সাধনার অবদান ছিল যথেষ্ট।

বাংলার সেই ধর্মীয় ঐতিহ্যের অবদানের ভূমিকা ছিল দুই ধরনের। প্রথমটি সংগঠিত হয়েছিল সেইসব বাঙালী দার্শনিকদের মৌলিক রচনার সাহায্যে যারা উত্তর ভারতের বৈদিক ধর্মের প্রাথমিক অপরিশীলিত অবয়বকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন বাংলার প্রাগার্য প্রকৃতি-পুরুষের জ্ঞানতত্ত্ব এবং স্বকীয় মানবধর্মের দর্শনের সাহায্যে। দ্বিতীয়টি আরও অভিনব, যেখানে বাংলার ধর্মসাধনা বেদ-বিরোধী অবস্থান নিয়ে তার প্রাগার্য নিজস্ব মানবধর্মের ঐতিহ্যের সাথে বৌদ্ধ-জৈন-শাক্ত ঐতিহ্যের সম্মিলন রচনা করে এক নতুন লোকায়ত 'সহজিয়া' ভক্তিবাদী দার্শনিক ধারার প্রবর্তন ঘটালো যা পাল ও সেন বংশের রাজত্বকাল অতিক্রম করে পরবর্তী তুর্ক-আফগান ও মুঘল যুগে ইসলামের সুফি দর্শনের সঙ্গেও সমন্বয় স্থাপন করতে সক্ষম হল। বাংলার ধর্মীয় ঐতিহ্যের অবদানের প্রথম ধারাটি আমরা সংক্ষেপে উপস্থাপিত করব। দ্বিতীয় ধারাটি, যা লোকায়ত স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, তা কিছুটা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করব, বিশেষত মধ্যযুগের সময়সীমায়।

প্রথম ধারাটির উপস্থাপনা দিয়ে সুরু করা যাক। বৈদিক হিন্দুধর্মের ষড়দর্শনের মধ্যে পূর্বমীমাংসা বেদকেন্দ্রিক। পূর্বমীমাংসার দুটি মতপ্রবাহ—কুমারিলের অবস্থান রক্ষণশীল, প্রভাকরের মতাদর্শ উদার। বাংলায় গৌরমীমাংসক শালিকনাথের অবস্থান ছিল প্রভাকরী মতের সমর্থনে। বেদান্ত বা উত্তর-মীমাংসায় বাংলার ধর্মীয় ঐতিহ্যের অবদান আরও নির্দিষ্টভাবে প্রতিফলিত হল ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া নিবাসী মধুসূদন সরস্বতীর বিবিধ রচনার সূত্রে। মধুসূদন সরস্বতী ছিলেন ভারতীয় সর্বদর্শন ও সর্ববিদ্যার পরিপূর্ণ বিগ্রহ। তবু অবশেষে বাংলাদেশের মানবীয় ভাবেরই জয় তাঁর জীবনে ফুটে উঠল। মধুসূদন ধীরে ধীরে তাঁর সমস্ত দার্শনিকতা ভাসিয়ে দিলেন ভক্তির পথে। তাঁর রচিত গ্রন্থের যেমন অতুল গভীরতা তেমনি সংখ্যাও শতাধিক। তাঁর 'অদ্বৈতসিদ্ধি', 'সিদ্ধান্তবিন্দু', 'প্রস্থানভেদ' প্রভৃতি গ্রন্থ চিরদিন জ্ঞানীদের বন্দনীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু তিনি তাঁর 'ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থের পরিশেষে লিখছেন : "একদিন ছিলাম আমরা অদ্বৈত পথের পথিকদের আরাধ্য; স্বানন্দ সিংহাসনে বসে বসে দীক্ষা পূজা পেয়েছি। আজ একি হল! গোপবধূ প্রণয়রসিক লীলাময় চতুরের প্রেমের এ কি প্রভাব। শেষকালে কি না তাঁরই চরণে এসে বাঁধা পড়তে হল।" (আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক মূল সংস্কৃত শ্লোকটির

বঙ্গানুবাদ)। মধুসূদন যেখানে বৈদান্তিক সেখানে তিনি উত্তর-মীমাংসার দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছেন। যেখানে তিনি ভক্তিবাদী, সেখানে তাঁর গৌড়ীয় বৈশিষ্ট্যই উচ্চমার্গে উজ্জ্বল।

সাংখ্যের প্রবর্তক কপিলের আশ্রম ছিল বাংলায় গঙ্গাসাগর সঙ্গমে। সাংখ্যদর্শনের জগতে কপিল ও তাঁর অনুসারী আসুরি, পঞ্চশিখ, ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রভৃতি বাঙালী আচার্যদের বিশেষ প্রতিবাদী অবস্থান ছিল। তাঁরা বেদপ্রবর্তিত যাগযজ্ঞকে বড় স্থান দেননি তাঁদের চিন্তায় ও রচনায়। ঈশ্বরকৃষ্ণ তো তাঁর কারিকার আরম্ভেই বললেন : ''দুঃখনিবৃত্তির কাজে বৈদিক যাগযজ্ঞ প্রত্যক্ষ উপায় বটে, কিন্তু তাতে অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও তারতম্য দোষ আছে; কাজেই তার চেয়ে বিপরীত (অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের) জ্ঞানের পথই ভালো।'' (ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক মূল সংস্কৃত শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ)। বাংলার স্বকীয় সাধনার সঙ্গে সাংখ্যমত সম্পৃক্ত রয়েছে নিবিড়ভাবে। ন্যায়--বৈশষিক দর্শনেও বাংলার অবদান কম নয়। বৈশষিক দর্শনে শ্রীধরের 'ন্যায়কন্দলী' মহাগ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত। দক্ষিণরাঢ়ের ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামে ছিল শ্রীধরের নিবাস। নব্যন্যায়ে তো বাংলার স্থান বহুকাল থেকে সারা ভারতে অগ্রগণ্য হয়ে রয়েছে। শুধু রঘুনন্দন নন, বাসুদেব, জানকীশর্মা, কৃষ্ণদাস, গুণানন্দ, রুদ্রবাচস্পতি, জগদীশ সকলেই ছিলেন নব্যন্যায়ের জগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

বৈদিক হিন্দুধর্মের ষড়দর্শনের বিভিন্ন বিভাগে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলার ধর্মসাধনার যে নির্দিষ্ট অবদান, আমরা তার সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপিত করলাম। এবার আমরা আলোচনা করব বাংলার ধর্মীয় প্রবাহের দ্বিতীয় স্বকীয় ধারাটি নিয়ে, যার অবস্থান প্রোথিত ছিল বেদ-বিরোধী লোকায়ত ভক্তিবাদী দর্শনের ঐতিহ্যে। এই লোকায়ত দর্শনের উত্তরাধিকারকে বাংলার সাধারণ মানুষ 'সহজিয়া' সাধনার ঐতিহ্য হিসেবে মান্য করে থাকে। এব উন্মেষ প্রাগার্য যুগে বাঙালীর গ্রামীণ সমাজে নাথগুরু বা আচার্যদের কায়াসাধনের সূত্রে। অথর্ব বেদে এই সাধনার বিক্ষিপ্ত স্বীকৃতি রয়েছে। যদিও তৎকালীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সমাজ অথর্ব বেদকে ব্রাত্য বলে অবজ্ঞা করেছিল, এই ব্রাত্যসঙ্গীতেই প্রতিফলিত হয়েছিল প্রাগার্য বাংলার সাধনার কেন্দ্রবিন্দু সেই সাধারণ মানুষের স্তবগান। তবে সহজিয়া দর্শন অথর্ববেদে প্রথম প্রতিফলিত হলেও, সামগ্রিকভাবে তার সামাজিক স্বীকৃতি এলো অষ্টম শতাব্দী থেকে পালবংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের সান্নিধ্যে 'সহজযান' সাধনার প্রসারের মাধ্যমে। সহজিয়া দর্শনের প্রথম সাংস্কৃতিক প্রকাশ ঘটল নবম-দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার আদিস্রষ্টা সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাপদে। সিদ্ধাচার্যরা উচ্চবর্ণের অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নি; তাঁদের যোগাযোগ ছিল বাংলা ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে। চর্যাপদের সুপ্রাচীন দোহাকোষগুলি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথমে সঞ্চয় করে এনেছিলেন নেপালে প্রাপ্ত পুঁথির সংগ্রহ থেকে। অধিকতর সংখ্যায় আরও সমৃদ্ধ দোহাকোষ তিব্বত থেকে এনেছিলেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন।

চর্যাপদে যে 'সহজ' সাধনার প্রকাশ ঘটেছিল তা ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতার সব শৃঙ্খল ও লোকাচার পরিত্যাগ করতে উন্মুখ ছিল। ততদিনে হিন্দুধর্মের শ্রৌত পর্যায় সমাপ্ত হয়ে রক্ষণশীল অসহিষ্ণু স্মার্ত পর্যায় সুরু হয়েছে যা বাংলার কৃষক সমাজকে

জাতপাতের বিভাজনে বিভক্ত করতে উদ্যত ছিল। তার বিরুদ্ধে সিদ্ধাচার্য সরহ্-পা যা লিখেছিলেন তার পরিশ্রুত রূপ আধুনিক বাংলায় মোটামুটি এরকম দাঁড়াবে :

"ব্রাহ্মণরা আসলে ভীরু ও মূর্খ,
ওরা অর্থহীন চতুর্বেদ আওড়ায়,
মাটি, জল আর কুশ নিয়ে
ওরা বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে।
কী হবে প্রদীপে? নৈবেদ্যেরই বা কী প্রয়োজন?
কী লাভ মন্ত্র আউড়ে?
তীর্থ আর তপোবনে গিয়েই বা কী হবে?
মোক্ষ আসে কি শুধু অবগাহনে?..."

তাই চর্যাকারের উত্তর :

"অপনা অপা বুঝ তু নিঅমন"।

অর্থাৎ "আপনি বুঝে নাও নিজের চিন্তার নিরিখে।"

সহজিয়া দর্শনের মূল কথা হল উজান-সাধন। সংসারের প্রতিষ্ঠিত পন্ডিত ও ধার্মিকেরা চলছেন যে পথে সহজিয়াদের যেতে হবে তার উজানে বা বিপরীত পথে। যে ভোগবাদী ইন্দ্রিয়নির্ভর গড্ডালিকা প্রবাহে মানুষ নিমজ্জিত, সেই পথের বিপরীতে উজান বেয়ে সাধককে ফিরতে হবে 'সহজ' অর্থাৎ সহজাত সত্য-স্বরূপে, রূপ থেকে অরূপে। সহজিয়াদের এই 'সহজ' প্রত্যাবর্তনের পথ কিন্তু দার্শনিক অর্থে সহজ নয়। শীর্ষস্থানীয় সহজিয়া চন্ডীদাস পরবর্তীকালে গেয়েছিলেন :

"সহজ সহজ সবাই কহয়ে,
সহজ জানিবে কে?
তিমির অন্ধকার, যে হইয়াছে পার,
সহজ জেনেছে সে।"

বাইরের সব রূপের ভিতরে আত্মগোপন করে আছে যে 'প্রত্যাগাত্মন' তাই অমৃত-স্বরূপ। সেই অমৃত-স্বরূপের সন্ধান লাভ করতে হলে ইন্দ্রিয়গুলিকে ফিরিয়ে নিতে হবে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে। আধ্যাত্ম-সাধন তাই সর্বদাই উজান বা উল্টা-সাধন—বাইরের দেশ থেকে অন্তরের দেশে ফিরে যাওয়া। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সেই আত্মোপলব্ধির জন্য মন্দির, বিগ্রহ ও ব্রাহ্মণের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এতো নিজের সাথে কথোপকথন, নিজের চেতনার উন্নতি সাধন।

সহজিয়া দর্শনের উন্মেষকালে চর্যাপদ রচয়িতারা এই উজান-সাধনাকে গ্রামীণ সমাজে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন বাংলার পরিচিত নদী-নৌকা-মাঝির অনুষঙ্গ। দেহ-নৌকাকে নদীর উজান স্রোতে উল্টোপথে ফিরিয়ে নিতে হবে সহজ-স্বরূপের অভিমুখে গুণটানার মত উদ্যোগ গ্রহণ করে। আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে সিদ্ধাচার্য সরহ্-পা তাই গান বেঁধেছিলেন :

"নৌবাহী নৌকা টান অ গুণে।
মেলি মেলি সহজে জাউ না আনেঁ।।"

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যখন বাংলায় প্রসারিত হতে সুরু করেছিল তখন সহজিয়া দর্শনও সমৃদ্ধ হল কয়েকটি ক্ষেত্রে। তবে সহজিয়া দর্শন সেই প্রভাব আত্মস্থ করে কিছু প্রসঙ্গে নিজস্ব সংযোজনও নির্মাণ করতে সক্ষম হল ধীরে ধীরে। জৈনমতের অধীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা চলে আসছিল মুখে মুখে। মহাবীর পর্যন্ত আচার্যরা তীর্থংকর, তারপর চারজন শ্রুতকেবলী। শেষ শ্রুতকেবলী হলেন ভদ্রবাহু। তিনি ছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু। তাঁর জন্ম উত্তরবঙ্গে পৌন্ড্রবর্ধনের কোটপুর বা বর্তমান দেবীকোটে। ভদ্রবাহুই সর্বপ্রথম জৈন শাস্ত্রগুলি একত্র করে প্রকাশ করেন। ভদ্রবাহুই দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের প্রসার ঘটিয়েছিলেন।

বৌদ্ধদের হীনযান মতের চেয়ে মহাযান মতই বাংলাদেশের বেশী নিজস্ব। বহু মহাযান আচার্য বাংলাদেশেই জন্মেছেন। 'তত্ত্বসংগ্রহ' রচয়িতা শান্তরক্ষিত ৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলায় সাভারে জন্মগ্রহণ করেন। নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ এবং হিউয়েন সাঙের গুরু শীলভদ্রও ছিলেন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। বিক্রমশীলা বিহারপতি তিব্বতের ধর্মগুরু দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চর্যাপদে ও দোহাকোষেও আমরা বহু বাঙালী আচার্যের নামের সন্ধান পেয়েছি। হীনযান মতের আচার্যদের মধ্যে রামচন্দ্র কবিভারতীর বিশেষ ভূমিকা ছিল সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রে। বাংলার বরেন্দ্রভূমিতে চিরবাটিকা গ্রামে তাঁর জন্ম। এখনও এই বুদ্ধাগম চক্রবর্তী রামচন্দ্রকে সিংহলের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন।

জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে দেবতার স্থানে মানুষই বসলেন পূজ্য হয়ে। বেদের বিরোধিতা করে বৌদ্ধ ও জৈন সাধকরা বললেন মানববৃত্তিগুলি বিশুদ্ধ করাই হল ধর্মসাধনা। বাংলার সহজিয়াদের কায়াসাধনা সমৃদ্ধিলাভ করল জৈন ও বৌদ্ধদের ধর্মসাধনা থেকে। উচ্চারিত হল যে, বিশ্বের সব সত্যই মানবকায়ার মধ্যে জানতে হবে। জৈনদের পাহুড় দোহা মুনি রামসিংহ লিখেছিলেন প্রায় ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে। জৈনদের দোহা বহুক্ষেত্রে মহাযানদেরই বাণী। আর সহজিয়াদের 'সহজযান' সেই মহাযানেরই সমীপবর্তী হয়েছিল। সরহ-পার দোহাকোষে উপস্থাপিত হল :

> "এখু সে সুরসরি যমুনা।
> এখু সে গঙ্গা সাঅরু।।
> দেহ সরিসঅ তিথ।
> মই সুহ অন্ন ন দীটঠত্ত।।"

অর্থাৎ 'এখানেই (অর্থাৎ এই দেহেই) সুরেশ্বরী (গঙ্গা) ও যমুনা, এখানেই সেই গঙ্গা-সাগর তীর্থ। দেহই তীর্থস্থান, এবং এখানে যে সুখ লাভ হয় এমন আর আমি কোথাও দেখিনি।'

এইভাবে সহজযান মতের সাধকরা অর্থাৎ বাংলার বৌদ্ধ সহজিয়ারা 'মহাসুখ'-এর তত্ত্বকে 'সহজ' পন্থার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন পুরুষ ও নারীর 'উপায়' ও 'প্রজ্ঞা'র দ্বৈতভাবকে সম্মিলিত করে। তাঁরা জাতি-বর্ণের বিভেদ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাস্ত্রীয় শাসনকে উপেক্ষা করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু তাঁদের 'মহাসুখ' অর্জনের পথটি, সিদ্ধাচার্য

চর্যাকারদের বিশুদ্ধ প্রয়াসের অঙ্গীকার সত্ত্বেও, কিছু পরিমাণে ইন্দ্রিয়-ভিত্তিক তান্ত্রিক পদ্ধতির উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। সহজিয়া দর্শনের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল আরেকটি বড় কারণে। সহজিয়া সাধকরা বৌদ্ধধর্মী পাল রাজবংশের চারশ' বছরের রাজত্বকালের সহিষ্ণুতার পরিবেশে যে সমন্বয়বাদী লোকায়ত ধর্মের ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন তা সমর্থন পেল না একাদশ থেকে ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়সীমায় কর্নাটক থেকে আগত স্মার্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক সেনবংশের রাজত্বে। লক্ষণ সেন ও বল্লাল সেন 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ও 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়নে উৎসাহের সূচনা করে সচেষ্ট হয়েছিলেন স্মৃতি-নির্ভর ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের জাতপাতের বিভাজনে বাংলার সমাজকে বিভক্ত করতে। যদিও উত্তর ভারতের বর্ণাশ্রম প্রথা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বিভাজনের হুবহু বিন্যাস বাংলায় অনুপ্রবিষ্ট হল না এবং যদিও বাংলার সমাজকে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ছত্রিশটি উপ ও সংকর বর্ণে বিভক্ত করা হল (যার মধ্যে বৈদ্য ও করণ বা কায়স্থদের উত্তম-সংকর বর্ণের অন্তর্গত করা হয়েছিল), তথাপি বাংলার সমাজ জাতিভেদে আক্রান্ত হল। তার প্রভাবে সহজিয়া দর্শনের প্রধান শরিক, যারা সমগ্র বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, সেই কৃষক সমাজের অধিবাসীদের অধিকাংশকে নিম্নবর্ণ ও অন্ত্যজ হিসেবে চিহ্নিত করা হল।

এই আরোপিত অবদমনের বিরুদ্ধে বাংলার লোকায়ত সহজিয়া ঐতিহ্য পুনরায় সক্রিয় হতে সক্ষম হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে পরবর্তী তুর্ক-আফগান যুগে, বিশেষত ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী রাজবংশেব সমন্বয়বাদী সহিষ্ণুতার পরিবেশে। সে সময় সহজিয়া ঐতিহ্য দুটি প্রধান ধারায় প্রকাশিত হয়েছিল—সগুণ ও নির্গুণ। বৈষ্ণব সহজিয়া ভক্তিবাদের প্রকাশ ঘটল সগুণ ধারায়, যার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন চৈতন্যদেব ও চণ্ডীদাস। আর নির্গুণ সহজ পথের পথিক হলেন বাংলার বাউল ও উত্তর ভারতের সন্ত-সাধকরা। সন্ত কবিদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন কবীর এবং তাঁর শিষ্য দাদু ও নানক।

বৈষ্ণব সহজিয়ারা বৌদ্ধ সহজিয়াদের তন্ত্র-নির্ভরশীলতাকে কাটিয়ে সহজ-সাধনাকে উন্নীত করেছিলেন সগুণ ভক্তিবাদী প্রেমের দর্শনে। চণ্ডীদাস মানবধর্ম প্রসঙ্গে আরও গভীরতা অর্জন করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত রচনায়:

> "শুনহ মানুষ ভাই,
> সবার উপরে মানুষ সত্য,
> তাহার উপরে নাই।"

চৈতন্যদেব ও চণ্ডীদাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সামাজিক অবদান হল স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মের জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ। এই অবদান তুমুলভাবে আকৃষ্ট করেছিল পূর্বতন সেন বংশের রাজত্বে সামাজিকভাবে নিপীড়িত হিন্দুধর্মের এক বিশাল জনসমষ্টিকে। চৈতন্যদেব তাঁর প্রিয় শিষ্য নিত্যানন্দকে বলেছিলেন:

> "আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান।"

আত্মপরিচয় দিতে গিয়েও শ্রীচৈতন্য ঘোষণা করেছিলেন: "আমি তো ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়ও

নই, বৈশ্যও নই, শূদ্রও নই। আমি ব্রহ্মচারী নই, বর্ণাশ্রমী বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নই।" কৃত্রিম পরিচয়ের বন্ধন ছাড়িয়ে 'সহজ' মানুষ হবার জন্যই ছিল চৈতন্যদেবের ব্যাকুলতা। তাই তাঁর কাছে কোন মানুষই অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য ছিল না।

এই সময় অন্য একটি সমান্তরাল স্রোতও বইতে শুরু করেছিল। তুর্ক-আফগান রাষ্ট্রশক্তির উত্থানের কিছু আগে থেকেই ইসলামের প্রচারক হিসেবে ধর্মীয় নেতারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত আরম্ভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একাধিক সুফী সম্প্রদায়ের ফকীরদের বাণী ও জীবনী সামাজিকভাবে অবহেলিত হিন্দুধর্মের নিম্নবর্ণের একাংশকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তারা বাংলার গ্রামাঞ্চলে গড়ে তুলল এক ধরনের লোকায়ত ইসলামের ঐতিহ্য যা বাংলার সহজিয়া দর্শনের সঙ্গে কয়েকটি ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল।

তবে এই লোকায়ত ঐতিহ্য গড়তে বাধা পেতে হয়েছিল। বাধা এসেছিল মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত কট্টর শরিয়তপন্থীদের কাছ থেকে, যারা ইতিমধ্যে সুফীদের ঔদার্যের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলতার প্রাচীর গড়ে তুলেছিল। আবার ইসলাম ও হিন্দু উভয় ধর্মের অসহিষ্ণু মৌলবাদীরা পৃথক পৃথকভাবে মরীয়া হয়ে উঠেছিল চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের জোয়ারকে প্রতিহত করতে। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদী অবস্থান সমর্থন পেয়েছিল ইলিয়াস শাহ ও হোসেন শাহের গৌরবময় রাজত্বের সমন্বয়বাদী সহিষ্ণুতার পরিবেশে। জোয়ার এসেছিল বাংলা সাহিত্যের দুটি প্রধান ধারায়—বৈষ্ণবকাব্যে ও মঙ্গলকাব্যে। হোসেন শাহের দরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের শীর্ষস্থানীয় নেতৃদ্বয় রূপ ও সনাতন। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম লিখলেন 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'। এ সময় মুসলমান কবিরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন বৈষ্ণবকাব্য রচনায়।

তবে বৈষ্ণব সাধকদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান সত্ত্বেও তাঁদের সহজ পন্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমিত থাকল রাধা ও কৃষ্ণের সূক্ষ্ম লীলার জয়গানের স্তরে। এই সাধনা শেষ পর্যন্ত পুরুষ ও নারীর প্রেমের উপর দৈবভাব আরোপের এক পরিশীলিত উচ্চমার্গের দর্শনরূপে পরিগণিত হল, কিন্তু মানুষের একান্ত ঈশ্বর নৈকট্যের আধ্যাত্মিকতার গভীরতা সেখানে বহুলাংশে অনুপস্থিত ছিল। পক্ষান্তরে নির্গুণ বাউল সাধকরা আধ্যাত্মিক স্তরে আরও উন্নত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের দর্শনে চির-আকাঙ্ক্ষিত ঈশ্বরের সান্নিধ্যই একমাত্র সাধনা এবং সেই ঈশ্বর প্রতিভাত হয়েছেন বাউলদের অন্তরতম চৈতন্যের গভীরে 'মনের মানুষ' রূপে, যাঁকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে সাধক নিজের মন ও মননে 'আধ্যাত্মিক' উত্তরণের সম্ভাবনা অনুভব করতে সক্ষম হলেন। বাউলদের এই আত্মোপলব্ধির দর্শনকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে লিখেছেন: "বাউল আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকে বলে মনের মানুষ। বলে, মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।" বৈষ্ণবদের সগুণ প্রেমের বিষয়ে যে দ্বৈত-অদ্বৈত ভেদ, বাউলরা তা অতিক্রম করতে সফল হয়েছিলেন তাঁদের নির্গুণ সাধনায়। তাঁদের

মতে ঐ ভেদ না দূর হলে প্রেমে আধ্যাত্মিকতা আসে না। তাই বাউলরা গেয়েছেন:

"প্রেমে দ্বৈতাদ্বৈত ভেদ ঘুচেছে।"

'মনের মানুষ' সন্ধানের পথ নির্জন সাধনার পথ, সে পথে দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে এগোতে হয়। তাই বাউল গান বাঁধেন:

"দুখে দুখে জ্বলুক রে আগুন।"

তবে ঈশ্বর ঐশ্বর্যময় বিশ্বপতি হলেও প্রকৃত সাধকের আধ্যাত্মিক প্রেমে তিনি ধরা দিতে ব্যাকুল। সেজন্য শাস্ত্রজ্ঞানহীন বাউল বলেন:

"জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমেতে ভিখারি।"

বাউল সাধকরা অবশ্য বৌদ্ধ সহজিয়া ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাথে সহমত পোষণ করেছিলেন মানব-কায়ার উপর গুরুত্ব প্রদানের প্রশ্নে। তাঁরা গেয়েছিলেন:

"আদ্য অন্ত এই মানুষে
বাইরে কোথাও নাই।"

সহজিয়া দর্শনের শরিক বাউলদের গানের মূল কথা হল পূর্বে উল্লেখিত সেই উজান-সাধন। সংসারের তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত পন্ডিত ধার্মিকরা চলেছেন যে পথে, বাউল সাধকরা চলেন তার বিপরীত পথে। নিজের মনের সাথে কথোপকথনের ভঙ্গীতে বাউল গান বাঁধেন:

"নফরের উল্টা নাও বাইও, রে মনুরা।"

অথবা,

"অনুরাগী রসিক যারা
যাচ্ছে তারা উজান বাঁকে।"

বাংলার বাউল সাধকদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল তাঁরা উত্তর ভারতের সন্ত-সাধকদের সঙ্গে নিয়ে সহজিয়া উত্তরাধিকারকে নির্দিষ্টভাবে সমৃদ্ধ করলেন হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয়ের প্রশ্নে একেবারে লোকায়ত স্তরে। সেই ঐতিহাসিক উত্তরণ সাধিত হল নির্গুণ সহজিয়া ঐতিহ্যের সঙ্গে সুফী দর্শনের পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সংমিশ্রণের প্রক্রিয়ায়। বাংলার বাউল ও উত্তর ভারতের সন্ত কবিরা যুগপৎভাবে ধর্মীয় সমন্বয়বাদের গান গাইলেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক মন্দির-মসজিদের গোঁড়ামি ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান গ্রহণ করলেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। শীর্ষস্থানীয় সন্ত সাধক কবীর ছিলেন নিরক্ষর এবং জন্মেছিলেন দরিদ্র জোলা পরিবারে। জোলারা আগে ছিলেন সহজিয়া যোগীনাথ সম্প্রদায়ভুক্ত, পরে সুফী সাধকদের মাধ্যমে লোকায়ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বাউলদের মতই এঁরা ছিলেন নির্গুণ ভক্তিবাদী এবং উভয়েরই কোনো সংশ্রব ছিল না হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিত্তশালী ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর অসহিষ্ণু ধার্মিক পন্ডিতদের সঙ্গে। কবীর গান বেঁধেছিলেন:

"জো খোদায় মসজিদ বসতু হৈ
ঔর মুলুক কেহিকেরা।
তীরথ মূরত রাম নিবাসী
বাহর করে কো হেরা।।'

অর্থাৎ, "খোদা যদি মসজিদেই বাস করেন তবে বাকি জগৎটা কার? তীর্থে মূর্তিতেই যদি রাম থাকেন তবে তার বাইরে বিস্তীর্ণ সমাজকে দেখে কে?" বিশিষ্ট বাউল মদন (যাঁর জন্ম দরিদ্র মুসলমান বংশে) গেয়েছিলেন:

"তোমার পথ ঢাইক্যাছে
মন্দিরে মস্‌জেদে,
তোমার ডাক শুনি সাঁই—
চলতে না পাই,
রুইখ্যা দাঁড়ায়
গুরুতে মোরশেদে।"

সহজিয়া দর্শনের উৎস রূপে 'উজান' সাধন বা 'উল্টা' সাধনের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আগে বলা হয়েছে সন্ত সাধক কবীর সেই প্রসঙ্গই নির্দিষ্টভাবে এনেছেন তাঁর দোঁহায়:

"উলটে পবন চক্রষট্ বেধা মেরুদন্ড সরপুরা।
গগন গরজি মন সুঁনি সমাঁনাঁ বাজে অনহদ তুরা।।"

ঈশ্বরের সান্নিধ্যের জন্য যে দেবালয় বা মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন নেই এবং সেই অস্তিত্ব যে মানুষেরই সৃষ্টি মানুষের মনের মধ্যে, সে তত্ত্বও কবীর তুলে ধরেছিলেন সহজিয়া ঐতিহ্যের প্রতি সহমত পোষণ করে:

"মো কো কঁহা ঢুঁড়ো বন্দে
মৈ তো তেরে পাস মেঁ।
না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ
না কাবে কৈলাস মেঁ।।"

অর্থাৎ "ভগবান বলেন, আমাকে কেন বৃথা বাইরে খুঁজে মরিস? আমি তো তোর পাশেই আছি। আমি না থাকি দেবালয়ে, না থাকি মসজিদে, না থাকি কাবায়, না কৈলাসে আমার স্থান।"

আর সহজিয়া বাউল গান বেঁধেছিলেন:

"আছে তোরই ভিতর অসীম সাগর
তার পাইলি নে মরম।"

বাউলদের 'মনের মানুষ'-এর তত্ত্বের সাথে সুফী দর্শনের নৈকট্যের সন্ধান পাওয়া যায় আলি রাজা প্রণীত 'জ্ঞান সাগর' গ্রন্থে। সুফী দর্শন অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা বা 'আল্-হক্' মানবচৈতন্যে বা 'রুহ্'-এর অস্তিত্বে আগমন করে থাকেন নিজের প্রেমের প্রকাশ এবং আত্মোপলব্ধির প্রয়োজনে। আত্মপ্রকাশের পর 'রুহ্'-এর অস্তিত্ব থেকে 'আল্-হক্' পুনরায় সৃষ্টির উৎসে বিলীন হয়ে যান—এ যেন এক 'অচিন পাখি'র মানুষের মনের পিঞ্জরে সাময়িক অবস্থান এবং তারপরে উড়ে যাওয়া অন্তহীন আকাশে। 'মনের মানুষ'-এর তত্ত্বের সাথে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট 'অচিন পাখি'র চিন্তা বাউল সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ এবং এই প্রসঙ্গটি এসেছে সুফী ফকীরদের আত্মোপলব্ধির গভীর দর্শন থেকে।

বাউল গানে তাই বারংবার ফিরে আসে 'অচিন পাখি'র অনুষঙ্গ:

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়।"

বৈষ্ণব, বাউল ও সন্ত সাধকদের সাথে অন্য দুটি সাধনার ধারা সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছিল মুঘল রাজত্বকালে। প্রথমটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দশনামী শৈব সম্প্রদায়। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে দশনামী সন্ন্যাসীদের ধর্মীয় অবস্থানে সুফী দর্শনের প্রতি সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হয়। শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের ধর্মমতের ভিত্তি ছিল উত্তর মীমাংসার দর্শন। ক্রমশ প্রতিভাত হল যে, ইসলামের সুফী দর্শনের মূল সুর উত্তর মীমাংসার সহমর্মী। দারা শিকোহ্ ও বিভিন্ন সুফী দরবেশ এই সমন্বয়ের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। উপনিষদের 'ব্রহ্মাত্মা' ও 'জীবাত্মা'র তত্ত্বের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া গেল সুফী দর্শনের 'আল্-হক্' এবং 'রুহ্'-এর তাত্ত্বিক অবস্থানের। সাধন পদ্ধতির জগতে সাদৃশ্য আরও নিকটতর। যৌগিক 'প্রাণায়াম', 'আসন' ও 'ধ্যান'-এর সঙ্গে সুফীদের 'হব্স্-ই-দম্', 'ধিকির', এবং 'মুরাকিবা'র কোনো পার্থক্য নেই। 'চিত্ত' এবং 'কুন্ডলিনী-শতচক্রভেদ' যথাক্রমে 'নাফ্স্' ও 'লতিফা'র নিকটবর্তী। সংগঠনের ক্ষেত্রে দশনামী ও মাদারি সুফীদের মিল আরও বিস্ময়কর। দশনামীরা তাঁদের 'মঠ'-এর বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন 'গুরু-শিষ্য' পরম্পরা অনুযায়ী; সুফীদের 'খান্কা'র ভিত্তি ছিল 'পীর-মুরিদি' ঘরানা। দশনামী শাস্ত্রজ্ঞরা ('হংস', 'পরমহংস' ইত্যাদি) 'প্রবচন'-এর মাধ্যমে ধর্মীয় আলোচনা করতেন গ্রামবাসীদের সঙ্গে, সুফী দরবেশরা কীর্তনের মত 'সমা' গানের সূত্রে সমন্বয়বাদ প্রচার করতেন গ্রামাঞ্চলে লোকায়ত পদ্ধতিতে। কট্টর মৌলবাদী মুসলমান নেতারা ফতোয়া জারি করেছিল 'খান্কা'তে 'সমা' গান বন্ধ করার জন্য। প্রায় তুলনীয়ভাবে চৈতন্যদেব ও তাঁর বৈষ্ণব শিষ্যদের কাছে কীর্তনগান বন্ধ করার হুকুম এসেছিল দুই শতাব্দী আগে। চৈতন্যদেব ও তাঁর কীর্তনীয়াদের কণ্ঠ যেমন রোধ করা যায় নি, সেই রকমই জয়ী হয়েছিলেন সুফী সাধকরা। মোল্লাদের ফতোয়া অমান্য করে গরীব মুসলমানরা দলে দলে জমায়েত হতে শুরু করেছিল সুফীদের 'খানকা'গুলিতে। শাহ্জাহানের পুত্র সুজা বাংলা 'সুবা'য় মাদারি সুফীদের সমর্থন করে 'জুলুস' সহকারে মিছিল সংগঠিত করার অনুমতি দিয়েছিলেন ১৬৫১ সালে।

বাংলায় হিন্দুধর্মের আরেকটি যে ধারার অনুগামীরা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যকে স্তিমিত হতে দেননি, তাঁরা ছিলেন লোকায়ত শাক্ত। বৈষ্ণব ও বাউলদের যেমন নিজস্ব গান ছিল, বাংলার শাক্তরাও তেমনি নিজেদের গান লিখেছিলেন। রামপ্রসাদ, রামলোচন ও কমলাকান্তের প্রসিদ্ধি বহুজনবিদিত। এঁদের গানে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সাধনার কথা ছাপিয়ে প্রাধান্য পেয়েছিল বাংলার গ্রামাঞ্চলের সাধারণ পরিবারগুলির সুখ-দুঃখ বেদনার কথা এবং সমন্বয়ী মানবধর্মের লোকায়ত ঐতিহ্য। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে শাক্ত ধর্মের যে প্রভাব তার ভিত্তি একেবারেই মানবীয়। আগমনী ও বিজয়াগানে ঘরে ঘরে গৌরীর জন্য কন্যাবিরহবিধুর পিতামাতারা কেঁদে আকুল। শক্তি সাধনার উপাস্য দেবীকে মা বলে ডেকে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত কত বেদনাই না জানিয়ে গেছেন। মানবীয় সম্বন্ধের উপরে শক্তি সাধনাকে উপস্থাপিত করে তাঁরা পুরহিততন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য

হিন্দুধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতার বাধাকে অতিক্রম করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তারই সাথে রামপ্রসাদের মত সাধকরা সহজিয়া সাধনার মূল আকুতি অর্থাৎ আত্মোপলব্ধির গভীরতার কথাও তাঁদের গানে তুলে ধরেছিলেন কৃষক সমাজের পরিচিত অনুষঙ্গের মাধ্যমে, যেমন :

"মন রে কৃষি কাজ জানো না,
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।"

আমরা সংক্ষেপে প্রাক্-বৃটিশ যুগের বাংলার ধর্মীয় ঐতিহ্যের স্বকীয়তা উপস্থাপিত করলাম। পরবর্তীকালে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের আবর্তে সেই স্বকীয়তা অর্থাৎ সমন্বয়বাদী মানবধর্মের আত্মোপলব্ধির ঐতিহ্য হারিয়ে গিয়েছিল। সেই ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে আমাদের পথ দেখিয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলার তথা ভারতের ধর্মীয় সাধনা সম্বন্ধে মৌলিক দর্শনচিন্তা। সেই দর্শনচিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। মহম্মদ মনসুরউদ্দিনের দুষ্প্রাপ্য বাউল গানের সংকলন 'হারামনি' গ্রন্থের ভূমিকায়, ১৯২৭ সালে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি,—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরাণ-পুরাণে ঝগড়া বাধে নি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে-বিরোধে বর্বরতা। বাঙলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা স্কুল কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।"

নির্গুন সাধনার এই অন্তঃসলিলা লোকায়ত ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ মোটেই প্রান্তিক ধারা বলে অভিহিত করেন নি, বরঞ্চ নির্দিষ্টভাবে মর্যাদা দিয়েছিলেন ভারতের সাধনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে। ক্ষিতিমোহন সেন রচিত 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' গ্রন্থের যে প্রণিধানযোগ্য ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৯৩০ সালে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে আমাদের আলোচনার ইতি টানব : "ভারতের একটি স্বকীয় সাধনা আছে। সেইটি তার অন্তরের জিনিস। সকল প্রকার রাষ্ট্রিক দশা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ধারা শাস্ত্রীয় সম্মতির তটবন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি থাকে তো সে অতি অল্প। বস্তুত এই সাধনা

অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয় এবং সমাজ শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসারিত হয়েছে, বিধি নিষেধের পাথরের বাধা ভেদ করে। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রস্রবণের প্রকাশ, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণীর লোক, তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন তা 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'।''

আধুনিক ভারত বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ

সমাজ-সংস্কার—উনিশ শতকের পিতৃতন্ত্র ও জাতিপ্রথা বিরোধী আন্দোলন

তনিকা সরকার

(১)

আমাদের অবাঙালী বন্ধুরা অনেক সময় বলে থাকেন যে বাঙালী ঐতিহাসিক মাত্রেই উনিশ শতকের ঐতিহাসিক—তাও, বিশেষ করে, সামাজিক-ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের। অর্থাৎ, তাঁদের নিজস্ব গবেষণার বিষয় যাই হোক না কেন, এই একটা ব্যাপারে তাঁদের প্রত্যেকের একটা প্রবল মতামত থাকবেই। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারটা শুধুমাত্র বাঙালী ঐতিহাসিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পুরো বাঙালী আধুনিকতার মূল সূত্র একটু বেশিরকম দৃঢ়ভাবে সমাজ ও সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্যে গেঁথে আছে। তাই, লাখ কথা বলা হলেও এখনো হয় তো এ ব্যাপারে সব কথা বলা হয়ে যায়নি।

সেই ভরসায় আবার সেই বহুল-চর্চিত ইতিহাসে ফিরে যাচ্ছি। কোন নতুন তথ্য সঙ্গে নিয়ে নয়, এমন কি কোন নতুন ব্যাখ্যার আমদানি করতেও নয়। বরঞ্চ, ইতিহাসচর্চায় এখনো যে সব প্রশ্ন খুব সরব নয়, তার কয়েকটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। হয়তো, এই প্রশ্নগুলি ধরে ভাবতে শুরু করলে জানা তথ্যকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজানো যাবে, পরিচিত ব্যাখ্যায় দু-একটি নতুন সংযোজন দরকার হবে। এবং এর থেকেই কিছু বিতর্কের মুখপাত ঘটবে।

উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি। এই আন্দোলনের দুটি প্রধান স্তম্ভ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আবার একটু তলিয়ে ভাবতে চাই—তা হোল জাতিপ্রথা ও পিতৃতন্ত্র। এদের মধ্যে যদি কোন যোগসূত্র থেকে থাকে, তাহলে সেব্যাপারে উনিশ শতকের নেতৃবৃন্দ খুব সোচ্চার বা সচেতন ছিলেন না, আমরাও এ সম্বন্ধে খুব বেশি ভাবিনি। সমাজ-সংস্কারকরা কেউ কেউ জাতিপ্রথার বিরোধ করেছেন, বেশির ভাগই স্ত্রী-জাতির অবস্থান নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। কিন্তু এই দুই ধারা একসঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা হয়নি বল্লেই চলে। অথচ, হিন্দু-সমাজে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক এবং জাতিভেদ-দুই প্রথারই প্রতিষ্ঠা একক ব্রাহ্মণ্যরীতির নির্দেশের ওপর। ব্রাহ্মণ্যরীতি অনুযায়ী স্ত্রী ও শূদ্রের সামাজিক অবস্থানের মধ্যে বহু সাদৃশ্য যেমন আছে, তেমনই একে অন্যের পরিপূরকও বটে। সমাজে ও পরিবারে দুই-ই অধীন, পরনির্ভর,

আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এদের খুব সীমিত। শাস্ত্রের লিখনে নারী ও শূদ্রের সম্বন্ধে অনেক সময়ে একই ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎসমুখ থেকে বরাবর এই দুই ধরনের মানুষকে বহু বিধিনিষেধের বেড়ায় দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, উৎপাদনব্যবস্থা এঁদের হাতে কখনো আসেনি, সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা দু-পক্ষেরই খুব দুর্বল, প্রায়শই অনুপস্থিত। জাতিপ্রথা নির্ধারণে বর্ণসঙ্কর সমস্যা ঘটে নারী ও "নীচ" জাতির সংমিশ্রণে। কলিকাল-কেন্দ্রিক ধারণায় ও সাহিত্যে দেখি অবনতির প্রধান লক্ষণ হল নারী ও শূদ্রের হাতে ক্ষমতার অধিকার। কোন সন্দেহ নেই যে প্রাগাধুনিক হিন্দুসমাজে জাতিপ্রথা ও পিতৃতন্ত্র একসূত্রে গাঁথা, পরস্পরনির্ভর।

অথচ, সমাজের এই সামগ্রিক চেহারা সমাজ-সংস্কারকদের তেমন করে ভাবায়নি। দু-একটি ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই চোখে পড়ে। মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে ব্রাহ্মণের ঘরের নারী ও হিন্দুসমাজের শূদ্র—দুজনকেই ব্রাহ্মণ্য শক্তির শিকার হিসেবে দেখেছেন ও দুই-এরই প্রতিকারের কথা একসঙ্গে ভেবেছেন। সামাজিক স্তরভেদ ও ক্ষমতাবিন্যাস সম্বন্ধে আরো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দেখি বঙ্কিমচন্দ্রের "সাম্য" প্রবন্ধে—যেখানে বঙ্কিম জাতিপ্রথা, শ্রেণীবিভাজন ও লিঙ্গভেদ—তিনে মিলে এক সুসম্বদ্ধ, সুগ্রথিত সামাজিক শাসনব্যবস্থার গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। পরে অবশ্য, বঙ্কিম "সাম্য" থেকে এ ধরনের আলোচনা থেকে নিজেই সরে এসেছিলেন। যদি আমরা গত শতাব্দীর বিভিন্ন কালক্রম ও নানান জায়গা থেকে এই দু-ধরনের আন্দোলন সম্বন্ধে তথ্য নিয়ে একজায়গায় জড়ো করি, তাহলে হয়তো সমাজব্যবস্থার অদৃশ্য যোগসূত্রগুলি স্পষ্টতর হবে এবং সমাজচেতনায় যেসব ধারা বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে তাদের সামগ্রিক চেহারা সম্বন্ধে আমাদের মতামত পূর্ণতর হবে।

(২)

এখানে একটি ব্যাপার একটু পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। অনেকে বলতে পারেন যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন সর্বথা জাতিপ্রথার সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা ধরে টান মারেনি। এবং নারীমুক্তি অথবা পিতৃতন্ত্র-এ সব ভাষাও কখনো ব্যবহৃত হয়নি, বড়জোর বলা হয়েছে আংশিক উন্নতির কথা, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, শিশুবিবাহ রোধ করা—এইধরনের সীমিত অথচ বাস্তব কয়েকটি সমস্যার কথা। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে জাতিপ্রথা বা পিতৃতন্ত্র-এরকম ব্যবস্থাগত তাত্ত্বিক আলোচনা কদাচ হয়েছে, হলেও এ ভাষায় নয়। পিতৃতন্ত্র কথাটাই তো খুব হালের আমদানি। তাহলেও, সীমিত ও বাস্তব কয়েকটি সমস্যার খুব সীমাবদ্ধ সমাধানের আলোচনাও কিন্তু এই দুটি বৃহত্তর সামাজিক প্রথা ও তত্ত্বের মূল ধরে টানাটানি করেছে। যতই তাৎক্ষণিক বা সুনির্দিষ্ট, পরিমিত সংস্কারচিন্তাই হোক না কেন, সমস্তরকম সমাধানভাবনা সমগ্র সমাজপ্রণালীকে, তার তাত্ত্বিক ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিতে বাধ্য কারণ সমাজধারণা খুব ঘনসম্বদ্ধ, ঠাসবুনোনী একটি ব্যবস্থা, সেখানে বারেবারেই বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন ঘটে থাকে। এখন যা আমাদের কাছে খুব সামান্য, ছোটমাপের কার্য্যপ্রণালী মনে হয়, উনিশ শতকে তাই খুঁচিয়ে তোলে আশ্চর্যরকমের শক্তিশালী

বিরোধের ঝড়—তা শিশুকন্যা বা স্ত্রীর সামান্য অক্ষর পরিচয়ের ব্যাপারেও যেরকম, অস্পৃশ্যদের কণামাত্র সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রেও সেরকম সমান উদগ্র। সমাজ সংস্কার আন্দোলন চর্চা শুধুমাত্র সংস্কারকদের কাজ ও কথায় শেষ হয়ে যায়না, তা তলিয়ে বুঝতে গেলে বিরোধীপক্ষের বক্তব্য বা বিরোধের আবেগ ও প্যাশন—এর কারণ ও স্বরূপও খতিয়ে দেখা দরকার। তবেই ধরা পড়বে, যা সংস্কারকরা করতে চেয়েছেন, তখনকার সমাজ তাকে কি চোখে দেখেছে, কিভাবে নিয়েছে। এবং তার স্পষ্ট হয়ে উঠবে তখনকার সমাজে ক্ষমতার আত্মদর্শন, আত্মচিন্তা।

এবারে আমাদের আরো একটা গোড়ার দিকের ব্যাপার স্পষ্ট করে নেওয়া ভাল। আমরা এ পর্যন্ত বারবার সংস্কার আন্দোলন কথাটি ব্যবহার করেছি, কিন্তু আন্দোলনের সঠিক কি ছিল? এবার যদি তার বর্ণনা শুরু করি তাহলে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে যাবে অনেক বিখ্যাত বাদী-প্রতিবাদীর নাম—ব্যক্তির নাম তো বটেই, গোষ্ঠীর নামও—রামমোহন বনাম রাধাকান্ত দেব অথবা আর্য্যসমাজ বনাম সনাতনপন্থী অথবা উদারপন্থী বনাম গোঁড়া, কট্টরপন্থী হিন্দু অথবা পরের দিকের পুনরুত্থানবাদী হিন্দু। অর্থাৎ উনিশ শতক জুড়ে এই যে আন্দোলন, তা প্রধানতঃ এক প্রকাশ্য, নিরবচ্ছিন্ন, সুদূরপ্রসারী এক বিতর্কসভা। এবং আন্দোলনের অথবা এই বাদ-প্রতিবাদের বিষয়বস্তুর বাইরেও এই বিতর্কসভার একটি অভূতপূর্ব, ঐতিহাসিক অভিনবত্ব আছে। কারণ, উনিশ শতকের আগে এইরকম সার্বজনীন ও প্রকাশ্য বিতর্ক (পাবলিক এ্যান্ড জেনারেল ডিবেট) ব্যাপারটাই অকল্পনীয় ছিল। প্রাক-আধুনিক ইতিহাসে আগাগোড়াই সমাজ ও পরিবারের রীতিনীতি ব্যাপারে কে-কে মত জারি করতে পারেন, প্রামাণ্য ও চূড়ান্তভাবে, তার গন্ডী খুব সুস্পষ্টভাবে বেঁধে দেওয়া ছিল। শাস্ত্রকাররা এ ব্যাপারে কিছু উক্তি ও নির্দেশ রেখে গেছেন যা অমোঘ, অলঙঘনীয়, প্রশ্নের অতীত। এর বাইরে আছে লোকাচার ও দেশাচার, যার স্থানে স্থানে চেহারা অনেকরকম হতে পারে, কিন্তু অজস্র বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তা তর্কের অপেক্ষা রাখেনা, তা স্বয়ংসিদ্ধ। শাস্ত্রীয় ও আচারগত নির্দেশের প্রয়োগ নিয়ে যদি মতভেদ ঘটে বা সন্দেহ জন্মায় তবে মান্যগণ্য ব্রাহ্মণ পন্ডিত-অধ্যাপক সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বিধান দেবেন। যদি সামাজিক-পারিবারিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে বিতর্ক ওঠে, যে গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা শাসিত নয়, তাহলে সেখানে বিধান দেবেন ধর্মগুরু। এই বিধান নিয়ে সাধারণের তর্কবিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

আবহমান কাল ধরে এই যে ছকে-দেওয়া নকশা, এর থেকে আমরা উনিশ শতকে চলে আসি সমাজব্যাপী, দেশব্যাপী এক প্রকাশ্য সার্বজনীন তর্কসভায় ("পাবলিক স্ফিয়র")—গুজরাত-মহারাষ্ট্র-পঞ্জাব-মাদ্রাজ-বাংলাদেশ জুড়ে এর ব্যাপ্তি, হিন্দুসমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী এর সঙ্গে জড়িত এবং বাদী-প্রতিবাদীরা উঠে আসছেন সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে—ক্রমশই "নীচুজাতের" বেশ কিছু প্রতিভূ, বেশ কয়েকজন মহিলা, গ্রামগঞ্জ, মফস্বল শহরের মানুষ আর কলকাতা-মাদ্রাজ-বোম্বাই তো আছেই। এঁদের অনেকেই স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ লোক, যদিও আমরা বেশির ভাগ সময়েই কয়েকজন প্রধান চিন্তাবিদ্‌দের কথাই মনে রাখি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এতরকমের মানুষ এই

বিতর্কসভায় যোগ দিচ্ছেন, মত-প্রকাশ করছেন, বিভিন্ন মতামতের ক্রমান্বয় পর্যালোচনা করে তর্কটাকে সারাক্ষণ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এর অর্থ এই নয় যে নতুন সামাজিক-পারিবারিক আইন-প্রণয়নের দায়িত্ব এঁদের সকলের হাতে, অথবা এঁদের বক্তব্য সমানভাবে প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদালাভ করেছে। এঁদের বেশির ভাগ লোকের মতামত অগ্রাহ্য করেই রাজশক্তি আইন বদলাতো, গড়তো। কিন্তু তাতে প্রকাশ্য সভায়, বিতর্কে মতের আদান-প্রদান বন্ধ হতনা। আন্দোলন, যদি মূলতঃ অনেকগুলি বিতর্কের ধারা হয়, তাহলে এই তর্কের চেহারাটা কি ? পরস্পরের মধ্যে মতবিনিময় কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় ঘটত ? যাকে "পাবলিক স্ফিয়র" বলা হয়—অর্থাৎ, একদিকে রাষ্ট্রক্ষমতা ও অন্যদিকে পরিবার ও উৎপাদনকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত লেনদেনের সম্পর্কের মাঝামাঝি অবস্থিত যে আলোচনার ক্ষেত্র এবং যার বিষয়বস্তু হল সাধারণের জীবনের ও অস্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ গঠনবিন্যাস—তা কিভাবে কাজ করত ? এইসব অত্যন্ত সাদামাটা, বাস্তব ব্যাপারগুলো নিয়ে এখনো আমাদের আলোচনা হয়নি বল্লেই চলে, যদিও আমরা নেতৃবৃন্দের জীবনবৃত্তান্ত অথবা তাঁদের বক্তব্য সম্বন্ধে এখন অনেক কিছু জানি। কিন্তু সাধারণ জনতা তাঁদের বক্তব্য সম্বন্ধে কি আলোচনা করতেন, কেমনভাবে করতেন এবং সর্বোপরি, কেনই বা করতেন, এ নিয়ে আলোচনা সেভাবে হয়নি। এই সাধারণ বিতর্ক একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া—যার সঙ্গে কিছু আধুনিক উদ্ভাবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—ছাপাখানার অভ্যুত্থান, ছাপা বইয়ের বাজার, সংবাদপত্র, দেশীয়ভাষায় গদ্যরচনা। এই সব উদ্ভাবন বাদ দিলে সংস্কারমূলক কার্য্যকলাপ একটি বৃহৎ আন্দোলন হয়ে উঠতে পারতনা।

ছাপাখানা ও ছাপা বই এবং দেশীয় ভাষায় গদ্যরচনার প্রসার মতবিনিময়ের কাজটা সহজসাধ্য করে তোলে এবং তা ছড়িয়ে দেয় বিশাল এক পাঠক ও লেখকগোষ্ঠীর মাঝখানে। দেশীয় গদ্য তো সর্বসাধারণের কথ্য ভাষা—দেবভাষা বা রাজভাষার মতো মুষ্টিমেয় অতিশিক্ষিত পণ্ডিতের ভাষা নয়। এ ভাষায় পড়তে, বুঝতে, বা লিখতে বিশেষ কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, এ দৈনন্দিন জীবনের ভাষা, সকলেরই এতে দখল আছে। এর ওপর এলো ছাপা হরফ, যা লিখিত মতকে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ও ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে দিল। ছাপা বই খুব সস্তা, সহজে ব্যবহার করা যায়—হাতে-লেখা পুঁথির মতো বিরল, দুরূহপাঠ্য, অতি-মূল্যবান বস্তু নয়। সুতরাং এর বাজার বহু-প্রসারিত, এর উৎপাদক নানাধরনের সাধারণ মানুষও হতে পারেন। সামান্যতম ক্রয়ক্ষমতা থাকলে এবং সামান্য লেখাপড়ার সুযোগ পেলেই ছাপা বই কিনে পড়া যায়, এমন কি লেখাও যায়। এবং সাধারণের হাতে হাতে এসব বই ফিরতে থাকলে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত লোককে তা অনেক বেশি সহজে পড়ে শোনানো যায়। যেমন খবরের কাগজ। প্রতিদিন তার মূল বক্তব্যগুলি অশিক্ষিত "নিম্ন" জাতি বা শ্রেণীর মানুষ অথবা অক্ষরপরিচয়বিহীন মহিলারাও জানতে পারতেন কথোপকথন থেকে।

এরপর আসে বইয়ের বা সংবাদপত্রের বাজারের কথা। দীনহীনজনে লিখলেও তা পড়বে কে ও কেন ? এখানে আমরা সমাজ-আন্দোলনের ও আইন-পরিবর্তনের মূল

বিষয়গুলির কথা মনে করব। আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলির সংস্কার সাধন। এ ব্যাপারে নারী অথবা "নিম্নবর্গের" মানুষ শুধু জড়িত নন, তাঁদের মতামতের একটা বিশিষ্ট মূল্যও আছে। এবং আমরা দেখেছি মতপ্রকাশ করা তাঁদের অনেকের পক্ষে এখন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ব্যাপার—এর পর তাঁরা কি বলতে চান তা শোনার লোকও থাকবে, বাজারও তৈরি হবে। ১৮৬০ এর দশক থেকে মেয়েদের লেখার একটা জগৎ তৈরী হতে থাকে, পুরুষ পাঠকের অভাব কখনো হয়নি। স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রাসসুন্দরী দেবীর মতো একজন অখ্যাত গৃহবধূর আত্মজীবনীর ভূমিকা লিখে দেন। উদারপন্থীরা অনবরতই মেয়েদের শিক্ষা দিতেন, লিখতে উৎসাহ দিতেন, আশা করতেন মেয়েদের লেখা তাঁদের আন্দোলনের জোরালো হাতিয়ার হয়ে উঠবে। কট্টরপন্থীরা বা পুনরুত্থানবাদীরা স্বভাবতঃই এ ব্যাপারে অপারগ ছিলেন কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁদের পক্ষের বক্তব্যও মেয়েরা প্রকাশ করতেন—যেমন দয়াময়ী দাসী। তাঁর লেখায় স্ত্রী শিক্ষা বা স্বাধীনতার চিন্তার নিন্দা করেছেন। পরের দিকে "নীচুজাতের" সংস্কারচিন্তা—যেমন ফুলের অথবা তাঁর সত্যশোধক সমাজের চিন্তা—নিজস্ব পত্রিকা-পুস্তিকার সাহায্যে অনেক প্রকাশিত হয়। "উচ্চ" বর্ণের লোকেরা তা প্রণিধান করে পড়তেন, তাঁদের লেখায় এ সব মতের খন্ডন অথবা সমর্থন করতেন।

নতুন ধারণা অথবা আইন-আলোচনার প্রসঙ্গে বহু ছোটমাপের প্রকাশক ও শস্তার প্রেস, মফস্বলী খবরের কাগজ অথবা ছোট ছোট ব্যবহারপুস্তিকা, প্রবন্ধ, নাটক বা কাহিনী মুদ্রিত হয় যা সাহিত্যমূল্যে অপাংক্তেয় হতে পারে, কিন্তু যা নীচের মহলের আলোচনার প্রতিফলনও বটে, অংশীদারও বটে। আমরা দেশবিখ্যাত নেতাদের রচনা পাঠ করেছি অথবা সরকারী মহলের কার্য্যকলাপ মন দিয়ে প্রণিধান করেছি। কিন্তু এইসব লৌকিক ও জনপ্রিয় সাহিত্য ও রচনা—যা নতুন ভাবাদর্শ, মূল্যবোধ ও আইন প্রবন্ধনের পরিপূরক ও সহায়ক—তার দিকে ততটা তাকাইনি। বটতলা-পুস্তিকা, মফস্বলী খবরের কাগজ অথবা শতাব্দীর শেষার্ধের পাবলিক থিয়েটার—যেখানে সাধারণ জনতার অবারিত প্রবেশ—সেখানে এ সব বিষয়ে কি ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে তাও গুরুত্বপূর্ণ চর্চার ব্যাপার। অবশ্যই, নীচুমহলের লেখালেখি—এ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিন্নপত্র (ফ্র্যাগমেন্ট) নয়, কারণ এ মহলের সঙ্গে সরকারী ও উঁচুমহলের সংস্কারচিন্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সবটা মিলিয়ে দেখা উচিত।

পাবলিক থিয়েটারে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নাটক অভিনীত হত, যার লেখকবৃন্দ সচেতন ভাবেই নতুন মূল্যবোধের পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে জনশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে নাটক লিখতেন। এ ছাড়াও ছিল সর্বজনপ্রিয় প্রহসন-নাটিকা—যা সমাজের, পরিবারের সবরকম সম্পর্ক নিয়ে তামাশা করত, সমালোচনা করত, সমাধান-পরিকল্পনা করত। কাগজে-পত্রে এদেরও নানারকম সমালোচনা হত, এদের বক্তব্যের কথা নিয়ে তর্কাতর্কি হোত—এইরকম ভাবে নাটক, স্টেজ, খবরের কাগজ, দর্শক, পাঠক মিলিয়ে সমাজচিন্তার একটা প্রশস্ত, বহুধাবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল।

সংবাদপত্রের ব্যবহার তো ক্রমশঃই ছড়িয়ে পড়তে থাকে বড় শহর থেকে মফস্বল

শহরে, গ্রামেগঞ্জে। শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রেলবাহিত ডাকব্যবস্থা অবলম্বন করে এর প্রসার বাড়তে থাকে। বঙ্গবাসী কাগজের মালিক বিক্রী বাড়ানোর জন্যে সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করতেন শনিবার বিকেলে এবং কাগজ সোজা নিয়ে যাওয়া হত শেয়ালদা স্টেশনে—যেখানে অফিসের বাবুরা সপ্তাহান্তে গ্রামের বাড়িতে ফেরেন ট্রেনযোগে। যাবার পথে কাগজ কিনে তাঁরা গ্রামে আসতেন—খবরের কাগজ ফিরত গ্রামের লোকের হাতে-হাতে, মুখে-মুখে। খবরের চাহিদার অনেকটাই কারণ ছিল পারিবারিক আইনের পর্যালোচনা এসব কাগজে বিশদভাবে করা হত। রেভারেণ্ড লং এর শতাব্দীর মধ্যভাগে করা একটি তালিকায় লক্ষ্য করি যে নতুন কাগজ-পত্রের একটা বড় অংশ গজিয়ে উঠছে সংস্কারধারণা কেন্দ্র করে—সতী অথবা বিধবাবিবাহ প্রথা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে। অমৃতবাজার পত্রিকা জন্ম নেয় সাপ্তাহিকী হিসেবে, কিন্তু তার সহবাস সম্মতি আইনের সমালোচনার গুরুত্ব এত বেশি ছিল যে তা দৈনিক পত্রিকা হয়ে দাঁড়াল নব্বই দশকের গোড়ায়। সরকার এক নতুন দপ্তর তৈরী করলেন সাতের দশকে—যার কাজই ছিল প্রতি সপ্তাহে দিশী খবরকাগজের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। সহবাস-সম্মতি আইন সংক্রান্ত বাদানুবাদ ছিল নয়ের দশকের প্রথম কটি বছরের প্রধান বিষয়বস্তু। শেষের কয়েকটি দশকে "নিম্ন" জাতির কিছু সমিতি তাঁদের নিজস্ব পত্রপত্রিকা বার করে জনশিক্ষার প্রয়াস করেছেন। দিশী গদ্যের বিকাশ তাঁদের প্রধান সহায়। জন ও ক্যারেন লেনার্ডের মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর অন্ধ্র-এলাকার ইতিহাসে দেখি এ অঞ্চলে তেলেগুভাষী পত্রিকার সম্প্রসারণ ছিল উদারপন্থী সংস্কারকদের প্রধান হাতিয়ার। তুলনায়, তামিলভাষী অঞ্চলে ইংরিজি খবরের কাগজ অনেক বেশি জোরদার ছিল, কিন্তু—হয়তো সেই কারণেই সংস্কার আন্দোলন এখানে ততটা দানা বাঁধতে পারেনি, যতটা পেরেছিল তেলেগুভাষী অঞ্চলে। বাদানুবাদ সবটাই খবরের কাগজের মাধ্যমে হতনা। অনেক সময় বিশিষ্ট পণ্ডিতসমাজ অথবা সভাসমিতির মৌখিক আলোচনা খবরের কাগজে প্রকাশিত হত। সেই তথ্যের ওপর নির্ভর করে আবার অন্যস্তরে শুরু হত মৌখিক সমালোচনা। সহবাস-সম্মতি আইন নিয়ে দেখি শোভাবাজার রাজবাড়ির এক শ্রাদ্ধবাসরে দুইদলের মধ্যে প্রবল বাদানুবাদের ঝড় ওঠে। এই খবর সব সংবাদপত্রে বিশদ ভাবে ছাপা হয়, টিকাটিপ্পনী সমেত। তার থেকে শুরু হয় আর এক পর্যায়ের সভাসমিতি, তর্কবিতর্ক যা পুনঃপ্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ছাপার হরফ ও মুখের কথার এই একটা ক্রমান্বয়, ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক—এ নিয়ে মুসলমান সমাজের সংস্কারচিন্তার ওপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন রফিউদ্দীন আহমদ ও বারবারা মেটকাফ।

সংবাদপত্র নিজেই এক নিরবচ্ছিন্ন, প্রবর্ধমান বিতর্কসভা—যা বহুরকমের তথ্য ও অভিমত সমানে পেশ করে তাদের পরস্পরের সঙ্গে লড়িয়ে দেয়, নতুন সংযোজন নিত্য আমদানী করে তর্কটা অনবরত এগিয়ে নিয়ে চলে। অথচ, সচরাচর সংবাদপত্রগুলিকে আমরা শুধু তথ্যের সূত্র হিসাবে দেখি, সমাজের ইতিহাসে সক্রিয় নায়ক হিসেবে ধরিনা। সাংবাদিক ও সম্পাদকের সামাজিক অবস্থান, কর্মপ্রণালী, বাজারনির্মাণের কায়দাকানুন খুঁটিয়ে দেখার জিনিষ, কারণ এগুলোই ছিল সংস্কার-আন্দোলনের মস্তবড় মাধ্যম।

(৩)

আন্দোলনে "উঁচু" জাতির স্ত্রী-পুরুষ ও "নীচু" জাতের সংস্কারকদের ভূমিকা তুলনামূলক ভাবে দেখতে গেলে কিরকম দাঁড়ায়? পারিবারিক রীতিনীতি-বিষয়ক আন্দোলনের নেতৃত্ব সারা শতাব্দী জুড়ে নিঃসন্দেহে উচ্চবর্ণের পুরুষ নেতার হাত ছিল। অবশ্য যতটা এঁদের উচ্চবংশীয়, অতিশিক্ষিত "এলিট" হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, ততটা সকলে ছিলেন না। পূর্ববঙ্গের গ্রামের সাধারণ অবস্থার ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল, আর্য্যসমাজের ধারক-বাহক ছিলেন উত্তরভারতের ছোট ব্যবসায়ীবৃন্দ, ইংরেজি শিক্ষায় যাঁরা মোটেই পারদর্শী ছিলেন না। গুজরাটে প্রতাপশালী বল্লভপন্থী সম্প্রদায়ের গুরুদের কঠিন সমালোচনা করে বিখ্যাত হন অত্যন্ত রক্ষণশীল বেনে পরিবারের সন্তান কেরসোনদাস মূলজী।

উচ্চবর্ণের নেতারা স্ত্রীমুক্তি সম্বন্ধে যতটা মনোযোগ সহকারে চিন্তা করেছেন, জাতিপ্রথা নিয়ে তার কাছাকাছিও পৌছতে পারেননি। অর্থাৎ নিজস্ব লিঙ্গ ভিত্তিক স্বার্থ সম্বন্ধে তাঁরা যতটা আত্মসমালোচনা করেছেন, জাতিভিত্তিক স্বার্থের ব্যাপারে এতটা এগোতে পারেননি। সুমিত সরকার এর কারণ খুঁজেছেন তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে। অবশ্য, রামমোহন রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, আর্য্যসমাজ, প্রার্থনা-সমাজ অনেক সময়েই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দাপট, কাপট্য অথবা অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে কিছু কিছু কঠোর মন্তব্য নিশ্চয়ই করেছেন, যদিও সংগঠিত আন্দোলন চালাননি। প্রতিবাদমূলক কার্য্যকলাপ তেমন উল্লেখযোগ্য ছিলনা।

এখানে তাঁদের একধরনের অভিযান ও তার তাৎপর্য্য আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তা হল, অনেক উদারপন্থী সংস্কারকরা সময়ে সময়ে নিজেদের উচ্চবর্ণের ভিত্তি বা চিহ্নের ওপর আঘাত করেছেন—প্রকাশ্যে বা গূঢ়ভাবে। নিজেদের মধ্যে বর্ণোত্তম জাতির বিধি নিষেধ ভেঙে জাত খোয়ানোর নিশানা ওড়ানো—এসব আমরা বারবার নানা জায়গায় দেখতে পাই। রামমোহনের মুসলমানী আদবকায়দায়, ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রকাশ্য বিদ্রোহে, পরমহংস মন্ডলী বা মানব-ধর্ম মন্ডলীর গুপ্ত প্রতিবাদে জাতপাতের বিচার সচেতন ভাবে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে দেখি উচ্চবর্ণের মর্যাদা ও গৌরবে তাচ্ছিল্য জ্ঞাপন করা তাকে একধরনের অস্বীকার করা, জাতিস্বার্থ নস্যাৎ করে দেওয়া। এ ছিল একধরনের ব্রাহ্মণত্ব-বিসর্জন অথবা একে "ডি-ব্রাহ্মণাইজেশন" বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সমাজের শীর্ষভাগে বসে তাকে ওপর থেকে আঘাত করা।

মেয়েদের ক্ষেত্রে কি আমরা নারী-সংস্কারক হিসেবে একটি গোষ্ঠীকে আলাদা করে বার করে আনতে পারি—তা যতই সঙ্কীর্ণ হোক না কেন? সেরকম কিছু থেকে থাকলে সমশ্রেণীর পুরুষ-সংস্কারকের সঙ্গে তার সম্পর্ক বা পার্থক্য কিরকম ছিল?

এখানে দু-একটি নাম সহজেই মনে আসে—যেমন পন্ডিতা রমাবাঈ, যাঁর জীবন সম্বন্ধে উমা চক্রবর্তীর নতুন কাজ উল্লেখযোগ্য। আমার মনে হয় যে সংস্কারক শব্দটির সংজ্ঞা যদি আমরা আর খানিকটা বাড়িয়ে নিই, তাহলে বিরল ব্যক্তিবিশেষের বাইরেও

একটি গোষ্ঠীর অবতারণা করা যায়। এঁদের মধ্যে থাকবেন প্রধানতঃ লেখিকাবৃন্দ যা সম্পূর্ণই একটি আধুনিক, অভিনব, অভাবনীয় নতুন গোষ্ঠী। তাঁরা অবরোধের মধ্যে থেকেও ছাপা হরফের মাধ্যমে বহির্জগতে একটি স্থান অধিকার করে নিয়েছেন এবং মেয়েদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন আত্মবোধের সঙ্গে লিখে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। যেমন বাংলাদেশে কৈলাসবাসিনী দেবী ও পশ্চিম ভারতে তারাবাঈ শিন্ডে। আবার কোন ক্ষেত্রে বিদ্রোহী ও প্রতিবাদী মহিলাজীবনই সংস্কার আন্দোলনের অঙ্গ যেমন, রুকমাবাঈ-রমাবাঈ।

এঁদের প্রায় সকলেই উচ্চজাতির, স্বচ্ছল শিক্ষিত ঘরের কন্যা বা বধূ। কিছু ব্যতিক্রমও দেখি। তারাবাঈ নেহাতই মধ্যমবর্গের জাতিপ্রসূতা। রুকমাবাঈয়ের—যিনি সাতের দশকে তুমুল আন্দোলনের কারণ হয়েছিলেন অশিক্ষিত রোগগ্রস্ত স্বামীর স্বামীত্ব অস্বীকার করে—জাতি ছিল নিম্নস্তরের। প্রত্যেকে যে আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের সমর্থন পেয়েছেন তা নয়। রাসসুন্দরী দেবী অত্যন্ত গোঁড়া পরিবারের বধূ হয়েও সম্পূর্ণ গোপনে, একান্তই নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে স্ত্রীশিক্ষা ও আধুনিক কালকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। কৈলাসবাসিনী দিনান্তে, সংসারের সমস্ত দায়িত্ব চুকিয়ে দিয়ে অতি সঙ্গোপনে ঘরে দ্বাররুদ্ধ করে স্বামীর কাছে লেখাপড়া শিখতেন। লক্ষ্যণীয় যে, অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের শিক্ষিতা মহিলা, যাঁরা বাইরের কর্মজগতে প্রবেশের অধিকার পেয়েছেন—যেমন ডাক্তারনী, মহিলা গ্র্যাজুয়েট ইত্যাদি—তাঁরা কিন্তু মেয়েদের সমাজ, জীবন, সমস্যা, অভিজ্ঞতা, এ সব সম্বন্ধে সরাসরি মতজ্ঞাপন করেননি। সেসব নিয়ে লিখেছেন অভ্যন্তরবাসিনী গৃহবধূরা—হয়তো তাঁদের নবলব্ধ সত্তাবোধকে আর কোনভাবে অভিব্যক্ত করতে পারতেন না বলেই।

নিজেদের পরিবার, বংশ, জাতি বা শ্রেণীর সঙ্গে কিন্তু এইসব নারীদের সম্পূর্ণ একাত্মতা সম্ভব ছিলনা। এর কারণ নারী ও তাঁর বৃহত্তর সমাজের মধ্যে একধরনের আলগা বা তেরছা এক সম্পর্ক থাকে। সামাজিক বিধিনিষেধ তাঁদের পরিবারের মধ্যে নিম্নমানের অবস্থান দেগে দিয়েছে—জীবনে অনেক সময় তাঁরা অস্পৃশ্য, অশুচি। সম্পন্ন ও মর্যাদাময় বংশের, জাতের, শ্রেণীর বা পরিবারের সদস্য হয়েও তাঁরা আত্মনিয়ন্ত্রণহীন, পরনির্ভর, সম্পত্তিবিহীন। এবং এক অর্থে গৃহহারা উদ্বাস্তুও বটে কারণ চিরকালই তাঁরা এক ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলে যান, ফলে কোন ঘরেই শিকড় সম্পূর্ণ দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়না, সত্তা দ্বিখণ্ডিত হয়ে থাকে। বীণা আগরওয়াল দেখিয়েছেন যে কোন পরিবারেই সম্পত্তিতে তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, অতএব ধরে নেওয়া যায় যে অধিকারবোধও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। কোন ঘরই তাঁদের সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। তাঁদের ব্যবহার অতি পরাধীন, দীন মানুষের মতো নম্র, অধীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক ক্ষেত্রে, সামাজিক বিধি অনুযায়ী তাঁদের এতটাই আত্মত্যাগী হতে হয় যে খুব বড়োঘরের বউ হয়তো দুবেলা ভালভাবে খেতে নাও পেতে পারেন, উপবাসের অভিজ্ঞতা তাঁদের ভালভাবেই জানা। এবং হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সংসারের কাজ পালন করলেও তার ফলভোগ করা তাঁদের নিজেদের হাতে নেই। পরিবারের মধ্যে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গের শূদ্রজাতির প্রতিভূ। নিজেদের সামাজিক পশ্চাদপটের সঙ্গে তাঁরা পুরোপুরি খাপ খাননা, সম্পর্কটা বরাবর অসম্পূর্ণ, ভঙ্গুর হয়ে থাকে।

তাঁদের চিন্তাতেও একই ধরনের মিল-গরমিলের খেলা দেখি। উদারপন্থী পুরুষ সংস্কারক স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে যুক্তি সাজাতে গিয়ে বল্লেন শিক্ষিতা নারী আদর্শ গৃহিণী, সফলতর জননী, পরিবারের আদর্শস্বরূপ। মহিলা লেখিকারা কিন্তু একই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে অন্য যুক্তির অবতারণা করেন—তাঁরা বলেন মেয়েদের চিন্তার স্বাধীনতার কথা, পুরুষদের উপর বুদ্ধিগত নির্ভরতা থেকে মুক্ত হবার কথা। যেখানে পুরুষ-সংস্কারক বিধবাবিবাহের কথা বলেন, সেখানে লেখিকারা বেশি করে বলেন বৈধব্যের আচারগত নিষ্ঠুর পীড়নের কথা অথবা বিধবার আর্থিক অসহায়তার কথা। লক্ষ্যণীয় যে পুরুষের চিন্তায় নারী যখন এক স্বামীর আশ্রয় হারান তখন তাঁকে অন্য স্বামীর আশ্রয় খুঁজে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু মেয়েরা চিন্তা করেন কিভাবে পুরুষের অপেক্ষায় না থেকে মেয়েরা স্বনির্ভর হতে পারেন—রমাবাঈ বিধবাশ্রম গঠন করেন এই উদ্দেশ্যে। তাঁরা হিন্দু বিবাহরীতির সমালোচনার মধ্যে খুব বড়ো করে দেখিয়েছেন শিশুস্ত্রীর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা—যখন সে আচমকা নতুন, অপরিচিত, ক্ষমাহীন সংসারে প্রবেশ করে। তাঁর অসমাপ্ত বাল্যকালের বেদনা পুরুষের সংশোধনী চিন্তায় তত ধরা পড়েনা।

(৪)

অন্যদিকে জাতিপ্রথাবিরোধী আন্দোলনের সংস্কারকরা কিন্তু "নিম্ন" জাতি থেকেই উঠে এসেছেন। উচ্চবর্ণের বা বর্গের লোকেদের যে কখনোই কোন সমর্থন বা সাহায্য ছিলনা তা নয়। বিশেষতঃ খ্রীশ্চান মিশনারীরা শিক্ষা এবং জাতিনির্ভর শ্রমের বাইরে অন্য আর্থিক অস্তিত্ব তৈরী করে, জাতিপ্রথাকেন্দ্রিক হিন্দুধর্মের প্রভূত নিন্দাবাদ করে সময়ে সময়ে শূদ্রবর্ণের লোকেদের আত্মনির্ভরতা, আত্মমর্যাদাজ্ঞান ও প্রতিবাদী মনোভাব সঞ্চয়ে অনেক সাহায্য করেছেন। রবার্ট হাউগ্রেভ দেখিয়েছেন তিন্নেভেলী ও ত্রাভাঙ্কোর অঞ্চলে মিশনারীদের সাহায্যে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে বারেবারে অচ্ছুৎ শানার জাতি উচ্চবর্ণের শাসন এড়িয়ে নিজস্ব গ্রাম ও আবাদের পত্তন করেছিলেন। তাঁদের মেয়েরা ব্রাহ্মণ-নির্দেশ অগ্রাহ্য করে রাস্তাঘাটে বক্ষবস্ত্র ব্যবহার করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিলীপ মেনন তাঁর মালাবার অঞ্চলের ইতিহাসে দেখিয়েছেন কেমন করে কম্যিউনিস্ট পার্টি অচ্ছুৎ মানুষদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা এগিয়ে দেন। অনেক জায়গায় সমাজ সংস্কার নতুন সংজ্ঞা পায় যখন "নীচু" জাতের লোকেরা উঁচু জাতির মতন করে কাপড় পরতে, চলতে-ফিরতে, সাজতে শেখেন—যাতে শরীরকে জাতি দিয়ে চিহ্নিত আর না করা যায়। শরীরভিত্তিক এই নতুন ব্যবহার—একেও সংস্কার আন্দোলনের অংশভুক্ত করা দরকার। বর্ণাশ্রমধর্ম মেনে নিয়েও গান্ধীজির হরিজন ত্রাণ প্রচেষ্টার কথা আমরা সবাই জানি যার উৎসে ছিল ভক্তি আন্দোলন। আগে একধরনের উচ্চবর্ণপ্রসূত জাতিপ্রথা সংস্কার আন্দোলন ছিল যা প্রথাবিরোধী নয় কিন্তু সংশোধনধর্মী। প্রদীপ দত্ত দেখিয়েছেন বিশ শতকের গোড়ায় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী, মুসলমানবিরোধী মনোভাব থেকে একধরনের সংস্কার-আন্দোলন উঠে আসছে যা বর্ণপ্রথার আংশিক সম্মার্জনা করে ধর্মান্তর ঠেকাতে চেষ্টা করেছে ও হিন্দু সম্প্রদায়ের জনবৃদ্ধির কথা ভেবেছে।

"নিম্ন" জাতিসম্ভূত বেশ কিছু নেতাও এইধরনের প্রচেষ্টায় যোগদান করেছেন। কিন্তু, বেশির ভাগই "উচ্চ" বর্ণনিয়ন্ত্রিত সংগঠনের বাইরে থেকে স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ আন্দোলন বা

সংগঠন গড়ে তুলতে পেরেছেন। তবে সেরকম প্রচেষ্টাও বহুধাবিস্তৃত। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন বাংলাদেশে নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে একই সঙ্গে গড়ে ওঠে ব্রাহ্মণোচিত সংস্কৃত রীতিনীতির চলন আর উচ্চবর্গের তীব্র বিরোধিতা, নিন্দা, অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রতিবাদ। অন্যরকম এক ধারার কথা নিয়ে চর্চা করেছেন রোজ্যালিন্ড ও হ্যানলন, গ্যেল অমভেট ও এলীনর জেলিয়ট—তা হ'ল ফুলে—আম্বেদকর—পেরিয়ারের প্রতিবাদী, বিদ্রোহী চিন্তার পরম্পরা। সেখানে ক্রমশঃই গড়ে ওঠে ব্রাহ্মণ্যধর্ম নিয়ে শুরু করে পুরো হিন্দুধর্ম ও সমাজের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আত্মনির্ভর আন্দোলন যা সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির চিন্তা করেছে।

ডেভিড ওয়াশব্রুক ও রবার্ট হাউগ্রেভ এই প্রতিবাদী পরম্পরার চরিত্রনির্ণয় করেছেন খানিকটা অন্যভাবে। তাঁদের মতে, এই ধারা মূলতঃ নিম্নবর্গের ভেতর থেকে ফুটে ওঠা এক উচ্চবর্গ নির্মাণ প্রক্রিয়া (কাউন্টার এলিট ফর্মেশন) যা উচ্চবর্গের ও বর্ণের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সমস্ত সুযোগ নিতে পেরেছিল। তাঁরা বলেন যে আধুনিক দলিত আন্দোলন মূলতঃ এই সম্পন্ন স্তরের ব্যাপার, যাতে করে সম্পন্ন দলিতদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়। গ্যেল অমভেট অবশ্য মনে করেন আর্থিক সম্পন্নতার এই ছবিটা অতিমাত্রায় অতিরঞ্জিত। এবং শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এরকম আভ্যন্তরীণ স্তরভেদ দলিতবর্গের মধ্যে হয়ে যদি থাকেও, তাহলেও অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন স্তরের প্রতিবাদে ধরা পড়ে গোটা দলিতসমাজের প্রতিবাদী মানস। ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক অবস্থান বা স্বার্থ ও একটি গণ আন্দোলনের সামগ্রিক রাজনৈতিক চেতনা এক নয়।

নিম্নবর্গের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন সমাজসংস্কারের পথ বেয়ে চলেও তাকে সময়ে সময়ে ছাড়িয়ে গিয়ে সংঘর্ষমূলক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের পথে চলে আসতে পেরেছে। এম্. এস্. এস পান্ডিয়ান এইধরনের সংঘর্ষমূলক মুক্তি- আন্দোলন ধারার বিষয়ে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, এইধরনের প্রতিবাদের মুখোমুখি হওয়ার ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রবাদ নাগরিকত্বের অনেক প্রশস্ত, পূর্ণাঙ্গ ও অর্থপূর্ণ একটি সংজ্ঞা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল, যেরকম চেতনার উন্মেষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যবিত্ত, উচ্চবর্ণাশ্রয়ী নেতৃত্বের মাঝখানে তত পরিস্ফুট হয়নি। আমরা কি নারীকেন্দ্রিক সমাজসংস্কার আন্দোলনের সেরকম কোন বৃহত্তর সামাজিক-ঐতিহাসিক ভূমিকা দেখতে পাই?

(৫)

উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনের নানাধরনের নারীবাদী সমালোচনা হয়েছে। অনেকে দেখিয়েছেন সেযুগের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু যে নারী তিনি শুধুমাত্রই উচ্চবর্গের ও বর্ণের একজন ভদ্রমহিলা, সমস্ত নারী সমাজ নয়। লুসি ক্যারোল দেখিয়েছেন যে নিম্নজাতের বিধবারা পুর্নবিবাহের অধিকার বরাবরই পেয়েছেন, তদুপরি মৃত স্বামীর সম্পত্তিতেও তাঁদের অধিকার অব্যাহত থাকত, এমন কি পুনর্বিবাহের পরেও। বিদ্যাসাগরীয় নতুন বিধবা-বিবাহ আইন সেই অধিকার কেড়ে নেয়। এখানে অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে আর্থিক স্বাচ্ছল্য বাড়লেই নিম্নশ্রেণীর সম্পন্ন স্তর ব্রাহ্মণ্য রীতির অনুকরণ করতেন। তাঁদের মধ্যেও সতীদাহ, পুনর্বিবাহ

নিবারণ ও শিশুবিবাহ ছড়িয়ে পড়ে। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে অন্যদিকে, উচ্চবর্ণের মধ্যে সমাজসংস্কার আন্দোলন ওই ধরনের সংস্কৃতিকরণের পন্থার মোড় খানিকটা ঘুরিয়ে দিতে পেরেছিল। একধরনের বিকল্প ব্রাহ্মণ্যরীতির প্রচলন হ'ল যেখানে বিধবাবিবাহও বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষা অনুমোদিত। তার প্রভাব পড়লো নিম্নজাতি র সংস্কারকদের ওপর।

কোন কোন নারীবাদী সমালোচক বলে থাকেন যে সংস্কার আন্দোলন পিতৃতন্ত্রকে ঢেলে সাজিয়েছে মাত্র কিন্তু নারী-পরাধীনতা মূল নিগড় যথারীতি শক্তিশালী থেকে গেছে। আধুনিক ধনতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক শাসন এই সংস্কার-আন্দোলনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক নতুন পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে যেখানে ঘর ও বাহিরের মধ্যে ফারাকটা স্পষ্টতর, যেখানে নারীর অর্থনৈতিক ভূমিকা অনেক বেশি দুর্বল, যেখানে আধুনিক ভারতীয় ভদ্রমহিলা ভিক্টোরীয় "লেডির" নামান্তর। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হয় যে সমাজ-আন্দোলনের কোনরকম যদি বিদ্রোহী সম্ভাবনা থেকেও থাকে, ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে তার বিকাশ সম্ভব হয়নি। বিধবা-বিবাহ কাগুজে আইন মাত্র, বিদ্যাসাগর শেষজীবনে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। কয়েকদশক এ নিয়ে আন্দোলন চালিয়েও রাজামুষ্ঠি উদারবাদী সভা মাত্র কয়েকটি বিধবার বিবাহ দিতে পেরেছিলেন। অতএব আন্দোলন হয় এক বিষণ্ণ পরাজয়, আর নয় তো তা মূলতঃ পিতৃতন্ত্রী।

এখানে হয়তো পিতৃতন্ত্রের একটা ব্যাপক ও দৃঢ় ধারণা আমাদের ঐতিহাসিক মূল্যায়নের পথে একটু বাধার সৃষ্টি করে। নিঃসন্দেহে, পিতৃতন্ত্র বজায় থেকেছে এবং উনিশ শতকের আন্দোলন সর্বাঙ্গীণ অর্থে পিতৃতন্ত্রবিরোধী ছিলনা, বড়জোর সংশোধনী মনোবৃত্তি এখানে কাজ করেছে। কিন্তু যদি ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ধারা আমরা খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করতে চাই, তাহলে একটা অনড়, অটল ধারণার তৌলে সমস্ত ইতিহাসকে বিচার করলে পরিবর্তনের সূত্র আমাদের হাতে আসবেনা। পিতৃতন্ত্র সমাজে বজায় থাকলেও তার ভেতরে ভেতরে নতুন মূল্যবোধ, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী, প্রশ্ন, সন্দেহ, আশা, আকাঙ্খা জন্ম নিতে থাকে যা সর্বাংশে নারীবাদী না হয়েও পিতৃতন্ত্রের মূল শিকড়ে ফাটল ধরায়, খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত চেতনার সৃষ্টি করে। তা অনেক সময় পুরোনো পরম্পরার প্রাত আনুগত্য সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেনা, সচেতন নারীবাদী মনোভঙ্গীকে ভয় পায়, তা প্রায়ই স্ববিরোধে ভরা, পশ্চাদপসরণ পটু। তবু এই দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপও নূতনের সূচনা করে বৈকি।

সংস্কার-আন্দোলনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম—তা একদিকে ধর্মীয় নীতি ও আচারবিচার বিধিনিষেধ এবং অন্যদিকে আইনসম্মত ব্যবহার রীতির মাঝখানে একটা ঐতিহাসিক ফাটলের সৃষ্টি করে। প্রাক্-আধুনিক যুগে ধর্মীয় রীতি ও সামাজিক আইন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একই মূল্যবোধকে সেবা করত। এখন ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াল। আগে সতীদাহ ছিল সৎ নারীর সততার জ্বলন্ততম উদাহরণ, কিন্তু এখন আইনের চোখে তা হয়ে দাঁড়াল অপরাধ। অন্যদিকে, বিধবাবিবাহ—যা ধর্মীয় নীতি অনুসারে মারাত্মক অপরাধ—তা হ'ল আইনসঙ্গতবিধি। সতীদাহ প্রথা এখনো মাঝেমধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, বিধবাবিবাহও আজ পর্য্যন্ত সমাজে খুব প্রচলিত নয়। আমরা এখানে নতুন সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন যতটা না দেখছি, তার চেয়ে বেশি দেখছি কিছু নতুন জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন, সমালোচনার আবির্ভাব—যা এই

দুই ব্যবস্থার ফাটলের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে পারে। জাতিপ্রথার ব্যাপারেও একই জিনিষ দেখি—কার্য্যতঃ ব্রাহ্মণ রইলো সমাজের শীর্ষদেশে, আর দলিত আজও তার পাদপ্রান্তে। কিন্তু যে অটল, নির্মেঘ বিশ্বাস এই ব্যবস্থাকে এ যাবৎ চালু রেখেছে তার বাহুবল হয়েছে অনেক দুর্বল। অন্যরকমের ধারণা ও বিশ্বাস ধীরে ধীরে বিকল্প ও স্বীকৃতি পেতে শুরু করল—অন্ততঃ চিন্তাভাবনার জগতে, যদিও বাস্তব সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ততটা বা তৎক্ষণাৎ নয়।

ধর্মীয় নীতি ও ঔপনিবেশিক আইন—এ দুই-ই মেয়েদের সংসারের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ করে রেখে দিয়েছে। উদারপন্থী সংস্কারকরাও যতদূর সম্ভব ঘর আর বাহিরের সীমারেখা উল্লঙ্ঘন না করেই পারিবারিক-সাংসারিক সম্পর্কের চেহারা বদলে ফেলতে চেয়েছেন। কিন্তু এই চাওয়ার ফলে তাঁরা বারবার বলতে বাধ্য হয়েছেন যে অসংস্কৃত এই সব সম্পর্ক কত নিষ্ঠুর ও অসম। তাঁদের বর্ণনার ভেতরে যে ছবি ধীরে ধীরে ফুটে উঠল তাতে ঘরকে আর মেয়েদের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় ভাবা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াল—বরঞ্চ ঘরের ভেতরের ত্রাস, বিপদ, হিংসা ও মৃত্যু হয়ে দাঁড়াল আলোচনার মূল উপজীব্য। সতীদাহ, বৈধব্যযন্ত্রণা, অশিক্ষা, শিশুস্ত্রী-ধর্ষণ ও শিশু-স্ত্রী হত্যাকে আর কোনভাবেই একটি সুন্দর, প্রেমময় সংসারের ছবির সঙ্গে মেলানো যায়না। এইধরনের আলোচনার ফলে হিন্দু পিতৃতন্ত্রের সদর্প আত্মচেতনা একটু বিবর্ণ হতে বাধ্য—পুনরুত্থানবাদীরা তাতে যতই উজ্জ্বল রং চড়াবার চেষ্টা করুন না কেন।

সংস্কার-আন্দোলনের ফলে এত রকমের আত্মজিজ্ঞাসার সৃষ্টি হ'ল যে বিধি নিষেধের অমোঘ নৈতিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে কারোর হাতেই রইলনা—না রাষ্ট্রের হাতে, না ধর্মীয় শাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণে; না উদারপন্থীদের পক্ষে, না পুনরুত্থানবাদীদের পক্ষে। সব পক্ষের পারস্পরিক সমালোচনার ফলে সব পক্ষেরই যুক্তি ও মতামতের ভাবাদর্শগত (ইডিয়োলজিক্যাল) ভিত্তি স্পষ্ট হয়ে উঠল। কোন রীতিই আর প্রশ্নাতীত নির্দেশ অথবা প্রশ্নের অতীত সাধারণ জ্ঞান হিসেবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারলনা।

সুমিত সরকারের মতে হিন্দু সমাজচেতনার প্রধান ধর্মীয় ভিত্তি ছিল অধিকার ভেদতত্ত্ব। এই তত্ত্ব সমাজে প্রত্যেক গোষ্ঠীর স্থান পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত ও বিভাজিত করে রেখেছিল। স্তরবিভক্ত সমাজ দাঁড়িয়েছিল এক অটুট ও সুগ্রথিত নীতিবোধের ওপর যাকে বিদেশী সরকারও মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছিল। উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনের দীর্ঘস্থায়ী পরিণামে ধীরে ধীরে এক অতি স্ববিরোধী, ও দ্বিধাগ্রস্ত প্রক্রিয়ার পথ ধরে এই তত্ত্বের অপ্রতিহত প্রতাপ প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে উঠল—পিতৃতন্ত্র ও জাতিপ্রথার ক্ষেত্রে। এই দুই ক্ষেত্রেই অধিকারভেদ তত্ত্বের একটি বিকল্প গড়ে উঠতে শুরু করল—তা হ'ল সামাজিক ন্যায় ও অধিকারের তত্ত্ব, সাম্যদর্শনের তত্ত্ব, গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব হঠাৎ জন্ম নেয়নি, সম্পূর্ণতা পেতে একে বহু ঐতিহাসিক পরিবর্তন পেরিয়ে আসতে হয়েছিল। এখনো হয়তো পুরোপুরি সম্পূর্ণতা পায়নি। এবং তত্ত্বগতভাবে এই বিকল্প আদর্শ ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হলেও, বাস্তব সমাজব্যবস্থার নানান ছায়াপাত তাকে আজও দুর্বল, ভঙ্গুর ও সীমিত করে রেখেছে। এ সব সত্ত্বেও, আমরা আমাদের শতকের ইতিহাসে এক অমোঘ উত্তরণ নিশ্চয়ই খুঁজে পাই এক নতুন রাজনীতির মধ্যে, ভাবাদর্শের মধ্যে, আন্দোলনও অব্যাহত গণ-প্রতিবাদের মধ্যে, যেখানে মানবিক অধিকার বিদ্রোহ জাগায় স্তরবিভক্ত, বৈষম্যভিত্তিক অধিকারভেদ তত্ত্বের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহের মুখপাতে উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন ও তার সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে।

ভারত বহির্ভূত বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ

ভারত-চীন সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও পূর্বোত্তর ভারত[১]

হরপ্রসাদ রায়

আজ একবছর ধরে চীনে সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের চীনে আগমনের ২০০০ বৎসর শ্রদ্ধা এবং উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চীনের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে যে খৃষ্টপূর্ব ২ সালে চীনের রাজকীয় শিক্ষা সংস্থানের এক পণ্ডিত, যাঁর নাম চিঙলু ছিল, কুশান রাজানুগ্রহে বৌদ্ধধর্মের পাঠ গ্রহণে সক্ষম হন। এই ঘটনা একাধিক গ্রন্থ এবং ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যাতে মনে হয় বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে চীনেদের দিক থেকেই আগ্রহ বেশী ছিল। তদনন্তর ন্যূনাধিক হাজার বৎসর কাল চীন পরিপূর্ণভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে ভারতময় হয়েছিল। আনুমানিক ৩য় বা ৪র্থ শতাব্দী থেকে সংস্কৃত এবং কিছু কিছু পালি থেকে বৌদ্ধ ত্রিপিটক এবং বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখার যাবতীয় গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুদিত এবং সংরক্ষিত হতে থাকে। বৌদ্ধশাস্ত্র, ভাষা, সাহিত্য, সংগীত ও চিকিৎসাদি সম্পর্কিত গ্রন্থের অনুবাদকার্যের জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট অনুবাদব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দীর্ঘস্থায়ী এই কর্মযজ্ঞের অনুবাদকারী সংখ্যা সর্বসাকুল্যে লক্ষাধিক ছিল এবং সাত হাজারেরও অধিক ত্রিপিটকাদি গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুদিত হয়ে কোরিয়া, জাপান, আদি সুদূর প্রাচ্যদেশে প্রসারিত হয়। এই সকল গ্রন্থ আজও অধিকৃত রূপে উপলব্ধ। ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ড, লুট ও চুরি এই অক্ষয় ভাণ্ডারের ক্ষতি করতে পারে নি। এই গ্রন্থসম্ভারে ভারতের ইতিহাস. সমাজ, ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনের অনন্ত ভাণ্ডার নিহিত আছে।[২]

কিন্তু এই অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডার কিভাবে কোন পথে ভারত থেকে চীন ও অন্যান্য দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই পথের কিভাবে ও কখন প্রচলন হল? কারা এর পথপ্রবর্তক?

বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আমরা বলতে পারি যে এই পথ বাণিজ্যপথ, প্রাচীনকাল থেকেই নানাবিধ রত্ন, ঔষধ, প্রসাধন সামগ্রী সার্থবাহের দল দেশদেশান্তরে বাণিজ্যার্থে নিয়ে যেতেন। ইজিপ্ট, রোম, সুমের দেশ থেকে আরম্ভ করে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই বাণিজ্য তিনটি পথে পরিচালিত হত; পশ্চিমোত্তর ভারত ও মধ্যএশিয়ার মধ্য দিয়ে চীনের পশ্চিমোত্তর প্রান্তে অবস্থিত প্রাচীন রাজধানী পর্য্যন্ত যে পথ ব্যবহৃত হত, তার অপর দিশায় পূর্বোত্তর ভারত-ব্রহ্মদেশ (অধুনা মেয়ানমার) হয়ে দক্ষিণ চীনের য়ুন্নান ও চ্ছোয়ান প্রদেশ ও অন্যান্য স্থান অবধি প্রসারিত ছিল আর এক পথ। তৃতীয় পথ হল সমুদ্র পথ। এই পথ চীনের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ চীনকে দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর তীরে অবস্থিত দেশগুলির সঙ্গে জুড়ে রেখেছিল।

পূর্বোত্তর ভারতের সঙ্গে তিব্বত ও নেপালের মাধ্যমে আরও দুটি বাণিজ্য পথ আছে; একটি তিব্বতের সিগাৎসে-ফাড়ী-য়াতুং থেকে ভারতের নাথুলা হয়ে বাংলা দেশের রংপুর এবং অন্যটি তিব্বতের জেতাং থেকে অরুণাচলের সুমদোরোংচু-ছোনা হয়ে আসামের হাজো এবং গৌহাটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিব্বত এবং নেপাল থেকে একটি প্রাচীন পথ মুস্তাং এবং ধওলাগিরির পূর্বে এবং অন্নপূর্ণার উত্তরে অবস্থিত নেপালের মুক্তি নাথ অতিক্রম করে গোরখপুরের কাছে এবং অপরটি তিব্বতের সিগাৎসে-কিরুং ও নেপালে কাঠমাণ্ডুর উত্তরে অবস্থিত রসুয়াগঢ়ী ও চৌতারা হয়ে বিহারের রক্সৌল ও চম্পারনে প্রবেশ করত। অতীশ এবং অন্যান্য মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু-পণ্ডিতেরা এই দুটোর মধ্যে একটা পথ অনুসরণ করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

পূর্বোত্তর ভারত ও মেয়ানমার (ব্রহ্ম দেশ) হয়ে যে পথ চীনে প্রবেশ করেছে সেই গভীর অরণ্য পার্বত্যনদী ও গিরিবর্ত্মসঙ্কুল পথের ঐতিহাসিক মহত্ব রয়েছে। এই পথ দক্ষিণ চীনের য়ুন্নান প্রদেশের খুমিং ও তালি (পশ্চিমে স্চ্ছোয়ানের রাজধানী ছংতুর সঙ্গে সংযুক্ত) থেকে উত্তর মেয়ানমারের মিৎকিনা ও অসমের পাতকাই পর্বত অতিক্রম করতঃ পূর্বোত্তর ভারতের লেই পৌঁছায়। আর একটি শাখা মেয়ানমারের দক্ষিণপ্রান্ত বেষ্টন করে মণিপুর রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত মোরে এবং তদনন্তর ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে প্রসারিত পথে মিলিত হয় পূর্বোক্ত পাতকাই হয়ে আসা পথের সঙ্গে। এবং তারপর প্রাগজ্যোতিষপুরে (অধুনা গৌহাটী বা তন্নিকটস্থ দিসপুর) প্রাচীন বাণিজ্য পথে মিলিত হয়। এই পথই কর্ণসুবর্ণ পাটলিপুত্র ইত্যাদি ইতিহাসবিখ্যাত নগর ও রাজ্য অতিক্রম করে মধ্য এশিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল যার বিবরণ বহু বৈদেশিক ও ভারতীয় প্রাচীন বৃত্তান্তে পাওয়া যায়।[৮]

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পার হয়ে এই পথেই প্রাগ্জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত তার পীতবসন পরিহিত কিরাত-চীন যোদ্ধাদের নিয়ে মহাভারতের যুদ্ধে যোগদান করতে কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে কুচ করেছিলেন। এই পথ দিয়েই মহাভারত যুদ্ধের আনুমানিক দ্বিসহস্রাধিক বৎসরকাল পর সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক ত্রিপিটকাচার্য্য শোয়ান ৎচাং (হিউয়েন সাং) কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মার রাজ্যে আতিথ্যগ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। তিনি পাটনা ভাগলপুর ফারাক্কা মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ হয়ে বাংলাদেশের বগুড়ার মহাস্থানগড়ের ভাসুবিহারে অবস্থান করেন এবং তদনন্তর যে পথে কামরূপে প্রবেশ করেন তার ইঙ্গিত করে গেছেন। তিনি বলেছেন, "অত্রত্য অধিবাসী আকারে ক্ষুদ্র, রং কিঞ্চিৎ, গাঢ় পীত বর্ণ, ভাষা মধ্য-ভারতের ভাষা থেকে স্বল্প ভিন্ন, প্রকৃতি উগ্র কিন্তু প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, তারা বিদ্যানুরাগী কিন্তু বৌদ্ধধর্মে অবিশ্বাসী। তারা দেবপূজা করে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপাস্য দেবদেবীদের পূজা করে)। অদ্যাবধি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য একটিও সঙ্ঘারাম (বৌদ্ধবিহার) নির্মিত হয় নি, দু'একজন বৌদ্ধ ধর্মানুযায়ী যারা আছেন, তাঁরা নিভৃতে গোপনে বুদ্ধদেবের আরাধনা করেন। (এই অঞ্চলে) শতাধিক দেবমন্দির আছে, অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও অসংখ্য মন্দির আছে।"[৯]

শোয়ানৎচাং যে দেব ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মন্দিরের কথা বলেছেন তার নিদর্শন এই পথের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তরূপে এখনও বর্তমান। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ প্রান্তে গুয়াহাটীর প্রায় ১৩০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত গোয়ালাপাড়া থেকে প্রায় চৌদ্দ কিলোমিটার পশ্চিমে

মেঘালয়ের গারোপাহাড়ের পশ্চিমে স্থিত শ্রীসূর্য পাহাড়ে বহু সুদৃশ্য প্রস্তরতক্ষিত (রক-কার্ট) ভাস্কর্যমূর্তি দেখা যায়। ঋষভনাথের মূর্তি (বা, আদিনাথ, প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর) তাদের অন্যতম। এই মূর্তির দুই পাশে রয়েছে গোমুখ যক্ষ ও চক্রেশ্বরী যখিনী এবং নীচে এক চক্রের দুই পার্শ্বে দুটি বৃষভ উপবিষ্ট। এতদ্ব্যতীতআরও শতাধিক প্রথম শতাব্দীর দেবদেবীর প্রতিমাও পাওয়া গেছে। সূর্যপাহাড়ের উপর শিব ও নন্দীর মূর্তি, গদাচক্রধারী বনমালা সুশোভিত বিষ্ণু এবং আরও বহু বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবশেষ পাওয়া গেছে যার অধিকাংশই সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর। এই পাহাড়ের প্রায় বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে অবস্থিত যোগীঘোপা। এই নাম যোগীগুম্ফা অর্থাৎ যোগীদের বাসযোগ্য গুহা এই নামেরই পরিবর্তিত রূপ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে উপরোক্ত অঞ্চল অর্থাৎ অধুনা ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, কাকড়াঝাড়, বোঙ্গাইগাঁও ইত্যাদি জনপদ প্রাচীনকাল থেকেই সমৃদ্ধ এবং বহু পরিব্রাজক এবং সার্থবাহ (ক্যারাভ্যান) বণিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ফলতঃ এইসব মন্দির ও দেবদেবীর উদয়, যাতে এই পথযাত্রীদের বিঘ্ন নাশ হয়। পথিকদের জন্য এগুলো বিরামগৃহরূপে ব্যবহৃত হতো। রাজ্যের রাজধানী গুয়াহাটীতে সাম্প্রতিককালে আমবাড়ীতে উৎখননের পর সেখানে যে পুরাতাত্ত্বিক তথ্য ও নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে গুয়াহাটী এবং সংলগ্ন এলাকাগুলির প্রাচীনত্ব ও তৎসঙ্গে এই বাণিজ্য পথের ব্যাপক প্রচলন প্রমাণিত হচ্ছে।

গোয়ালপাড়ার অনুরূপ মেঘালয়ে গুয়াহাটীর ৩০ কিলোমিটার পশ্চিমে গাড়োপাহাড়ে কর্দম ও ইষ্টক নির্মিত দুর্গ উৎখনিত হয়েছে যার ব্যাস পাঁচ কিলোমিটারেরও অধিক। এত বড় দুর্গাবশেষ আজ অবধি পূর্বোত্তর ভারতে কোথাও পাওয়া যায় নি। এখানে যে দর্শনীয় ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে তন্মধ্যে অষ্টকোনী (অক্টাগোনাল) শিবমন্দির, প্রাসাদ ও বিস্তৃত আবাসিক স্থল; একটি বিশাল স্তুপ ও ত্রিশটি ছোট ছোট মন্দির উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধস্তূপ ও হিন্দু মন্দিরের সহাবস্থান থেকে বোঝা যায় অতীতে সেখানে উন্নত সহ-অস্তিত্বশীল নাগর সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল। বৌদ্ধ স্তূপ কখন নির্মিত হয়েছিল সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। খুব সম্ভব শোয়ান ৎচাং এর কামরূপে দীর্ঘ প্রবাসের ফলে আসামে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার সম্ভব হয়েছিল। বৌদ্ধ স্তূপ তারপরের হতে পারে। এখানকার অধিকাংশ পুরা নিদর্শন খ্রীষ্টাব্দের প্রথম কয়েক শতকের মধ্যেই নির্মিত।

গৌহাটীর উত্তরে তেজপুর, প্রাচীন হড়পেশ্বরে, প্রভূত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অবশেষ পাওয়া গেছে। তেজপুর থেকে পর্বতীয়া অঞ্চল, উত্তর গুয়াহাটীর আমবাড়ী এবং আরও পূর্বে গোলাঘাট, ডিমাপুর এবং দক্ষিণে মণিপুর ও অন্যান্য প্রান্তে ব্রহ্মপুত্রের (যার স্থানীয় নাম লুইত) উত্তর ও দক্ষিণ পারে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রত্নাবশেষ, যার নির্মাণকাল চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।

এখানে প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ অর্থাৎ গুয়াহাটীর আমবাড়ীতে উপলব্ধ ভগ্নাবশেষ ও অন্যান্য নিদর্শন প্রণিধানযোগ্য। এখানে প্রস্তর মূর্তি, মৃন্ময় পাত্রাদি, প্রস্তর ও ইষ্টক নির্মিত কাঠামো বর্তমান, "কাওলিন" এই বিশেষ প্রকার মৃত্তিকা প্রণীত পাত্রাদি (পটারি) চীনের কথা মনে করিয়ে দেয়। যদি এই বিভিন্ন প্রকার মৃৎপাত্র ও চীনামাটির বাসন তৈরীর প্রথা চীন থেকেএসে

থাকে তাহলে চীনের সঙ্গে পূর্বোত্তর ভারতের ব্যাপার বিনিময়ের আর এক সাক্ষর পাওয়া যাচ্ছে। আমবাড়ীর ছোট বাটি, গামলা ও ডিশের উপর মাদুর বুনাই করা বা পদ্মফুল খোদাই করা আছে। এখান থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষের তথা কামরূপের উন্নত সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

অতএব, এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে পথ দিয়ে শোয়ানৎচাং (হিউয়েন সাং) গিয়েছিলেন সেই প্রাচীন পূর্বোত্তর যাত্রাপথে চীনের রেশম (সিল্ক), মৃগনাভি আদি মহার্ঘ দ্রব্য ব্রহ্মদেশ ও পূর্বোত্তর আসাম-অরুণাচলের পাতকাই গিরিপথ অতিক্রম করে ব্রহ্মপুত্র বেয়ে গুয়াহাটী পৌছাতো এবং ব্রহ্মপুত্রের উত্তর কূলবর্তী যোগীঘোপা হয়ে স্থলপথে রাঙামাটি, বগুড়া, কর্ণসুবর্ণ এবং গঙ্গা ও ভাগীরথী নদী হয়ে তাম্রলিপ্তি প্রাপ্ত হতো এবং তাম্রলিপ্তি থেকে পণ্যদ্রব্যগুলি আরকামেডু হয়ে রোম ও অন্যত্র বিদেশে সমুদ্রপথে প্রেরিত হতো। ব্রহ্মপুত্র সমুদ্রতীরবর্তী প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বন্দরের এই আদানপ্রদানে মহত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[৮]

উপরোক্ত পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ ছাড়াও চীনের ঐতিহাসিক গ্রন্থে উপলব্ধ বিবরণ থেকে জানা যায় চীনের বিখ্যাত বংশদন্ড ও তথাকথিত স্‌চ্‌ছোয়ানবস্ত্র ভারত হয়ে খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকে ব্যাক্‌ট্রিয়া পৌছেছিল। অর্থশাস্ত্রের 'চীনপট্ট' তো এখন সর্ববি দিত এই বাণিজ্য পথ (রুট) খৃঃপূর্ব ২য় শতক থেকেই অনবরত ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রথম ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত কাশ্যপ মাতঙ্গ এই পথে চীনে প্রবেশ করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। ২য়-৩য় শতকে ২০ জনেরও অধিক চীনা ভিক্ষুক এই পথে শ্রীগুপ্তের রাজধানীতে এসেছিলেন। এই গুপ্তবংশীয়, রাজা এক মন্দির নির্মাণ করেন; 'চীনামন্দির' অভিহিত এই উপাসনাগৃহের পরিচিতি বোধগয়ায় প্রাপ্ত চীনা শিলালিপিতে পাওয়া যায়। ই-চিং এই পথের স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। ৮৬০ ও ৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক ত্রিপিটকাচার্য্য দক্ষিণ-চীনের যুন্নান (Yunnan) থেকে এই পথেই ভারতে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। চতুর্থ শতকে হুইরুই Hui Rui) নামে এক চীনা ভিক্ষু এই পথে আগমনের সময় ডাকাতদ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন।[৮]

আহোমজাতির আসামে আগমন এখন ইতিহাসখ্যাত। পরিযানশীল এই জাতি দক্ষিণ চীন থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুকাফার নেতৃত্বে স্থায়ীভাবে পূর্ব এবং পূর্বোত্তর আসামে বসবাস এবং রাজ্য বিস্তার আরম্ভ করেন। কিন্তু বিভিন্ন আহোম বুরঞ্জী থেকে জানা যায় যে বহু প্রাচীন কাল থেকেই এই পরিযান (migration) আরম্ভ হয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে আহোম পূর্ববর্তী মাওশান, খুনলুং (খৃঃ ৫৬৮-৬৩৮), থাই-আহোমের এই পূর্বপুরুষরা পাতকাই পর্বতের পাদদেশে অধিকার স্থাপন করেন। সুকাফার পূর্বে সাম-লুং-ফা নামের এক সেনাপতি মণিপুর, কাছাড় ও তৎকালীন উত্তর পূর্ব আসাম অধিকার করেন। আহোম শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে আসাম ও মেয়ানমারের আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্ক বাড়তে থাকে এবং এই পথ সচরাচর ব্যবহৃত হতে থাকে, দীর্ঘ ৬০০ বৎসরকাল আহোম রাজারা মেয়ানমারের মাধ্যমে তাদের পূর্বপুরুষের আদিবাসস্থান দক্ষিণ চীনের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কিন্তু ১৮১৭, ১৮১৯ ও ১৮২১ সন এই তিন মান (বর্মী) আক্রমণের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতিস্বরূপ আসামের দিক থেকে এই পথ অবরুদ্ধ থাকে, কিন্তু চীন ও মেয়ানমারের বাণিজ্য অব্যাহত ছিল, যদিও এই বাণিজ্য বৃটিশদের স্বার্থে পরিচালিত হতে থাকে। তাছাড়াও অসংগঠিত এবং পরোক্ষভাবে

এই পরম্পরীণ বাণিজ্যিক আদান-প্রদান প্রথাগতরূপে চলতে থাকে। সাম্প্রতিক কালে নাগা এবং অন্যান্য বিদ্রোহী গোষ্ঠীরা অহরহ এই পথ ব্যবহার করে চলেছে—মেয়ানমারের সাগায়েং (Sagaing) ডিভিজন ও কাচিন প্রান্ত হয়ে চীনসীমান্ত অতিক্রম করে দক্ষিণ চীনের য়ুন্নান প্রদেশের উত্তর পশ্চিমে থংছুং (Tengchong) ও অন্যত্র অস্ত্র আহরণ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে তারা। তথাকথিত golden triangle (স্বর্ণিম ত্রিভুজ) এর মধ্য দিয়ে যে নিষিদ্ধ ড্রাগের অপরিমিত অসাধু ব্যবসা চলছে সেই ট্রাফিকিং এ এই প্রাচীন পূর্বোত্তর ভারত-চীন-মার্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[৮] চীনের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গে পূর্বোত্তর ভারতের সাদৃশ্য আমাদের যোগাযোগের আভ্যন্তরীন কারণ। এই বিশাল অঞ্চল বর্ষাবহুল ক্ষেত্র হওয়ার ফলস্বরূপ কৃষিপ্রধান অঞ্চল রূপে জ্ঞাত চীনের এই অঞ্চলেই ধান্যচাষের প্রচলন হয় ৫/৬ হাজার বৎসর পূর্বে এবং সেখান থেকে পূর্বোত্তর ভারতের মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য স্থানে বিকীর্ণ হয়। নাগপূজা এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। সর্পদেবী বিষহরির নাম বাংলার ঘরে ঘরে শোনা যায়। এই নাগ চীনের দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে ড্রাগনের রূপ গ্রহণ করে পবিত্র এবং মঙ্গলসূচক কাল্পনিক জীবরূপে প্রতিষ্ঠিত (ঠিক আমাদের গরুড়ের মত)।

এই দুই হিমালয়ীন পরিবেশপুষ্ট বিশাল অঞ্চলের সাদৃশ্যের অগণিত নিদর্শন বর্তমান। আবহাওয়া এবং ভৌগোলিক পরিবেশের বৈচিত্র্য ও অনেক; অত্রত্য জলবায়ু, ও জোয়ারভাটা, মেঘ, অনু বাত, ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, পর্বতশৃঙ্খলা, হিমানী-সম্প্রপাত (avalance), গিরি, নদী, নালা, তুষাব ও তুষারস্রোত, হ্রদ, শীত, গ্রীষ্ম আদি প্রাকৃতিক সাম্য ও বিবিধতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জীবনোপযোগী শস্য ধান, গম, চা, ইক্ষু, বিবিধ প্রকার শাকসব্জী ও ঔষধজাতীয় লতাপাতা ও গাছ-গাছড়া এবং তুলা, পাট আদি প্রয়োজনীয় অন্য উদ্ভিদের এ সব অঞ্চলে প্রাচুর্য্য আছে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উপযোগী গরু, কুকুর, শূকর, ছাগল, হাতী, হরিণ, ঘোড়া, রেশম পোকা অসংখ্য প্রকারের মাছ ও পাখী ও অন্যান্য পশুতে সমৃদ্ধ এই ভূভাগ। হিমালয়ের জীবনদায়ী নদনদী ও অপরিমেয় প্রাকৃতিক সম্পদ, এই দুই দেশের যাবতীয় সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন প্রাচুর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করার পক্ষে পর্য্যাপ্ত।[৯]

এই দুই বিশাল হিমালয়ীন উপত্যকা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে খনিজ পদার্থ অপরিমিত, এখানে বিমানপোত কারখানা, মহাকাশ, পরমাণু, সামুদ্রিক জাহাজ, মেশিন ও যন্ত্রপাতি, লৌহ ও অলৌহ ধাতু, রাসায়নিক পদার্থ, ইলেক্ট্রনিক্স, বিদ্যুৎশক্তি এবং অন্য বহু প্রকার উৎপাদক কারখানা আছে। চীনের এই অঞ্চল ভারতীয় পণ্য বিক্রয়ের বিস্তীর্ণ বাজারও বটে। এই অঞ্চলের জলবিদ্যুৎ শক্তি ন্যূনাধিক ১৯৪০০০ মেগাওয়াট যা নাকি চীনের সমগ্র বিদ্যুৎশক্তির ৫৭ ভাগ। পূর্বভারতের সকল নদীর উৎস চীনের তিব্বতপ্রদেশে। পূর্বোত্তর ভারতের প্রভূত বনজ সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য চীনের এই অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত উদ্যোগ আরম্ভ করা যেতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর দেহলী পার হয়ে একবিংশ শতাব্দী আগতপ্রায়। ইতিহাস একই স্থানে থিতু হয়ে থাকে নি। চীন এক অন্ধকার যুগ অতিক্রম করে এখন মুক্তদ্বার অপেক্ষমান। বিভাজিত ভারতেব অবিকশিত উত্তরপূর্বাঞ্চল বিকাশোন্মুখী। আমরা ভারতের সঙ্গে মেয়ানমারের মধ্য দিয়ে চীনের যোগাযোগের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মেয়ানমার বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে

দক্ষিণ চীন ও উত্তর ও দক্ষিণ মেয়ানমার রেলদ্বারা যুক্ত করেছে। এই রেলপথ চীনা সীমান্তে অবস্থিত মেয়ানমারের মিৎকিনা থেকে ইয়াঙ্গন (রেঙ্গুন) এবং অন্যান্য বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী বন্দর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ চীনের খুনমিং থেকে মেয়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্কক পর্য্যন্ত প্রসারিত ১৩৫০ কিলোমিটার লম্বা রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনাও সাকার হতে চলেছে।[১০] চীন ও মেয়ানমারের পারস্পরিক বাণিজ্য প্রধানত সীমান্তের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়, কিন্তু ভারত-চীন ব্যাপার সুদীর্ঘ সামুদ্রিক পথেই পরিচালিত হয়।

এই ক্ষেত্রেই সেই প্রাচীন রুটের (যাত্রাপথের) ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। য়ুন্নানের রাজধানী খুনমিং থেকে কোয়াংচৌ (ক্যান্টন) প্রায় ২২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। অপরপক্ষে, খুনমিং ও উত্তর মেয়ানমার হয়ে আমাদের পূর্বোত্তরের প্রান্তিক স্থান লিডো (Ledo) পর্য্যন্ত স্থলপথে ২২০ কিলোমিটারের বেশী নয়। লিডো থেকে কলিকাতা পর্য্যন্ত আনুমানিক ১৬০০ কিলোমিটারের কিছু বেশী। এতদনুসারে দক্ষিণপূর্ব চীনের পরিচিত সহর কোয়াংচৌ পর্য্যন্ত দূরত্ব সর্বসাকুল্যে ৬০০০ কিলোমিটারের বেশী নয়। কিন্তু জলপথে এই দূরত্ব ৭৭৫০ কিলোমিটারের বেশী। তাছাড়া, এ পথে কালক্ষয় অনেক বেশী। বিমানযোগে দূরত্ব অনেক কম, কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ।

আমাদের এই পূর্বপরিচিত স্থলপথে আসাম অতিক্রম করে ব্রহ্মপুত্রনদের পথে অথবা রেলপথে বাংলাদেশের পরিচিত ও সমৃদ্ধ আভ্যন্তরীন বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে আন্তর্জাতিক বন্দর চট্টগ্রাম পৌছানো যাবে। ঠিক অনুরূপ পথে পশ্চিম বাংলা, মধ্য ও পশ্চিম ভারত তথা পাকিস্তান ও মধ্যএশিয়ার প্রখ্যাত "রেশম-পথ" অনুসরণ করে বহু এশীয় ও য়ুরোপীয় বন্দর ক্ষুদ্র ও মধ্যম শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের নাগালে এসে যাবে।

পূর্বোত্তর ভারত, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিম চীন তিন দিক থেকেই স্থলভূমি দ্বারা অবরুদ্ধ। এই ক্ষেত্রের আর্থসামাজিক সহযোগিতা বিশ্বের এই বৃহত্তম ভূভাগের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির অন্যতম সুদৃঢ় আধাররূপে প্রতিপন্ন হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এবং তখনই চীনাভাষায় উল্লিখিত "দক্ষিণ-রেশম-পথ", সেই প্রাচীন চী ন-মেয়ানমার-ভারত হাইওয়ের সার্থকতা প্রতিপাদিত হবে।

টীকা

১। পূর্বোত্তর ভারত বলতে বিহারের পূর্বাংশ, পশ্চিম বাংলা, আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল, মণিপুর, মিজোরাম ও নাগাল্যাণ্ড, এই রাজ্যগুলিকে ধরা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে আলোচনাপ্রসঙ্গে বাংলাদেশকেও টেনে আনা হয়েছে।

২। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, Probodh Chandra Bagchi, **"India and China : A Thousand Years of Sino-Indian Cultural Contact,** China Press, Calcutta, 1944, পৃ. ১২৬-১৫৪।

৩। Haraprasad Ray, "The Southern Silk Route from China to India–An Approach from India", **China Report, A Journal of East Asian Studies**, 31. 2, 1995, পৃ. ১৯৮।

৪। Ji Xianlin, **et al**, eds., **Da Tang Xiyu Ji Jiaozhu** (যাং সাম্রাজ্যকালীন শোয়ানৎচাং এর পশ্চিম ভূভাগে পরিব্রাজন, টীকা সম্বলিত), Beijing, 1955, পৃ. ৭৯৪।

৫। হরপ্রসাদ রায়, পূর্বোল্লিখিত (নং ৩). পৃ. ১৯৩.

৬। ঐ, পৃ. ১৯৩—৪।

৭। —ঐ—, পৃ. ১৯৫—৬।

৮। এতৎসম্পর্কে দ্রষ্টব্য, Pradip Srivastava, IPS, ''India and South East Asia : The Drug Connection'', **Asia-Prashant**, 2.1, 1995, পৃ. ১১২-৫।

৯। Tan Chung & Haraprasad Ray, ''Trans-Himalayan Multinational Habitat'', **Indian Horizons**, Special Issuc, India and China, ICCR, 43. 1-2, 1994, পৃ. ২৯৫-৬।

১০। Udai Bhanu singh, ''China-Myanmar Relations'', **Asia-Prashant,** 2, 1. 1995, পৃ. ১০০-০২।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য বিকাশের নির্ণায়ক উপাদানসমূহ ঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক।

সুরজিৎ কুমার ধর

পৃথিবীর যে কোন জাতি বা দেশ যখন উন্নতির চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করে স্বাভাবিকভাবে তখন আমাদের ধরে নিতে হয় যে, ঐ উন্নতি (তা সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক যাই হোক না কেন) কোন একটি যুগের ব৷ কোন নির্দিষ্ট একটি সময়ের প্রয়াস নয়। ঐ প্রয়াস বা পদ্ধতি হল ''Continuing process''।[১] প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনায় এই "Non-stop", "Continuing Process" টি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয়। ইতিহাসে কোন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বা কোন দেশের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা পরিমাপ করি মূলতঃ সেই যুগের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অর্থনীতির নিরিখে। প্রাচীন ভারতবর্ষে মৌর্যযুগ, কুষাণ যুগ বা গুপ্তযুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে বিস্তৃতি ঘটেছিল তার সূত্র নিহিত ছিল 'political supremacy' বা রাজনৈতিক একাধিপত্য এবং সঙ্গে সঙ্গে ''Economic Infrastructure'' এর সাযুজ্য বিধানের ফলে।[২] রাজনৈতিক বিজয় অভিযানের ফলে প্রাপ্ত বিজয়ী অঞ্চলগুলি যে বাণিজ্য বিকাশের কাজে শাসকবর্গ ব্যবহার করতেন তার প্রমাণ প্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্য প্রয়াস বা অর্থনীতির ধারণার মধ্যে পাওয়া সম্ভব।

রাজনৈতিক নির্ণায়ক ঃ আধুনিক কালে পাশ্চাত্যজগতে একটি প্রচলিত ধারণা আছে ''Politics and commerce go hand and glove together''—প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে এই ধারণাটি ধ্রুব সত্য বলে প্রতিপন্ন হবে। বিশেষভাবে মৌর্য্য সম্রাটদের অধীনে বাণিজ্য রাষ্ট্র কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। নিয়মিতভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে তার গতি অব্যাহত রেখেছে তার প্রমাণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত 'অধ্যক্ষ' (পণ্যাধ্যক্ষ, 'আকরাধ্যক্ষে' নাব্যধ্যক্ষ')[৩] ছাড়াও বিশেষিত (specialised) কতকগুলি শব্দের দ্যোতনায় ধরা পড়েছে। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে হয় যে, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে রাষ্ট্রের অবিসংবাদী প্রাধান্যের কথা সবচেয়ে জোরালোভাবে কৌটিলীয় "অর্থশাস্ত্রে" আলোচিত হয়েছে।[৪] এমনকি অর্থশাস্ত্রে রাজা তথা রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কৌটিল্যের মতে যে সাতটি উপাদানে[৫] রাষ্ট্র গঠিত (স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ, বল ও মিত্র), তার মধ্যে অন্যতম হ'ল কোষ বা অর্থভাণ্ডার। জীবনে ও রাষ্ট্রে অর্থই যে প্রধান, তাতে কৌটিল্যের কোন দ্বিধা নেই (**"অর্থৈব প্রধানম্, অর্থমূলং ধর্মকামাবতি"**)। আমবা জানি যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের আগেই কৃষির সাফল্য ও প্রসার দেখা দিয়েছিল, কৃষিজ উদ্বৃত্ত (surplus production) সংগ্রহ করে রাষ্ট্র তার রাজনৈতিক ক্ষমতা বহুগুণে বাড়িয়েছিল। ফলে খৃ. পূ. ৪র্থ শতকে যখন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির উদ্ভব ঘটল, তখন প্রত্যাশিত ভাবে তার চাবিকাঠি নিহিত ছিল কৃষি অর্থনীতিতে (Agro based Economy) এবং কৃষিজ উদ্বৃত্ত আহরণের মধ্যে।[৬] মৌর্য্য শাসকগণ খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে বাণিজ্যবিকাশের জন্য বা আন্তর্জাতিকস্তরের বাণিজ্য সচল রাখতে হলে যোগাযোগ, যানবাহন ব্যবস্থা[৭] রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রনাধীন করতে হবে। এই কারণে তাঁরা নতুন নতুন জনপদ বিস্তার ও নির্মাণ, উন্নয়ন, নিরাপত্তাবিধানের বিষয়টিকে[৮] গুরুত্বসহকারে যেমন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনাধীনে নিয়ে এসেছিলেন, তেমনি জলপথে বাণিজ্য বিষয়েও সচেতনতা অবলম্বন করেছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্যের স্থলে নতুন নতুন জনপদের পত্তনও করেছিলেন। একদিকে রাষ্ট্রীয়স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত থাকে, তার পাশাপাশি শাসকবর্গ ব্যবসায়ীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দিকগুলি যথেষ্ট গুরুত্বসহ বিবেচনা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে "আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামোর" (Bureaucratic Machinery)[৯] উদ্ভব ঘটে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের মধ্যে একারণে **'জনপদ'** তৃতীয় স্থানে রয়েছে। কৌটিল্য 'জনপদে'র গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে **'পুর'** কে আলাদা অর্থে ব্যবহার করতে গিয়ে **'জনপদসমপৎ'** (৬.১) শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, যা ছিল প্রধানতঃ গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষিভিত্তিক। নতুন নতুন জনপদস্থাপনের পশ্চাতে কৌটিল্য যে কারণগুলি দেখিয়েছেন তা হ'ল (১) জনবহুল অঞ্চলের উপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্য বিকল্প হিসেবে নতুন জনপদ গড়ে তোলা; (২) উদ্বৃত ও অপসৃত জনসংখ্যার দ্বারা জনবিরল এলাকাকে বাসযোগ্য করে তোলা (**ভূত পূর্বম্‌ভূতপূর্বংবা**)[১০]। এমনকি দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী ও রামশরণ শর্মা অশোকের ত্রয়োদশ গিরিলিপির ভাষ্য থেকে জানাচ্ছেন যে, পরাজিত কলিঙ্গবাসীদের নতুন জনপদে স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল জনবিরল অঞ্চলকে জনপূর্ণ করার নীতি (অপবূরে)। জনপদ কৌটিল্যের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, কৃষি উৎপাদনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এই জনপদগুলিতে প্রমোদকানন, বিনোদনের স্থান অবাঞ্ছিত, নট, নর্তক, গায়কের ও বাদকের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। কারণ এই উপকরণগুলি কাজে বিঘ্নঘটায় (**কর্মবিঘ্নং কুর্যুঃ**)। তাই কৌটিল্য মনে করেন **"রক্ষেৎ পূ-র্বকৃতান্ রাজা, নবাংশ্চ অভিপ্রবর্ত্তয়েৎ।"** বাণিজ্য[১১] যাতে ঠিকঠাক চলে তার জন্য যে পণ্যাধ্যক্ষ গণ মৌর্য্যআমলে আমলাতন্ত্র এ স্থান করে নিয়েছিলেন তাদের কার্যাবলী ছিল বাজারে আনীত বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য, কোথায় উৎপন্ন, স্থলপথ না জলপথে আনীত, তাদের চাহিদা ও যোগানের চরিত্র এবং দামের ওঠাপড়া বিষয়ে অবহিত থাকা (**"নানাবিধানাং পণ্যানাং, স্থলজলজানাং, স্থলপথ বারিপথোপয়াতানাং, প্রিয়াপ্রিয়তাং অর্ঘান্তরং চাবেক্ষেত"**)[১২]। এমনকি কোনরূপ ক্ষতিকর

প্রতিযোগিতার সম্মুখীন যাতে তাদের না হতে হয়, সে বিষয়েও 'পণ্যাধ্যক্ষ'[13] নজর রাখতেন। অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে[14] ব্যবসায়ীদের রক্ষার পাশাপাশি কৌটিল্য বিধান দিয়েছেন ব্যবসায়ীদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য।

ব্যবসাবাণিজ্য সচল রাখতে সবচেয়ে জরুরী প্রসঙ্গ হ'ল যোগাযোগ ও নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটানো[15], এদিক থেকে মৌর্য্য সম্রাটগণ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। দ্রুতগতিসম্পন্ন যাতায়াত ব্যবস্থার পত্তন হলে ব্যবসাবাণিজ্য যেমন অভূতপূর্বভাবে বিকাশলাভ করে, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের হাতে কর বাবদ অর্থাগম হয়। এখানে কৌটিল্যের মতে মৌর্য্যগণ "পূর্তবিভাগে" কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন, এমন প্রমাণও তৎকালে পাওয়া যাবে। মৌর্য্য রাজসভায় আগত গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিসেব বিবরণ[16] থেকে জানা যায় যে, 'AGRONOMOI' নামক কর্মচারীগণ পথঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ ও পথের ধারে প্রতিদশ স্টেডিয়া অন্তর দূরত্ব নির্দেশিক ও দিক নির্দেশক ফলক বসাতেন।[17] ২৭৫-১৯৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আগত ARATOTHENES লিখেছেন যে. মৌর্য্য রাজধানী পালিমবোথরা (পাটলিপুত্র)[18] থেকে একটি দীর্ঘ রাজপথ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিম এশিয়ার দিকে গিয়েছিল। কর্মচারীগণ এক্ষেত্রে পথঘাটে দস্যু, তস্করদের লুঠপাটের হাত থেকে ব্যবসায়ীদের রক্ষা করতেন। অতি সম্প্রতি ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আফগানিস্তানের লাঘ্যমানে আবিষ্কৃত আরামীয় ভাষায় ও হরফে লিখিত অশোকের দুটি অনুশাসনে রাজপথেব উল্লেখ দেখেছেন।[19] তাঁর মতে 'কারপথি' শব্দটির 'কার' (ইরানীয় শব্দ থেকে উদ্ভূত) যার অর্থ রাজা/প্রভু,' 'পথি' অর্থ 'পথ' অর্থাৎ রাজপথকে বোঝানো হচ্ছে। আর আছে **"পূর্ত্তবর্গ"** বা **"পূর্তভাগ"** নামক কর্মচারীর কথা। কৌটিল্যের রচনায় স্থলপথ, জলপথের কথা উল্লেখিত হলেও, জলপথ এর গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে বেশী মাত্রায়।[20] কারণ জলপথকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ভারতবর্ষকে বৈদেশিক জগতে শীর্ষাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মৌর্য্য আমলের 'নাব্যাধ্যক্ষ'[21] পদটি জলপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কথা মাথায় রেখে গড়ে উঠেছিল। তাঁর হাতদিয়ে রাষ্ট্র বিপুল পরিমাণ সংগৃহীত বাণিজ্য শুল্ক লাভ করত। পোতাশ্রয়গুলিতে ব্যবসায়ীদের আচরণবিধি গড়ে উঠেছিল। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে (১)**"মূঢ়বাতাহতা নাবঃ পিতেবানু গৃহীয়াত"** অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের প্রতি তিনি পিতৃসুলভ আচরণ করবেন[22]। (২) ব্যবসায়ীর দোষে বাণিজ্যে ক্ষতি না হলে সে বিষয়ে ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে উদ্যোগী হবে রাষ্ট্র। সরকারী ব্যবস্থায় বলা হয়েছে

"পুরুষোপকরন হীনায়াম্ সংস্কৃতায়াম্ বা নাবি।
বিপিন্নায়াম্ নাবধ্যক্ষ নষ্টং বিনষ্টং বাম্যাবহেৎ।।"[23]

বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে এ প্রসঙ্গেই ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতি রচনার প্রয়াস। মৌর্য্যগণ গ্রীকদের সাথে বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন।[24] চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য, বিন্দুসার এবং অশোক পশ্চিম দেশের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন। খ্রীষ্ট পূর্ব ৩০৬ অব্দে প্রথম সেলুকস এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে ভারত ও

সিরিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন শুরু হয়।[২৫] পরবর্তীকালে সিরিয়ার শিল্প বিকাশের মূলে কিন্তু ছিল ভারত থেকে বাণিজ্যসূত্রে প্রাপ্ত কাঁচামালের সরবরাহ।[২৬] মেগাস্থিনিসের রচনাতে অসুস্থ ব্যবসায়ী বা পর্যটকদের অভ্যর্থনা, বিনোদন, সুযোগ সুবিধে, এমনকি চিকিৎসার বন্দোবস্তের জন্য বিশেষ বোর্ড গঠিত হয়েছিল।[২৭] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বাণিজ্যের ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে "পর্ণ্যার্ধ্যক্ষ" নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার কাজই ছিল বিদেশীদের দ্বারা আনা পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ে উৎসাহিত করা।

অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে :

"পরভূমিজ ম্ পন্যমঅনুগ্রহেনাহ্বায়েৎ।
নাবিকসার্থবাহেম্যশ্চ পরিহারম্ অরতিক্ষমম্দহ্যাৎ।."[২৮]

মৌর্য্যদের পতনের পর রাজনৈতিক মঞ্চের পাশাপাশি, অর্থনীতি ক্ষেত্রে ছন্দপতন ঘটে।[২৯] মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত ভারত ইতিহাসে বর্বর উপজাতি শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্ত্তীকালে উত্তর ভারতে কুষাণগণ এবং দক্ষিণভারতে সাতবাহনগণ-এর নেতৃত্বে রাজনৈতিক সুস্থিতি (political stability) র পাশাপাশি অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটতে শুরু করে।[৩০] স্থল ও জল বাণিজ্যে ভারতে লাভের মাত্রা বাড়তে শুরু করে। রোমান স্বর্ণমুদ্রার প্রাচুর্য ভারতবর্ষে লক্ষ্য করা যায়। JOURNAL OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY এর একটি নিবন্ধে (1984, page 56) বলা হয়েছে : During the Kushana period the Roman influence on India was at its height, when the whole of the civilised world, except India and China, passed under the sway of the caesars, and the empire of Kanishka marched, or almost marched, with that of Hadrian the ancient isolation of India was infringed upon, and Roman arts and ideas travelled **with the stream of Roman gold** which flowed into the treasuries of the Rajas in payment **for the silks, gems and spices of the orient".**

গুপ্তযুগে স্থল ও জল বাণিজ্যে ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যের প্রমাণ **রঘুবংশম্**-এ বলা হয়েছে।[৩১] ব্যবসায়ীদের পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ, তাদের আকস্মিক মৃত্যুতে ঐ পণ্যসামগ্রী ব্যবসায়ীর আইনগত উত্তরাধিকারীর হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্বগ্রহণ রাষ্ট্রের কর্তব্যতালিকার অন্তর্গত ছিল বলে নারদ স্মৃতিতে বলা হয়েছে।[৩২] মৃত ব্যক্তির পণ্যের কোন দাবীদার না পাওয়া গেলে রাজা দশবছর পর্যন্ত রাখতে পারতেন, প্রয়োজনবোধে ঐ সময়সীমা আরও ১০ বছর বাড়ানো হত।[৩৩] গুপ্তযুগে আন্তর্বাণিজ্য যতটা বিস্তৃত ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ততটা ছিল না, তাব কারণ এই সময় রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে।[৩৪]

অর্থনৈতিক নির্ণায়কসমূহ :

ভারতবর্ষে অন্যান্যযুগের মত প্রাচীন যুগের অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। অর্থনীতির অন্যতম উপাদান হলেও, একমাত্র উপাদান ছিল না কৃষি। কৃষিজ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছিল বলেই পূর্ববর্তীযুগগুলির 'continuity follow up' করে মৌর্য্যযুগে এই উদ্বৃত্তকে

বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল। কৃষি ব্যবস্থাব উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ **"সীতাধ্যক্ষ"** (২.২৪) পদটি / শব্দটির মধ্যে নিহিত। যার অর্থ রাজার নিজস্ব ভূসম্পদের অধ্যক্ষ। তিনি কৃষিবিদ্যা, বৃক্ষায়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী হবেন এবং যথাসময়ে ধান প্রভৃতি খাদ্যশস্য, ক্ষৌম ও কার্পাসেরমত পণ্যশস্য, ফলমূল তরকারী-এসবের বীজ সংগ্রহ করবেন। জমির বিভাজনের প্রমাণ **"স্বভূমৌ"** অর্থাৎ রাজকীয় ভূমিকে (২.২৪.১) বোঝানো হয়েছে। জমিতে বীজ বপন ও চাষ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার কৃষি শ্রমিক নিয়োগের উপদেশ অর্থশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। 'সীতাধ্যক্ষ'-ক্রীতদাস, বেতনভুক জনমজুর ও জরিমানা দিতে অক্ষম ব্যক্তিদের 'সীতা' জমিতে চাষের কাজে নিযুক্ত করবেন (**"দাস কর্মকর দন্ড প্রতিকেতৃ"**)। অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় দুই শ্রেণীর শ্রমিকের উল্লেখ বা শ্রমবিভাজনের কথা সমকালীন /বৌদ্ধ তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়। প্রথম শ্রেণীর কৃষক উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাওয়ার অধিকারী ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমিকগণ দৈহিক শ্রমের মাধ্যমে (**স্ববীর্যোপজীবী**) উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশ / এক পঞ্চমাংশ পাবেন বলে অর্থশাস্ত্রে **'চতুর্থ পঞ্চভাগিক'** শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে।

মৌর্য্যযুগে রাষ্ট্র যেভাবে কৃষি ব্যবস্থার উপর ক্ষত্রিয় হস্তক্ষেপ শুরু করেছিল, গুপ্তযুগেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। কৃষিজীবীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদিতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে গুপ্তযুগে। সেচব্যবস্থার গুরুত্ব কৃষিব্যবস্থায় যে অত্যাবশ্যক একটি শর্ত সে বিষয়ে মেগাস্থিনিসের রচনায় উল্লিখিত 'AGRONOMOI' শব্দটি । কর্মচারী গোষ্ঠীর বর্ণনাতে পাওয়া যাবে, যারা গ্রামীণ এলাকার তত্ত্বাবধান করতেন আর গ্রামীণ অর্থনীতি ছিল মূলতঃ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। গুপ্ত আমলে কৃষি ও সেচব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রমাণ জুনাগড়ে অবস্থিত সুদর্শন হ্রদের আবিষ্কারের মধ্যে নিহিত রয়েছে। ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত জুনাগড় শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, পুষ্যগুপ্ত নামক রাষ্ট্রীয় শাসক এই জলাধার নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঐ একই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, অশোকের আমলে, গুপ্তদের অনেক আগেই এই জলাধারাটিতে কয়েকটি প্রণালী সংযুক্ত হয়। (**প্রনালিভিরলঙ্কৃতম্**)। এই জলাধার কেউ ধ্বংস/বিনষ্ট করার চেষ্টা করলে অর্থদন্ডের বিধান **বৃহস্পতি** দিয়েছেন। তাঁর মতে জলাধার ধ্বংসকারীর বিরুদ্ধে ১০০ পন বা অধিক জরিমানা অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী নির্ধারিত হত।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বনজ সম্পদের গুরুত্ব সেযুগেও (মৌর্য যুগে) অজ্ঞাত কোন ঘটনা ছিল না। এ কারণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে **"অর্থকরী বনজ সম্পদের"** উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে শাসকবর্গ সজাগ ছিলেন। বনজাত সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্বের নিরিখে কৌটিল্য শক্ত কাঠের জন্য (সর্দারু), বাঁশজাত দ্রব্য/(বেনু), লতা (বল্লি), দড়ি তৈরীর লতা (রজ্জুভান্ড), লতাগুল্ম, যা ঔষধের কাজে লাগবে (ঔষধি), বিষাক্ত জীবনদায়ী ওষুধ (বিষ) এবং ফলের কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে কালিদাসের রচনাতে বনজাত দ্রব্যসামগ্রীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। 'রঘুবংশম্'—এ তন্তুজাত দ্রব্য, মুখোশ নির্মাণ (মৃগনাভি), গালা (লাক্ষা) র কথা বলা হয়েছে। বনজাত আমাদের অর্থনৈতিক উপযোগিতার কথা

চিন্তাভাবনা করে রাষ্ট্র **'কূপ্যাধ্যক্ষ'** দের নিযুক্ত করেছিল। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালের **BIHAR STONE PILLAR INSCRIPTION** থেকে 'অগ্রহারিক', 'শ্লৌকিক' এবং 'গৌলমিক' নামক কর্মচারীবর্গের বর্ণনা পাওয়া যায়। **'বনজাত সম্পদের'** পাশাপাশি **পশুসম্পদও** যে গুরুত্ব লাভ করেছিল তার প্রমাণ **'গোঅধ্যক্ষ'** শব্দটির মধ্যে নিহিত। পশুসম্পদ, যেমন গোরু, ভার বহন, চাষাবাদ, এবং যানবাহনের কাজে ব্যবহৃত হ'ত।

জাতীয় বাণিজ্যের পরিকাঠামো বিকাশশীল শিল্প-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। 'অর্থশাস্ত্রে' রাষ্ট্রের শিল্প দেখা শোনার তদারকির জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীর কথা বলা হয়েছে। খনি শিল্প, ধাতবশিল্প রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পুরোপুরি পরিচালিত হত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করলে তা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। খনির দায়িত্বভার ছিল **"আকরাধ্যক্ষের"** হাতে, স্বর্ণখনি দেখার ভার যারা পেতেন তাদের বলা হত **'সুবর্ণাধ্যক্ষ'** বস্ত্র শিল্পে ভারপ্রাপ্তগণ **'সূত্রাধ্যক্ষ,'** সর্বোপরি মদ্য বিলোপের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি **'সুরাধ্যক্ষ'** নামে পরিচিত ছিলেন। মৌর্য্যদের পরবর্তীকালেও কুষাণ, ইন্দো-গ্রীক, অথবা গুপ্তদের নেতৃত্বে বাণিজ্য অর্থনীতিতে নিরাপত্তার কড়াকড়ির দরুণ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বাণিজ্য ভিন্নতর মাত্রা লাভ করেছিল। এর কারণ ছিল মৌর্য্য অর্থ নীতির **"solid infrastructure"**; কুষাণদের আমলে ব্যবসা বাণিজ্যে (আন্তর্জাতিক) স্বর্ণমুদ্রার প্রাচুর্য ভারতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে।

যে কোন যুগের শিল্পবিকাশের ধাবা বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে যে শ্রমজীবী শ্রেণীর মজুরিসমস্যা বা তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকলে কোন শিল্পই ভালভাবে বিকশিত হতে পারে না। শ্রমজীবী / ব্যবসায়ীগণ যাতে তাদের নায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত না হন সেজন্য তারা 'গণ' / 'নিগম' / গিল্ডে নিজেদের নথিভূক্ত করেছিলেন। শ্রমজীবীদের মজুরী নির্ধারণে মূলতঃ দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখা হত। (১) পণ্যের গুণ, এবং তার উপর লাভের সম্ভাবনা ; (২) শ্রমের সময়সীমা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে-র ইংরেজী সংস্করণে বলা হয়েছে : "wages shall be fixed according as the thread spun are thin. coarse, or of middle quality, and in proport ion to a greater or less quality manufactured, and in consideration of the quantity of thread spun, those (who turn out a greater or less quantity manufactured) and in consideration of the quantity of thread spun, those (who turn out a greater **quantity**) shall be presented with oil and dried cakes of fruits."

বাজারের ক্রেতাদের ও বিক্রেতাদের কথা বিবেচনা করে অন্যান্য যুগ, আধুনিক যুগের মত প্রাচীন যুগেও চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। চাহিদার কথা বিবেচনা করে বাণিজ্যপোযোগী পণ্যসামগ্রী বাজারে ছাড়া হত। যে সকল দ্রব্যের বাজারে চাহিদা কম সেরূপ সামগ্রী কোন ব্যবসায়ীব বাণিজ্য সামগ্রী হিসেবে রাখবেন না, একথা চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়। কারণ ঐ সামগ্রী থেকে তার লভ্যাংশের সম্ভাবনা কম বলে। ধরা যাক, যদি কোন দ্রব্যের বাজারে চাহিদা বেশী থাকে, সেক্ষেত্রে

বিক্রেতা পণ্যের দাম তুলনামূলক বিচারে কম রেখে বিক্রয় বাড়াবার যে চেষ্টা করবেন সে কথা বলাই বাহুল্য। এই কারণে অর্থশাস্ত্রে 'পণ্যাধ্যক্ষ' নামক বিশেষ পদের সৃষ্টি হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক নির্ণায়ক : খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের পক্ষে লাভের পাল্লা ভারী থাকার কারণ ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লোহা ও বস্ত্রের বিপুল চাহিদা। বিশেষভাবে এই দুটি সামগ্রীকে কেন্দ্র করে ভারত-রোম বাণিজ্য আলাদা মাত্রা পেয়েছিল। ভারতবর্ষের লোহার উৎকর্ষের প্রমাণ দিল্লীর নিকটে প্রাপ্ত মেহরৌলি শিলালিপির নিদর্শন থেকে প্রমাণ করা সম্ভব। এই সময়ের লোহার ধাতব লেপন (ELECTRO PLATING) কার্যের জন্য অদ্যাবধি ঐ পিলরটিতে কোনরূপ মরিচা পড়ে নি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে নির্মিত এই মেহরৌলি স্তম্ভ লেখটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে PERCY BROWN লিখেছেন : "It is remarkable tribute to the genius and manipulative dexterity of the Indian iron workers" অর্থশাস্ত্রে প্রাপ্ত 'লৌহাধ্যক্ষ' শব্দটির ব্যঞ্জনায় এই শিল্পে ভারতীয়দের উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যাবে। মৌর্যযুগে লোহা ছাড়াও অন্যান্য ধাতবশিল্পে উৎকর্ষের প্রমাণ নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি : "

"লোহাধ্যক্ষতাম্রসীসত: পূর্বেকৃত্ত কারমকূটবৃত্ত কংসতাললৌহ।
কর্মান্তাৎ কারয়েৎ লৌহভাণ্ড ব্যবহারম্ চ।"

অর্থাৎ লোহা, তামা, সীসা, পিতল, কাঁসাও সেযুগে সমাদব লাভ করেছিল। ভারতীয় বাণিজ্যের অপর নির্ণায়কটি ছিল মৌসুমী বায়ুর আবিষ্কার। খ্রীষ্টীয় ৪৭ অব্দে হিপ্পোলাস ভারত মহাসাগরে মৌসুমী বায়ুর গতিপথ আবিষ্কারের ফলে সমুদ্র যাত্রা আরও গতিশীলতা লাভ করে। এই মৌসুমী বায়ুর প্রবাহ জুলাই মাসে শুরু হলে রোমান ব্যবসায়ীগণ সরাসরি অতিদ্রুত ভারতীয় বন্দরে উপনীত হতে পারতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে আলোচ্য তিনটি প্রধান নির্ণায়ক ছাড়াও ভৌগোলিক নির্ণায়কও বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষেব সমৃদ্ধির সূত্রপাত ঘটিয়েছিল।।

সূত্রনির্দেশ

১। অম্লান দত্ত : উন্নয়নের তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ (অশোক কুমার সরকার স্মারক বক্তৃতামালা ২, পৃ. ১২-১৩, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৭, কলিকাতা);

২। ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়: সাম্রাজ্যের বাকী ইতিহাস (সুশোভন চন্দ্র সরকার স্মারক বক্তৃতা, ১৯৯৭, কলিকাতা, প্রস্তাবনা, পৃ. ১)

৩। R.P. KANGLE (ed) : THE KAUTILYAN ARTHASASTRA, Bombay 1969, p 65-66.

৪। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক : কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, প্রথম খণ্ড, ১৯৫০ সাল, কলিকাতা, মুখবন্ধ দেখুন।

৫। তদেব; THE MAURYAN POLITY (ed) : V.R.R. DIKSHITAR SECT. IV.

৬। রণবীর চক্রবর্তী : প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৯৮, পৃ. ৯৭; J.B. KEITH : THE ASIATIC QUARTERLY REVIEW, JULY 1910;

৭। R.C.JAIN (ed) . MCCRINDLE'S ANCIENT INDIA AS DESCRIBED BY MEGASTHENES AND ARRIAN, N.DELHI, 1972, pg. 67-68.

৮। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক : অধ্যক্ষ প্রচার দ্বিতীয় অধিকরণ / প্রথম অধ্যায়, ১৯শ প্রকরণ—জনপদ নিবেশ, পৃ. ৫১

৯। SASTRI age of the nandas and mauryas, P 178 ; ROMILA THAPAR : THE MAURYAS REVISITED

১০। বসাক · পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃ. ৫১

১১। R.P. KANGLE : pg 82.

১২। অর্থশাস্ত্র (২.১৬); H.D. VALENKAR, RAGHUVAMSA, XVII, p 64. BOMBAY 1948.

১৩। R.P KANGLE : p 65-66.

১৪। Ibid, p 65-66.

১৫। Ibid, p 67-68.

১৬। R C. JAIN (ed) : MCCRINDLE'S ANCIENT INDIA AS DESCRIBED BY MEGASTHENES AND ARRIAN, N, DELHI, 1972, p 86

১৭। Ibid, p 86

১৮। BONGARD LEVIN · MAURYAN INDIA p 270.

১৯। R. GHIRSMAN : IRAN, p 268, 272, 282; H.G. RAWLINSON : THE SIXTH ORIENTAL MONARCHY ; A HISTORY OF PARTHIA, LONDON 1873, p 371, 391: B.N.MUKHERJEE (ed) . THE KUSHANA QENEALOGY 7, 30, 230.

২০। C.BAILY · THE LEGACY OF ROME, OXFORD 1962, p 141, 265.

২১। বসাক : অষ্টাবিংশ অধ্যায়, ৪৫ শ প্রকরণ, নাবধ্যক্ষ পৃ. ১৫৬-১৫৯.

২২। KANGLE · P 83.

২৩। Ibid, p 84.

২৪। ARTHASASTRA, BKI, CH 11, 12, 14: R.E.VI, CORPUS, p 58, SMITH : EARLY HISTORY OF INDIA, p 155-156, 433,

২৫। E.J. RAPSON (ed) : THE CAMBRIDGE HISTORY OF INDIA, DELHI, 1968, vol I, p 584 . RHYS DAVIDS : BUDDHIST INDIA, p 298-299 ;

২৬। M.P. CHARLESWORTH : TRADE ROUTES AND COMMERCE OF THE ROMAN EMPIRE, CAMBRIDGE, 1924, p 44; R C. MAJUMDER : AGE OF IMPERIAL UNITY p 618 ff.

২৭। R.C. JAIN . p 87 KANGLE, p 66

২৮। KANGLE p 66.

২৯। B.N. MUKHERJEE : THE RISE AND FALL OF THE KUSHANA EMPIRE. CAL 1988, p 372, 30, 230 THE ECONOMIC FACTORS IN KUSHANA HISTORY, CAL 1970, p 16.

৩০। Ibid ;

৩১। H.D. VALENKAR (ed) : RAGHUVAMSA, Bombay 1948, XvII, p 64.

৩২। J. JOLLY (ed) : NARAD SMRITI, CALCUTTA 1885, III, p 16.

৩৩। Ibid : III, p 17, p 18.

৩৪। S.K. MAITY (ed) . ECONOMIC LIFE IN NORTHERN INDIA, CAL 1970, p 181-182.

৩৫। KANGLE, p 76,

৩৬। Ibid, p 93, 76, 109, পুন্যবিজয় (সম্পাদক) অঙ্গবিক্কা, বারাণসী, ১৯৫৭, পৃ. ৫৫, অধ্যায় নং ৯, পৃ. ১০১-১০৩

(৩৬ ক) Vide Athasastra 1.6; U.N GHOSAL . HINDU LAND REVENUE SYSTEM, CALCUTTA, p 4-10.

৩৭। J.F. FLEET . INSCRIPTIONS OF THE EARLY GUPTA KINGS, LONDON 1888, p 56; A.N. BOSE : STATE, SOCIETY, AND ECONOMY IN ANCIENT INDIA.

৩৮। K.V.R. AIYANGER : BR. SMRITI XXIII, p 5,

Brhaspati mentions that the stealers of grains were compelled to give 10 times as much to theowner and the double of the amount as a fine to the state : BR. SMRITI, Baroda, 1941, XXII, p 23-24.

৩৯। KANGLE, p 67,

৪০। VALENKAR, RAGHUVAMSA III, p 31, 65 ; S.D. GAJENDRAGADKAR AND A.B. GAJENDRAGADKAR (ed) : RTV SAMHARA, Poona, 1916, VI p12 ; J.B. CHAUDHURI (ed) : MEGHDUTA ; CAL 1950, SEC II, p 13, vide P E VII, Rock EDICT XII.

৪১। KANGLE, p 67

৪২। J.F. FLEET : inscriptions of the early gupta kings P 50.

৪৩। KANGLE, p 84-85, BHANDARKAR , ASOKA p 50-51.

৪৪। KANGLE, p 55-56,

৪৫। Ibid, p58.

৪৬। Ibid p 75,

৪৭। Ibid p 78 ;

৪৮। R.FICK : SOCIAL ORGANISATION OF NORTH-EAST INDIA IN BUDDHA'S TIME ; ROMILA THAPAR : ANCIENT INDIA, p 63, 79, প্রাচীন ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা : সুরজিৎ কুমার ধর, ইতিহাস অনুসন্ধান, খন্ড ১০।

৪৯। J.F. FLEET. p ১২৭.

৫০। HISTORY OF SOUTH INDIA : NIL KANTA SASTRI, p 139-142 ; RADHAKUMUD MUKHERJEE : A HISTORY OF INDIAN SHIPPING, SEE CH X, CH III.

৫১। J.F. FLEET : p 139.

৫২। PERCY BROWN : INDIAN ARCHITECTURE, Bombay 1949, p 61.

৫৩। KANGLE : p 57.

৫৪। W.H. SCHOFF (tr.) : THE PER IPLUS OF THE ERYTHREAN SEA, LONDON 1912, SECTION 57,

গ্রীক অধিকৃত বাহ্লীক দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি

সুচন্দ্রা ঘোষ

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে দিওদোতোস নামক এক গ্রীক ক্ষত্রপ সেলুকীয় শাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করে বাহ্লীক দেশে (হিন্দুকুশের উত্তর-পশ্চিমে, হেরাতের পূর্বে ও বক্ষু অথবা Orus এর দক্ষিণে) এক পৃথক গ্রীক রাজ্যের সূচনা করেন যা বাহ্লীক-গ্রীক রাজ্য নামে পরিচিত। এই গ্রীক অধিকৃত বাহ্লীক রাজ্যের অন্তর্গত প্রধান অঞ্চল গুলি হলো, বালখ, তাহসিয়া, প্যারোপনিসাদাই (কাবুল-বেগ্রামঅঞ্চল) ও আইখানুম্ (উত্তর-আফগানিস্তান)। শুধু বাহ্লীক এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলই নয়, কোন কোন গ্রীক রাজা উত্তর-পশ্চিম ভারতও জয় করেছিলেন। বাহ্লীক-গ্রীক রাজগণের ভারত জয়কে আমরা প্রথম ইউথিদিমোস (Euthydemus) এর রাজত্বকালের শেষে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেস ভাগ বা দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে এবং প্রথম ইউক্রেতিদেস (Eucratides) এর রাজত্বকালের সূচনা পর্বের (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৭০) মধ্যে নির্দিষ্ট করতে পারি।[১] খ্রীষ্ট পূর্ব ১৩০ নাগাদ শক বা অয়েতি যাযাবরদের আক্রমণের ফলে, বাহ্লীক অঞ্চলে গ্রীক শাসনের পতন ঘটে। তখন গ্রীকরা কেবলমাত্র হিন্দুকুশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল ও ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল শাসন করতে থাকেন। এই গ্রীক শাসনকর্তারাই ভারতীয় ইতিহাসে ইন্দো-গ্রীক বা ভারতীয়-গ্রীক শাসক রূপে উল্লিখিত। বর্তমান নিবন্ধে আমরা ইন্দো-গ্রীক রাজ্যের নয়, শুধু গ্রীক অধিকৃত বাহ্লীক রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করব।

দিওদোতোস-এর পৃথক গ্রীক রাজ্য তৈরীর অনেক আগে থেকেই বাহ্লীক অঞ্চল একটি সম্ভাবনা-পূর্ণ বাণিজ্য অঞ্চল রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। এই রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানই তাকে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

এই বাহ্লীক-গ্রীক অঞ্চল বেশ কয়েকটি প্রধান বাণিজ্য পথের সংযোগ স্থলে অবস্থিত ছিল। এবং কয়েক শতাব্দী ধরে এই বাণিজ্য পথের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রবাহ গতিশীল থাকায় এই অঞ্চল স্বাভাবিক ভাবেই অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল।

চ্যাংছিয়েন্-এর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে সিন্-কিয়াঙ্ (Sinkiang) এর তাক্লামাকান মরুভূমির উত্তরের একটি পথ দিয়ে চীন দেশ থেকে বক্ষু (Orus) নদী

পর্য্যন্ত চলাচলের সুযোগ ছিল।[৫] খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ এবং তৃতীয় শতকের কিছু গ্রীক উপাদান থেকেও আমরা আরেকটি পথের উল্লেখ পাই যা পশ্চিম-এশিয়া থেকে এরিয়া অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তানের হেরাত অঞ্চল, কাবুল, চারসাদা, তক্ষশীলা হয়ে একেবারে পূর্ব-ভারতের পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৮]

হিন্দুকুশের উত্তর-পশ্চিমে এবং বক্ষু নদীর দক্ষিণে অবস্থিত এই রাজ্যের রাজধানী ব্যাক্ট্রা বা বালখ পশ্চিমদিক থেকে হেরাত ও মার্জিয়ানা বা তুর্কমেনিস্তানের মার্ভ্ অঞ্চল, উত্তরদিক থেকে সগ্‌ডিয়ানা (বক্ষু নদীর উত্তরে) এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে কুভা বা কাবুল, কপিশা বা বর্ত্তমান বেগ্রাম ও লম্পক বা লাম্‌ঘান্ অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

শুধু মাত্র বাণিজ্যেই নয়, কৃষির ক্ষেত্রেও অনেক আগে থেকেই বাহ্লীক রাজ্যের ঋদ্ধি ছিল। প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে জানা যায় যে বক্ষু তীরবর্ত্তী বাহ্লীক দেশে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দেই কৃষি-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে স্ত্র্যাবোর[৭] একটি উক্তি প্রাসঙ্গিক। স্ত্র্যাবো, তাঁর **জিওগ্রাফিকন্** এ বলেছেন, "The Greeks who caused Bactria to revolt grew so powerful on account of the fertility of the country that they became masters, not only of Ariana but also of India as Apollodorus of Artemita says." কাজেই বাহ্লীক রাজ্যের অবস্থান ও ভূমির উর্বরতাই ছিল তার অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তি। এই ভিত্তি শাসক শ্রেণীকে প্রাথমিকভাবে প্রলুব্ধ ও পরে শক্তিশালী করেছিল।

বাহ্লীক অঞ্চলে আবিষ্কৃত ধাতব শিল্পরাজি থেকে বোঝা যায় যে এখানে ভাস্করেরা তাদের শিল্পে প্রচুর পরিমাণে সোনার ব্যবহার করতেন। স্বভাবতই এই সোনা আসত তাদের পৃষ্ঠপোষক বা ক্রেতাদের কাছ থেকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পারস্যের রাজা দারয়বোউশ্ (খ্রীষ্টপূর্ব ৫২১) এর একটি লেখতে দেখা যায় যে সুসার রাজপ্রাসাদ তৈরীর জন্য তিনি বাহ্লীক দেশ থেকে সোনা এনেছিলেন।[৮] আবার বাহ্লীক রাজ্যে সোনা আসত কির্‌ঘিজিযা, উরাল ও আলতাই অঞ্চল থেকে। কাজেই এই দ্রব্যের উৎপাদন স্থল বাহ্লীক না হলেও, বাহ্লীক রাজ্যের মধ্য দিয়েই এর অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য প্রবাহিত হত।

বাহ্লীক রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত তাহ্‌সিয়াও বহির্বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করত। স্যু-মা-ছিয়েন্ এর **শি-চি** থেকে জানা যায় যে তাহ্‌সিয়ার জনগণ যুদ্ধ করতে ভয় পেলেও বাণিজ্যিক ব্যাপারে কৌশলী ছিল।[৯] চ্যাংছিয়েন তাহ্‌সিয়ার বাজারে শু প্রদেশের (দক্ষিণ-চীন) কাপড় বিক্রী হতে দেখেছেন। এই কাপড় আবার তাহ্‌সিয়ার ব্যবসায়ীরা সংগ্রহ করতেন সেন্তু (নিম্নসিন্ধু অঞ্চল) থেকে। কাজেই দেখা যায় যে সুদূর দক্ষিণ চীন থেকে নিম্নসিন্ধু অঞ্চল পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত এলাকা বাণিজ্যের যোগসূত্রে আবদ্ধ ছিল।

বাহ্লীক-গ্রীক রাজারা কাবুল-বেগ্রাম অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করলে স্বাভাবিক ভাবেই সেই অঞ্চলের বাণিজ্যেও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেন। তাহ্‌সিয়ার লোকেদের মত কাবুলের লোকেরাও সামরিকভাবে দুর্বল হলেও ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে সবল ছিল।[১০] তাই কাবুল অঞ্চলের অর্থনীতিও খুবই সুদৃঢ় ছিল।

উত্তর-আফগানিস্তানের আইখানুম্‌ও দূরবর্ত্তী বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত। আইখানুমের

কোষাগার থেকে প্রাপ্ত অলিভ তেলের পাত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুদূর গ্রীস থেকে এই তেল আইখানুমে আমদানি করা হত। অন্যদিকে পর্যাপ্ত হাতির দাঁতের সামগ্রীর ব্যবহার থেকেও প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গেও এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রবহমান ছিল। কেবলমাত্র বাণিজ্যগত সমৃদ্ধিই নয়, আইখানুমের অর্থনৈতিক শক্তির অন্য উৎস ছিল তার কৃষিভূমির বিস্তৃতি।[৮] মূল্যবান পাথর লাপিজলাজুলি বা রাজপট্টের উৎস বাদাখ্শান্ পর্বতাঞ্চলও সম্ভবত বাহ্লীক-গ্রীকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই দ্রব্যের রপ্তানি এই অঞ্চল থেকেই হত। এই অর্থে রাজপট্টের বাণিজ্যের সূচনা বিন্দু ছিল বাদাখ্শান্।

বাণিজ্যিক লেনদেন হত মূলতঃ মুদ্রায়। এটি সুবিদিত যে, এই অঞ্চলে প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেণীর রৌপ্য মুদ্রা তৈরী হয়েছিল। এখানে এথেন্সের তৌলরীতি অনুসরণ করা হত।[৮] (রূপার দ্রাখ্মার ওজন ৬৭.২ গ্রেন ও সোনার স্টেটারের ওজন ১৩৪ গ্রেন)। তাম্রমুদ্রারও প্রচলন ছিল। স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম ছিল। রোপ্যই ছিল ব্যবসার প্রধান বিনিময় মাধ্যম।

এই আলোচনা থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, বাহ্লীক রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রাচুর্যই গ্রীক রাজাদের আকৃষ্ট করেছিল এই অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে। রাজনৈতিক শক্তির উৎস হিসেবে বাণিজ্যের ব্যবহারের যে রীতি বাহ্লীক-গ্রীক রাজগণ প্রচলন করেছিলেন, তা ইন্দো-গ্রীকরা পুরোপুরি অনুসরণ করতে সক্ষম না হলেও পরবর্তী কালের কুষাণ রাজশক্তি তার ব্যবহারের চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

সূত্রনির্দেশ

১। এইচ.সি. রায়চৌধুরী, **পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ্ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া**, কমেন্টারী বাই বি.এন. মুখার্জী, নিউদিল্লী. ১৯৯৬, পৃ ৬৪৬।

২। **শি-চি**, অধ্যায় ১২৩, বি.ওয়াটসন, **রেকর্ডস অফ্ দ্য গ্র্যাণ্ড হিস্টোরিয়ান অফ্ চায়না**, খণ্ড২, নিউইয়র্ক, ১৯৬১, পৃ. ২৬৬ এফ।

৩। প্লিনি, **নাচুরেলিস্ হিস্তোরিয়া**, ৭,২১,৬১-৬৪।

৪। স্ত্র্যাবো. **জিওগ্রাফিকন্**. ১৫,১,৭৭।

৫। আইরিন.এম.ফ্র্যাঙ্ক ও ডেভিড.এম.ব্রাউনস্টোন, **দ্য সিল্ক রোড: এ হিস্ট্রি**, নিউইয়র্ক ও অক্সফোর্ড, ১৯৮৬, পৃ. ৬৫-৬৬।

৬। বি.ওয়াটসন্. **অপ্সিট্**, ২৬৯।

৭। **হৌ-হান্-শু**, অধ্যায় ১১৮।

৮। সি. রোজা মারিয়া (সম্পাদক), **এন্সিয়েন্ট রোম এণ্ড ইণ্ডিয়া, কর্মাসিয়াল এণ্ড কাল্চারাল কনট্যাক্টস বিট্যুইন দ্য রোমান্ ওয়ার্ল্ড এণ্ড ইণ্ডিয়া**, নিউ দিল্লী, ১৯৯৪, পৃ. ১৯৭।

৯। এ.এন. লাহিড়ি. **করপাস্ অফ্ ইন্দো-গ্রীক কয়েনস্**, ক্যালকাটা, ১৯৬৫, ১৯৬৫, পৃ. ১৩-১৬।

প্রাচীন ভারতে মুদ্রা ব্যবস্থা ঃ সিন্ধু সভ্যতা থেকে মৌর্যযুগ

সৈকত মণ্ডল

প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষরা শিকার এবং খাদ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জীবন ধারণ করত। ছোট গোষ্ঠী তাদের জীবন ধারণের (খাদ্যের প্রয়োজন) বা অন্য চাহিদা মেটাতে গৃহপালিতপশু পালন করত। প্রাথমিকভাবে যদিও তারা শিকারী গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত ছিল এবং অন্য গোষ্ঠীর সাথে তাদের সম্পর্ক মোটেই বন্ধুমনোভাবাপন্ন ছিল না, খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই তাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন বিনিময় ্াধ্যম ছিল না।

সময়ের বিবর্তনে ক্রমশ আদিম সমাজ একটা বৃত্তের লক্ষ্যে উপনীত হয় এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী, উপজাতির মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তারা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে নিত্য ব্যবহার্যদ্রব্য সামগ্রী 'barter system' এর মাধ্যমে পরিচালিত হত। যা ক্রমে নিয়মাবদ্ধ রীতিতে পরিণত হত। প্রাথমিক পর্যায়ে পশুসম্পদ এবং শস্য সম্পদ অতিপরিচিত বিনিময়ের মাধ্যম ছিল। সমাজে, অর্থনীতি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতির সাথে সাথে Standardise fixed exchange এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এখানে বলে নেওয়া দরকার যে, আগে বিনিময়মাধ্যম হিসাবে পশু সম্পদ ও শস্য সম্পদ ব্যবহৃত হত। কিন্তু মাঝে মধ্যে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হত, যখন পশু সম্পদ হিসাবে গরু এবং জামা, টুপি প্রভৃতি বিভাজিত করা হত। কারণ তাদেরকে ছোট ছোট অংশে বিভাজিত করা হলে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের সামগ্রিক মূল্য হারাত।

সুতরাং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সুদূর টাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। বস্তুত সামগ্রিক সমস্যাগুলি মুক্ত করার জন্য মুদ্রার বা টাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

সমাজে এইভাবে বিভিন্ন ধাতু সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি মুদ্রার প্রচলন ঘটেছে। এবং এইসব মুদ্রার উপর বিভিন্ন চিহ্ন কর্তৃপক্ষের দ্বারা ছাপা হত। উদাহরণস্বরূপ গ্রীসের প্রাচীন মুদ্রায় জন্তু জানোয়ারের ছবি চিহ্নিত ছিল। প্রাচীন মিশরে সোনা বা রূপার মুদ্রা দিয়ে গরু বা অন্যান্য পশুর চিত্র চিত্রিত ছিল।

সিন্ধু সভ্যতার যুগ

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুযায়ী ইওরোপ মহাদেশ থেকে ৬ষ্ঠ খ্রী. পূর্ব নাগাদ আমাদের

এ সম্পর্কে প্রমাণ আসে। কিন্তু বর্তমান গবেষকরা এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, হরপ্পা সভ্যতার সময়লগ্ন থেকেই ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

হরপ্পা সভ্যতার মুদ্রা ব্যবস্থার ধারণায় যারা বিশ্বাসী তাদের মধ্যে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর নাম করা যায়। যিনি মনে করেছেন ভারতীয় উপমহাদেশের আদি সভ্যতা মেহেড়গড় বা সিন্ধু উপত্যকা অর্থনীতিতে বিনিময় প্রথা ও 'Commodity money' এর সাথে পরিচিত ছিল। তিনি মনে করেন যে মেহেড়গড় তার প্রাথমিক পর্বে ধাতুর ব্যবহার না জানলেও হরপ্পা সভ্যতা, মুদ্রা হিসেবে ধাতুর ব্যবহার জানত। পরবর্তী পর্যায়ে মহেঞ্জোদারোতে খনন কার্যের ফলে একটি রূপার পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পাত্রে বিভিন্ন ধরণের মণিরত্নাদি ও ধাতবদ্রব্যাদি ছিল। সেগুলির আকার কখনও আয়তকার, বর্গক্ষেত্রাকার, গোলাকার ও সমতল। এর মধ্যে একটি পাওয়া গেছে কীলকাকার চরিত্র বৈশিষ্ট্য যা থেকে প্রাসাদ পাওয়া যায় যে, ব্যাবিলনীয় ওজন ব্যবস্থারধরণ ভারতে গ্রহণ করা হয়েছে। ডি.ডি. কোশাম্বী মনে করেন যে, এই খণ্ডগুলির মধ্য থেকেই আমরা মুদ্রা ব্যবস্থার প্রারম্ভের ইঙ্গিত পাই। এই খণ্ডগুলি থেকেই ব্যাবিলনীয় ওজন পরিমাপ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করা যায় ও এগুলিকে আবার ভারতের চিহ্ন যুক্ত মুদ্রার (punch markedcoins) সূচক বলা যায়।

এই খণ্ডগুলিকে মনে হয় বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ধরা হত। এইসব থেকেএটা প্রমাণ পাওয়া যায় যে বিনিময় প্রথার একটা সুষ্ঠু মাধ্যম ছিল।

লোথালে প্রচুর সীল পাওয়া গেছে সেগুলির আকার ছিল গোলাকার যেহেতু এই সীলে হরপ্পার হরফ ব্যবহার করা হত। তাই বলা যায় এগুলিতে হরপ্পার কৃতিত্ব ছিল। S.K. Maity এর মতে এর থেকে মনে হয় হরপ্পা বিনিময়ের মাধ্যম অর্থ নৈতিক আদান প্রদানের সাথে যুক্ত ছিল। এবং উন্নত বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যা টাইগ্রীস ইউফেটিস ও সিন্ধু সভ্যতার মধ্যে তা লক্ষ্য করা যায়।

রত্নাগর, এস.আর রাও এবং আলচিন বলেছেন যে হরপ্পার কেন্দ্র থেকে যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হত, সেক্ষেত্রে এই সীলগুলি ব্যবহৃত হত।

অধ্যাপক ফ্রন্সিস এ ওয়াকার এর মতে মুদ্রার প্রয়োজন ব্যবহার ব্যবস্থা বাণিজ্যের ফলেই উদ্ভূত। প্রথমে ব্যবসা (দ্রব্যর বিনিময়ে দ্রব্য) 'bartar system' এর মাধ্যমে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই ব্যবসা বাণিজ্য খুব দ্রুত বিস্তৃত হতে পারে না। Prof Jevous এটা স্বীকার করেছেন। এবং বলেছেন হরপ্পা সভ্যতার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য।

শচীন্দ্রকুমার মাইতির মতে হরপ্পা সভ্যতা উন্নত নগর সভ্যতা হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিল, তা মুদ্রা অর্থনীতির অগ্রগতির জন্যই সম্ভব হয়েছিল, মুদ্রা অর্থনীতির অগ্রগতি ছাড়া সম্ভবপর হত না।

বৈদিক যুগ ঃ ঋক বৈদিক যুগে আর্যরা কৃষিকার্য ও পশুপালনের মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করত এবং পশুসম্পদ আগে অর্থনীতিতে যথেষ্ট ভূমিকা নিত। ধান এবং পশু সম্পদ বাণিজ্যিক দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত। এর ফলে অবশ্য সোনা, রূপা বা তামার মুদ্রাও ব্যবহৃত হত। এক্ষেত্রে 'Nisaka' এর কথা উল্লেখ করা যায়। যা

প্রকৃতপক্ষে একটি স্বর্ণনির্মিত নেকলেস ছিল। Prof ম্যাকডোনেল এবং কীথ মনে করেন নিসক অসলে একধরণের সোনার গহনা যা গলায় অলঙ্কার হিসাবে লাগানো হত। নিসকগ্রীবা যা গলায় থাকত। তা স্বত্ত্বেও (Nisaka griva) এর অর্থনীতিতে ব্যবহারের উল্লেখ ঋকবেদে পাওয়া যায়, যাতে একজন লোককে ১৮০ নিসক প্রদানের মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করার নীতি প্রচলিত ছিল। অন্যান্য বেদেও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত তার প্রমাণ পাই। অথর্ববেদে অনেক পরিচ্ছদে নিসকার ব্যবহার এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য ও নিসকার মুদ্রা এবং গহনা হিসাবে ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ঐতিরিয় প্রমাণে একজন ব্যক্তির নিসকার নেকলেস ধারণের কথা উল্লেখ মেলে। জাতক সাহিত্যে আবার এটা নিক্কন (Nikkan) নামে পরিচিত। যাইহোক এটা সাধারণ ভাবে মনে করা হয় ১৫০০ খ্রী. পূর্ব—৬০০ খ্রী. পূর্ব এর মধ্যে এই নেকলেস ক্রমে ধাতু মুদ্রায় পরিবর্তিত হয়।

নিসকা ছাড়া মানা আর একটি 'Term' যা বিনিময় ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ঋকবেদের একটি বাক্য এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে। যাতে প্রার্থনা করা হয়েছে "দেবতা ইন্দ্র আমাদের গোসম্পদ, ঘোড়া, রত্ন এবং মানা যা গোটা নির্মিত তা দান করুন।" ম্যাকডোনাল্ড এবং কীথ এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন যে আসলে এটা ছিল 'Desirable Object' এই সময় রৌপ্য মুদ্রা ও রৌপ্য নিসকার উল্লেখ পাওয়া যায়। রৌপ্যমুদ্রা যা 'rayes' নামে পরিচিত তা বৈদিক যুগে অস্পষ্ট ছিল। এছাড়া 'কোসা' এবং 'হিরণ্যপিণ্ড' খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেনেডি ও স্মিথ বলেন যে ভারতে সপ্তম খ্রী, পূর্বাব্দে নির্দিষ্ট ওজনের চিহ্নযুক্ত ধাতুখণ্ড মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হত। এবং বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের সূত্রপাত লগ্নে এটা ঘটেছিল। কিন্তু আমরা জানি যে সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের সূত্রপাতের কথা পূর্বে ব্যবহৃত কার্সপানা এবং অন্যানা চিহ্ন যুক্ত মুদ্রায় প্রমাণ পাই না। সুতরাং 'কেনেডি' ও 'স্মিথ' এর মত গ্রহণ যোগ্য নয়।

উইলসন যদিও বলে যে আলেকজাণ্ডারের সময়কালের পূর্ব থেকে হিন্দুরা মুদ্রা অর্থনীতির সাথে পরিচিত ছিল। বৈদিক সাহিত্যে নিসকা সম্পর্কে জানা গেলেও এর ওজনের মান সম্পর্কে এই গ্রন্থ নিরুত্তর।

স্মৃতি শাস্ত্র এবং অর্থ শাস্ত্র থেকে নিসকার ওজনের মান সম্পর্কে জানা যায়। নিসকা এবং মা না ছাড়া কৃষ্ণল ও সতমানা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হত।

দীনেশচন্দ্র সরকার এবং ভাণ্ডারকর অর্ধশত মান = ৫০ রতি, পাদ শতমান = ২৫ রতি এবং পদার্থ শতমান = ১২ ১/২ রতি উপস্থাপিত করেছেন। অর্থনীতিতে শতমানের ব্যবহার শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে জানা যায়।

মাইতির মতে শতমানের ক্ষুদ্র অংশ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত। পাণিনি, মনু, শতমানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

প্রাক্-মৌর্য থেকে মৌর্যোত্তর যুগ ঃ

প্রাক মৌর্যযুগে 'Barter System' প্রচলিত ছিল। এবং মুদ্রা ব্যবস্থা প্রাত্যহিক জীবনের বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে কয়েক শত চিহ্ন যুক্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। তবে এই মুদ্রাগুলির প্রচলনের সঠিক তারিখ চিহ্নিত

করার বিষয়টি এখনো অমীমাংসিত। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। A.L. Basham এর মতে ষষ্ঠ খ্রী. পূর্বাব্দ নাগাদ এই চিহ্ন যুক্ত মুদ্রার প্রচলন ঘটে। এবং তা পরবর্তী অনেক সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। মাইতি যদিও বলেন চিহ্ন যুক্ত মুদ্রার প্রচলন ষষ্ঠ খ্রী. পূ. বহু আগে ঘটেছিল। Allan, Rapson জোর দেন অন্য দিকের উপরে। অর্থাৎ তাঁরা পূর্ববর্তী চিহ্ন যুক্ত মুদ্রায় বৈদেশিক প্রভাব পড়েছিল বলে মনে করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান ৫০০ থেকে ৩৩১ খ্রী. পূ. নাগাদ কিছু পারস্য দেশীয় মুদ্রা পাঞ্জাব অঞ্চলে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত মুদ্রা 'Sigloi' যা ভারতীয় চিহ্ন যুক্ত মুদ্রার সাথে 'Counter Mark' বহন করছেন। এবং এই সমস্ত গ্রীক মুদ্রাগুলোতে চিহ্ন হিসাবে 'এথেনীয় পেঁচার' ব্যবহার যা উত্তর পশ্চিম ভারতে মুদ্রার উপর চতুর্থ খ্রী. পূ. নাগাদ প্রভাব ফেলেছিল। এই কারণে তারা ভারতীয় চিহ্ন যুক্ত মুদ্রার উপর জোর দেন। কিন্তু মাইতি এই মত মানতে নারাজ, তার কাছে ভারতীয় চিহ্ন যুক্ত মুদ্রা অনেক পূর্ববর্তী এবং প্রাচীন।

দুর্গাপ্রসাদ এবং কোশাম্বী কয়েক হাজার চিহ্ন যুক্ত মুদ্রা গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এর মধ্যে কিছু রৌপ্য চিহ্ন যুক্ত মুদ্রা যাদের ওজন 180 grain, অপরদিকে পার্সীয় Sigloi যার ওজন 3645 grain এর বেশী নয়। সুতরাং বলা যায় ভারতীয় চিহ্ন যুক্ত মুদ্রাকে পারসীয় মুদ্রা (Sigloi) হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। আসলে ভারতীয় মুদ্রাগুলিকে স্বতন্ত্র মুদ্রা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এবং সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত মতমানর সমতুল্য বলে মনে করা হয়। এই মুদ্রাগুলিতে ব্যবহৃত চিহ্ন বা প্রতীক অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন ছিল।

ওয়ালশ মত প্রকাশ করেছেন ভারতীয় চিহ্ন যুক্ত মুদ্রার প্রচলন মহেঞ্জোদারোর নকসা অঙ্কিত শীলের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কোশাম্বীর মতে চিহ্ন যুক্ত মুদ্রায় সূর্য্যর প্রতীক চিহ্ন আসলে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক যা সাদর চক্রের মতো ছিল। ক্ষমতার প্রতীক (cresent on arches) আসলে মৌর্যদের প্রতীক, যা সাদর চক্রের সাথে যুক্ত ছিল। কোশাম্বীর মতেপ্রতীক চিহ্ন আসলে শাসক বংশের সাথে এবং মানবীয় মূর্ত্তির সাথে যুক্ত। এই সাদর চক্র ছাড়া মুদ্রা উপজাতীয় রাজ্য শাসনকে বোঝাতো। আবার Foucher এর মতে ভারতীয় চিহ্ন যুক্ত মুদ্রায় হাতি ও ষাঁড়ের যে প্রতীক চিহ্ন পাওয়া যায় তা বস্তুত মৌর্যদের সাথে ভগবান বুদ্ধের যোগ সূত্রকে নির্দেশ করে। এবং খিলান নিঃসন্দেহে বৌদ্ধস্তূপকে নির্দেশ করে।

অর্থশাস্ত্রে এটা প্রমাণ পাওয়া যায় এই চিহ্ন যুক্ত মুদ্রা ব্যাপক ভাবে বিনিময় মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত। এই গ্রন্থে প্রধান দুই প্রকার মুদ্রার নাম যথা—Pana রৌপ্য মুদ্রা এবং তাম্রমুদ্রা যা Masaka নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া স্বর্ণ মুদ্রার চলও ছিল তবে অল্প। মাইতি বলেছেন pana ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা Pana এর মাধ্যমে বেতন পেত।

মাইতির মতে চিহ্ন যুক্ত মুদ্রা খুব সম্ভবতঃ রৌপ্য এবং তাম্র দ্বারা তৈরী হত এবং ব্যবহৃত হত। যদিও খুব অল্প সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা কাজে ব্যবহৃত হত। অর্থশাস্ত্র থেকে এটাও

জানা যায় যে খুব সংগঠিত টাকশাল গড়ে উঠেছিল। এবং এ ব্যাপারে কর্মচারীরা খুব সচেতন দৃষ্টি রাখত, যাতে কোন রকম জাল মুদ্রা প্রস্তুত হতে না পারে।

Rhys Davids স্পষ্ট বলেন যে 'বৌদ্ধ সাহিত্যগুলি থেকে জানা যায় সমাজে এই মুদ্রা ব্যবহারের ব্যাপক চল ছিল। সমাজে সমস্ত রকম উৎসব, পেনসন, ঋণ, কোষাগারে সঞ্চয় প্রভৃতি দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় ব্যাপকভাবে মুদ্রার চল ছিল'।

'Dhammapada Atthakatha' থেকে বিভিন্ন মুদ্রার মূল্য যথা—Nikkha, Hiranna Suvanna, Masaka, Kahapana, Kala Kahapana প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। এই সমস্ত মুদ্রাগুলি হল স্বর্ণ বা রৌপ্য নতুবা তাম্র দ্বারা নির্মিত।

A.C. Childers এবং Rhys Davids মনে করেন Suvanna Hiranna সোনাকে বোঝাত। Davids এর মতে Suvanna স্বর্ণ মুদ্রাকে বোঝাতো এবং Hiranna ছিল চিহ্নহীন সোনার বাট।

Bhandarkar অন্য কথা বলেন। তার মতে Suvanna নির্দিষ্ট ওজনের সোনার মুদ্রা ছিল। কিন্তু Hiranna সোনার মুদ্রার ধরণের হলেও তা কিন্তু সোনার তৈরী ছিল না।

C.D. Chatterjee তাঁর Article 'Numismatic Data in the pali Literature' থেকে জানা যায় 'বুদ্ধ ঘোষ, Kala Kahapana শব্দটি চিহ্ন যুক্ত তাম্রমুদ্রা বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। বুদ্ধের আমলেও তা প্রচলিত ছিল। পালি সাহিত্যে 'Nila এবং Kala' নামে দুটি শব্দ পাওয়া গেলেও তাদের এ ব্যাপারে সনাক্ত করা খুব মুশকিল।

দীনেশচন্দ্র সরকার উপরোক্ত মতের সাথে এক মত হয়েছেন।

পাণিনি ১০০ Karshapana যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উন্নতমানের রৌপ্য মুদ্রা হিসাবে সমসাময়িক যুগে সমাদৃত হয়েছিল।

মনু এবং Davids উপরোক্তমুদ্রাগুলিব ওজনের তালিকা প্রস্তুত করেন। যার দ্বারা এগুলির নির্দিষ্ট মূল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়।

তালিকা

৫ কৃষ্ণল বা রক্তিকা = ১ মাসা (masha)
সোনা এবং তামার মুদ্রা ১৬ মাসা = ১ সুবর্ণ
৪ সুবর্ণ = ১ নিসক
১০ নিসক = ১ ধর্ণা সোনার

২ কৃষ্ণল বা রক্তিকা = ১ মাসা
রৌপ্যমুদ্রা ১৬ মাসা = ১ ধর্ণা
১০ ধর্ণা = ১ সাতমালা।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা নিয়ে মুদ্রাগুলির উল্লেখ করা হল। যথা—মাসকা, পাদ, সুবর্ণ এবং কাহ্পন প্রভৃতির মূল্য সবসময় এক রকম ছিল না।

সামগ্রিক আলোচনার পর এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে মুদ্রা ব্যবস্থা বিনিময়ের

ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত হয়েছিল।

প্রমাণ পাওয়া যায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ফলেই যে এটা সম্ভব হয়েছিল এবং তা অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসাবে বলা চলে। কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে অর্থনৈতিক কাঠামোর বার্টার ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রমাণ মেলে এই বার্টার ব্যবস্থা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে 'Transaction Cover' করেছিল। আলেকজাণ্ডার কানিংহাম Taxila থেকে অনেক ধরনের চিহ্ন যুক্ত মুদ্রা আবিষ্কার করেন। এবং এই সব মুদ্রা শাসক বা বণিক গোষ্ঠী দ্বারা ব্যবহৃত হত। রাষ্ট্রের কিন্তু মুদ্রা ব্যবস্থার উপর কোন রকম একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই সমস্ত মুদ্রাতে সাধারণত কোন নাম উল্লেখ পাওয়া যায় না। সাধারণত এগুলিতে বিভিন্ন প্রতীক (symbol) হিসাবে মানুষ এবং জন্তু জানোয়ারের চিত্র, সূর্য বা গ্রহ সম্বন্ধীয় চিহ্ন বর্তমান ছিল। ৭০০ খ্রী. পূর্ব থেকে ৫০০ পর্যন্ত এই মুদ্রা ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রাচীন বাটার ব্যবস্থা কিন্তু খুবই অস্পষ্ট ছিল। বার্টার ব্যবস্থা সর্বত্র পরিচিতি না পেলেও মুদ্রা ব্যবস্থা সেই পরিচিতি লাভে সক্ষম এবং মুদ্রা ব্যবস্থা কেবলমাত্র বাণিজ্যিক প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ এই মুদ্রার উপর ব্যাপক ভাবে নির্ভরশীল ছিল।

D.C. Sircar, ''Studies in Indian Coins''—এ মত প্রকাশ করেন যে, ষষ্ঠ খ্রী. পূর্ব বুদ্ধের জন্মের আগে ভারতে চিহ্নযুক্ত মুদ্রা বর্তমান ছিল তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং দক্ষিণভারতে ৫ম খ্রী. পর্যন্ত তার ব্যবহার অব্যাহত ছিল। তিনি আরো বলেন এর অনেক আগে বিদেশীরা যখন উত্তর পশ্চিম ভারতে আগমন করে তখন তারা পৌরাণিক কাহিনী চিহ্নযুক্ত মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করেন এবং সময়ের সাথে ভারতীয়রা তাদের কাছ থেকে এই মুদ্রা ব্যবস্থা অনুসরণ করে।

সূত্রনির্দেশ

১। S.K. Maity, Early Indian Coins Currency System: New Delhi, Munshiram Monoharlal, 1970.

২। Damodar Dharmanand Kosambi: Indian numismatics-New Delhi, Orient Longman Limited-1981.

৩। Dinesh Chandra Sarkar-Studies in Indian Coins, Delhi Varanashi, Motilal Banarsi das 1968.

৪। D.R. Bhandarkar–Lectures on ancient Indian numismatics, Madras, New Delhi, Asian Education Services 1990.

৫। E.J. rapson-Ancient Indian from the earliest times to the Ist century and London-Cambridge University Press, 1916.

মল্‌হারের মুদ্রা ও বাণিজ্য

সুস্মিতা বোস মজুমদার

মল্‌হার বর্তমান মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলায় অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই প্রত্ন-ক্ষেত্রটি প্রাচীন 'দক্ষিণকোশলের' অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক তথ্যনির্দেশ থেকে জানা গেছে যে প্রাচীন যুগে এই অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছিল। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চলে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে এই অঞ্চলে বসতিবিস্তারের প্রাচীনত্ব ও মুদ্রাপ্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত উপাদানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টিয় চতুর্দশ শতকের মধ্যে প্রস্তরনির্মিত ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তি, মন্দির স্থাপত্য, চারটি তাম্রপত্র, অনেকগুলি লেখ ও নামমুদ্রা, শীলমোহর এবং অজস্র মুদ্রা। এই প্রসঙ্গে যে বিষয়টি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে তা হল—এই প্রত্নকেন্দ্রটির ১০০ একর বিস্তৃতি জুড়ে একটি কাঁচা মাটির গড় পাওয়া গেছে যার ভিতর ও বাহির দুদিকে জলপূর্ণ পরিখার অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয়।

মল্‌হার থেকে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি প্রধানত তামা ও সীসা দ্বারা নির্মিত। এই মুদ্রাগুলির লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য হল ব্রাহ্মী 'ম' অক্ষরের আকৃতির মত একটি চিহ্ন যা মল্হার ব্যতীত অন্য কোন অঞ্চলের মুদ্রায় আমরা পাই না। মুদ্রাতাত্ত্বিকগণ এই বিশেষ চিহ্নটিকে মল্হারমুদ্রা চিহ্নরূপে নির্দিষ্ট করেছেন।

তামা ও সীসার মুদ্রা ছাড়াও মল্‌হার থেকে দুটি রূপোর আহত-মুদ্রা (punch mar ked) পাওয়া গেছে। এই মুদ্রাগুলিতে ব্রাহ্মী 'ম' অক্ষরের মতো বিশেষ মল্হার চিহ্ন পুনরাহত (Re-strucked)।

তামা ও সীসানির্মিত মলহারের এই মুদ্রাগুলিকে আমরা নির্দিষ্ট চারটি ধারায় ভাগ করতে পারি। প্রথম ধারার মুদ্রায় দুজন রাজার নাম উল্লিখিত। এই দুই রাজার নাম যথাক্রমে 'অচডসিডি' এবং 'সিলালুসিরি'। লিপিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মুদ্রালেখগুলির সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকের অন্তবর্তী বলে নির্ধারিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধারার মুদ্রায় চারজন মঘবংশীয় রাজার নাম পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বায়ুপুরাণে আমরা দক্ষিণকোশলে রাজত্বকারী ন'জন মঘ শাসকের উল্লেখ পাই। এক্ষেত্রে ঐতিহ্যপূর্ণ যে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সাহিত্যিক উপাদানের দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এই শাসকবংশের ঐতিহাসিকতা সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছে।

তৃতীয় ধারায় আমরা দুজন রাজার মুদ্রা পেয়েছি। যাঁদের নাম হল 'ভলিগ' এবং 'সিলালুক'। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই 'সিলালুক' উৎকীর্ণিত মুদ্রাটিকে পূর্ববর্তী

কয়েকজন মুদ্রাতাত্ত্বিক 'আপিলক' রূপে পাঠদান করে ঐ নামের সাতবাহন বংশীয় শাসকের মুদ্রারূপে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু নিবিষ্ট লিপিতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের সূত্রে এই মুদ্রালেখপাঠকে কোনভাবেই 'সিলালুক' ছাড়া অন্যকিছু পাঠনির্দেশ করা যায় না।

চতুর্থ বা অন্তিম ধারায় আমরা মুখ্যদিকে হস্তি ও গৌণদিকে দেবী অঙ্কিত মুদ্রা পাই। এই ধারার মুদ্রাগুলিকে মুদ্রাতাত্ত্বিকগণ হস্তী ও দেবীটাইপ রূপে চিহ্নিত করেছেন। এই ধারার মুদ্রায় তিনটি বিশেষ শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয়। যথা (১) আংশিক মুদ্রালেখ যুক্ত, (২) আংশিক অর্থহীন মুদ্রালেখযুক্ত এবং (৩) অবশিষ্টগুলি লেখবিহীন। লেখচিহ্নিত মুদ্রাগুলিকে খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতকের প্রবর্তন বলে মনে করা যায়। উপরোক্ত মুদ্রাগুলির আনুপূর্বিক মুদ্রাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে সঙ্গতভাবেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এই মুদ্রাগুলি ছিল দক্ষিণ কোশলের অন্তর্ভূক্ত মলহারের স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রচলন (local coins).

মলহার অঞ্চলে এই ধরণের বিপুল সংখ্যক বিশিষ্ট ধারার মুদ্রা পাঁচ শতাব্দী ধরে প্রচলিত হতে থাকলে মলহার অঞ্চলের বাইরে দক্ষিণ কোশলের অন্যত্র চতুর্থ শতকের মধ্যে কোন আঞ্চলিক মুদ্রার প্রচলন ঘটেনি। বিষয়টি আর্থসামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্তের প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন, এর থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে মলহার অঞ্চলের লোকেরা ব্যাপকতর বাণিজ্যপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত ছিল ও অনিবার্যভাবেই মুদ্রার ব্যবহার সম্পর্কেও অভিজ্ঞ ছিল। পূর্বালোচিত প্রমাণাদি ছাড়াও এই অঞ্চল থেকে রোমান মুদ্রা ও বাইজান্টিয়ান মুদ্রার প্রতিচিত্র (eplica) থেকেও আমরা অনুমান করতে পারি যে মলহার একটি বিস্তৃত পথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং বাণিজ্যে অংশগ্রহণের অপরিহার্য কারণবশতঃ তাদেরকে মুদ্রাপ্রচলনে ব্যাপৃত হতে হয়েছিল। যদিও মলহারের এই বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পক্ষে অন্য কোন সমর্থিত উপাদান পাওয়া যায়না। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অন্যান্য যে সমস্ত জায়গা থেকে স্থানীয় বা আঞ্চলিক মুদ্রা পাওয়া যায়, যেমন—উজ্জয়িনী, বিদিশা, কোশাম্বী, তক্ষশীলা, প্রভৃতি অঞ্চল মলহারের মতই বাণিজ্য পথেব উপরে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ মলহারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এই অঞ্চলের মুদ্রার যেগুলি স্থানীয় বা আঞ্চলিক মুদ্রা বলে মনে করা যায়, তার একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

সূত্র নির্দেশ

১। 'মলহার', কে, ডি, বাজপেয়ী এবং এস কে পাণ্ডে, ১৯৭৮,

২। বায়ুপুরাণ, ২য় অধ্যায়, ৩৭৩—৩৮২।

৩। 'এ নিউ অন্ধ্র কয়েন'—নিউমিসম্যাটিক সাপ্লিমেন্ট, ১৯৩৭-৩৮, কে. এন. দীক্ষিত, নং ৪৩, পৃ. ৯৩-৯৪।

৪। 'নিউমিসম্যাটিক নোটস্', ১ কয়েন অফ আপীলক, জে.এন.এস.আই, খণ্ড ৪৩, পৃ. ১৩৪-৩৭।

৫। 'থ্রি মলহার কয়েন্স্ রিভিসিটেড', নিউমিসম্যাটিক ডাইজেস্ট, খণ্ড ১৪, পৃ. ১০-১৫, ১৯৯০, পি.এল গুপ্ত

৬। 'ইন্সক্রাইবড্ কয়েন্স্ ফ্রম মল্হার, দ্য বাউন্টিয়াস ট্রি'—ট্রেসার্স্ ইন ইন্ডিয়ান আর্ট এ্যাণ্ড কালচার, পৃ. ২০২ —২০৫, ১৯৯৭, অজিত রাইজাদা।

৭। নিউ রিডিং অন মলহার কয়েন্স্—আই, আই, আর.এন.এস. নিউজলাইন ইস্যু ১৪, ১৯৯৭, সুস্মিতা বোস মজুমদার।

কলিঙ্গ, উৎকল, ওড্র এবং ওড়িশার সন্ধানে : ইতিহাস আশ্রয়ী ভূগোল

রাজকুমার জাজোদিয়া

প্রাচীনকালের কলিঙ্গদেশ আজ ওড়িশা রাজ্য নামে পরিচিত। 'কলিঙ্গ' নামটি মহাভারত এবং রামায়ণ মহাকাব্যে পাওয়া যায়। বর্তমান ওড়িশার উত্তরপূর্বে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে বিহার, পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর অবস্থান করছে। এই রাজ্যের দক্ষিণাংশ পূর্বঘাটের পর্বত, উত্তরাংশ মালভূমি এবং কেন্দ্রীয় ও উপকূলীয় অংশ সমভূমি নিয়ে গঠিত। অতীতের কলিঙ্গ এবং বর্তমানের ওড়িশার সীমানার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে উপকূলীয় সমভূমির সীমানার ক্ষেত্রে। এই সমভূমি দক্ষিণে গোদাবরী নদী থেকে উত্তরে সুবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোদাবরীর দক্ষিণে ছিল অন্ধ্রদেশ এবং সুবর্ণরেখার উত্তরে ছিল বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত বন্দর বা জনপদ। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, কোন দেশের রাজনৈতিক সীমানা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। ইতিহাসে নদীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওড়িশার ক্ষেত্রে মহানদী, ব্রাহ্মণী এবং বৈতরনী নদীগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

কলিঙ্গ, উৎকল, ওড্র এবং ওড়িশা ইত্যাদি নামগুলি উৎস সন্ধানের জন্য আমাদের সহজ ভূগোল এবং সহজ মনো ইতিহাস অর্থাৎ Psyco-History র পথ ধরে এগোতে হবে। পৌঁছাতে হবে বিখ্যাত মহাকাল পর্বতের পাদদেশে। এই মহাকাল ওড়িশার উত্তর পশ্চিমে অবস্থান করছে। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের অংশ হয়ে আছে। মহাকাল শব্দের অর্থ হচ্ছে মহাশিব। প্রাচীনকালে মহাকাল পর্বতকে মহাশিবের প্রতীক মনে করা হত। বিখ্যাত মহানদী মহাকাল পর্বত এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে। বর্তমানে মহানদীর উৎসস্থল মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার দক্ষিণাংশের শিয়াওয়াড়কে ধরা হয়। বর্তমানের উৎসস্থল মহানদীর মধ্যগতির দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছে। কিন্তু প্রাচীন কালে মহানদীর উৎসস্থল মহাকাল পর্বতকে মনে করা হত। প্রমাণ হিসাবে এই পর্বত থেকেই কয়েকটি ছোটনদী মহানদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আছে। এই মিলিত ধারার জন্যই মহাকাল পর্বতকে মহানদীর উৎসস্থল মনে করা ছিল স্বাভাবিক। মহানদীর নামকরণেও

'মহাকাল' নামের প্রথম অংশ 'মহা'ধ্বনি নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মহা+নদী→মহানদী হয়েছে। এই মহানদী দ্বারাই গঠিত হয়েছিল কলিঙ্গের কেন্দ্রীয় ও মোহনার সমভূমি। এই সমভূমি ছিল মহাকাল বা মহাশিবের বিশেষ অঙ্গ। এই বিশেষ অঙ্গ ছিল লিঙ্গ। কলিঙ্গের নামকরণেও 'মহাকাল' নামের অবশিষ্ট অংশ 'কাল' ধ্বনি নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কাল + লিঙ্গ → কলিঙ্গ হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় কলিঙ্গ ছিল মহাকালের লিঙ্গের প্রতীক। যেমন উত্তর ভারতকে হিমালয় এবং গঙ্গার দান বলা যায়। দানকে স্মরণ রাখার জন্য প্রমাণ হিসাবে মহানদীর মোহনাংশে অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে অবস্থান করছে বিশ্ববিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দির। প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই মন্দিরের প্রাচীনত্ব খুব বেশি না হলেও এই বিশেষ স্থানের গুরুত্বের প্রাচীনত্ব খুব গভীরে। কোন এক সময়ে মানুষ বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশকে অবলম্বন করে প্রার্থনা করতে শুরু করেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে সে স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক নির্মাণ কাজ হয়েছিল। এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বহু প্রাচীন নির্দশন অবস্থান করছে। যেমন ধৌলিতে সম্রাট অশোকের শিলালেখ, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, পুরীধামে বিশ্ববিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির এবং কোনারকের বিখ্যাত সূর্য্য মন্দির। মনে হয় এই অঞ্চলে প্রত্ন সম্পদের মেলা বসেছে।

কলিঙ্গদেশ প্রথম পর্যায়ে মোহনা অঞ্চলের সমভূমিতে গঠিত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তট ভূমির এবং কেন্দ্রীয় সমভূমিতে বিস্তার লাভ করে। কোন একসময়ে সমভূমির অভাবে কলিঙ্গ ব্রাহ্মণী নদী ধরে উত্তর পশ্চিমদিকে বর্তমানের সুন্দরগড় জেলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এই উত্তর পশ্চিম দিকই হচ্ছে মালভূমি অর্থাৎ উচ্চভূমি। কলিঙ্গ যখন সমভূমি থেকে উচ্চভূমিতে বিস্তারিত হল তখন এই নতুন উচ্চভূমিকে উচ্চকলিঙ্গ বা উৎকলিঙ্গ নামে চিহ্নিত হওয়াই স্বাভাবিক। এই উৎকলিঙ্গ নামটি পর্যায় ক্রমে উৎকলি হয়। উৎকলি থেকে উৎকল হওয়াই স্বাভাবিক।

আবার এই উৎকল আরো উত্তর পশ্চিম দিকে বৈতরনী নদী ধরে বিস্তার লাভ করে। এই উত্তর পশ্চিম দিক আরো উচ্চ বা উচ্চতর ছিল। তাই 'উৎকল' এর 'উৎ' অংশের সঙ্গে তুলনামূলক ধ্বনি 'তর' যোগ হয়। অর্থাৎ উৎ + তর→উড্র হয়। উদাহরণ হিসাবে উৎ + ডীন → উড্ডীন হয়। উভয় ক্ষেত্রে 'ৎ' এবং 'ত' ধ্বনি 'ড' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এই 'উড্র' ধ্বনি 'ওড্র' ধ্বনি হিসাবে উচ্চারণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। উভয়ের মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে। উড্র বা ওড্র বর্তমানের কেওনঝড় এবং ময়ূরভঞ্জ জেলা পর্যন্ত ধরা যায়।

আবার উড্রের অনুকরণে উড়িষ্যা এবং ওড্রের অনুকরণে ওড়িশা হওয়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। উদাহরণ হিসাবে মনু থেকে মনুষ্য এবং বারি থেকে বর্ষা শব্দ এসেছে। প্রথমে উড্র বা ওড্র স্থানবাচক ছিল। কোন কোন সময় জাতি বাচকও হয়ে পড়ে। যেমন অন্ধ্র বলতে দেশ এবং জাতি উভয় বোঝায়।

এখন ওড়িশা নাম নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। আমরা জানি, 'ওড্ডিশ' ঃ শব্দের অর্থ শিব ঠাকুর। এখানে শিব ঠাকুর উচ্চতর আসনে বসে আছেন। প্রমাণ হিসাবে

বৈতরণী র উৎস অঞ্চলে অবস্থান করছে স্বল্পখ্যাত খিচিঙ মন্দির। আবার ‘ওড্ডিশঃ’ এবং ‘ওড়িশা’ নাম দুটির মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে। বলার তাৎপর্য হচ্ছে, যে স্থান বা জনপদগুলি উচ্চ বা উচ্চতর স্তরে অবস্থান করে সেটাই ওড়িশা। এখন বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে লেখা যায়।

কাল + লিঙ্গ—কলিঙ্গ
উৎ + কলিঙ্গ—উৎকলিঙ্গ—উৎকলি—উৎকল
উৎ + তর—উড্র বা ওড্র
উড্র—উড়িষ্যা
ওড্র—ওড়িশা

বিষয়টি আরো সংক্ষেপে বলা যায় যে মহানদীর অববাহিকা অঞ্চলে কলিঙ্গ, ব্রাহ্মণীর অববাহিকা অঞ্চলে উৎকল এবং বৈতরণীর অববাহিকা অঞ্চলে ওড্র অবস্থান করত। আরো সহজ ভাবে বলা যায়, এক বিরাট রাজপ্রাসাদের ভূমিতল হচ্ছে, কলিঙ্গ, প্রথমতল হচ্ছে উৎকল এবং দ্বিতল হচ্ছে ওড্র আর সম্পূর্ণ রাজপ্রাসাদটি হচ্ছে ওড়িশা রাজ্য। ইতিহাসের রূপ বড়ই বিচিত্র। এই বিচিত্ররূপই হচ্ছে ইতিহাসের প্রাণ।

বিলুপ্ত বন্দর চন্দ্রকেতুগড়

গৌরীশংকর দে

ইংরেজী port শব্দটির উৎস ল্যাটিন portus।[১] ফরাসী 'porte' শব্দের অর্থ দরজা।[২] জার্মান Haten শব্দের অর্থ আশ্রয়।[৩] ওয়েবস্টার কম্প্রিহেনসিভ অভিধান (আন্তর্জাতিক সংস্করণ) অনুযায়ী বন্দর হলো সেই স্থান যেখানে জাহাজ, বিশেষত বাণিজ্যিক কারণে প্রবেশ করে বা যেখান থেকে প্রস্থান করে।[৪] বন্দরের সংজ্ঞা ঃ "সমুদ্র থেকে স্থলভূমি পর্যন্ত যাবার প্রবেশপথ এবং সমুদ্রগামী জাহাজের সুরক্ষিত অন্তবর্তীকালীন বিশ্রামস্থল।"[৫] আরো একটু বিশদভাবে বলা যায়—নদী ও সমুদ্রের তীরবর্তী যে অংশে জাহাজ নোঙ্গর করে; রপ্তানীযোগ্য মাল বোঝাই করে; আমদানীকৃত মাল খালাস করে; প্রয়োজনমতো মেরামতির কাজ সারে; যাত্রী পরিবহন করে এবং ঝড়-ঝঞ্ঝার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নেয় সেই স্থানকে বলা হয় বন্দব।

অবস্থান অনুযায়ী বন্দর তিন শ্রেণীর : (ক) সমুদ্র বন্দর, (খ) নদী বন্দর ও (গ) হ্রদ বন্দর। বন্দর থাকলে তার পশ্চাদ্‌ভূমিও থাকবে।

সমুদ্রাশ্রয়ী ও নদনদীবিধৌত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত মালাবার ও করমণ্ডল উপকূলে, প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছিল বহু বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দর।[৬] গুজরাটের লোথালে সমুদ্রগামী জলযানের এক বিশাল পোতাশ্রয় আবিষ্কৃত হয়েছে।[৭] সবরমতী নদীর মোহনায় এই পোতাশ্রয় নির্মিত হয়েছিল।[৮] এখানে আবিষ্কৃত একটি গুদাম থেকে পাওয়া গেছে বেশ কিছু শীলমোহর এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত একজন সুমেরিয়ান, আফ্রিকার একটি গরিলা ও মিশরীয় মমির টেরাকোটা প্রতিকৃতি।[৯] প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি প্রমাণ করে সমকালীন বিভিন্ন সভ্য ও উন্নত দেশগুলির সঙ্গে লোথালের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর তৃতীয় বা শেষ পাদে কোন এক নামগোত্রহীন গ্রীক নাবিক রচনা করেন **"পেবিপ্লাস অফ দ্য এরিথ্রিয়ান সী"** (ভারত মহাসাগরে ভ্রমণ)। এই গ্রন্থে ভারতের বন্দর, পোতাশ্রয়, আমদানী-রপ্তানি, পণ্যদ্রব্য প্রভৃতির নিপুণ বর্ণনা আছে।[১০] খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি রচনা করেন **'ভূগোল'**। খ্রীস্টীয় প্রথম দুই শতকে ভারতীয় উপকূলের প্রধান বন্দরগুলির উল্লেখ এই দুটি গ্রন্থে পাওয়া যায়। সিন্ধুনদের মোহনায় অবস্থিত ছিলো বারবারিকাম।[১২] মালাবার উপকূলে ছিলো বিখ্যাত বন্দর **মুজিরিস**।[১৩] টলেমি গুজরাটের উপকূলে **সুরাস্থিনি** বন্দরের উল্লেখ করেছেন।[১৪] এই বন্দরটিই আধুনিক সুরাট। সমগ্র পশ্চিম উপকূলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিলো **ভৃগুকচ্ছ**

(বারুগাজা)।[১৫] 'পেরিপ্লাস'[১৬] ও 'টলেমির ভূগোল'[১৭] গুরুত্ব স্বীকৃত। এই বন্দর ছিলো নর্মদার মোহনায়। এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি ছিলো বিশাল।

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্ধং কৃষিকর্মণি'—এ কথা প্রাচীন বাংলায় যথার্থতা লাভ করেছিল। প্রাচীন বাংলার লক্ষ্মী ব্যবসাবাণিজ্য নির্ভরই ছিলেন বেশি।[১৮] খ্রীস্টপূর্ব থেকে শুরু ক'রে আনুমানিক খ্রীস্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত কাল বাঙলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ। মালয়দেশের ওয়েলজলী জেলায় খ্রীস্টীয় পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি সংস্কৃত অভিলেখ থেকে বুধগুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ 'মহানাবিক'—এর নাম জানা গেছে।[১৯] তিনি রক্তমৃত্তিকার (মুর্শিদাবাদ জেলার) অধিবাসী ছিলেন।[২০] সম্ভবত যে অর্থে ইংরেজী ভাষায় **Captain** শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেই অর্থে মহানাবিক অভিধাটি ব্যবহার করা হয়েছে।[২১]

অশীন দাশগুপ্ত লিখেছেন, "সমুদ্রের কোনো ইতিহাস নেই, কোনো ইতিহাস থাকতে পারে না। মহাদেশগুলিরও ইতিহাস নেই। ইতিহাস মানুষের। সমাজবদ্ধ মানুষের। ... (তবে) সমুদ্র বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সেতু বন্ধন করেছে।"[২২] প্রাচীন বাংলার বাণিজ্য ও বন্দরের ইতিহাসে বঙ্গোপসাগর এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের মতো প্রাচীন বাংলার বন্দরগুলিও ছিলো নদী বন্দর। প্রাচীন বাংলায় সামুদ্রিক বাণিজ্যেব প্রধান বন্দর ছিলো গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি।[২৩] তাম্রলিপ্তি ভাগীরথীর তৎকালীন মোহনার অনেকটা নিকটে অবস্থিত ছিলো।

'পেরিপ্লাস' **(Periplus Maris Erythraei)** গ্রন্থের রচয়িতা সম্ভবত দক্ষিণ মিশরের বেবেনিস নামক স্থানের একজন গ্রীক নাবিক।[২৪] খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের শেষার্ধে বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি কয়েকবার ভারতে এসেছিলেন।[২৫] পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাটের উপকূলভাগ ধরে অগ্রসর হয়ে তিনি বঙ্গোপসাগরে পৌঁছান। দাশারিণ অর্থাৎ উড়িষ্যার পর ডানদিকে বঙ্গোপসাগর ও বাঁদিকে বর্তমান সুন্দরবনের উপকূলভাগকে রেখে পূর্ব দিকে যাবার সময় শতমুখী গঙ্গার প্রধান মুখে তিনি গঙ্গে নগর প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[২৬]

অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক লিখেছেন, "এখানেই ভারতের বৃহত্তম নদী 'গঙ্গা' সাগরে পড়েছে। নীলনদের মতো এর জলও বাড়ে কমে। নদীর তীরে একটি হাট-শহর বা গঞ্জ আছে যার নাম 'গঙ্গে' বা 'গঙ্গ'। এখানে ব্যাপকভাবে কেনাকেটা চলে—তেজপাতা, সুগন্ধি গাঙ্গেয় অঞ্জন তৈল, প্রবাল ও মুক্তা এবং সব থেকে উৎকৃষ্ট জাতের মসলিন, যার নাম 'গাঙ্গেয় মসলিন'। শোনা যায়, এখানে একটি সোনার খনি আছে। এখানকার প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার নাম ক্যালটিস।"[২৮]

গ্রীক ভৌগোলিক, গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ টলেমি ক্লডিয়াস (খ্রীঃ, ১৩৯—১৬১) তাঁর 'ইণ্ডিয়া, ইনট্রা গাঙ্গেম্" অর্থাৎ 'আন্তর্গাঙ্গেয় ভারত' নামক বিবরণী ও মানচিত্রে নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় 'গঙ্গে' নামক রাজ্য ও বন্দরের সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।[২৯] পেরিপ্লাসের বিবরণের সঙ্গে টলেমির বিবরণের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়।

ভারতীয় সাহিত্যে গঙ্গাতীরবাসী গাঙ্গ বা গাঙ্গেয় নামক কোন জাতির উল্লেখ দেখা যায় না।[৩০] বোঝা যায় ভারতীয়দের কাছে এই জাতি অন্য কোনো নামে পরিচিত ছিল।[৩১]

দীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেন, "খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত টলেমি (Ptolemy)-র ভূগোলে স্পষ্ট বলা আছে যে, গঙ্গানদীর পাঁচটি মোহনার দ্বারা বিধৌত দেশে অর্থাৎ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে Gangarid জাতি বাস করত। আবার চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশ' (৪/৩৬)-এ ঠিক ঐ জনপদে বঙ্গজাতির বাসস্থান নির্দেশ করেছেন।"[৩২] দক্ষিণবঙ্গে বঙ্গোপসাগরবক্ষে নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকার বদ্বীপসমূহ প্রাচীনকালে অরণ্যপ্রকৃতি ও জনসম্পদে সমৃদ্ধ ছিলো। শিরা-উপশিরার মতো নদনদী ও খাল—নালাগুলিতে মিঠা জলের স্রোত ছিল অব্যাহত। তাই অঞ্চলটি ছিলো উর্বর। স্থানীয় অধিবাসীরা ছিল জলযান নির্মাণে পটু, নৌ বিদ্যায় পারদর্শী ও নৌ বলে বলীয়ান। খনিজ সম্পদ ও নানা কারিগরি শিল্পও ছিল উন্নতির সহায়ক। স্বাভাবিক কারণেই গঙ্গা বা গঙ্গে বন্দর বর্তমান ২৪-পরগণা জেলারই কোথাও গড়ে উঠেছিল। দীনেশচন্দ্র সরকার একসময়ে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, গঙ্গা নগর বা বন্দর গড়ে উঠেছিল গঙ্গাসাগর অঞ্চলে।[৩৩] কিন্তু পরবর্তীকালে নতুন নানা প্রত্ন নিদর্শন আবিষ্কারের আলোকে তাঁর ধারণার পরিবর্তন ঘটে। তাঁর পরিবর্তিত মত : "গঙ্গার বিভিন্ন মোহনার তীরে আরও কতকগুলি নগর-বন্দরের অস্তিত্ব নবাবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাই এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন। টলেমি (Ptolemy)-র ভূগোল থেকে এই সমস্যার সমাধান হয় না।"[৩৪]

যশোহর-খুলনার ইতিহাস (১ম খণ্ড) গ্রন্থের রচয়িতা সতীশচন্দ্র মিত্র অনুমান করেছিলেন, বর্তমান উত্তর ২৪-পরগণা জেলার দ্বিগঙ্গা বা দেগঙ্গাই হলো গঙ্গারেজিয়া বা গঙ্গাবন্দর।[৩৫] দেগঙ্গা বা দ্বিগঙ্গা শব্দটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : "সম্ভবতঃ উহা দেবগঙ্গা, দ্বীপগঙ্গা বা দীর্ঘগঙ্গা এইরূপ কোনও শব্দের অপভ্রংশ। প্রকাণ্ড দীঘি এবং বহুদূরবিস্তৃত ভগ্নস্তূপমালা এখনও এস্থানের প্রাচীনত্বের পরিচয় দিতেছে। ইহারই নিকটে দেউলিয়ার চন্দ্রকেতু প্রভৃতি প্রাচীন রাজার কীর্তিস্থান।"[৩৬] দেবপ্রসাদ ঘোষ সতীশচন্দ্র মিত্রের অভিমতকে সমর্থন করেছেন।[৩৭]

চন্দ্রকেতুগড়ে পরীক্ষামূলক উৎখননের (১৯৫৭ খ্রী.) পরিচালক কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী লিখেছেন, "দেগঙ্গা নাম থেকে মনে হয় পূর্বে গঙ্গার সঙ্গে এর সম্বন্ধ ছিল। দেগঙ্গা শব্দ দ্বারা সম্ভবত দেবীগঙ্গা অথবা দ্বিগঙ্গা অর্থাৎ গঙ্গা নদীর দ্বিতীয় শাখা বোঝাবার উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান চন্দ্রকেতুগড়, বোধহয়, খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পেরিপ্লাস (Periplus) বর্ণিত গাঙ্গে নামক বন্দর এবং খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি (Ptolemy) উল্লিখিত গঙ্গারিদয় নামক স্থান। এক্ষেত্রে দেগঙ্গাকে প্রাচীন গাঙ্গে কিংবা গঙ্গারিদয় বলে ধরে নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ এস্থানে সেরকম কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। পক্ষান্তরে খননের দ্বারা যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হতে গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত দেশ বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে চন্দ্রকেতুগড়ই উপকূলবর্তী একটি উন্নত প্রধান নগর ছিল।"[৩৮]

সাম্প্রতিককালে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, বর্তমান বারাসত অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার (ভাগীরথীর) এক অধুনালুপ্ত শাখার উপর ছিল প্রাচীন গাঙ্গেস্ বা গঙ্গে

অর্থাৎ গঙ্গা নামের শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র এবং স্থানীয় রাজ্যের রাজধানী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে প্রস্তুত রেণেল (Renell) এর এক মানচিত্রে দেখা যায় যে যবুনা (যমুনা) নামে এক নদী র ধারা হুগলী বা ভাগীরথীর পূর্ব দিক থেকে বেরিয়ে ইচ্ছামতীতে পড়েছে। পরে আবার নিচের দিকে ঐ নদী যমুনা নামে প্রবাহিত হয়ে রায়মঙ্গল নদী বা খাঁড়িতে পড়েছে। যা মিশেছে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে। এই যবুনা বা যমুনা গঙ্গার (ভাগীরথীর) এক প্রাচীন শাখা। এরই উপরে ছিল গঙ্গা নামে বাণিজ্য-কেন্দ্র যার নাম আজও খুঁজে পাওয়া যায় বর্তমান বারাসতের নিকটবর্তী দেগঙ্গা নামের মধ্যে। গঙ্গার দ্বিতীয় শাখার আবির্ভাব ও তার প্রত্যাবর্তন নিয়ে প্রচলিত কিংবদন্তী ও দেগঙ্গা নামকরণ বাস্তবিকই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; এই কিংবদন্তী ও নামকরণের মধ্যে লুকিয়ে আছে গঙ্গা বন্দরকে সনাক্ত করার একটি মূল্যবান চাবিকাঠি।

চন্দ্রকেতুগড় এবং গঙ্গারেজিয়া বা গঙ্গাবন্দর যে এক ও অভিন্ন তা প্রমাণ করার মতো নামাঙ্কিত কোনো শীলমোহর, অভিলেখ বা অন্য কোনো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবশ্য আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। চন্দ্রকেতুগড় একটি অর্বাচীন নাম, এর প্রকৃত ও প্রাচীন নাম আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তবে ধ্রুপদী গ্রীক ও রোমান লেখকদের বিবরণ, প্রাচীন চীনা গ্রন্থে উল্লেখ, মহাকবি কালিদাস কৃত রঘুবংশের সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত মূল্যবান কাব্যিক কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যে উদ্ভাসিত বর্ণনা, সর্বোপরি চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিষ্কৃত অসংখ্য, বিচিত্র ও অতি গুরুত্বপূর্ণ যে-সব পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন বিগত কয়েক দশকে আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে চন্দ্রকেতুগড় ছাড়া দক্ষিণবঙ্গের আর কোনো প্রত্নস্থলেই গঙ্গাবন্দর হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করা যায় না।

চন্দ্রকেতুগড়ের প্রত্নক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ। বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে এর কালগত অবস্থান মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণ ও গুপ্ত শাসনকাল জুড়ে। বন্দর রূপে তার স্বর্ণযুগ ছিল কুষাণ ও গুপ্ত শাসন পর্ব। বাস্তবিকই পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্রটির নাম চন্দ্রকেতুগড়। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নদী গঙ্গার সমুদ্রসন্নিহিত অঞ্চলের আশ্রয়ে প্রাচীনকালে পূর্ব ভারতে দুটি আন্তর্জাতিক বন্দর গড়ে ওঠে। এর একটি তাম্রলিপ্ত। অপর বন্দরটি চন্দ্রকেতুগড়।

ভৌগোলিক পরিবেশ, বিশেষত নদী-সংস্থানে, ব্যাপক ও অবিশ্বাস্য পরিবর্তন, আধুনিক নগরায়ণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রাচীন কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরী তার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। চন্দ্রকেতুগড় আজ সত্যি এক বিলুপ্ত বন্দর। তথাপি এই অতি প্রাচীন বন্দরের ইতিহাস পুনরুদ্ধার কঠিন হলেও, অসম্ভব নয়।

বহু শতাব্দীর ক্রমাগত অভিঘাত ও তার ফলে বিরাট পরিবর্তন সত্ত্বেও বন্দর রূপে এর পরিচয় আজও নির্ভুলভাবে খুঁজে পাওয়া যায় তার ভৌগোলিক সংস্থান ও অসংখ্য প্রত্ন অভিজ্ঞানের মধ্যে।

চন্দ্রকেতুগড়ের অবস্থান ছিল পদ্দা বা পদ্মা (উত্তর ২৪ পরগণা জেলার একটি নদী, বিখ্যাত পদ্মা নদী থেকে স্বতন্ত্র) এবং বিদ্যাধরীর মাঝখানে। বর্তমানে বিদ্যাধরী প্রত্নস্থলটির প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে পশ্চিম থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। আর প্রাচীন

স্থানটি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে উত্তর থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত পদ্মা। অতীতে পদ্মা প্রবল ও নাব্য ছিল, কিন্তু বর্তমানে শুস্ক। জীবনপুরের কাছে তার প্রশস্ত খাত এখনো দর্শককে বিস্মিত ও বিষণ্ণ করে।

পদ্মা ও বিদ্যাধরী ছাড়া আর একটি লুপ্ত নদীখাত শুষ্ক জলাশয়ের মতো বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায় চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রায় নয়/দশ কিলোমিটার দূরে দেগঙ্গা নামক স্থানে। এই নদী রেখা থেকে মনে হয় অতীতে দেগঙ্গা ও চন্দ্রকেতুগড়ের পাশ দিয়ে এক প্রবল নদীস্রোত বহমান ছিল। সম্ভবত এই নদী -রেখাটিই ছিল গঙ্গার দ্বিতীয় শাখা যা থেকে দেগঙ্গা নামকরণ ও গঙ্গা সম্পর্কে স্থানীয় একটি প্রচলিত কিংবদন্তীর উৎপত্তি। বন্দররূপে চন্দ্রকেতুগড়ের ভূমিকা বহুকাল আগেই শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আজও যেন পড়ে আছে তার পরিত্যক্ত, বিলুপ্তপ্রায় প্রেক্ষামঞ্চ।

বন্দর চন্দ্রকেতুগড়ের স্মৃতি সংরক্ষিত রয়েছে অসংখ্য, বিচিত্র প্রত্ন-নিদর্শন—মৃৎপাত্র, শীলমোহর, মুদ্রা, মাল্যদানা, ও গজদন্ত শিল্পে।

(১) মৃৎপাত্র—পিটার ক্রেটন মন্তব্য করেছেন, কাল নির্ণয় ও অর্থনৈতিক ইতিহাস উদ্ধারের কাজে মৃৎপাত্র পুরাতাত্ত্বিকের একটি অপরিহার্য অবলম্বন।

দ্রা। ক্ষার দেশ ইতালী আর খেজুরের দেশ আরব থেকে ভারতে উৎকৃষ্ট সুরা আমদানী করা হতো। পেরিপ্লাস গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। সুরা ছিল রোমক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। আবার এই বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল এক ধরণের বিশেষ মৃৎপাত্র বা ভাণ্ড যাতে করে জাহাজে সুরা চালান দেওয়া হতো। রোমক এই সুরাভাণ্ডটি পুরাতত্ত্বের ভাষায় অ্যাম্পোরা নামে পরিচিত। এই ধরণের পাত্র চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত রোমকদেশীয় রুলেটেড (কুন্ডলীকৃত নকসা) মৃৎপাত্রের আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ। ভারতেও অনুরূপ পাত্র নির্মিত হয়েছিল। এই নিদর্শন ভারতের মৃৎশিল্পে রোমক সংস্কৃতির প্রভাব সূচনা করে।

চন্দ্রকেতুগড় থেকে রুলেট মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। উত্তর ভারতীয় কালো পালিশ করা তৈজসপত্র ও তার ভগ্নাংশ (Northern Black Pottery) এবং কুষাণ যুগের ব্রাহ্মী-খরোস্টী লিপি সম্বলিত মৃন্ময় পাত্র। চন্দ্রকেতুগড়ে নির্মিত এক শ্রেণীর মৃৎপাত্র ও প্রদীপ উন্নত মানের শিল্প-পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এগুলি অবশ্যই ছিল মহার্ঘ বিলাস সামগ্রী, উচ্চবিত্ত শ্রেণী ও বিদেশীদের কাছে সমাদৃত। কতগুলি পাত্রের গায়ে সমুদ্রমন্থন ইত্যাদি পৌরাণিক চিত্র, শ্রেণীবদ্ধ অশ্ব, সামুদ্রিক জলজন্তু প্রভৃতির চিত্র উৎকীর্ণ। চন্দ্রকেতুগড় বন্দরের অন্যতম রপ্তানী দ্রব্য ছিল মৃন্ময় পাত্র। কিছু কিছু পাত্রের গায়ে কারিগরের নাম পাওয়া যায়। যেরকম অসংখ্য মৃন্ময় পাত্র এই প্রত্নস্থল থেকে পাওয়া গেছে তাতে সন্দেহ থাকে না, কী ব্যাপক ভাবে মৃৎপাত্র তৈরি করা হতো। বাণিজ্যিক চাহিদাই ছিল এই ব্যাপক উৎপাদনের কারণ।

হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত শীলমোহর ও চিত্রে দাঁড়ি, মাঝি, পাল ও মাস্তুলওয়ালা জলযানের প্রতিকৃতি দেখা যায়। এই ধরণের জলযানের সাহায্যে

সিন্ধুতীরের অধিবাসীগণ দেশবিদেশে যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল।

বণিক, রপ্তানী দ্রব্য, বাণিজ্য পোত ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন বাংলা তথা ভারতের এ যাবৎকাল অজ্ঞাত এক অধ্যায়ের উপরে প্রখর আলোকপাত করেছে চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত, খরোস্টী-ব্রাহ্মী লিপি ও প্রাসঙ্গিক চিত্র সম্বলিত বেশ কিছু সংখ্যক মৃন্ময় শীলমোহর।[৫৬]

মাটির পাত্র, ফলক ও নাম-মুদ্রার গায়ে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা গেছে, খ্রীস্টীয় প্রথম কয়েক শতকে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ থেকে এক বা একাধিক সম্প্রদায় বর্তমান উত্তর ২৪-পরগণা জেলায় চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।[৫৭] বাণিজ্যিক কারণেই তারা এখানে এসেছিল। এদের অনেকে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মালিকানা লাভ করে এবং শস্য, মৃৎপাত্র ও ঘোড়ার বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয়।[৫৮] এঁদের মধ্যে কয়েকজন এই অঞ্চলে রাজক্ষমতাও আয়ত্ত্ব করেছিলেন।[৫৯] লিপি থেকে তাঁদের নাম জানা গেছে। এই সময় উত্তর-পশ্চিম সহ ভারতের এক বিশাল অংশের ওপর ছিল ইউয়েচ্-চি বা কুষাণদের আধিপত্য। লেখগুলির কয়েকটি নামে ইরাণীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একটি নাম মুদ্রায় দেখা যায় শক বা কুষাণদের মতো কোট ও পাজামা পরিহিত লরপোতা নামে এক রাজার মূর্তি ও তার পাশে হেলেনীয় পোশাক পরিহিত এক দেবী মূর্তি।[৬০] চন্দ্রকেতুগড়ের বেশ কিছু সীলমোহরে প্রদর্শিত নারী বা দেবী মূর্তিতে এবং মৃন্ময় মূর্তিতে যে গ্রিক ও রোমক প্রভাব বা গান্ধার শিল্পের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা সম্ভবত শক-কুষাণদের মাধ্যমেই সঞ্চারিত হয়েছিল। একটি শ্মশ্রুমণ্ডিত টেরাকোটা মূর্তি স্পষ্টতই ইরাণীয়।[৬১] বণিকের নাম-মুদ্রা, বিক্রয় ও অনুমতিপত্র, বণিক সম্প্রদায়ের নাম-মুদ্রা, বাণিজ্যে লিপ্ত কয়েকজন রাজার নাম, সামুদ্রিক আপদ-বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য রক্ষাকবচ, প্রধান দুটি রপ্তানীদ্রব্য ঘোড়া ও ধানের ছবি এবং সমুদ্রগামী জলযানের ছবি সম্বলিত শীলমোহর বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে চন্দ্রকেতুগড়ের পরিচয় ও ভূমিকা সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়া ভারতে জন্মাত না। মধ্য যুগেও নয়। বাইরে থেকে ভারতে ঘোড়া আমদানী করতে হতো। অর্থশাস্ত্র অনুসারে কম্বোজ সিন্ধু, আরট্ট এবং বনায়ু (আরব দেশ), বলহীক (ব্যাকট্রিয়া) ইত্যাদি অঞ্চলে উৎকৃষ্ট ঘোড়া পাওয়া যেতো।[৬২] মধ্য এশিয়ার তা-য়ুয়ান বা ফরগনা রাজ্য ছিল ঘোড়ার জন্মস্থান রূপে প্রসিদ্ধ।[৬৩] এখান থেকে বিভিন্ন দেশে ঘোড়া রপ্তানী করা হতো। ভারত ছিল এই দেশগুলির একটি।

হস্তী ও অশ্ব ছিল রাজকীয় মর্যাদার প্রতীক। যুদ্ধ, শোভাযাত্রা, রাজা, রাণী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাহন রূপে বিদেশী ঘোড়ার বিশেষ চাহিদা ছিল। উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে ঘোড়া নিয়ে আসা হতো নিম্ন বঙ্গে। এখানে ঘোড়াগুলিকে প্রয়োজনীয় কায়দা কানুন শেখানো হতো ও জাহাজে ক'রে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চালান দে'য়া হতো। এই ব্যবসা ছিল অত্যন্ত লাভজনক। চীনা গ্রন্থ ও চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত কয়েকটি শীলমোহরের ব্রাহ্মী-খরোস্টী লিপি থেকে এইসব অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য জানা গেছে।[৬৪] রোমিলা থাপারও জানিয়েছেন. "সাধারণত জাহাজে চাপিয়েই ঘোড়া আমদানীর রীতি ছিল" এবং "ভারতে আমদানীর মধ্যে সব থেকে দামী জিনিস ছিল ঘোড়া।"[৬৫]

গাঙ্গেয় বঙ্গভূমির দান ধান ছিল কুষাণ আমলে চন্দ্রকেতুগড় বন্দরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানী দ্রব্য। কাছাকাছি অঞ্চলে তো বটেই, বহু দূর দেশেও শস্য রপ্তানী করা হতো। একটি নাম মুদ্রায় দেখা যায় মাস্তুলসমেত একটি জাহাজের ও পাশে সবৃন্ত ধানের ছবি। মুদ্রাটিতে খরোস্টী-ব্রাহ্মী লিপিতে জিধএধন (জিতএধন) বা খাদ্য ধনজয়ী (অর্থাৎ খাদ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ধনী) জুশত্র (যশোদহ) নামে এক ব্যক্তির বিদেশযাত্রার উল্লেখ। নাম-মুদ্রাটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহে রক্ষিত।[৬৭]

অন্য একটি নাম-মুদ্রায় দেখা যায় শস্যের গাছ ভর্তি ঝুড়িসমেত জলযানের ছবি। মুদ্রার খরোস্টী-ব্রাহ্মী লেখ থেকে জানা যায় দিজম্ম নামে এক ধনীর জাহাজের নাম ছিল 'জলধি-শক্র' বা সমুদ্রের ইন্দ্র।[৬৮]

সমুদ্রগামী এক শ্রেণীর জাহাজের নাম ছিল ত্রপ্যগ। একটি নাম-মুদ্রায় মাস্তুলসমেত এই শ্রেণীর জাহাজের ছবি উৎকীর্ণ। মুদ্রার খরোস্টী ব্রাহ্মী-লিপি থেকে জানা যাচ্ছে, এই ত্রপ্যগ (জাহাজ) টঙ্কোরাও নামে এক ধনী পরিবারের সম্পত্তি। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে রচিত পেরিপ্লাস তেস ইরিথ্রাস থালাস্‌সেস গ্রন্থে যে সমুদ্রগামী ভারতীয় জাহাজকে ত্রপ্পগ ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে নাম-মুদ্রায় উৎকীর্ণ জলযানটি সেই শ্রেণীর একটি উদাহরণ।[৬৯]

শিল্পের জগতে প্রাচীন রোমের একটি বিশিষ্ট অবদান বাস্তবানুগ প্রতিকৃতি নির্মাণ।[৭০] বিখ্যাত বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে মোমের সাহায্যে তাঁর মুখের আদল ধরে রাখার চেষ্টা থেকে এই শিল্পের জন্ম।[৭১] আবক্ষ মূর্তি রোমক শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রথম দিকে সম্রাট ও রাজনীতিকদের মূর্তি তৈরী হলেও পরে সাধারণ নর নারী, এমন কি একজন মুচির' আবক্ষ মূর্তি নির্মিত হয়।[৭২]

রোম-ভারত বাণিজ্য-সূত্রে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে এই ধরণের রোমক আবক্ষ মূর্তি (portrait-heads) আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ১৯৯৮ সালের ১২ই মার্চ তারিখে বর্তমান লেখক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা কৃষ্ণকুমারীর বক্তৃতা থেকে তিনি জানতে পারেন অন্ধ্র প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চল থেকে রোমান প্রতিকৃতি মস্তক পাওয়া গেছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা যায় এই নিদর্শন পাওয়া গেছে নাগার্জুনকোন্ডা (গুন্টুর জেলা), ইয়েলেস্বরম (নলগোন্ডা জেলা), কোন্ডাপুর, পেড্ডাবানকু, ইত্যাদি প্রত্নস্থল থেকে।

বর্তমান লেখক চন্দ্রকেতুগড় থেকে রোমান রমণীর একটি আবক্ষ মূর্তি (টেরাকোটা, গোলাকার বা ইন দি রাওন্ড, ৩ ইঞ্চি × ১ ১/২ ইঞ্চি) সংগ্রহ করেছেন।[৭৩] রোম-ভারত বাণিজ্যে দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলির মতো চন্দ্রকেতুগড়ের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই মত ব্যক্ত করেছেন। কারণ এখানে কোনো রোমান মুদ্রা পাওয়া যায় নি। কিন্তু রোমের সঙ্গে চন্দ্রকেতুগড়ের যে অন্তত পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র আবক্ষ মূর্তিটি তার নির্ভুল প্রমাণ।

সভ্যতা ও বাণিজ্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ লিপি ও মুদ্রা। দুয়েরই প্রচুর নিদর্শন চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া গেছে। এখানে পাওয়া গেছে তামা ও রূপার তৈরী ঢালাই পেটাই মুদ্রা, যে মুদ্রা পুরাণ, ধরণ বা কার্ষাপণ নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান লেখক এখান

থেকে আবিষ্কার করেছেন মৌর্য যুগের একটি দুষ্প্রাপ্য রৌপ্য মুদ্রা, কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের স্বর্ণ মুদ্রা এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের তীরন্দাজ মূর্তি সম্বলিত স্বর্ণ মুদ্রা। এখান থেকে পাওয়া গেছে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর বিবাহের দৃশ্য সম্বলিত একটি দুষ্প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রচারিত আরো দুটি স্বর্ণমুদ্রা (আর্চার টাইপ) হাদিপুরের একটি পুষ্করিণী থেকে পাওয়া যায়। মুদ্রা দুটি বর্তমানে আশুতোষ মিউজিয়ামের সংগ্রহে রক্ষিত। উল্লিখিত মুদ্রাগুলি মৌর্য যুগ থেকে গুপ্তকাল পর্যন্ত চন্দ্রকেতুগড়ের ধারাবাহিক বাণিজ্যিক তৎপরতার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিষ্কৃত টেরাকোটা শীলমোহর বা নাম-মুদ্রাতেই যে কেবল সমুদ্রগামী জাহাজের ছবি পাওয়া গেছে তা নয়। জাহাজের ছবি পাওয়া গেছে এই প্রত্নস্থলটি থেকে আবিষ্কৃত এক শ্রেণীর দুষ্প্রাপ্য বিলিয়ন মুদ্রায়। প্রধানত গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকেই বিলিয়ন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন মাল্যদানা বা পুঁতি (beads)। অপেক্ষাকৃত কম দামী পাথর দিয়ে মাল্যদানা তৈরী করা হতো। চন্দ্রকেতুগড়, বিশেষত গাছতলা থেকে, নানা ধরণের পাথর বা পুঁতি পাওয়া গেছে। যেমন কার্ণেলিয়ান, জ্যাসপার, ক্রীস্টাল, ফিরোজা, এমেথিস্ট, অ্যাগেট বা অকীক ইত্যাদি। এই পাথরগুলির বেশ কিছুরই উৎস ছিল দূরবর্তী দেশ। রোমানদের কাছে কার্ণেলিয়ানের বিশেষ সমাদর ছিল। চন্দ্রকেতুগড়ে অবশ্য এ্যাগেট বা অকীক পাথরেরই প্রাধান্য দেখা যায়। বর্তমান লেখক এই প্রত্নস্থলটি থেকে সংগ্রহ করেছেন অ্যামার বা তৈলস্ফটিকের একটি পুঁতি। এই নিদর্শনটি কেবল দুর্লভ নয়; সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটি সুনিশ্চিত নিদর্শন।

প্রাচীন রোমের অর্থনীতিতে জাহাজ ও বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। প্রতি বছর মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া থেকে রোমের বন্দর ওস্টিয়াতে উপনীত হতো শস্যবাহী নৌ-বহর। স্বাভাবিক কারণেই রোমক ভাস্কর্যে দেখা যায় জাহাজ ও বন্দরের ছবি। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের একটি দ্বি-মাত্রিক ভাস্কর্যে (relief) ওস্টিয়ার (Ostia) ব্যস্ত পোতাশ্রয়ের চমৎকার ও বিশদভাবে প্রদর্শিত চিত্র দেখা যায়। এই পোতাশ্রয় নির্মাণের কাজ শুরু হয় ক্লডিয়াসের সময়, আর শেষ হয়েছিল নীরোর সময়। নীরোর একটি মুদ্রায়ও এই পোতাশ্রয়ের ছবি উৎকীর্ণ। আলোচ্য ভাস্কর্য-চিত্রে দেখা যায় একটি বিশাল বাণিজ্য-জাহাজ পোতাশ্রয়ে এসে ভিড়েছে। জাহাজের পালে দুটি শাবক সহ দুটি নেকড়ে বাঘের ছবি। জাহাজের পাটাতনে দাঁড়িয়ে কিছু লোক হৈ-চৈ করছে। একজন কাঠ-মিস্ত্রি এক টুকরো কাঠের ওপর যন্ত্র (adze) চালাচ্ছে। পেছনে দেখা যাচ্ছে ত্রি-তল একটি বাতিঘর (pharos)। তার উর্ধমুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা। সম্ভবত আলেকজান্ড্রিয়ার বিখ্যাত বাতিঘরের আদলে রূপায়িত। পাশেই আরেকটি (ভগ্ন) জাহাজের গায়ে একটি বিশাল চঞ্চু, সম্ভবত বিপদভঞ্জন একটি প্রতীক। কিছু লোক দড়িদড়া বেয়ে উঠছে। বড়ো-বড়ো বস্তা নামাতে গিয়ে কিছু লোক ন্যুব্জপ্রায়। আশে পাশে চারদিকে বিভিন্ন রোমক দেব-দেবী। একটি অংশে দেখা যাচ্ছে হস্তীযূথ (Quadriga চার)—সম্রাটের দেবত্বের প্রতীক। চিত্রের সর্বদক্ষিণে নগ্ন দেহী, ত্রিশূলধারী রোমক সমুদ্র-দেবতা

নেপচুন সমগ্র দৃশ্যটি প্রসন্ন চোখে অবলোকন করছেন। এই অপূর্ব ভাস্কর্য-দৃশ্যটি বর্তমানে রোমের গালেরিয়া টরলোনাতে সংরক্ষিত।[৮]

চন্দ্রকেতুগড়ের শিল্পীরা ছিলেন বাস্তব পরিবেশ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। চন্দ্রকেতুগড়ের অর্থনীতিতে ছিল সমুদ্রগামী জলযান ও বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত বিভিন্ন নাম-মুদ্রা ও মুদ্রার গায়ে উৎকীর্ণ জাহাজের ছবি। চন্দ্রকেতুগড় যে অবশ্যই একটি বন্দর ছিল তারও অভ্রান্ত প্রমাণ, সচিত্র দলিল, স্থানীয় শিল্পী অন্যভাবে রেখে গেছেন। পোতাশ্রয়ের দৃশ্য সম্বলিত একটি মৃন্ময় শীলমোহর পাওয়া গেছে।[৮] বর্তমান লেখক এই প্রাচীন স্থানটি থেকে উদ্ধার করেছেন একটি আয়তাকার ফলক (টেরাকোটা)। ফলকটিতে একটি বন্দর বা পোতাশ্রয়ের দৃশ্য দক্ষতা ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে রূপায়িত। জলযান ভিড়ে আছে; মালপত্র ওজন করা হচ্ছে—এক কথায়, বাণিজ্যিক ক্রিয়া-কান্ড ব্যস্ততার সঙ্গে চলেছে।[৮] বর্তমানকালে বহু গবেষক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন; এমন চরম মতও দিয়েছেন যে চন্দ্রকেতুগড় আদৌ কোনো বন্দর ছিল না। কিন্তু এঁরা যে ভ্রান্ত মত ব্যক্ত করেছেন তা প্রমাণ করেছে এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্ন-নিদর্শন। বন্দরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সব সন্দেহ ও বিতর্কের ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছে উল্লিখিত শীলমোহর ও মৃন্ময় ফলকটি। রোমক ভাস্কর্যের পোতাশ্রয়-দৃশ্যের সঙ্গে অবশ্য এই ফলকটির তুলনা করা চলেনা। রোমক শিল্পের মাধ্যম মূল্যবান প্রস্তর এবং তার পৃষ্ঠপোষক সম্রাট ও শাসকবর্গ। অন্যদিকে, চন্দ্রকেতুগড়ের পোতাশ্রয় বা বন্দরের দৃশ্য একটি ক্ষুদ্র, স্বল্পপরিসর, টেরাকোটা ফলকে রূপায়িত, যা লোকায়ত শিল্পের একটি নমুনা। কিন্তু ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে ফলকটি অদ্বিতীয়। চন্দ্রকেতুগড়ের শিল্পী নিষ্ঠার সঙ্গে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আগামীকালের মানুষের জন্য রেখে গেছেন এক মূল্যবান সমকালীন দলিল—বন্দর চন্দ্রকেতুগড়, তার পোতাশ্রয়ের এক বিশ্বস্ত অনবদ্য চিত্র।

সূত্র নির্দেশ

১। মল্লিক, দেবব্রত, কলকাতা বন্দর, **দেশ**, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ৪৮।

২। উল্লিখিত।

৩। উল্লিখিত।

৪। **ওয়েবস্টার কম্প্রিহেনসিভ ডিক্‌শনারি** (ইন্টারন্যাশনাল এডিশন), ভল্যুম ২, শিকাগো, ১৯৭৭, পৃ. ৯৮৩।

৫। **দেশ**, উল্লিখিত।

৬। সিংহ, অজয় কুমার, **ইন্দো-রোমান ট্রেড**, দিল্লী, ১৯৮৮, পৃ. ২৮-৪০।

৭। জৈন, কে.সি, **প্রি-হিস্ট্রী অ্যান্ড প্রোটো-হিস্ট্রী অব ইন্ডিয়া**, নিউ দিল্লী, পৃ. ১৩০ ; সাংকালিয়া, এইচ ডি ঃ **দি প্রি-হিস্ট্রী অ্যান্ড প্রোটো-হিস্ট্রী অব ইণ্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্থান**, পুণা, ১৯৭৪, পৃ. ৩৭২-৩৭৩।

৮। রাও, এস. আর, **লোথাল**, নিউ দিল্লী, ১৯৮৫, পৃ. ২।

৯। রাও, পৃ. ২৭।

১০। মজুমদার, আর. সি, **ক্লাসিক্যাল অ্যাকাউন্টস অভ ইন্ডিয়া** পৃ. ২৮৮-৩১২।

১১। মজুমদার, পৃ. ৩৫১-৩৮১।

১২। অগ্রওয়াল, আর.এস , **ট্রেড সেন্টারস অ্যান্ড রুটস ইন নর্দার্ণ ইন্ডিয়া**, দিল্লী, পৃ. ১১৪-১৫, ১৬৫।

১৩। ওয়াশিংটন, ই. এইচ , **দ্য কমার্স বিটুইন দ্য রোমান এম্পায়ার অ্যান্ড ইন্ডিয়া**, লন্ডন, ১৯৭৪, পৃ. ১০, ১১৩, ১৮১, ইত্যাদি।

১৪। উল্লিখিত, পৃ. ৭৫, ২৮৯।

১৫। অগ্রওয়াল, পৃ. ১১৬-১৮, ১৬৫।

১৬। ল, বি.সি , **হিস্টোরিক্যাল জিয়োগ্রাফি অভ অ্যানসেন্ট ইন্ডিয়া**, প্যারিস, ১৯৬৮, পৃ. ৩২৭-৩২৮

১৭। মজুমদার, পৃ. ৩০১-৩০৩।

১৮। রায়, নীহাররঞ্জন , বাঙ্গালীর ইতিহাস (১ম খণ্ড) কলকাতা, ১৯৮০, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৯৮।

১৯। সরকার, দীনেশচন্দ্র , **সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ**, কলকাতা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৫।

২০। তদেব।

২১। তদেব।

২২। দাশগুপ্ত, অসীন , বঙ্গোপসাগর, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৯।

২৩। রায়, পৃ. ২০০।

২৪। তদেব।

২৫। মজুমদার, পৃ. ২৮৮।

২৬। উল্লিখিত।

২৭। উল্লিখিত, পৃ. ৩০৮।

২৮। উল্লিখিত।

২৯। মোনাহান. এফ. জে , **দ্য আর্লি হিস্ট্রি অভ বেঙ্গল**, বারাণসী, ১৯৭৪, পৃ. ১৫।

৩০। সরকার, দীনেশচন্দ্র , **পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত**, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৭৬

৩১। তদেব।

৩২। তদেব।

৩৩। সরকার, ডি.সি. , **দি সিটি অভ গঙ্গা**, দি প্রসিডিংস অভ্ দি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী কংগ্রেস, ১৯৪৭।

৩৪। **পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত**, পৃ. ৬১।

৩৫। মিত্র, সতীশচন্দ্র , **যশোহর—খুলনার ইতিহাস** (১ম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৬৩ (৩য় সংস্করণ), পৃ. ১৮১।

৩৬। তদেব।

৩৭। তদেব, পরিশিষ্ট (গ), পৃ. ৪৬৭-৪৬৯।

৩৮। গোস্বামী, কুঞ্জগোবিন্দ , **প্রত্নতীর্থ পরিক্রমা**, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১৪৩।

৩৯। মুখার্জী, বি.এন. , **চন্দ্রকেতুগড়, স্মরণিকা**, সেমিনার, ১৯৯১, তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র, তমলুক।

৪০। উল্লিখিত।

৪১। উল্লিখিত।

৪২। আই. এম. **বুলেটিন**, ১৯৯০, পৃ. ১৭।

৪৩। মৈতে, দিলীপ কুমার (সম্পাদক) , **গড় চন্দ্রকেতুর কথা**, বারাসত, ১৯৭২, পৃ. ২

৪৪। দে, জি. এস. , **চন্দ্রকেতুগড়ের মুদ্রা** (পৃ. ৯১-৯৫) **ইতিহাস অনুসন্ধান** ৪, পৃ. ই. সংসদ, কলকাতা, ১৯৮৯।

৪৫। দে, গৌরীশংকর , চন্দ্রকেতুগড়ের গজদন্ত **শিল্প** (পৃ. ১০৯-১১৩) **ইতিহাস অনুসন্ধান**, ১৩, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৯।

৪৬। ক্রেটন. পিটার , **ট্রেজারস অভ্ অ্যানমোন্ট রোম**, লন্ডন, ১৯৮৬, পৃ. ১৬৮।

৪৭। মজুমদার, পৃ. ৩০৪।

৪৮। উল্লিখিত।

৪৯। ডি. ফিলিপ , **ফোর থাউজেন্ড ইয়ারস আন্ডার দ্য সী**, লন্ডন, ১৯৫৪, পৃ. ৬৪।

৫০। দাশ, সুধীররঞ্জন , **উৎখনন বিজ্ঞান**, কলকাতা পৃ. ১৫৮।

৫১। ঘোষ, দেবপ্রসাদ , **ভারতীয় শিল্পধারা**, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১৪।

৫২। উল্লিখিত।

৫৩। দে, জি.এস , খরোস্টী লিপির আলোকে চন্দ্রকেতুগড় (পৃ. ৯৯-১০৫) **ইতিহাস অনুসন্ধান**-৫, পঃ ইঃ সংসদ, কলকাতা, ১৯৯০।

৫৪। দে, জি.এস , পট্স, পিচারস্ অডান্ড ল্যাম্পস ফ্রম চন্দ্রকেতুগড় ঃ মিথস অ্যান্ড মোটিফস, (পৃ. ৯৩) **জার্নাল অভ বেঙ্গল আর্ট**, ভল্যুম-১, ঢাকা, ১৯৯৬।

৫৫। গোস্বামী, পৃ. ৪২।

৫৬। **ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন**, ভল্যুম XXV, কলকাতা, ১৯৯০।

৫৭। মুখোপাধ্যায় ব্রতীন্দ্রনাথ ঃ ঘোড়ার ব্যাপারী চালের কারবারী, **দেশ**, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ৩৯।

৫৮। উল্লিখিত।

৫৯। উল্লিখিত, পৃ. ৪০।

৬০। উল্লিখিত।

৬১। সংগ্রহ, লেখক।

৬২। মোরল্যান্ড , **ইন্ডিয়া অ্যাট দি ডেথ অভ আকবর**, **দিল্লী**, ১৯৮৭, পৃ. ৭১, ১৮৫।

৬৩। মাইতি. এস. কে , **ইকনমিক লাইফ অভ নর্দার্ন ইন্ডিয়া**, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৯৬; ব্যানার্জী, এস. কের **ইকনমিক লাইফ ইন দি** এপিক, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১১১।

৬৪। **দেশ**, উল্লিখিত, পৃ. ৩৮।

৬৫। উল্লিখিত।

৬৬। থাপার, রোমিলা , **অ্যা হিস্ট্রী অভ ইন্ডিয়া**, মিডলসেক্স, ১৯৭২, পৃ. ২৯৭।

৬৭। দেশ, উল্লিখিত, পৃ. ৪১।

৬৮। উল্লিখিত।

৬৯। উল্লিখিত।

৭০। স্টোবার্ট, জে. সি. , **দ্য স্পেলনডার দ্যাট ওয়াজ রোম**, লন্ডন, ১৯৬১, পৃ. ১৪৩।

৭১। স্টোবার্ট।

৭২। স্টোবার্ট।

৭৩। সংগ্রহ, লেখক।

৭৪। **ইতিহাস অনুসন্দান**—৪।

৭৫। ঘোষ, ডি. পি , পৃ. ১৪।

৭৬ ।সংগ্রহ, লেখক।

৭৭। **ইতিহাস-অনুসন্ধান**—৪।

৭৮। অলচিন, আর অ্যান্ড ব্রিজেট , **দ্য রাইজ অভ সিভিলাইজেসন ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান**, নিউ দিল্লী, ১৯৯৬ ফোর্স্ট সাউথ এসিয়ান এডিসন, পৃ. ১৮৮।

৭৯। সংগ্রহ, লেখক।

৮০। সংগ্রহ, লেখক।

৮১। ক্রেটন, পি, পৃ. ১০৫।

৮২। উল্লিখিত।

৮৩। উল্লিখিত, ১০৬।

৮৪। উল্লিখিত।

৮৫। উল্লিখিত।

৮৬। **পঃ বঃ ডিস্ট্রিক্ট** গেজেটীয়ার ২৪-পরগণা, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৬৮৮।

৮৭। সংগ্রহ, লেখক।

বৈদিক যুগে কালী

সঙ্গীতা চৌধুরী

বৈদিক যুগ ছিল প্রধানতঃ পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তাই প্রত্যক্ষভাবে দেবীপূজার প্রচলন সে যুগে অনেক কম বলেই মনে হয়। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক বৈদিকযুগ পূবর্তন হরপ্পা সভ্যতার ধরণীর, উর্বরতার, শস্যের দেবীদের প্রভাবকে উপেক্ষা করতে পারে নি। ভারতীয় সমাজে দেবীপূজা বহুপূর্বতন এবং সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই এই সমাজে দেবীর প্রভাব রয়েছে। হরপ্পা সভ্যতায় দেবী পূজার প্রচলন ছিল ব্যপক হারে। শক্তিপূজার এই প্রচলন বৈদিক সমাজে একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। সমাজের প্রাত্যহিক জীবন যাপনের মধ্যে মানুষ এত বেশী অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল দেবী পূজায় যে বৈদিক ধার্মিক জীবনকেও এঁরা প্রভাবান্বিত করেছিলেন।

বৈদিক যুগে পূজ্য দেবগণের স্ত্রীরা অর্থাৎ ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রানী, বরুণের স্ত্রী প্রমুখ তাঁদের স্বামীর সঙ্গে পূজিতা হতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, স্বাধীন স্বকীয়তায় বর্তমান দেবীদের সংখ্যা কম হলেও তাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন না বৈদিক সমাজে। শক্তি পূজার প্রচলন প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও পরোক্ষভাবে ছিল।

দেবী কালীর নাম বৈদিক সাহিত্যগুলিতে ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে অবর্তমান। কিন্তু তাঁর চারিত্রিক ও মূর্তিগত বৈশিষ্ট্য বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত বেশ কিছু দেবীর চারিত্রিক ও মূর্তিগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য প্রমাণ করে। এই সকল দেবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল দেবী অদিতি, রাত্রি, নির্‌রতি প্রমুখ।

শক্তিবাদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে যার উল্লেখ বিশদভাবে পরবর্তীকালে পুরাণ ও তন্ত্রেও পাওয়া যায়। এই সূক্ত দেবী সম্বন্ধে আমাদের বিশদ তথ্য প্রদান করে থাকে। উপনিষদ থেকেও বৈদিক যুগে দেবীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়।

দেবী অদিতি বৈদিক যুগের একজন অন্যতমা দেবী, তাঁর উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে প্রায় আশিবার করা হয়েছে, অথচ ঋগ্বেদে তাঁর উদ্দেশ্যে কোন শ্লোক উৎসর্গ করা হয় নি। ইনি সাধারণতঃ পূজিতা হতেন তাঁর ভক্তদের শৃঙ্খল মোচন করার জন্য। তৎকালীন একটি উপকথা অনুযায়ী দক্ষ এবং অদিতি একে অপরের থেকে উদ্ভূত। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক বৈদিক সমাজ দক্ষকেই সৃষ্টির উৎস হিসাবে চিহ্নিত করে, তবে অদিতির সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা স্বীকার করে। পরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন সাহিত্যে অদিতিকে কাল

বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যে কালকে কালীর পূর্বতন রূপ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে' কারণ দেবী অদিতির যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় মহাভারতে বর্ণিত দেবী কালী-রও সেরূপ অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়, এখানে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কাল সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয়েরই কারণ। ইনি ধ্বংসকালে সব নিজের মধ্যে গ্রহণ করেন এবং সৃষ্টিকালে সবকিছুকে ওলট পালট করেন। **কঠোপনিষদে**' অদিতিকে সর্বোদেবতাময়ী বলে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ সকল দেবীর সমাহার যিনি আবার **সারদাতিলক তন্ত্রে** কুন্ডলিনীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্তা। অদিতি আবার ব্রহ্মশক্তি মহাস্বরূপিণী মহাশক্তি হিসাবে পরিগণিতা, যাকে শাক্তরা কালী হিসাবে পূজা করে থাকে। পরবর্তীকালে সাধক রামকৃষ্ণও কালীকে স্বয়ং ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করেছেন। **ঋগ্বেদে**' অদিতিকে মিত্র ও বরুণের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকটিকে ঋষি বশিষ্ঠের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, কালিকাপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণে দেবী বশিষ্ঠের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তা। অদিতি শব্দের অর্থ বন্ধনহীনা, অসীম যা দেবী কালীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। **অথর্ববেদে**' অদিতি রুদ্রর স্ত্রী হিসাবে পরিগণিতা, যে রুদ্র শিব হিসাবে পরিচিত। অদিতির সাথে শিবের এই সম্পর্ক কে আরও স্পষ্ট হয় যেমন দেখা যায় যে, অদিতির পূর্বতন অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেবী কালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। **বাজসনেয়ী সংহিতায়** দেবী অদিতিকে দৈবিশ নবম অর্থাৎ মানবমনের ভবসাগর পার হওয়ার তরী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। **মার্কন্ডেয় চন্ডী**-তে দেবী দুর্গাকেও অশান্ত সাগরে ভেসে থাকা তরীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। **দেবী মাহাত্মর** দৈত্য দমনকাবিণী দেবী চণ্ডী দেবী দুর্গার সমতুল্য। আবার দেবী কালী দেবী দুর্গার থেকেই উদ্ভূত। সুতরাং এক্ষেত্রেও কালীর সাথে অদিতির সাদৃশ্য দেখা যায়।

দেবী রাত্রি যিনি রাত্রের দেবী, ঋগ্বেদে' কেবলমাত্র একটি শ্লোক তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হয়েছে। ইনি দেবী উষার ভগিনী এবং সেই হিসাবে বহুস্থানে বন্দিতা। তিনি কেবল কৃষ্ণবর্ণা হিসাবেই বর্ণিতা হন নি বরং উজ্জ্বল তারকাখচিত রাত্রি হিসাবেও বর্ণিতা এবং বন্দিতা যার আহ্বানে লোক রাত্রে বাড়ি ফিরে আসে। তাঁকে আহ্বান করা হয় চোর, বাঘ, ভাল্লুক এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৃহদ্দেবতায়' তাঁকে সরস্বতী, দুর্গা এবং অদিতির সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। শক্তির পরবর্তী পদক্ষেপে এঁর যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। **স্কন্দপুরাণ**' অনুযায়ী দেবী রাত্রি ব্রহ্মের অনুরোধে দেবী মেনকার গর্ভে প্রবেশ করেন এবং তাঁরই প্রভাবে গর্ভস্থ উমার গায়ের রঙ কালো হয়ে যায়। সুতরাং এই দেবী পরবর্তী পৌরাণিক দেবী কৌশিকী কালী পার্বতী বা অন্যান্য দেবীদের সঙ্গে অভিন্ন হিসাবে পরিগণিতা। অন্যভাবে বলা যায় যে, দেবী কালী প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই **ঋগ্বেদের** সঙ্গে সম্পর্কযুক্তা **ঋগ্বেদের** রাত্রি সূক্ত' থেকে দেবী কালীর সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এই সূত্রটিতে বলা হয়েছে যে, তাঁর অস্তিত্ব সর্বত্র-ই বর্তমান এবং তাঁকে কেবলমাত্র রাত্রে জ্যোৎস্নার আলোতেই দেখা যায়। তিনি শুধুমাত্র পৃথিবীর জন্যে নন, আবহাওয়া ও স্বর্গের জন্য-ও তিনি বন্দিতা। সমস্ত বৃক্ষাদিও তাঁর দ্বারা আবৃত। তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে মানুষ, জীব জানোয়ার তাঁর-ই নির্ভর বাণীতে আশ্বস্ত হয়ে রাত্রে নিদ্রা যায়। এই দেবী মানবজাতিকে শত্রুপক্ষের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য এবং ভবসাগর পার

হওয়ার জন্য বরদান করে থাকেন। পুরাণে[৬] তাঁকে চেতনাময়ী শক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্বেতাশ্বতারা বৈদিক যুগে দেবী কালীর অস্তিত্ব সম্পর্কে মৌলিক তথ্য প্রদান করে। শ্বেতাশ্বতারা হল প্রকৃতি ও যোনির সেই রূপ যা ব্রহ্ম শক্তির স্বচ্ছ রূপ হিসাবে উমা হিমবতীতে বর্তমান। যার উল্লেখ **কঠোপনিষদে** পাওয়া যায়। পরবর্তী ছোট ছোট উপনিষদগুলিতে যেমন **ত্রিপুর তাপিন্যুপোনিষদে** ঐ দেবীর সমগোত্রীয় শ্রী বিদ্যা এবং ত্রিপুরাসুন্দরী সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেয়। এর অনুরূপ বিষয়ের উপর পরবর্তীকালে তন্ত্রে অনেক কাজ হয়েছে। তন্ত্রে ঐ সকল দেবীর সমগোত্রীয়াদের মধ্যে যথাক্রমে শ্রীচক্র, কামকলা, মুদ্রা, কৌল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। শক্তির উৎসর সম্বন্ধে কিছু তথ্য **অথর্ববেদের দেব্যুপোনিষদে** পাওয়া যায়। এই উপনিষদে এমন কিছু সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় যার থেকে শক্তিমূর্তির পূর্বতন ইতিহাস ও তার সম্পর্কিত তথ্য সম্বন্ধে জানা যায়। পরবর্তী বৈদিক যুগের সাহিত্যে তো সরাসরি দুর্গা, কালী, করালী, ভদ্রকালী, কাত্যায়নী, করালী প্রমুখ দেবীদেব নামোল্লেখ পাওয়া যায়, যার থেকে একথা মনে করা অসঙ্গত হবে না যে, এই সব দেবীর উৎসগত মূল সূত্র বৈদিক সাহিত্যে বর্তমান।

দেবী নিররতি অন্যান্য বৈদিক দেবীর মতো শান্ত নন। ঋগ্বেদে তাঁর নামোল্লেখ খুব বেশী না পাওয়া গেলেও যখনই তিনি উল্লিখিত হয়েছেন তখনই মানুষ তাঁর কুপ্রভাব থেকে মুক্তি প্রার্থনা করেছে। তিনি ধ্বংস, মৃত্যু, দুর্ভাগ্য প্রভৃতি কুপ্রভাবের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিতা। **ঋগ্বেদে**[৭] তাঁর উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র একটি-ই শ্লোক উৎসর্গীত হয়েছে। এই শ্লোক থেকেই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। চারটি শ্লোকে যাতে ভগবানের কাছে পুর্নজীবন, সম্পদ, খাদ্য , উজ্জ্বল কর্ম, দীর্ঘ জীবন, যৌবন কামনা করা হয়েছে তার পরবর্তীতেই দেবী নিরংরতি কে দূরবর্তী স্থানে চলে যেতে অনুরোধ করা হয়েছে। দেবী নিররতি ক্রোধ, ভীরুতা, বার্ধক্য, মৃত্যু, অবনতি ও অবক্ষয়ের প্রতীক হিসাবে বর্তমান, তিনি অন্ধ কারাচ্ছন্ন দিকের-ও প্রতীক। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তাঁকে দক্ষিণ-দিশা অর্থাৎ মৃত্যুব দিশায় বসবাসকারী হিসাবে এবং বেদনার প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে যজ্ঞে তাঁব উদ্দেশ্যে যে আহুতি দেওয়া হয় তা তাঁকে মানুষের জীবনযাত্রা থেকে এবং যজ্ঞেব স্থান থেকে দূরীভূত কবার জন্য। তাঁর তমসাচ্ছন্ন রূপের বর্ণনার সঙ্গে দেবী কালীর ঘোর ভয়ঙ্করীরূপের বর্ণনার অভূতপূর্ব সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

দেবী মাহাত্মের প্রধান দেবী **ঋগ্বেদের**[৮] দেবীসূক্তে পূর্বেই বর্ণিতা হয়েছেন, যেখানে তিনি একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য রূপে ভ্রাম্যমানা এবং বরুণ, মিত্র, অগ্নি প্রমুখ দেবীদের ধারণ করে আছেন। তিনি সর্বোচ্চ আত্মা ও ক্ষমতার অধিকারিণী, পৃথিবীর উৎপত্তির কারণ এবং মানবজীবনের সমস্ত ঘটনার কারণ। তাঁর যোনি থেকেই সৃষ্ট পৃথিবী। এই সকল দেবী-ই হল বাকদেবীর প্রধান উৎস। **ঋগ্বেদের** পরবর্তী যুগে এই বাক্‌দেবী হলো সৃষ্টির প্রাথমিক কারণ। পরবর্তী শাক্ত দেবীদের সৃষ্টি রহস্য এঁর মধ্যে নিহিত। তিনি অদ্ভুত, উজ্জ্বল, আশ্চর্যজনক রূপে প্রকাশমানা। তিনি শ্রীনিভালি, রাকা, অনুমতি, কুহু প্রভৃতি দেবী দের-তাঁর মধ্যে গ্রহণ করেন।[৯] সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল দেবী বাক, ভারতী, সরস্বতী ও ইলা এঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ন দেবী। কিন্তু পরবর্তীকালে এঁরা সমগোত্রীয়া দেবী

হিসাবে পরিগণিতা হন। **শতপথ ব্রাহ্মণে** বাক্‌কে সর্পের দেবী হিসাবে ও পরবর্তীকালে দেবী কালী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। **ঐতরেয় ব্রাহ্মণে**[১৩] তাঁকে 'মহানগ্না ভূতয়া' অর্থাৎ নগ্ন দেবী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা দেবীকালীর অন্যতম প্রধান মূর্তিগত বৈশিষ্ট্য। একটি সমসাময়িক উপকথায় তাঁকে ক্রুদ্ধ দেবী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাকের পরবর্তী অংশ হল দেবী সরস্বতী, যার বাহন হল হংস। কিন্তু বৌদ্ধ বাগেশ্বরী ও সরস্বতীর বাহন হল সিংহ। বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতীকে শক্তিশালী দেবী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নদীর দেবী সরস্বতীকে **ঋগ্বেদে** এরূপ বর্ণনা কবা হয়েছে যে. তাঁর ঢেউ বড় বড় পর্বত পর্য্যন্ত ভেঙে দিতে পারে। তাঁকে বেদে অন্যান্য দেবতারও দেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁকে যজ্ঞের দেবীদের সাথেই আহ্বান করা হয়ে থাকত। ইলা, ভারতী প্রমুখ সমগোত্রীয়া দেবীরা তিরস্কৃত দেবগণের ও শব্দের উদ্রেককারী দৈত্য দমনকারিণী হিসাবে পরিগণিতা।

দেবী লক্ষ্মী কিন্তু প্রথম দিকের বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিতা হয় নি। তবে পূর্বতন সাহিত্যে শ্রী কথাটি বহুল প্রচলিত। যদিও দেবী কালী ও শ্রী বা লক্ষ্মী সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর দেবী তথাপি ভদ্রকালী ও লক্ষ্মী একই সঙ্গে **সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে**[১৪] বর্ণিতা হয়েছেন। এখানে বলা হয়েছে যে, আহুতির মাথার দিকটি শ্রীকে এবং পায়েব দিকটা ভদ্রকালীকে উৎসর্গ কবা হয়েছে। **মার্কণ্ডেয় পুরাণে**-র মহালক্ষ্মী একজন ভয়ঙ্করী দেবী যিনি মহিষমর্দিনীর সমতুল্য।

দেবী অম্বিকাকে **বাজসনেয়ী সাংহিতা**[১৫]-তে ও **তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ** এ রুদ্রের ভগিনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে আবার **তৈত্তিরিয় আরণ্যকে** তাঁকে রুদ্রের স্ত্রী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐখানে একটি শ্লোকে দেবী দুর্গাকে অগ্নিবর্ণা বলা হয়েছে। তিনি কঠোর অথচ উজ্জ্বল। আবার বৌদ্ধধর্মের ভয়ঙ্করী দেবী বৈরেচনী যিনি ওখানে অগ্নি বা সূর্যের কন্যা হিসাবে বর্ণিতা, তিনি মানুষের কর্মের ফললাভের জন্য পূজিত হন। অগ্নি আবার **মুণ্ডকোপনিষদে**[১৬] সপ্ত-জিহ্বা বিশিষ্ট বলে বর্ণিত। যেগুলি হল যথাক্রমে বগলী , করালী. মনোজবা, সুলোহিত, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং বিশ্বরুচি। এই প্রথম কালী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি গার্হপ্ত্য, অহবনীয় এবং দক্ষিণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। দক্ষিণ আবার দক্ষিণের অগ্নির সঙ্গে সম্পর্কিত যেখানে আহুতি দেওয়া হয়। দক্ষিণ আবার যমের সঙ্গে সম্পর্কিত যিনি মৃত্যুর দেবতা। এই দক্ষিণাগ্নির সঙ্গে দক্ষিণা কালীর যোগসূত্র নিবিড় যিনি মানুষকে মৃত্যুভয় থেকে উদ্ধার করেন।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা বোধহয় ভুল হবে না যে, বৈদিক যুগের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাবের মাঝে দেবী তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। যদিও এইসব দেবীগণ আপাতদৃষ্টিতে শান্ত স্বভাবের কিন্তু এঁদের তত্ত্বগত ও চরিত্রগত

এমনকি কোন কোন সময় মূর্তিগত বৈশিষ্ট্য ও পরবর্তকালের ভয়ঙ্করী দেবী কালীর সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য ও সম্পর্ক প্রমাণ করে। সুতরাং দেবীকালী ঠিক ঐনামে না হলেও পরোক্ষভাবে যে, সে যুগে অস্তিত্বমানা ছিলেন তা অবশ্যই বলা যেতে পারে।

সূত্র নির্দেশ

১। ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল কোয়ার্টালি, দশম খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩০
২। কঠোপনিষদ-মণ্ডল ২, অধ্যায় ১, শ্লোক ৭
৩। ঋগ্বেদ মণ্ডলী, অধ্যায় ৪০, শ্লোক ৪
৪। অথর্ববেদ সপ্তম খণ্ড, মণ্ডল ৭, অধ্যায় ৬, শ্লোক ২
৫। ঋগ্বেদ দশম খণ্ড, মণ্ডল ১২৭
৬। বৃহদেবতা দ্বিতীয় খণ্ড, শ্লোক ৭৪-৭৭
৭। স্কন্দপুরাণ-মণ্ডল ১৫৪
৮। ঋগ্বেদ-মণ্ডল ১০, অধ্যায় ১২৭ শ্লোক ১-৮
৯। মৎস্যপুরাণ অধ্যায় ১৫৪
১০। ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০, অধ্যায় ৫৯
১১। ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০, অধ্যায় ১২৫
১২। বৃহদেবতা অধ্যায় ২৭৭
১৩। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-মণ্ডল ১, অধ্যায় ৫
১৪। সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র-মণ্ডল ২, অধ্যায় ১৪, শ্লোক ১৪
১৫। বাজসনেয়ী সংহিতা-মণ্ডল ৩, অধ্যায় ৫, শ্লোক ৭
১৬। মুন্ডকোপনিষদ অধ্যায় ১, শ্লোক ২-৪

দেবী দুর্গা : তাঁর উদ্ভব ও অস্তিত্ব

সুমিত বিশ্বাস

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই উপমহাদেশগুলিতে শক্তিপুজোর প্রচলন ছিলো। পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারো নগরে দেবী পুজোর প্রচলন।

বৈদিক যুগে দেবী পুজার প্রচলন সুস্পষ্ট। উষসকান্ড, রাত্রি, অরণ্যানী, অগ্নেয়ি, সরস্বতী, বরুণানী, গৌরী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। সামবেদীয় রাত্রিসুক্তই এই কথা প্রমাণ করে যে শক্তিবাদ বৈদিক যুগে প্রতিষ্ঠিত। দেবী পুরের ঋষি ছিলেন মহর্ষি অস্ভৃণের কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্। এই বাক্ ব্রহ্মাশক্তিকে স্বীয় আত্মার অনুভব করে ঋক্‌মন্ত্রে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনিই সকল দেবতার ধারক পরমাপ্রকৃতি, ব্রহ্মের চালিকা শক্তি। তার মতে তিনি ঃ

"ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত
বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুনোভা বিভম্যহমিন্দ্রাগ্নী
অহমশ্বিনোভা"
(শ্রী শ্রী চন্ডী)

অর্থাৎ আমি একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, এবং বিশ্বদেবতা, আমি মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র অগ্নি, ও দুই যুগল অশ্বিনীকুমারকে ধারণ করি। এই উক্তিই বৈদিক দেবীসুক্ত, সামবেদের কেনোপনিষদ থেকে জানা যায়যে দেবাসুরের সংগ্রামে বিজয়ী দেবগণ বিজয়গৌরবে মত্ত হয়ে ব্রহ্মশক্তির কথা ভুলে যায়। তাঁদের এই মিথ্যাভিমান খন্ডন করতে ব্রহ্ম জ্যোতিপুরুষ বেশে দেবতাদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার কথা জানতে চান। প্রথমে আসেন অগ্নি তার সর্বগ্রাসী পরিচয় নিয়ে। ব্রহ্ম তাকে একখন্ড তৃণকে দহন করতে বলেন, ব্যর্থ হন অগ্নি, এরপর আসেন পবন কিন্তু তার অতুল শক্তি প্রয়োগ করেও সে ওই তৃণখন্ডকে একচুলও নড়াতে পারে না, তখন ইন্দ্র গেলেন সেই শক্তিমান পুরুষের কাছে কিন্তু তিনি তার বদলে সুশোভনা উমা হৈমবতী দেবীকে দেখলেন, ও দেবী তাকে জানালেন যে তিনিই ব্রহ্মের শক্তি ও দেবতাদের জয়ের কারণ।

সংখ্যায়ন গৃহ্যসুত্রে ভদ্রকালি বা ভদ্রকালিকা দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। হিরণ্যকেশী গৃহ্যসুত্রে ভবানীকে যজ্ঞাহুতির ব্যবস্থা ছিলো। শুক্লা যর্জুবেদে বাজসনেয়ী সংহিতার অম্বিকাদেবীকে রুদ্রের বোন বলা হয়েছে, আবার কৃষ্ণ যর্জুবেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে

তিনি রুদ্রের শ্রী বা পত্নী, আবার এই আরণ্যকের যাজ্ঞিকা উপনিষদের দুর্গা গায়ত্রীতে[১] বলা হয়েছে যে—

"কাত্যায়নায় বিমহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি
তন্নোদুর্গিঃ প্রবোয়াৎ"

বেদ ও উপনিষদের পরে পুরাণেও দেবী দুর্গার অস্তিত্ব[২] প্রবল। বিষ্ণুপুরাণ, কালিকা পুরাণ, মাকর্ণ্ডেয় পুরাণ, দেবীপুরাণ,, বামনপুরাণ, ব্রহ্মাবৈবর্তপুরাণাদিতে দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভাগবতপুরামে বলা হযেছে যে অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় ব্রহ্মেরও চালিকা শক্তি বর্তমান তা বিনা ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। যে শক্তির লীলায় ব্রহ্ম উৎপন্নকরেন ত্রিদেবকে, দেবী ভাগবত, মামনপুবাণ (১৮০০/১৯০০) অধ্যায়ে দেবীর সৃষ্টির কাহিনী পাওয়া যায়। দেবীর রহস্য তন্ত্রে তিনি দুর্গা দুর্গমাসুরনাশিনী ·

"তৃমেব চ বধিষ্যামি দুর্গমাস্যঃ মহাসুরাম্।
দুর্গদেবী তি বিশ্বাস্ত তস্মো নমাঃ ভবিষ্যতি।।"[৩]

ব্রহ্মবৈবতর্ত পুবাণে তাকে পরমাপ্রকৃতি বলা হয়েছে (২/৬৬/৭-১০)। বৃহন্নারদীয় পুরানে তিনি বিশ্বপ্রসবিনী। কালিকাপুরাণ, দেবীপুরান, মার্কন্ডেয়পুরান, মৎস্যপুর' বৃহন্নান্দিকেশ্বর, দেবীপুরাণ, মার্কন্ডেয়পুরান, মৎসপুরাণ ও বৃহম্মান্দিকেশ্বর পুরাণে দুর্গাপুজোর প্রচলন পাওয়া যায়। উত্তর সংহিতাব জিংগুলাদ্রীকান্ডে বলা হয়েছে যে বিষ্ণুই দেবী-মহামায়ার রূপে স্বয়ং দৈত্য সংহারকারী। মার্কন্ডের পুরানেব এক বৃহৎ অংশ দুর্গাকে সমর্পির্ত "দেবী মাহাত্ম্য", এর ৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায়ই দেবীর জয়গান। দুর্গাসপ্তমতী ৭০০ মন্ত্রে নিয়ে দেবীর স্তবরাজী এবং দেবী ভাগবতের মন্ত্রের সংখ্যা ১৮০০, বামনপুরাণে দেবী রাম্ভাসুরের পুত্র মহিষাসুরকে কাত্যায়নী রূপে বধ করেন।

মার্কন্ডেয় পুরাণ মতে দেবী প্রায় একাধিক বার দেবতার সাহাযার্থে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। মেধস মুনি, রাজা সুরথকে সেই দেবীর কথা বলেন ও তাকে মহামায়া রূপে স্তব করেন। তিনি বলেন যে মহামায়া বিষ্ণুযোগনিদ্রাধিশ্বরী, প্রলয়কালে (ব্রহ্মার দিবাসানে)[৪] বিষ্ণু মায়ার প্রভাবে যোগনিদ্রায় জন্ম হলে তার কর্ণজলতাত মধুকৈটভ অসুরদ্বয় তার নাভীপদ্মজাত ব্রহ্মার কর্মতস্তিতবিনাশে উদ্যত হলে কমলযোনী বিধাতাবিষ্ণুকে জাগানোর জন্য তার নয় নাশ্রিতা তামসী জগতের স্থিতিসংহারকারিনী যোগনিদ্রার স্তব করলেন।

"ত্বং স্বাহা, ত্বং স্বধা ত্বং হি বষটকারঃ
স্বরাত্মিকা,"

অর্থাৎ, তিনি স্বাহা, স্বধা ও আদি বষট্‌মন্ত্র,

"বিসৃষ্টো সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে।"[৫]

অর্থাৎ তিনি ত্রিগুণা সত্বগুণে সৃষ্টি. রজোগুণে পালন ও অন্তে তমোগুণে তার বিনাশকারিনী।

"কালরাত্রি মাজারাত্রি মোহরাত্রি রশ্চ দারুনা।।"

অর্থাৎ তিনি কালরাত্রি, মহারাত্রি ও মোহরাত্রিরূপা।৬

"খঙ্গনী শুলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিনী তথা।

শঙ্খিনী, চাপিনী বানভূসন্তীপরিঘায়ুধা।।"

অর্থাৎ তিনি খঙ্গ , শুল, তজনী , গদা, বান, শঙ্খ, ধনুক, ভূসন্তী ও পরিঘাত ধারিণী।

ব্রহ্মার স্তবে প্রসন্ন হয়ে দেবী বিষ্ণুর নয়ন থেকে সরে গেলেন ও তার মায়ার প্রভাবে মধুকৈটভ সহজেই বিষ্ণুর বধ্য হয়ে উঠলো। বরাহপুরাণমতে দেবী মহিষকে তিনবার বধ করেন। দৈত্য বিপ্রচিত্তির মাহিষ্মতী নামে এক মেয়ে ছিলো। সেই মাহিষ্মতীর গর্ভেই জন্ম হয় মহিষাসুরের, কালিকাপুরাণমতে, রম্ভাসুর ও করম্ভাসুর দুই ভাই, ব্রহ্মার তপস্যায় রত। তপস্যাকালে ইন্দ্র কুম্ভির রূপে করম্ভার হত্যা করলে রম্ভাসুর বরলাভ করেন যে তিনি মহাদেবকে-তাঁর পুত্ররূপে পাবেন। ফেরার পথে একটি ঋতুমতী মহিষীর সাথে সে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয় ও তার ঔরষে ওই মহিষীর গর্ভে জন্ম নেয় মহিষাসুর। মহিষাসুর মহাবলশালী যে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে ইচ্ছারূপধারণ ও নারীর হাতে বধ্য এই দুই বর লাভ করে ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত কবলো। ইন্দ্রাদি দেবগণ তখন ত্রিদেবের আশ্রয় নিলেন। অমরবৃন্দের অসহায়তায় ক্রুদ্ধ হলেন ত্রিদেব তাদের মুখমন্ডল ভ্রূকুঞ্চনে ভীষাণাকার ধারণ করল। "চকর কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রুকুটী ফুটি লাননৌ।।" দেবতাদের মুখমণ্ডল হতে তেজ নিঃসৃত হতে লাগল। "নিশ্চক্রম মহৎ তেজেব ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ।।" এই বিপুল তেজরাশি একত্র হয়ে এক দিব্যশ্রী মূর্তিতে দেবী অষ্টাদশভূজা দুর্গার রূপ ধারণ করলেন। শঙ্করের তেজে তার মুখমণ্ডল, বিষ্ণুর তেজে বাহু, যমের তেজে তার কেশপাশ উৎপন্ন হলো।

"যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্।

যাম্যেন চাডবন কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা।।"

এই প্রকার অন্যান্য দেবতাদের তেজে দেবীর ঘটনা সম্পূর্ণ হলে দেবগণ তাকে সমরাস্ত্রে সাজালেন। মহাদেব দিলেন ত্রিশুল, বিষ্ণু দিলেন চক্র

"শূলং শূলাদ বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তশ্যৈ
পিনাকধৃক্।

চক্রঞ্চ দত্তবান কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ।।"

এইভাবে নানা দেবতা দেবীকে সাজালেন ও সেই সালঙ্কারা দেবী মুহুর্মুহু অট্টহাস্য করতে লাগলেন। "সম্মানিতা ননাদৌচ্চৈঃ সাট্টহাসা মুর্হুঃমুহুঃ"।। তার হুকারে চতুর্দশভূবন সপ্তসমুদ্র ও ত্রিলোক প্রকম্পিত। এই রণতুরীয়া দেবী মহিসাসুরকে তার চতুরঙ্গ সেনার সাথে আক্রমণ করলেন। দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হোল, দেবী ওই অসুরের নানা রূপকে খন্ডিত করলেন নানা আয়ুধে তারপর মহাসুর এক মহিষ রূপে দেবীকে আক্রমণ করলে সিংহরূঢ়া দেবী সুরাপান করতে করতে আরক্তনয়নে বিজড়িত স্বরে বলেন—

"গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবম্যহম্।

ময়াত্বয়ি হতেহত্রৈব গতিষ্যান্ত্যাশু দেবতাঃ।।"

এরপর দেবীর মহিষের মুন্ড কেটে ফেললেন ওই মহিষাসুর বাহির হতেই তিনি তাকে বধ করলেন।

এরপর দেবী আবার ধরাধামে আসেন শুম্ভনিশুম্ভ বধের জন্য। ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গচ্যুত হয়ে দেবীর আরাধনায় রত, দেবগণের কাছে ওই দুই দৈতভ্রাতার কাহিনী শুনে পাবর্তীর কোষ থেকে জন্ম নিলেন দেবী কৌশিকি। শুম্ভনিশুম্ভ আবার পুরুষের অবধ্য, তাদের বধ করতে পারবে কেবল অযোনিজা[১০], পুংস্পর্শরহিত শ্রী শরীরে জন্ম কোন অলঙঘ্যপরাক্রমা নারীর হাতে[১১], গৌতম মুনির আশ্রমে দেবী পার্বতী তার কৃষ্ণকোষ ত্যাগ করে হলেন গৌরী ও কৃষ্ণরূপা কৌশিকি হোলেন সেই অযোনি পুংস্পর্শরহিত নারী। দেবীকে বিবাহ করার জন্য শুম্ভনিশুম্ভ দূত পাঠালেন কিন্তু দেবী বিনা যুদ্ধে বারে বশ্যতা স্বীকার করবেন না শুনে দৈত্য ধুম্রনেত্র তাকে বলপ্রয়োগ করতে উদ্যত হলে দেবীর হুঙ্কারে সে ভষ্ম হয়ে যায়, "হুঙ্কারে নৈব তং ভষ্ম সা চকারামম্বিকা ততঃ।।" এর পর প্রেরিত হোল চণ্ড ও মুন্ড, তাদের দেখে দেবীর বদন ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে উঠলো ও তার ললাট থেকে জন্ম নিলেন দেবী কালী

"ভ্রূকুটি কুটিলৎ তস্যা ললাট ফলকাদ্রুতম।
কালী করালবদনা বিনিত্রান্তাসিপাশিনী।।"

"ইনি দেবী চামুন্ডা, চন্ডমুন্ড হারিনী, বিচিত্রনরস্কালধারিণী, মুন্ডমালিনী ও ব্র্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, অস্থিচর্মমাত্র দেহ, অতিবিশাল ভয়াল বদনা, লোলজিহ্বা, কোটরাগত আরও নয়না, বিকটশব্দে দিঙমন্ডলপূর্ণকারিণী...।"

"বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম পবিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।।
অতিবিস্তার বদনা জিহ্বা ললনভীষণা।
নিমগ্ন রক্তনয়না নাদাপুরিতদিঙমুখা।।"

(শ্রী শী চন্ডী (৫/৫-৮)

এর পর দেবী চামুন্ডা ও দেবী চন্ডীকা চন্ডমুন্ড বধ করেন।[১২]

দেবী দুর্গা দেবী কালিকে চামুন্ডা নাম দিলেন,

"চামুন্ডেতি তো লোক খ্যাতা দেবী ভবিষ্যামি।"

এরপর শুম্ভ দেবীকে সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করলে দেবী তার অষ্টশক্তিকে[১৩] প্রকট করলেন প্রথমে এলেন হংসযুক্ত বিমানে, জপমালা কমন্ডলু হাতে দেবী ব্রহ্মাণী, তারপর চন্দ্রচুড়া, ত্রিশুলধারিণী, তক্ষকভুষিতা মাহেশ্বরী, তারপব মথুরারূঢ়া, শক্তিধরা কুক্কুটধ্বজী দেবী কৌমারী। এরপর গরুড়াসনা, শঙ্খ, চক্র গদা ও শারঙ্গ ধনুধরা দেবী বৈষ্ণবী, তারপর এলেন বরাহী, নারসিংহী, ঈশ্বরী ও চামুন্ডার পর এলেন গরুঢ়া বজ্রহস্তা দেবী ঐন্দ্রী।

এই অষ্টশক্তি মিলে রক্তবীজাদি দৈত্যাদের সংহার করলেন ও দেবী কালি সেই রক্তবীজদের রক্তপান করে তাদের জন্ম রোধ করলেন ও অন্তে দেবী নিশুম্ভকে বধ করলেন। নিশুম্ভ বধে শুম্ভ দেবীকে তিরস্কার করলো, অন্যের সাহায্য নেওয়ার জন্য কিন্তু

মুহুর্তের মধ্যে সকল শক্তি দেবী চন্ডীকাতে বিলীন হয়ে গেলেন। দেবী তাকে বলেন যে তিনি এক ও একমাত্র।

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কামমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্টমথ্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ।।"

এই দৃশ্যের পর দেবী শুম্ভকে বধ করলেন। এরপর দেবী বহুবার ধরাতলে এসেছেন যেমন তিতি বিপ্রচিত্তিবংশীয় অসুরনাশিনী দেবী রক্তদন্তিকা, অনাবৃষ্টি জজরিত ধরাকে শতলোচনে অবলোকনকারিনী দেবী শতাক্ষী, স্বীয়শরীরে শাক জন্ম দিয়ে জগতপালিকা দেবী শাকম্ভরী, দুর্গমাসুর নাশ করে দেবী দুর্গা, দেবী ভীমা,অসংখ্যভ্রামরযুক্তা হয়ে অসুরদলনে দেবী ভ্রামরী ইত্যাদি রূপদেবী কল্যাণকারিণী। তার অভয়বাণী তার বারবার আমার কথা স্মরণ করায়।

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষতি।
তদা তদাবতীর্থাহং করিষাম্যারিসংক্ষয়ম্।।"

(শ্রী শ্রী চন্ডী)

অর্থাৎ 'যখনই ধরাধামে দানবেরা উত্থান হবে তখনই আমি দৈত্য নাশার্থে ধরাতলে অবতীর্ণা হবো।' দেবী রূপ আমরা যে কেবল হিন্দুশাস্ত্রেই পাই তা নয় এই বর্ণনা আমরা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও পাই। হিন্দুতন্ত্রের মতো বৌদ্ধতন্ত্রেও চন্ডীপাঠের প্রচলন ছিলো। বৌদ্ধদের লেখা চন্ডী নেপালে পাওয়া যায়। হিন্দু তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার ন্যায় বৌদ্ধদেরও উগ্রা, মহোগ্রা বজ্রাদি দেবীর উল্লেখ পাওযা যায় জাপানের চনষ্টী দেবী ও হিন্দুদের চন্ডী একার্থক, তিব্বতী উষা বা মারীচি দেবী ও দশভূজা ও তিনি বৌদ্ধদের তন্ত্রদেবী, জৈনদের সরস্বতী ও অন্যতম উল্লেখযোগ্য দেবী। শিখ ধর্ম "গুরুগোবিন্দ সিংহজীর" 'দশম বাদশা কি গ্রন্থে'র, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অংশে দেবী চন্ডীর কথা আছে। মহাভারতের ২৩শ অধ্যায় শ্রী হরির অর্জুনকে যুদ্ধের পূর্বে দেবীদুর্গার স্তব করতে বলেন ও বিরাট পর্বের অজ্ঞাতবাসকালে দুর্গার স্তবে দেবীকে কুমারী কালী, মহিষাসুরনাশিনী, বিন্ধ্যবাসিনী ও মদমাংসবলিপ্রীয়া বলা হয়েছে। রামায়নে (কৃত্তিবাসরচিত) রাম দেবীকে অকালে বোধন করেন, "রাবণশ্য বিনাশায় রামস্যনুগ্রহায় চ অকালে বোধিতাদেবী।।" এই পূজা কৃত্তিবাস কল্পিত নয় ভাগবতপুরাণ মতে এই পূজা অতিপ্রাচীন।

মৎসপুরাণে দেবীর যে বর্ণনা আছে তা হোল এই রকম :

"দেবী জটাজুটাযুক্তা, জটা অর্ধচন্দ্রশোভিত। দেবী পুর্নচন্দ্রবদনা ও ত্রিনয়না।

তিপ্তস্বর্ণবর্ণা" আয়তনয়না, সুন্দর তার দন্তরাজী, তিনি নবযৌবনা এবং সর্বালঙ্গারভূষিতা।

দেবী চারুবদনা, তুঙ্গকুচা, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমায় বিরাজিতা ও তিনি মহিষাসুরমর্দিনী।

দেবীর দশ হাতে দশপ্রহরণ, তার দক্ষিণ হাতগুলোয় যথাক্রমে ত্রিশূল, মঙ্গ, চক্র, বাণ ও শক্তি বর্তমান

দেবীর বাম হাতে বর্ম, ধনুক, পাশ, অঙ্কুশ, ঘন্টা ও পরশু বিরাজমান।

দেবীর পদতলে ছিন্নমুন্ডমহিষ যার ধর থেকে উৎপন্ন মহিষাসুর খড়্গা নিয়ে যুদ্ধরত ও দেবী তার শূলদ্বারা অসুরের বক্ষদেশ বিদীর্ণ করেছেন।

মহিষাসুরের সর্বাঙ্গ রক্তধারায় পরিপূর্ণ, সে দেবীর নাগপাশে বেষ্টিত ও তার মুখমন্ডল ক্রোধে ও যন্ত্রণায় ভ্রুকুটী কুটিল হয়েছে।

দেবী অসুরের কেশ আকর্ষণ করছেন, ও তার বাহন সিংহ যুদ্ধরত ও তার মুখগহ্বর রক্তপূর্ণ।

দেবীর দক্ষিণ পা সিংহের উপরে স্থিত এবং বাম পায়ের আঙুলগুলো কিঞ্চিৎ উঠে আছে এমনভাবে অসুরের উপরে স্থিত।

প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় তার "Eastern Indian School of Medieval Sculpture" এ (Page 114) বলেছেন যে উত্তর ভারতে সর্বাধিক প্রচলিত দুর্গা মূর্তিগুলো মূলতই অষ্টাদশ দ্বাদশ ও দশভূজা।

মধ্যভারতের নাগোদরাজ ও মুম্বাই এর বিজাপুরে দেবী দশভূজা মূর্তি পাওয়া যায়। রাজসাহীর বরেন্দ্র বিসার্চ একাডেমীতে বক্ষিত দুর্গামূর্তি ষড়ভূজা। দিনাজপুরের কেশবপুর গ্রামের দুর্গামূর্তি দ্বাদশভূজা। উদয়গিরি গুহাতে ৪র্থ শতাব্দীর দুর্গামূর্তি পাওয়া যায়। ভূমারে খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতকের দ্বিভূজা দুর্গামূর্তি পাওয়া যায়। ভূবনেশ্বর বিঠলদেব মন্দিরে ১১শ শতকে মহিষমর্দ্দিনী মূর্তি পাওয়া যায়। আনুমানিক ১০৫০ খৃষ্টাব্দে মহারাজা ভীমদেও সোলাঙ্কীর পত্নী মহারানী উদয়মতীর আমলের একটি স্থাপত্বে দশভূজা মূর্তি গুজরাটের অনিহালপুরে পাওয়া যায়।

দেবী মহিষমর্দিনী রূপ কুষাণযুগেও বর্তমান ছিলো। মথুরাশৈলীর সমসাময়িক স্থাপত্যে চতুর্ভুজা দেবী মূর্তি পাওয়া যায়। R.E.Agrawala-র মতে রাজস্থানের নগরে একটি টেরাকোটা দুর্গামূর্তির ফলকে দেবী মহিষকে শূলে বিদ্ধ করেছেন ও পা দিয়ে তাকে দলন করছেন, দেবী এখানে চতুর্ভূজা, মথুরাশিল্পে দেবীর বাহন সিংহ ও অসুর অদৃশ্য, কেবল গুপ্তযুগেই এদের প্রকাশ লক্ষ করা যায়।[১৫]

গুপ্তযুগের মহিষমর্দ্দিনী মূর্তিতে মহিষকে চঞ্চল ও উন্মত্ত রূপে দেখা যায়, সমসাময়িক একটি মূর্তিতে[১৬] দুর্গা মহিষের সঙ্গে যুদ্ধরতা ও মহিষের অসহায়তা অদৃশ্য, চালুক্য রাজাদের বাদামীতে দুর্গা মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া যায়। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আইলোলে চালুক্য রাজারা অষ্টাদশভূজা সিংহবাহিনী দুর্গামূর্তির স্থাপন করে। এই সময়ে ইলোরা ও কালী বাগানেও দুর্গামূর্তি পাওয়া যায়। খাজুরাহোর চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরেও (৮৫০-৯০০ খৃঃ) চতুর্ভূজা মহিষমার্দ্দিনী মূর্তি পাওয়া যায়। পল্লবদের রাজত্বকালে দেবীদুর্গার মূর্তিতে অনেক পরিবর্তন আসে। মমল্লপুরমের দুর্গামূর্তিটিতে দেবী মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে রত। এই অসুর মানবদেহে মহিষমুন্ড, হাতে গদা, প্রায় পরাজিত কিন্তু অস্তগামী সূর্যের মতো তেজপূর্ণ, দেবী অষ্টভুজা, সিংহরূঢ়া, স্বসৈন্যে ধানমান হয়ে অসুরকে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু দেখা যায় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে হঠাৎই যে, মহিষ তার পশুভাব ছেড়ে এক পুরুষ বেশে আত্মপ্রকাশ করছে। এইরকম মূর্তি প্রথম পাওয়া যায় Alwar এর পারানগরে আনুমানিক নবম ও দশম শতাব্দীতে। অনুরূপ একটি মূর্তি পাওয়া যায় মানভূমের দুলমীতে

যা এখন ভারতীয় সংগ্রহশালা কলিকাতায় সংরক্ষিত আছে।[১১] এছাড়াও রসুলপুর, ফরিদপুর, বালিগাওতেও সমসাময়িক অসুরমর্দ্দিনী মূর্তি পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে যে দেবী পুজার প্রচলন, তা অত্যন্ত সামাজিক একটা পুজো। দুর্গা দেবীর থেকে ঘরের মেয়ে হয়েছেন। তার আগমনে বাঁধা হয় আগমনী গান। বাঙালীর মনের পরিপূর্ণ ঘর সংসারের চিত্র ফুটে ওঠে পুত্রকন্যা পতিব্রতা দেবীর চালচিত্রে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের যোগদানে হয় এই পূজা। কুম্ভকার দেবী প্রতিমা নির্মাণ করে, পতিতার উঠোনের মাটি ছাড়া প্রতিমা সম্পূর্ণ হয় না, পুজো করেন ব্রাহ্মণ, বলিদেয় কামার, ফুল দেয় মালী, ঢাক বাজায় চামার, নিরঞ্জন দেয় মাঝি, বিজয়ার প্রণাম, আলিঙ্গনে হয় সামাজিক মিলন।

ডঃ প্রণব বন্দোপাধ্যায় মনে করেন যে দেবী হলেন রাষ্ট্র তার দক্ষিণে অবস্থান করেন গণেশ, তিনি গণদেবতা, কর্ম ও কামার দেবতা শূদ্রদের প্রতীক তিনি। দেবী লক্ষ্মী ধনসম্পদ ও বাণিজ্যের দেবী বৈশ্যদের প্রতীক তিনি। দেবীর বামে আছে বলরূপী কার্তিক, তিনি ক্ষত্রিয়দের প্রতিভূ, এবং সরস্বতী কলাবিদ্যার দেবী ব্রাহ্মণদের প্রতীক। দেবী এই চার প্রকার সামাজিক স্তর নিয়ে এক প্রধান কেন্দ্রীয় শক্তি (Main Central force) ও এক শত্রুহারী রাষ্ট্রের প্রতীক।

দেবী পূজায় আমরা যে কলাবউ স্নান করাই সেটা আমলে নবপত্রিকা বেল, কচু ডালিমআদি নটা ঔষধিগুণসম্পন্ন[১২] গাছকে বাঁচিয়ে রাখার এ এক অভিনব প্রয়াস। উদ্ভিদকে দৈবরূপে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের অপুর্বনিদর্শন এটি। এ ছাড়া কুমারী পূজোর[১৩] মাধ্যমে মেয়েদের সম্মান প্রদর্শন ও তাদের সুস্থ ও সবল মা হওয়ার চাবিকাঠি এটি। আজ আমাদের দেশে নারী লাঞ্ছিতা, তাই আমাদের আরো বেশি করে মনে করতে হবে যে সকল নারীতেই দেবীর প্রকাশ

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদঃ
স্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

প্রত্যেক নারীর যন্ত্রণা দূর করাই দেবীর আসল পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণ তার স্ত্রী শ্রীসারদাদেবীকে মাতৃজ্ঞানে পূজো করেছিলেন, তিনি বলেছেন, যে দেশের মেয়েরা সুখী নয় সে দেশ কখনো উন্নতি করতে পারে না। দেবী বিশ্বব্যাপিনী তার কথা অফুরন্ত অবশেষে এই বলে শেষ করতে চাই—

"যচ্চ কিঞ্চিৎক্কবিদ্‌বস্তু সদসদবাখিলাত্মিকে।
তস্য সবর্স্য যা শক্তিঃ সাত্বং কিং স্তূয়সে ময়া।।"

অর্থাৎ-হে বিশ্বরূপিনী, যে কোন স্থানে যা কিছু চেতন বা জড় বস্তু অতীতে ছিলে, বর্তমানে আছে এবং তা ভবিষ্যতে থাকবে, সেই সকল শক্তি আপনি, বিশ্বপ্রপঞ্চে আপনি ভিন্ন যখন অন্য কিছু নাই, তখন আপনার স্তব কি রূপে সম্ভব?

সূত্রনির্দেশ

(১) কৃষ্ণযর্জুরবেদ—তৈত্তিরীয় আরণ্যক—নারায়ন উপনিষদ

"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং...দুর্গাদেবীং পরনমহং...তরসে নমঃ।।"

(২) তৈত্তিরীয় আরণ্যক—যাজ্ঞিকা উপনিষদ (১০/১/৭)

(৩) "Durga Kosh"–RAO RAMCHANDRA S.K. Banglore-1997, Page-8-10.

(৪) সত্য ত্রেতা, দ্বাপর, কলি মানুষের চারযুগ, এই চারযুগ দেবতাদের একযুগ, ৭১টি দেবযুগে এক মন্বন্তর, যোদ্ধ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন ও ব্রহ্মার একশ বছরে তার দিবাবসান হয়।

(৫) চন্ডী প্রথম অধ্যায় (৭৩-৮১)

(৬) "কাল যেখানে অপ্রকাশিত তাই কাল রাত্রি—সত্ত্বগুণের লয়স্থান—কালরাত্রি, রজোগুণের—মহারাত্রি, তমোগুণের মোহরাত্রি। —সাধনসমর।"

(৭) চতুর্দশ ভুবন—ঊর্দ্ধে - ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, সহঃ, জনঃ, তপঃ, ও ব্রহ্মালোক— নিম্নে সপলেক যথা অতল, বিতল, পুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ওপাতাল।

(৮) সপ্তসমুদ্র যথা- -লবণ, ইক্ষু, সনা, সর্পিঃ, দুগ্ধ, দধি ও জল

(৯) চতুরঙ্গ সেনা --রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিক।

(১০) যে নারীর কোন মাতৃগর্ভে জন্ম হয়নি।

(১১) যে নারী কোন পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ করেনি।

(১২) বামন পুরান মতে দেবী চন্ডমারী চন্ডমুন্ড বধ করেন।

(১৩) অষ্টশক্তি নানা দেবতাদের নারীরূপ যেমন—

(i) ব্রহ্মা ব্রাহ্মী

(ii) বিষ্ণু নারায়ন-নারায়নী বৈষ্ণবী

(iii) কুমার-কৌমারী

(iv) মহেশ্বর-মাহেশ্বরী

(v) ইন্দ্র-ঐন্দ্রী

(vi) বরাহ বারাহী

(vii) নরসিংহ-নারসিংহী

(viii) ঈশ্বর-ঐশ্বরী

(১৪) মতান্তরে 'অতসীপুস্পবর্ণা"।

(১৫) Lalit Kala, Nos 1&2, April 1955-March 1956.

(১৬) Bharat Kala Bhaban, Beneras.

(১৭) "Indian Temple Sculpture" by Munshi, K.M & Goshwami Calcutta; 1956

(১৮) নবপত্রিকা—কলা, মানকচু, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, অপরাজিতা, ধান ও কচু।

(১৯) "কুমারী পূজো এক বছর থেকে কন্যা ঋতুমতী না হওয়া পর্যন্ত তাকে প্রতি বয়সে এক একটি দেবীরূপে পূজা বিধেয় যেমন—একবছর-সন্ধ্যা, দুবছর-সরস্বতী, তিন-ত্রিধামূর্তি, চার-কালিকা, পাঁচ-সুভাগা, ছয়-উমা, সাত-মালিনী, আট-কুব্জিশ, নয়-কালসন্দর্ভা, দশ-অপরাজিতা, এগারো রুদ্রানী, বারো-ভৈরবী, তেরো-মহালক্ষ্মী, চোদ্দ-পীঠনায়িকা, পনেরো-ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোল-অম্বিকা।"

প্রাক্-গুপ্ত বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব

সরিতা ক্ষেত্রী

একটি আঞ্চলিক একক রূপে বঙ্গের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে।[1] যদিও এই রচনায় বঙ্গের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত হয়নি। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে খ্রীঃ পূঃ ১ম শতক থেকে খ্রীষ্টিয় ১ম শতকের মধ্যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চল বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।[2] পরবর্তীকালে, অর্থাৎ প্রাক্-গুপ্ত যুগের মধ্যে বঙ্গের সীমানা অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করেছিল ও পশ্চিম বঙ্গের নিম্ন-বদ্বীপ অঞ্চল ও পদ্মার মোহানা পর্যন্ত বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চল বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।[3] গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বঙ্গের ভৌগোলিব সীমা আরও ব্যাপকতা লাভ করেছিল।

প্রাক্-গুপ্ত যুগে বঙ্গ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু অশোকের সময়ে তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক) তাম্রপর্ণী বা শ্রী লঙ্কায় বোধিবৃক্ষের অভিপ্রেরণ সংক্রান্ত ঐতিহ্যানুসারী তথ্য পরম্পরা যদি ঐতিহাসিক দিক থেকে গ্রহণ যোগ্য হয় তাহলে বঙ্গের অন্তর্গত এই অঞ্চল মৌর্য-সাম্রাজ্যের অধীন ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।[4] অশোকের লেখতে যেহেতু উদ্ধৃত যে, যোন অঞ্চল ছাড়া তাঁর সাম্রাজ্যেব সর্বত্রই ব্রাহ্মণ ও শ্রমণরা বাস করতেন[5] সেহেতু আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে আলোচ্য অঞ্চল ওই সময়ে শ্রমণদের ধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবাধীন ছিল।

প্রাক্-গুপ্ত যুগে বঙ্গ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের তথা অন্ততঃ পক্ষে বৌদ্ধ ধর্মের কোন একটি শাখার অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী লেখর[6] তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখটী মেদিনীপুর জেলার তমলুক থেকে আবিষ্কৃত। অস্থিখণ্ডের উপর উৎকীর্ণিত এই লেখটী সম্ভবতঃ 'ধর্মীয় দান' রূপে প্রদত্ত হয়েছিল। লেখটীর সম্পাদক অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনা অনুযায়ী লেখপাঠ হল—''চেতগোঠ'' । অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই শব্দটির দুই শব্দাংশের অর্থ নির্ধারণ করেছেন এই রূপে—'চেত' অর্থাৎ একটি সম্প্রদায় (চৈত্য>চেত্ত>চেত) এবং 'গোঠ' (গোঠ>গোষ্ঠ) মিলনস্থল অর্থাৎ চেত তথা চৈত্য নামক একটি বৌদ্ধ ধর্ম সম্প্রদায়ের উপাসকদের মিলনস্থল। এই 'চৈত্য (ক)' বা 'চেতীয়' গোষ্ঠী ছিল মহাসাংঘিকদেরই অন্যতম একটি শাখা।[7] মহাবস্তু অবদানে[8] এই শাখাব কার্যাবলীব সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে যে-স্তূপ প্রদক্ষিণ বা চৈত্য-উপাসনার ধর্মীয় বিধিই

এই বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মাচরণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। সেজন্যই এই গোষ্ঠী কে 'চৈত্যক' বলা হত। বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই লেখটী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই লেখটী থেকেই গুপ্ত-পূর্ব-যুগে পূর্ব-ভারতের এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব সম্পর্কে মৌলিক তথ্য পাওয়া গেছে।

এই চৈত্যক গোষ্ঠীর মৌলকেন্দ্রটি ছিল অমরাবতীর (বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশ) নিকটস্থ ধান্যকটক অঞ্চল। আনুমানিক খ্রীষ্টিয় ৩য় থেকে ৪র্থ শতকের মধ্যে উৎকীর্ণ নার্গাজুনীকোন্ডা ও অমরাবতী থেকে প্রাপ্ত কিছু সংখ্যক লেখ থেকে 'চৈত্যক' বা 'চেতীয়বাদক' সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০] খ্রীষ্টিয় শতকের প্রথম কয়েকটি শতকে এই গোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অতএব উল্লিখিত খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী লেখটীর সময়কাল নাগার্জুনাকোন্ডা ও অমরাবতীর প্রাসঙ্গিক লেখগুলির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় আমরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সমর্থ হই যে খ্রীষ্টিয় ২য় শতক নাগাদ এই 'চৈতকে' গোষ্ঠীর কিছু উপাসক অন্ধ্রপ্রদেশের মৌল কেন্দ্র থেকে বঙ্গ অঞ্চলে অভিবাসিত হয়ে প্রাক্-গুপ্ত বঙ্গে তাদের দ্বিতীয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিল।

এ প্রসঙ্গে চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিষ্কৃত একটি ভগ্ন বুদ্ধের কিংবা বোধিসত্বের মূর্ত্তির আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[১১] এই মূর্ত্তি-উপাদান প্রাক্-গুপ্ত বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। মূর্ত্তিতত্ত্বের শৈলীগত বৈশিষ্ট বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক সরস্বতী এটিকে খ্রীষ্টিয় ২য় শতকের বলে চিহ্নিত করেছেন। নার্গাজুনকোন্ডা থেকে প্রাপ্ত খ্রীষ্টিয় ৩য় শতকের কয়েকটী লেখতে ধর্মে-রূপান্তরিত প্রসিদ্ধ অঞ্চলগুলির একটি দীর্ঘ তালিকায় বঙ্গের নাম পাওয়া যায়।[১২] এই লেখগুলিতে বলা হয়েছে যে, সিংহলের স্থবিরেরা বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিল। অবশ্য সিংহলের এই দাবি সত্য না হলেও অন্ধ্রের সঙ্গে বঙ্গের সম্পর্কের ঐতিহাসিকতা বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

উপরিউক্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ সুত্রে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বঙ্গদেশে-গুপ্ত যুগের পূর্বেই বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই বিষয়ে প্রাক-গুপ্ত যুগের ঐতিহাসিক তথ্যাদি স্বল্প হলেও বঙ্গ অঞ্চলে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব কম ছিল এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। কেননা গুপ্ত যুগে তাম্রলিপ্তি যে বৌদ্ধ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল তা বিভিন্ন সূত্র থেকেই জানা যায়। এ ছাড়াও ফাইয়ানের বিবরণ অন্ততঃ পক্ষে এ বিষয়ে প্রামান্য তথ্য প্রদান করে।[১৩]

সূত্র নির্দেশ

১। কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্র**, ২য় খন্ড, ১১; এই প্রসঙ্গে অমিতাভ ভট্টাচার্যের **"হিস্টোরিকাল জিওগ্রাফী অফ্ এনশিয়েন্ট এ্যান্ড আরলি মিডিয়েভ্যাল বেঙ্গল"**, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৫৬ দ্রষ্টব্য।

২। বি.এন. মুখার্জী, **"খরোষ্টী অ্যান্ড খরোষ্টী-ব্রাহ্মী ইনস্ক্রিপ্শনস্ ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল"** **ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন**, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৬৫।

৩। **পূর্বোক্ত** পৃ. ৬৬।

৪। মহাবংস, ১৯, পৃ. ৬

৫। **কর্‌পাস ইন্‌স্ক্রিপ্‌শনাম্‌ ইন্ডিকরাম**, ১ম খন্ড, **ইন্‌স্ক্রিপ্‌শনস্‌ অফ অশোক**, দিল্লী, ১৯৯১, পৃ. ৪৭

৬। বি.এন. মুখার্জী, **খরোষ্ঠী অ্যান্ড খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী ইন্‌স্ক্রিপশনস্‌ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন**, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৫৩।

৭। **দ্য ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টারলি**, ৭ম খন্ড, পৃ. ৬৪৮

৮। **মহাবস্তু**, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৬২।

৯। কে.এ. নীলকান্ত শাস্ত্রী (সম্পাদিত), **এ কম্প্রিহেন্‌সিভ হিস্ট্রি অভ ইন্ডিয়া**, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৩৬৮

১০। **দ্য ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টারলি**, ৭ খন্ড, পৃ. ৬৪৬

১১। এস. কে. সরস্বতী, **আরলি স্কাল্পচার অফ বেঙ্গল**, কলিকাতা, ১৯৬১, পৃ. ১২, চিত্র, ১, এস. এস বিশ্বাস, **টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল**, নিউ দিল্লী, ১৯৮১ হারোয়া থেকে প্রাপ্ত সম্ভবতঃ প্রাক্‌-গুপ্ত যুগের একটি টেরাকোটা ফলকে বুদ্ধের বাল্যকালের চিত্র দেখা যায়, চিত্র ৩০

১২। **এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা**, খন্ড ২০, ১৯২৯-১৯৩০, পৃ. ২২

১৩। **কো-কু-চি**, ৩৭শ অধ্যায়, দ্রষ্টব্য-এস.এস বিশ্বাস, **টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল**, নিউ দিল্লী, ১৯৮৭, পৃ. ১৯২-১৯৩ চিত্র ৪০

প্রাক্-গুপ্ত যুগে বঙ্গে মগ ব্রাহ্মণ

মলয় কুমার দাস

প্রাক্-গুপ্ত যুগে বঙ্গ অঞ্চলে ঈরানীয় ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের তথা 'ম্যাগি' পুরোহিতদের অবস্থান সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নুতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। 'ম্যাগি' পুরোহিতরা তৎকালীন বঙ্গে'র সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারকরেছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই সময় বহুসংখ্যক বহিরাগতের আগমন ঘটেছিল, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিল 'ম্যাগি' বা 'মগ' জাতি— সে সাক্ষ্যও বহন করে। মগজাতিদের সঙ্গে বঙ্গালদেশীয়দের (আদি বাসিন্দা) এবং অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল তা অবশ্যই আলোচনা সাপেক্ষ।

উপরিউল্লোখিত আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের (বাংলার) উত্তর চব্বিশ পরগণাজেলার অন্তর্গত বেঁড়াচাঁপা বা প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিষ্কৃত একটি ভগ্ন মৃৎপাত্রাদির টুকরো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই ভগ্ন-মৃৎপাত্রাদির উপাদান প্রাক্-গুপ্ত যুগে বঙ্গে 'মগ' ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। ভগ্ন-মৃৎপাত্রাদির টুকরোর উপর খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ দ্বি-ই-জ অথবা দ্বিজ (dvr(i)ja or dr(i) ja] শব্দটি পাওয়া যায়।[১] দ্বিজ কথার অর্থ হোল উচ্চবর্ণের হিন্দু যাদের জন্মগ্রহণ ও উপনয়ন রূপ দুই জন্ম হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, (ঋগ্বেদ অনুযায়ী)। আলোচ্য লেখাটি থেকে আরও জানা যায় যে এই 'দ্বিজ' বা 'ব্রাহ্মণ'-এরা এসেছে 'মক্' থেকে।[২] অর্থাৎ এই দ্বিজ-বা ব্রাহ্মণরা 'মক্দ্বিজ' বা 'মক্ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত। ভগ্ন-মৃৎপাত্রাদির উপর উৎকীর্ণিত এই লেখটি থেকে মনে হয় মৃৎপাত্রটি সম্ভবত 'ধর্মীয় দান' হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সুতরাং এখন আমাদের দেখতে হবে এই 'মক্দ্বিজ' কারা এবং প্রাক্-গুপ্ত বঙ্গে তাদের কি ভূমিকা ছিল?

'মক্' ব্রাহ্মণদের অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে হলে-বা উৎপত্তিস্বরূপ নির্দেশ করতে হলে আমাদের সংবাদের জন্য 'মগ' ব্রাহ্মণদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়। কারণ মক্ কথাটা মগ থেকে এসেছে। সুতরাং আমরা 'মক্দ্বিজ' থেকে 'মগ দ্বিজ' বা মগ ব্রাহ্মণ এর পরিচয় পাচ্ছি। বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিষ্কৃত, ভগ্নমৃৎপাত্রাদির টুকরোর উপর উৎকীর্ণিত খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী এই লেখটিই হচ্ছে প্রাক্-গুপ্ত যুগে বঙ্গের বা আদিবাংলার লেখ মালাগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরনো তথ্য। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর সময় কালে প্রাচীন বঙ্গে 'মগ' দের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। যেহেতু আমরা জানি ইতিহাস প্রত্ন-নির্ভর। বিশেষ করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস বিশ্লেষণে

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ব্যবহার হয়ে থাকে। ইতিহাসের এমন কোনো কোনো কালপর্ব আছে, যেখানে একমাত্র প্রত্ন-উপাদানই ঐতিহাসিক সত্যকে উদঘাটিত করতে পারে। বিশ্লেষিত হতে পারে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস। কারণ, প্রত্নবস্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে।[৮] মগ ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে বর্তমান আলোচনাও তার ব্যতিক্রম নয়।

মক মানে মগ জাতি। এটি প্রমাণিত। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের টলেমীর রচনায়, সুয়ান্-সাঙ (৬২৯-৪৬ খৃ.) এর বিবরণে, সাম্বপুরাণ (আঃ খৃঃ ৫০০-৮০০ খৃঃ) এবং সর্বোপরি অধ্যাপক ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পাঠোদ্ধারিত ব্রাহ্মী ও খরোষ্টী—ব্রাহ্মী লেখমালার তথ্য থেকে জানা যায় যে, মগ জাতির লোকেরা সৌর উপাসক ছিল এবং সেই হিসেবে তারা ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়। টলেমীর বিবরণ থেকে আমরা ম্যাগি শব্দটি পাই (Brahmanai Magai)[৯] যারা ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত ছিল। এই উপমহাদেশে ম্যাগি গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষরা এসেছিলেন এশীয় মহাদেশের যে অংশে ইরানীয় সংস্কৃতি বিরাজ করে সেখান থেকে। পরিশেষে এরা ব্রাহ্মণ বর্ণভূক্ত হয়েছিলেন। প্রাচীন বঙ্গে তথা ভারতে পুরোহিত সম্প্রদায় ছিল ব্রাহ্মণ শ্রেণীভূক্ত (আজও যা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে)। অনুরূপ ম্যাগি (Magai) সম্প্রদায় ভূক্ত লোকেরা ইরানে পুরোহিত ছিল বলে ভারতে এরা ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় (শ্রেণী) ভূক্ত বলে পরিগণিত হয়। খুব সম্ভবত প্রাক-গুপ্ত বঙ্গে বর্ণ বা জাতি ব্যবস্থার চলন ছিল। দ্বিজ (Men of Brahmana Caste) শব্দটি তারই সাক্ষ্য বহন করে। অর্থ ত্যাগী, বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ী ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করা। ম্যাগী বর্ণভূক্ত মানুষরা ইরান থেকে এসে প্রাক্-গুপ্ত বঙ্গে তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে এখানকার বিশেষ বর্ণ বা জাতি প্রথার সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেন। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যগত উপাদান থেকে জানতে পারা যায় যে ভারতে ম্যাগী পুরোহিতরা সর্বপ্রথম সূর্যোপাসনার সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। সুতরাং বলা যেতে পারে ম্যাগ কথাটা এসেছে ম্যাগি বা ম্যাগি থেকে এবং সেখান থেকে 'মগ' কথাটার উৎপত্তি। এই মগ জাতিরাই প্রাক্-গুপ্ত যুগে বঙ্গে মগ দ্বিজ বা মগ ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়। তাহলে এটা প্রমাণিত হল যে মগ জাতিরাই মক নামে পরিচিত।

সাম্বপুরাণ (আঃ খৃঃ ৫০০-৮০০ খৃঃ) এর কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, কৃষ্ণপুত্র 'সাম্ব পিতৃশাপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। যখন ভালো হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না তখন কারও পরামর্শে সূর্যোপাসনায় ব্রতী হন। মূলতান অঞ্চলে তিনি সূর্যমন্দির নির্মাণ করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সাম্বের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হোল কুষ্ঠরোগের প্রকোপ থেকে উপশম পাওয়া। কিন্তু সাম্বর সামনে সমস্যা এসে হাজির হয়। স্থানীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত রা কেউই উক্ত মন্দিরে পূজা করতে আগ্রহী নয়। তখন তিনি সূর্যোপাসনার জন্য শাকদ্বীপ (ইরান) থেকে সূর্যপূজক 'মগদের' নিয়ে আসেন।[৮] ইরানে সূর্যপূজার ব্যাপক প্রচলন আছে। সূর্যপূজার পুরোহিত স্বরূপ ম্যাগি বা মগরা ওখানে বিশেষ খ্যাতিমান ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই সাম্ব তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে সূর্য উপাসনার জন্য ম্যাগি বা মগ পুরোহিতদের আমন্ত্রণ জানান। কালক্রমে সূর্য পূজা ভারতের ধর্মের ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং সূর্যোপাসনার জনপ্রিয়তাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে ভারতের

অভ্যন্তরে মগজাতিদের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। প্রাক্-গুপ্ত যুগে বঙ্গেও যার প্রভাব অব্যাহত ছিল। ইরাণ থেকে আগত সূর্য দেবতার পুরোহিতবর্গ (ম্যাগি বা ম্যাগি) প্রাচীন বঙ্গে তথা সমগ্র ভারতে মগদ্বিজ নামে পরিচিত হন। বরাহ ও ভবিষ্যপুরাণ ও এই স্বাক্ষ্য বহন করে। এমন কি দ্বাদশ শতকের গোবিন্দপুর শিলালেখেও ঘটনাটি উল্লিখিত।[৮] বরাহ, ভবিষ্য, সাম্বপুরাণ এবং গোবিন্দপুর লেখ-র মূলকথা হোল মগজাতির উৎপত্তি সূর্য থেকে। তাই তাঁরা সূর্য উপাসক। সাম্ব মগদের এদেশে নিয়ে আসেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে সূর্য পূজার অনুপ্রবেশ ঘটে ইরাণ থেকে।[৮]

এখন প্রশ্ন হোল প্রাক্ সাম্ব সময়ে বা প্রাচীন ভারতে কি সূর্যপূজার প্রচলন ছিল না? দেশীয় ব্রাহ্মণরা কি এই পূজার কোনরূপ উপাচার জানত না? কেন তারা সাম্বের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মুলতানের মন্দিরে সূর্যোপাসনা করতে অস্বীকৃত হয়? এর উত্তর খুবই বিতর্কিত। ধর্মের ইতিহাস (ভারতের) নিয়ে যারা গবেষণা করেন হয়ত ভবিষ্যতে তারাই যুক্তিপূর্ণ উত্তর দেবেন। তবে এ-প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি রচনার বহু উপাদান থেকে আমরা ভারতে সূর্যপূজার বহু বিবরণ পাই। ঋগ্বেদ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, মৈত্রায়নীয় সংহিতা, গৃহ্যসূত্র সমূহ, মহাকাব্যদ্বয়, পুরাণসমূহ, পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্য, ময়ূরের সূর্যশতক কথা, ভবভূতির মালতী মাধব, বানভট্টের হর্ষচরিত, কৃষ্ণমিত্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, বিদেশী বিবরণ, হিউয়েন সাঙ এর সি.ইউ.কি, আরব ভূগোলবিদ অল্-ইস্তাঘড়ি এবং অল্ ইদ্রিসি'র বিবরণ, প্রাচীন মুদ্রায়। প্রাচীন লেখমালায়, মন্দির গাত্রে, মূর্ত্তি এবং ফলক ও স্থাপত্য ভাস্কর্যে সূর্যোপাসনার চমৎকার বিবরণ (উদাহরণ) পরিস্ফুট[৮]। তবে, একথাও ঠিক প্রাচীন ভারতে সূর্যপূজার সাধারণ চলন থাকলেও মুখ্যত ইরান দেশ থেকে জাকজমকপূর্ণ সূর্য-আরাধনায় নিয়ম বা আচার, রীতি-নীতির আমদানী ভারত করে। পুরানের তথ্য সমূহে স্পষ্ট উল্লিখিত যে, ভারতে সূর্যপূজার একটা উন্নত রূপ ইরান থেকে এসেছিল।[৮] ইরানীয় সূর্যদেবতা মিথ (মিত্র, মিহির) এই পূজার উৎস। ইরানীয় পুরোহিত শ্রেণীভুক্ত মগরাই সূর্যের প্রধান উপাসক। তাঁরাই সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত অধিকারী (বরাহ মিহিরের বক্তব্য অনুযায়ী) হওয়ায় ভারতে আগমন ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। ব্রহ্মস্বরূপ রক্ষাকর্তা, ঐশ্বর্য ও ফলপ্রদানকারীর প্রতীক হোল সূর্য।[১০] হয়ত এই পূজার জটিলতা বা অন্যান্য আঁরাধ্যদেবতা বা দেবীদের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় ব্রাহ্মণরা সূর্যপূজা করতে নারাজ হয়। অথবা কোনরূপ অশুভ ইঙ্গিত থাকায় তাঁহারা সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে অস্বীকৃত হন। তথাপি একথা ঠিক যে ভারতীয় ব্রাহ্মণরা একেবারে সূর্যপূজার কোনরূপে আচার, ক্রিয়াকলাপ জানত না, তা যথার্থ নয়। যাই হোক ইরানীয় সংস্কৃতির ধারক-বাহক মগ বা মক্ বা ম্যাগি বা ম্যাগি পুরোহিত শ্রেণী যাহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ রূপে পরিগণিত হন তারা ইরান থেকে ভারতে সূর্যপূজার অনুপ্রবেশ ঘটান। কুষাণ ও অন্যান্য বিদেশীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায়, এই পূজা ভারতে জনপ্রিয় হয়।[১১] কুষাণদের আমলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সঙ্গে প্রাচীন বাংলা বা প্রাক্-গুপ্ত যুগের বঙ্গের মধ্যে, সামাজিক, আর্থিক,

বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান বা ভাব বিনিময় এর একাধিক তথ্য পাওয়া যায়। ফলে প্রাক্-গুপ্ত বঙ্গেও সূর্যোপাসনা-র প্রচলন হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। আর সূর্যোপাসনাকে কেন্দ্র করেই প্রাক্-গুপ্ত যুগের বঙ্গে ব্যাপক হারে মগ ব্রাহ্মণদের অনুপ্রবেশ ঘটে। এই ব্যাপারটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে, নাহলে সেটা হোত বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। মগ জাতির লোকেরা যেহেতু ইরাণ বা শাকদ্বীপে সূর্যপূজার পুরোহিত ছিল বা শাক দ্বীপীয় ব্রাহ্মণ ছিল, সেহেতু বঙ্গে বা ভারতের বর্ণ বা জাতি প্রথায় মগরা ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। চন্দ্রকেতুগড়ের প্রাপ্ত ভাঙা মৃৎফলকের উপর খরোষ্ঠী ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা 'মক্' শব্দটি তার প্রমাণ বহন করে আছে।[১২]

প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক সীমানা বলতে মূলত ঢাকা, বিক্রমপুর এবং ফরিদপুর সন্নিহিত অঞ্চলকে বোঝায়।[১৩] অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব দিকের উপকূল অঞ্চলকে বোঝায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'বঙ্গের' সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে বঙ্গের সীমানা বর্ধিত হয়ে বর্তমান পশ্চিম-বঙ্গের উপকূলীয়, অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রাক্-গুপ্ত যুগে এর সীমানা আরও বেড়ে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গর নিম্ন-বদ্বীপ অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের পদ্মার মোহনা পর্যন্ত সীমানা প্রসারিত করে। অর্থাৎ বাংলাদেশের পদ্মার মোহনা পর্যন্ত সীমানা প্রসারিত করে। অর্থাৎ বাংলাদেশের উপকূলবর্ত্তী অঞ্চল বঙ্গের ভৌগলিক এলাকার মধ্যে পড়ে। পরবর্ত্তী পর্যায়ে প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক সীমা আরও দীর্ঘায়িত হয়।[১৪] মক্ বা মগ জাতিদের বসবাস বঙ্গের আলোচ্য ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই ছিল।

উল্লিখিত বিশ্লেষণ ও আলোচনার শেষ পর্বে এসে আমরা মক্ বা মগ ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যাই দিতে পারি যে, গুপ্ত যুগের আগেই প্রাচীন বাংলায় সৌর উপাসক হিসাবে মগ জাতিদের আগমন হয়েছিল। বঙ্গে যে সৌর সম্প্রদায়ের (যারা সূর্যের উপাসক হিসাবে পরিচিত) উদ্ভব ঘটেছিল তার নেপথ্যে ছিল মগ ব্রাহ্মণরা। প্রাচীন বঙ্গের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল একথা মনে করা যেতে পারে। ইরাণীয় সংস্কৃতি ও প্রাচীন বঙ্গের সংস্কৃতির মধ্যে ভাববিনিময়ের ফলে সমগ্র বঙ্গ অঞ্চলে এক অভিনব ভাবধারা যথার্থভাবে অনুভূত হয়েছিল বলা যেতে পারে। প্রাক্-গুপ্ত বঙ্গে বহিরাগতর সংখ্যার পরিমাণ যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ছিল তা অনুমান করা যেতে পারে। কারণ পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ ভারত ইতিহাসের আদিমধ্যযুগে (আঃ ৬০০-১২০০ খ্রিঃ) বঙ্গ অঞ্চলে যে বহুসংখ্যক বহিরাগতের আগমন ঘটেছিল[১৫] তার সূচনালগ্নে অর্থাৎ প্রাক্-গুপ্ত যুগে বঙ্গ অঞ্চলে মগ জাতিদের আগমন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। হয়ত মগদের আগমনের আগে বা তাদের সময় থেকে বঙ্গ অঞ্চলে অনুপ্রবেশের হার বাড়তে থাকে। আদিমধ্য যুগে যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বহিরাগতরা সংখ্যায় বা গুরুত্বে এতটাই উল্লেখযোগ্য ছিল যে, তাদের দেশান্তরীয়' অভিধায় চিহ্নিত করতে হয়। দেশান্তরীয়দের সাথে বঙ্গালদেশীয়দের পৃথক করা হয়। বঙ্গাল দেশীয়রা স্থানীয় লোক ছিল নিঃসন্দেহে বলা যায়।[১৬] ফলে উভয়ের মধ্যে সু-সম্পর্ক বিরাজিত ছিল কিনা প্রশ্ন ওঠাই যুক্তিযুক্ত। যে প্রশ্ন ভারতের আদি মধ্যযুগে উঠতে পারে তা প্রাক্-গুপ্ত বঙ্গে মগ

জাতির অনুপ্রবেশের সময় উত্থাপিত হবে না কেন? কারণ প্রাক্-গুপ্ত যুগে বঙ্গ অঞ্চল সৌর উপাসনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। এমন কি অল্পবিস্তর যেটুকু তথ্যাদি পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে প্রাক্-গুপ্ত যুগে বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ছিল। ধর্মীয় আচরণ বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং সহিষ্ণুতার প্রশ্নে-কোন সমস্যা দেখা গিয়েছিল কিনা তা যথেষ্ট বিতর্কের বিষয়। যদিও সেই সময় উপাস্যদেবতারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। তবে একথা ঠিক যে, সর্বধর্ম সমন্বয়-এর দেশ হোল বঙ্গদেশ। এখানে অসহিষ্ণুতা, গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক কোথাও কোনওভাবে দুরত্ব, বৈরিতা বা অসহিষ্ণুতা জেগে উঠেছিল বা কোনদিন ওঠেনি-এ সম্পর্কে স্পষ্ট উত্তর হয়ত আগামী দিনের গবেষণায় পাওয়া যাবে। মগ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণদের আত্মিক মিলন কি সম্ভবপর ছিল? মুখ্যত বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী যখন বাঙ্গলায় আপন আপন ধর্মের দ্বারাই পরিচালিত হত। ধর্মের বাইরে এদের জীবন কিন্তু খুব অল্প অংশই। সুতরাং নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা বাঙ্গলার বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে কি ভাবে-আপন করে নিয়ে একসঙ্গে সহবস্থান করেছে সেটা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

সর্বশেষে মগ ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে যে আলোচনাটি করা একান্ত উচিত তা হোল, এরা কি কেবলমাত্র বঙ্গেই বাস করত? না অন্য কোথাও? বঙ্গ অঞ্চলে পেশাগত অবস্থান (সম্মান) কি একই মর্য্যাদায় উপনীত ছিল? না পরিবর্তন হয়েছিল? প্রশ্নদুটিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, পরবর্ত্তীকালে সূর্যোপাসক মগ ব্রাহ্মণদের সম্মান অনেকটা কমে যাচ্ছে। কারণ সূর্যোপাসনার ব্যাপক প্রচলন প্রাচীন বঙ্গে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

ফলে মগদ্বিজ বা মক্দ্বিজ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের বংশধরেরাই কালক্রমে ভোজকব্রাহ্মণ নামে পরিচিতি লাভ করে। শ্রাদ্ধাদিতে এরা দান গ্রহণ করতেন এবং সেই হিসাবে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হিসাবেও পরিচিত হন।[১৭] বঙ্গে অগ্রদানী ব্রাহ্মণরা কখনই ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের উপরের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না। বঙ্গের কোন কোন স্থানে আজও পর্যন্ত অগ্রদানী ব্রাহ্মণদের পরিচয় পাওয়া যায়।

মগ জাতিদের বাসস্থান শুধুমাত্র বঙ্গেই ছিল না-একথা বর্তমানে জোরের সঙ্গেই উচ্চারণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম লেখ-এর কথা বলা যেতে পারে। ডঃ দেবল মিত্র সম্পাদিত এক্সপ্লোরেশনস্ ইন্ আর্ট অ্যান্ড আরকেওলজি গ্রন্থে, কলিকাতা, ১৯৯৬ ডঃ গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত লেখমালা সম্বলিত একটি ঘটের সন্ধান দিয়েছেন। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত উৎকীর্ণিত লেখমালা মনে হয় ধর্মীয় দান' হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছিল। এর সময়কাল ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঘটে মক্ শব্দটির উল্লেখ আছে।[১৮] মক মানে মগ জাতির এ ব্যাখ্যা পূর্বেই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং চট্টগ্রামে প্রাপ্ত তথ্যাদির সূত্রে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, প্রাক্-গুপ্তযুগে বঙ্গ অঞ্চলে যে মগদের পরিচয় পাই তারা শুধু বঙ্গেই বাস করত না, পরবর্তীকালে তাঁরা সুদূর চট্টগ্রাম

অঞ্চলেও বাস করত। তারা শুধু সৌর উপাসকই ছিলেন না, রীতিমত রাজদরবারেও তারা আধিকারিকের ভূমিকা পালন করত।

সূত্রনির্দেশ

১। বি.এন. মুখার্জী, "**খরোষ্ঠী অ্যান্ড খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী ইনস্ক্রিপ্শনস্ ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল**" **ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন**, খন্ড-২৩, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৮, ২৯।

২। ঐ, ঐ, ঐ,

৩। প্রত্নতত্ত্ব অধিকার ও সংগ্রহালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ আয়োজিত ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক কর্মশালায় (১৯৯৯) ডঃ নিখিলেশ্বর সেনগুপ্তের পঠিত প্রবন্ধ।

৪। টলেমি, **সিওগ্র্যাফি হুপেগেসিস্**, সপ্তম, ১, টি ই.এল. স্টিভেনসন, সম্পাদিত ও অনুবাদিত, **জিওগ্র্যাফি অফ টলেমি**, বই অষ্টম, প্রথম অধ্যায় পৃষ্ঠা ১৫৩।

সুয়ান্-সাঙ, সি.ইউ.কি.

৫। **সাম্বপুরাণ।**

ভবিষ্য ১৩৯ অ।।

৬। **গোবিন্দপুর শিলালেখ**, শক অব্দ, খ্রীষ্টাব্দ অনুযায়ী তারিখ, ১১৩৭-১১৩৮ খ্রী, **এপিগ্র্যাফিক ইন্ডিকা**, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩০-৩৩৩।

৭। ভি.সি. শ্রীবাস্তব, **দ্যা সান ওয়ারিশন ইন এ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া**, বেনারস, ১৯৭২

সি.এফ.ওল্ডহাম, **দ্যা সান এ্যান্ড দ্যা সারপেন্ট**, লন্ডন, ১৯০৫, সচন, **অলবেরুণীর ভারত**

৮। পূর্বোক্ত

এবং

ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০

বৃহৎ সংহিতা ৫৭, অ।।, ৪৬-৪৭

বাণভট্টের হর্ষচরিত ।

Ed. J. Tarkapanchanan, Bibliotheca Indica, 94-96

ব্রহ্মপুরাণ, ২৮।৪৬-৪৭, ৬৪।।

T. Walters, on Yuan Chwang, II. 254.

৯। ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠায় ৩১২-৩১৫।

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট, কলিকাতা ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১৮১-১৮৩।

জে.এন. ব্যানার্জী, ডেভলপমেন্ট অফ্ হিন্দু আইকোনোগ্রাফি, পৃষ্ঠা ৪৩০।

ভি.সি. শ্রী বাস্তব, দ্যা সান ওয়ারশিপ ইন এ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, বেনারস, ১৯৭২।

১০। ঐ ঐ ঐ

১১। ঐ ঐ ঐ

১২। বি.এন. মুখার্জী, **খরোষ্ঠী এ্যান্ড খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী ইনস্ক্রিপ্শনস্ ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল**" **ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন**, খন্ড-২৩, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৮, ২৯

১৩। কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্র**, ২য় খণ্ড, ১১ ; অমিতাভ ভট্টাচার্য, "হিস্টোরিকাল জিওগ্রাফী

অফ এনশিয়েন্ট আরলি মিডিয়েভ্যাল বেঙ্গল;" কলিকাতা ১৯৭৭, পৃষ্ঠা-৫৬।

১৪। পূর্বোক্ত

১৫। রণবীর চক্রবর্ত্তী, বাংলা প্রবন্ধ, **অভিন্ন দেবতা, ভিন্ন মঠ ঃ প্রাচীন শ্রী হট্টের একটি 'ব্রহ্মপুর'**, আকাদেমি পত্রিকা, ৪ মে, ১৯৯১.

১৬। ঐ ঐ ঐ

১৭। ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৩১৫।

১৮। ডঃ দেবল মিত্র সম্পাদিত, **এক্সপ্লোরেশনস্ ইন আর্ট অ্যান্ড আরকেওলজি**, কলিকাতা, ১৯৯৬, ডঃ গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য এর প্রবন্ধ।

জাতকে প্রকৃতি বর্ণনা

কাকলী রায়

জাতক হল গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত। প্রত্যেক জাতকের তিনটি অংশ থাকে— প্রত্যুৎপন্নবস্তু, অতীতবস্তু এবং সমবধান। প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে গৌতমবুদ্ধ কোন্ প্রসঙ্গে আখ্যায়িকাটি বলেছিলেন তা' বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অংশটি অর্থাৎ অতীতবস্তু হল গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্ম বৃত্তান্ত। এটিই প্রকৃত জাতক বা মূল আখ্যায়িকা। সমবধান হল অতীতবস্তুতে বর্ণিত পাত্রদের সাথে বর্তমান বস্তুতে বর্ণিত ব্যক্তিদের অভেদ প্রদর্শন।

জাতকের কাহিনীগুলিতে দেখা যায় যে বোধিসত্ত্ব পশু, পাখী ও নানা সামাজিক স্তরের মানুষ হয়ে জন্মেছেন। যেহেতু জাতক আখ্যানধর্মী, তাই জাতকে স্বাভাবিকভাবে আমরা ব্যাপক অর্থে মানুষ এবং প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের বিচিত্র বিন্যাস দেখতে পাই। এই আলোচনায় জাতকের প্রকৃতিবিষয়ক তথ্যগুলিকে দুটি পৃথক দিক থেকে দেখা হবে। প্রসঙ্গতঃ অধ্যাপক ল্যামবার্ট স্মিথাউসেনের অনুসৃত পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যায়।[১]

অনুমান করা হয় জাতকের কালক্রম প্রথম খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ থেকে দ্বিতীয়-প্রথম খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। সামগ্রিক ভাবে এটি শুঙ্গ-কুষাণ-সাতবাহন যুগ বলে পরিগণিত। নানা কারণে এই ঐতিহাসিক পর্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্যে বোঝা যায় এই সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রান্তে ব্যাপকভাবে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। [এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রান্তে ব্যাপকভাবে জনবসতি গড়ে উঠেছিল।] এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ভারতবর্ষের প্রায় সবকটি ভৌগোলিক অঞ্চলেই একাধিক নগরের উপস্থিতি। উত্তর-পশ্চিমে তক্ষশীলা থেকে পূর্ব ভারতের তাম্রলিপ্ত এবং পশ্চিমে জুনাগড় থেকে দক্ষিণে কাবেরীপট্টনম পর্যন্ত প্রসারিত এক বিশাল ভূখন্ডে একাধিক নগর বাণিজ্য কেন্দ্র, সমুদ্র ও নদীবন্দর গড়ে উঠেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষের একটি বড় অংশে জীবনযাত্রার উপকরণে এক ধরণের সমতা (Uniformity of nature) ছিল। পাশাপাশি জাতকের বর্ণনা থেকে ভারতবর্ষের জনবসতির ছকটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কারিগর, বণিক, শাসক ও ধর্মজীবীদের সমাজ; তার পাশাপাশি গ্রাম—এখানে মূলতঃ কৃষিনির্ভর এবং পশু পালনকারী জনগোষ্ঠীর বসবাস। এরই সাথে আছে বিস্তীর্ণ অরণ্য আবৃত ভূখণ্ড, যেখানে বনবাসী সম্প্রদায় তখনও প্রাচীনতম জীবনযাত্রা—অর্থাৎ শিকার এবং বনজ উপাদানের উপর নির্ভরশীলতা বজায় রেখেছে। স্বাভাবিক ভাবে

নটি স্তরের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিততি মনে রাখলে জাতকে প্রকৃতির চেহারা সেভাবে ধরা পড়েছে তা' আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

এই আলোচনায় কতগুলি বিশেষ উপাদানকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে :— পশুপাখী, অরণ্য, পর্বত এবং জলাশয়।

জাতকের কাহিনীগুলিতে আমরা দেখি বোধিসত্ত্ব মোট ১০১ বার মনুষ্যেতর জন্মগ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে তিনি ১৮টিতে বানর, ১১টিতে মৃগ, ১০টিতে সিংহ ৮টিতে রাজহংস ৬টিতে যতাক্রমে বর্তক ও হস্তী, ৫টিতে যথাক্রমে কুক্কুট, গৃধ্র, অশ্ব, গো, ময়ূর এবং সর্প, ৩টিতে গোধা, ২টিতে যথাক্রমে মৎস্য, মুষিক, শৃগাল, কাক, কাষ্ঠকুট্টক, শূকর এবং একটিতে কুকুররূপে বর্ণিত।

তির্যক্ জগতে অন্তজ ও জরায়ুজ—এই ভেদ পরস্পরের প্রতি শত্রুতা সৃষ্টি করে। অথচ প্রাকৃতিক নিয়মে অন্তজ ও জরায়ুজ সত্ত্বার অস্তিত্ব স্বভাবজ। নকুলজাতকে (১৬৫) ও অহির এবং চর্তুসৃষ্ট (১৮৭) জাতকে হংসপোতক ও শৃগালের এই সহজাত বৈরীতা বিদ্যমান।

মহাভূত চতুষ্টয় (জল, অগ্নি, বায়ু, মৃত্তিকা) পরস্পর ভিন্নধর্মী, এমনকি একের প্রয়োগে অপরটি বিনষ্ট হয়। অথচ এই মহাভূতের সমতায় নিসর্গ ও জগত সদা ক্রিয়াশীল, যেমন অগ্নির প্রচন্ড তেজ জলদ্বারা নির্বাপিত হয়। অনুরূপভাবে সংস্তব (১৬২) জাতকে পরস্পরবিরোধী জন্তুগুলি (সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপি ও শ্যামামৃগী) সদ্ভাবাপন্ন হয়ে একত্রে বিরাজ করছে। নৈসর্গিক জগতের এই সহাবস্থান ব্যক্তি এবং সমষ্টি—উভয়ের ক্ষেত্রেই কাম্য।

কুরঙ্গমৃগ জাতক (২০৬) শুধুমাত্র কতগুলি প্রাণীর (কচ্ছপ, মৃগ এবং বক) পারস্পরিক সহাবস্থানের কথাই বলেনা, এখানে একের বিপদে অন্যকে সহায়তা করতে দেখা যায়। নিসর্গরাজ্যে অন্তজ, জরায়ুজ এবং খেচর জীব পরস্পরের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে।

অন্তজ জীবদের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে কম হলেও ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা বহু পঞ্চ ইন্দ্রিয় জীবের তুলনায় স্বভাবত বেশী। কচ্ছপ (১৭৮) জাতকে তাই দেখা যায় জলে বসবাসকারী কচ্ছপ ও মৎস্যেরা সুবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির পূর্বাভাস বুঝতে পারে।

মানুষ পঞ্চস্কন্দযুক্ত, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্কলন। তদুপরি মন ও মনোবিজ্ঞান মানুষের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। হস্তী জরায়ুজ এবং চতুরিন্দ্রিয়সম্পন্ন। ইন্দ্রসমানগোত্র (১৬১) জাতকে দেখা যায় বোধিসত্ত্ব হস্তী প্রতিপালন করতে গিয়ে হস্তীকর্তৃক নিহত হন। সুতরাং কূল, সমাজ, গোষ্ঠী ও জাতি বিচারে ভেদ থাকলে নিসর্গ সমতা স্থাপন করা সম্ভব নয়।

ময়ূর জাতকে (১৫৯) সূর্যের সঙ্গে তির্যক্ ও মনুষ্যজগতের সত্ত্বার যে ঘনিষ্ঠতা তা' আলোচনা করে বলা হয়েছে সূর্যই সত্ত্বামাত্রের প্রাণস্পন্দনের উৎস।

পশুপাখির আলোচনা প্রসঙ্গে অনিবার্য ভাবে যে প্রসঙ্গটি এসে পড়ে তা' হল তাদের আশ্রয়স্থল অর্থাৎ অরণ্য এবং তৎসংলগ্ন পর্বত ও জলাশয়ের কথা। সমগ্র জাতকের কাহিনীগুলিতে অরণ্য, পর্বত ও জলাশয়ের বশিষ্ট স্থান আছে এবং এগুলির বর্ণনা নানাভাবে আছে। আমরা তার মধ্যে কয়েকটিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করব।

(ক) কুনাল জাতকে (৫৩৬) এক রমণীয় বনভূমির উল্লেখ আছে। এই বনভূমি বর্ণনায় বলা হয়েছে, "পর্বতসমূহ সর্ববিধ ওষধি দ্বারা মণ্ডিত ছিল; তরুলতা নানাবিধ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত ছিল; গজ, গবয়, মহিষ্য, রুরু, চমরী, গোকর্ণ, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপি, ঋক্ষ, কোক (নেকড়ে), উদবিড়াল, কদলীমৃগ প্রভৃতি প্রাণী বিচরণ করিত। নানা জাতীয় বিড়াল ও গজযুথ, হয্যমৃগ, শাখামৃগ, শরভমৃগ, এনিমৃগ, বাতমৃগ, পৃষতমৃগ, যক্ষ ও রাক্ষসগণ বাস করিত। মুকুল মঞ্জরীধর, পুষ্পিতাগ্র, ঘনসন্নিবিষ্ট মহীরুহ গণ এই অরণ্যের শোভা বর্দ্ধন করিত। কুরর, চকোর, বারণ, ময়ূর, পরভৃৎ, জীবঞ্জীবক, করবীক প্রভৃতি বিহঙ্গের রব শুনা যাইত। তাহার ভূতল অঞ্জন, মনঃ শিলাতল, হরিতাল, হিঙ্গুল, সুবর্ণ রজত প্রভৃতি শতশত ধাতুদ্বারা রঞ্জিত ছিল।"[২]

(খ) সুধাভোজন জাতকে (৫৩৫) বর্ণিত অরণ্যের মধ্যে আমরা পিয়াল, পনস, আম্র, অশোক, কিংশুক, শাল, সৌভাঞ্জন (সজনা), লোধ্র, পদ্ম, ভঙ্গ (ভাঙ্ বা সিদ্ধি), তিলক (একপ্রকার পুষ্পগুল্ম), তবে উদম্বু, ন্যাগ্রোধ, অশবথ, সিন্ধুবার (নিষিন্দা) প্রভৃতি গাছের উল্লেখ পাই। এছাড়া বিভিন্ন শস্য ক্ষেত্রের বর্ণনাও পাওয়া যায়; যেমন শ্যামাক (শ্যামা ঘাসের বীজ), নীবার (একপ্রকার বনজ ধান্য), তন্ডুল, হরেণু ইত্যাদি। সংস্কৃতে হরেণু একপ্রকার মটরকে বোঝায়। পালি সাহিত্যে হরেণু মুগ, মায, তিল, কুলথ, অলাবু, কুষ্মাণ্ড—এই কযটি বোঝায়।

এই বনভূমির উত্তরে দর্পনের ন্যায় স্বচ্ছ, অভগ্নতট এক দীর্ঘ সরোবরের উল্লেখ আছে। এই সরোবর শৈবালাদি বর্জিত এবং প্রাচীন (বোয়াল), শকুল (শোল), শৃঙ্গি (শিঙি) রহিত ইত্যাদি মৎস্য বিচরণ করে। খাদ্যের লোভে হংস, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, ময়ুর, কোকিল ইত্যাদি পাখী এই সরোবরের তীরে অবস্থান করে। জলপানের জন্য এখানে পশুর সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গন্ডার, গবয়, অশ্ব, মহিষ ইত্যাদি বহু পশুর আগমন হয় যারা বৈরভাব ত্যাগ করেছে।

(গ) ষড়দন্ত জাতকে (৫১৪) ষড়্দন্ত হ্রদ নামে এক জলাশয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই হ্রদ দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে পঞ্চাশ যোজন। মধ্য-ভাগে দ্বাদশ যোজন পরিমিত জলাংশে শৈবালাদি কোনরূপ জলজ উদ্ভিদ নাই। সেখানে নির্মল জলরাশি ঐন্দ্রজালিক মণির ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই জলরাশি বেষ্টন করিয়া এক যোজন পরিমিত কহ্লারবন, তদনন্তর কহ্লারবন বেষ্টন করিয়া যোজন পরিমিত নীলোৎপল বন, তাহার পর এক একটিকে বেষ্টন করিয়া যথাক্রমে যোজনব্যাপী রক্তোৎপল, শ্বেতোৎপল, রক্তপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, ও কুমুদের বন অবস্থিত। এই সপ্তবন বেষ্টন করিয়া আবার কহ্লারাদি উক্ত সপ্তবিধ পুষ্পের যোজনব্যাপী রক্তশালিবন। সেখানে জল এত অগভীর যে হস্তীরা অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে। সর্বশেষে জলের শেষসীমা পর্যন্ত নীল, পীত, লোহিত ও শ্বেতবর্ণের সুরভি ও রমনীয় কুসুম পরিশোভিত নানা জাতীয় ক্ষুদ্র গুল্ম। এই দশটি বনের প্রত্যেকটির বিস্তার এক যোজন। ইহাদের বহির্ভাগে ছোট বড় নানাবিধ উৎকৃষ্ট জাতীয় মাষ ও মুগের বন, কলম্বী, এরারুক, অলাবু, কুষ্মান্ড প্রভৃতি লতার বন, গজদন্ত প্রমাণ ফলবিশিষ্ট কদলীবন, শালবন, পনসবন, সুমধুর ফলবিশিষ্ট তিন্ডিরিবন, কপিত্থবন এবং সর্বশেষে তরুলতাসমাকীর্ণ মহারণ্য।

ইহার বহির্ভাগে আছে বেণুবন। এই বেণু বনের চতুর্দিকে সাতটি পর্বতমালা আছে। ইহাদের নাম—ক্ষুদ্রকৃষ্ণ, মহাকৃষ্ণ, উদক, চন্দ্রপার্শ্ব, সূর্যপার্শ্ব, মণি-পার্শ্ব, ও সুবর্ণপার্শ্ব। সুবর্ণ পার্শ্ব ষড়দন্তকে পরিবেষ্টন করিয়া পাত্রমুখবর্তির ন্যায় অবস্থিত। ইহার উচ্চতা সপ্তযোজন। ইহার যে পার্শ্ব আভ্যন্তরীণ তাহা সুবর্ণবর্ণ। ইহা হইতে যে আভা বিকীর্ণ হয় তাহাতে ষড়দন্ত হ্রদ বালসূর্যের ন্যায় দীপ্তি পায়। বহিঃস্থ পর্বতগুলির উচ্চতা ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই ও এক যোজন। সপ্তগিরি পরিবেষ্টিত ষড়্দন্ত হ্রদের পূর্বোত্তর কোণে হ্রদশীকরশীতল স্থানে একটি বিশাল বটবৃক্ষ আছে। ইহার স্কন্ধের পরিধি পাঁচ যোজন, উচ্চতা সাত যোজন, চারিদিকে চারিটি শাখার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ছয় যোজন। যে শাখাটি উর্ধদিকে গিয়াছে তাহার প্রমাণ ছয়যোজন মূল হইতে তেরো যোজন উচ্চ, একদিক হইতে বিপরীত দিকের শাখা বারো যোজন, প্ররোহের সংখ্যা আট হাজার। ইহা তৃমগুল্মাদিহীন মণিপর্বতের ন্যায় বিরাজ করিত।''[৭]

(ঘ) নেমিজাতক (৫৪১) এ সাতটি পর্বত এবং তৎসংলগ্ন জলাশয়ের বর্ণনা আছে। পর্বতগুলি হল সুদর্শন, করবীক, ইষ্টাধর যুগন্ধর, নেমিন্ধর, বিনতক এবং অশ্বকর্ণ। বর্ণনাটি এই রকম—''সকলের বাহিরে সুদর্শন পর্বত, তাহার পর করবীক, ইহা সুদর্শন অপেক্ষা উচ্চতর। উভয় পর্বতের মধ্যে একটি সীদান্তর সমুদ্র। অতঃপর যথাক্রমে ইসাধর, যুগন্ধর, নেমিনধর, বিনতক ও অশ্বকর্ণ পর্বত পরপর উচ্চতর হইয়া সোপানকারে অবস্থিত। পরস্পর নিকটবর্তী প্রতি দুই পর্বতের অন্তবর্তী অংশ এক একটি সীদান্তর সমুদ্র। এই পর্বতগুলির কেন্দ্রভাগে সুমেরু পর্বত। তাহার শিখরদেশে ত্রয়স্ত্রিংশদভবন বা দেবনগর।''[৮] সীদা শব্দটি এই জাতকের ১৪শ গাথায় নদীরূপে এবং ১৪৫তম গাথায় সমুদ্ররূপে বর্ণিত হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যাটি হল যে 'ইহার জল এত লঘু যে ময়ুরের পালক পড়িলেও তাহা তৎক্ষনাৎ ডুবিয়া যায়।''[৯]

(ঙ) বিশ্বন্তর জাতকে (৫৪৭) আমরা বিস্তৃতভাবে প্রকৃতির বর্ণনা পাই। রাজা বিশ্বন্তরের আশ্রমের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখা যাচ্ছে অঞ্জন বা আবঞ্জব পর্বত, গন্ধমাদন পর্বত, সুবর্ণ গিরিতাল পর্বত, এবং কোন্তীমারা নদীর কথা। বিশাল অরণ্যভূমিতে অশ্বকর্ণ, ধব, খদির, পলাকা প্রভৃতি তরুলতার পাশাপাশি পনস, আম্র, শাল, বিভী তক, জম্বু, হরিতকী, অশ্বত্থ, ন্যাগ্রোধ, তিম্বরু (আবলুশ), ভব ও (কামরাঙ্গা), দ্রাক্ষা, তাল, নারিকেল প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

এছাড়া আছে এক মনোরম তটিনী, যার জল অত্যন্ত স্বচ্ছ; শ্বেত, নী ল, রক্তশতদল, ও শৃঙ্গাটক (পানিফল) সমাচ্ছন্ন।

এই বর্ণনাগুলি ছাড়াও বিভিন্ন জাতক কাহিনীতে আমরা আরও পর্বত, বৃক্ষ ও জলাশয়ের উল্লেখ পাই। উদাহরণস্বরূপ বৈভার পর্বত, বিপুলগিরি পর্বত, গৃধ্রকূট পর্বত, সুদর্শন, নিসভ্যও কাকনেরা পর্বত (ভূরিদত্ত জাতক), কোনও এক নদীর মধ্যে আম্রপনস প্রভৃতি ফলবৃক্ষসম্পন্ন দ্বীপ (বানরেন্দ্র জাতক, ৫৭), কিম্ফল নামে একটি বিম্বফল (ফলজাতক, ৫৪) যার বৃক্ষের কান্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল—সবই আমের মত, ইত্যাদি।

জাতকের কাহিনীগুলির কয়েকটিতে কান্তারের উল্লেখ ও দেখতে পাওয়া যায়। অপন্নক জাতকে (১) আমরা পাঁচ রকম কান্তারের উল্লেখ পাই। সেগুলি হল—

(১) চৌরকান্তার—অর্থাৎ যেখানে দস্যুভয় আছে;

(২) ব্যাল কান্তার—অর্থাৎ যেখানে সিংহব্যাঘ্রাদির ভয় আছে;

(৩) নিরুদক কান্তার—অর্থাৎ যেখানে জল নাই;

(৪) অমনুষ্যকান্তার—অর্থাৎ যেখানে যক্ষ রক্ষো ভূতপ্রেতাদির ভয় আছে;

(৫) অল্পভক্ষ্য কান্তার—অর্থাৎ যেখানে খাদ্যাভাব।

বন্নুপথ জাতকে (২) একটি কান্তারের বর্ণনা আছে নিরুদককান্তার বলে মনে হয়। বর্ণনায় বলা হচ্ছে —"সেখানকার বালুকা এত সূক্ষ্ম ছিল যে মুষ্টি মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিলে তাহা আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পড়িয়া যাইত। সূর্য্যোদয়ের পর এই বালুকারাশি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় উত্তপ্ত হইত। এই ভীষণ মরুদেশ অতিক্রম করিবার সময় পথিকেরা রাত্রিকালে পথ চলিত এবং দিবাভাগে বিশ্রাম করিত।"[৮]

জাতকের প্রকৃতি বর্ণনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক বর্ণনা বহুলাংশে প্রথাসিদ্ধ (Conventional)। এই প্রথাসিদ্ধ বর্ণনায় একই সাথে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের পশুপাখী, বৃক্ষ, লতাপাতার উল্লেখ দেখা যায়। অনুমান করা অসঙ্গত হবেনা যে এই বর্ণনা বহুদিন থেকে প্রচলিত শ্রুতিনির্ভর কাহিনী পরম্পরা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই ধরণের বর্ণনায় ঘটনাস্থল বা প্রধান চরিত্রগুলিকে একটি বিশেষ ভৌগোলিক বা নৈসর্গিক পরিমন্ডলের সাথে যুক্ত করা যায় না। যেমন ষড়্দন্ত (৫১৪) জাতকে ষড়্দন্ত হ্রদের বর্ণনা।

অন্যদিকে একাধিক জাতককাহিনীতে প্রকৃতির বর্ণনার অনেকটাই বাস্তবধর্মী। এই বাস্তবধর্মী বর্ণনায় যে ধরণের পশুপাখী, গাছপালা বা অন্যান্য নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলিকে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সাথে নিশ্চিতভাবে যুক্ত করা যায়। অনুমান করা যায় এই ধরণের বর্ণনা প্রচলিত কাহিনী পরম্পরা থেকে খানিকটা পৃথক এবং দেশকাল বিন্যাসে সেই পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বন্নুপথজাতক (২) বর্ণিত নিরাদক কান্তারের কথা বলা যেতে পারে।

জাতকের প্রকৃতি-বর্ণনায় আর যে বৈশিষ্ট্যটি পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে তা হল ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের আভাস। আগেই বলা হয়েছে প্রকৃতির বর্ণনায় প্রথাসিদ্ধ উপাদানের প্রাধান্য রয়েছে। কিন্তু কয়েকটি অত্যন্ত তাৎপর্যময় শব্দের প্রয়োগে এই প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক বৈচিত্র্য বিষয়ে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বন্নুপথ জাতকে কান্তারের যে বর্ণনা আছে, সেটির কথা বলা যায়। স্পষ্টতঃই এই ধরণের বর্ণনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই জাতক কাহিনীগুলিতে গ্রথিত হয়েছিল।

সর্বোপরি জাতকে পশুপাখি, বৃক্ষ, লতাপাতা এবং মানুষের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। এই সম্পর্কের মূলে নিশ্চিতভাবে যে ভাবনাটি কাজ করেছে তা' হল এদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যা প্রাকৃতিক ভারসাম্যের মূল ভিত্তি। এই

বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে পশুতে মানবিকগুণের আরোপে, বৃক্ষের সাথে পশু এবং মানুষের প্রগাঢ় সম্পর্কে এবং পশুর প্রতি মানুষের করুণাতে। উদাহরণস্বরূপ ন্যাগ্রোধমৃগ (১২), দুর্মেধা (৫০), মহাস্বপ্ন (৭৭), লৌহকুম্ভী (৩১৪), অষ্টশব্দ (৩১৮) প্রভৃতি জাতকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

ন্যাগ্রোধমৃগ (১২) জাতকে দেখা যাচ্ছে রাজার আহারের জন্য প্রতিদিন বহু হরিণ মারা হত। হরিণেরা নিজেরাই স্থির করল একদিন একজন করে প্রাণ দেবে। একদিন এক অন্তঃসত্ত্বা হরিণীর দিন উপস্থিত বলে বোধিসত্ত্ব কৌশলে প্রথমে ঐ হরিণী এবং পরে সমগ্র মৃগকূল, চতুষ্পদ প্রাণী ও বিহঙ্গকূলকে রক্ষা করলেন।

দুর্মেধা জাতকে (৫০) পর্বোপলক্ষে বহু পশু বলি দিয়ে দেবতার অর্চনার কথা বলা আছে। মহাস্বপ্ন জাতকে (৭৭) রাজা স্বপ্নভয়ে ভীত হলে পুরোহিতেরা বহু পশু, পাখী বলি দিয়ে যজ্ঞ করার উপদেশ দেন।

লৌহকুম্ভীজাতকে (৩১৪) রাজার হিতসাধনের জন্য পুরোহিতেরা সর্বচতুষ্ক যজ্ঞ (অর্থাৎ হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি পশু, বক ও অন্যান্য পাখি—সবই চারটি করে বলি দিয়ে যে যজ্ঞ) সম্পাদনের উপদেশ দেন। এই কারণে বহু পশুপাখিকে বন্দী করা হয়। একই ধরণের কাহিনী অষ্টশব্দ জাতকেও (৪১৮) দেখা যায়। এইসব ক্ষেত্রেই বোধিসত্ত্বের পরামর্শ এবং উপদেশদানের মাধ্যমে মরণভয়ে ভীত সমস্ত পশুপাখির প্রাণরক্ষা হয়।

এইভাবে জাতকে মানুষ বৃক্ষ এবং পশুজগতে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্যে দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভারহুত, সাঁচী, বুদ্ধগয়ার আখ্যানধর্মী (Buddhist narrative art) এই মানসিকতার প্রতিফলন অত্যন্ত স্পষ্ট। এই বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

সূত্রনির্দেশ

১। **Schmithansen, Lambert** (1991) : Buddhism and Nature ; Studia philosophica Buddhica, occessional paper series VII, Tokyo ; pp. 1.

২। ঈশানচন্দ্র ঘোষ, অনূদিত (১৩৯১) **জাতক**, ৫ম খন্ড, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৬২

৩। ঐ পৃষ্ঠা ২২

৪। ঐ পৃষ্ঠা ৯০

৫। Fausboll. v. ed (1964) : Jataka, vol VI, London page 100 (vs. no 14) and page 125 (vs no 145)

৬। ঈশানচন্দ্র ঘোষ, অনূদিত (১৩৯১) ঃ জাতক, ১ম খন্ড কলিকাতা, পৃঃ ১০।

প্রাচীনভারতে নবগ্রহমূর্তি ও পাল যুগের একটি অনন্য শনি প্রতিমা

রাজশ্রী মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় ধারণা অনুযায়ী শনি হলেন নবগ্রহের অন্যতম এবং রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—এই নয়টি 'গ্রহ' একত্রে নবগ্রহ বলে পরিচিত। এঁদের সকলকেই বিপজ্জনক মনে করে গ্রহযাগ বা গৃহযাগ ও স্বস্ত্যয়ন বিধি অনুসারে এঁদের পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং বিশ্বাসী হিন্দুদের মধ্যে এখনও রয়েছে। বিশিষ্ট মূর্তিতত্ত্ববিদ জে.এন. ব্যানার্জীর মতে এই প্রবণতা পূর্বাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়।[১] এই মতামতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকেই অতি উৎকৃষ্ট নবগ্রহফলকসমূহ ও আলোচ্য শনি প্রতিমাটিও (বর্তমানের বিহার) পাওয়া গিয়েছে।

বিপদের সময় নবগ্রহ পূজো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ ভাবা হতো যে এঁদের রোষ, অসন্তোষ বা কোপের ফলে মানবজীবনে দুর্বিপাক নেমে আসে। মহাকাব্যে ও পুরাণে, দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দ্বাদশ আদিত্য ও নবগ্রহ প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় জীবনে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল।[২]

'যাজ্ঞবল্ক্যসূত্র' তাদের গ্রহযজ্ঞ বা নবগ্রহপুজো করতে উপদেশ দিয়েছে, যারা শান্তি ও সমৃদ্ধি, পর্যাপ্ত ফসলের জন্য বৃষ্টি, দীর্ঘায়ু-সুস্বাস্থ্য কামনা করে ও শত্রুর ক্ষতি সাধন করতে চায়।[৩] এই গ্রন্থে আছে যে নবগ্রহ মূর্তি তামা, স্ফটিক, রক্তচন্দন, সোনা, রূপা, লোহা, সীসা বা কাঁসা দিয়ে তৈরি হবে অথবা পটের ওপর রং দিয়ে আঁকা হবে। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর', 'অংশুমৎভেদাগম', 'শিল্পরত্ন', ও 'অগ্নিপুরাণে' নবগ্রহের বর্ণনা, মূর্তি তৈরীর উপাদানের জন্য নির্দেশ, তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গী, হাতের মুদ্রা, আসন ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন 'বৈখানসাগম'-এ বলা হয়েছে যে কুবের, যক্ষদের অধিপতি এবং নবগ্রহদের মাপ হবে নবার্দ্ধ তাল (১১৪ অঙ্গুল)। এমন কি জৈন মূর্তি শিল্পে জিন্ বা তীর্থঙ্কর ছাড়া আর যে দেবতাদের মূর্তি পাওয়া যায়, তারা হলেন দিক্‌পাল ও নবগ্রহ। এদের উপাসক ও শাসনদেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] শনির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় 'স্কন্দপুরাণে'র রেবাখন্ডে। সেখানকার শনিস্তোত্রে বলা হয়েছে—

> "ক্রুরঃ শনৈশ্চরো বক্রশ্ছায়াহৃদয়নন্দন ঃ
> মার্ত্তন্ডেয়স্তথা সৌরিঃ পীতাঙ্গী-গ্রহনায়কঃ।।

ব্রাহ্মণ্যঃ ক্রূরকর্ম্মা চ নীলবস্ত্রোহঞ্জনদ্যুতিঃ।
দ্বাদশৈতানি নামামি শনিং সমাজ্যুযঃ পঠে।।"

শনি যে সূর্যপুত্র এই তথ্যের ওপর জোর দেওয়ার জন্য শুধু 'সৌরি' নয়, তাঁকে 'সূর্য্যাত্মজঃ স্থিরগ্রহঃ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

অতএব উপরোক্ত সূত্র সাহিত্য, পুরাণ ও বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্রের উল্লেখ থেকে এ কথা পরিষ্কার যে প্রাচীনভারতে নবগ্রহ ও শনি পূজা সুপ্রচলিত ছিল এবং শিল্পশাস্ত্র অনুসারে তাদের মূর্তিও তৈরী হতো। উৎখনিত বা আবিষ্কৃত প্রধান নবগ্রহফলকগুলি দেখলে, প্রধান কতগুলি প্রতিমা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন, এই গ্রহদের একক বা আলাদা প্রতিমা খুবই বিরল। সাধারণতঃ এরা একই লাইনে সার বেঁধে খোদিত হতো। নবগ্রহমূর্তি প্রায় সবসময়েই দন্ডায়মান ও খুব কম ক্ষেত্রেই উপবেশনরত। বৈষ্ণবা বা শৈব মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারফলকে, মন্দিরগাত্রের অলংকরণরূপে (যেমন ভুবনেশ্বরের কিছু শৈব মন্দিরের গায়ে), সূর্যমূর্তির প্রভাবলী বা পৃষ্ঠপটে ও সূর্য মন্দিরের চার কোণায় পার্শ্বদেবতা রূপে নবগ্রহ মূর্তি পাওয়া যায়। আদি মধ্যযুগ ও মধ্যযুগের ভারতীয় স্থাপত্যে এই ধরণের প্রচুর নিদর্শন রয়েছে।

বিভিন্ন প্রত্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত এমন কয়েকটি নবগ্রহফলক উল্লেখ ও বর্ণনার দাবি রাখে। সারনাথ থেকে প্রাপ্ত, গুপ্ত আমলের শেষদিককার একটি ভগ্ন ফলক তার মধ্যে অন্যতম। বেলেপাথরের এই ভগ্ন ফলকটিতে (ভারতীয় জাদুঘর সংগ্রহ সংখ্যা ১৫৩৬) মাত্র চারটি গ্রহ অবশিষ্ট আছে—বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এবং রাহু। এরা প্রত্যেকেই দ্বিভুজ এবং প্রথম তিনজনের দাঁড়ানোর ভঙ্গী লালিত্যময় ও নমনীয়। বৃহস্পতি, শুক্র, শনি—এদের প্রত্যেকের ডানহাতে অক্ষমালা ও মাথার পিছনে প্রভামণ্ডল। শনিমূর্তির বাঁ হাত ভাঙা। তাই তাঁর বাঁহাতে কি আয়ুধ ছিল বোঝা যায় না। প্রখ্যাত মূর্তিতত্ত্ববিদ জে.এন. ব্যানার্জির মতে, এই ফলকে মোট আটটি গ্রহের মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। চারটির কথা আমরা সেভাবে জানতে পারি না। শুধু অনুমান করতে পারি কারণ ফলকটি পাওয়া যায় প্রথম চারটি মূর্তিছাড়াই অর্থাৎ সেগুলি আগে ভেঙে গিয়েছে। তবে অনুমান করা হয় আটটি মূর্তি কারণ প্রাথমিকভাবে অষ্টগ্রহের মূর্তিরই প্রচলন ছিল। মূর্তিশিল্পের উদ্ভবের দিক থেকে বিচার করলে কেতু হল পরবর্তী সময়ের সংযোজন। এর যুক্তি হিসাবে, জে.এন. ব্যানার্জী বলেছেন যে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে ভৌমকার যুগের যে শৈব মন্দিরগুলি রয়েছে, তার দ্বারফলকে অষ্টগ্রহের মূর্তিই পাওয়া যায়। কেতুর আবির্ভাব ঘটেছে গঙ্গ যুগ ও তার পরবর্তী সময়ে।

পরের দিকের কিছু ফলকে একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এই ফলকগুলির শুরু হয়েছে গণপতির মূর্তি দিয়ে। প্রথমে গণেশের মূর্তি, তারপর নবগ্রহের মূর্তি। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া থেকে প্রাপ্ত ও বর্তমানে আশুতোষ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত নবগ্রহফলকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু নিজ নিজ আয়ুধ ধারণ করে, সম্মুখে গণেশ সহ, পর পর দন্ডায়মান। ফলকটি আনুমানিক ৮ম শতকের।

আশুতোষ সংগ্রহশালায় রক্ষিত আর একটি ফলকের উল্লেখ করা যেতে পারে যা কিনা ২৪ পরগণার কণকদীঘি অঞ্চল থেকে পাওয়া গিয়েছে। এই ফলকটি শিল্পসুষমা মণ্ডিত এবং এর ভাস্কর্য অতি উচ্চমানের। সময় আনুমানিক ১১শ শতক। এখানে দেখা যায় যে গ্রহদেবতারা শিলাফলকের বজ্রাঙ্গের মধ্যে গভীর ভাবে উৎকীর্ণ। ফলকের বহ্নিশিখার রূপকল্প দর্শনীয়। নবগ্রহগণ লালিত্যময় ভঙ্গীমায় পদ্মপীঠে দণ্ডায়মান। এদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ডৌলে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ফলকের জমি থেকে প্রধান মূর্তিগুলি যেভাবে উদ্গত তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে— যে এটি শুধুমাত্র মন্দিরের দ্বারফলক বা অলংকরণের জন্য ব্যবহৃত হতো না। গ্রহযাগের সময় এটি নিয়মিত পূজিত হতো।[৮]

নবগ্রহ খোদাই করার একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ পাওয়া যায় উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলের খিচিং থেকে। এখান থেকে প্রাপ্ত দ্বাদশ শলাকাযুক্ত একটি চক্রের, ভেতরের প্রশস্ত অংশে গ্রহবেদতাদের মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। চক্রটি একধারে পদ্মপীঠের ওপর স্থাপন করা হয়েছে। এই অনন্য নবগ্রহচক্রও কণকদীঘির ফলকের মত নিয়মিত পূজিত হতো বলে অনুমান।

এবার যদি শনির মূর্তি বা মন্দিরের প্রসঙ্গে আসা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে প্রাচীন অথবা আদি মধ্যযুগের ভারতবর্ষে নবগ্রহ ফলক বা নবগ্রহমূর্তির যতটা প্রচলন ছিল, শুধুমাত্র শনিদেবের একক মূর্তি বা মন্দির ততটাই অপ্রচলিত। আলোচিত সময়কালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে কেবলমাত্র একটি শনিমন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহল পণ্ডিচেরীর কাছে তিরুনাল্লার এলাকায় করিকালের আমলের একটি শনি মন্দির।[৯] বর্তমানে কলকাতাসহ, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রায়শই যে শনিমন্দির বা বড়ঠাকুরের (শনির প্রচলিত লোকায়ত নাম) মন্দির পাওয়া যায়, তা বহু পরের ঘটনা।

নবগ্রহ ফলকের প্রতুলতা ও পূজোর প্রচলন ও একইসঙ্গে আলাদা, একক শনিমূর্তির বিরলতা, বর্তমানে আশুতোষ সংগ্রহশালায় রক্ষিত শনির একটি একক মূর্তির প্রতি যে কোন শিল্প-ঐতিহাসিকের বা ইতিহাসানুরাগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মূর্তিটি একাধিক কারণে অনবদ্য এবং তা সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

আলোচ্য শনিমূর্তিটি আনুমানিক ৯ম শতকের এবং এর প্রাপ্তিস্থান হল বর্তমান বিহার। এখনকার বিহার মধ্য-৮ম থেকে ১৩শ শতকের শুরু অবধি রাজনৈতিক ভাবে প্রথম পাল ও পরবর্তী কালে সেন রাজাদের অধীনে ছিল। আদি মধ্যযুগের এই অঞ্চলটির কোন আলাদা বিশেষ নাম না থাকায়, ব্যবহারিক সুবিধার জন্য আমরা পাল রাজার রাজত্ব বলে ভাবতে পারি। অতএব প্রাপ্তিস্থান ও কালের সমন্বয় করলে দেখা যায় যে মূর্তিটি পাল আমলের।

পাল শৈলীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একটিমাত্র মিল আছে এবং তা হল উপাদানে। পাল ও সেন আমলের অধিকাংশ মূর্তির মত এটিও কালো কষ্টিপাথরে খোদিত। তবে পাল-সেন যুগের মূর্তিশিল্পে যে ঐশ্বর্য মণ্ডনের আধিক্য বা অলংকরণের সূক্ষ্মতা ও বাহুল্য দেখা যায়, তা এই মূর্তিটিতে অনুপস্থিত। এর ভাস্কর্যের সারল্যে ও সপ্রাণ ঔজ্জ্বল্যে লুকিয়ে আছে তার স্বকীয়তা।

উচ্চতায় নাতিদীর্ঘ মূর্তিটি, বেশি বড় না হওয়ার জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর রূপায়ণে ও সমগ্র রূপকল্পের ভেতরে চমৎকার একটি ভারসাম্য বজায় আছে। মূল দন্ডায়মান মূর্তির পিছনে লম্বাটে অর্ধবৃত্তাকার শীর্ষের ভরাট পৃষ্ঠপট। পৃষ্ঠপটের শীর্ষে কোন কীর্তিমুখের অলংকরণ নেই ও তার মাঝের জমিও ভরাট, সমান ও অলংকারহীন। কেবল চারধারে শাড়ির পাড়ের মত সরু করে গোল, মটরদানার মত অলংকরণ। শনিদেব দাঁড়িয়ে আছেন ছড়ানো পদ্মপীঠে। পদ্মপীঠের দু'ধারে জোড়কর, নতজানু, হ্রস্বায়তন দুই ভক্তমূর্তি উর্ধ্বমুখে ভক্তি বিগলিত ভাবে তাদের আরাধ্যদেবের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই ভক্তমূর্তিদ্বয়ের তক্ষণেও কোন বাহুল্য বা ঐশ্বর্যমন্ডণের চিহ্ন নেই। শুধুমাত্র অবয়ব ও ভঙ্গী খোদাই করেই ভাস্কর তার কর্ম সমাধা করেছেন। শনির ডানহাতে অক্ষমালা, বাঁহাতে দীর্ঘ দন্ড (ত্রিশূল?) কানে রত্নকুন্তল। উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত ও নিম্নাঙ্গের বস্ত্রেও কোন বিশেষ বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। তা কোমর থেকে হাঁটুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। মাথায় এক বিশেষ ধরনের জটা মুকুট, যার সাথে অনেক, অনেক পরের সময়ের পাগড়ীর যেন একটা মিল পাওয়া যায়। একটি পা সামান্য ছোট এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গীতেই খুঁড়িয়ে হাঁটার একটা ভাব আছে। মুখে শনিসুলভ কোন ক্রুরতার ভাব নেই। আছে এক মাধুর্যমন্ডিত প্রসন্নতা ও সারল্য। মূর্তিটির সমস্ত ভাব এবং নাতিদীর্ঘ হওয়ার ফলে একটা বালকসুলভ ভাবও যেন পাওয়া যায়।

প্রাথমিকভাবে মূর্তিটি শনৈশ্চর বা শনিদেবের-ই কিনা তা নিয়ে সংশয় ছিল। ১৯৮১ সালের মে মাসে প্রকাশিত আশুতোষ সংগ্রহশালার ''পূর্বভারতীয় মূর্তিসমূহ'' শীর্ষক নিদর্শনসংগ্রহের তালিকায় এই মূর্তিটি (তালিকানুযায়ী ১৯ নং) শৈব পুরুষমূর্তি রূপে চিহ্নিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে এটি সম্ভবতঃ শিবের ভিক্ষাটনরূপ। কিন্তু পরবর্তী কালে সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রী গৌরীশ্বর ভট্টাচার্যের মতানুসারে বর্তমান লেখিকারও দৃঢ় ধারণা এটি কোন শৈব মূর্তি নয়। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি একক, শনিমূর্তি, যা কোন ফলকের অংশ নয় এবং পৃথক বা পূজিত হওয়ার জন্যই তা নির্মিত হয়েছিল।

মূর্তিটি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে শিল্পশাস্ত্রের সূত্রে ও পুরাণে বর্ণিত শনির পরিচয় ও কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পৌরাণিক মতে শনিদেব হলেন মূর্ট ও ছায়ার ছেলে। চিত্ররথের মেয়ে তাঁর স্ত্রী। একদিন শনি একাগ্রচিত্তে ধ্যান করছিলেন। এই সময় তাঁর স্ত্রী ঋতুস্নান করে, সুসজ্জিত হয়ে এসে স্বামীর সঙ্গ চান। ধ্যানমগ্ন শনি এতই নিবিষ্ট ছিলেন যে ফিরেও তাকাননি। কিন্তু এতে তাঁর স্ত্রী অপমানিত বোধ করেন এবং রাগে অভিশাপ দেন যে শনি যার দিকে তাকাবেন সেই-ই বিনষ্ট হবে। এইজন্য শনির দৃষ্টি বিপদজনক বলে মনে করা হয় এবং গণেশ জন্মাবার পর যখন শনি তাকে দেখতে যান, তার দৃষ্টির প্রভাবে গণেশের মাথা খসে গিয়েছিল। আবার গণেশের মাথা খসে গিয়েছিল বলে, তার মা পার্বতী শনিকে পাল্টা শাপ দেন, যাতে শনি খোঁড়া হয়ে যান।[৮] এই কাহিনী ছাড়াও, 'অংশুমৎভেদাগম' গ্রন্থেও আছে যে শনি প্রতিমার এক পা খোঁড়া হবে। অতএব, এই মূর্তির যে খোঁড়া ভাব রয়েছে তা পৌরাণিক কাহিনী সূত্র ও শিল্পশাস্ত্র-এর নির্দেশ দুইয়ের সাথেই মিলছে।

'অংশুমৎভেদাগম' অনুযায়ী শনৈশ্চরের গায়ের রঙ এবং তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের রঙ হবে কালো। উচ্চতায় নাতিদীর্ঘ, দ্বিভুজ মূর্তির একহাতে থাকবে দন্ড ও অন্যহাতে বরদমুদ্রা। শনির এক পা কিঞ্চিৎ খোঁড়া হবে ও শনির আসন হবে পদ্মপীঠ।

'বিষ্ণুধর্মোত্তর' অনুসারে মূর্তি দ্বিভুজ হবে; একহাতে দন্ড ও অন্যহাতে অক্ষমালা থাকবে। এই গ্রন্থের মতে শনির আসন পদ্মপীঠ নয়—শনি উপবেশন করবেন আটটি ঘোড়ায় টানা লৌহ রথে।

'রূপমন্ডন' গ্রন্থেও নবগ্রহের রঙ, আয়ুধ ও লাঞ্ছনের বর্ণনা আছে। তাতে বলা হয়েছে যে শনি প্রতিমার রঙ কৃষ্ণবর্ণ হবে এবং হাতে আয়ুধ হিসাবে দন্ড থাকবে। নবগ্রহের কানে রত্নকুন্তল থাকবে।

নবগ্রহের কথা আলোচনা করার সময় 'যাজ্ঞবল্ক্যসূত্র' বর্ণিত, উপাদান, রঙ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানেও বলা হয়েছে যে শনির মূর্তি লৌহ নির্মিত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ হবে।

আলোচ্য মূর্তির সাথে 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' বর্ণিত আয়ুধ সম্পূর্ণ মিলছে। আসন হিসাবে পদ্মপীঠ 'অংশুমৎভেদাগমে'র বর্ণনা মিলছে। তাছাড়া আলোচিত নবগ্রহ ফলকের সবগুলিই পদ্মপীঠে পাওয়া গিয়েছে। কাজেই নবগ্রহের আসন হিসাবে পদ্মপীঠ-ই প্রধান রীতি ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মূর্তির উপাদান হিসাবে কালো পাথর ও কৃষ্ণবর্ণ সব বর্ণনার সাথেই মিলছে।

এই পৃথক মূর্তিটি অনেক প্রশ্ন ও কিছু ধারণার জন্ম দেয়। প্রথমতঃ এই মূর্তিটি পাল আমলের—সম্ভবতঃ দেবপালের আমলের (৮১০—৮৫০ খৃ.)। অন্যত্র জে.এন. ব্যানার্জী, পৃথক নবগ্রহমূর্তির উল্লেখ করতে গিয়ে পাহাড়পুরের একটি চন্দ্র ও একটি বৃহস্পতির মূর্তির উল্লেখ করেছেন।[৮] পাহাড়পুর ছিল ধর্মপাল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সোমপুর বিহারের কেন্দ্র। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে পাল আমলে স্বল্প সংখ্যক হলেও পৃথক গ্রহমূর্তি পাওয়া যাচ্ছে। এখন কিছু শিল্প ঐতিহাসিকের মতে পাল-সেন আমলের শিল্পকলা ধর্মীয় এবং প্রতিমা রূপায়ণে সীমিত ছিল। ফলে, শিল্পের ক্ষেত্রে ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল একমাত্র উদ্দীপনা ও পরিচালিকা শক্তি।[৯]

যেখানে ধর্মকে প্রধান প্রেরণাস্থল হিসাবে দেখা হয়েছে, সেখানে এই ধরণের পৃথক মূর্তি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ হয়তো তা তৎকালীন কোন ক্ষুদ্র উপাসক গোষ্ঠীর দিশারী। হয়তো সে সময় শনির উপাসক কোন স্বতন্ত্র শনি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বাংলার উপাস্য দেবতা হিসাবে বিষ্ণুর পরেই সূর্যের স্থান ছিল এবং সৌরবর্ণের মূর্তির মধ্যে কয়েকটি নবগ্রহ মূর্ত্তি শিল্পকীর্তি হিসাবে শিল্প ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[১০]

পুজো বা উৎসবের ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলন দুরূহ ব্যাপার।[১১] বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে শনি মন্দির বা শনি পুজোর যে আধিক্য তা ঠিক কবে থেকে শুরু হল তা নির্ণয় করা যথেষ্ট দুঃসাধ্য ও অনেক বড় আকারের গবেষণার দাবী রাখে। তবে নবগ্রহফলক থেকে আলাদা করে গ্রহদেবতার মূর্তি, বিশেষ করে শনিমূর্তির পৃথকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তৎকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ধরা যেতে পারে।

হয়তো মানুষের মধ্যে কুসংস্কার ও অদৃষ্টবাদী চিন্তাধারা আরও বেশি করে গেঁড়ে বসছিল, তাই বিপদনাশক শনির প্রতি পক্ষপাতিত্ব। অথবা, পাল আমলের বৌদ্ধ বাতাবরণকে খর্ব করতে বিভিন্ন ছোট ছোট সম্প্রদায়ের মধ্যে দিয়ে হিন্দুধর্মের নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা।

"শনি" আঃ নবম খ্রীঃ বিহার
সৌজন্য ঃ আশুতোষ সংগ্রহশালা

সূত্রনির্দেশ

১। জে.এন. ব্যানার্জী, **'দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ্ হিন্দু আইকনোগ্রাফী'**, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৫৬, পৃ. ৪৪৩।

২। ঐ, পৃ. ৪২৯।

৩। **'যাজ্ঞবল্ক্যসূত্র'**, মুম্বাই সংস্করণ, ১৮৯২, পৃ. ৮৯।

৪। জে.এন. ব্যানার্জী, **'দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ্ হিন্দু আইকনোগ্রাফী'**, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৫৬, পৃ. ৫৬১।

৫। ঐ, পৃ. ৪৪৫।

৬। এই সূত্রটি দেন অধ্যাপক গণপতি সুব্বাইয়া, যিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগে আছেন এবং ইতিহাস সংসদের পঞ্চদশ বার্ষিক সম্মেলনের প্রাচীন ভারত বিভাগের সভাপতি ছিলেন। প্রবন্ধটি যখন পঠিত হয়, সভাপতিরূপে তিনি এই তথ্য দেন।

৭। অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় **'পৌরাণিকা'**, ২য় খণ্ড ফার্মা.কে.এল.এম প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ২৩২।

৮। জে.এন. ব্যানার্জি, 'নবগ্রহ', **'দ্য এজ অফ্ ইম্পিরিয়াল কনৌজ'**, **'দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অফ্ দি ইন্ডিয়ান পিপ্‌ল'**, সাধারণ সম্পাদক রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পঞ্চম মুদ্রণ, মুম্বাই ১৯৮৮।

৯। কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, **'বাংলার ভাস্কর্য'** সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১৬১।

১০। ঐ, পৃ. ১৭১।

১১। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, **'বাংলার পালপার্বণ'**, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৩৫৯ পৃ. ৫-৬।

তমলুকের দেবী বর্গভীমা

শুভজিৎ দাশগুপ্ত

বর্গভীমা তমলুকের স্থানীয় দেবী। মেদিনীপুল জেলার লোকায়ত— সংস্কৃতির সঙ্গে এই দেবী-সত্তা গভীরভাবে যুক্ত। তমলুক-নিবাসী মানুষ-জন সুদীর্ঘকাল ধরে বর্গভীমা বিগ্রহটিকে সদাজাগ্রত দেবী-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে এসেছেন। বর্গভীমার বর্তমান বিগ্রহটির রূপরেখায় কালীবিগ্রহের কিঞ্চিৎ প্রতিফলন থাকলেও অতীতে সম্ভবত তা' ছিল না। ডঃ প্রদ্যোৎ কুমার মাইতি তাঁর গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন একটি মাত্র স্বত্বখন্ড থেকে ঐ মূর্তি করা হয়েছিল। ইংরাজীতে called thing বলা হয়েছে। সুদূর অতীতে সম্ভবত এটি নরাকৃতির মূর্তি না হয়ে অবয়বহীন প্রস্তরখণ্ড মাত্র ছিল। খৃ. ষষ্ঠ শতাব্দীর চৈনিক ভারত-পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ্ 'বা স্বান্ জাঙ্গ বৈশালীর নিকটবর্তী এক পর্বত-শিখরে মহেশ্বর-পত্নী ভীমাদেবী'কে গাঢ় নীলবর্ণ শিলাখন্ড রূপে পূজিতা হতে দেখেছিলেন[১] মধ্যভারতের মেকল পর্বতে দেবী বিন্ধ্য বাসিনী'র যে মন্দির রয়েছে সেখানেও গর্ভগৃহে দেবী শিলারূপেই রয়েছেন। বীরভূম জেলার অট্টহাস-ক্ষেত্রেও রয়েছে দেবী'র অধরোষ্ঠ-রূপে কল্পিত এক শিলা। অতএব অ-নরাকৃতি দেবীমূর্তি ভারতের বহু গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানেই পূজিতা হচ্ছেন একথা বলা যায় এবং সম্ভবত দেবী বর্গভীমার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। মধ্যযুগের সূচনা থেকেই বঙ্গদেশে 'শক্তি-সাধনায় দেবী কালী'র গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। শক্তি সাধনার আচার-অনুষ্ঠানে ক্রমবর্দ্ধমান তান্ত্রিক প্রভাব কালী' কে এই সাধনার কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসে। সমকালীন বহু শক্তিবিগ্রহ ক্রমশঃ কালী-বিগ্রহের রূপ নেয়। দেবী বর্গভীমা'ও হয়তো এ বিষয়ে ব্যতিক্রম ছিলেন না। দেবী'র বর্তমান মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত কম প্রাচীন। রেখদেউল স্থাপত্য-শৈলী'র এই বিরল নিদর্শনটিকে স্বচ্ছন্দে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে স্থান দেওয়া চলে।[৩] ওড়িশায় খৃঃ অষ্টম-নবম শতাব্দীতেই ঐ শৈলীর নিদর্শন দেখা যায়। যদি ডঃ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীদের ধারণা সত্য হয়ে থাকে তবে অবশ্য এর বহু পূর্বেই বৃহত্তর কলিঙ্গরাজ্যের সীমা 'তমোলুক' অঞ্চল স্পর্শ করেছিল।

সাহিত্যগত উপাদানের দিক থেকে বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহকে দেবী বর্গভীমা সম্পর্কে প্রথম প্রামাণ্য রচনা হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। এ বিষয়ে স্বীয় গ্রন্থে ডঃ প্রদ্যোৎকুমার মাইতি মঙ্গলকাব্যগুলি দেবী বর্গভীমা সংক্রান্ত "only earliest recorded evidence" বলে মন্তব্য করেছেন[৪] এবং তার ভিত্তিতে তিনি খৃ. চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীকে দেবী

বর্গভীমার উৎপত্তি-কাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৫] কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত "পান্ডব দিগ্বিজয়" ও "দেশাবলী বিবৃতি" শীর্ষক সপ্তদশ শতাব্দীর দুটি মূল্যবান পান্ডুলিপি অনুধাবন করলে মনে হয়, খৃঃ পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই বর্গভীমা শুধু তমলুককেই নয় সমগ্র সমতট অঞ্চলে শ্রুতকীর্তি হয়ে উঠেন। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা মঙ্গলকাব্যের কবিরা দিগ্বন্দনায় তমলুকের দেবী বর্গভীমাকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন। কবিকঙ্কণ চন্ডী-গ্রন্থের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বলেছেন, দেবী চন্ডী নানা মূর্তিতে সর্বত্র বিরাজমানা। তিনি গোকুলে গোমতী নামা / তমোলুকে বর্গভীমা / উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।'[৬] এধরণের বর্ণনার ভিত্তিতে মনে হয়, বর্গভীমা পূর্ব মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূল স্রোতে অনুপ্রবেশ করেন ও মধ্যযুগের অন্তিমভাগে চন্ডীর সহিত অভিন্না রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এ'সময় একটি সমান্তরাল উদ্‌বর্তনের ধারায় কালী ক্রমেই ব্রাহ্মণ্য পরিমন্ডলে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। তাই দুটি ধারা বেশীদিন পৃথক থাকে নি। তথাপি প্রত্নতত্ত্ব ও সাহিত্যগত উপাদানে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত এমন কিছু তথ্য চোখে পড়ে যা পরোক্ষবাবে দেবীর প্রাচীনত্বের ইঙ্গিত দেয়।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বর্গভীমা নামটির প্রকৃত তাৎপর্য্য নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। জনৈক প্রতিবেদক এ'বিষয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। প্রথমতঃ তিনি মনে করেন "বর্গ" শব্দের আক্ষরিক অর্থ যেহেতু "দল" অথবা "সংঘ" সেহেতু বর্গভীমা হলেন সংঘবদ্ধভাবে পূজিতা দেবী। তমলুকবাসী মাত্রেই বিদিত আছেন, বর্গভীমা বিগ্রহটিকে বর্তমানে দুটি ভিন্নধর্মী মহিষমর্দ্দিনী মূর্তি ও "সর্বানন্দ শিব" হিসেবে পরিচিত একটি শিবলিঙ্গের সহিত একত্রে অর্থাৎ "সংঘবদ্ধভাবে" পূজা করা হয়। দ্বিতীয় মতটি হোল দেবী বর্গভীমা 'প্রলয়রূপিণী' অর্থাৎ 'পরমেশলয়াত্মিকা কালী' স্বরূপিণী বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী বজ্রভীমার ব্রাহ্মণ্য বিবর্ত। ইনিই বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের সেই উগ্রতারা দেবী যিনি পালযুগের ভাস্কর্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন'[৭] ডঃ প্রদ্যোৎ কুমার মাইতি তাঁর গ্রন্থে এসব ধারণা অস্বীকার করে একটি তৃতীয় মত উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে সমাজের নিম্নবর্গস্থ কৈবর্ত্য জাতির উপাস্য দেবী বর্গ বর্তমান কালের দেবী বর্গভীমা[৮] অর্থাৎ, অতীতে এই গোষ্ঠীর উপাস্য "বর্গ" নামাঙ্কিত কোন দেবী'ই বোধহয় পরবর্তকালে বর্গভীমা[৮] রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সর্বশ্রী বিনোদশঙ্কর দাশ ও প্রণব রায় সম্পাদিত **'মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন'** গ্রন্থের প্রথম খন্ডে কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার কিয়দংশ প্রসঙ্গত নিম্নে উল্লেখ করা হোল '১৯৫৪ সালে ষ্টেটস্ রি-অর্গানাইজেশন কমিশনের কাছে যে স্মারকলিপি দাখিল করা হয় তা প্রণিধানযোগ্য ঃ 'চাষী-কৈবর্ত্য' বা মহিষ্যেরা' মেদিনীপুরে সংখ্যায় বেশী। এই বর্ণসম্প্রদায়'ই এখানকার কেন্দ্রীয় জনগোষ্ঠী;...ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান মাহিষ্য একটি অতি প্রাচীন জনগোষ্ঠী। জঙ্গল কেটে চাষবাষ বাড়িয়ে মহিষের মতো কৃষি-উৎপাদক ও রক্ষক হিসেবেও মাহিষাসুরের মতো বীর এই জনগোষ্ঠী মাহিষ্যরূপে পরিচিত।"[৯] মহিষাসুরের সঙ্গে

মাহিষ্যগণের যে তুলনা এই প্রবন্ধে করা হয়েছে তা ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে সমর্থনযোগ্য। 'মহিষের মতো কৃষি-উৎপাদক ও রক্ষক'—বক্তব্যের এ অংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইরাণীয় উর্বতার দেবী অনহিতর সঙ্গে সম্পর্কিত এক ধর্মানুষ্ঠানের নাম টোরোবলিয়াম বা বৃষনিধন। মনে করা হোত, সৃজন-ক্ষমতার আধার বৃষের রক্তে পৃথিবী তার উর্বরতা ফিরে পাবে। অধুনা মহারাষ্ট্রে মহিষকে কেন্দ্র করে অনুরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অন্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য অংশে (অধ্যায় ৮৯-৯৩) চন্ডী 'শাকম্ভরী' রূপে অভিহিত হয়েছেন। 'শাকম্ভরী' শস্য-উৎপাদিকা দেবী এবং শস্য উৎপাদনের জন্য ভূমির উর্বরতা প্রয়োজন। তাই কৃষিজীবী সম্প্রদায় যদি দুর্গা অথবা চন্ডীর পূজারী হয় তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই। প্রবন্ধকার লিখছেন মাহিষ্যেরা 'জঙ্গল কেটে চাষবাস' বাড়িয়েছে। তাই বর্গভীমা দেবীর মধ্যে চন্ডী স্বরূপ আরোপিত করা বোধহয় অসম্ভব নয়। কবিকঙ্কণ চন্ডী'র রচয়িতা দেবী বর্গভীমাকে চন্ডী'র অভিনব প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। তার প্রেক্ষাপট অবশ্য পৌরাণিক সাহিত্যেই রচিত হয়ে গিয়েছিল। দেবী মাহাত্ম্যে (১১।৫০-৫২) সমবেত দেবমন্ডলীকে ভবিষ্যত নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে দেবী বলেন :—

"পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুণীনাং ত্রাণকারণাৎ।।
তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোষ্যান্ত্যানর্মমূর্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তম্মে নাম ভবিষ্যতি।।"

অর্থাৎ, 'পুনরায় যখন হিমালয়ে আমি ভীমা মূর্তি ধারণ করিয়া মুণিগণের সংরক্ষণের জন্য, রাক্ষসদিগকে বধ করিব, তখন মুনিগণ প্রণতদেহে আমার স্তব করিবেন। এই জন্য আমি ভীমাদেবী নামে বিখ্যাত হইব।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সংস্কৃত ভাষায় 'ভীম' শব্দের অর্থ 'ভয়ঙ্কর'। শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতায় (১'ম অধ্যায়। ১৫) দ্বিতীয় পান্ডবকে 'ভীমকর্মা বৃকোদরঃ' বলা হয়েছে। 'ভীমকর্মা' শব্দের অর্থ হোল 'যিনি ভয়ঙ্কর কার্য্যে নিরত'। চন্ডী ভীমকর্মা। তিনি অবলীলায় দৈত্যবিনাশ করেন। তাই তিনি ভীমা।

পূবেই বলা হয়েছে, দেবী বর্গভীমার মধ্যে চন্ডীর স্বরূপ আরোপিত করা অসম্ভব নয়। দেবীর অধুনা প্রচলিত পুজোয় যে ধ্যানমন্ত্রটি উচ্চারণ করা হয় তা দক্ষিণকালী'র ধ্যানমন্ত্র স্মরণে আনে। বর্গভীমার ধ্যানমন্ত্রটি হোল

"কৃষ্ণবর্ণাং চতুর্ভূজাং মুন্ডমালাবিভূষিতাং।
দক্ষিণে খড়্গশূলঞ্চ তীক্ষ্ণধারা দূরাসদম্।।
বামে খর্পরমুন্ডঞ্চ লোলজিহ্বা ত্রিলোচনা।
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানাং ভীমাদেবী শবাসনা।।"[১০]

আপাতদৃষ্টিতে ধ্যানমন্ত্রে বর্ণিত ভীমাদেবী'র সঙ্গে কালী'র প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। দেবী চতুর্ভূজা, মুন্ডমালা বিভূষিতা, কৃষ্ণবর্ণা, লোলজিহ্ব্ ও ত্রিনয়নী। তিনি 'শবাসনা' অর্থাৎ 'শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতা'। কিন্তু দেবী হস্তে যে তীক্ষ্ণাগ্র শূলের উপস্থিতি তা' মহাভাবতের অন্তর্গত অর্জুনের দুর্গাস্তোত্রটির (VI. 23) কথাই মনে করিয়ে দেয়। সেখানে বলা হয়েছে, 'অষ্ট-শূল-প্রহরণে-খড়্গ্-খেটক-ধারিণী/গোপেন্দ্র সানুজে জ্যেষ্ঠে নন্দগোপ

কুলোদ্ভবে/মহিষাসৃক—প্রিয়ে নিত্যম্ কৌশিকী পীতবাসিনী/অট্টহাস—কোকামুখে—নমস্তেহস্তু, রণপ্রিয়ে।।" মহিষরক্ত-লিপ্ত সমর-সজ্জায় সুসজ্জিতা এই যে পীতবাসিনী কৌশিকী দেবী, তিনি কালীর চেয়ে দেবী দুর্গার নিকটতর। তাহলে বর্গভীমা চন্ডীর কোন্ রূপের প্রতিনিধিত্ব করছেন? এ বিষয়ে আমার নিজস্ব ধারণা হোল, দেবী ভদ্রকালী বর্গভীমা মূর্তিটিকে প্রভাবিত করেছেন। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে ভদ্রকালী'র মনোহর রূপের বর্ণনা আছে।[১১] দুর্গার সঙ্গে পার্থক্য সামান্যই! কালিকাপুরাণে আমরা দেবীভক্ত মহিষাসুরের সন্ধান পাই। অত্যাচারী মহিষাসুর একদিন স্বপ্ন দেখলেন, ষোড়শভূজা দেবী ভদ্রকালী তাঁর মাথা কেটে সহাস্যে রক্তপান করছেন[১২] অতঃপর মহিষাসুর উগ্র তপস্যার দ্বারা দেবীকে সন্তুষ্ট করে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত যজ্ঞভাগের অংশীদার হতে চান। দেবী ভদ্রকালী অসুরকে বলেন—যতদিন তিনি দুর্গা, ভদ্রকালী এবং উগ্রচন্ডা, এই তিনটি রূপে পূজিতা হবেন, অসুরও ততদিন তাঁর পদলগ্ন হয়ে পূজা পাবে। এ কাহিনীতে চন্ডীর রূপত্রয়—দুর্গা, ভদ্রকালী ও উগ্রচন্ডা অভিন্না। অতএব বর্গভীমা দেবীর উপর যদি চন্ডীর স্বরূপ আরোপিত হয়ে থাকে তাহলে চন্ডী'র ভদ্রকালী রূপটিই তাঁর পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত হবে।

উপরোক্ত ক্ষেত্র বাদে আরো একটি অদ্ভুত সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। শ্রী দুর্গাদাস পাত্র রচিত "দুর্গাপূজা" শীর্ষক একখানি পত্রে (দ্য হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ড, ২৫।১০।৯৯) ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের সমপপ্রিয়া ব্যাইর্গো দেবী'র উল্লেখ করে বলা হয়, অতীতে এই দেবী'র অনুগ্রহক্রমেই ভূমধ্যসাগরীয় একটি জাতি 'মন্-স্মের' গোষ্ঠীকে পরাজিত করে। 'মন্-স্মের' গোষ্ঠীর টোটেম ছিল মহিষ। তাই এই বিজয় প্রকারান্তরে মহিষ মর্দ্দনের সামিল। মেদিনীপুরের স্থানীয় দেবী বর্গভীমা এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের ব্যাইর্গো এঁদের মধ্যে সাহিত্যগত অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সমর্থিত সরাসরি কোন যোগাযোগ নেই। তথাপি ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে 'ব্যাইর্গো' শব্দের সঙ্গে 'বর্গ' শব্দের লক্ষণীয় মিল পাওয়া যায়। মেদিনীপুরের প্রাচীন নৃগোষ্ঠী যে অষ্ট্রিক—দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত সে বিষয়ে বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিকবৃন্দ মোটামুটি একমত। অপরপক্ষে প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় নৃগোষ্ঠীকেও 'দ্রাবিড়ীয় চরিত্রের' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই সাদৃশ্যের প্রশ্নে যদি ব্যাইর্গো এবং বর্গভীমা দেবী'র তুলনা করা হয় তাহলে এঁদের বহু তুল্যমূল্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এঁদের মধ্যে কোন ধরণের যোগসূত্র থাকা কি একেবারেই অসম্ভব? সাংস্কৃতিক আদান—প্রদান নিয়ে বিচার করলে এ'ধরণের প্রশ্ন মনে আসা খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য এই সম্ভাব্য আদান-প্রদানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এখনও স্পষ্ট নয়।

আচার অনুষ্ঠানের আঙ্গিকে যদি দেবী বর্গভীমার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে এমন কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে যা দেবীর চন্ডীস্বরূপকেই সমর্থন করে। বর্গভীমা দেবী-পূজায় (চরণামৃতে) বিল্বপত্র ও বাঁশের কোঁড় (বাঁশগাছের অঙ্কুর) অপরিহার্য্য। শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রারম্ভে বিল্বমূলে দেবী'র বোধন ও নবপত্রিকা প্রকাশ হয়—বাঙ্কিলা পত্রিকা

নববৃক্ষের বিলাস।[১৩] তমলুকের ব্যবসায়ীবৃন্দ বাংলা নববর্ষের দিনে দেবী বর্গভীমার পূজার মাধ্যমে নূতন হালখাতা প্রবর্তন করে থাকেন।[১৪] এই আচার আচরণ আমাদের শ্রী যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহোদয় রচিত 'পূজা-পার্বণ' গ্রন্থটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উক্ত গ্রন্থে বিদ্যানিধি মহোদয় দুর্গোৎসবকে নববর্ষোৎসব বলে বর্ণনা করেছেন।[১৫]

পরিশিষ্ট

আলোচিত তথ্যের ভিত্তিতে দেবী বর্গভীমাকে প্রাক্— মধ্যযুগীয় দেবী বলে মনে হয়। তবে এই দেবীর সহিত প্রাচীন তাম্রলিপ্তের গৌরবময় দিনগুলির পরোক্ষ সম্পর্ক থাকা সম্ভব। দেবী'র ভক্তগণ তাঁর মধ্যে দুর্গার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি অনুভব করে বলতে পারেন---"প্রণতানাং প্রসীদত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি / ত্রৈলোক্যবাসীণামীড্যে লোকাণাং বরদা ভব।।" (দেবীমাহাত্ম্য, ১১। ৩৫)। 'হে সকল বিশ্বের দুঃখহারিণী দেবী, যারা তোমার নিকট প্রণত তাহাদিগের প্রতি তুষ্টা হও।'

সূত্রনির্দেশ

১। প্রদ্যোতকুমার মাইতি, দ্য গডেস বর্গভীমা ঃ এ স্টাডি, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ১৬

২। ওয়াটার্স, টি, অন য়ুয়ান চোয়াং'স ট্রাভেলস ইন ইন্ডিয়া, খন্ড-২, পৃ. ৭০

৩। বিনোদ শংকর দাশ ও প্রণব রায় সম্পাঃ মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, সাহিত্যলোক, কলকাতা ১৯৮৯, পৃ. ৩৪৭

৪। প্রদ্যোতকুমার মাইতি, দ্য গডেস বর্গভীমা..., পৃ. ৭

৫। তদেব, পৃ. ১০।

৬। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কন চন্ডী, বঙ্গবাসী সং, পৃ. ৫

৭। এস. সামন্ত, 'গ্লিমসেস অব বর্গভীমা টেম্পল,/ 'তমলুক', পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ পত্রিকা, ১৯৬৭

৮। প্রদ্যোতকুমার মাইতি, দ্য গডেস বর্গভীমা..., পৃ. ১৮-১৯

৯। বিনোদশঙ্কর দাশ ও প্রণব রায় সম্পাঃ মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, পৃ. ৬৮-৭০

১০। প্রদ্যোতকুমার মাইতি, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১৭

১১। প্রিয়বালা শা সম্পাঃ বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, ভূমিকা, পৃ. ২৬

১২। পূর্বা সেনগুপ্ত, দুর্গা ঃ রূপে রূপান্তরে, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ১৯৯৮, পৃ. ২৪

১৩। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাঃ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, কলকাতা, পৃ. ৪৬০

১৪। তদেব, পৃ. ২১

১৫। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পূজা-পার্বণ, শান্তিনিকেতন, পৃ. ১৩২-৪১

পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনের ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

শম্ভুনাথ কুণ্ডু

দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে হরিকেল চন্দ্রদ্বীপের চন্দ্রবংশীয় রাজারা পালরাজাদের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন 'পরমসৌগত' অর্থাৎ সুগতের (বুদ্ধের) আশ্রিত এবং ধর্মচক্রলাঞ্ছিত মুদ্রাঙ্কিত ক'রে। "বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য" রাজ শাসনাদি প্রদান করেছেন। বৌদ্ধধর্ম ছিল এঁদের রাজধর্ম। প্রায় প্রতিটি শাসনের বন্দনা শ্লোক (invocation) বুদ্ধের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পূর্ণচন্দ্র। তারপর সুবর্ণচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র—এই সাতজন নরপতি পুরুষানুক্রমে প্রায় ১১১ বছর রাজত্ব করেন।[১] ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি।

আজ পর্যন্ত চন্দ্ররাজাদের ১৩ খানি অভিলেখের সন্ধান পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ১০টি তাম্রশাসন (copper-plate grants) ও ৩টি মূর্তিলেখ (image inscription)।[২]

শ্রী চন্দ্রের তাম্রশাসন ৬টি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি হোল—পশ্চিমভাগ, মদনপুর, রামপাল, কেদারপুর (অসম্পূর্ণ), ধূল্লা ও ইদিলপুর। শ্রীহট্টজেলার পশ্চিমভাগ গ্রামে শ্রী বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী ১৯৫৮ সালে একটি তাম্রশাসন আবিষ্কার করেন এবং শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্ত মহাশয় এটির পাঠোদ্ধার করেন। বর্তমানে এই পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনটি শ্রীহট্টের Historical and Archaeological Society-র মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। তাম্রশাসনটি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতকারণেই গবেষক ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু রাজনৈতিক বা সামাজিক নয়, ধর্মীয় ইতিহাস পুনর্গঠনে এটি একটি অমূল্য দলিলবিশেষ—এক নতুন ধর্মীয় দিগন্তের প্রেক্ষাপট বহন করে এটি। শুধু বঙ্গদেশে নয়-আর্যাবর্তের কোন তাম্রশাসনে এর নজির নেই।

এই তাম্রশাসনে এক সুবিশাল ভূখণ্ডদানের কথা ক্ষোদিত আছে। মহাপরাক্রমশালী শ্রী-চন্দ্র (আনু ৯২৫-৭৫ খ্রী.) তিন প্রস্থে ভূমিদান করেছেন শ্রীচন্দ্রপুর-ব্রহ্মপুর বিষয়ে। লক্ষণীয়, বিষয়টির নাম ও মহারাজ শ্রী চন্দ্রের নাম রেখাঙ্কিত। প্রথম প্রস্থে ১২০ পাটক অর্থাৎ ১৮০০ একর ভূখণ্ড প্রদত্ত হয় ব্রহ্মা ও তাঁর মঠের ব্যয়নির্বাহের জন্য এবং চন্দ্রব্যাকরণ অধ্যাপনার জন্য জনৈক অধ্যাপককে :

"...শ্রী শ্রী চন্দ্র পুরাভিধানং ব্রহ্মাপুরং পরিকল্প্য / এতস্মিন্ শ্রী চন্দ্রপুরে / ব্রহ্মাণে এতন্মঠ প্রতিবদ্ধ-চান্দ্রব্যাকরণোপাধ্যায়স্য"।[৩]

ভারতবর্ষের সর্বত্র যখন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁর মহিমা হারিয়ে ফেলেছেন তখন দশম শতাব্দীর বঙ্গদেশে তাঁর পূজার জন্য স্বতন্ত্র মঠস্থাপনা একটি অনন্য দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য বহন করে।[৮] কালের বিবর্তনে বৈদিক দেবতারা যখন তাঁদের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন তখন যেসব পৌরাণিক দেবতা তাঁদের প্রাধান্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা অন্যতম। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ ঋত্বিকবিশেষ। তিনিই ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, বিশ্বকর্মা, ব্রাহ্মণসম্পত্তি রূপে স্তুত। যাস্কাচার্য বৃহস্পতিকেই ব্রহ্মা বলেছেন—"বৃহস্পতির্ব্রহ্মাসীৎ"। এই বৈদিক ব্রহ্মা পৌরাণিক ধর্মভাবনায় ত্রিমূর্তিবাদের অন্যতম স্রষ্টারূপে বন্দিত। তবে একথা সত্য যে, সাম্প্রদায়িক দেবতারূপে তিনি তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হননি। কেন হননি সে আলোচনা এখানে করার সুযোগ নেই।

দ্বিতীয় প্রস্থে ২৮০ পাটক (৪২০০ একর) ভূমি প্রদত্ত হয়েছিল চারটি দেশান্তরীয় ও চারটি বঙ্গালমঠের উদ্দেশ্যে। এই দ্বিবিধ প্রতিটি মঠেই এক একজন করে চারটি দেবতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন—বৈশ্বানর (অগ্নি), যোগেশ্বর (শিব), জৈমনি (জৈমিনি) এবং মহাকাল (শিব/ বৌদ্ধতান্ত্রিকদেবতা?) ।

"তথা দেশান্তরীয়-মঠ চতুষ্টয়স্য বঙ্গাল মঠ-চতুষ্টয়স্য চ বৈশ্বানর-যোগেশ্বর-জৈমনি-মহাকালেভ্যশ্চ এষামুভয়েষাং মঠপ্রতিবদ্ধ-ঋগ্‌যজুসসামাথর্বে াপাধ্যায়ানামষ্টানাং প্রত্যেকং দশ পাটকাঃ..."।[৯]

শাসনোক্ত বৈশ্বানর বা অগ্নির মঠনির্মাণ ও নজিরবিহীন। ঠিক তেমনি হোল পূর্বমী মাংসাদর্শনের প্রবক্তা জৈমিনির দেবত্বে উত্তরণ এবং তাঁর অর্চনার জন্য স্বতন্ত্র মঠস্থাপন। অনুরূপ দৃষ্টান্ত হোল গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থলে সাংখ্যদর্শন প্রবক্তা ভগবান্ কপিলমুনির মন্দির স্থাপন ও তাঁর পূজার্চনা।[১০] শিবের যোগেশ্বর ও মহাকালরূপও বঙ্গদেশে তেমন জনপ্রিয় নয়। এ ব্যাপারেও আলোচ্য শাসনটি নতুন তথ্য পরিবেশন করে।

এই শাসন থেকে জানা যায় উপরিউক্ত প্রত্যেকটি দেবতার দুটি করে মঠ এখানে স্থাপিত হয়েছিল, যার একটি দেশান্তরীয় অর্থাৎ বহির্বঙ্গ থেকে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে আগত ছাত্রদের। অপরটি বঙ্গাল' ছাত্রদের জন্য। এই দুই সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের পূজার্চনাবিধির কোন তারতম্য ছিল কিনা তা অনুমান সাপেক্ষ। সম্ভবতঃ বিদেশীদের সঙ্গে দেশীয় ছাত্রদের সম্প্রীতি ছিল না বলেই মহারাজ শ্রীচন্দ্রকে দুই প্রস্থ মঠনির্মাণ করতে হয়েছিল উভয়সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার জন্য। তবে শাসন থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে, শ্রীচন্দ্রপুর ব্রহ্মপুরে যে একটি সুবৃহৎ ধর্ম ও শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল যেখানে দেশী-বিদেশী অগণিত জ্ঞানপিপাসু ছাত্রের সমাগম ঘটেছিল এবং এমন বিশাল শিক্ষাকেন্দ্রের কথা উত্তরভারতের আর কোন অভিলেখে পাওয়া যায় না। অবশ্য দক্ষিণভারতে এই ধরণের ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বাঙালী শৈবাচার্য বিশ্বেশ্বরশম্ভু প্রতিষ্ঠিত "শ্রীবিশ্বেশ্বর গোলকী মঠ" অন্যতম।[১১] দক্ষিণরাঢ়ের পূর্বগ্রামনিবাসী এই শৈবাচার্য ছিলেন কাকতীয়রাজ গণপতির (খ্রী. ১১৯৯-১২৬১) দীক্ষাগুরু। অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুরজেলার তিরুমলয় তিরুপতির শ্রীবালাজী বেংকটেশ্বর দেবপ্রতিষ্ঠানটিও সুপ্রসিদ্ধ।[১২]

তৃতীয় প্রস্থে শ্রীচন্দ্র চতুশ্চরণ শাখাধ্যায়ী বিভিন্ন গোত্র-প্রবরযুক্ত গর্গপ্রমুখ ছয়হাজার ব্রাহ্মণকে সমপরিমাণ (পরিমাণ এখানে অনুল্লিখিত) বিস্তৃত ভূখণ্ড দান করেছিলেন :

"...গর্গাদি ষড় ব্রাহ্মণ সহস্রেভ্যশ্চ নানা-গোত্র প্রবরেভ্যঃ/ চতুশ্চরণ-নানা-শাখাধ্যায়িভ্যঃ সমবিভাগেন শেষভূমিঃ।"[১০] এই ছয়হাজার ব্রাহ্মণের মধ্যে আলোচ্যশাসনে কেবল ৩৮ জনের নাম উল্লিখিত হয়েছে। সহজেই অনুমেয়, এর পরিমাণ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্থের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। প্রতিটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবার পিছু যদি কমপক্ষে এক পাটক করেও ভূমি প্রদত্ত হয়ে থাকে (বেশী হওয়াই স্বাভাবিক কারণ এই লেখেই চান্দ্র ব্যাকরণের অধ্যাপককে দশ পাটক, ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদের আটজনকে দশ পাটক হারে ভূমি প্রদত্ত হয়েছিল) তাহলে এই দানের পরিমাণ দাঁড়ায় ছয়হাজার পাটক অর্থাৎ ৯০ হাজার একর। B.M. Morrison সঙ্গত কারণেই মনে করেন যে শ্রীচন্দ্র প্রদত্ত ভূখণ্ডের পরিমাণ প্রায় হাজার বর্গমাইল[১১]

শ্রীচন্দ্র যে ছয় হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বসতি স্থাপনের জন্য ভূমিদান করেছিলেন ভারতবর্ষের এই পূর্ব প্রান্তে তাঁদের যে ৩৮ জনের নাম পাই সেই নামের পদবীগুলিও (Surname) শুধু ধর্মেতিহাসের ছাত্রদের কাছে নয়, সমাজতত্ত্বের গবেষকদের কাছেও চমকপ্রদ তথ্য পরিবেশন করে। দত্ত নাগ, নন্দী, পাল, ধর, ঘোষ, দাঁমন, সোম, কর ও গুপ্ত প্রভৃতি পদবীগুলি নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। এই ব্রাহ্মণদের পরিচয় নিরূপণ গবেষণাসাপেক্ষ এবং গবেষণালব্ধ ফল এক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সাহায্য করবে বলেই আমার ধারণা।

তৎকালীন শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠক্রম সংক্রান্ত একটি তথ্য এই শাসন থেকে জানা যায়। বঙ্গদেশে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী নয়, চান্দ্রব্যাকরণই অধীত হোত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বৌদ্ধ বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমিন্। তিনি চন্দ্রদ্বীপেরই অধিবাসী ছিলেন। তাঁর লেখা ব্যাকরণই চান্দ্রব্যাকরণ।[১২] অবশ্য পরবর্তীকালে কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

পশ্চিমভাগে তাম্রশাসনে বৌদ্ধনরপতি শ্রীচন্দ্রের ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ধর্মের প্রতি গভীর আনুগত্য ছিল। তিনি গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন না, বরং প্রজাদের ধর্মীয় ভাবাবেগকেই নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁর নিজস্ব কৌলিক ধর্মমত বজায় রেখেই। জোর করে প্রজাদের উপর রাজধর্মকে চাপিয়ে দেননি। এইদিক দিয়ে বৌদ্ধ রাজারা উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এই বংশের রাজা লড়হচন্দ্র (শ্রীচন্দ্রের পৌত্র) "লড়হমাধব ভট্টারক' নামে কৃষ্ণবিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে ভূমিদান করেছেন "বাসুদেবভট্টারকমুদ্দিশ্য"। আবার তাঁর পুত্র গোবিন্দ্রচন্দ্র "শিবভট্টারকমুদ্দিশ্য" "নটেশ্বরভট্টারকের" উদ্দেশ্যে ভূমিদান করেছেন।[১৩]

পালবংশীয় নরপতিদের মধ্যেও এই আচরণ লক্ষ্য করা যায়। ধর্মপাল, দেবপাল, শূরপাল, রাজ্যপাল প্রমুখ রাজারা পৌরাণিকধর্মের প্রচার প্রসারে আনুকূল্য দান করেছেন। নারায়ণপাল, প্রথম মহীপাল এবং তৎপুত্র জয়পাল তো বৌদ্ধধর্মই পরিত্যাগ করেছিলেন।[১৪]

একথা অনস্বীকার্য যে, যে ধর্ম মানুষের ধর্মীয় আবেগকে ভক্তিরসে যতখানি উজ্জীবিত

করতে পারে সে ধর্ম ততখানি জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাই এই অনিবার্য প্রভাবকে অস্বীকার করা কিংবা দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি বৌদ্ধরাজাদের পক্ষে। পৌরাণিকধর্মের প্রতি সাধারণমানুষের তীব্র আকর্ষণ সম্ভবতঃ তাঁদের বাধ্য করেছিল প্রজাকুলের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য উক্ত ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী উদার করতে। পক্ষান্তরে, হিন্দুরাজাদের তেমন কোন গরজ ছিল না। তাই তাঁরা যথেষ্ট গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার পরিচয় রেখে গেছেন।[১৫] বল্লাল সেন দম্ভভরে দাবী করেছিলেন, তিনি নাস্তিক বৌদ্ধদের পদোচ্ছেদের জন্য প্রত্যক্ষ নারায়ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।[১৬] আবার বর্মণরাজ হরিবর্মদেবের মহাসান্ধিবিগ্রহিক 'বালবলভীভুজঙ্গ' ভট্টভবদেব তো বৌদ্ধপাষণ্ডী দলনের দর্পিত উন্নাসিকতার পরিচয় রেখে গেছেন তাঁর শিলা প্রশস্তিতে।[১৭] পরমতসহিষ্ণুতার উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষ্যবাহী এই পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনটি সেদিক দিয়ে যুগের প্রচলিত ধারারই অনুবর্তন করেছে বলেই আমাদের ধারণা।

সূত্রনির্দেশ

১। Mukherjee R.R. & Maity S.K., **Corpus of Bengal Inscriptions,** Calcutta, 1967, p 21-24.

২। সরকার দীনেশচন্দ্র, **পাল-সেনযুগের বংশানুচরিত**, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ২৪-২৫।

৩। Sircar D.C., **Epigraphic Discoveries in East Pakistan,** Calcutta, 1973, p. 67 (Appendix)

৪। Majumdar R.c., ed. **The Classical Age,** Bombay, 1954, pp 365-66.

৫। Sircar d.C., **op. Cit.** p. 67 (Appendix)

৬। Sircar D.C., **Studies in the Geography of Ancient and Medieval India,** Delhi, 1960, pp. 181-82

৭। রায় নীহাররঞ্জন, **বাঙ্গালীর ইতিহাস**, আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১৪।

৮। "Malkapuram Stone Inscription of the Kakatiya King Rudradeva", **JAHRS,** Vol IV, p. 147 ff.

৯। Sircar D.C., **Epigraphic Discoveries in East Pakistan,** Calcutta, 1973, p. 37.

১০। Sircar D.C., **op. cit.,** p. 68 (Appendix)

১১। Morrison, B.M , **Political Centres and Cultural Regions in Early Bengal,** Tuscon, 1970, p. 163 (Appendix)

১২। রায় নীহাররঞ্জন, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৫৭০-৭১

১৩। Sircar D.C., **op. cit.** p. 74, 76, (Appendix).

১৪। কুণ্ডু শম্ভুনাথ, 'পাললেখে পৌরাণিক দেবভাবনার প্রকৃতি', **ইতিহাস-অনুসন্ধান**, (৮ম) কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২৪০-২৪২।

১৫। কুণ্ডু শম্ভুনাথ, **প্রাচীনবঙ্গে পৌরাণিকধর্ম ও দেবভাবনা**, বর্ধমান বিশ্ব ১৯৯৬, পৃ. ৮৮-৮৯

১৬। ধর্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাত ঃ কলৌ। শ্রীকান্তোহপি সরস্বতীপরিবৃত ঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ।।

–**Danasagara** of Vallalasena, ed. by B.Chatterjee, Calcutta, 1955, p. 720.

১৭। Majumder N.G., **Inscriptions of Bengal**, Vol, III, Rajshahi, 1929, pp. 25 ff.

আবাস থেকে মঠ আদি মধ্যকালীন পূর্ব ভারতে একটি বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠান।

কৃষ্ণেন্দু রায়

আদি মধ্যকালীন পর্বে (খৃঃ ৬০০-১২০০ খৃঃ) ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভক্তি আশ্রয়ী ধর্ম ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই ভক্তি আশ্রয়ী ধর্মাদর্শকে কেন্দ্র করে সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিশ্বাস বা পূজা-পদ্ধতি বিশিষ্ট ধর্মীয় নানা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ইত্যাদি। এই সম্প্রদায়গুলি সুনির্দিষ্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠানে বসবাস করত। প্রতিষ্ঠানগুলি নিছক দেবালয় ভিত্তিক ছিল না; সেখানে অন্যান্য ব্যবস্থাও থাকত। দেবার্চনার জন্য মন্দির সহ পুরোহিতগণ ও তাঁদের শিষ্যদের থাকার জায়গা এবং এদের সকলের প্রাত্যহিক জীবন যাপনের উপযোগী নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহকারী পেশাদারী লোকেদের থাকবার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের পূজার্চনা বা সাধন ভজন করা হত বলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় পরিভাষায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা হত মঠ[১]। একটি দেবালয় বা মন্দিরকে ভিত্তি করে যে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ দেখা যায়, তার চেয়ে এই মঠ জাতীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জটিলতা বেশী, আকারেও বৃহত্তর। আদি মধ্যকালীন পর্বে এই মঠ জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতার নজির যথেষ্ট আছে। পরবর্তী গুপ্ত রাজা আদিত্য সেনের (৬৬০ খৃঃ - ৭৫ খৃঃ) মাতা মহাদেবী কোনাদেবী ধর্মপ্রাণ বিষ্ণু ভক্তদের থাকার বন্দোবস্ত স্বরূপ একটি মঠ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন[২]। পালরাজ প্রথম শূর পালের (আঃ খৃঃ ৮৪৭-৬০ খৃঃ) মাতা মাহ্‌টা দেবী শৈবাচার্যদের একটি পরিষদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে নিজের নামে এক আবাসিক মন্দির স্থাপন করিয়ে দিয়েছিলেন[৩]। পালরাজ নারায়ণ পালের আমলে (আঃ খৃঃ ৮৬১-৯১৭ খৃঃ) কলশপেত নামক জায়গায় (অজ্ঞাত পরিচয়) পাশুপত শৈবাচার্যদের একটি আবাসিক ধর্ম প্রতিষ্ঠান ছিল বলে জানা যায়[৪]। অর্থাৎ আদি মধ্যকালীন পূর্ব ভারতে মঠ জাতীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি রাজানুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

রাজানুকুল্য ছাড়াও ব্যক্তিগত উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতাও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি পেত। এমন নজির পাল রাজ ধর্ম পালের আমলেই (আঃ খৃঃ ৭৭৫-৮১০ খৃঃ) পাওয়া যায়। ধর্ম পালের ২৬তম রাজ্যবর্ষে অর্থাৎ ৮০১ খৃস্টাব্দে উজ্জ্বল নামে কোন এক ভাস্করের পুত্র কেশব বুদ্ধগয়া ধামে মন্দির নির্মাণ করিয়ে চতুর্মুখ শিবের মূর্তি স্থাপন করিয়েছিলেন।

মন্দিরটির নাম চম্পেশায়তন। এবং সাধুগণের মঙ্গলার্থে একটি পুষ্করিণী খনন করান। সমগ্র প্রতিষ্ঠা কার্য্যে তার ব্যয় হয়েছিল মোট ৩০০০ দ্রম্ম(৫)। লক্ষণীয় যে, বৌদ্ধদের মহা তীর্থস্থান বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধরাজা ধর্ম পালের আমলেই শৈব প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত সহায়তাদান করা হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম প্রতিষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন বোধ হয় সমাজে বন্ধ হয়নি। কারণ পাল রাজ নারায়ণ পালের আমলে এই জাতীয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে লেখমালা ভিত্তিক খবর আছে। তাই এটি নিছক বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়।

বিহার প্রদেশের গয়া জেলায় তথা গয়া তীর্থে বিষ্ণুপাদ মন্দির চত্বরের মধ্যে অবস্থিত মহাদেবের মন্দিরের গায়ে পাথরের উপরে কিছু লেখ পালরাজ নারায়ণ পালের সপ্তম রাজ্যবর্ষে (আঃ ৮৬৮ খৃঃ) উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। সংক্ষেপে একে বলা হয় গয়া লেখ(৬)। লেখটিতে কয়েকটি শব্দ আছে যে-গুলি আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সমার্থক, কিন্তু বিশেষভাবে বিচার করলে মঠ জাতীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ধারণা ভিন্নতর হয়ে ওঠে। বর্তমান পত্রের উদ্দেশ্য সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

লেখটি বিষ্ণু বন্দনা দিয়ে শুরু হয়েছে—**ওঁ নমঃ পুরুষত্তমায়**। প্রথম ছন্দের প্রথম অংশে বিষ্ণুকে **(মুরারিস্ট রিঃ)** এবং দ্বিতীয়াংশে তাঁর-ই ভক্ত সন্ন্যাসীগণকে

(তদনু মুনিজনো) শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। খুব সম্ভবত এই সন্ন্যাসীগণকেই ভানুদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, জ্ঞান অর্জন **(জ্ঞানম্ আস্বাদনায়)**(৭); এই জ্ঞান প্রসঙ্গত বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধীয় (বিষয়টিতে পরে আসছি)। ভানুদেবের পরিবার তিন পুরুষ ধরে গয়ায় বসবাস করছিল। ভানুদেবের পিতার নাম বপ্পদেব, পিতামহের নাম সীহদেব এবং প্রপিতামহের নাম ভট্ট বামদেব(৮)। যাহোক্ সন্ন্যাসীরা অনেকেই ছিলেন, সঠিক সংখ্যা অবশ্য জানা যায় না। সন্ন্যাসীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ **(তেন-অনেক-দ্বিজ-জন-ভবি...গয়াং শ্রীমাদেশো যতিষু বিহিত [:] সদ্-গুণ-আবাস-বাস:)**(৯)।

লক্ষ্যণীয়, বাসস্থানটিকে **আবাস-বাস** বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাসস্থানটি বেশ বড়সড় ছিল বলেই বোধ হয়। কারণ সেখানে অনেক সন্ন্যাসী বাস করতেন **(অনেক দ্বিজ-জন)**। সম্ভবত সন্ন্যাসীগণ প্রথমে অস্থায়ীভাবে বাস করতেন। কারণ **আবাস-বাস** শব্দটির মধ্যে **আ**-উপসর্গের মুখ্য অর্থ-ই হল উপর-উপর সংলগ্ন হওয়া(১০)। অনুমান করা চলে যে, বাসস্থানটি প্রথমে স্থায়ী ধর্ম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়নি।

বোধ হয় কোন এক সময়ে উক্ত বাসস্থানে ব্রহ্মচারীগণ বেদাধ্যয়নের জন্য বসতি করতেন। তখন **আবাস-বাসটি** স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের চেহারা পেয়েছিল। তাই বাসস্থানটিকে, **আশ্রম** আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে **(জাত্য শ্রেয়ো যদ্-অমল গুণং ব্রহ্মচার্য-আশ্রমেন তেন ..)**(১১)।

ব্রহ্মচারীগণ এবং সন্ন্যাসীরা ধর্ম প্রতিষ্ঠানটিতে স্থায়ীভাবে বসতি ও ধর্মচর্চা করতেন মনে করা যেতে পারে। কারণ প্রতিষ্ঠানটিকে এবার **নিবাস**(১২ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নির্বিসর্গে(১৩) নি উপসর্গের অর্থ ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত হওয়া(১৪)। কাজেই প্রসঙ্গত অনুমান

করা চলে যে, প্রতিষ্ঠানটি বেশ পাকাপাকিভাবে-ই আবাসিক হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ভানুদেবকে **মৌনী**[১৪] বলা হয়েছে। মুনির মতো আচরণ করেন যিনি, অর্থাৎ যিনি মননশীল, তথা মৌলিক চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তাঁকে **মৌনী** বলা হয়। এখন, এ-কথা সুবিদিত যে, বৌদ্ধ দেবতা অবলোকিতেশ্বর সমগ্র জগৎসংসারের তথা মানুষের মঙ্গল ও শান্তির জন্য চিন্তা এবং অবলোকন করেন। যেমন লোকনাথ রক্তার্য্য-অবলোকিতে-শ্বর, চিন্তামনি-লোকেশ্বরের নাম উল্লেখ্য[১৫]। অবলোকিতেশ্বরের এই মঙ্গলদায়ী বৈশিষ্ট্য ব্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণুর মধ্যেও লক্ষ্যণীয়। ভগবান বিষ্ণুকেও সাধারণভাবে বলা হয় জগতের পালন কর্তা। বস্তুত, আলোচ্য লেখমালায় বিষ্ণুকে বলা হয়েছে **শ্রীমান লোকেকনাথো ভুবন-হিত বিধাতা পাতু যুস্মান্ স বিষ্ণুঃ**[১৬]। অর্থাৎ জগৎ-সংসারের প্রভু হিসেবে মানুষের মঙ্গল করেন তথা হিতসাধনে কর্তব্যরত থাকেন ভগবান বিষ্ণু। অবলোকিতেশ্বরের ঢঙে ভগবান বিষ্ণুরও মৌনী রূপের নজির খাজুরাহের বিশ্বনাথের মন্দিরে (১০ম-১১ শ শতক) আছে[১৭]। বিষ্ণুর এই হিতকারী প্রভাব ভানুদেবের উপরও লক্ষ্যণীয়। প্রভাবিত হয়ে এই কারণে-ই বোধ হয় ভানুদেব জনসাধারণের নিকট আবেদন করেছিলেন যেন তারা উক্ত **বৈষ্ণব নিবাসটি** যত্ন সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করেন (...**সুকৃতে পালনে রক্ষণে চ তৎ কর্তব্য ভবদ্ভিঃ স্থির-বিমল-গুণঃ স্যান-নিবা**সো[১৮]। দেবাচনা ও সন্ন্যাসীগণের আবাসনের ব্যবস্থা উভয়ই আলোচ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠানটিতে ছিল। সম্ভবত সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধীয় উচ্চস্তরীয় আলোচনা সভাও বসত; কারণ একটু আগেই বলা হয়েছে যে, ভানুদেব আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞান আস্বাদনের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করিয়েছিলেন। সমাজে **মঠটি** বেশ স্বীকৃতিও পেয়েছিল। তাই একে বলা হয়েছে **সন্ধ প্রতিষ্ঠিত মঠ**[১৯]।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। **মঠটিতে ধর্ম**প্রাণ ব্যক্তি মাত্রই আশ্রয় পেতেন না। বিশুদ্ধ চিত্তের অধিকারী, মাননীয় এবং শুধুমাত্র তপস্যাব্রতে ব্রতী হয়ে আছেন—এমন সন্ন্যাসীগণ-ই উক্ত আশ্রমে তথা মঠে থাকতে পারতেন (...**অনার্য-বহিস্ তপধন-জনৈঃ স্থাতব্যম্-অত্রাশ্রমে**)[২০]। বস্তুত আলোচ্য মঠের সন্ন্যাসীগণ ধ্যান চর্চায় মগ্ন থাকিতেন (**ধ্যান-বৃত্তৌ-স্থিরাত্মা**)[২১]। এই নিয়ম যাতে কোন মতেই লঙ্ঘিত না-হয়, সেটি লক্ষ্য রাখা গয়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের এবং সাধারণ মানুষদেরও কর্তব্য ছিল, যাতে **মঠটির** বিশিষ্টতা ক্ষুণ্ণ না হয় (...**ন-অন্যথা কর্তব্যং...বিপ্রৈঃ-গয়া-বসিভিঃ**[২২]।

অতএব বলা যেতে পারে যে, বৌদ্ধ শাসক নারায়ণ পালের আমলে একজন বিষ্ণু ভক্ত ব্রাহ্মণ ব্যক্তি নিজ উৎসাহে ও পৃষ্ঠ পোষকতায় বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই বাসস্থান অস্থায়ী অবস্থা থেকে ধীরে-ধীরে পূর্ণাঙ্গ মঠে পরিণত হয়েছিল-আবাস-বাস-আশ্রম-নিবাস-মঠ।

সূত্রনির্দেশ

(১) চক্রবর্তী রণবীর, 'মনার্কস্, মার্চেন্টস অ্যাণ্ড- এ মঠ ইন নর্দান কোঙ্কন', লেখকের ব্যক্তিগত প্রতিলিপি থেকে, পৃ. ১।

(২) থপ্লিয়াল কে.কে., **ইনস্‌ক্রিপশন্‌স্‌ অব দ্যা মৌখরীজ, লেটার গুপ্তজ, পুষ্পভূতিজ, অ্যান্ড যশোবর্মন অব কনৌজ**, দিল্লী, ১৯৮৫, পৃ. ১৬০-৬৬, বিশেষ করে পৃ. ১৬৪।

(৩) সরকার ডি.সি, 'কপারপ্লেট গ্র্যান্ট অব শূরপাল প্রথম', **জার্নাল অব বিহার রিসার্চ সোসাইটি**, খন্ড ৬১, নং ১-৪, ১৯৭৫, পৃ. ১৩৯ হতে।

(৪) মৈত্র অক্ষয় কুমার, **গৌড়লেখমালা**, রাজশাহী, ১৯২৯, পৃ. ৬১, সারি সংখ্যা ৩৮-৪০।

(৫) ঐ, **তদেব**, পৃ. ৩০-৩২, সারি ১-৩।

(৬) সরকার ডি.সি., 'ত্রি পাল ইন্‌স্‌ক্রিপশন্‌স্‌, গয়া ইনস্‌ক্রিপশন্‌ অব দ্যা টাইম অব নারায়ণ পাল ইয়ার ৭', **এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা** (এরপর এ.ই), খন্ড ৩৫, পৃ. ২২৫-২৮।

(৭) সরকার ডি.সি, **তদেব**, পৃ. ২২৮, ছন্দ ৭।

(৮) ঐ , **তদেব**, পৃ. ২২৬, ছন্দ ৩-৬।

(৯) ঐ , **তদেব**, পৃ. ২২৮, সারি নং-৯।

(১০) ঠাকুর দ্বিজেন্দ্রনাথ, **উপসর্গের অর্থ বিচার**, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ৫৮।

(১১) সরকার ডি.সি, **এ.ই**, পৃ. ২২৮, সারি নং-৯।

(১২) ঐ , **তদেব**, পৃ. ২২৮, সারি নং-১১।

(১৩) ঠাকুর দ্বিজেন্দ্রনাথ, **পূর্বোক্ত**, পৃ. ৫৬-৫৭...নির্বিসর্গ **নি** এবং সার্বিসর্গ **নিঃ** উভয়ের মধ্যে অর্থ বৈষম্য ও বৈপরীত্য আছে। সাবিসর্গ **নিঃ** এর অর্থ Ex=out এবং নির্বিসর্গ **নি**-এর অর্থ In। যখন বলা হয় নিশ্বাস টানা হচ্ছে, তখন সেই নি-উপসর্গ নির্বিসর্গ। নির্বিসর্গ নিশ্বাস মানে ভিতরে টেনে নেওয়া শ্বাস। আর সবিসর্গ **নিঃ** মানে নিঃশেষণ, নিঃশ্বসিত হওয়া অর্থাৎ সবিসর্গ হলে **নিঃ** উপসর্গের অর্থ শ্বাসবিহীনতা।

(১৪) ঠাকুর দ্বিজেন্দ্রনাথ, **তদেব**, পৃ. ৫৮; তুলনীয় চট্টোপাধ্যায় সুনীতি কুমার, **ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ**, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৭৩।

(১৫) সরকার ডি.সি, **এ.ই**, পৃ. ২২৮, সারি নং-১১।

(১৬) ভট্টাচার্য্য বিনয়তোষ, **দি ইন্ডিয়ান বুদ্ধিস্ট আইকোনগ্রাফি**, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১৪৩, ৩৯৬,৪৩০।

(১৭) সরকার ডি.সি, **এ.ই.**, পৃ. ২২৭, সারি নং-৩, ছন্দ নং-২।

(১৭ ক) ব্যানার্জিয়া জে.এন, **দি ডেভেলপমেন্ট অব হিন্দু আইকোনগ্রাফি**, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা - ১৯৫৬, পৃ. ৪০৬, চিত্র ২৪।

(১৮) সরকার ডি.সি, **এ.ই**, পৃ. ২২৮, সারি নং-১১।

(১৯) ঐ , **তদেব**, পৃ. ২২৮, সারি নং-১৬।

(২০) সরকার ডি.সি, **তদেব**, পৃ. ২২৮, সারি নং-১৩।

(২১) ঐ , **তদেব**, পৃ. ২২৭, সারি নং-২।

(২২) ঐ , **তদেব**, পৃ. ২২৮, সারি নং-১৩-১৪।

হিউয়েন-সাং-এর ভারত-বিবরণে গাছপালা, ফুলফল

শুভ্রদীপ দে

প্রাচীনকালে চীন থেকে যে সব পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাং ও ইৎ—সিং। ভারতে আগত চীনা পর্যটকদের মধ্যে আবার সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন হিউয়েন—সাং (খ্রীঃ ৬০২—৬৬৪)।

হিউয়েন সাং-এর ভারতযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ দার্শনিক-তত্ত্ব অধ্যয়ন।[১] তিনি ভারতে এসেছিলেন ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে আর দেশে ফিরে যান ৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে।[২] তিনিই একমাত্র চীনা পর্যটক যিনি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ ক'রে বিভিন্ন অঞ্চলের বিবরণ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩] তাঁর বিরাট কীর্তি—**'সি-উ-কি'** (থাং রাজবংশের সময়কার পশ্চিমাঞ্চলের দেশসমূহের বিবরণ)। চীনা ভাষায় গ্রন্থটির নাম তথাং **সিইয়ুচি**। তিনি ভারতের মোট ১৩৮টি রাজ্যের অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন।[৪] মূলতঃ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লেখা বলে তাঁর বিবরণ নিখুঁত। তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রবল, পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল প্রকৃত বিজ্ঞানীর মতো।

কেবল বৌদ্ধ তীর্থস্থানের বর্ণনা, রাজনৈতিক বা সামাজিক সংবাদের জন্য নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু, অধিবাসী, গাছপালা, পশু-পাখি ইত্যাদি বিষয়ে নানা বাস্তব বর্ণনার জন্য সি-ইউ-কী গুরুত্বপূর্ণ।[৫] জলবায়ু, মৃত্তিকা ও ঋতুভেদে বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদ জগতে যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য স্বাভাবিক সেই পার্থক্য ও বৈচিত্র্য তাঁর বিবরণে ধরা পড়েছে।[৬]

ভারতের উদ্ভিদ জগতে শাল **(Shorea robusta)** একটি প্রধান বৃক্ষ। এই গাছ ২৫-৩০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। এর পাতা লম্বায় ১৫-২০ সে.মি.. গোড়ার দিকটা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। ফুল শ্বেতবর্ণ, নরম ও লোমযুক্ত। মার্চ মাসে ফুল হয়। ভারত, বাংলাদেশ এর আদি বাসস্থান।[৭] হিউয়েন-সাং কুশীনগরে শাল বন দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "শাল গাছ দেখতে অনেকটা আমাদের হু (Huh) গাছের মতো। সবুজাভ সাদা বাকল। পাতা তেলতেলে মসৃণ।[৮] হিউয়েন সাং লিখেছেন, 'দুটি সাল গাছের মাঝে বুদ্ধ নির্বাণের আনন্দলোকে প্রয়াণ করেন।"[৯]

অশ্বত্থ (Ficus religiosa Linn) হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র বৃক্ষ। শ্রীলঙ্কা, ভারত ও বাংলাদেশ এর আদি নিবাস।[১০] খ্রীষ্টপূর্ব ছয় শতকে নৈরঞ্জনা নদীতীরে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে ধ্যানী সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিলাভ করেন। স্থানটি বুদ্ধগয়া ও পবিত্র

বৃক্ষটি বোধিবৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। বুদ্ধগয়ার এই পবিত্র বৃক্ষ সম্পর্কে হিউয়েন-সাং লিখেছেন, "বজ্রাসনের উপরের বোধিবৃক্ষটি একটি অশ্বত্থ গাছ (পিপল)। পুরাকালে বুদ্ধের সময়ে গাছটি কয়েকশো ফুট উঁচু ছিল। তারপর একে প্রায়ই কেটে ফেলা হয়েছে। তাসত্ত্বেও এখনো এটি ৪০ থেকে ৫০ ফুট উঁচু। বুদ্ধ এর নিচে বসে 'সম্যক সম্বোধি' বা যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন ব'লে একে জ্ঞানের বৃক্ষ বা বোধিবৃক্ষ বলা হয়। এ গাছের বাকল হলদেটে— সাদা, পাতা গাঢ় সবুজ রঙের। কি শীত কি গ্রীষ্ম কোন ঋতুতেই এর পাতা ঝরে না। সবসময় সেগুলি তেলতেলে চিকণ, কখনো কোন হেরফের নেই। কিন্তু প্রত্যেক বছর বুদ্ধের নির্বাণ তারিখটি এলে পাতাগুলি হলদে হয়ে ঝরে পড়েও মুহূর্তের মধ্যে আবার নতুন পাতা গজিয়ে ওঠে ও আগের চেহারা ফিরে পায়।"[১১]

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যানুশীলনের ক্ষেত্র ছিল। হিউয়েন-সাং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন। এখানকার ছায়া-নিবিড় নিকুঞ্জ ও উদ্যানের শোভাদর্শনে তিনি মোহিত হয়েছিলেন। এখানে সরোবর সমূহের স্বচ্ছ সলিলে নীলকমল প্রস্ফুটিত হতো, রক্তবর্ণ কুসুমে কনকতরু ঝলমল করতো, শ্যামল পত্র-শোভিত আম্রবৃক্ষরাজি আনন্দপ্রদ ছায়া বিস্তার করতো।[১২]

হিউয়েন-সাং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের ফলের গাছ দেখেছিলেন। যেমন—অমল, আম্র, মধুক, ভদ্র, কাপিত্থ, অমলা, তিন্দুক, উদুম্বর, মোচ, নারিকেল, পনস ইত্যাদি।[১৩] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে অমলা হলো সাতলাবৃক্ষ[১৪], তিন্দুক হলো গাব গাছ[১৫], মোচ কদলীফুল অথবা একধরণের শোভাঞ্জন বৃক্ষ।[১৬] আর পনস হলো কাঁঠাল।[১৭] আম (Magnifera indica Linn) কে বাংলাদেশে বলা হয় ফলের রাজা। ভারত উপমহাদেশই আমের আদি আবাসস্থল। নামের শেষাংশ ইন্ডিকা এরই স্মারক। চিরসবুজ ও দীর্ঘজীবী আম গাছের ফল পাকবার সময় মে—জুন।[১৮] মধুক বলতে বোঝায় মহুয়া।[১৯] কপিত্থ (Feronica limonia) বা কয়েৎবেল। ভারত ও বাংলাদেশ এর আদি নিবাস।[২০] হিউয়েন-সাং পুনচ্ অঞ্চলে অমল, উদুম্বর, মোচ ইত্যাদি ফল দেখেছিলেন।[২১] উদুম্বর হলো ডুমুর।[২২]

আমলক বা আমলকী (Phyllanthus emblicn) বাংলার অবহেলিত কিন্তু মূল্যবান বৃক্ষ। শুধু ভেষজগুণে নয়, সুন্দর তরু রূপেও সমাদর যোগ্য। ভারত ও বাংলাদেশ এর আদি বাসস্থান।[২৩] হিউয়েন-সাং লিখেছেন, মথুরার অধিবাসীগণ "সব থেকে বেশি মনোযোগ দেয় অন-য়ো-লো বা আমলকী গাছ চাষের ওপর। এগুলি ঝাঁক বেঁধে জন্মায় ও রীতিমতো অরণ্য সৃষ্টি করে। এর গাছগুলির যদিও একটি মাত্র নাম তা হলেও এরা আসলে দুটি জাতের। যেটি ছোট প্রজাতির তার ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ, কিন্তু পাকার পর হলদে হয়ে যায়। যেটি বড়ো প্রজাতির তার ফল সব অবস্থাতেই সবুজ থাকে।"[২৪]

হিউয়েন-সাং জানিয়েছেন, আমলক ফলটি ভারতে ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।[২৫] প্রসঙ্গত তিনি একটি কাহিনীর মাধ্যমে জানিয়েছেন, রাজা অশোক একবার কঠিন অসুখে পড়েন। তিনি ধরে নেন যে আর বাঁচবেন না। কিন্তু আধখানা আমলক ফলদান থেকেই রাজা আরোগ্য লাভ করেন। তিনি সংঘারামের পরিচালককে উপযুক্ত পাত্রে এই ফলের বীজ সংরক্ষণ করার আদেশ দেন।[২৬]

হিউয়েন-সাং লিখেছেন, পুণ্ড্রবধনে পনস ফলের খুব কদর। এই ফল ফলেও অনেক। পনস কুমড়োর মতো বড়। পাকলে রং হয় হলুদে—লাল। ভাঙ্গলে এর মধ্যে পায়রার ডিমের মতো বড় ফল বেরোয়। সেগুলি ভাঙ্গলে হলুদে—লাল রঙের অতি সুস্বাদু রস বেরোয়। কখনো এই ফল গাছের ডাল থেকে অন্য ফলের গুচ্ছের মতো ঝুলে থাকে, আর কখনোবা এগুলি গাছে শিকড়ের কাছে জন্মায়, ভূমিতে উৎপন্ন ফু-লিগের (সম্ভবত কোন চীনা ফল বা উদ্ভিদ) মতো।[২৭] বাস্তবিকই পনস বা কাঁঠাল (Artocarpus heterophyllus lamk) একটি যৌগিক ফল। বসন্তে এই ফল ধরে ও গ্রীষ্মে পরিপক্ক হয়।[২৮] কামরূপেও পনস ও নারকেলের চাষ হতো।

নাসাপাতি (Pyrus communis)-র জন্মস্থান ইউরোপ।[২৯] আঙুর (Vitis vinifera Linn) পৃথিবীর প্রাচীন ফলের অন্যতম; পাঁচ থেকে ছ হাজার বছর আগে মিশরে আঙুরের চাষ হতো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।[৩০] পীচ (prunus persica) ইউরোপীয় ফলবৃক্ষ বিশেষ। ফল বর্ষাকালে পাকে।[৩১] হিউয়েন-সাং লিখেছেন, নাসাপাতি, বুনো কুল, পীচ, খোবানি আর আঙুর কাশ্মীরে জন্মায়।[৩২] উদ্যান রাজ্যে আঙুর ফলে।[৩৩]

হিউয়েন-সাং তাঁর বিবরণে ভারতে চীনাভুক্তি নামে একটি স্থানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি শুনেছিলেন বহু পূর্বে চীনদেশের একজন রাজকুমার এইস্থানে এসে মাঝে মাঝে বাস করতেন। তাঁর জন্য চীন থেকে পীচফল ও নাসাপাতিফল ওখানে আনা হতো। এইভাবে ভারতে দুটি ফলের প্রচলন হয়। তাই প্রাচীন ভারতে পীচ ফলকে "চিনানি" এবং নাসাপাতিকে "চীনারাজপুত্র" বলা হতো।[৩৪]

হিউয়েন-সাং তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন ফসলের কথা লিখেছেন। ফসলের মধ্যে ধান ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। পারিযাত্র নামক দেশে আশ্চর্য এক জাতের ধান বোনা হোত—যেগুলি মাত্র ৬০ দিনে পাকত।[৩৫] লম্পক, কৌশাম্বী ইত্যাদি অঞ্চলেও ধান হত।[৩৬] মগধ দেশে এক বিশেষ ধরণের চাল জন্মাত যা আকারে ছিল বড়। এই চাল ছিল সুগন্ধি ও এর স্বাদ ছিল চমৎকার। এর নাম ছিল 'মহাশালী' বা 'সুগন্ধিকা'। এর বর্তমান নাম 'বাসমতী'। সাধারণ রাজা, ধনী বণিক বা বিখ্যাত ধার্মিক ব্যক্তিরাই এই চাল ব্যবহার করতেন।[৩৭]

হিউয়েন-সাং-এর অনুরক্ত ও অনুগত শিষ্য সমন হুইলি তাঁর গুরু সম্পর্কে লিখেছেন, 'হিউয়েন-সাং যখন নালন্দায় ছিলেন তখন তাঁকে সুগন্ধিকা চালের অন্ন পরিবেশন ক'রে সম্মানিত করা হয়।[৩৮]

হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা অনুসারে, ফুলের জন্যে আকর্ষণীয় ছিল কয়েকটি অঞ্চল—নগরহার[৩৯], হিডড বা হি-লো শহর[৪০], উদ্যান.[৪১] তক্ষশীলা[৪২], পূনচ[৪৩], মতিপুর (মান্দোর),[৪৪] গোবিসান,[৪৫] বিশাখা ইত্যাদি।

পদ্ম (Nelumbo nucifera) জলের ওপর বড় বড় গোলাকার পাতা প্রসারিত করে বেড়ে ওঠে। বারো মাস জল থাকে এমন জায়গায় পদ্ম হয়। বর্ষাকাল এর প্রস্ফুটনের

সময়। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ের নিকটই পদ্ম পবিত্র ফুল। হিউয়েন সাং নালন্দায় ও সিংহপুর অঞ্চলে পদ্ম দেখেছিলেন।

কনকচাঁপা (Orchna Squarrosa L.) সুগন্ধি ফুলের জন্য প্রখ্যাত। চিরহরিৎ। গ্রীষ্মকালে হলুদ রঙের বড় ফুল ফোটে। পাতা ছায়ানিবিড়। নাতিদীর্ঘ ও মসৃণ কান্ড, ছায়ানিবিড় পাতা ও বড়ো আকৃতির সুগন্ধি ফুলের জন্য বাগানে বা গৃহ-প্রাঙ্গণে কনকচাঁপা একটি অনন্য নির্বাচন। অবশ্য বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাসে চাঁপা ও কনকচাঁপার মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। রাজগৃহে রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধ কনকচাঁপা গাছ চীনা পরিব্রাজকের চোখে পড়েছিল।[৮৭]

বিভিন্ন ধরণের মশলা, গন্ধদ্রব্য এবং ওষধি গাছপালার সযত্ন উল্লেখ সি-ইউ-কী গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। দরিল নদীর উপত্যকায় প্রচুর সুগন্ধি হলুদ (Curcuma Longa) জন্মাতো। কাশ্মীরে জন্মাতো সুগন্ধি হলুদ ও ড্রাগন—হর্স।[৮৮] এই সুগন্ধি হলুদ হয়তো বর্তমান কালের জাফরান (Crocus sativa Lily)। রাজগৃহে সুগন্ধি কুশ ঘাস হতো।

রক্তচন্দন (Pterocarpus santalinus Linn.) হিন্দুদের পবিত্র বৃক্ষের অন্যতম। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়। শ্বেত চন্দন (Santalumalbum Linn.)। ভারত এর আদি নিবাস। হিউয়েন—সাং লিখেছেন, মালকূট রাজ্যে মলয় পর্বতমালায় শ্বেতচন্দন ও চন্দনিভ গাছ হতো।[৮৯]

কর্পূর (Cinnamomum camphora L.)। আদি নিবাস চীন ও জাপান। সি-ইউ-কী অনুসারে মলয় পর্বতমালায় কর্পূর পাওয়া যেতো। তিনি লিখেছেন, "কর্পূরগাছের গুঁড়ি দেখতে পাইন গাছের মতোই, তবে পাতা, ফুল ও ফল দেখতে আলাদা রকমের। যখন গাছ কেটে ফেলা হয় ও রসালো অবস্থায় থাকে তখন কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। কাঠ শুকিয়ে গেলেই তার মধ্যে শিরার মতো দেখা যায় ও ফেটে ফেটে যায়। তখন এর মধ্যে অভ্রের মতো স্বচ্ছ, জমাট, তুষারশুভ্র কর্পূরের দেখা মেলে।"[৯০]

কাশ্মীরে নানা ধরণের ওষধি গাছ-গাছড়াও জন্মাতো। তুষারাচ্ছন্ন পর্বত-সংকুল কুলুত দেশে বহু রকমের অতি মূল্যবান ওষধি গাছ ও মূল পাওয়া যেতো। হিউয়েন-সাং লিখেছেন, আমলক ফল ভারতে ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।[৯১] অটলি নামক অঞ্চলে হাটসিয়ান বা গোলমরিচ গাছ প্রচুর দেখা যেতো। এই গাছের পাতাগুলি ছিল চীনের ঝে—চুয়েন গোলমরিচ পাতার মতো।[৯২] হিয়ুন-লু নামে সুগন্ধি গাছও এখানে জন্মাতো।

হিউয়েন-সাং তাঁর **সি-ইউ-কী** গ্রন্থে সপ্তম শতকের ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গাছপালা, ফসল, ওষধি গাছ, গন্ধদ্রব্য, মশলা ও ফুল ফলের বিচিত্র ও মনোগ্রাহী বর্ণনা রেখে গেছেন।[৯৩] তাঁর উল্লেখ ও বর্ণনা যে সঠিক তা প্রমাণ করে সমসাময়িক আরেকজন চীনা পর্যটক ই-সিং-এর বিবরণ এবং হর্ষের সভাকবি বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' কাব্যদ্বয়ে প্রদত্ত বিবরণ।

সূত্রনির্দেশ

১। দাস, সুধীর রঞ্জন : **কর্ণসুবর্ণ-মহানগরী**, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৬৮।

২। তদেব।

৩। তদেব।

৪। খোমু চিন : **চীন-ভারত মৈত্রী কথা**, পেইচিং, ১৯৮৪, পৃ. ৮১।

৫। মজুমদার, আর.সি. (সম্পাদক) : **দি ক্লাসিক্যাল এজ**, বোম্বাই, ১৯৮৮ (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ৫০২।

৬। রান্ধয়া, এম.এ. : **এ্যা হিস্ট্রি অব এগ্রিকালচার ইন ইন্ডিয়া**, নিউ দিল্লী, ১৯৮০, পৃ. ৪২৭।

৭। মনিরুজ্জামান, এফ.এম. : **উদ্ভিদ সংহিতা**, (৩য় খণ্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৭১।

৮। দাশগুপ্ত প্রেমময় : **হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত**, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৯৩।

৯। তদেব, পৃ. ৯৪।

১০। **উদ্ভিদ-সংহিতা** (২ য় খন্ড), পৃ. ৩১৫।

১১। দাশগুপ্ত, পৃ. ১১৬।

১২। রায়, শরৎকুমার : **বৌদ্ধ ভারত**, কলকাতা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৯।

১৩। দাশগুপ্ত, পৃ. ২৫।

১৪। বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ : **উদ্ভিদ অভিধান**, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১১।

১৫। তদেব, পৃ. ১৭৪।

১৬। তদেব, পৃ. ৩৩১।

১৭। তদেব, পৃ. ২৩৮।

১৮। **উদ্ভিদ-সংহিতা** (৩য় খন্ড), পৃ. ৮৩।

১৯। বিদ্যাভূষণ, পৃ ৩০০।

২০। **উদ্ভিদ-সংহিতা** (২য় খন্ড), পৃ. ৩০৮।

২১। দাশগুপ্ত, পৃ. ৪৯।

২২। বিদ্যাভূষণ, পৃ. ২৯।

২৩। **উদ্ভিদ-সংহিতা** (৩য় খন্ড), পৃ. ১৮১

২৪। দাশগুপ্ত, পৃ. ৫৫-৫৬।

২৫। তদেব, পৃ. ১০৯।

২৬। তদেব, পৃ. ১১০।

২৭। রায় অসীম : **বঙ্গবৃত্তান্ত**, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৯৭-৯৮।

২৮। **উদ্ভিদ-সংহিতা** (২য় খন্ড), পৃ. ৮৬; শর্মা দ্বিজেন : **শ্যামলী নিসর্গ**, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ১৩০-১৩২।

২৯। **উদ্ভিদ-সংহিতা** (৩য় খন্ড), পৃ. ২১৯।

৩০। ঐ, পৃ. ৩৫৪।

৩১। বিদ্যাভূষণ, পৃ. ২৫০।

৩২। দাশগুপ্ত, পৃ. ২৫।

৩৩। ঐ, পৃ. ৩৬।

৩৪। খোমু চিন, পৃ. ৮৮; দাশগুপ্ত, পৃ. ৫২।

৩৫। দাশগুপ্ত, পৃ. ৫৫।

৩৬। দাশগুপ্ত, পৃ. ১০৬।

৩৭। হুই-লি সামন : দ্য লাইফ অভ হিউয়েন-সাং (অনুবাদ : এস্ বীল), দিল্লী, ১৯৮৬ (ফার্স্ট প্রিন্ট ইন ইন্ডিয়া), পৃ. ১০৯।

৩৮। দাশগুপ্ত, পৃ. ২৮।

৩৯। উল্লিখিত, পৃ. ২৯।

৪০। উল্লিখিত, ৩৬।

৪১। উল্লিখিত, পৃ. ৪১।

৪২। উল্লিখিত, পৃ. ৪৯।

৪৩। উল্লিখিত, পৃ. ৫৯।

৪৪। উল্লিখিত, পৃ. ৬১।

৪৫। উল্লিখিত, পৃ. ১৩৫।

৪৬। উল্লিখিত, পৃ. ৪২।

৪৭। উল্লিখিত, পৃ. ১২৮।

৪৮। উল্লিখিত, পৃ. ৪৮।

৪৯। উল্লিখিত, পৃ. ১৫৭।

৫০। উল্লিখিত।

৫১। উল্লিখিত, পৃ. ১০৯।

৫২। উল্লিখিত, পৃ. ১৬৪।

জম্বুদ্বীপ
প্রাচীন সভ্যতার মাতৃভূমি

রাজীব দে

জনমার্শালের মতে "যে সকল বশেষ বিশেষ ভূখণ্ডে নদীমাতৃক প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ ও পবিবর্ধন ঘটেছে সে সব দেশের নাম করতে হলে এতকাল ইরান, মেসোপটেমিয়া, মিশরের নাম উল্লেখিত হত এখন থেকে ভারতবর্ষের নাম এর সাথে যুক্ত করতে হবে।"(1)

এই উক্তি মার্শাল করেছিলেন হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ের আবিষ্কারের পর। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, চীন তার সভ্যতার প্রাচীনত্ব নিয়ে ঐ একই সরলরেখায় অবস্থান করছে।

এখানে প্রশ্ন একটাই বর্তমানে আমেরিকা এবং ইউরোপ আধুনিক বিশ্ব সভ্যতার মাতৃভূমি হিসাবে যদি প্রাচীন বৃহত্তর গ্রীক সভ্যতার ঐতিহ্যকে ইতিহাসে স্থান দিতে পারে তবে প্রাচীন বৃহত্তর গ্রীক পূর্ব সভ্যতার বিশ্বায়ন কোথায় হয়েছিল?

এই কৌতূহলই টেনে নিয়ে গেছে জম্বুদ্বীপ সভ্যতার অন্দরমহলে। (2) অধ্যাপক হিরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে "আধুনিক ইউরোপীয় এবং আমেরিকান সভ্যতার সৌধ নির্মিত হয়েছে তিনটি স্তম্ভের ওপর প্রাচীন বৃহত্তর গ্রীসের সভ্যতা হইল এর মূল স্তম্ভ বাকি দুটি প্রাচীন বৃহত্তর রোমের সভ্যতা এবং খ্রীষ্টধর্ম।" প্রাচীন সভ্যতা অর্থাৎ গ্রীক, রোম বা খ্রীষ্টধর্ম সৃষ্টির বহু পূর্বে এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় নদীমাতৃক যে সভ্যতাগুলির জন্ম হয়েছিল তাঁর মূল ভিত্তিই ছিল আঞ্চলিক প্রাকৃতিক অবস্থা। হিংস্র অস্থায়ী ধ্বংসাত্মক যাযাবর জীবন ছেড়ে, স্থায়ী সৃষ্টিকর্মী সভ্যতার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে থাকলো, ফলে মানব সমাজে মানবতাবাদ অর্থাৎ সহনশীলতা, নমনীযতা এবং উদারতা প্রভৃতি উপাদানের সৃষ্টি হল। সভ্যতার মূল ভিত্তি মানবতাবাদের ঐ উপাদানগুলির অস্তিত্ব জম্বুদীপ নামক অঞ্চলেই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এবং বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করতে পেরেছিল। মানবতাবাদের ঐ উপাদানগুলি প্রাচীন চীনদেশে লক্ষ করা গেলেও পর্বত সমুদ্রে ঘেরা প্রকৃতি তার সভ্যতাকে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করার সুযোগ দেয়নি। অন্যদিকে মিশর, মেসোপটেমিয়া ইরান, পরবর্তীকালে ক্রীট, গ্রীক, রোম এই সকল সভ্যতাগুলি (তৎকালীন উন্নত প্রযুক্তির ধারক হয়েও) মানবতাবাদকে বিশেষ পাত্তা দেয়নি। তাই স্থায়ী প্রাচীন সভ্যতার স্বীকৃতি ঐ সমস্ত সভ্যতাগুলি কোনদিন পাইনি। (3) F.P. Krovkin এর মতে

"প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতাগুলি অর্থাৎ মিশর, মেসোপটেমিয়া, পারসিক, গ্রীক, ব্যাবিলন, রোম, পার্থিয়ান প্রভৃতি দেশে উন্নত সভ্যতার জন্ম হলেও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একে অপরের সভ্যতাকে অটুট রাখতে পেরেছে।" বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ঐ দুটি ভূখণ্ড কোনদিন নিজের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ায় নি। এর প্রধান কারণ প্রাসাদ থেকে পর্ণ কুটিরে ছড়িয়ে পড়া মানবতাবাদ। অন্যের ভূখন্ডে জম্বুদ্বীপ এবং চীন আধিপত্য বিস্তার করলেও তাদের সভ্যতা বা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেনি কখনই।

মানবতাবাদ বিশ্বাসী এই সভ্যতাগুলি যুগ যুগ ধরে বর্ধিত হয়ে বিশ্ব দরবারে একটা অপরিবর্তনশীল নির্দিষ্ট আকার ধারণ করেছিল। এই অবস্থায় পৌছতে তার পেছনে বহু সহস্রব্যাপী মানব প্রচেষ্টার প্রয়োজন ঘটেছিল।

মানবতাবাদের জন্ম কেবল জম্বুদ্বীপ বা চীনে ঘটেছিল তা নয়। পৃথিবীর যে অংশে মানব সভ্যতার জন্ম হয়েছে মানবতাবাদ সেখানেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তবে জম্বুদ্বীপ বা চীনের মতো পৃথিবীর কোন অংশেই কোন জাতিই মানবতাবাদকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয়নি।

এই দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ার কতকগুলি কারণ আছে। পূর্বেই উল্লেখিত, মানবতাবাদের তিনটি অংশ সহনশীলতা, নমনীয়তা এবং উদারতা। এই তিনটি গুণ মানব সভ্যতার হৃদয়ে স্থায়ী স্থান করে নিলেই জন্ম দেয় (স্থায়ী) উন্নত দর্শন, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতি এবং বাণিজ্য । (4)

প্রথমতঃ প্রাচীন পৃথিবীর ভৌগলিক অবস্থান আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই আজ থেকে প্রায় ১০ লক্ষ বৎসর পূর্বে যে তুষার যুগের জন্ম তার বিস্তার ছিল পৃথিবীর উত্তরাঞ্চল। কৃষিনির্ভর স্থায়ী সভ্যতা সৃষ্টির পরেও প্রায় দু হাজার বৎসর ইউরোপের প্রায় সমস্ত অঞ্চল বরফাচ্ছাদিত ছিল। কেবলমাত্র পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের উত্তর দিক মনুষ্য বসতির উপযোগী ছিল। নিষ্ঠুর প্রকৃতি ঐ সমস্ত মানুষকে যোদ্ধা বানিয়েছে জীবনযাপনের স্বার্থে।

অন্যদিকে আফ্রিকা ছিল ঘনবৃষ্টিপূর্ণ বনাঞ্চল যা মানব সভ্যতার বিরোধী। আমরা দেখতে পাই উন্নত কৃষিভূমি নীলনদ, ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রীস অঞ্চল হলেও ভয়ঙ্কর বন্যার কবলে প্রত্যেক বৎসরই ধ্বংস হত মানব সভ্যতার আশা আকাঙ্খা।

ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করে গ্রীক সভ্যতার পূর্বে যে সমস্ত সভ্যতার জন্ম হয়েছিল তাদের মধ্যে ভূখণ্ড দখলের লড়াই লেগে থাকতো জীবনধারনের স্বার্থে। তাই সহনশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতার আদর্শকে ঐ সমস্ত সভ্যতা পাত্তা দিত না। এমনকি নগরকেন্দ্রিক গ্রীক সভ্যতাও গড়ে উঠেছে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে।

অন্যদিকে চীনের মোঙ্গলীয় জাতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির সাথে লড়াই করে মানবতাবাদ বিরোধী হলেও দক্ষিণ চীন, সৃষ্টিকামী সভ্যতার সমর্থক ছিল। সেই কারণেই সভ্যতা এবং বর্বরতার মাঝে চীনকে দিতে হয়েছিল বিশাল এক প্রাচীর। আবার জম্বুদ্বীপ কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ মৌসুমী বায়ুর অঞ্চলে নীরবে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে সহনশীলতা, নমনীয়তা এবং উদারতার আদর্শকে। নিষ্ঠুরতা এখানে ছিল না একথা বলা ভুল তবে তা সভ্যতা ধ্বংসকারী ছিল না।(5)

দ্বিতীয়তঃ নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় দেখতে পাই আদিম যুগ থেকে (অর্থাৎ মানুষের আদি জীবাশ্ম রামপিথেকাসের আমল থেকে ক্রোম্যাগনন এর যুগ পর্যন্ত) মানুষের পদচিহ্ন জম্বুদ্বীপের ওপর পড়েছে। মানুষ বংশ রক্ষার সুবিধার্থে যুগ যুগ ধরে জম্বুদ্বীপকে বেছে নিয়েছে তাদের স্থায়ী বাসস্থান হিসাবে। ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চল এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উন্নত মস্তিষ্কের আদিমানব ক্রোম্যাগনন এর জীবাশ্ম আর আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল এবং কেনিয়ায় অনুন্নত মস্তিষ্কের কেনিয়া পিথেকাসের জীবাশ্ম পাওয়া গেলেও বিজ্ঞানীদের ধারণা জম্বুদ্বীপের মধ্য দিয়েই আদিমানবেব চীন যাত্রা ঘটেছিল। জাভা ছিল তাদের বিশ্রামস্থল। জম্বুদ্বীপ আদি মানবদের আকৃষ্ট করার মুল কারণ এখানকার প্রকৃতি। নাতিশীতোষ্ণ মৌসুমী বায়ু, বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক সমতলভূমি, উর্বর মৃত্তিকা, তামা, লোহা এবং অন্যান্য খনিজদ্রব্যের প্রাচুর্য, সমুদ্রবেষ্টিত দক্ষিণাঞ্চল, উত্তরে তুষার ভরা পর্বত শ্রেণী। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এই জম্বুদ্বীপই প্রাচীন বৃহত্তর ভারতবর্ষ। (6) মঁসিয়ে রেনি গ্রুসেই তার গ্রন্থে বৃহত্তর ভারতের নাম উল্লেখ করেন। তিনি বলেছেন "বৃহত্তর গ্রীসের মত বৃহত্তর ভারত রাজনৈতিক দিকে সুব্যবস্থিত ছিল না কিন্তু নৈতিক ও মানসিক ব্যাপারে সামঞ্জস্য সাধন উভয়েই সমান পরিমাণে করতে পেরেছিল"।

জম্বুদ্বীপ প্রকৃত অর্থে ভারতবর্ষের কোন ঐতিহাসিক নাম নয়। বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থে বৃহত্তর ভারতবর্ষকে জম্বুদ্বীপ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন ভাগবত পুরাণ মতে পৃথিবীকে সাতটি দ্বীপে ভাগ করা হয়েছে সেই সাতটি দ্বীপের একটি জম্বুদ্বীপ।(7)

সম্রাট অশোকের প্রথম ক্ষুদ্র গিরি শাসন (রূপনাথের পাঠ) এবং অন্যান্য আরও অনেক অনুশাসনে জম্বুদ্বীপের নাম উল্লেখ আছে। অর্থাৎ পৃথিবীর যে অংশে ভারতবর্ষ অবস্থিত তার নাম জম্বুদ্বীপ।

প্রাচীন বৃহত্তর ভারতবর্ষ রাজনৈতিক দিকে সুব্যবস্থিত না থাকলেও মানসিক এবং নৈতিক দিকে উন্নত হতে পেরোছিল আদিকাল থেকে। (8) হরপ্পা আবিষ্কারের পর জন মার্শাল বলেছিলেন "এই সভ্যতার নাম হরপ্পা সভ্যতা হলেই পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ এবং সম্ভবতঃ ভারতের অন্যান্য, স্থানেও একটি উন্নত ও বিশেষভাবে এক ভারাত্মক এবং স্বতন্ত্র সভ্যতার উদয় হয়েছিল।" বহু প্রাচীন যুগ থেকেই দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, শিল্প, সংস্কৃতি, বাণিজ্যের বিশ্বব্যাপী বিস্তার ঘটিয়েছিল এই বৃহত্তর ভারতবর্ষ।(9)

ডক্টর ম্যাকনিক্যল বলেছেন, "এই আমাদের জগৎ আর এতে মানুষের জীবনযাত্রা চলছে। এসব কিসের ব্যঞ্জনা দিচ্ছে, কি প্রকাশ করতে চায় তা আবিষ্কার করার জন্য লোকে বহু যুগ ধরে বহু প্রয়াস দেখিয়ে এসেছে। ঋক্‌বেদের স্তোত্রগুলিতে আমরা এই সকল উদ্যমের বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখতে পাই"। ভারতবর্ষের এই অন্বেষণের প্রবৃত্তি কখনো থেমে যায়নি। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে বেদ শব্দের উৎপত্তিবিদ্ ধাতু থেকে যাব অর্থ জানা বা অন্বেষণ করা।

বহু প্রাচীন যুগ থেকেই সভ্যতার মূল ভিত্তি মানবতাবাদকে সমর্থন করে এসেছে ভারতবর্ষ।

বুদ্ধদেব, মহাবীর, অশোকের বহু পূর্বে হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে ভারতবর্ষ মানবতাবাদের সমর্থক ছিল। (10) ডক্টর গর্ডন চাইল্ড তৎকালীন হরপ্পা সভ্যতাকে নাগরিক সভ্যতার আখ্যা দিয়েছেন যার ছাপ বহু পরে গ্রীক সভ্যতায় দেখতে পাই। তিনি বলেছেন 'যত্ন পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত পথঘাট, জল নিষ্কাশনের জন্য উৎকৃষ্ট পয়ঃপ্রণালী এবং তা নিয়মিত পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখে একটা সুবিহিত নগর শাসন প্রতিষ্ঠান বা মিউনিসিপ্যালিটির কথা মনে হয়। এ প্রতিষ্ঠান এমন শক্তিশালী ছিল যে শহর পরিকল্পনা সংক্রান্ত নিয়মকানুন কেউ ভাঙতে পারত না।" অন্যদিকে সমসাময়িক যুগে তো আমরা দেখতে পাই মিশর, মেসোপটেমিয়ার মন্দির, সমাধিক্ষেত্র, রাজপ্রাসাদের প্রতি অধিক অর্থ ব্যয় করা হত। সাধারণ নাগরিকগণ অকিঞ্চিৎকর আবাসগৃহে কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করতো।

মহর্ষি বাল্মিকীর রামায়ণ এবং মহর্ষি ব্যাসদেবের মহাভারত গ্রন্থের কাহিনীগুলি প্রমাণ দেয় তৎকালীন যুগেও সভ্যতার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য মানবতাবাদ বিরোধীর বিরুদ্ধে লড়াই হত। যদিও রামায়ণ মহাভারতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে তবুও ঐতিহাসিকগণ এ কথা স্বীকার করেন যে ঐ গ্রন্থ দুটির মধ্য দিয়ে সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। (11)

রেনি গ্রুসেই উল্লেখ করেন "ভারতীয় সংস্কৃতি পূর্ব ইরানের মালভূমিতে, সিরিন্ডিয়ার মরুদ্যানগুলিতে, তিব্বতের এবং মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুলিয়ার শুষ্ক অনুর্বর অংশে, প্রাচীন ও সভ্য চীন ও জাপানে, চীন-ভারতের মন্‌-খামের প্রভৃতি আদিবাসীদের জনপদে, মালয়-পলিনেসিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায় এই সকল স্থানে ভারতবর্ষ এমন ছাপ রেখেছিল যা কোনদিন মুছে ফেলা যাবে না। এ ছাপ কেবল ধর্মের ওপর নয় শিল্প ও সাহিত্যের উপরেও ; এক কথায় যা কিছু অন্তরের উন্নততর অবস্থা জ্ঞাপন করে সমস্তের ওপর এই প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।" বর্তমানে এই সমস্ত তথ্যগুলি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক মতভেদ রয়েছে। তবে তথ্যগুলি বাতিল হয়ে যায়নি কতকগুলি কারণে। প্রথমতঃ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জন মার্শাল এবং গর্ডন চাইল্ডের উক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে ভারতবর্ষই ছিল পূর্ব এবং পশ্চিমের বাণিজ্যিক মধ্যভূমি চীন, মালদ্বীপ, জাভা প্রভৃতির সাথে মিশর, মেসোপটেমিয়া, ইরান, গ্রীস, রোম, এই সমস্ত অঞ্চলের বাণিজ্য হত ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে। উত্তরে সিল্করোড, দক্ষিণের সমুদ্রবন্দরগুলি তার প্রমাণ দেয়। উন্নত মানের সুতি বস্ত্র, তামা, লোহার সামগ্রী, মসলা, মৎস্য, অলঙ্কার সামগ্রী, রত্ন প্রভৃতির রপ্তানি হত; অন্যদিকে সিল্ক, সুরা, অস্ত্রসামগ্রী এবং আরও অনেক কিছু আমদানী করা হত।

বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে ঐ সমস্ত দেশগুলির বন্ধুত্ব এবং জ্ঞান আদানপ্রদান শুরু হয়। ভারতীয় দর্শনএর প্রতি পশ্চিম এবং পূর্ব উভয় দিকের আগ্রহ ছিল। এছাড়াও গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র তক্ষশীলা এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে পশ্চিম এবং পূর্বে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছে।(12)

ডক্টর পি.সি. বাগচির গ্রন্থে উল্লেখিত হিউয়েন সাঙ এর একটি চিঠি এখানে উল্লেখ করলে বোঝা যাবে ভারতীয় শাস্ত্রের কদর কতখানি। তিনি বলেছেন "অল্প কিছুদিন আগে

ভারত থেকে প্রত্যাগত একজন রাজদূতের কাছ হতে শুনেছি মহা অধ্যাপক শীলভদ্র আর ইহ জগতে নেই। এই সংবাদে আমার শোকের অবধি নেই...যে সকল সূত্র এবং শাস্ত্র আমি সঙ্গে এনেছিলাম তার মধ্যে যোগাচার্য, ভূমিশাস্ত্র এবং অন্যান্য গ্রন্থ মোট ৩০ খানি পুস্তক অনুবাদ করেছি। বিনয়ের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে সিন্ধুনদ পার হবার সময় শাস্ত্র গ্রন্থের একটি মোট হারিয়েছে, যা গেছে তার তালিকা এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি যদি সুযোগ মেলে শাস্ত্রগুলি পাঠাবার জন্য অনুরোধ করি।" এই পত্রটি উনি লিখেছিলেন প্রজ্ঞা দেব নামক একজন পন্ডিতকে।

কনফুসিয়াস ও লাওসের দর্শনে বিশ্বাসী সুসভ্য এবং উন্নত সংস্কৃতির ধারক চীন বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞানের প্রতি সর্বদা আকৃষ্ট হত। ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ধর্ম এবং শাস্ত্রগুলি প্রকৃতই বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান যা তাদের উন্নত সভ্যতাকে আরও বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিল।

কাস্যপ, মাতঙ্গ, বুদ্ধভদ্র, জিনভদ্র, কুমারজীব, পরমার্থ, জিনগুপ্ত, বোধিধর্ম এই সমস্ত ভারতীয় পন্ডিতদের চীন ভ্রমণের বিবরণী প্রমাণ দেয় চীন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি কতটা আকৃষ্ট হত অন্য দিকে হিউয়েন সাঙ, ফা হিয়েন এবং অন্যান্য ভারত ভ্রমণার্থী চৈনিক পর্যটকের বিবরণীও এর সাক্ষ্য রাখে।(13)

ভাষাগত দিকে ডক্টর দীনেশ সরকার বলেন ব্রাহ্মী ভাষা বহিঃভারতের (আধুনিক) তিব্বত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, যবদ্বীপ, কাম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের বর্ণমালারও জননী।(14)

ডক্টর আর. সি. মজুমদার বলেন "অতীতের সকল ভারতীয় উপনিবেশকিদের সামরিক প্রচেষ্টার আলোচনা বিশেষভাবে মূল্যবান কারণ এ প্রসঙ্গে ভারতীয় চরিত্র ও প্রতিভার এমন সকল দিকে আলোকপাত করে যেগুলি এখনও পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি। তবে তাদের উপনিবেশগুলিতে তারা যে উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সেকথা আরও মূল্যবান; এই সভ্যতা সহস্রাধিক বছর ধরে বলবৎ ছিল। গত পঁচিশ বছরে সুবিস্তৃত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, এই অঞ্চলকে কখনও কখনও বিশাল ভারত বা বৃহত্তর ভারত আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে পন্ডিতদের মধ্যে মতের বিরোধ আছে। ভারতের অনেক পুস্তক, আরবদেশীয় ভ্রমণকারীদের পুস্তক, চীনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণী, পুরাতন খোদিত লিপি ও অনুশাসন, গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য এবং প্রাচীন স্মৃতিসৌধগুলির ধ্বংসাবশেষ এই ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের পক্ষে খনি স্বরূপ। বিশেষভাবে আংকোর ও বোরোবুদুরে পাওয়া তথ্য।"

প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক বৎসর ধরে ভারত ও তার পূর্ব-পশ্চিমের দেশগুলির মধ্যে যে আদান প্রদান চলেছিল তাতে প্রত্যেক দেশটি অপরটির কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখে নিয়েছিল। তা যে কেবল চিন্তা ও দর্শন বিষয়েই ঘটেছিল তা নয়, সুকৌশলে জীবন পরিচালনা ও তার বিজ্ঞানসম্মত রীতি সম্বন্ধেও আদান প্রদান হয়েছিল। সম্ভবত ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের মধ্যে পরস্পরের ওপর পরস্পরের প্রভাব অন্যান্য দেশেই অধিকতর ভাবে পড়েছিল। আমাদের দেশ (ভারতবর্ষ) যে বেশী কিছু

নিতে পারেনি তা আমাদের পক্ষে পরিতাপের বিষয়। পূর্ব পশ্চিমের মধ্য ভূমি হিসাবে অন্যান্য দেশের জ্ঞান বেশী করে গ্রহণ করলে এদেশের উপকার হত। তর সাহায্যে অতিরিক্ত কল্পনা প্রবণতাকে দমন করা যেত। হীন আত্মগর্বে সকলকে বাইরে ঠেকিয়ে রেখেছিল। ফলে এখন সে এক ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সবশেষে একথা স্বীকার করতে হবে "সবার উ'পরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"। মানবতাবাদই সভ্যতার প্রকৃত মাপকাঠি যার প্রথম জন্ম জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ প্রাচীন বৃহত্তর ভারতবর্ষে।

সূত্রনির্দেশ

(1) পন্ডিত জহরলাল নেহেরু, ভারত সন্ধানে।

(2) অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গ্রীক পুরা কাহিনী—

(3) F.P. Krovkin, "History of the Ancient World"-Progress Publishers, Mos cow.

(4) + (5) কলিকাতা জাতীয় সংগ্রহ শালা।

(6) রেনি গ্রুসেই, সিভিলাইজেশন অফ দ্য ইষ্ট (২য় খন্ড) ঃ

(7) ডাঃ দীনেশ সরকার, অশোকের বাণী ঃ

(8) পন্ডিত নেহেরু, ভারত সন্ধানে ঃ

(9) ঐ

(10) গর্ডন চাইল্ড, হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন হিস্ট্রি ঃ

(11) রেনি গ্রুসেই, সিভিলাইজেশন অব দ্য ইষ্ট ঃ

(12) পি. সি. বাগচি, ইন্ডিয়া এন্ড চায়না ঃ

(13) ডঃ দীনেশ সরকার, অশোকের বাণী ঃ

(14) ডাঃ আর. সি. মজুমদার, এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান কলনিস অন দ্য ফার ইষ্ট ঃ

'মৃচ্ছক টিক'-এর আলোকে ব্রাহ্মণদের সামাজিক অবস্থান

দূর্বা আইন

বহু শতাব্দীর ব্যবধানে ও শুদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিকম্' একটি বহুল পরিচিত গ্রন্থ। পন্ডিতদের মতানুসারে এই নাটকটির রচনাকাল খ্রীষ্ট্রীয় চতুর্থ শতাব্দী।[১] নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নায়ক চারু দত্ত ও নায়িকা বসন্তসেনার মিলন নাটকটির কেন্দ্রীয় ঘটনা। এরই সঙ্গে পরিপার্শ্বিক হিসাবে তৎকালীন সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রাহ্মণ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়-চারু দত্ত, মৈত্রেয়, বিট (দু'জন) শর্বিলক।

নাটকটির নায়ক চারু দত্ত। তিনি জাতি বা বর্ণের দিক থেকে ব্রাহ্মণ, কিন্তু বৃত্তিতে বণিক। এখানে তাঁকে সেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে দেখা যায় একসময় তিনি অত্যন্ত ধনশালী হলেও বর্তমানে তিনি নিঃস্ব, রিক্ত। তাঁর কিছু কথা থেকেই বোঝা যায় দারিদ্র্যের কুফল সম্বন্ধে তিনি কতখানি চিন্তিত- 'দারিদ্র্য থেকে লজ্জা আসে, লজ্জাগ্রস্ত লোক তেজ থেকে ভ্রষ্ট হয়। নিস্তেজ মানুষ পরাজিত হয় । পরাভব থেকে নির্বেদ আসে নির্বেদযুক্ত মানুষ হয় শোকাহত-কে বুদ্ধি পরিত্যাগ করে, আর নির্বুদ্ধি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অহো, নির্ধনতাই সমস্ত বিপদের কারণ।[২] আবার কখনও বলেছেন সুখের পর যে মানুষ দারিদ্র্য ভোগ করে, সে শরীর ধারণ করলেও মরেই যেন বেঁচে থাকে[৩] বা দারিদ্র্য হল পুরুষের চিন্তার আধার আর শত্রুর কাছে পরাভব, যার চেয়ে বড় শত্রুতা আর নেই।[৪] এই ধরনের কথা তিনি একাধিকবার উচ্চারণ করেছেন[৫]। এ থেকে বোঝা যায় অর্থের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি কতখানি সচেতন। তিনি একস্থানে মরণকেও দারিদ্র্য অপেক্ষা শ্রেয়তর বলেছেন।[৬]

বসন্তসেনার সঙ্গে কথোপকথনের সময় তাঁর স্বাভাবিক মানবিক আশা-আকাঙক্ষারই প্রকাশ ঘটেছে। অবশ্য বসন্তসেনার প্রতি তাঁর অনুরাগও অনেকক্ষেত্রেই অর্থ চিন্তার দ্বারা ব্যাহত হয়েছে। বসন্তসেনার গচ্ছিত রাখা অলংকারগুলি চুরি যাওয়ায় পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে ওঠে। তবে বসন্তসেনার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও অন্ততঃ একবারের জন্য হলেও গণিকা বসন্তসেনার' প্রতি তাঁব কিছুটা অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। একস্থানে তাঁকে বলতে শুনি-এ গহনা গণিকা পরেছিল। এটাকে অন্দব মহলে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই।[৭]

চারু দত্ত নিজে ব্রাহ্মণ হয়ে বণিক বৃত্তি নিলেও ব্রাহ্মণদের বিশেষ সম্মান সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন একথা বলা যেতে পারে। কারণ তিনি একবার বলেছেন বামুণকে পা ধোবার জল দাও (বর্ধমানককে বলেন মৈত্রেয়-র পা ধুইয়ে দিতে)[৮]

শেষ দৃশ্যে দেখা যায় ছেলেকে তিনি মৃত্যুর আগে তাঁর উপবীত দান করে যাচ্ছেন এবং তিনি উপবীতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন সুন্দরভাবে-''ব্রাহ্মণের অলংকার সোনার নয়। মুক্তোর নয় তবু এতে দেবতাদের আর পূর্বপুরুষের ভাগটা দেওয়া চলে'।[৯] তবে তা সত্ত্বেও চন্ডালদের প্রতি ব্যবহারে তাঁর কোন অবজ্ঞা প্রকাশ পায় নি। অপরপক্ষে চন্ডালদের আচরণেও তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেয়েছে-তবে সেটা ব্রাহ্মণ বলে ততটা নয় যতটা চারু দত্তের মহানুভবতার জন্য।

অপর একটি ব্রাহ্মণ চরিত্র মৈত্রেয়। তিনি চারু দত্তের অকৃত্রিম বন্ধু।[১০] এমনকি তিনি নিজের প্রাণের বিনিময়ে চারু দত্তের জীবন রক্ষা করতে চেয়েছেন।[১১] বন্ধুর বিপদের জন্য তিনি ঈশ্বরকে দায়ী করেন এবং পূজা দিতেও অস্বীকার করেন। ব্রাহ্মণ হয়েও পূজা দিতে অস্বীকার করার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে পাঠকমনে কৌতূহল জাগায়। চতুর্থ অংকে তিনি যখন বসন্তসেনার গৃহে যান সেখানে তাঁর ব্রাহ্মণ সংক্রান্ত কিছু তুলনা ও আগ্রহ সৃষ্টি করে।[১২] একজন ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি বলেছেন দারোয়ানটা ঘুমোচ্ছে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মতো। একটা মোষ ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে যেন অপমানিত কুলীন ব্রাহ্মণ। গণিকাদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে কখনো কখনো।[১৩] তবে তার জন্য উভয়ের সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের থেকেও বসন্তসেনার ব্যবহার বেশী দায়ী কারণ মৈত্রেয় বসন্তসেনার গৃহে গেলে বসন্তসেনা তাঁকে খাদ্য পানীয় দিয়ে আপ্যায়িত করেন নি।

'মৃচ্ছকটিকম্'-এর অপর এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র শর্বিলক। তিনি নিজেই বলেছেন তিনি চতুর্বেদবিৎ ব্রাহ্মণের পুত্র এবং নিজেও শিক্ষিত কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ। পেশাগত দিক থেকে তিনি চৌর্যেরত। চৌর্য ও শিক্ষা করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। পরম্পরাগত গুরুর কাছে। বসন্তসেনার সহচরী মদনিকার প্রেমে নিরুপায় হয়ে তিনি চুরিতে প্রবৃত্ত হন যাতে তিনি মদনিকার নিস্ক্রয়ের অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। তবে তাঁর মন থেকে আদর্শবোধ কখনও হারিয়ে যায় নি। তিনি একাধিকবার বলেছেন যে চুরির সময় ন্যায়-অন্যায়বোধ তিনি কখনও হারিয়ে ফেলেন নি।[১৪] তাঁর মধ্যে আবেগপ্রবণতার প্রাধান্য দেখা যায়। তিনি গণিকা মদনিকার প্রেমে অনুরক্ত, আবার কখনও চারু দত্তের প্রসঙ্গে মদনিকার মন্তব্যে ঈর্ষাকাতর হয়ে গণিকাদের প্রতি অসম্মাজনক উক্তি করেন।[১৫]

ব্রাহ্মণ হিসাবে তাঁর চৌযবৃত্তির প্রশংসা ও উপবীত সম্বন্ধে উক্তি পাঠকের মনে আগ্রহ সঞ্চার করে। তিনি চৌর্যকে একটি স্বাধীন বৃত্তি বলেছেন এবং মহাভারত থেকে এর সমর্থন খুঁজেছেন। উপবীতের যে ব্যবহার তিনি বর্ণনা করেছেন তা এককথায় অনবদ্য। তাঁর মতে পৈতে দিয়ে সিদ কাটার জন্য দেওয়ালে কাজের রাস্তা মাপা যায়। কব্জাওয়ালা গয়নার খিল খোলা যায়। যন্ত্র দিয়ে বন্ধ করা কপাট খোলা যায়, আবার সাপে বা কোন পোকায় কামড়ালে তা দিয়েই কষে বাঁধা যায়।[১৬] একজন ব্রাহ্মণের মুখে পৈতের এই ব্যবহার বর্ণনা সত্যিই অদ্ভুত।

আগেই বলা হয়েছে এই নাটকে দু'জন বিটের সন্ধান পাওয়া যায়-সংস্থানকের ও অপরজন বসন্তসেনার। বিট উপনায়ক, নায়িকা বা প্রতিনায়কদের সহচর।[১১] সংস্থানকের বিট তার সহচর হওয়ায় তার সকল কাজের সহকারী। তবে নাটকের শেষের দিকে (অষ্টম অংক) দেখা যায় তার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। বিট বসন্তসেনাকে হত্যা করতে অস্বীকার করে। বিট নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও বংশ অপেক্ষা স্বভাবের ওপরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

উপরে বর্ণিত ব্রাহ্মণ চরিত্রগুলি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বকীয়। ব্রাহ্মণ হিসাবে সকলেই সে এক বর্ণ বা শ্রেণীভুক্ত, তা কিন্তু নয়। আর্থ-সামাজিক-পটভূমিতে প্রত্যেকের স্থান ভিন্ন। চারু দত্ত ছিলেন একসময় ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তি। কিছুদিন তিনি অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে কাটান। পরে আবার তাঁর ভাগ্য পরিবর্তন হয়। তাঁর মধ্যে ভাগ্য বিশ্বাসী মনোভাবও দেখা যায়। কখনও তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণদের বিশেষ সম্মানের মনোভাবের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। আবার কখনও দেখা যায় তিনি মনুষ্যত্বকেই মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বৃত্তিতে বণিক যেটা ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন অনুযায়ী বৈশ্যদের বৃত্তি বলে স্বীকৃত। তাঁর মধ্যে অর্থের গুরুত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতনতার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারেও ব্রাহ্মণদের উন্নাসিকতা কখনই প্রকাশিত হয়নি। শর্বিলক ব্রাহ্মণ হয়েও চৌর্যকার্যে নিযুক্ত। ব্রাহ্মণের উপবীত তাঁর কাছে চৌর্যকার্যে সহায়ক অস্ত্রস্বরূপ। তিনি গণিকার সহচরীর প্রেমে অনুরক্ত এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকেই বিয়ে করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সনাতন রীতি অনুযায়ী স্বীকৃত ব্রাহ্মণ্য আদর্শ এখানে প্রাধান্য পায়নি। প্রতিটি ব্রাহ্মণ চরিত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতাও আছে। চারু দত্ত সেখানে উপবীত যথেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন, শর্বিলক সেই উপবীতকেই ব্যাখ্যা করেছেন একেবারে অন্যভাবে। সংস্থানকের বিট ব্রাহ্মণ হয়েও অব্রাহ্মণ সংস্থানকের কর্মচারী। বসন্তসেনার বিট ও ব্রাহ্মণ হয়ে গণিকালয়ে কর্মে নিযুক্ত। সুতরাং বলা যায় 'মৃচ্ছক টিক্'-এ বর্ণিত সমাজে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথার প্রভাব ছিল অল্প। এ প্রসঙ্গে এই নাটকে বর্ণিত নাগরিক পটভূমিকার কথা বলা যায় কারণ নগরে সাধারণভাবেই বর্ণভেদ প্রথার প্রভাব কম থাকে।

তবে এখানে চারটি বর্ণের পারস্পরিক অবস্থানের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ব্রাহ্মণ বর্ণভুক্ত বিভিন্ন চরিত্রের এক-এক ধরনের আর্থ-সামাজিক অবস্থান। বর্ণের দিক থেকে সকলে ব্রাহ্মণ হলেও মানসিকতা, জীবনযাপনের রীতি-নীতি. জীবিকা, আদর্শবোধ সমস্ত দিক দিয়ে চরিত্রগুলি পৃথক। একথাও সুনিশ্চিত যে ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের একমাত্র স্বীকৃত কর্তব্য-যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহণ-এগুলি ব্রাহ্মণদের কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়নি। চারু দত্তের দান-ধ্যান ছিল একান্তভাবেই ব্যক্তিগত মানসিকতা প্রসূত। আর একটি ক্ষেত্রেও অনুশাসন থেকে বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ্য অবধ্য বলে স্বীকৃতি পেলেও এখানে আমরা দেখি চারু দত্তকে বধ্যভূমিতে আনা হয় মৃত্যুদন্ড দেবার জন্য এবং কজিটি করার দায়িত্ব ছিল চন্ডালদের। এইভাবে মৃচ্ছকটিকে

বর্ণিত ব্রাহ্মণ চরিত্রগুলি তৎকালীন সমাজের পরিবর্তিত আদর্শের কথা সূচিত করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধর্মশাস্ত্রগুলিতে প্রাপ্ত সামাজিক বিধি-নিষেধের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটত। মৃচ্ছকটিক থেকে যে সামাজিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে তার প্রতিফলন ধর্মশাস্ত্রগুলিতে পাওয়া সম্ভব নয়। ধর্মশাস্ত্রগুলি অনুশাসনমূলক অর্থাৎ কি করা উচিত, সেই জাতীয়। কিন্তু সাহিত্য প্রচলিত সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। সুতরাং বলা যায় তা আরও 'মাটির কাছাকাছি'। অর্থাৎ কল্পনা মিশ্রিত হলেও তার মূল থাকে মাটিতে, ফলে বাস্তবের পরিচয় সহজে পাওয়া সাহিত্যে। সেই কারণে সমাজ-জীবনের ইতিহাস পুনর্গঠনকালে ধর্মশাস্ত্রগুলির পাশাপাশি সৃষ্টিমূলক সাহিত্যগুলিকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। উভয়ের মিলিত সাক্ষ্যপ্রমাণেই হয়ত সঠিক অবস্থার কথা জানা যাবে।

সূত্রনির্দেশ

১। 'মৃচ্ছক টিক'-এর রচনাকাল নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। তবে সাধারণভাবে মনে করা হয় এটি চতুর্থ শতাব্দীর রচনা (রাধাগোবিন্দ বসাক, ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টারলী, ১৯২৯)।

২। সুকুমারী ভট্টাচার্য, শূদ্রক বিরচিত মৃচ্ছকটিক্, সাহিত্য অকাদেমী, নিউদিল্লী, প্রথম প্রঃ ১৯৮০, ১৯৯০, ১।১৪ (এরপর থেকে শুধুমাত্র 'মৃচ্ছকটিক' বলে উল্লিখিত হবে)।

৩। 'মৃচ্ছকটিক', ১। ১০,

৪। তদেব, ১ । ১৫,

৫। তদেব, ১। ৩৬, ৩৭

৬। তদেব, ১। ১১

৭। তদেব, ৮। ৩,

৮। তদেব, ৩। ৮

৯। তদেব, ১০। ১৮,

১০। তদেব. ১। ৯

১১। তদেব, ১০। ২৪

১২। তদেব, ৪। ২৮

১৩। তদেব, ৫। ৪

১৪। তদেব, ৪। ৬, ৪। ৯

১৫। তদেব, ৪। ১৭,

১৬। তদেব, ৩। ১৭

১৭। তদেব, পৃঃ ২১।

বৈধব্যে আহার্য রীতি

শর্মিষ্ঠা আঢ্য

প্রাচীন ভারতে বিধবাগণ এক অক্রিয় এবং অনুগত জীবন যাপন করতেন। প্রবল প্রতিকূল অবস্থাতেও তাদের না ছিল কোন প্রতিবাদের ভাষা, না ছিল প্রতিবাদের কোন স্পৃহা। নারী জীবনের স্বাভাবিক কোমলতা এবং নম্রতা ছাড়াও, তাদের এই অন্তর্মুখী জীবন-যাত্রা কৌতুহলদ্দীপক। প্রশ্ন জাগে, বিধবাদের এই অবনত জীবনের পিছনে কোন গূঢ় কারণ ছিল কি না। অথবা তাদের খাদ্যাভ্যাস কোন প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে কি না।

বিধবাগণের উপর খাদ্যের প্রভাব সঠিক ভাবে নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন তাদের সমগ্র নারী জীবনের খাদ্যাভ্যাসের বিস্তারিত বিশ্লেষণ। কারণ, সব নারী বিধবা নয়, কিন্তু সব বিধবাই নারী।

প্রাচীন যুগে কন্যা সন্তান আকাঙ্খিত ছিল না। পুত্র সন্তানই ছিল অধিক কাম্য এবং অধিকতর সমাদৃত। বিভিন্ন কারণে পুষ্টিকর খাদ্যের অধিকাংশই নির্ধারিত থাকত পুত্রের জন্য। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কন্যার খাদ্যের পৌষ্টিকতা তুলনামূলকভাবে কম হত।[১] এই প্রবণতা আজও চলছে। য়ুনিসেফের (NICEF)[২] সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা যায়, অধিকাংশ মা, বাল্যকাল হতেই অপুষ্টির শিকার। ভারতের ৮০ শতাংশ মা রক্তাল্পতায় ভোগে এবং অপুষ্ট মা জন্ম দেয় অপুষ্ট সন্তান। অতি সম্প্রতি ৬ঃ মেহেরবান সিং অনুরূপ মন্তব্য করে বলেছেন—"প্রতি তৃতীয় ভূমিষ্ঠ শিশু অপুষ্ট, কারণ জন্মদাত্রীও অপুষ্ট"। তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন "শিশুকাল থেকেই কন্যা-সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং তাদের যৌবন, গর্ভাবস্থা, স্তন্যদানের সময়ও যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।"[৩] স্বভাবতঃই এই সব মন্তব্যের উদ্দেশ্য চক্রাকারে আবর্তিত নারী জীবনের প্রতিটি স্তরে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জন্মলাভের পর প্রথম চার মাস মস্তিষ্কের কোষবৃদ্ধি খুব দ্রুতগতিতে হতে থাকে এবং মস্তিষ্কের বিকাশ ও বৃদ্ধির এটিই শ্রেষ্ঠ সময়।[৪] কিন্তু অপুষ্টিজনিত কারণে মস্তিষ্কের শ্রীবৃদ্ধি সঠিকভাবে হতে পারে না, ফলে মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও এই সময় শিশুর প্রধান খাদ্য মাতৃ-দুগ্ধ, কিন্তু পূর্বেই দেখা গেছে যে মাতা স্বয়ং দুর্বল এবং অপুষ্ট।

বালিকা অবস্থায় যাবতীয় সুখাদ্যে অধিকার থেকে সে বঞ্চিত—সবই বরাদ্য ভ্রাতা বা

অন্যান্য পুরুষদের জন্য। তা ছাড়া এই সময় থেকেই শুরু হয়ে যেত বিভিন্ন ব্রত পালন, উপবাস, ইত্যাদি।

বিবাহিত জীবনেও নারীর খাদ্য-ব্যবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল না। পরিবারের সকলের আহার সমাপ্ত হলে তবেই বধূর আহার করা সমীচীন মনে করা হত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[৫] ও খাদীর গৃহ্যসূত্রে[৬] দেখা যায় যে স্বামীর আহার সমাপ্ত হবার পর ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করত বধূ। বার মাসে তের পার্বণ, আনুষঙ্গিক ব্রত, পূজা, উপবাস, কৃচ্ছ্রসাধন, এ সব তো ছিল বধূর নিত্যকর্ম। বৃহস্পতি বলেছেন, ধর্ম পালন, কৃচ্ছ্র সাধন, উপবাস ইত্যাদি নারীর স্বর্গের পথ প্রশস্ত করে।[৭] বাৎসায়ন কামসূত্রে উল্লেখ করেছেন যে স্বামী অনুমতি না দিলেও স্ত্রীর উচিত উপবাস করা।[৮] ব্যাস সংহিতায় বলা হয়েছে ঋতুমতী নারী শুধুমাত্র রাত্রে ভাত সিদ্ধ খাবে।[৯] সুতরাং দেখা যায়, যে কোন অজুহাতে নারী কৃচ্ছ্র সাধন এবং উপবাস করতে বাধ্য থাকত। এই কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রভাব নারীর পুষ্টির ওপর পড়া খুবই স্বাভাবিক।

এই পর্যন্ত নারীর খাদ্য-প্রক্রিয়ার যে চিত্র পাওয়া গেল, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, জন্মাবধি সে অপুষ্টির শিকার। পিত্রালয় এবং শ্বশুরালয়, সর্বত্রই ধর্ম এবং সমাজ-বিধির কল্যাণে নারী পরিমাণগত এবং গুণগত যথেষ্ট খাদ্য হতে বঞ্চিত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে নারী ক্ষুৎপীড়িত মনে না হলেও, অথবা আপাতঃদৃষ্টিতে প্রতীয়মান না হলেও, আভ্যন্তরীণ (মস্তিষ্ক) কোন গোলযোগ ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

বৈধব্য নারী জীবনের করুণতম অধ্যায়। এই সময় আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছুর সাথে তার খাদ্য-ব্যবস্থাও চরম বিপর্যয়গ্রস্থ হয়ে পড়ে। স্বল্পাহার অথবা দিনান্তে একাহার তার সম্বল। উপরন্তু সেই খাদ্যও প্রধান উপকরণ বর্জিত। উপবাসের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

বৌধায়ন[১০], বশিষ্ঠ[১১] ইত্যাদি ধর্ম-সূত্রে বিধবাদের কঠোর খাদ্য-বিধির নির্দেশ আছে। মধু, মাংস, সুরা, লবণ, তীব্র গন্ধ-যুক্ত মসলা, ইত্যাদি ছিল বর্জনীয় দ্রব্য। মনুর উপদেশ—"স্বেচ্ছায় পুষ্প, ফল-মূল ইত্যাদি ভক্ষণ করে তাদের কৃশ হওয়া উচিত।"[১২] মনুর টীকাকার কুল্লুক বলেছেন, মাছ, মাংস, মধু, ইত্যাদি খাওয়া উচিত নয়। অপর এক টীকাকার রাঘব, বিধবাদের তাম্বুল গ্রহণও নিষিদ্ধ করেছেন। মহাভারতেও উপদেশ দেওয়া হয়েছে, ফল-মূলই বিধবাদের খাদ্য হওয়া উচিত।[১৩]

সঙ্গম যুগেও বিধবাগণের খাদ্য-বিধির নির্দেশ পাওয়া যায়। পেরুণকোপেন্ডুর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে জানা যায় যে বিধবাগণ ভেলাই-পাতা সিদ্ধ এবং সিদ্ধ ভাত খাবে।[১৪] সঙ্গম-সূত্র উল্লেখ করে এ. এন শাস্ত্রী বলেছেন-বিধবাগণ ঘৃত বর্জন করে এক মুষ্টি পান্তা ভাত খাবে। তেঁতুল জলে পাতা সিদ্ধ করে তিল পত্রের চাটনি খেতেও বলা হয়েছে।[১৫] প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ অনুসারে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী কচ্ছ্রসাধন করবে এবং মৎস্য, মাংস ইত্যাদি উত্তেজক খাদ্য বর্জন করবে।[১৬]

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে দেখা গেল, প্রাচীন ভারতে বিধবাদের প্রধান খাদ্য ছিল ফল-মূল এবং ভাত। এগুলি সবই শর্করাজাত। আমিষ জাতীয় বস্তু একেবারেই নিষিদ্ধ এবং পদ্ম-পুরাণ মতে আমিষ-ভোজী বিধবা নরকগামী হবে।[১৭] দুর্ভাগ্যের বিষয়, মাছ-

মাংসর পরিবর্তে সমশ্রেণীভুক্ত বিকল্প কোন প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য গ্রহণের কোন নির্দেশ বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। মশলা-বর্জিত খাদ্য অবশ্যই ছিল স্বাদ-গন্ধহীন এবং বিভিন্ন প্রকার উপাদেয় খাদ্য অথবা খাদ্যে বৈচিত্র্যের, অর্থাৎ চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়র কোন প্রশ্নই ছিল না।

বর্তমান কালে বিভিন্ন বিজ্ঞানী অত্যাধুনিক গবেষণার সাহায্যে দেহ-মনের উপর খাদ্যের প্রভাব বিশ্লেষণ করে বিস্ময়কর তথ্যসমূহ সংগ্রহ করেছেন। প্রধান তথ্যগুলি নিম্নরূপ—

(১) খাদ্য-বস্তু যদি বিভিন্ন প্রকারের এবং বিভিন্ন স্বাদ-গন্ধযুক্ত হয়, তবে মানুষ এবং পশু উভয়ের ভোজনেব পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(২) ক্ষুধা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কিন্তু আহারে রুচি এক শিক্ষিত প্রক্রিয়া। খাদ্যের ঘনত্ব, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, পরিবেশ, ইত্যাদির পূর্ব অভিজ্ঞতা রুচির উপর প্রভাব বিস্তার করে।[১৯] সুতরাং খাদ্য-সংক্রান্ত অনুভূতি মানসিক অবস্থার প্রতিও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

(৩) স্নায়বিক দৌবর্ল্য, অস্বস্তি, অবসাদ, বিভ্রান্তি নিজের প্রতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি অনীহা ইত্যাদি, অপুষ্টির নিদর্শন।[২০]

(৪) খাদ্যের বিভিন্ন পদ এবং বৈচিত্র অথবা সেগুলির অভাব, খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের অন্যতম কৌশল।

(৫) মস্তিষ্ক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন শর্করা (গ্লুকোজ)। কিন্তু শুধুমাত্র শর্করাপ্রধান খাদ্য (যেগুলি বিধবাগণের আহার্য ছিল) শর্করাবিহীন খাদ্যে ন্যায়ই সমান ক্ষতিকর।[২১]

(৬) স্বাস্থ্য, দৈহিক শক্তি এবং মানসিক শক্তি, পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। একটির অভাব ঘটলে অপরগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২২] বলা বাহুল্য, এগুলি সবই নির্ভর করে যথানুপাত পুষ্টিকর খাদ্যের উপর।

(৭) স্বল্পাহার, অথবা স্বল্প পুষ্টিকর আহার ক্রমাগত বহুদিন যাবৎ গ্রহণ করলে তা অধিকতর ক্ষতির কারণ হয়।[২৩]

(৮) পুষ্টিকর খাদ্যে পরিমাণ শারীরবৃত্তির উপর নির্ভরশীল।

(৯) প্রজনশীল প্রাপ্তবয়স্ক নারীর অধিক পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। কোন কোন সমাজে, বিশেষতঃ যেখানে পুরুষদের প্রাধান্য, গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদায়ী মায়েদের ক্ষেত্রে এর বিষম প্রভাব দেখা য়ায়।[২৪]

(১০) অপুষ্টিকর এবং প্রোটিন বর্জিত খাদ্য, বিচার-শক্তি এবং বোধ শক্তির ক্ষতিসাধন করে।[২৫]

(১১) স্বল্পাহার এবং মেধা সংক্রান্ত এক গবেষণা করা হয়। ৩০ জন স্বাস্থ্যবান এবং স্বাভাবিক প্রকৃতির স্বেচ্ছাসেবী ৬ মাস যাবৎ অর্ধোপবাস থাকার পর, দেখা গেছে যে তাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটেছে, স্নায়বিক পীড়া এবং মনোবিকারগ্রস্ত হয়েছে।[২৬]

(১২) খাদ্য মানবিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ন্ত্রিত খাদ্যপ্রণালী মানসিক চাপ সৃষ্টি

করে এবং অনুভূতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ বা স্বাভাবিক প্রয়োজনবোধ বিপর্যস্ত হয়। ব্যক্তিগণ অবসাদগ্রস্ত অথবা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে।

(১৩) অভুক্ত ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধি হ্রাস পায়, মনঃসংযোগ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং চিন্তা ধারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২৭]

(১৪) অপুষ্টিকর খাদ্য স্নায়ুদৌবল্য সৃষ্টি করে।[২৮]

উপরোক্ত তথ্যগুলির প্রতিধ্বনি দেখা যায় বেকনের মন্তব্যে—"মস্তিষ্ক থাকে উদরের জিম্মায়। অপুষ্টিকর খাদ্য থেকে মুক্তি পেলে মানসিক অবসাদ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।[২৯] ফিউয়েরবাকের (Feuerboch) বাণীও অনুরূপ—"যেমন খাদ্য, তেমন মানুষ।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে. উৎস এবং তার ফলাফলের এক স্পষ্ট চিত্র দেখা যায়। অর্থাৎ, খাদ্য এবং তার ফলাফল বা প্রভাব বিচার করা যায়। একটি সহজ এবং সরল তথ্য প্রতিষ্ঠিত হল যে প্রাচীন ভারতে বিধবাগণ যে খাদ্য গ্রহণ করতেন, তা যথোপযুক্ত ছিল না এবং অস্বাভাবিক মানসিকতার কারণ হতে পারেত।

এই অবসরে একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য প্রকাশ করা যায়—উৎস, অর্থাৎ খাদ্য-বিধি প্রাচীন কালের, কিন্তু ফলাফল জানা গেছে সম্প্রতি। বাস্তবে, খাদ্য এবং তার ফলাফল বা প্রভাব, আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল, যেগুলি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা জানা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের কোন উপকরণ প্রাচীন যুগে ছিল না। এর অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, খাদ্যের কোন প্রভাব প্রাচীন যুগে ছিল না।

প্রাচীন যুগে বৈজ্ঞানিক উপচার বা উপকরণ অবশ্যই ছিল না। কিন্তু বৈদিক এবং উত্তর-বৈদিক যুগের কিছু বিশেষ শ্রেণীর মানুষের গভীর এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তা শক্তি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সেই যুগের অধিকাংশ নীতি এবং নির্দেশ রচিত হয়েছিল অভিনিবিষ্ট পর্যবেক্ষণ-শক্তির মাধ্যমে। তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলেন খাদ্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মানসিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব এবং এইভাবে সহজেই মানুষকে অবদমিত রাখা যেতে পারে।

বিধবাগণ শৈশবকাল থেকেই যথানুপাত পুষ্টিকর খাদ্য হতে বঞ্চিত। বাল্যজীবনও তথৈবচ। পৌনঃপুনিক মাতৃত্ব, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান এবং উপবাস, তাদের অপুষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছে। অবশেষে বৈধব্যে তাদের খাদ্য-ব্যবস্থা বিপর্যয়ের চরমে পৌঁছেছে। গুণগত অথবা পরিমাণগত নিরীক্ষায় বিধবাদের খাদ্যবস্তু ছিল নিম্নতম।

এর সামগ্রিক প্রভাব পড়েছিল তাদের মনের উপর। যদিও বা ধরে নেওয়া যায় যে বৈধব্যের পূর্বে তাঁরা উন্নত মানের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতেন, তবু পূর্বোক্ত তথ্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে শুধু বৈধব্য জীবনের খাদ্যই মানসিক বৈলক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট।

পর্যাপ্ত এবং যথানুপাত খাদ্যের প্রভাব পড়েছিল বিধবাদের মনের উপর। তারা হয়ে পড়েছিল মূঢ়, মূক, ম্লান। প্রতিবাদ-ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। তাদের দুরবস্থা যে কতটা গভীর, সে বোধশক্তিও তাদের ছিল না। এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল তৎকালীন সমাজ। আপাতশান্ত, স্তব্ধ জীবনের গভীরে প্রবাহিত অশ্রুর লবণসিন্ধু বহির্জগতের অগোচরেই রয়ে গিয়েছিল।

সূত্রনির্দেশ

(১) (ক) The Relevance of Nourishment To The Reproductive Cycle of The Female In India, by Judit Katore Apte in "Being Female", Ed. Dara Raphael, p.43, Hague Paris, 1975.

(খ) The Girl Child in "Women And Society In Ancient India" by Sukumari Bhattacharji, p. 108-109, Calcutta, 1994.

(২) The Statesman, 17.12.97

(৩) The Statesman, 27.10.98 Dr. Meharban Singh was the former Professor and Head of the Department of Paediatrics and Neonatology, All India Institute by Medical Science, New Delhi.

(৪) Nutrition and Brain Development, by Myror Wirick in "Nutrition And Mental Function"", Ed. George Serban, p. 73, Ondon, 1973.

(৫) Aitareya Brahmera (Vi. 3.7.13), q. in Women and Society in Ancient India, by Sukumari Bhattacharji, p.7.

(৬) Khadira Grhyasutra (1.4.11), op.cit.Sukumari Bhattacharji, p.159

(৭) Brhaspati (xxiv. 10), the Minor Law Books, Sacred Books of the East (SBE), Vol : 33, Part I, Oxford, 1889.

(৮) Vatsyayara's Kamasutra (An Ancient Indian Classic) : The Hindu Art of love, by Acharya Vipin Chandra Bandhu, p.172, Delhi,1973.

(৯) Vyasa Sanhita (II. 38-40), Tr. by M.N. Dutt, Vol : I of The Dharmasastra or the Hindu Law Codes, Varanasi, (2nd ed), 1977

(১০) Baudhayana (II. 2.4.7), SBE, vol : 14, Tx. by G.Bihler, Oxford, 1882.

(১১) Vasistha (XVII.55), op.cit. Biihler,

(১২) Manu (V. 157), SBE, Vol : 25, Tr. by G. Bihler, Oxford, 1886. For the comments of Kulluka and Raghava, see Women in Manu and His Seven Commentators, by R.M.Das, p. 222, Varanasi, Avah, 1962.

(১৩) The Mahabharata (XVI. 8. 72) Critical Edition, B.O.R.I. Poona, 1975.

(১৪) Sangam Potty, by N.Subramaniam, p. 315, Madurai, 1980.

(১৫) Sangam Literature–Its Cults and Culture, by K.A.N. Sastri, p. 60, Madras, 1972.

(১৬) Prayaschitta Prakarana 69 of Bhatta Bhavadeva, ed. by Girish Ch. vidyaratna, Rajshahi.

(১৭) Padma Purana (796-82), Part II, Vol 40 of Ancient Indian Tradition And Mythology (AITM), ed. G.P. Bhatt, Delhi, 1989.

(১৮) Encyclopaedia of Human Behavior, Ed. by V.S. Ramachandran, vol : I, p. 194, California, 1994.

(১৯) Nutrition and Mental Health, by Abrahan Weinbag, in "Encyclopaedia of Mental Health", Ed. by alburt Deutsch, Vol : IV, p. 1354 ff, New York, 1963.

(২০) Ibid, p. 1354 ff.

(২১) Nutrition And Your Mind, by George Watson, p.2, 25-28, London, 1974.

(২২) op. cit. Abrahan Weinberg, p. 1354.

(২৩) Long, continued Marginal Protein Deficiency, by R.J.C. Stewart, in "Nutrition and Mental Functions", Ed. by George Serban, London, 1973.

(২৪) Ibid.

(২৫) Protein-Energy Malrutrition and Intellectual Abilities, by Jan Hoolweg, p. 98, Leiden, 1976.

(২৬) op. cit. George Watson, p. 15.

(২৭) The Biology of Human Starvation, by And Keys and Dthers, Vol : II, p. 859, Mirrcapolis, 1950.

(২৮) Ibid, vol : I, p. 687

(২৯) quoted in ibid, vol : II, p. 854.

মৌর্যযুগের কোষ্ঠাগার

সুদর্শনা চৌধুরী

খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ২৩০০ অব্দে হরপ্পা সভ্যতার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম নগর কেন্দ্রিক জীবনযাত্রার আবির্ভাব ঘটে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দ নাগাদ এটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর আমরা আবার নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা দেখতে পাই গাঙ্গেয় উপত্যকায় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ। এই একই সময় বিভিন্ন মহাজনপদের উদ্ভব ও উত্থান ঘটে। এরই মধ্যে মগধ অন্যান্য মহাজনপদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ক্রমশঃ অন্যান্য রাজ্যের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। এই সমস্ত নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার মূলে রয়েছে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদন, কারণ নগরবাসীর অধিকাংশই সরাসরিভাবে খাদ্যউৎপাদক ছিল না। সুতরাং তাদের ভরণপোষণের জন্য নগরের পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদন একান্ত আবশ্যক ছিল। এই সমস্ত শস্যও যথাযথভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল, তাই নগর সভ্যতা বিকাশের অন্যতম অংশ ছিল কোষ্ঠাগার নির্মাণ।

কৃষি প্রধান ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাসে শস্য সংরক্ষণের দীর্ঘ ইতিহাস আছে।[১] খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে বোলান গিরিপথ ও কোয়েটা শহরের কাছে অবস্থিত মেহেরগড় নামক প্রত্নস্থলটিতে সর্বপ্রথম কোষ্ঠাগারের হদিশ পাওয়া যায়। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতাতেও কোষ্ঠাগারের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় উৎখননের ফলে জানা গিয়েছে,[২] যেমন হরপ্পায় একটি বিরাট কোষ্ঠাগারের হদিশ পাওয়া গিয়েছে। এর আয়তন ১৬৮ ফুট × ১৩৫ ফুট। এখানে বারোটি হল ঘর পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে শস্য সংরক্ষণ করা হত এবং শস্য মাড়াই করার জন্য পাথরের তৈরী উঁচু মঞ্চও পাওয়া গিয়েছে। কোষ্ঠাগার নির্মাণ ছাড়াও বিভিন্ন পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণেরও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে,[৩] যেরকম মহারাষ্ট্রের ইনামগাঁওতে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে মাটির মধ্যে গর্ত করে খাবার সংরক্ষণের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।[৪] এরকম গর্তের মধ্যে খাবার সংরক্ষণের নিদর্শন নব্য প্রস্তরযুগে কাশ্মীরের বুরজাহোমে ও প্রাক্ হরপ্পা যুগের হরিয়ানার বানায়ালীতে পাওয়া গিয়েছে।[৫] বানায়ালীতে আবার দেওয়ালের মধ্যে গর্ত করে শস্য সংরক্ষ'ণের নিদর্শনও পাওয়া গিয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ শতক থেকে ৩০০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ন'শো বছরের মধ্যে কোষ্ঠাগার নাগরিক জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছাড়াও এর প্রমাণ আমরা এই সময় রচিত বিভিন্ন সাহিত্য ও লেখাতে পাই। এর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র[৬]। দক্ষিণের সঙ্গম সাহিত্যেও কোষ্ঠাগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। মন্দির সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখ থেকেও কোষ্ঠাগার সম্পর্কে

জানতে পারা যায়। এই রচনায় শুধু মৌর্যযুগের কোষ্ঠাগার সম্পর্কেই আলোচনা সীমিত রাখা হয়েছে।

মৌর্যযুগের কোষ্ঠাগারের অস্তিত্ব কোন ব্যতিক্রম বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই সময় কয়েকটি প্রধান নগরে কোষ্ঠাগার উপস্থিত ছিল। এই যুগের কোষ্ঠাগার সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায় **কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র** থেকে। এছাড়া সোহগৌড়া ও মহাস্থান লেখ থেকেও সেই সময়ের কোষ্ঠাগার সম্পর্কে জানা যায়। এই দুটি লেখই খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের এবং দুটিই প্রাকৃত ভাষায় এবং ব্রাহ্মী লিপিতে রচনা করা হয়েছে।[৩] সোহগৌড়া বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় অবস্থিত। এখান থেকে যে কাঁসার ফলকটি পাওয়া গিয়েছে তাতে শ্রাবস্তীর মহামাত্যের দেওয়া নির্দেশ আছে। মহামাত্যের উল্লেখ দেখে অনুমান করা যায় এটি সম্ভবতঃ মৌর্যযুগের।[৮] মহাস্থান বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় করতোয়া নদীর বাম তীরে অবস্থিত। মহাস্থানই ছিল প্রাচীন পুন্ড্রনগর এবং এটি উত্তরবাংলার সর্বপ্রাচীন নগর। মৌর্য আমলেই সম্ভবত গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্বপ্রান্তে প্রাচীন বাংলার নগরায়নের সূত্রপাত ঘটে। লেখটির হরফ মৌর্যযুগের ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে তুলনীয়। ফলে, লেখাটি মৌর্যযুগের বলেই মনে হয়। এছাড়াও এই লেখতে যে প্রশাসনিক সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায় তা মৌর্য আমলের বলেই মনে হয়। বহু ইতিহাসবেত্তা সোহগৌড়া ও মহাস্থান লেখ দুটির অনুবাদ করেছেন কিন্তু তথ্যের উৎস হিসাবে এখানে ডাঃ কে জি কৃষ্ণনের অনুবাদটিই অনুসৃত হয়েছে। এই দুটি লেখ এবং অর্থশাস্ত্র থেকে মৌর্যযুগের কোষ্ঠাগারের আকৃতি ও তার মধ্যে সঞ্চিত বিভিন্ন খাদ্য বস্তুর বিবরণ ও তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থায় কোষ্ঠাগারের যে একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল তা বিশদভাবে জানতে পারা যায়।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে[৯] আমরা কোষ্ঠাগারের যে ব্যাখ্যা পাই তা খানিকটা এই রকম- কোষ্ঠ শব্দটির অর্থ উদর। উদর পোষণার্থ প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুকেও কোষ্ঠ বলা হয়। এই সমস্ত খাদ্যবস্তু সংগৃহীত হয়ে যে স্থানে রক্ষিত হয় তার নাম কোষ্ঠাগার। অর্থশাস্ত্রে 'দুর্গনিবেশ' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে কোষ্ঠাগারের অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটি রাজবাড়ীর দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। কোষ্ঠাগার নির্মাণের ভার ছিল সন্নিধাতা নামক রাজপুরুষের উপর। এটি পাকা ইঁট দিয়ে তৈরী হত। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কোষ্ঠাগার হ'ত স্তম্ভ যুক্ত, চতুঃশাল ও একদ্বার বিশিষ্ট এবং অনেক কোষ্ঠ ও দুই পাশে অলিন্দ যুক্ত। এটি পরিখা দিয়ে ঘেরা থাকত এবং অগ্নিত্রাণ, বিষত্রাণ, মার্জার ও নকুলের ব্যবস্থাও থাকত। এছাড়া রক্ষী পুরুষ দিয়ে পাহারা দেবার ব্যবস্থাও ছিল। সুতরাং কোষ্ঠাগার যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা পাহারার ব্যবস্থা থেকে বোঝা যায়। কোষ্ঠাগারের বৃষ্টির পরিমাণ মাপার জন্য এক অরত্নি পরিমিত মুখবিশিষ্ট একটি গর্ত করা হত। কোষ্ঠাগারের অবস্থান এবং এটি সুরক্ষিত রাখার জন্য কৌটিল্যের বিভিন্ন নির্দেশ সেই যুগের অর্থনীতিতে কোষ্ঠাগারের গুরুত্ব প্রমাণ করে।

সোহগৌড়া লেখতে আমরা কোষ্ঠাগারের একটি চিত্র পাই।[১০] এখানে তিনতলা বাড়ীর

একটি কাঠামোর পাশে একটি গাছ, পাথরের নীচু বেড়া, পদ্মের কুঁড়ি ও দুটি পাহাড়ের মাঝে চাঁদের চিত্রও দেখতে পাই। সোহ্‌গৌড়া লেখতে শ্রীমান ও ভাম্‌সা গ্রামে অবস্থিত দু'টি ত্রিভূম বা তিনতলা কোষ্ঠাগারের উল্লেখ আছে। মন্থরা, চাঁচা, ময়ূদামা ও ভলাকা গ্রামের থেকে উৎপন্ন শস্য এখানে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। আর দুর্দিনের সময় এই সমস্ত গ্রামে উক্ত কোষ্ঠাগার থেকে খাদ্য বিতরণের কথাও বলা হয়েছে। কোষ্ঠাগার আবার শস্য দিয়ে ভরে তোলার দায় এইসব গ্রামবাসীর ছিল না। লেখটিতে সুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়।

মহাস্থান লেখটিতে কোষ্ঠাগারের কোন বর্ণনা নেই।[১১] এখানে ষড়বর্গীয় থেরবাদী ভিক্ষুদের অত্যায়িক বা আপৎকালীন পরিস্থিতি যেমন বন্যা, খরা বা আগুনলাগা ইত্যাদি মোকাবিলা করার জন্য কোষ্ঠাগার থেকে ধান, তিল ও সর্ষে সাহায্য দানের কথা বলা হয়েছে। ফসল ভাল হলে এই কোষ্ঠাগারটি আবার ভরে তোলার কথাও মহাস্থান লেখটিতে বলা হয়েছে। এই লেখটিতে যিনি আদেশ দিচ্ছেন তাঁর নাম নেই, তবে এই লেখটিতে কড়া রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। এবং এই কড়া রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি মৌর্য শাসন ব্যবস্থার একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল।

আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি লেখ থেকে একটি কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু মহাস্থান লেখতে শর্ত অনুযায়ী খাদ্যদানের দিকটিতেও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কতটা কল্যাণমুখী ছিল সেই বিষয়ও সন্দেহ জাগে।

অর্থশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে রাজকীয় কোষ্ঠাগার পরিদর্শনের ভার কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষের।[১২] কোষ্ঠাগারের জন্য ভিন্ন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করায় সেই সময়ের কোষ্ঠাগারের গুরুত্ব আরও বেশী করে বোঝা যায়। কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষের পদটিও যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাব প্রমাণ পাওয়া যায় এই পদটির উপর আরোপিত বিভিন্ন কাজের দ্বারা। কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষের কাজ শুধু বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর ক্ষয় ও বৃদ্ধির খোঁজ খবর রাখা ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ও পশুপাখীর খাদ্য পরিমাণ নির্ধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষকে বিভিন্ন করও আদায় করতে হত। এটি অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ সীতা, রাষ্ট্র, ক্রয়িম, পরিবর্ত্তক, প্রামিত্যক, আপমিত্যক, সিংহনিকা, অন্যজাত, ব্যয় প্রত্যয় ও উপস্থান এই দশ বিষয়ের পূর্ণ উপলব্ধি করতেন। এইসব উপায়ে প্রাপ্ত শস্য কোষ্ঠাগারে সঞ্চিত হত।

অর্থশাস্ত্রে[১৩] বলা হয়েছে যে কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষকে জনপদবাসীদের দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি বিপদের সময়ের জন্য স্নেহাদি, বর্গস্থিত, দ্রব্যের অর্ধেক রক্ষা করতে হত। অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ রাজমহানসাদিতে ব্যবহারের জন্য খরচ করা হত।

বিভিন্ন খাদ্যবস্তু যেমন ধান ভাঙলে বা রান্না করলে, তার যে ক্ষয় ও বৃদ্ধি হবে তার হিসেবও কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষকে রাখতে হত।[১৪]

(১৫) কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে[১৫] আমরা বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর উল্লেখ পাই। সম্ভবত এই

সমস্ত খাদ্যবস্তু কোষ্ঠাগারে রক্ষিত থাকত। ধান, স্নেহজাতীয় পদার্থ যেমন ঘী, তেল, বসা ও মজ্জা, ক্ষাড় দ্রব্য যেমন গুড়, মৎস্যন্ডিকা ইত্যাদি ও নুন (সৈন্ধব, সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত নুন, বিড, যবক্ষার, সৌবর্চ্চল ও উদ্ভেদজ) এই চারটি পদার্থের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার মধু, যেমন ক্ষৌদ্র (মক্ষিকাদ্বারা সঞ্চিত মধু) ও মার্দ্বীক (দ্রাক্ষার রস থেকে প্রাপ্ত মধু) শুক্তবর্গ (একপ্রকার রস), কটুকবর্গ (আদা, ধনে, জীরে ইত্যাদি), দ্রবাম্লবর্গ (দধি) ফলাম্লবর্গ (তেঁতুল, পাণিআমলা, আম), শাকবর্গের (শুষ্ক, মাছ, শুষ্ক মাংস ইত্যাদি) উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত খাদ্যবস্তু কিভাবে সংরক্ষিত করা হোত তারও বিশদ বিবরণ অর্থশাস্ত্রে[১৬] আছে। ধান উপরে রাখা হত। গুড় জাতীয় ক্ষার দ্রব্য সান্দ্রঘটিত ঘাস দিয়ে ঢাকা থাকত। তেল, ঘী, ইত্যাদি স্নেহজাতীয় পদার্থ মৃতকোষ্ঠ বা কাষ্ঠকোষ্ঠ পাত্রে রাখা হত। নুন মাটিতে বা মাটির পাত্রে রাখা হত।

সর্বশ্রেণীর মানুষ ও পশুপাখীরও একটি খাদ্যতালিকা অর্থশাস্ত্রে[১৭] পাওয়া যায়। রাজা, রাজপত্নী, রাজপুত্রদের খাদ্যতালিকা থেকে আরম্ভ করে মধ্যবিত্ত, অমধ্যবিত্ত আর্য পুরুষ, মহিলা ও বালকের খাদ্য তালিকাও এতে আছে। এছাড়াও সৈন্য ও বিভিন্ন শ্রেণীর দাস দাসীর খাদ্য তালিকা আছে, ঝাড়ুদার, কোষ্ঠাগারের রক্ষী, মান পরিদর্শক, তুলাদ্বারা মাপকারী, ধানের মাপকারী, দ্রব্যাদি দানের পরিদর্শক ও ওজন গণনার যষ্টি গ্রহণকারীর খাদ্য সম্পর্কেও বলা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পশু পাখীর খাদ্যতালিকাও আছে। বিভিন্ন ধরনের হস্তী (যেমন রাজবাহ্য হস্তী, যুদ্ধকার্যে নিযুক্ত হস্তী ইত্যাদি), অশ্বের খাদ্য তালিকা থেকে আরম্ভ করে গরু, উট, ছাগল, হরিণ, মেষ, কুকুর, বিড়াল, হাঁস ইত্যাদির খাদ্য সম্পর্কেও অর্থশাস্ত্রে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এই সমস্ত খাদ্য তালিকা অনুযায়ী খাদ্য দানের ভার কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষের। এই সুবিশাল খাদ্যতালিকা থেকে সেই সময়ের কোষ্ঠাগারের খাদ্য সঞ্চয়ের ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র এবং সোহ্‌গৌড়া ও মহাস্থান লেখ থেকে আমরা মৌর্যযুগের কোষ্ঠাগার এবং সেই যুগের অর্থনীতিতে এর ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে পারছি। কোষ্ঠাগার নগর সভ্যতার একটি বিশেষ অঙ্গ।[১৮] গর্ডন চাইল্ডের উল্লেখিত নগর সভ্যতা স্থাপনের একান্ত প্রয়োজনীয় শর্তগুলির মধ্যে কোষ্ঠাগার নির্মাণ অন্যতম। মৌর্যযুগের বিভিন্ন শহরেও কোষ্ঠাগার ছিল এবং সে যুগের অর্থনীতিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ও বহু সংখ্যক রাজপুরুষের প্রয়োজন ছিল। এদের ভরণপোষণের জন্য পরিপূর্ণ কোষ্ঠাগার অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। অর্থশাস্ত্রে কোষ্ঠাগারের জন্য পৃথক অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা এবং তাঁর উপর আরোপিত বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়েও কোষ্ঠাগারের গুরুত্ব বোঝা যায়, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র এবং মহাস্থান ও সোহ্‌গৌড়া লেখ থেকে আমরা মৌর্যযুগের কোষ্ঠাগারের কাঠামো এর মধ্যে সংরক্ষিত বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর বিবরণ এবং এই খাদ্যবস্তুগুলি সংরক্ষণের

যথাযথ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। সেই যুগের অর্থনীতিতে কোষ্ঠাগারের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তা উক্ত আলোচনা থেকে প্রকাশ পায়। এছাড়াও আপদকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য কোষ্ঠাগারের যে একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল তাও আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারি। সোহ্‌গৌড়া লেখ থেকে জানা যায় ফসল ভাল হলে কোষ্ঠাগার পূর্ণ করার কোন দায় গ্রামবাসীর ছিল না, কিন্তু মহাস্থান লেখতে এর বিপরীত চিত্র পাই। এখানে ফসল ভাল হলে কোষ্ঠাগারা ভরে তোলার কথাও বলা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মনে হলেও সে যুগের অর্থনীতি কতটা কল্যাণমুখী ছিল সে বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। কারণ মহাস্থান লেখটিতে শর্ত অনুযায়ী খাদ্যদানের একটি দৃষ্টান্ত আমরা পাচ্ছি। সুতরাং মৌর্যযুগের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে কল্যাণমুখী ছিল না। তবে উক্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের ভরণপোষণের পিছনে সেই যুগের কোষ্ঠাগারের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল।

সূত্রনির্দেশ

১। জিন ফ্রান্‌কোয়িস জারেজ, 'এস্‌ক্যাভেসন্ এট্ মেহেরগড় : দেয়ার সিগ্‌নিফিকেন্স এ্যান্ড আন্ডাস্ট্যান্ডিং দ্য ব্যাক্‌গ্রাউন্ড অফ্ হরপ্পান্ 'সিভিলাইজেশন', গ্রেগরি পোসসেল (সম্পাদিত) **হরপ্পান সিভিলাইজেশন এ রিসেন্ট পার্সপেক্‌টিভ**, অক্‌সফোর্ড ও আই.বি.এইচ্ পাব্লিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃ ঃ ৭৯-৮৪, এছাড়াও দ্রষ্টব্য জিন ফ্রান্‌কোয়িস জারেজ টাউন এন্ড ভিলেজস্ অফ্ হিল এ্যান্ড প্লেন, 'বি বি লাল, এস্.পি.গুপ্ত (সম্পাদিত) **ফ্রন্টিয়ারস্ অফ্ ইন্ডাস সিভিলাইজেশন**, প্রকাশক বুক্‌স এন্ড বুক্‌স আর্কিওলজিকাল সোসাইটির সৌজন্যে ১৯৮৪, পৃঃ ২৯২-২৯১।

২। মাধো সাপ্রো ভাট্‌স্, **একসক্যাভেসন এ্যাট্ হরপ্পা**, ভলিউম্-১, দিল্লী, প্রকাশক ভারত সরকার ১৯৪০ পৃঃ ১৫

৩। এ ঘোষ (সম্পাদিত), **এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ্ ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি**, ভলিউম ১, মুন্সিরাম মনোহরলাল পাব্‌লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৯, পৃঃ ১৭৩

৪। **এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ্ ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি** পৃঃ ৮৬

৫। আর এস বিস্টু 'স্ট্রাক্‌চারাল বিমেইন্‌স্ এ্যাট বানায়ালী,' বি বি লাল, এস্.পি. গুপ্ত (সম্পাদিত), **ফ্রন্টিয়ারস্ অফ ইন্ডাস সিভিলাইজেশন্**, ১৯৮৪ পৃঃ ৮৯

৬। **প্রি পল্লভ টেক্‌স্ট ইন্ডেক্‌স**

৭। কে জি কৃষ্ণন (সম্পাদিত) **উওন্‌কিটা বিদ্যা অরণ্য এপিগ্রাফ্‌স্**, ভলিউম ২, উওন্‌কিটা বিদ্যা অরণ্য ট্রাস্ট, ১৯৮৯, পৃ ঃ ১০৮

৮। **উওন্‌কিটা বিদ্যা অরণ্য এপিগ্রাফ্‌স**, পৃ ঃ ১০৪, এছাড়াও দ্রষ্টব্য দিলীপ চক্রবর্ত্তী,

আর্কিওলজি অফ্ এন্সিয়েন্ট ইন্ডিয়ান সিটিস্, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৯৫, প্র: ২১৬-২১৭, ২৪৫ তাছাড়াও রণবীর চক্রবর্ত্তী, **প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে**, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৮, পৃ: ১১৪; এবং নীহার রঞ্জন রায়, **বাঙালীর ইতিহাস** (আদিপর্ব) দ্বিতীয় সংস্করণ, বুক এম্পোরিয়াম লিমিটেড, মাঘ-১৩৫৬, পৃ: ৩৭২-৩৭৩।

৯। রাধাগোবিন্দ বসাক (অনুবাদিত), **কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র**, জেনারাল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭, পৃ: ৭৩, ৭৯।

১০। **উওন্কিটা বিদ্যা অরণ্য এপিগ্রাফ্স** পৃ: ১০৮

১১। **উওন্কিটা বিদ্যা অরণ্য এপিগ্রাফ্স** পৃ: ১০৪-১০৫

এছাড়াও দ্রষ্টব্য **বাঙ্গালীর ইতিহাস** পৃ: ১৫০

১২। **কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র** পৃ: ১৪০-১৪২

১৩। **কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র** পৃ: ১৪৩

১৪। **কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র** পৃ: ১৪৩

১৫। **কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র** পৃ: ১৪২-১৪৩

১৬। **কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র** পৃ: ১৪৬

১৭। **কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র** পৃ: ১৪৪-১৪৬

১৮। ভি গর্ডন চাইল্ড, 'দ্য আর্বান রিভলিউসন গ্রেগরি পোসসেল (সম্পাদিত)

এন্সিনান্ট সিটিস্ অফ্ দ্য ইন্ডাস্, বিকাশ পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৯ পৃ: ১৫-১৭।

মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতিতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অবদানের নিরীক্ষা

অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়

মেদিনীপুর জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ২১°, ৩৬', ৩৫'' ও ২২°,৫৭',১০'' অক্ষাংশে। আয়তনে সম্ভবত ১৩,৭৪০ বর্গ কিলোমিটার।[১] এই জেলা মেদিনীপুর সদর নিয়ে ৭টি মহকুমা, ৫৪টি ব্লক, ৫১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১২টি মিউনিসিপ্যালিটি ও ১০,৬৭৮ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত।[২] সুপ্রাচীনকাল থেকে বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত এই জেলা বঙ্গদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সীমানা শাসনকার্যের সুবিধার্থে ব্রিটিশ শাসনের সময়েই নির্ধারিত হয়েছিল। এইভাবে এই অঞ্চল মধ্যযুগে কখনো পরগণা, কখনোও চাক্‌লা নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। জেলাই সর্বাধুনিক রূপ। বর্তমানে মেদিনীপুর জেলা নামে চিহ্নিত অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ওড়িশা / ওড়িশি / ওড্র / উৎকল / কঙ্গোদ নামে পরিচিত বর্তমান উড়িষ্যা ভূখণ্ডের কোন সীমানা ছিল না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, আক্রমণ, রাজ্যবিস্তারের ফলে কখনো কখনো মেদিনীপুর অঞ্চল ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জেলার জনবসতিতে ও সংস্কৃতিতে অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থায়, ধর্মে-কর্মে, ধ্যান-ধারণায়, শিল্পকলায়, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রাঙ্কণে তৎসংলগ্ন ওড়িশার প্রতিফলন পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। মেদিনীপুর জেলা পুরোপুরি খাঁটি বাঙ্গলাভাষী জেলা নয়। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুর জেলার তমলুকের পূর্বে, মেদিনীপুর শহরের দক্ষিণে নারায়ণগড় ও সবং পর্যন্ত অঞ্চলে প্রচলিত বিশিষ্ট ধরনের বাঙ্গলা ভাষাব নামকরণ করেছেন 'দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গলা' অথবা 'সুহ্মক বাঙ্গলা'।[৩]

এই নিবন্ধে আলোচ্য বিষয় মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতিতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অবদানের নিরীক্ষা। প্রথমেই অবগত হওয়া প্রয়োজন মেদিনীপুর জেলার সীমানা ও তৎসংলগ্ন স্থানসমূহ। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তরে বাঁকুড়া ও উত্তর-পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা, পশ্চিমে বিহারের সিংভূম ও ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ, দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড়িশার বালেশ্বর জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব সীমানায় হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার প্রাকৃতিক সীমারেখা রূপনারায়ণ নদ ও হুগলী নদী, উত্তর-পূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা জেলা। পশ্চিমাংশে ছোটনাগপুরের মালভূমির

পূর্বসীমার প্রসারিত অংশ। প্রাচীন বঙ্গদেশে অর্থাৎ সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, তাম্রলিপ্তি, রাঢ় ইত্যাদি জনপদে যারা বসবাস করতো তারাই অস্ট্রালয়েড, মেডিটেরিনিয়ান, মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত আদিম মানুষ। তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় অধিকাংশই অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের বসতি ছিল। অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীভূক্ত জনগণের ভাষা ছিল অস্ট্রিক। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে মেডিটেরিনিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দ্রাবিড় ভাষাভাষীরা এই অঞ্চলে প্রবেশ করে। উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিশ্রণও ঘটে। কালক্রমে বহুবিধ উপজাতিগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের ফলে বহুল মিশ্রণ স্বাভাবিক রূপে দেখা দেয়। অস্ট্রিকভাষাভাষী গোষ্ঠীভুক্ত সাঁওতাল, হো, কোল, মুন্ডা, শবর, লোধা, কোড়া, পুরাওঁ, খারওয়ার, খেড়িয়া, গোন্ড, ধাঙ্গড়, নাট, মহালী, ভূমিজ, ওঁরাঁও ইত্যাদি উপজাতি গোষ্ঠীর জনগণ এই অঞ্চলের অধিবাসী যদিও লোকগণনার সংখ্যায় অল্প।[৮] উল্লেখ্য মঙ্গোলয়েড জাতির মিশ্রণ এ অঞ্চলে কম। পরে আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর প্রবেশ ও জৈন, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচার শুরু হয়।

বঙ্গদেশের দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত থাকায় এই অঞ্চলে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে বহু উপজাতিগোষ্ঠী তার শাখা-প্রশাখা ও বর্ণের (Caste) উৎপত্তি হয়েছিল। এইরূপে পরে সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি হয়। ফলে মূল জাতির সন্ধান পাওয়া যায় না। সংমিশ্রিত অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষাভাষী গোষ্ঠীরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়েছিল। সংমিশ্রণের ফলে এই অঞ্চলে বাউরি, বাগ্‌দি, হাড়ি, ডোম, মুচি, নাপিত এই সব জনগণকে বসবাস করতে দেখা যায়। আবার কৈবর্ত ও তার শাখা প্রশাখা, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, ভকত বা ভোক্তা, ভক্তা, মাঝি, কদমা, কড়মা অর্থাৎ জেলে, চূণ তৈরী কাজে নিযুক্ত সম্প্রদায়, বাজু, শুক্‌লি, তাঁতুয়া ইত্যাদি বর্ণের জনগণের বসতি দেখা যায়।[৯] এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় চন্দ্রকোণায় শরাক পদবীধারী তন্তুবায় সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল, এখনও আছে।[১০] এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই জেলায় কৈবর্ত বা মাহিষ্য শ্রেণীর বসবাসের আধিক্য দেখা যায়। গ্রিয়ারসন সাহেব তাঁর লিন্‌গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে উল্লেখ করেছেন মেদিনীপুর জেলার মধ্যভাগে; দক্ষিণে সবং থানার উত্তরে, নারায়ণগড়ে, পশ্চিম তমলুক, পশ্চিম পাঁশকুড়া, পশ্চিম নন্দিগ্রাম থানায় প্রধানত কৈবর্ত বা মাহিষ্য শ্রেণীর বসবাস আছে। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লিখিত 'সুহ্মক উপভাষা' ঐ শ্রেণীর জনগণের মধ্যেই প্রচলিত।[১১] এই উপভাষার উদ্ভব আদিবাসীগোষ্ঠীর ভাষার যথা অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও অন্যদিকে মাগধী অপভ্রংশ, মৈথিলী, উড়িয়া ও সংস্কৃত ভাষার সংমিশ্রণে বলে অনুমান করা যেতে পারে। উপরিউক্ত বহুবিধ সঙ্কর বর্ণের জনগণের বসতি ব্যতীত রাঢ়ী ও মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত জনগণের বসতি আছে, তবে সংখ্যায় কম। এইরূপ সংক্ষিপ্ত জনবসতির পরিচয় থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এই জেলায় প্রাচীন উপজাতিগোষ্ঠী ও ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে বহুবিধ বর্ণ ও উপবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। এই উপজাতিগোষ্ঠীর জীবন-যাপন প্রণালী ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-ধারণা এই অঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তার করবে এটাই স্বাভাবিক। মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদের ভাষায়, গ্রামের ও স্থাননামের অন্ত শব্দের বিশ্লেষণে, কৃষিজাত দ্রব্যের নাম তালিকায়, আর্য-

সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন-চর্চায় অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার ও ভাষাভাষী জনগণের আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহাদি ধর্ম, কর্ম ও পূজা পদ্ধতিতে প্রতিফলন দেখা যায়। বর্তমান প্রবন্ধটি লিখতে গিয়ে অনেক ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ্, ভাষাতত্ত্ববিদ্, ইতিহাসবিদ্ ও গবেষক প্রমুখের পুস্তক ও কয়েকটি সূত্রনির্দেশে শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে।[৮]

মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতিতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যে সমস্ত ফল-মূল, ফুল, গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, নিত্যসামগ্রী দ্রব্যসমূহ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কোন্ শব্দগুলির সংগে পরিচিত। তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল। যথা-কদলী (কলা), নারিকেল, তাম্বুল (পান), নিম্বুক (লেবু), দাড়িম্ব (ডালিম), রম্ভা (পাকা কলা), ডুমুর, বাইগুণ (বেগুণ), ঝিঙে, কচু, কুমড়া (ডিংলা), নেবু, কামরাঙ্গা, লাউ, কার্পাস (তুলা), তন্ডুল (চাল) = চাউল, তেঁতুল, হরিদ্রা (হলুদ), সিঁদুর, কদম্ব (কদম ফুল), শাল্মলী (সিল্ক তুলা), অঙ্গার (আগুনের ছাই), ঢেঁকি, বাখারি (চেরা বাঁশ), কানি (ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো), কালি, ছোট, ঠোঁট, ঠ্যাং (পা গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত), জাং (জঙঘা), বাসি, পেট, ডোম (যারা মৃতদেহ সৎকার করে), ঝোড়, ঝোপ, ঝাড়, করাত, দা, পগার (খাল), গড়, বরজ (পানের চাষ যেখানে হয় তাকে বলে), বারুই (যারা বরজের বিক্রেতা বা চাষ করে) ইত্যাদি। এছাড়া হাতী, কপোত (পায়রা), মাতঙ্গ, মেড়া বা ভেড়া, ময়ুর, গজ (হাতী), গন্ডার, মিনু বা মেনি (বেড়াল), বাদুর, কামরা। কারা (মহিষ), বোয়াল (মাছ), কাঁকড়া, লাঙ্গুল (লাঙ্গল), মদ, মহুয়া (Ma-dukam), ছাঁচ, ছাঁচতলা, চুণ, চিখিল (কাদা), চোঙ, চোঙ্গা ইত্যাদি শব্দগুলির সংগে জনগণ পরিচিত। বিশেষজ্ঞগণের বিশ্লেষণী সমীক্ষায় নির্ধারিত হয়েছে উপরিউক্ত শব্দগুলি মূলত অস্ট্রিক ভাষার অন্তর্গত বা অস্ট্রিকভাষার সংগে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত।[৮] এতদ্ব্যতীত একই শব্দ দুইবার প্রয়োগে যে ধ্বন্যাত্মক শব্দসমূহ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় সেগুলিও অস্ট্রিকভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় খাঁ-খাঁ, কুলিন্দ-পুলিন্দ, অঙ্গ-বঙ্গ, উড্র, পুন্ড্র, খোকা-খুকি, মুণ্ড ইত্যাদি। পণ্ডিতপ্রবর লেভি পশিলুস্কি বলেছেন এই সকল যমজ নামকরণ পদ্ধতিই অস্ট্রিক ভাষার । নদ-নদী নামেও অস্ট্রিক ভাষার অবদান লক্ষণীয়। যেমন দামোদর, কপোতাক্ষ ইত্যাদি। দামোদর নামটি দাম্ + দাক্ থেকে গৃহীত।[১০] কপোতাক্ষ—কব্ + দাক্ থেকে উদ্ভূত। কোল শব্দ দা বা দাক্ অর্থ জল। দা বা দাক্ থেকে সংস্কৃত 'উদক' শব্দ। দামোদর মেদিনীপুর জেলার একটি নদী। এই নদী নামটিও মূলত অস্ট্রিক ভাষার। বাংলায় মোটা শব্দটিও মুণ্ডা ভাষায় মোটো।[১১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে মোটা শব্দটিও অস্ট্রিক ভাষার অন্তর্গত। মেদিনীপুর জেলার গ্রামনামগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় অধিকাংশ নামই আর্যেতরগোষ্ঠীর অর্থাৎ অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষাভুক্ত। কখনও সংস্কৃতের প্রলেপে আর্যেতর ও সংস্কৃত ভাষা সংযুক্ত হয়ে মিশ্র রূপ ধারণ করেছে। তাছাড়া বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের নামসমূহের সঠিক অর্থও খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু বিশ্লেষণী সমীক্ষায় যা প্রতীয়মান হয় তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীগণ তাদের বাসস্থানের জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী, গাছ-পালা, লতা-গুল্ম, নদ-নদীর নামে তাদের বসতির নামকরণ করেছে তাদের ভাষায়। যেমন দহ বা দা শব্দ অন্তে গ্রাম বা স্থান নামের উৎস অস্ট্রিক

ভাষার।[১২] ড়, ড়া, তোড়, নোলা, স্তালি, জোলা, হিট্টি, জোট, জোটি, জোটিকা গুলি ইত্যাদি শব্দ অন্তে গ্রামনাম দ্রাবিড় ভাষার সংলগ্ন।[১৩] মেদিনীপুর শহরের আশে পাশে যে সব স্থান বা গ্রামের নাম দেখা যায় সেগুলি সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত নয়। যেমন, গোদাপিয়াশাল, শালবনি, পিছাবনি, লোধাগুলি, লোয়াদা, ডেবরা, পিংবনি, গোয়ালতোড়, হুমগড়, কাত্‌রা, মাথাভাঙ্গর শাঁখাভাঙ্গা, হাতিহোল্‌কা, পাখ্‌রা, এঁড়েমারা ইত্যাদি। এইভাবে স্থান ও গ্রামের নামেও অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষার স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

পোশাক পরিচ্ছদে লক্ষ্য করা যায় এই অঞ্চলের অধিবাসীরা (পুরুষেরা) ধুতি, সার্ট ও শীতকালে চাদর, (স্ত্রীলোকেরা) শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া পরিধান করে। বর্তমানে যে কোন অঞ্চলে শহরে, গ্রামে-গঞ্জে, দেশ বিদেশের পোষাক পরিচ্ছদের প্রভাব পড়তে দেখা যায়। সূতির পোষাকের ব্যবহার এখানে বেশী। বঙ্গদেশে কার্পাস চাষের উলেখ চর্যাপদে পাওয়া যায়। ('সুকুড় এ সেরে কপাসু ফুটিলা'[১৪]) অধিবাসীগণ কাপাস ফুল ফোটার আনন্দে অভিভূত। কার্পাস (কর্পাম), পট (পট্টবস্ত্র বাঙলা পট, পাট) কর্পট (পট্টবস্ত্র) মূলত অস্ট্রিক শব্দ।[১৫] শান্তিপাদে ধুনুরি ও তূলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ করার বর্ণনা আছে। কার্পাস বা তূলার চাষ, তূলা ধুনা, তাঁতে বস্ত্রবয়ন অস্ট্রিকভাষী সাঁওতাল, শবর প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবিকা। বর্ণসংকরের ফলে তাঁতি বা তন্তুবায় বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরের অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়। আজও মেদিনীপুর জেলার অমর্শি, রামজীবনপুর, আনন্দপুর, চন্দ্রকোণা, তমলুকের ও কাঁথির বিভিন্ন অঞ্চলের সুতা, রেশম ও তসরের বস্ত্র বয়ন প্রশংসা অর্জন করে। যে তাঁতশিল্পে বাংলাব নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য বিশ্বের দরবারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে তা মূলত অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠীর অবদান। বাঙ্‌লার তথা মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতির গভীরে অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠীর প্রতিফলন পরিস্ফুট। উল্লেখনীয় প্রতিফলন দেখা যায় গণনারীতি ও পদ্ধতিতে। গণনায় আধুনিক দশমিক প্রথা প্রবর্তনের আগে এমনকি আজও গ্রামে গঞ্জে এক কুড়ি (বিশ বা ২০), দুই কুড়ি (২০×২=৪০), তিন কুড়ি (২০×৩=৬০) চার কুড়িতে (২০×৪=৮০) এক পণ অর্থাৎ ৮০-এই গণনার রীতি প্রচলিত আছে। এই কুড়ি শব্দ ও গণনারীতি উভয়ই অস্ট্রিক ভাষার।[১৬] পণও সাঁওতালি শব্দ।[১৭] সাঁওতালি ভাষায় উপুণ বা পুণ বা পণ শব্দটির অর্থ ৮০। আবার পণ শব্দ চার(৪) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। খড়ের আঁটি ও পানের গণনায় এখনও কুড়ি, পণ, গাছি, বর পণ গাছি রীতি ব্যবহৃত হয়। চাষীরা এই গণনায় অভ্যস্ত। উল্লেখ্য বর মানে ২, পণ ৮০, বর-পণ গাছি অর্থাৎ ২×৮০=১৬০।[১৮] লক্ষণীয় এই যে, কুড়ি শব্দটি মানবদেহের হস্ত পদের মিলিত কুড়ি (২০) অঙ্গুলির সংগে সম্পৃক্ত। মানবদেহই গণনার মূল ভিত্তি। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গণনার নিম্নতম মান চার-৪ যা গোণ্ড বা গণ্ডা নামে পরিচিত। এই ৪ গণনাও মানবদেহের হাতের প্রতিটি অঙ্গুলির ৪টি কড়া বা ভাঁজের সংগে সংশ্লিষ্ট। ১ গণ্ডা = ৪, ৫ গণ্ডা = ৫×৪ = ২০ এক কুড়ি। চার কুড়িতে ২০×৪ = ৮০ = এক পণ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও পাঠশালায় ধারাপাতে এই কুড়ি, গণ্ডা ও পণের গণনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।[১৯] বাংলায় গুঁড়ি, গুড়া, গুটি শব্দগুলি গোণ্ড বা গোণ্ডা শব্দ থেকে উদ্ভূত।[২০] গণ্ডা শব্দও অস্ট্রিক ভাষার অন্তর্গত।[২১]

মেদিনীপুর জেলার নদীবহুল স্থানে অর্থাৎ ঘাটাল, কাঁথি, তমলুক, মহিষাদল, সূতাহাটা, নন্দিগ্রাম, পাঁশকুড়া এসব অঞ্চলে নৌকা, ডিঙ্গি ও ডোঙ্গার ব্যবহার ছিল, এখনও আছে। নৌকা, ডোঙ্গা, ডিঙ্গি, সাঁকো, ভেলা এসকল শব্দই মূলত অস্ট্রিকভাষার।[২২] এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যাতায়াতে উপরিউক্ত যানবাহনই ব্যবহার করতো। আরোও দেখা যায় শাসনকার্যের সুবিধার জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রথা, গ্রামের মোড়ল বা প্রধানের বিচার ও ভূমিকা অস্ট্রিকভাষীদের কাছে পরিচিত ছিল।

মনোনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় তিথি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সূর্য, চন্দ্র. নক্ষত্রের প্রভাবে অস্ট্রিকভাষীরা বিশ্বাসী ছিল। লিঙ্গ ও যোনি পূজায় অভ্যস্ত ছিল।[২৩] সিং বোঙ্গা বা সূর্যদেবতা ও নিন্দচন্দ বা চন্দ্রদেবতা সাঁওতালদের অর্থাৎ অস্ট্রিকভাষীদের সর্বশক্তিমান দেবতা রূপে পূজিত হতো এবং এখনও হয়।[২৪] এছাড়াও এখনও আর্যেতর গোষ্ঠীভুক্ত সম্প্রদায় মন্ত্র, তন্ত্র, গল্পকথা, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, উর্বরাশক্তিতে অর্থাৎ fertility cult এ, বলিপ্রথায় তাই তারা বিশ্বাস করতো। মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা গাছে, সর্বপ্রাণবাদ ও পাহাড়ে, জীব জন্তুতে প্রবশে করে। এ বিশ্বাস করতো তারা সাধারণত ছাগল, মহিষ, মুরগী ও পায়রা দেবতার কাছে মানত করে বলি দিত। উর্বরাতন্ত্রের সংগে বলি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমানে বড়াম বা বনদেবতার পূজায়, শীতলা ও কালিপূজায় বলিদানের প্রচলন আছে। উর্বরাতন্ত্রে (fertility cult) আর্যেতর গোষ্ঠীভুক্ত জনগণই বিশ্বাসী ছিল। মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদের প্রচলিত ধর্মীয়, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে, বিবাহ, উপনয়ন ও পূজা পদ্ধতিতে দূর্বাঘাস, হলুদ, পান, সুপারি, কলা, সিঁদুর, কড়ি, খই, নারিকেল ইত্যাদি অস্ট্রিক ভাষাভাষীর অবদান। বিবাহে বরপণ দেওয়ার রীতি আর্যেতর গোষ্ঠীর। বরপণ ও বিবাহে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ চর্যাপদে পাওয়া যায়। (সিঙ্গা ডম্বুর বাজে, কাংস্য করতাল... করড়া করড়ী বাজে কুণ্ডলা কুণ্ডলী বেণু বাঁশী.... সবমণ্ডল বাজে চন্দ্রাবলী)[২৫] বিবাহে বরপণ সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল। তাছাড়া বর ও কনের মাতা ও মাতামহকে শাড়ী দেওয়ার প্রথাও ছিল।[২৬] অধুনা বাঙালীদের বিবাহ প্রথায় বরপণ, শ্বশুর, শাশুড়ী ও গুরুজনদের নমস্কারি শাড়ী দেওয়ার যে প্রথা রয়েছে তাও অস্ট্রিক ভাষী জনগোষ্ঠীর প্রচলিত প্রথার অবদান। এতদ্ব্যতীত ব্রতকথা, লক্ষ্মীপূজা, আলপনা, টুসু, ভাদুগান, ইঁদপূজা, ভীম, বড়াম মার পূজা—এসবই অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠীর অবদান।[২৭] লোকউৎসবে ভীমপূজার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে মহাভারতের দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম ও মেদিনীপুর জেলায় পূজিত ভীমের একীকরণে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কাল পরিক্রমায় মহাভারতের ভীমের সাথে মেদিনীপুরে ভীম কৃষি দেবতা রূপেই পূজিত হয়। খোলা মাঠে, ক্ষেতের কিনারে, বৃক্ষতলে, ধানের মড়াই বা গোলার কাছাকাছি, গ্রামের ভিতরে বা সীমান্তে, হাটবাজার ও রাস্তার সন্ধিস্থলে ভীম পূজা হয়। বিশাল মূর্তি ও কাঁধে গদা সাধারণত পূজিত ভীমের রূপ।[২৮] এই ভীম আর্যেতর গোষ্ঠীর দেবতা, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নন। উল্লেখ করা যেতে পারে ঘাটাল মহকুমা ও সদর মহকুমার উত্তরাংশে ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজঠাকুরের পূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ধর্মপূজার পুরোহিত হন ডোম, হাড়ি, বাগদি প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা। ধর্মঠাকুরের

পূজার উৎস সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় মনে করেন বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্ন পাওয়া যায় ধর্মঠাকুরের পূজায়। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুকুমার সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐ মত গ্রহণ করেন নি। আচার্য চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ অস্ট্রো-এশিয়াটিক (কোল-মুণ্ডা) ভাষায় 'কচ্ছপ'। ধর্ম পূজা কূর্ম পূজার নামান্তর। পণ্ডিতপ্রবর সুকুমার সেন মহাশয় তো স্পষ্টই বলেছেন ধর্মঠাকুরের পূজা পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের সুপ্রাচীন আদিম ধর্মীয় প্রথা। আজও তা চড়ক পূজা ও গাজন উৎসবের মধ্যে অনুসৃত হতে দেখা যায়।[৮] মেদিনীপুর জেলায় ঘাটাল, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজার প্রাবল্য দেখা যায়।

ক্রমে ধর্মঠাকুর শিবের সংগে এক হয়ে গিয়েছেন ধর্মের গাজন আর শিবের গাজনের সাদৃশ্য তাই এতো গভীর। আবার শাক্ত ও শৈবধর্মের মিলনের প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য ...there is a tendency in Midnapur to equate Dharma to Siva by making him husband of a Sakti'[২৮]

সাঁওতাল ও আদিবাসীজনগোষ্ঠী যখন বনে শাল ফুল ফোটে তখন সঙ্গীত ও বাঁশী বাজিয়ে স্ত্রী পুরুষ একে অপরের গায়ে জল নিক্ষেপ করে জলসিক্ত করে আনন্দ প্রকাশ করে। এই উৎসবকে বাহা পূজা বলা হয়। এই বাহা পূজা হোলি উৎসবের সংগে সংশ্লিষ্ট।[২৮] এসবই অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবিত। পৌষ সংক্রান্তিতে পাকা ধান গৃহে তোলার পর যে উৎসব এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ পালন করে তা পৌষ পার্বণ নামে পরিচিত। এই উৎসবও কৃষি উৎসব তদুপরি লক্ষণীয় বিষয় বৃক্ষপূজা, জন্তু ও পশুপক্ষী পূজাও অস্ট্রিকভাষী সম্প্রদায়ের অবদান।

মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত। অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠীর প্রধান খাদ্যই ভাত। চাউল অস্ট্রিক শব্দ। চর্যাপদে ধান গাছের ও চাষের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। কঙ্গু চিনা বা কাগনী (ধান্য বিশেষ) পাকেল্লা রে শবর শবরী মাতেলা। মাঠে-মাঠে পাকা ধান শবর শবরী আনন্দে মেতে উঠেছে। শিয়ালের হাত থেকে রক্ষার জন্য বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বেড়া দিত। শবর, নিষাদ, চণ্ডাল, ডোম যারা মূলত অস্ট্রিকভাষাভাষী জনগোষ্ঠীভুক্ত তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী চর্যাপদে বিধৃত আছে। তারা চাষ করতো, কাপড় বুনতো, নৌকা, ভেলা, সাঁকো, চাংগেড়া তৈরী করতো।[২৯] তদুপরি শাসন ব্যবস্থায় তারা পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্তন করেছিল। মাঝি, নায়েক পদবীধারী সম্প্রদায় গ্রামের শাসন ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করতো। বতমানে শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ পঞ্চায়েত প্রথা অস্ট্রিকভাষীরই অবদান[২৮] নৃতত্ত্ববিদ, পণ্ডিতপ্রবর শরৎচন্দ্র রায় এই অভিমত পোষণ করেন। তারা নৃত্যগীতে পারদর্শী ছিল। ডোম্বীর অসাধারণ নৃত্যকুশলতা চর্যাপদে বিধৃত রয়েছে। (লাউ বাঁকলে বাঁশের ডাঁট লাগিয়ে তন্ত্রীযোগে একরূপ বীণাজাতীয় যন্ত্র প্রস্তুত করে তারা বাজাতো আর নাচগান করতো। এখন বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে একতারা বাজিয়ে নাচ-গান করার প্রচলন আছে। আনন্দোৎসবে আজও দেখা যায় সাঁওতাল,

বাউরি প্রমুখ আর্যেতর সম্প্রদায় মাদল ও বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে নাচ-গানের মধ্যে তাদের অন্তরের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। ছন্দ ও তালের অঙ্গ-ভঙ্গিমায় নিজস্ব স্বকীয়তা পরিস্ফুট)।

দ্রাবিড়ভাষা-ভাষী নরগোষ্ঠী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বঙ্গে প্রবেশ করার ফলে অস্ট্রিকভাষী অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর সংগে বিবাহসূত্রে ও সাংস্কৃতিক মিলন মিশ্রণে আবদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং কোন্‌টি দ্রাবিড়ভাষী গোষ্ঠীর ও কোন্‌টি অস্ট্রিকভাষী গোষ্ঠীর চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য ও প্রায় অসম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে একসাথে বসবাসের ফলে মিলন-মিশ্রণে ধর্ম কর্মে তারা একই সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। অর্থাৎ উভয় গোষ্ঠীই একই মূল সূত্রে আশ্রিত। উভয় নরগোষ্ঠীই বৃক্ষ পূজায় বিশ্বাসী। তথাপি ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্লেষণী ব্যাখ্যায় দ্রাবিড় ভাষার অন্তর্গত শব্দ ও পূজা-অর্চনা, বিবাহ ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক রীতি নীতি ও অনুষ্ঠানে দ্রাবিড়ভাষী নরগোষ্ঠীর সংস্কৃতির রূপ প্রতিফলিত হয়। মূল অস্ট্রিক শব্দের সংগে সংশ্লিষ্ট বাংলার বহু শব্দ যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি দ্রাবিড়ভাষার সাথে সংলগ্ন বাংলার বহু শব্দ প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলা শব্দের উপান্তে ড়, ড়া, ভিটা, ভিটি, উর, কুট (দুর্গ বা চূড়া), পুর (নগর) মূলত দ্রাবিড়ভাষার অন্তর্গত।[illegible] এছাড়াও গুড়ি, জুলি, ঝোল, জোট, জোটিকা, জুড়, লোহিত, কুণ্ড, শোল, শোলা, গুলি ইত্যাদি অন্তযুক্ত শব্দের উৎস দ্রাবিড় ভাষায়।[illegible] আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি থেকেই বোঝা যায় বাংলাভাষায় দ্রাবিড়ভাষার প্রভাব কতোখানি ছিল। যথা—"Dravidian affinities in Bengali phonetics, morphology, syntax and vocabulary are noteworthy."[illegible] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রামের নাম গোয়ালতোড়। গোয়ালতোড় এই শব্দের উপান্তে ড় বা ড়া থেকে অনুমিত হয় এই গ্রামনাম দ্রাবিড় ভাষার সংগে সংশ্লিষ্ট। বাংলা বহু শব্দ মূলত দ্রাবিড়ভাষার বা অস্ট্রিকভাষার। যথা কপি, মর্কট (অর্থ বাঁদর), খড়্গ (অর্থ খাঁড়া, ইংরাজীতে sword) ইত্যাদি দ্রাবিড় ভাষাভুক্ত। পণ্ডিতপ্রবর প্রবোধ চন্দ্র বাগচী মনে করেন 'কপি' শব্দের অর্থ হাতী ও কপি শব্দ দ্রাবিড়ভাষাভুক্ত।[illegible] এতদ্ব্যতীত অণু, কাল, ঘোটক, তিন্তিড়ী, হেরম্ভ ইত্যাদি শব্দসমূহ দ্রাবিড়ভাষার।[illegible] সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, সীসে ধাতুর কারিগরী দ্রাবিড় ভাষী গোষ্ঠীর অবদান। যেমন বলা যায়, বাংলা শব্দ কামার মূলত দ্রাবিড় শব্দ।[illegible] নগরের পত্তন ও নগরায়ন সংস্কৃতি দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান।[illegible] অস্ট্রিকভাষী নরগোষ্ঠীর মতন তাদেরও প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ যদিও তারা বার্লি, যব এসব চাষ করতো। মাটির তৈরী পাত্র ও চাকার সাহায্যে প্রস্তুত মৃন্ময়পাত্র নিঃসন্দেহে আর্যেতরগোষ্ঠীদের অবদান। এই মৃৎশিল্পের উৎসই দ্রাবিড় ভাষীগোষ্ঠীর।[illegible] মেদিনীপুর জেলাতে মৃৎশিল্পের বিকাশ মাটির হাঁড়ি, কলসী, কুঁজো, গ্লাস, ধুনুচি, সড়া, ফুলের টব ইত্যাদিতে এই শিল্পের সংগে যুক্ত সম্প্রদায় কুমোর বা কুম্ভকার এবং যে পাড়ায় তাদের বসতি ও কাজকর্ম চলে তা কুমোর পাড়া নামেই পরিচিত। মাতৃতন্ত্র অর্থাৎ মাতৃকাপূজা, দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, ষষ্ঠীপূজা দ্রাবিড় ভাষীদের কাছ থেকেই গৃহীত। মাটির তৈরী দেব দেবীর পূজা পদ্ধতি, পাথর, বৃক্ষ ও জন্তু পূজাও ওদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।[illegible] উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হনুমান পূজা, নাগ বা মনসা পূজা।[illegible] মেদিনীপুর জেলায় সর্বত্র

মনসা পূজার প্রচলন আছে। মনসা গাছ মনসা বা নাগের প্রতীকরূপে পূজিত হয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে নাগপঞ্চমী পালিত হয়। ঘাটালে মনসা দেবীর মন্দির দেখা যায়। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়, যে কোন পূজার মূলে ভয়। সর্প ভয়, বন্যজন্তু ভয়। দেবতাজ্ঞানে ভয়াবহ জীবজন্তুকে পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা হ'তো, এখনও হয়। দ্রাবিড়ভাষী জনগণের মধ্যে গো পূজা প্রচলিত ছিল।[৮৯] পূজার পদ্ধতি উপকরণ, ফল, ফুল, পাতা, মিষ্টান্ন নিবেদনের সুষ্ঠু পরিপাটি আয়োজন মূলত দ্রাবিড় ভাষী গোষ্ঠীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।[৯০] 'পূজা' শব্দও (তামিল) দ্রাবিড় ভাষাভুক্ত। পু অর্থ ফুল।[৯১] অস্ট্রিকভাষীদের মতো মানুষের মৃত্যুর পর যে আত্মা থাকে এই বিশ্বাস দ্রাবিড় ভাষী গোষ্ঠীর মধ্যেও আছে। আর্যেতরগোষ্ঠীভুক্ত জনগোষ্ঠীদের মধ্যেই ঐ সকল রীতি নীতি, বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। শাঁখা পরার রীতি দ্রাবিড় ভাষীদের অবদান।[৯২] দক্ষিণ ভারতে এখন শাঁখা বিবাহিত স্ত্রীলোকদের প্রতীক চিহ্ন নয়। অস্ট্রিকভাষী স্ত্রীলোকদের শাঁখা ও লোহা পরাই বিবাহের প্রতীক চিহ্ন। মেদিনীপুর জেলার জনগণের মধ্যে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবর্গের বিবাহিত স্ত্রীলোকেরা হাতে শাঁখা ও লোহা পরে। দক্ষিণে শঙ্খ, হীরে, মুক্তা ও স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান প্রস্তর বিখ্যাত।[৯৩] গুটি খেলা, দাবা খেলা, স্থলপথে যাতায়াতের জন্য গরুর গাড়ীর ব্যবহার, সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য এ সকলের উৎপত্তি দ্রাবিড় ভাষী গোষ্ঠীর জীবন চর্চায়।[৯৪] এইরূপ পর্যালোচনায় স্পষ্টই বোঝা যায় মেদিনীপুর জেলা নামে চিহ্নিত ভূখণ্ড প্রাচীনকালে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর আদিম বাসভূমি ছিল। পশ্চিমদিক থেকে আর্যভাষী জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের ফলে ও জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ফলে বঙ্গের তথা মেদিনীপুর অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হতে থাকে। একসংগে বসবাসের ফলে একে অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত হ'তে থাকে। আবার ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় সমাজের পরিকাঠামোতে উপজাতি গোষ্ঠীকে ও নিম্নবর্গীয় জনগণকে একটু উচ্চ পর্যায়ে স্থান দিতে আরম্ভ করলো। ফলে আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় সকল পর্যায়েই মিশ্র সংস্কৃতির রূপ প্রতিভাসিত হ'লো। বহুবিধ সংস্কৃতির নিরীক্ষায় পরিশেষে এ কথাই বলা যেতে পারে মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতিতে আর্যেতর বিশেষ করে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিই বহুলাংশে বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রলেপে এক অপূর্ব মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে।

মেদিনীপুর জেলার স্থাপত্য, ভাস্কর্যেও এই মিশ্র শিল্প শৈলীর রূপ পরিস্ফুট। মেদিনীপুর জেলায় অজস্র মন্দির লক্ষ্য করা যায়। কোথাও চারচালা, আটচালা বা রত্নমন্দির, কোথাও ওড়িশি শিল্পশৈলীর প্রভাবে শিখর মন্দির, মসজিদ ও চার্চ্চ নির্মিত হয়েছে। ভাস্কর্য রূপায়ণে পাথরের খোদাই কার্য পোড়ামাটির টেরাকোটার কাজ ও ষ্টুকো অর্থাৎ চুণ সুড়কি জমিয়ে মূর্তি তৈরী করা হয়েছে। সুপ্রাচীন যুগের অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষী ও আর্য ভাষাভাষী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিলিত স্রোত মধ্যযুগেও প্রবহমান। মধ্যযুগে ইসলাম ও পরবর্তীকালে ইউরোপীয় সংস্কৃতিও এই স্রোতে এসে মিশেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য ও মিলনের সুর ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত। বিবাদ ও সংঘর্ষে সংস্কৃতি বিকৃত হয় নাই। ইতিহাসবিদ্ অধ্যাপক

নীহার রঞ্জন রায়ের উপলব্ধিই উদ্ধৃত করলাম 'ইতিহাসের আবর্তচক্রে বারবার নূতন নূতন জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংগে বিচিত্ররূপে তাহাদের বিরোধ-মিলন ঘটিয়াছে, আজও ঘটিতেছে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। চলমান প্রবাহ, বিরুদ্ধ প্রবাহ, সমন্বিত প্রবাহ ইহাই জীবনের গতিধর্ম।'' এই ধর্মই জীবনীশক্তি, প্রাণশক্তি। এই সমন্বিত সংস্কৃতির রূপই প্রতিভাত হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারততীর্থ কবিতার ছত্রে ছত্রে

তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তার বিচিত্র সুর।।

সূত্রনির্দেশ

১। সম্পাদক রায়, বি ঃ সেন্সাস ১৯৬১, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস্ হ্যান্ডবুক, মিদ্‌নাপুর, ভল্যুম ওয়ান, পৃষ্ঠা ৮, কলিকাতা, ১৯৬৬।

২। মেদিনীপুর জেলা পরিষদ্ থেকে সংগৃহীত।

৩। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার; বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে।, পৃ ঃ ২৮৪, ২৯০-৯১, কলিকাতা, ১৯৭৫।

৪। ঘোষ, বিনয়; পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ঃ ১৯৯-২০৩, কলিকাতা, ১৯৭৮; ভট্টাচার্য, তরুণদেব; মেদিনীপুর, পৃ ঃ ৫০, কলিকাতা, ১৯৭৯, হান্টার, ডবলু ডবল্যু, এ ষ্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল, ভল্যুম থার্ড, রিপ্রিন্টেড, ১৯৭৩; এল.এস.এস, ও ম্যালে, বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, মিদনাপুর ১৯১১।

৫। ভট্টাচার্য, তরুণদেব, মেদিনীপুর, পৃ ঃ ৫৯-৬৬ বিজলী হাবার্ট, ট্রাইবস এ্যাণ্ড কাস্টস্ অব বেঙ্গল, ভল্যুম টু, পৃ ঃ ২৭৩-৭৪, ৩৩৩ ইত্যাদি কলিকাতা, ১৯৮১

৫ক। ঘোষ বিনয় ঃ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, (সমগ্র খণ্ড), পৃ ঃ ৩৮৪-৮৫, কলিকাতা, ১৯৫৭

৬। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯১

৭। অনুবাদক বাগচী প্রবোধ চন্দ্র; প্রি এ্যারিয়ান এ্যাণ্ড প্রি দ্রাবিডিয়ান ইন ইন্ডিয়া অব সিলভ্যান লেভি, প্রিজুলুস্কি এ্যাণ্ড আদার্স, কলিকাতা, ১৯২৯; চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার ঃ ওরিজিন অব দি ডেভলপমেন্ট অব বেঙ্গলি ল্যানগুয়েজ, ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৫; ইন্দো এ্যারিয়ান এ্যাণ্ড হিন্দি, কলিকাতা, ১৯৬৯

রায় নীহার রঞ্জন ঃ বাঙালীর ইতিহাস রিপ্রিন্ট ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮০; বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয় কুমার ঃ পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম, কলিকাতা ১৯৮০; সেন সুকুমার ঃ বাংলার স্থান নাম, কলিকাতা, ১৯৮০; এন হেমব্রম ঃ অস্ট্রিক সিভিলাইজেসন অব ইন্ডিয়া-প্রি বেদিক খেরওয়াল সিভিলাইজেসন, কলিকাতা ১৯৮২, মজুমদার রমেশচন্দ্র ঃ হিস্ট্রি অব

এ্যানসিয়ান্ট বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৭১; গোস্বামী কৃষ্ণপদ : নন্ এ্যারিয়ান এলিমেন্টস্ ইন দি প্লেস নেম্স্ অব বেঙ্গল (ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টারলি ভল্যুম পঞ্চদশ, ১৯৩৯) ডিস্গাইস্ড্ কম্পাউণ্ডস্ ইন দি প্লেস নেম্স্ অব বেঙ্গল (বুলেটিন অব দি ঢাকা কলেজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ভল্যুম বিংশ, ১৯৬০)।

মুখোপাধ্যায় শঙ্করানন্দ : দি অস্ট্রিকস্ অব ইন্ডিয়া—দেয়ার রিলিজন এ্যাণ্ড ট্রাডিসন্স্ : কলিকাতা, ১৯৭৫।

৮। বাগচী প্রবোধচন্দ্র : পূর্বোক্ত, পৃ : XIX-XXIX; চট্টোপাধ্যায় সুনীতি কুমার : ওরিজিন অব দি ডেভলাপমেন্ট অব বেঙ্গলি ল্যানগুয়েজ, পৃ : ৬৬-৬৭ ইন্দো এ্যারিয়ান এ্যাণ্ড হিন্দি, পৃঃ ৩৮; বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে পৃ : ৩৫৪; রায় নীহার রঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস : ১ম খণ্ড, পৃ : ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৭-৬৯।

৯। তদেব, রায় নীহার রঞ্জন, পূর্বোক্ত, পৃ : ৫৯, ৬০।

১০। রায়, পূর্বোক্ত, পৃ : ৬০।

১১। রায়, পূর্বোক্ত, পৃ : ৬০; চ্যাটার্জী, সুনীতিকুমার, ভারত সংস্কৃতি, পৃ : ৯৭, কলিকাতা, বঙ্গাব্দ, ১৩৬৪ (প্রথম সংস্করণ)

১২। তদেব, পৃ : ৬০ ; গোস্বামী কৃষ্ণপদ; প্রি এ্যারিয়ান এ্যাণ্ড পোস্ট এ্যারিয়ান এলিমেন্টস্ ইন দি বেঙ্গলি ল্যানগুয়েজ এ্যাণ্ড বেঙ্গলি টপোনমি (দি ক্যালক্যাটা রিভিউ), পৃঃ ১১৯-৪০; চ্যাটার্জী সুনীতি কুমারঃ ওডিবিএল, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৬৪-৬৭।

১৩। তদেব; চ্যাটার্জী, ওডিবিএল, পৃঃ ৬৫-৬৭; গোস্বামী কৃষ্ণপদ, নন্ অ্যারিয়ান এলিমেন্টস্ ইন দি প্লেস নেম্স্ অব বেঙ্গল (ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়াটারলি, ভল্যুম পঞ্চদশ (XV)) ১৯৩৯ এবং ১, পৃঃ ১৩৭-১৪৩; চট্টোপাধ্যায় অন্নপূর্ণা : গ্রাম নামের বিশ্লেষণী সমীক্ষা, ইতিহাস অনুসন্ধান ১২, সম্পাদনা চট্টোপাধ্যায় গৌতম, পৃঃ ১৪৪-৫০, কলিকাতা, ১৯৯৮।

১৪। দাশগুপ্ত শশিভূষণ বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, ৫০ নং চর্যা, শবরপাদে, পৃঃ ১১৭, কলিকাতা, ১৩৭৬।

১৫। রায় নীহার রঞ্জন : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮, বাগচীঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ XVI, XXII, ৭, ২৮, ৩০, ১১; চ্যাটার্জী, ইন্দো এ্যারিয়ান এ্যাণ্ড হিন্দি, পৃঃ ৩৮, ৭৪, ৩৬, কলিকাতা, ১৯৬৯।

১৬। রায় নীহার রঞ্জন : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৯, বাগচী পূর্বোক্ত, পৃঃ XVI, XXII, 7, 28, 30; চ্যাটার্জী : ইন্দো এ্যারিয়ান এ্যান্ড হিন্দি, পৃঃ ৩৮, ২৫।

১৭। ক্যাম্পবেল, সানতালি ডিকসেনারি।

১৮। রায়, বাগচী, চ্যাটার্জী, পূর্বোক্ত

১৯। তদেব; মজুমদার রমেশচন্দ্র; বাংলা দেশের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০, কলিকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

২০। তদেব।

২১। তদেব।

২২। রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮, বাগচী, পূর্বোক্ত।

২৩। তদেব।

২৪। রায় নীহার রঞ্জন : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৯, ৭৪-৭৬; রায় সমরেণ : দি রুটস্ অব দি বেঙ্গলি কালচার, পৃঃ ১০-১৩, কলিকাতা, ১৯৮২; রিজলে হাবার্ট : দি ট্রাইব্স এ্যাণ্ড কাস্টস্ অব বেঙ্গল, ভল্যুম টু, পৃঃ ২৩২-৩৩, কলিকাতা, ১৯৮১ বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয় কুমার : বাঁকুড়ার মন্দির, পৃঃ ২৪-৪০; কলিকাতা; ডালটন, ই.ট, ডেসক্রিপটিভ এথনোলজি অব বেঙ্গল পৃঃ ২২৩-২২৪ (সিং বোঙার জন্য) কলিকাতা, ১৯৭২, ১৯৭৩ রিপ্রিন্ট।

২৫। চট্টোপাধ্যায়, ভারত সংস্কৃতি, পৃঃ ৯৪, কলিকাতা, ১৩৭০ সাল (জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য) , রায়, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৬, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯৮-৮৯৯

২৫ক রায়, তদেব।

২৬। দাশগুপ্ত শশিভূষণ : পূর্বোক্ত পৃঃ ১১৯।

২৬ক। রিজলী, এইচ, এইচ : ট্রাইব্স্ এ্যাণ্ড কাস্ট্স্ অব বেঙ্গল, ভল্যুম টু, পৃঃ ২২৯, কলিকাতা, ১৯৮১।

২৭। দাশ.এস.আর : ফোক রিলিজেন অব বেঙ্গল -এ স্টাডি অব দি ব্রত রাইট্স্, পার্ট ওয়ান, নং ১, পৃঃ ১, ২, ১১, ১৩, কলিকাতা, ১৯৫৩, ফোক রিচুয়্যাল ড্রইংস অব বেঙ্গল, পৃঃ ১-৫, কলিকাতা, ১৯৫৩-৫৪ (আলপনা, লক্ষ্মীপুজা, ব্রতকথার জন্য); সেন ক্ষিতিমোহন : হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ, পৃঃ ১৬ (আলপনার জন্য), কলিকাতা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ)।

২৭ক। চট্টোপাধ্যায় তুষার : মেদিনীপুরের ভীমপূজা ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা (বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ, ১৯৭৪); ভট্টাচার্য, মেদিনীপুর, পৃঃ ৯৪, ৯৫,৯৬।

২৮। বি.সি.লঃ ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৭৫, ৬৬৯।

২৮ক। চট্টোপাধ্যায় ক্ষিতিশ প্রসাদ : ধর্ম ওয়ারশিপ, জারন্যাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ৮, ১৯৪২। ভট্টাচার্য পূর্বোক্ত পৃঃ ১০০-১০৬; ভট্টাচার্য আশুতোষ : ধর্ম ওয়ারশিপ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল; ঘোষ, বিনয়: পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি, পৃঃ ৩৮৪, ৩৯২-৯৫ কলিকাতা, ১৯৫৭ (সমগ্র)।

২৮খ। রিজলী, এইচ, এইচ : ট্রাইব্স্ এ্যাণ্ড কাস্টস্ অব বেঙ্গল, ভল্যুম টু, পৃঃ ২৩৩।

২৯। দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত পৃঃ ১১৭, ১২২, ১২৩, ১২৬, ১১৯।

২৯ক। হেম্ব্রম, এনঃ অস্ট্রিক সিভিলাইজেসন অব ইন্ডিয়া পৃঃ ৩০-৩১, কলিকাতা, ১৯৮২; বাগচী, পূর্বোক্ত পৃঃ XVI-XXII, ৭, ২৮, ৩০ ff.

৩০। রায় নীহার রঞ্জন : পূর্বোক্ত; চ্যাটার্জী সুনীতি কুমার : ওডিবিএল, পূর্বোক্ত; গোস্বামী কৃষ্ণপদ : ডিসগাইসড় কম্পাউণ্ডস্ ইন দি প্লেস নেম্স্ অব বেঙ্গল, (বুলেটিন অব দি ঢাকা কলেজ, রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ভল্যুম বিংশ [XX], ১৯৬০) পৃঃ ৩৫৭-৩৬৩।

৩১। তদেব, চ্যাটার্জি, ওডিবিএল, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ২৫৫, ২৬৭, ৪৩৯, ৫২১, ৪৮১, ৫৪৪, ৪৯৫, ৪৬৬, ৫১৬ ইত্যাদি।

৩২। রায়; পূর্বোক্ত পৃঃ ৬২; চ্যাটার্জী, ওডিবিএল, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৮২-১৭৮, ৪২ (মর্কট এর জন্য)।

৩৩। বাগচী, প্রবোধচন্দ্র ঃ ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়াটারলি, ১৯৩৩, পৃঃ ২৬১; মজুমদার, রমেশচন্দ্র ঃ হিস্ট্রি অব এ্যানসিয়েন্ট বেঙ্গল, পৃঃ ৩৯৯, কলিকাতা, ১৯৭১।

৩৪। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার ঃ বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩৫৪।

৩৫। বাগচী, পূর্বোক্ত, তদেব; চট্টোপাধ্যায়, ভারত সংস্কৃতি পৃঃ ২০-২১, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬৪; চ্যাটার্জি, ইন্দো এ্যারিয়ান এ্যাণ্ড হিন্দি, পৃঃ ৩৮, ৪৭ ইত্যাদি।

৩৬। তদেব। চট্টোপাধ্যায় ভারত সংস্কৃতি পৃঃ ২১ (এই ধরনের অনুসন্ধান খুঁটিনাটির সংগে কাল্ড্ওয়েলের পর অধ্যাপক পি.টি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার করেছেন)

৩৭। রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৬; স্লাটার, দ্রাবিডিয়ান এলিমেন্ট্স্ ইন ইন্ডিয়ান কালচার', পৃঃ ৮৩-৯৬; ম্যান ইন্ ইন্ডিয়া, ভল্যুম ৭, ১৯২৭, পৃঃ ৫৬; সেন, ক্ষিতিমোহন ঃ হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ পৃঃ ১৩ (মাতৃকাতন্ত্র দেবী পূজা ইত্যাদির জন্য) বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৮৭।

৩৮। তদেব।

৩৯। শাস্ত্রী, কে.এম ঃ এ্যারিয়ান্স্ এ্যাণ্ড দ্রাবিডিয়ানস্, পৃঃ ৭৩, বম্বে, ১৯৬৭; চ্যাটার্জী, ইন্দো এ্যারিয়ান্স এ্যাণ্ড হিন্দি, পৃঃ ৪৭, কলিকাতা, ১৯৬৯ রিপ্রিন্টেড।

৪০। তদেব, পৃঃ ৬৬-৬৭, চ্যাটার্জী, ইন্দো এ্যারিয়ান এ্যাণ্ড হিন্দি, পৃঃ ৪৭, ভারত সংস্কৃতি, পৃঃ ১১ (২য় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩৭০)

৪১। চ্যাটার্জী সুনীতি কুমার ঃ কীরাত জন কৃতি, পৃঃ ৮, কলিকাতা, ১৯৫০; ভারত সংস্কৃতি, পৃঃ ১১, (২য় সংস্করণ বঙ্গাব্দ ১৩৭০) ;শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬-৬৭।

৪২। শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২-৬৩; বাগচী, পূর্বোক্ত; চ্যাটার্জী, ভারত সংস্কৃতি, পৃঃ ২৪, কলিকাতা

৪৩। শাস্ত্রী. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২-৬৩।

৪৪। বাগচী পূর্বোক্ত, পৃঃ XVI, XXII, ৭, ২৮, ৩০ ff. রায় নীহার রঞ্জন, পূর্বোক্ত পৃঃ ৭১।

৪৫। রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০।

শূদ্রায়ন ঃ ঐতিহাসিক বিতর্কের ক্রমবিকাশ

স্বাতী সেনগুপ্ত

শূদ্রায়ন সম্পর্কিত যে কোন গভীর আলোচনায় প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস রচনার আধুনিক প্রেক্ষিতের বিবেচনা একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত। প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থা নিয়ে ভরতে আধুনিক আলোচনার সূত্রপাত, বহুলাংশে ঘটেছিল ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উদ্যোগে, কারণ তারা অনুভব করে ছিলেন যে, ভারতের সামাজিক তথা ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে ভারতীয়দের শাসন করা কঠিন। এই উপলব্ধি প্রথম উচ্চারিত হয় ১৭৭৬ সালে 'A code of Gentoo laws' (London) গ্রন্থের ভূমিকায়, যেটি ছিল প্রাচীন ভরতের সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে লিখিত অন্যতম প্রথম ইংরেজী প্রকাশনা। এতে বলা হয়েছিল যে, ভারতের বাণিজ্যিক গুরুত্ব এবং বাংলায় আধিপত্য স্থাপনের সুবিধা কেবলমাত্র অর্জিত হতে পারে বেশ কিছু মৌলিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্য দিয়ে, যেগুলি কোনভাবেই বিজেতা শাসকদের স্বার্থ এবং আইনের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাবে না।[১] এরপর ১৭৯৪ সালে আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ব চর্চার পথিকৃৎ হিসাবে গণ্য স্যার উইলিয়াম জোন্স্ 'মনুস্মৃতি' অনুবাদ করতে গিয়ে বলেন, ভারতীয় সমাজের আদিপর্ব সম্পর্কে অধ্যয়ন শুধুমাত্র ভারতকে বুঝতেই সাহায্য করবে না, এই উদ্যোগ ইংল্যাণ্ডের জ্ঞানভাণ্ডারেরও মূল্যবান সংযোজন ঘটাবে।[২]

স্বাভাবিকভাবেই এরপর থেকে ব্রিটিশ প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের রচনায় ভারতের সামাজিক ইতিহাস গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিফলিত হতে শুরু করে। ১৭৭৮ সালে সেই ধারা অনুসরণ করে ব্রিটিশ পুরাতত্ত্ববিদ কোলব্রুক তাঁর রচনায় ভারতীয় সমাজের শ্রেণী বিন্যাসের অস্তিত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।[৩]

উনিশ শতকেও সামাজিক ইতিহাস রচনার ধারা অব্যাহত থাকে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ১৮১৮ সালে জেমস মিল তাঁর 'History of India' গ্রন্থে ইতিপূর্বে প্রকাশিত রচনাগুলির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ভারতীয় চতুবর্ণ প্রথার সমালোচনা করতে গিয়ে উচ্চতর বর্ণ কর্তৃক নিম্নতর বর্ণের উপর শোষণ ও নিপীড়নের অস্তিত্বের কথা বলেন এবং এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসাবে মিল শূদ্রদের উপর অত্যাচারের কথা বলেন। তিনি আরো বলেন যে, ভরতীয় সমাজব্যবস্থার এই ধ্বংসাত্মক দিকের তীব্রতা অন্য কোন জাতির মধ্যে এতটা দেখা যায় না, যা ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত সমানভাবে প্রবাহিত।[৪] ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শূদ্রদের অবস্থান সংক্রান্ত মিলের বক্তব্যের পাশাপাশি কৌতুহলজনকভাবে একই

তথ্যসূত্রকে ব্যবহার করে ১৮৪১ সালে অপর ব্রিটিশ পণ্ডিত এলফিনস্টোন সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যান্য কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতায় দাসদের যে শোচনীয় অবস্থা ছিল তার তুলনায় ভারতে শূদ্রদের অবস্থা ছিল অনেক উন্নত। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে কোন দাসব্যবস্থা নেই।[৫] যদিও বাস্তবে উনিশ শতকের আধুনিক ভারতেও প্রাচীন ভারতের অনেক সামাজিক প্রথাপদ্ধতি অপরিবর্তিত ছিল (যেমন-সতীদাহ, আজীবন বৈধব্য, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি), যেগুলির প্রতিকারের জন্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ আধুনিক ভারতীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও সমাজসংস্কারকগণ উদ্যোগী হয়েছিলেন।

১৮৪৭ সালে রোট আভাস দেন যে, সম্ভবতঃ শূদ্ররা ছিলেন আর্যসমাজ ও সংস্কৃতির চতুঃসীমার বাইরে।[৬] শূদ্রদের এই সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে এরপর থেকে ম্যাকডোনেল ও কীথ, সেনার্ট, রমেশচন্দ্র মজুমদার, এন.কে.দত্ত, ঘুরে, ডি. আর. ভান্ডারকরের মতো ঐতিহাসিকেরা মনে করতে শুরু করেন যে, ব্রাহ্মণ্য সমাজের এই চতুর্থ বর্ণটি মূলত সেই অনার্য-জনগোষ্ঠী নিয়েই তৈরী, যে কারণে আর্য বিজেতারা তাদের নিম্ন অবস্থায় নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু এলফিনস্টোন ভারতীয় শূদ্রদের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তে তাদের উন্নত অবস্থার উল্লেখ করলেও একথা মনে করার কারণ আছে যে, মিলের বক্তব্যই ইংরেজসহ পরবর্তী পাশ্চাত্য গবেষকদের অধিকতর পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। মোটকথা, মিলের পরবর্তীকালের গবেষণার ধারায় শূদ্রদের সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা ও তাদের সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নটি বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হপ্‌কিন্‌স এর কথা বলা যায়। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থে হপ্‌কিন্‌স বলেন যে, ১৮৬০ সালে একজন আমেরিকান গৃহভৃত্যের বা দাসের যে অবস্থা ছিল, ভারতে শূদ্রদের অবস্থা তার চেয়ে পৃথক ছিল না।[৭] এই প্রায় একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় অপর জার্মান পন্ডিতের রচনায়। হপ্‌কিন্‌সকে সমর্থন করে হিল্লেব্রান্‌ডট ১৮৯৬ সালে বলেন যে, শূদ্রদের অবস্থান বিচার করতে হবে প্রাচীন পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার দাসদের সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে, পরবর্তীকালের কোন ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নয়।[৮] এই গবেষণা পদ্ধতিকে সমর্থন করে ফরাসী লেখক সেনার্ট ১৮৯৬ সালেই উল্লেখ করেন যে, ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরাই পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার নিরিখে ভারতীয় শূদ্রদের ভ্রান্ত বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন, যদিও কোনভাবেই ভারতীয় ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে চরিত্রগত বিচারে তুলনীয় নয়।[৯] অবশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ জাতিগত পার্থক্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে ভারতের জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্যে অতিরঞ্জন সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত।

কিন্তু মতামতগুলির এই পরস্পর বিরোধিতার পটভূমিকায় আধুনিক ভারতীয়

সামাজিক ইতিহাস গবেষকরা যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন (যেমন কেত্‌কার, আর.সি দত্ত, ঘুরে ইত্যাদি) তাতে মূলতঃ তৎকালীন জরুরী দেশজ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতটি ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, বিশ শতকের প্রথমের জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সমাজ সংস্কারের যে জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তা নিয়ে সংস্কারক ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মধ্যে যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয় সেই বাস্তবতার দ্বারা চালিত হয়েই উপরিউক্ত লেখকেরা নিজেদের ব্রিটিশ বিরোধী মতামত ব্যক্ত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেত্‌কার নিগ্রোদের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্যবাদের অভিযোগে ইউরোপীয় লেখকদের অভিযুক্ত করেন।[১০] কিন্তু জাতীয়তাবাদী প্রয়োজনে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রানুমোদিত শ্রেণীবিন্যাসগুলিকে সমর্থন করতে গিয়ে তাঁরা এই হাস্যকর যুক্তি দেখাতে বাধ্য হন যে, নানা অত্যাচার, নিপীড়ন ও শ্রেণীগত অবনমন সত্ত্বেও শূদ্র সমাজ সুখে জীবনযাপন করতো।

পাশ্চাত্য গবেষণাপদ্ধতির কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দিক থাকলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁরা মূলতঃ সমাজের উচ্চতর বর্ণ সম্পর্কেই তাঁদের গবেষণা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। দৃষ্টান্ত হলো, উনিশ শতকের শেষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সামাজিক প্রাধান্য নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে মুহর এর কাজ[১১], প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়দের অবস্থান নিয়ে হপ্‌কিন্‌স এর বিস্তৃত গবেষণা (১৮৮৯)[১২] এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সমাজব্যবস্থা নিয়ে বলতে গিয়ে মূলতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শ্রেষ্ঠী বা গৃহপতিদের সম্পর্কে ফিক্‌ এর প্রশংসনীয় রচনা (১৮৯৭)।[১৩] রামশরণ শর্মা মনে করেছেন সমাজের নিম্নবর্ণ তথা শূদ্রদের নিয়ে পন্ডিতমহলের এই আগ্রহের অভাবকে তাঁদের নিজস্ব উচ্চতর সামাজিক শ্রেণী অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।[১৪]

এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক গ্রন্থগুলির মধ্যে উনিশ শতকের লেখায় মূলতঃ শূদ্রদের সামাজিক অবস্থান নিয় আলোচনা হলেও বিশ শতকের রচনায় শূদ্রদের নিয়ে গবেষণায় এক নতুন মাত্রার সংযুক্তি চোখে পড়ে। শূদ্রদের নিয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ যদিও ক্ষুদ্র, রচনা প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে[১৫] ভি.এস. শাস্ত্রীর মাধ্যমে, যিনি 'শূদ্র' শব্দটির দার্শনিক ভিত্তি আলোচনা করেন। ১৯২৩ সালে তিনি দেখান, শূদ্ররা বৈদিক যজ্ঞ করতে পারতো।[১৬] ১৯৪৭ সালে উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ধর্মসূত্রে বর্ণিত শূদ্রদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেন।[১৭] ১৯৫০ সালে রুশ লেখক জে.এফ.ইলিন দেখান যে, ধর্মশাস্ত্র সাক্ষ্য দেয় যে শূদ্ররা দাস ছিলনা।[১৮] এ প্রসঙ্গে ১৯৪৬ সালে বি.আর. আম্বেদকর দ্বারা প্রকাশিত 'Who were the Sudras' নামে একটি গ্রন্থের কথা বলা যায়, যেখানে তিনি এমনকি শূদ্রদের উচ্চ সামাজিক অবস্থানের কথা বলেন, যেহেতু মহাভারতের শান্তিপর্বের একটিমাত্র অনুচ্ছেদে 'শূদ্র পৈজবন' কর্তৃক যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা আছে, যার মাধ্যমে তিনি শূদ্রদের মূলতঃ ক্ষত্রিয় হিসাবে ঘোষণা করেন। আম্বেদকর শূদ্রদের ক্ষত্রিয়বর্ণভূক্ত করার স্বপক্ষে বলেছেন যে, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংঘাতের ফলে ক্ষত্রিয়দের অবনমিত করা হয় শূদ্র পর্যায়ে এবং

যার ফলে শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণরা তাঁদের প্রতিপক্ষদের উপনয়নের অধিকার থেকেও বঞ্চিত করেন।[১৯]

নিরপেক্ষ বিচারে এই মতামতের পেছনে কোন তথ্যগত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ কেবলমাত্র উপনয়ন সংস্কার হারানোর ফলেই আর্য-ক্ষত্রিয়রা শূদ্রে পরিণত হয়েছিল এমন কথা বিশ্বাস করা সহজ নয়। বরং বলা যেতে পারে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টির ফলেই আর্যরা নিম্নতর বর্ণে নেমে গিয়েছিলেন। তাছাড়া শূদ্রগণ প্রকৃতপক্ষে ছিলেন প্রাচীন ভারতের এমন একটি সামাজিক শ্রেণী যারা নানা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনের মিশ্রণের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমজীবী সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

১৯৬৬ সালে বি.এন.এস. যাদব তাঁর রচনায়[২০] শূদ্রশ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা ও তাদের বিবিধ অধিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। গুপ্তোত্তর কালে উত্তর ভারতে কৃষকদের অবস্থানের বর্ণনা প্রসঙ্গে শূদ্রদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি শূদ্রদের অস্থায়ী কৃষক রূপে অভিহিত করেছেন।[২১] তিনি আরো বলেছেন, চাতুর্বর্ণ প্রথা সম্বলিত গুপ্তোত্তর সমাজব্যবস্থায় শূদ্র-কৃষক এবং ভূমি শ্রমিকরা সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করতো। মেধা তিথিকে অনুসরণ করে যাদব শূদ্রদের বৈধ অধিকারের প্রশ্নের সমাধানে দেখাতে চেয়েছেন যে, উক্ত সময়ে শূদ্রদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি অর্জনের স্বাধীনতা ছিল এবং তাকে কখনোই 'দাস' দের সঙ্গে তুলনা করা বা একাসনে বসানো উচিত নয়। মধ্যযুগীয় ইউরোপের পরাধীন দাসদের সঙ্গে প্রাচীন ভারতে তথা আদি-মধ্যযুগীয় ভারতে শূদ্র শ্রমিকদের অবস্থানকে কখনোই এক করে দেওয়া যেতে পারে না।[২২]

অধ্যাপক রামশরণ শর্মার ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত রচনায় শূদ্রদের সামগ্রিক সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা, তাদের বস্তুগত জীবন এবং সর্বোপরি সমাজের উচ্চতর বর্ণগুলির সঙ্গে শূদ্রদের সামাজিক সম্পর্ক, এককথায় প্রাচীনযুগ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শূদ্রদের অবস্থানের বিভিন্ন পর্যায় প্রতিফলিত।[২৩] রামশরণ শর্মা শূদ্রদের সামাজিক অবস্থানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষিতটিও আলোচনা করেছেন। ১৯৮০ সালে তিনি দেখিয়েছেন যে, অথর্ববেদ পর্বের শেষ দিকে কর্মবিভাজন সামাজিক স্তর বিভাজনে পরিণত হতে শুরু করে। তিনি মনে করেন, শূদ্র জনগোষ্ঠী বা আর্যদের যে অংশ দাসসুলভ কাজ করতেন, তাঁদের স্থান নির্ধারিত হল চতুর্থবর্ণে।[২৪] শর্মার মতো ওল্ডেনবার্গও[২৫] শূদ্রদের উচ্চতর সামাজিক অবস্থানের স্বপক্ষে বলেন, গাঙ্গেয় এলাকায় আর্য শূদ্রদের বংশধররা সংখ্যাবৃদ্ধি করতে শুরু করলে বৈদিক যুগ থেকেই বিভিন্ন কুলের বহু আদিবাসী, শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অথর্ববেদ শূদ্রদের আর্য গোষ্ঠীরই একটি অংশ হিসাবে চিহ্নিত করে। অবশ্য সমাজের চতুর্থবর্ণের 'শূদ্র' নামকরণ কোন বিজিত জনগোষ্ঠী থেকেই হয়েছে বলে শর্মা মনে করেন।

১৮৮১ তে হপ্‌কিন্‌স শূদ্রদের দাস বলে অভিহিত করলেও, রামশরণ শর্মা তার সঙ্গে

একমত হননি। ১৯৯০ তে[২৬] শর্মা বলেন যে, শূদ্রদের একটিমাত্র অংশ বৈধভাবে দাস হয়ে থাকতে পারে কেননা প্রাচীন ভারতে দাসের ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত মাত্রায়। তাঁর মতে, শূদ্ররা কাজ করতেন দাসদের বিকল্পরূপে, সামাজিক সংকট শূদ্রদের দাসসুলভ অবস্থার প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনলেও তাদের মধ্যে দাসত্বের উপাদান থেকেই গিয়েছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার, মৌর্যযুগে ও বিশেষ করে গুপ্তযুগে শূদ্রদের বেশ কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার দান করা হয়েছিল, সমাজে উচ্চবর্ণের সঙ্গে তারা সমান মর্যাদা অর্জন করেছিল। আসলে শূদ্রদের দমিয়ে রাখার পেছনে বর্ণভেদ প্রথা, কর্মবাদ ও দেবনির্দিষ্ট জাতিবর্ণপ্রথার কঠোরতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করেছিল।[২৭]

শূদ্রদের অবস্থান, তাদের সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নটি আলোচনা করতে গিয়ে শর্মা ১৯৯৬ সালে নতুন কিছু তত্ত্বের অবতারণা করেন।[২৮] এ পর্যন্ত গবেষণার ধারায় শূদ্রদের উৎপত্তি ও তাদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা থাকলেও রামশরণ শর্মা এই আলোচনাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে প্রতিস্থাপন করেছেন। প্রাচীন ভারতের জটিল সমাজব্যবস্থার মূল তিনি খুঁজেছেন রাষ্ট্রের ভিত্তি ও তার উৎপত্তির মধ্যে। রাষ্ট্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সমাজব্যবস্থা এমন একটি সামাজিক ক্রমকাঠামোর দ্বারা নির্ধারিত ছিল যার সদস্যরা সকল দিক দিয়েই একে অন্যের সঙ্গে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে। বলাবাহুল্য, শর্মা মনে করেন এই সামাজিক ক্রমকাঠামো বর্ণবিভাজিত ভারতীয় সমাজে পার্থক্য সূচিত করেছিল, বিশেষ করে মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় বুদ্ধের সময়কালে। পার্থক্য কেবলমাত্র সামাজিক দিক থেকেই প্রযোজ্য ছিল না, উপরন্তু তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় দিক থেকেও পার্থক্য সূচিত করেছিল।[২৯] তাঁর মতের সমর্থনে তিনি দেখিয়েছেন যে, নিম্নবর্ণের মানুষরা উচ্চবর্ণ থেকে স্ত্রী পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারতো না।[৩০] শর্মা আরো উল্লেখ করেছেন যে, শূদ্রবর্ণের লোকেরা সরকারী কোন উচ্চপদে নিয়োজিত হতেন না।[৩১] তাঁর মতে, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনও এই বর্ণভেদের বিষয়ে পার্থক্য সূচিত করেছিল। কোন ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করতে পারতো না। সমাজে বর্ণই সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করতো।[৩২] তিনি আরো বিশদে গিয়ে বলেছেন যে, শূদ্রদের বৈদিক যাগযজ্ঞ করার, এমনকি বেদপাঠ করার অধিকার ছিল না। এছাড়াও তারা নানা ধরনের দুর্বলতাজনিত কারণে কষ্টভোগ করতো।[৩৩] ১৯৯৬ সালে শর্মা আরো বলেন যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীর প্রাধান্য বৈশ্য ও শূদ্রদের সামাজিক অবস্থানকে অনেকটাই অবদমিত করে রেখেছিল।[৩৪] সাহিত্যিক সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে শর্মা বলেছেন যে, বৈশ্য এবং শূদ্ররা যারা নিম্ন বর্ণসম্ভূত ছিলেন তারা মূলতঃ ছিলেন ভারতের নিজস্ব অধিবাসী। এ প্রসঙ্গে শর্মা 'ব্রাত্য' দের কথা বলেছেন যারা ইন্দো-আর্য ভাষায় কথা বললেও বেদপাঠ করত না, মূলতঃ যারা ছিল গ্রাম্যমানুষ। বৈদিক যুগের ব্রাত্যদের শূদ্রদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, যারা বেদপাঠ করত না।[৩৫] বলাবাহুল্য, প্রাচীন ভারতে ব্রাত্যদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল যদিও এই বিভাগ বৈদিকোত্তর যুগে বা সূত্রযুগে প্রযোজ্য ছিল। সমাজের এই ব্রাত্য সম্প্রদায় চতুর্থ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পূর্বভারতে

বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সামাজিক অসাম্যের অবসান ঘটাতে যদিও প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল কিন্তু কোন কারণই শূদ্রদের দাসসুলভ অবস্থায় সারগত পরিবর্তন আনতে পারেনি।

সুতরাং এ পর্যন্ত গবেষণার ধারাগুলি আলোচনা করে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় প্রাচ্য তত্ত্ববিদগণ ভারতের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে চাতুর্বর্ণের মধ্যে সর্বনিম্ন বর্ণ, শূদ্রের অবস্থান বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন এবং অন্যান্য উচ্চতর বর্ণগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের নানাদিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। এই আলোচনার ধারাবাহিকতা বিশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। এই ধারাবাহিক আলোচনার গতিপ্রকৃতিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, শূদ্রদের সামাজিক অবস্থানের চরিত্র নিয়ে বিদেশী লেখকদের সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় লেখকদের এবং বস্তুবাদী ইতিহাস চর্চাকারীদের দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তাছাড়া অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে গবেষণার ধারা যে রকম ছিল, বিংশ শতকে তার সঙ্গে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। শূদ্র সংক্রান্ত গবেষণার ধারা কেবলমাত্র তাদের উৎপত্তি বা সামাজিক অবস্থানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, গবেষণার গতিপ্রকৃতি ক্রমশঃ শূদ্রদের রাজনৈতিক ও আইনগত বৈধ অধিকার, ধর্মীয় প্রাধান্য, অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা ও সমাজে উচ্চবর্ণের সঙ্গে তাদের সমমর্যাদার প্রশ্নেও ছড়িয়ে পড়েছে।

সূত্রনির্দেশ

1. R.S. Sharma, **Light on Early Indian Society and Economy,** Bombay, 1966, pp. 1-3.

2. **Institute of Hindu Law,** Preface, p. XIX. Cf. Discourse of Colebrooke in the first general meeting of the Royal Asiatic Society (15th March, 1823), Essays, i, 1-2.

3. H.T. Colebrooke, **Miscellaneous Essays,** (Ed.) E.B.Cowell, Vol.II, London, 1873, pp. 157-70.

4. James Mill, **The History of India,** London, 1817, i, pp. 166-9, ii, p.166.

5. M.Elphinstone, **The History of India,** London, 1841, pp. 37 and 107.

6. Roth, **Zeitschriftder Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft,** (henceforth ZDMG), Berlin, 1847, vol. I, p 84.

7. E.W. Hopkins, **Mutual Relations of the Four Castes in Many,** leipzig, 1881, p 102.

8. Alfred Hillebrandt, "Brahmanen und Sudras", **Festschrift fur karl Weinhold,** Breslau, 1896, p.57.

9. E. Senart, **Caste in India,** Paris, 1896, pp. 12-13.

10. S.V. Ketkar, **The History of Caste in India,** NewYork, 1909, p.78, fn.3.

11. J.Muir, **Original Sanskrit Texts,** Vol. i, ch IV.

12. E.W. Hopkins, "Position of Ruling Caste in Ancient India", **Journal of American Oriental Society**, Vol. Xiii, Baltimore, 1889, pp. 57-376.

13. Richard Fick, **The Social Organisation in North-East India in Buddha's Time,** Calcutta, 1920.

14. R.S. Sharma, **Sudras in Ancient India,** Delhi, 1958; second revised edition 1980, p.4.

15. V.S.Shastri, **Indian Antiquary,** vol.li, Bombay, 1922, pp-137-9.

16. V.S. Shastri, "The Status of the Sudras in Ancient India", **Viswa Bharati Quarterly,** Vol i, 1923, pp. 268-278.

17. U.N. Ghoshal, **Indian Culture,** Vol.Xiv, Calcutta, 1947, pp. 21-27.

18. J.F. Ilyin, **Vestnik drevnei istorii,** 1950, No.2, pp.94-107.

19. B.r. Ambedkar, **'Who were the Sudras'**? Bombay, 1946, p.239.

20. B.N.S. Yadava, "Secular land Grants of the Post-Gupta Period and Some Aspects of the Growth of Feudal Complex in Northern India," "in D.C. Sircar (ed.), **Land system and Feudalism in Ancient India**, Calcutta, 1966, p. 91.

21. Ibid.

22. Ibid., p.94

23. R.S. Sharma, Op. cit.

24. **Ibid.,** 1980, p. 30-40

25. Oldenberg, **ZDMG,** Vol. li. p. 286.

26. R.S. Sharma, **Sudras in Ancient India,** Delhi, third edition, 1990

27. **Ibid.,** pp. 316-325.

28. R.S. Sharma, **The State and Varna Formation in the Mid-Ganga plains An Ethnoarchaeological View,** Varanasi, 1996.

29. **Ibid.,** pp. 17-19.

30. R.S. Sharma (ed.), **Perspectives in Social and Economic History of Early India,** Delhi, 1983 ; second edition, New Delhi, 1995, pp. 49-60.

31. R.S. Sharma, **Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India,** third edition, Delhi, 1991, Ch. XVI.

32. R.S. Sharma, **Some Economic Aspects of the Caste System in Ancient India,** Patna, 1952.

33. Same as footnote 26. Chapter IV.

34. Same as footnote 28, p. 19

35. **Ibid,** pp. 43-58.

মালাকার জাতির উদ্ভব

চন্দ্রকান্ত মালাকার

১৯০১ সালের সেনসাস্ রিপোর্টে সরকার হিন্দুর বিভিন্ন জাতির সামাজিক স্থান নির্দেশ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এই অভিপ্রায়পূরণ কল্পে ১৯২৫ সাল থেকে নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকলেও সামগ্রিকভাবে মালাকার জাতির উদ্ভব সম্পর্কে কোন গ্রন্থে আলোচনা করা হয় নাই। আমি এই নিবন্ধে মালাকার জাতির উদ্ভব সম্পর্কে একটা অতি সংক্ষেপ ইতিহাস আলোচনা করবো।

মালাকার জাতি সম্পর্কে যে সব তথ্য তা প্রধানতঃ পুরাণ ও স্মৃতি নির্ভর। মালাকার জাতি নবশাক(যাদের হাতে ব্রাহ্মণরা জল গ্রহণ করে[১]) শ্রেণীর অন্তর্গত। যার মধ্যে তিলি, মালাকার, তাম্বুলী, গোপ, নাপিত, গোছালী, কামার ও পুঁটুলী অন্তর্ভুক্ত[২], ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বলা হয়েছে মালাকার জাতি বিখ্যাত ৯টি শিল্পী জাতির অন্যতম এবং বিশ্বকর্মার ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জন্ম।[৩] আবার ময়ূর ভট্টের ধর্মপুরাণে অন্যান্য অনেক পেশা ভিত্তিক জাতির মতো মালাকার জাতির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] বৃহদ্ধর্মপুরাণে মালাকার জাতিকে উত্তম সংকর বিভাগে ফেলা হয়েছে।[৫] আবার ইহাও লক্ষণীয় যে, ভূমি মালী বা ভুঁই মালী (দেওলী, হাঁড়ি ও কোচ মালি) সহ অনেক অনাচরণীয় জাতি নিজেদের মালাকার বলে পরিচয় দিলেও তা ভুল প্রমাণিত।[৬]

মালাকার জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত জাতি কিনা সে সম্পর্কে বিশ্বকোষ সংকলয়িতা প্রাচ্য বিদ্যামহার্নব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রনীত "বাংলার জাতীয় ইতিহাস" গ্রন্থে পৌরাণিক আখ্যায় বলা হয়েছে।[৭] এতে বলা হয়েছে মালাকারের পূর্বপুরুষ মথুরারাজ বংশের সভায় ফুল যোগাত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংশাসুরের নিধনার্থ মথুরাধামে উপস্থিত হয়ে বেশভূষা করবার সময় এক মালাকার বংশের জন্য পুষ্পমালা নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে ডেকে নিজেদের চুঁড়াদেশে ফুলমালা জড়িয়ে দিতে বললেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য মালাকার তখনই মালা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চুঁড়াদেশে জড়িয়ে দিলেন। বাঁধা শক্ত হল না দেখে মালাকার তার নিজের পৈতা হতে কয়েক গাছি সুতা ছিঁড়ে সেই মালা বেঁধে দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখনই সেই জ্ঞানহীন মালাকারকে তিরস্কার করে বললেন, "যেমন তুই পৈতার মর্ম না বুঝে তা ছিঁড়ে ফেললি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অতঃপর তোকে শূদ্রত্ব ভোগ করতে হবে।[৮]

আবার পুরাণ ও সংহিতায় মালাকারকে শূদ্র ও অন্তজঃ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণ ও সংহিতায় বলা হয়েছে যারা গোমাংস ভক্ষণ করে তারাই অন্তজ। এই সব অন্তজ

জাতির সংগে আলাপ করলে স্নান করতে হয়। আবার দেবনাগর অক্ষরে লিখিত বেংগল গর্ভনমেন্টের ১১৫২ নং ব্যাস সংহিতায় যে প্রকৃত পাঠ গৃহীত হয়েছে তাতে মালাকারকে শূদ্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এখানে আরো বলা হয়েছে যে, শূদ্ররা অনার্য নহে।[৯] বলা যায় সংস্কার ক্রিয়াদি লোপের কারণে মালাকার শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।[১০] বলা হয়েছে মালাকার শূদ্রত্ব প্রাপ্ত আর্য জাতি।[১১] আবার আমরা এটাও দেখি যে, বল্লাল সেনের আমল থেকেই মালাকার জাতি সৎ শূদ্রের মর্যাদা পায়।[১২]

মালাকার জাতির 'মালাকার' ছাড়া অন্য পদবী না থাকলেও সাধারণতঃ পশ্চিমবংগের মালাকার জাতির পদবী আছে। এর কারণ এই অঞ্চলের মালাকার পদবী দ্বারা উচ্চশ্রেণীর লোক নিম্নশ্রেণীর লোক বলে মালাকারকে ভ্রম করতে পারে তাই এরা দাস, ঘোষ, দত্ত প্রভৃতি পদবী ব্যবহার করে থাকে।[১৩] আর পূর্ববংগের মালাকারেরা নিজেদেরকে অন্যজাতির থেকে পৃথক করে উল্লেখ করার জন্য সরাসরি মালাকার পদবী ব্যবহার করে থাকে।[১৪] পুরাণে ও বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীতে সুদাম মালাকারের নাম উল্লেখ আছে। সুদাম প্রত্যহ শ্রী কৃষ্ণকে মালা পরাতেন। এজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের খুব প্রিয় পাত্র ছিলেন। সুদাম শ্রী কৃষ্ণের প্রিয়তম সখা বলেও বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত আছে। আর মালাকার জাতি (পূর্ববংগের) এই সুদামের বংশোদ্ভূত বলে নিজদিগকে গৌরবান্বিত ও সম্মানজনক মনে করে থাকে।

মালাকারের জাতীয় ব্যবসা প্রধানতঃ ফুলের মালা গাঁথা ও দেবদেবীর পূজা ও বিবাহাদি শুভকর্মে ব্যবহারের জন্য মালাটোপর; সীঁতি প্রভৃতি নির্মাণ করা। মালাকার জাতি ফুল ব্যবসায়ী জাতি।[১৫] মেরুতন্ত্র বচনে বলা হয়েছে ভূমিতে পতিত বা অন্য কোন ভাবে ফুল অপবিত্র হলে মালাকার দ্বারা সেই ফুল সমর্পিত হলে তা দেবদেবীর পূজার জন্য ব্যবহৃত হবে। আর্য জাতি অনার্য জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করার জন্য যখন দেবদেবীর পূজা করতেন তখন মালাকারেরা ফুল ফোটাত।[১৬] একাজ ছাড়াও মালাকারেরা শোলার দ্বারা মালা, ফুল, পাখী প্রভৃতি কারুকার্যের পরিচায়ক নানাবিধ দ্রব্য তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের কথা বলা হয়েছে তাতে মালাকার টোপর, মালা তৈরী করে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করত।[১৭] সেই সময়কার গ্রামে শিল্পী জাতির বসবাস ছিল,[১৮] এবং মালাকার জাতিকে সমাজসেবক জাতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯]

মালাকার জাতির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ। মালাকারী কাজ দ্বারা এদের জীবন যাপন কোনরকম চলত।[২০] এদের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা অনেক পরে দেখা যায়, এদের আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকার কারণ এরা নিজ পেশা ছাড়া অন্য কোন ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল না। কোন মতে জীবন যাপন যখন নির্বাহ করা গেল না তখন পেশার পরিবর্তন ঘটে। এই জাতি কবিরাজী, বসন্ত চিকিৎসা, বাজীর ও রং এর কাজে যুক্ত হতে থাকে।[২১] আবার এর বেশ কিছু অংশ পান ও সুপারী চাষে নিয়োজিত হতে থাকে। উল্লেখ যে, এই সবকাজে থেকেও এরা নিজের জাতীয় বৃত্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। তবে এরা চরম দারিদ্র্যে পড়লেও কখনো অন্য জাতির দাসত্ব গ্রহণ করেনি।[২২]

মালাকার জাতির শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।[২৩] এর একটি কারণ আর্থিক দুর্বলতা,

অন্যটি হল শুধু নিজ ব্যবসায় নিয়োজিত থাকা। তবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসে। এদের মধ্যে চেতনার অভাবও দেখা যায়। তাই যেসব পরিবারের জীবিকার অন্য পথ আছে তারা শিক্ষার দিকে উন্নতি করতে থাকে। একারণে বর্তমানের মালাকারেরা শিক্ষায় মোটামুটি উন্নতি করেছে। তবে তা নগণ্য। আবার যেসব পরিবারে চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে তারাও শিক্ষার আলো দেখতে শুরু করেছে।

আমি মালাকার জাতির উদ্ভবের মাধ্যমে মালাকার জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করি নাই। বরং বলতে পারি ভারতে সুপ্রাচীন কাল থেকে যেসব ছোট ছোট সম্প্রদায় বর্তমান কাল পর্যন্ত তাদের পেশা ভিত্তিক কাজ করে চলেছে সে সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মালাকার জাতি -চেতনার সংক্ষেপ পদক্ষেপ দিয়েছি মাত্র। মালাকার জাতির আর্থিক ও শিক্ষার দিক যে অত্যন্ত খারাপ তা ভারত সরকার এই জাতিকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে প্রমাণ করে দিয়েছেন। আবার মালাকার জাতির সংখ্যা যে অল্প তা বর্তমানেও প্রতি গ্রামে বা অঞ্চলে একটি / দুটি পরিবার তা কোথাও বা নেই, থেকে প্রমাণিত হয়।

এই আলোচনার মাধ্যমে মালাকার জাতির উদ্ভব সম্পর্কে একটা সামাজিক দিক সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। অতি প্রাচীন কালে এই জাতি যেমন দেবভাগের ফুল সরবরাহক প্রিয় সখা, তেমনি প্রাচীন বাংলায় পাল সেন যুগ সহ বিভিন্ন সময়ে সৎ শুদ্র প্রজা হিসেবে খ্যাত হয়েছে। আবার মধ্যযুগ ও ব্রিটিশ যুগে এরাই রাজার মন্দির দেখাশুনার ধর্মীয় দিক পেয়েছিল। তারাই স্বাধীন যুগে ফুল ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাত হয়েছে।

সূত্রনির্দেশ

১। অতুল সুর	বাংলা ও বাংগালীর বিবর্তন	২০৬ পৃষ্ঠা
২। নগেন্দ্রনাথ মালাকার	মালাকার জাতিতত্ত্ব	৭ পৃষ্ঠা
৩। নগেন্দ্রনাথ মালাকার+ অতুল সুর	একই বই	৭ ও ২৪ পৃষ্ঠা
৪। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ		৮২ পৃষ্ঠা
৫। নীহার রঞ্জন রায়	বাংগালীর ইতিহাস(আদিপর্ব)	২৬ পৃষ্ঠা
৬। নগেন্দ্রনাথ মালাকার	একই বই	৪ পৃষ্ঠা
৭। নগেন্দ্রনাথ মালাকার	একই বই	৯-১০ পৃষ্ঠা
৮। নগেন্দ্রনাথ মালাকার	একই বই	১০-১১ পৃষ্ঠা
৯। নগেন্দ্রনাথ মালাকার	একই বই	১১-১২ পৃষ্ঠা
১০। নীহার রঞ্জন রায়	একই বই	২৬-২৭ পৃষ্ঠা
১১। নীহার রঞ্জন রায়	একই বই	২৬-২৭ পৃষ্ঠা
১২। রমেশচন্দ্র মজুমদার	বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২৬-১২৭ পৃষ্ঠা
১৩। নগেন্দ্রনাথ মালাকার	একই বই	১৫ পৃষ্ঠা
১৪। নগেন্দ্রনাথ মালাকার	একই বই	১৫-১৬ পৃষ্ঠা
১৫। হীতেশ রঞ্জন সান্যাল	সোসাল মোবিলিটি ইন বেংগল	১৮, ২০ পৃষ্ঠা

১৬। নগেন্দ্রনাথ মালাকার	একই বই	১৭ পৃষ্ঠা
১৭। মুকুন্দরাম	চণ্ডীমংগল	৮৪ পংক্তি
১৮। নীহার রঞ্জন রায়	একই বই	২৮৭ পৃষ্ঠা
১৯। নীহার রঞ্জন রায়	একই বই	২৫১ পৃষ্ঠা
২০। হীতেশ রঞ্জন সান্যাল	একই বই	৬৮ পৃষ্ঠা
২১। নগেন্দ্রনাথ মালাকার	একই বই	২১-২২ পৃষ্ঠা
২২। নগেন্দ্রনাথ মালাকার	একই বই	২২ পৃষ্ঠা
২৩। নগেন্দ্রনাথ মালাকার	একই বই	২৪-২৫ পৃষ্ঠা

মেদিনীপুর ইতিহাসের সমন্বয়ী প্রেক্ষাপট

অরবিন্দ মাইতি

মেদিনীপুর জেলা শহরের নামানুসারে মেদিনীপুর জেলার নাম হয়েছে। কথিত আছে ত্রয়োদশ শতকে গুন্ডিচা দেশ বা উড়িষ্যার সামন্তরাজা প্রামকরের পুত্র মেদিনীকর এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারই নামানুসারে মেদিনীপুর নাম হয়েছে। আবার কেহ কেহ মনে করেন মেদিনীকর 'মেদিনী কোষ' নামে একটি সংস্কৃত অভিধান রচনা করেন। এই 'মেদিনীকোষ' নাম থেকেই মেদিনীপুর নামকরণ হয়েছে।

কিন্তু এগুলি কিংবদন্তী। 'আইন-ই-আকবরী' তে মেদিনীপুরের উল্লেখ করা হয়েছে নগরী হিসাবে। 'মেদিনী' কথার অর্থ জগৎ। মেদিনীপুর কথার অর্থ হল জগতের নগর। অন্যভাবে উল্লেখ করা হয়েছে অনন্ত বর্মন চোঙ্গল রাজার মিথুনপুর থেকে 'মেদিনীপুর' কথাটির উদ্ভব হয়েছে। উপরোক্ত মন্তব্যগুলি কিংবদন্তীর উপর নির্ভরশীল এবং কিছুটা কষ্ট কল্পিত। আমি মনে করি ঔরঙ্গজেব এই নগরীর নরমপুর নামক একস্থানে সপ্তদশ শতাব্দীতে কিছুদিন এখানে বাস করেছিলেন। মেদিনীপুর থেকে তদানীন্তন সুবেদার শাহসুজার প্রভাব মুক্ত করার জন্য তিনি তাঁর এক বিশ্বস্ত স্থপতি কর্মী মুস্তাফা মাদানী বা পির মাদানী শাহকে নিযুক্ত করেছিলেন, যাঁর সমাধি মন্দির এখনও মেদিনীপুর শহরের পুরোনো জেলখানায় রয়েছে। মুস্তাফা মাদানীর নাম থেকেই মেদিনীপুরের উদ্ভব হয়েছে। 'মাদানী' একটি বিদেশী শব্দ। তার সঙ্গে 'পুর' কথাটি যোগ হয়েছে। মাদানী+পুর = মাদানীপুর। পরে এর নাম হয়েছে মেদিনীপুর।

এই মেদিনীপুর এই রাজ্যের সর্ববৃহৎ জেলা। যার আয়তন ১৩, ৭২৪.৩০ বর্গ কি.মি, যার অবস্থিতি উত্তর গোলার্ধের কর্কটক্রান্তি রেখার সন্নিকটে।

অক্ষাংশ দক্ষিণ প্রান্ত ২১° ৩৬ ' ৩৫'' উঃ, এবং
উত্তর প্রান্ত ২২° ৫৭' ১০'' উঃ
দ্রাঘিমা পশ্চিম প্রান্ত ৮৬° ৩৩' ৫০'' পূঃ এবং
পূর্ব প্রান্ত ৮৮° ১২' ৪০'' পূঃ

জনসংখ্যার দিক থেকে প্রায় ১ কোটি লোকের বাসভূমি এই মেদিনীপুর। তবে আদিবাসীর সংখ্যা মোট লোকসংখ্যার ১০%হিন্দু ৮১% , মুসলিম ৭.১৯%, খ্রীষ্টান ০.২৫

%, শিখ ০.০৪% , বৌদ্ধ ০.১০% , জৈন ০.১০% , ব্রাহ্ম ও অন্যান্য ১.৩২% ।

এই জন বৈচিত্র্য স্বাতন্ত্র ও সংমিশ্রণ নিয়ে আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এক সমন্বয়ের পটভূমি রচনা করেছে।

সীমা ঃ —উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সমন্বয় বিন্দুতে এই জেলা অবস্থিত। যার উত্তরে রয়েছে বাঁকুড়া ও হুগলী; উত্তর-পশ্চিমাংশে রয়েছে পুরুলিয়া ও বিহারের সিংভূম জেলা; পূর্বে হুগলী নদী ও রূপনারায়ণ নদ, হাওড়া ও ২৪ পরগনা জেলা; পশ্চিমে উড়িষ্যার বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, সিংভূম ও মানভূম জেলা; এবং দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর।

ভূমিগঠন ও ভূমিঢাল ঃ—

মেদিনীপুর জেলার দঃ-পূর্ব মুখী ভূমি ঢাল পরিলক্ষিত হয়। সেকারণে এই জেলার প্রায় সব নদী পূব বা দঃ-পূর্ব বাহিনী হয়েছে। এবং রূপনারায়ণ বা হুগলী নদীতে অথবা বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বালেশ্বর বাঁকুড়া রেলপথের পশ্চিমদিকের ভু-গঠন উচ্চ থাকায় নদী নালাগুলি খরস্রোতা হয়েছে; কিন্তু বিপরীত দিকে কিছুটা নাব্য। উপকূল ভাগে সাব-মার্জ ভূমি আন্দোলনের ফলে গঠিত হয়েছে dune অঞ্চল (বালু খাড়ি অঞ্চল)। যার ফলশ্রুতিতে নদী-নালার গতিপথে সৃষ্টি হয়েছে বেসিন। উপরোক্ত বন্ধুর ও সমতল ভূমি খন্ডের উপর দিয়ে বিচিত্র গতিতে বহু সংখ্যক নদী-নালাও এই জেলায় প্রবাহিত হয়েছে। এই জেলার সীমান্তবর্তী দুইটি প্রধান নদী হুগলী ও রূপনারায়ণের কথা বাদ দিলেও রয়েছে কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, শিলাবতী, দারকেশ্বর, হলদী, রসলপুর। এছাড়া আছে পুরন্দর, জয়পন্ডা, ডুলুং, কেলেঘাই, চান্ডিয়া, পিছাবনী, তারাজুলি, ঘাঘরা, তারাফেনি, ভৈরববাঁকি, দুর্বাচিটি, তমাল, কুবাই, পারাং, খস্বতী, কেটিয়া নদী, মাণিকডাঙ্গা, চেমার নদী, কপালোধরী, পলাশপই, দোনাই, আমোদর. ঝুমি নদী, পল্‌পল্‌, পুতরঙ্গী নদী ইত্যাদি।

ভূ-প্রকৃতি ঃ

মেদিনীপুর জেলার সারা উত্তর-পশ্চিমাংশে রয়েছে ল্যাটেরাইট বা রক্তাভ কাঁকর মৃত্তিকা। ঐ অঞ্চলে দেখা যায় জমাট ভাঁজের পাথর এবং আর্কিয়ান যুগের শিস্‌টস ও পিলটস্‌ ও এপিডারমিটস্‌ জাতীয় পাথর। এখানে গ্রাভেল স্তর গ্রিটস্‌ আছে এবং টার্সিয়ারী যুগের বালি ও এরও ঠিক দক্ষিণে আর্কিয়ান যুগের পাথর রয়েছে। আর এর পরে পরেই পূর্বদিকে ল্যাটেরাইট পলিমৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়। জেলার বাকি অংশ সমভূমি। কেবলমাত্র সমুদ্র উপকূল অঞ্চল ভগ্ন এবং এই অঞ্চলে বালিয়াড়ী দেখা যায়। এগুলি সৃষ্টি হয়েছে উপকূল ভাগের ভূ-আন্দোলনের ফলে, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এই জাতীয় ভূমিগঠনকে বলা হয় সাব-মার্জ প্ল্যান। এই অঞ্চলে বালুকারাশি যা সমুদ্রস্রোতে বাহিত হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত পূর্বঘাট পর্বতের কঙ্কালবিশেষ। অবশ্য খাজুরী ও নন্দীগ্রামের ভূমি গঠনের মধ্যে ব-দ্বীপ গঠিত সমভূমির চিহ্ন সর্বাধিক। এই ভূমি গঠনে গাঙ্গেয় পলির প্রভাব সর্বত্রই লক্ষিত হয়। অবশ্য উপকূলীয় মৃত্তিকার লবণাক্ত চরিত্র উপকূল ভাগের সর্বত্রই বিদ্যমান। এক কথায় ভারতের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি অল্পবিস্তর মেদিনীপুরের ভূ-প্রকৃতির মধ্যে একত্রিত হয়েছে।

জলবায়ু ঃ মেদিনীপুর জেলার শীতকালীন তাপমাত্রা ১২°-১৫° সেন্টিগ্রেড; গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ৩৬°-৩৮° সেন্টিগ্রেড। মেদিনীপুর জেলার গড় বৃষ্টিপাত ১৫৭০ মিলিমিটার।
স্বাভাবিক উদ্ভিদ ঃ যেমন মেদিনীপুরের ভূ-বৈচিত্র্য লক্ষণীয় তেমনি স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলয় আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বালেশ্বর-বাঁকুড়া রেলপথের পশ্চিমদিকে রয়েছে শাল, সেগুন, মহুয়া, পলাশ, কুল, জাম, বাঁশ ইত্যাদি পাতাঝরা বৃক্ষের অরণ্য, উপকূলভাগে রয়েছে ঝাউ, বাদাম, কেয়া, নারিকেল, সুপারী, বেত ইত্যাদি। মধ্যভাগে রয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল আরও অনেকগাছের সমাবেশ। এই সুবিস্তৃত স্বাভাবিক উদ্ভিদ মণ্ডলের মাঝে মাঝে চিরহরিৎ ও সরলবর্গীয় বৃক্ষ পরিলক্ষিত হয়। 'মান্দারমণি' দ্বীপের খেজুরীর পললমৃত্তিকা ও নন্দীগ্রামের দঃ-পূঃদিকে ম্যানগ্রোভ অরণ্যভূমির চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়।

মানবিক পরিচয় ঃ জেলার বহু বিচিত্র পরিচয় থাকা সত্ত্বেও মেদিনীপুরের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে সবচেয়ে পুরাতন মানবজাতি হল অস্ট্রেলিয়েট। এই আদি রূপকে কেউ কেউ আবার 'নিষ্যাদিক' বলেছেন। এদের মাথা লম্বাটে, চামড়া কালো, নাক মোটা এবং উচ্চতা কম। এখানে অপর এক ধরনের আদিবাসী দেখা যায় যারা লম্বাটে মাথাওয়ালা, উঁচু গড়ন এবং ছুঁচালো নাক বিশিষ্ট। এরা দ্রাবিড় জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই দুই প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর উত্তর পুরুষ বর্তমান আদিবাসী সমাজে রয়েছে সাঁওতাল, ভূমিজ, লোধা, কোরবা বা মুন্ডারা ইত্যাদি। একই সঙ্গে এখানে গোল মাথাযুক্ত সুমেরীয়ান বা আরমানি গোষ্ঠীর মানুষজনের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া ফরসা রং, বৃহদাকার মুখ, ধারালো নাক, দীর্ঘদেহী অ্যালপাইন্ বা ইন্দো-এরিয়ান জাতির মানুষজনের ব্যাপক অবস্থান রয়েছে এই জেলায়। এই জাতির সংমিশ্রনে জেলার বেশীর ভাগ মানুষজন গড়ে উটেছে। এই সংমিশ্রন ঘটার পিছনে অন্যতম কারণ ছিল উপকূলবর্তী এই জেলার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রাচীন বন্দরের অবস্থিতি। যেমন দন্ডভুক্তী ও জয়রামপুর, বাহিরি, তাম্রলিপ্ত ও হিজলী বন্দর ইত্যাদি। এই স্বাতন্ত্র্য ও সংমিশ্রনের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কালের গতিপথে জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এই জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বেলপাহাড়ী অঞ্চলে রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনুসন্ধানকারীরা লাল জলায় আবিষ্কার করেছেন চিত্রিত আদিম মানুষের গুহা। ভারতীয় প্রত্ন সমীক্ষা বিভাগের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ ওটা কাঁকড়াঝোলের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানকে পোলিওলিথিক ও মাইক্রোলিথিক হাতিয়ারের খনি বলে চিহ্নিত করেছেন। বিক্ষিপ্তভাবে প্যালিওলিথিক হাতিয়ার জেলার বহুস্থানে পাওয়া গিয়েছে। মোহনপুর—একরার মধ্যবর্তী স্থানে নব-প্রস্তর যুগের কালক্রমিক হাতিয়ার ও মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বোন পয়েন্ট, বোন হারপুন্, হাড়ের কাস্তে, হাড়ের বড়শীর কাঁটা, রজনীকান্ত জ্ঞান মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে এবং তমলুকে পাওয়া গিয়েছে। তামাজোড় ও এগরা থানায় তাম্রাশ্রিত সভ্যতার

নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এই সঙ্গে বহু মাতৃকা মূর্ত্তি আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। বেহালার রাজ্যসংগ্রহশালায় উহা সংরক্ষিত আছে।

রজনীকান্ত জ্ঞান মন্দির ও তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় এর নমুনাগুলিও সংরক্ষিত আছে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য কেবলমাত্র তাম্রাস্ত্র নয়, সমকালীন মৃৎপাত্র ও পাত্রাংশ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। সভ্যতার বিবর্তনের পথ বেয়ে এখানে এসেছে প্রোটো-ঐতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগ। মৌর্য-শুঙ্গ-যুগ, গুপ্ত যুগ, পালযুগ পর্য্যন্ত। জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশে পাওয়া গেছে অপূর্ব শিল্প শৈলী টেরাকোটা, মৃৎপাত্র, ক্রিট, রোম ও মিশরীয় সভ্যতার প্রত্যক্ষ প্রভাবে নির্মিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৃৎপাত্র। এ সব অঞ্চলে কিছু কিছু পাথরের প্রাচীন ভাস্কর্য্য পাওয়া গেছে। বর্তমান দাঁতনে বিশাল জটাধারী মূর্ত্তি, মূর্ত্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। এছাড়াও পাঞ্চমার্ক মুদ্রা এবং ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা মৃত্তিকা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে মেদিনীপুরের গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন প্রত্নক্ষেত্রগুলির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন লালজলা, জয়রামপুর (উড়িষ্যা মেদিনীপুরের বর্তমান সীমানা থেকে প্রায় ১০ কি.মি. দূরে), দাঁতন, জয়কালীচক, বাহিরী, তমলুক, নাটসাল, তিলাদী, পানা পিংলা ইত্যাদি স্থান।

বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রভাব এই জেলার জনজীবনে সামান্য নয়। বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাস ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন মূর্তিতত্ত্বের সমাবেশ ঘটেছে এখানে। সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে ধর্ম যুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু ধর্ম সমাজের একমাত্র পরিচয় নয়। সমকালীন ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক অবস্থা থেকে সৃষ্ট মূর্তিতত্ত্বগুলি সমকালীন সামাজিক ইতিহাস জানতে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে। সেই কারণে আদিবাসী এবং সাঁওতালদের ঠাকুর জাহির বুড়ী, বংগা ঠাকুর (দারগার), তুথুঘন্টাকর্ণ, করম, সালুই, বাঁধনা, তেঁতুলবুড়ী, চাতরাবুড়ী, সাতভউনী ইত্যাদি। এদের মধ্যে অনেককে পাথর বসিয়ে পূজা করা হয়। আবার কখনও কখনও নিজস্ব গোষ্ঠীর রীতি ও ধ্যান-ধারণা থেকে মূর্তি কল্পনা করা হয়। লোধা, সবর, বাউড়ী ও বাগদীদের উপাস্য দেবতা হলেন বড়াম। আকৃতিতে ঠাকুর দীর্ঘাকার, লোমশ শরীর, হাতে থাকে কুঠার। এই জাতীয় মূর্ত্তি কল্পনায় আদিমতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। মনসা বা জাগুলী, চন্ডিকা বা পর্ণশবরী, বাছুলি (বা শুলী), ধর্ম ঠাকুরের পূজা এখানে প্রায়শই হয়। শিবলিঙ্গ সহ তীর্থঙ্করদের অবস্থান এই জেলায় আবিষ্কৃত হয়েছে। শিবের গাজন এ জেলার লোক সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ, অম্বিকা, তারা, অবলোকেশ্বর ও জগন্নাথ ইত্যাদির পূজার্চ্চা ও মূর্তিতত্ত্বের মধ্যে আমরা বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবের সুস্পষ্ট লক্ষণ খুঁজে পাই। সেই সঙ্গে বৈদিক দেব দেবীরাও উপেক্ষিত নয়। এই জেলায় মহাপ্রভু চৈতন্যের পদার্পনের সঙ্গে সঙ্গেই জনমানসে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিশালভাবে পরিলক্ষিত হয়। এমনকি কবি লোচনদাস চৈতন্যদেব সম্পর্কে গ্রন্থ প্রনয়ন করেন। জেলায় পীরের দরগা ও মাজারের সংখ্যাও খুব কম নয়। এর অনেকগুলিতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ মানৎ করেন, সিন্নি নিবেদন করেন এবং প্রসাদ পান। জেলায় যেমন বহু দেবতা রয়েছেন তেমনি একেশ্বরবাদীরাও রয়েছেন। ব্রাহ্ম

সমাজেই তার প্রমাণ। কালের গতিপথে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাবে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এখানে ধর্মপ্রচার করেছে, স্থাপন করেছে গীর্জা। তবে এখানেও সমন্বয় ঘটেছে। গেঁওখালির নিকট ফিরিঙ্গি পাড়ার পর্তুগীজ খ্রীষ্টানরা বাংলায় যীশুখ্রীষ্টের কীর্ত্তন করেন। হিন্দু সমাজের সঙ্গে তারা একাত্ম হয়ে মিশে গেছেন। শিখ ধর্মাবলম্বীরা এখানে গুরুদুয়ার গড়েছেন। আজও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা মেদিনীপুরের জনসমুদ্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে।

ভাষা ঃ জেলার প্রধান ভাষা বাংলা হলেও কোন কোন অঞ্চলের মানুষ হিন্দিতে কথা বলেন। দ্রাবিড়ীয় ভাষা গোষ্ঠীর প্রভাব এখানে রয়েছে। খড়্গপুরের অনেক মানুষ তেলেগু, তামিল ভাষায় কথা বলেন। উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে উড়িয়া ভাষা, বিহারের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে হিন্দী ভাষা, আঞ্চলিক ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। মুসলমান সমাজের অনেকে উর্দুভাষায় কথা বলেন। আদিবাসীদের মধ্যে স্বতন্ত্র ভাষা থাকলেও অলচিকি বর্ণমালার মাধ্যমে তার উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা চলেছে।

উপসংহার ঃ এই প্রয়াসের উদ্দেশ্য হল ভারতীয় সভ্যতার শাশ্বত সুরটি যা বিভেদের মধ্যে ঐক্যের সাধনতাকে নিজের সামগ্রিক পরিমন্ডলের মধ্যে আর একবার চিনে নেওয়া, উপলব্ধি করা ও আত্মস্থ করা। স্বাতন্ত্রের সঙ্গে এখানে ঘটেছে সমন্বয়। জেলার জনচরিত্রের এটাই প্রকৃত রূপ। আপেক্ষিকভাবে সম্প্রদায় সম্পদায় যে সংঘাত ঘটেছে এখানে তা মূলতঃ শ্রেণী সংগ্রাম। শোষকের সঙ্গে শোষিতের সংগ্রাম। অশিক্ষার পশ্চাদপদতা থেকে উদ্ভুত সমস্যার ফলে সৃষ্ট সংঘাত যা প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘাত নয়।

আর্যাসপ্তশতী কাব্যে প্রাচীন বাঙালী নারী

শাহানারা হোসেন

আর্যাসপ্তশতী একটি শৃঙ্গার কাব্য। খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতকের কবি গোবর্ধন আচার্য রচিত ৭০০টি বিচ্ছিন্ন শ্লোক এই কোষ কাব্যে অ-কারাদি বর্ণক্রমে ৩৪টি ব্রজ্যায় ভাগ করা হয়েছে এবং এর সাথে রয়েছে গ্রন্থারম্ভ ব্রজ্যা ও সমাপ্তি ব্রজ্যা। আর্যাসপ্তশতীর বর্ণনীয় বিষয় প্রেম। কিন্তু এই কাব্যের মুক্তকগুলিতে রয়েছে প্রকৃতি সংসার সমাজের দৃশ্য এবং প্রাকৃত জনসাধারণের ধুলিমাখা প্রেমচিত্র। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের ধারক ও এই সংস্কারে লালিত হয়েও গোবর্ধন আচার্যের দৃষ্টি ছিল জনজীবনমুখী। গোবর্ধন আচার্য ছিলেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি। একটি প্রচলিত শ্লোকে লক্ষ্মণ সেনের সভার পঞ্চরত্ন রূপে গোবর্ধন, শরন, জয়দেব, উমাপতি ও কবিরাজ এর নাম উল্লেখিত হয়েছে। কবি জয়দেব তার গীত গোবিন্দ কাব্যে গোবর্ধনের প্রশংসা করেছেন। সুপণ্ডিত নীলাম্বরের পুত্র গোবর্ধন আচার্য ছিলেন সর্বশাস্ত্রবেত্তা ও পণ্ডিত ব্যক্তি। হালের প্রাকৃত প্রেমকবিতার সঙ্কলন গাহাসত্তসঙ্গা বা গাথা সপ্তশতীর আদর্শে রচিত গোবর্ধনের আর্যাসপ্তশতীর ক্ষুদ্র শ্লোকগুলিতে রয়েছে সমসাময়িক সমাজ জীবনের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি। প্রাচীন বাঙালী নারীর সুখ-দুঃখ, জীবন ও পরিবেশের বহু চিত্র গোবর্ধন আচার্যের আর্যাসপ্তশতীতে ছড়িয়ে রয়েছে। এ চিত্রগুলি যেন তাদের জীবনের জলছবি।

শাস্ত্রকারগণের অনুশাসন অনুসরণ করে অভিভাবক কন্যাকে শৈশব উত্তীর্ণ না হতেই বিয়ে দিতেন। তারপর পতিগৃহেই একটি নারীর জীবন অতিবাহিত হতো। সমৃদ্ধ গৃহস্থের গৃহ বৃতি বা প্রাচীর বেষ্টিত থাকতো। বৃতি বেষ্টনের মাঝে মাঝে থাকতো বৃতি বিবর বা গবাক্ষ। অন্তঃপুরিকাগণ প্রাচীরের বাইরে সাধারণতঃ যেতেন না। বাইরের দৃশ্য তারা দেখতেন বৃতি বিবর পথে। প্রাচীরের ভিতরের অঙ্গনের একপ্রান্তে অবস্থিত ছিলো গৃহস্থের শয়নভবন, অন্যপ্রান্তে সদর দ্বার। গৃহের বহির্ভাগের বহির্বাটিতে কখনও কখনও পুষ্পোদ্যান থাকতো। যৌথ পরিবারের সদস্য ছিলো পতি পত্নী, শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর। ধনী গৃহে দাসী রাখার প্রথা প্রচলিত ছিলো। তাছাড়া গৃহে অনেক সময় থাকতো সখী বা সহচরী। দাম্পত্য জীবনে প্রত্যাশা করা হতো গৃহিনী সেবা, বিনয়, বিধেয়তা গুণে ভূষিতা হবে আর গৃহপতি হবে তার পৃষ্ঠপোষক ও সেবক। দম্পতির জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ সমসূত্রে গাঁথা বলে ধরে নেয়া হতো। আর্যার একটি মুক্তকে গোবর্ধন আচার্য প্রবাসী স্বামীর

বিরহে পতিনির্ভর অসহায়া বঙ্গনারীর অবিরল অশ্রু ধারায় সিক্ত নয়নকে তুলনা করেছেন শৈবালাচ্ছন্না সদানীরা করতোয়া নদীর সাথে।

প্রাচীন যুগে পুরুষের বহু স্ত্রী গ্রহণ শাস্ত্র ও সমাজের অনুশাসন অনুমোদিত ছিলো। সে যুগে বাঙালী সমাজেও পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো এবং সেকালে বাঙালী নারীর গভীর দুঃখ ছিলো সপত্নী দুঃখ। বালাবধূর গৃহে আগমন জ্যেষ্ঠা পত্নীকে ভীত ও ঈর্ষান্বিত করে তাকে করে তুলতো স্বামীর প্রেমের কাঙাল। জ্যেষ্ঠা স্ত্রী পুত্রবতী হলেও তার মনে সপত্নী-ভীতি কিছুটা কম থাকলেও হৃদয়ের ঈর্ষা থেকেই যেত। নবাগতা বালাপত্নীর হৃদয়ে জ্যেষ্ঠা সপত্নীর প্রতি ছিলো ভয় অন্যদিকে পতি সৌভাগ্য গর্বে সে আকার ইংগিতে প্রকাশ করতো গর্ব। কামশাস্ত্রে নির্দেশ রয়েছে যে পতি দুই পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করবে। স্বামী উভয়পত্নীকে তুষ্ট করার প্রচেষ্টা করতো, এমন কি পালা করে সপত্নীদিগের ভিতর 'পতিশয়নবার'ও নির্দিষ্ট করা হতো। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সম্প্রীতির অভাব দেখা দিতো স্বামী ও পত্নীদের মধ্যে কলহ সংশয় ও দ্বন্দ্বের কারণে। অসহায়া পত্নীদের সুখ-দুঃখ ও হৃদয়ের কথা বলার ব্যক্তি ছিলো তাদের সখী।

প্রাচীন বাঙালী সমাজে বিত্তবান তরুণেরা বারাঙ্গনা গৃহে আমোদ প্রমোদের জন্য যেতেন। বারবনিতা ভবনে মদন চঞ্চল যুবকেরা বারাঙ্গনার নৃত্য দর্শন করে সকৌতুকে তালি দিতেন। বাংলার প্রাচীন যুগে উচ্চ কোটির পুরুষদের মধ্যে যে নৈতিক শিথিলতা ছিলো তার প্রমাণ আর্যাসপ্তশতী ছাড়াও অন্যান্য সাহিত্যিক উৎসে এবং লিপি সাক্ষ্যে রয়েছে। শাস্ত্রকারগণ বারংবার পারিবারিক শুচিতা, পবিত্রতা এবং সংযত জীবন যাপনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবুও সমাজে নৈতিক শিথিলতা বিশেষ করে উচ্চকোটি স্তরে অনেকটা যেন স্বাভাবিক জীবনেরই অংগ ছিলো।

গ্রামীণ সমাজে পল্লীপতির কঠোর শাসনে নারীদের নগরাচার বর্জন করে চলতে হতো। গ্রামীণ জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিলো সহজ সারল্যে ভরা। সাধারণ শ্রেণীর গ্রাম্য নারীদের হাটে মাঠে বাটে কাজ করতে হতো। কখনো তারা কলম গোপী বা শস্য রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন—কখনো বা তারা হতেন প্রপাপালী বা জলাশয় রক্ষিকা। গ্রাম্য নারীরা নগর নারীর তুলনায় কলা নিপুণা হতেন না। গ্রামে ও নগরে বিত্তবান অভিজাত নারীগণ প্রাচীর বেষ্টিত গৃহে বাস করতেন। প্রাচীরের বিবর বা গবাক্ষ দিয়ে বাইরের জগৎ অবলোকন এবং বস্ত্র আচ্ছাদিত দোলায় চড়ে গৃহের বাইরে যাওয়াই ছিলো তাদের জন্য প্রচলিত রীতি। তবে সমাজে খেটে খাওয়া স্তরের নারীদের অবরোধ প্রথা পালনের কোন রীতি ছিলো না। রজকিনী, প্রপালিকা বা কলম গোপীদের বাইরে চলাচল ছিলো। নিত্যদিনের প্রয়োজনেই তাদের গৃহে আবদ্ধ থাকা সম্ভবও ছিলো না। গ্রামের ভিক্ষুক রমণী পায়ে হেঁটে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করতেন। ব্যাধ নারী পশু শিকারে অংশ গ্রহণ করতেন।

বিবাহিতা নারী তার সীমন্ত সিঁদুর রঞ্জিত করতেন-এই সীমন্তের সিঁদুর ছিলো এয়োতির চিহ্ন। নারীদের প্রসাধনী দ্রব্যের মধ্যে আরো ছিলো কাজল, মৃগমদ, চন্দন, কুঙ্কুম ও লাক্ষা। কপালে তারা দিতেন কাজলের টিপ এবং শলাকা দিয়ে নয়ন অঙ্কিত করতেন

কাজলে। অংগ বিলোপন করতেন মৃগবদ, চন্দন ও কুঙ্কুম দিয়ে। পা রঞ্জিত করতেন লাক্ষায়। দীর্ঘ চুল বাঁধতেন গন্ধ তেল দিয়ে। কখনো করঞ্জ তেলের ব্যবহার করা হতো কেশ বিন্যাসের প্রাক্কালে। সাধাবণ সমাজের নারী এক বসনা হতো। তবে ধনীগৃহের নাবীরা পরতেন জঘনাংশুক বা ঘাঘরা, কঞ্চুক এবং অংগাংশুক। বিয়ের সময় নারীদের পরিধান ছিলো চেলী। বিবাহিতা নারীরা ঘোমটা দিতেন। গৃহবধূরা বিনা আবরণে বাইরে যেতেন না। দরিদ্র পরিবারের নারী শীতঋতুতে সারারাত্রি শীত নিবারণের জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখতেন।

সধবা রমণী হাতে পবতেন শঙ্খ বলয়। বিত্তবান পরিবারের রমণীদের কণ্ঠে শোভা পেত বিলম্বিত হার, মুক্তামালা, কর্ণে কুন্ডল, মাথায় অবতংস বা কিরীট হার, ললাটে ললাটিকা, হাতে বলয়, কঙ্কন, কটিদেশে মেখলা বা কাঞ্চী, পায়ে নূপুর। বিত্তহীন পবিবারের নারী পরতেন তাড়পত্র নির্মিত কর্নভূষা তটিঙ্ক। গ্রামের নারী অংগ সজ্জা করতেন গুঞ্জার মালা পরিধান করে।

বিত্তবান পরিবারের নারীগণ অবসর কালে আমোদ প্রমোদের জন্য দাবা ও পাশা খেলতেন কখনো কখনো পণ রেখে। তাছাড়া তারা শুক পাখী খাঁচায় রেখে পালন করতেন। শুকালাপন অবসর বিনোদনের একটি অংগ ছিলো এবং বচনপটু শুকের আলাপনে নায়ক নায়িকার প্রেম হয়ে উঠতো রসমধুর। সখী বা সহচরীর সাথে আলাপচারিতা করেও তারা হৃদয়ের সুখ দুঃখ প্রকাশ করে মনের ভার লাঘব করতেন। কোন কোন নারী বীণা বাজাতেন এবং চিত্রকলায়ও নিপুনা হতেন। বিশেষ করে বারাঙ্গনাগণ নৃত্য ও সংগীতে পটিয়সী হতেন। প্রাচীন বাংলায় ধ্রুপদী সংগীত ও লোকগীতি উভয়েরই চর্চা ছিলো। গোষ্ঠে গ্রাম্যগীতি গাওয়া হতো এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে নারীগণ মংগল গান করতো। একথা সহজেই অনুমেয় যে ধ্রুপদী সংগীত ও লোকগীতি এই উভয় সংগীতেরই নারীগণ চর্চা করতেন। গ্রামীণ নারী গাইতেন গ্রাম্য লোকগীতি। সাপুড়ের প্রদর্শিত সাপ খেলা গ্রাম বাংলার নাবীব জন্য ছিলো একটি আকর্ষনীয় অনুষ্ঠান।

প্রাচীন বাংলায় লোকায়ত বিশ্বাসের মধ্যে একটি ছিলো নারীর সম্মোহ বিদ্যায় পারদর্শিতা, যে বিদ্যাকে বলা হতো ডাকিনী-বিদ্যা। ডাকিনী হিসেবে কোন নারী বিবেচিত হলে পল্লীপতি তাকে কঠোর দণ্ড দিতেন।

আর্যাসপ্তশতীতে প্রাচীন বাঙালী নারীর জীবন চর্চার যে প্রতিফলন ঘটেছে সেই প্রতিফলন আমরা গোবর্ধন আচার্যের সমকালে সঙ্কলিত সুভাষিত রত্নকোষ ও সদুক্তিঙ্কর্নামৃত কোষ কাব্য দুটিতেও পাই। তাছাড়া লিপিমালা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও প্রাচীন যুগের বাঙ্গালী নারীর জীবনের চিত্রাবলী একই রূপ সাক্ষ্য বহন করে। একাদশ হতে ত্রয়োদশ শতকে রচিত ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থগুলিতে পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ প্রধান সমাজ কাঠামো গঠনের জন্য যে সকল অনুশাসন বর্ণিত হয়েছে তারই প্রতিফলন হয়েছে আর্যাসপ্তশতীর মুক্তকগুলিতে এবং সুভাষিত রত্নকোষ ও সদুক্তিঙ্কর্নামৃতে প্রকীর্ণ বহু শ্লোকে এবং লিপিমালায়। সাহিত্যিক সাক্ষ্য, লিপি সাক্ষ্য এবং পোড়ামাটির ফলকগুলিতে প্রাচীন বাঙালী নারীর দৈনন্দিন জীবন এবং সমাজে নারীর মর্যাদা ও অবস্থানের যে পরিচয়

আমরা পাই তার প্রকৃতি অভিন্ন। নারীর সৌন্দর্য চর্চা, পুরুষ অভিভাবকের উপর তার নির্ভরশীলতা, স্ত্রী ও পুত্রবতী মাতা রূপে তার গৌরব ও নিরাপত্তা, স্বামীর ইচ্ছার অনুগামী হয়ে তার জীবন নির্বাহ করা—এ সবই ছিলো প্রাচীন বাঙ্গালী নারী জীবনের চলমান ধারা। ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা বা ব্যক্তি সত্ত্বার স্বীকৃতি প্রাচীন বিশ্বে সাধারণতঃ প্রায় কোথায়ও ছিলো না। তবু প্রাচীন বাংলার নারী সমকালীন বিশ্বের সর্বস্থানের নারীদের মত ধর্মীয় বিধান, সামাজিক অনুশাসন দ্বারা পুরুষ সমাজের তুলনায় অনেক বেশী নিগৃহীত ছিলো—এ কথা সার্বজনীন ঐতিহাসিক সত্য। আর্যাসপ্তশতীর বিভিন্ন শ্লোকে প্রতিফলিত বাঙ্গালী নারীর আনন্দ, বেদনা ও যন্ত্রনার চিত্রগুলি আমাদের সহায়তা করে বাংলার সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনে।

সূত্র নির্দেশ

গোবর্ধন আচার্য, **আর্যাসপ্তশতী**, সম্পাদনায় পন্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও অন্যান্য, তৃতীয় সংস্করণ, কাব্যমালা ১, বোম্বে, ১৯৩৪।

আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বংগ, বংগা ুবাদ ও সম্পাদনা শ্রী জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, কলিকাতা, ১৯৭১।

রমেশচন্দ্র মজুমদার, **এন্সিয়েন্ট হিস্ট্রী অব বেংগল**, কলিকাতা, ১৯৭১।

রামরঞ্জন মুখার্জী ও শচীন্দ্র কুমার মৈতি, **কর্পাস অব বেংগল ইন্সক্রিপশনস্**, কলিকাতা, ১৯৬৭।

বিদ্যাকর, **সুভাষিতরত্নকোষ**, অনুবাদ ও সম্পাদনা এইচ.ডি.ইঙ্গলস, হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ৪৪, ১৯৬৫.

শাহানারা হোসেন, দি **সোসাল লাইফ অব উইমেন ইন আর্লি মিডিয়েভেল বেংগল**, ঢাকা, ১৯৮৫।

সদুক্তিকর্ণামৃত অব শ্রী ধর দাস, সম্পাদনায় সুরেশ চন্দ্র বানার্জি, কলিকাতা, ১৯৬৫।

মধ্যযুগের বাংলায় 'টেরাকোটা'-শিল্পের নতুন ধারা

প্রণব রায়

বর্তমান নিবন্ধে 'মৃৎফলক-কলা' বা 'টেরাকোটা'-শিল্প বলতে প্রধানতঃ মন্দির 'টেরাকোটা' শিল্পই অভিপ্রেত। অবশ্য, মসজিদ-গাত্রে 'টেরাকোটা'-বিন্যাস লক্ষ্য করা গেলেও তা ফুল, লতাপাতাব প্রতিকৃতি বা নকশা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুলতানী আমলে কোন কোন মসজিদ বা মাজারে কিছু কিছু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিফলক লক্ষ্য করা গেলেও আসলে সেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন মন্দিরের অংশ বিশেষ। পক্ষান্তরে, মধ্যযুগের বাংলায়, বিশেষতঃ, শেষ-মধ্যযুগে (খ্রী. ষোল শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত), মন্দির-গাত্রে টেরাকোটার যে অভাবনীয় প্রাচুর্যের সমাবেশ ঘটেছিল, তা বৈচিত্র্য ও শৈল্পিক সুষমার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা এনে দেয়। মন্দিরাশ্রিত এই 'টেরাকোটা'-শিল্পের আকার, প্রকার ও রীতি-নীতি প্রাচীন বাংলার 'টেরাকোটা'র থেকে যে বহুলাংশে ভিন্নধর্মী ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও এর সূচনার পূর্বাভাস পাল-যুগের মাঝামাঝি সময় থেকেই (খ্রী. অষ্টম-নবম শতক) দেখা যেতে থাকে পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় ও ময়নামতীর (স্থানগুলি সবই বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত) ধ্বংসাবশেষ থেকে। কিন্তু সে শুধু সূচনামাত্র। প্রাক্-মুসলিম যুগে বাংলার মন্দির-টেরাকোটা সম্পর্কে বিস্তৃত আরও কিছু জানার সুযোগ আমাদের আর নেই।

মধ্যযুগে বাংলার মন্দিরাশ্রিত 'টেরাকোটা'-শিল্পে যে এক নতুন ধারার সূচনা ও বিকাশ ঘটে, যাকে আমরা স্বাধীন, স্বচ্ছ ও লোকায়ত শিল্প বলতে পারি, তার পূর্বাভাস পূর্বোক্ত স্থানে পাওয়া গেলেও সুদীর্ঘকাল এই শিল্পের বিকাশধারার গতিপথ কোন্ এক অজ্ঞাতকারণে রুদ্ধ হয়ে যায়। কোন কোন শিল্পসমালোচক এর কারণরূপে সেন-যুগে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শাস্ত্রানুসারী শিল্পচর্চাকে উল্লেখ ক'রে থাকেন।[১] কেননা, পাল-সেন পর্বে বা এই দুই রাজন্যবর্গের শাসনাধিকারকালে বাংলায় যে সব ইঁটের মন্দির তৈরি হয়, সেগুলিতে (অন্ততঃ এখনও যেগুলি অস্তিত্ব রক্ষা ক'রে আছে) মূর্তি বিন্যাস অল্প হলেও প্রাচীন শিল্প শাস্ত্রানুমোদিত অলংকরণবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, এগুলির প্রায় সবই বৌদ্ধ বা জৈন মন্দির। যেমন. বহুলাড়া ও সোনাতপল (বাঁকুড়া) এবং সাতদেউলিয়া (বর্ধমান) যেগুলিতে মূর্তির চেয়ে ফুল, লতাপাতার নকশাই বেশি। অবশ্য, এই সম্প্রদায়ের মন্দিরে মূর্তিসন্নিবেশের অবকাশ একপ্রকার নেই বললেই চলে।

শাস্ত্রানুমোদিত বা প্রাচীন ভারতের শিল্প শাস্ত্রসম্মত প্রস্তরভাস্কর্য ও টেরাকোটাশিল্প

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু হয়ে খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতকে শক-কুষাণ যুগে যে পরিণতি লাভ করে ও বিশেষ এক শৈলীর সৃষ্টি ক'রে তা সর্বভারতীয় শিল্পাদর্শরূপে পরিগণিত হয়। গুপ্তযুগে এই শিল্পে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয় এবং শিল্পাদর্শরূপে উত্তরভারত তথা বাংলায় গৃহীত হয়।[১] কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাংলার আঞ্চলিক কোন শিল্পরীতি গড়ে ওঠে নি, যদিও বিক্ষিপ্তভাবে পশ্চিম বাংলার তমলুক, পান্না (মেদিনীপুর), চন্দ্রকেতুগড় (উত্তর চব্বিশ পরগণা) এবং কর্ণসুবর্ণের (মুর্শিদাবাদ) ধ্বংসাবশেষ থেকে পোড়ামাটির কিছু কিছু মূর্তিফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলিতে সুপ্রতিষ্ঠিত গুপ্ত শিল্পাদর্শের ছায়াপাত ঘটেছে দেখা যায়। সেই খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে অষ্টম-নবম শতক পর্যন্ত তখনও বাংলার কোন আঞ্চলিক শিল্পাদর্শ গড়ে ওঠে নি। উত্তর ভারতের সর্বভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের মতো সর্বভারতীয় এক শিল্পাদর্শ বাংলার গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রচলিত ছিল। উপরিউক্ত স্থানগুলিতে এদের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

তবে প্রস্তরভাস্কর্যের মতো মৃৎফলকশিল্প প্রাচীন বাংলায় বিশেষ অভিজাত মর্যাদা লাভ করেনি। এটা ছিল 'প্রাকৃত স্তরের শিল্প'। এই শিল্প ছিল অপভ্রংশ পংক্তির শিল্প। অভিজাত সংস্কৃত স্তরের শিল্পের সঙ্গে একাসনে এর স্থান নেই, শিল্পশাস্ত্রেও নেই। 'জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সৃজনক্রিয়া... এই সব নিদর্শন উচ্চ কোটি ও সংস্কৃত শিল্পসাধনার নিপুণতর নিদর্শনের পাশে কোথাও দাঁড়াইবার সুযোগ পায় নাই...'[২]। এই শিল্প রায়ের মতে 'জনসাধারণের লোকায়ত জীবনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।[৩] বাংলাদেশের পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় ও ময়নামতীর বিহারগাত্রে এই শিল্পের যে নিদর্শনগুলি লক্ষ্য করা গেছে, তাতে এই শিল্পের এক নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে।

কিন্তু কি ছিল এই শিল্পের বৈশিষ্ট্য ? নীহাররঞ্জন রায়ের মতে এই টেরাকোটা-শিল্পের সাবলীল গতিময়তা, স্বচ্ছন্দ প্রাণপ্রবাহ এবং প্রত্যক্ষগোচর দৈনন্দিন জীবনের সমৃদ্ধ বস্তুময়তা লোকায়ত শিল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রকাশ করেছে। দৈনন্দিন জীবনের যে সাধারণ ছবিগুলি আমরা এর মধ্যে পাই তা হোল, লাঙ্গল নিয়ে চাষী, গৃহপ্রবেশরতা নারী, মৎস্যবহনরতা ও মৎস্যকর্তনরতা নারী, কূপে জল আহরণরতা ও জলপাত্রবাহিনী নারী, স্ত্রী ও পুরুষ যোদ্ধা, শিকারবহনরত ব্যাধ, ধর্মাচরণরত ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক, অস্থিচর্মসার সন্ন্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক, মল্লবীর, মোরগ ও ষাঁড়ের লড়াই, দ্বারপাল ইত্যাদি। দেব-দেবী মূর্তিগুলির মধ্যে বেশি আছেন শিব, এরপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ। বৌদ্ধ দেব-দেবীর মধ্যে মহাযান-বজ্রযানবর্গের বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী, তারা। কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত দেবদেবী প্রায় নগণ্য। এই সব মূর্তির মধ্যে (টেরাকোটা-ফলক) মার্জিত রুচি, কারুকার্যের সূক্ষ্মতা বা গভীর ব্যঞ্জনার প্রকাশ ততটা নেই, যতটা আছে এদের সাবলীল গতিছন্দ, সজীব প্রাণের স্পর্শ, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীর আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে শিল্পিকুলের গভীর সচেতন দৃষ্টি। নীহাররঞ্জন রায় একেই প্রথাবদ্ধ প্রতিমা শিল্পের চেয়ে লৌকিক শিল্প বলে মনে করেন।[৪] এটি বাংলার একান্ত নিজস্ব শিল্প যা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। এই শিল্পকৃতির কয়েকটি নিদর্শন আমরা কলকাতার 'আশুতোষ চিত্রশালা'য় লক্ষ্য করি। টেরাকোটা-ফলকগুলির আকার বেশ বড়ো (অনেক

ক্ষেত্রে ১ফুট × ১ ফুট)। 'রিলিফে' খোদিত পার্শ্ব চিত্রগুলির প্রতিটিতে দেশজ লোকায়ত ভাব-ভঙ্গীর প্রকাশ বেশিমাত্রায় এগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। পাহাড়পুর বিহার-মন্দিরের এই ফলকগুলি সম্ভবতঃ তারও আগে কোন ব্রাহ্মণ্য মন্দিরগাত্রে সন্নিবেশিত হয়েছিল।[৮] পরে মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গেলে ঐ মন্দিরের বহু ফলক (এর মধ্যে প্রস্তর ফলকও আছে) পালসম্রাট ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত অষ্টম শতকের মধ্যভাগে নির্মিত ঐ বিহারে স্থাপিত হয়। সরসী কুমার সরস্বতী এই মূর্তিফলকের তিনটি শ্রেণী লক্ষ্য করেছেন। সেগুলিকে তিনি যথাক্রমে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শতকে বাংলার শৈলীর বিবর্তন বলে মনে করেন। তাঁর মতে প্রথম দুটি শ্রেণীতে গুপ্ত শিল্পধারার এক ধরনের রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর মূর্তিগুলিতে খাঁটি দেশজ বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।[৮]

এই তৃতীয় বিভাগ বা ধারার অন্তর্ভুক্ত 'বাস-রিলিফে' (Bas-Relief) খোদিত মূর্তিফলকের অনেকগুলি ক্ষয়ে গেছে, কোন কোনটি ঠিকমতো বোঝা যায় না। এতে পৌরাণিক কৃষ্ণকথা ও রামায়ণের রামকথার অনেক চিত্র পাওয়া যায়, যেমন, দেবকী কর্তৃক নবজাতক কৃষ্ণকে বসুদেবের কাছে সমর্পণ, কংসের কারাগার থেকে বালকৃষ্ণকে বসুদেবের বহন, বালকৃষ্ণের ননী ভক্ষণ, রাখালবালকদের সঙ্গে কৃষ্ণবলরামের ক্রীড়া, গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের রাসক্রীড়া, কৃষ্ণকর্তৃক প্রলম্বাসুরবধ ইত্যাদি। আবার রামায়ণকাহিনীর মধ্যে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণে রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ, ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের সাক্ষাৎকার ইত্যাদি।

কিন্তু এই শ্রেণীভুক্ত মূর্তিগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্য ও সংযত পরিমিতি না থাকলেও এগুলির মধ্যে বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হ'তে শুরু হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত গুপ্তযুগে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য বাংলার ভাস্কর্যে অনুসৃত হওয়া প্রথাগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থানে গুপ্তযুগে প্রবর্তিত ভাস্কর্যরীতি অনুসৃত হোত। কিন্তু বাংলায় খ্রী. সপ্তম শতকের শেষ বা অষ্টম শতকের গোড়া থেকে ভাস্কর্যশিল্পে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ প্রকট হচ্ছিল এবং একটি পৃথক শৈলী সেন-রাজাদের রাজত্বকালের শেষ বা মুসলমানবিজয়ের আগে পর্যন্ত (খ্রী. দ্বাদশ শতক পর্যন্ত) প্রচলিত হয়েছিল।[৮] খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে শুরু হয়ে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পাল-সেন শাসনাধিকারের পুরো সময় ধরে এর বিকাশপর্ব চলেছিল অনুমান করা যায়। কিন্তু এই এক নির্দিষ্ট 'বাংলা শৈলী'র নিদর্শন পূর্বোক্ত পাহাড়পুর প্রভৃতি স্থান ছাড়া আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কারও কারও মতে 'এই প্রাচীন শিল্প মুসলমানেরা মঠগুলোকে বিনষ্ট করার বহু আগেই সম্ভবত লুপ্ত হয়েছিল (একাদশ শতকের পাহাড়পুর মন্দিরের সংস্কারকার্য থেকে দেখা যায়, নতুন ফলক আর সুলভ নয়) এবং প্রাক্-মুসলিম যে সমস্ত হিন্দু বা জৈন মন্দির এখনও টিকে আছে, তার কোনটাতেই অন্তত এর হদিশ মেলে না—এগুলোকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে খোদাইকরা ইঁটে প্লাস্টারের (স্টাকোর) সাহায্যে অলঙ্কৃত করা হয়'।[৮] আবার কারও কারও ধারণা, পাহাড়পুর বা ময়নামতীর বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত টেরাকোটা ফলকগুলির মত এ ধরনের শিল্পের বেশ কিছুকাল পরেও আর কোন মন্দির বা বিহারে লক্ষ্য করা

যায় নি, প্রতিমা শিল্প-শাস্ত্রের কঠোর অনুশাসনের ফলে দীর্ঘকাল ধরে প্রাচীন শৈলীই পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলমানবিজয় ও পরবর্তী দীর্ঘ তিন শতক ধরে ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও মসজিদ স্থাপত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের ফলে মন্দির স্থাপত্য ও মন্দিরাশ্রিত 'টেরাকোটা'-শিল্পের বিকাশের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। সুলতানী শাসনের শেষ পর্যায়ে বাংলার মন্দিরস্থাপত্যের যে নতুন ক'রে অভ্যুদয় ঘটল, ('ইতিহাস অনুসন্ধানের ১৩ সংখ্যায় বাঙালির স্থাপত্যচর্চা শীর্ষক বর্তমান লেখকের নিবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে)। তার সঙ্গে মন্দিরাশ্রিত 'টেরাকোটা'—শিল্পেরও এক নতুন ধারার পত্তন হ'ল। অষ্টম-নবম শতকের পর এই দীর্ঘ বিরতি টেরাকোটা শিল্পের রূপ ও চরিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। খ্রীষ্টীয় পনের শতক থেকে মন্দির স্থাপত্যের যে নূতন শৈলী, যাকে 'বাংলা-শৈলী' বলা যায়, তার সঙ্গে যেন সামঞ্জস্য রেখে টেরাকোটা শিল্পের একটি নতুন ধারা জন্ম লাভ ক'রল। নব পর্যায়ের এই মন্দির-স্থাপত্য ও টেরাকোটা-অলংকরণের উদ্ভব ও বিকাশ বাংলায় শেষ-মধ্যযুগের এক স্মরণীয় ঘটনা। এই শিল্পসৃষ্টির পশ্চাতে সে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ও ইসলামীয় ধর্মীয় অনুশাসনের বিধিনিষেধের বেড়াজাল তখন অনেকটা দূরীভূত। রাজশক্তি তখন রাজনৈতিক সংকীর্ণতা থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে সাহিত্য ও শিল্পের পুনরুজ্জীবনে বাধা সৃষ্টি থেকে বিরত হতে পেরেছে। অন্যদিকে, লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যগাথা সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করায় কবিরা জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্যগুলি রচনা করতে শুরু করেছেন। রামকথা, ভারতকথা অবলম্বনে রামায়ণ ও মহাভারতের মতো জনপ্রিয় পাঁচালি কাব্যগুলি যেমন এ যুগে রচিত হচ্ছিল, তেমনি পৌরাণিক কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে কৃষ্ণমঙ্গল, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-জাতীয় কাব্যও রচিত হয়েছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই যে সমৃদ্ধি, তা এ-যুগের বাঙালি-মানসের সৃষ্টিকর্মের এক মহান্ অবদান। এরপর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বাঙালি জাতিকে এনে দিল নতুন প্রাণ, বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দিল প্রেমভক্তির বাণী। নূতন ক'রে বাংলাসাহিত্যে সৃষ্ট হোল, যা পরিণত হয় সুললিত কান্তকোমল পদাবলী সাহিত্যে! বলা বাহুল্য, এই সব কিছু মন্দির-শিল্পীদের প্রেরণার কাজ করেছিল।

পনের শতকে তৈরি দু'একটি 'চালা'শৈলীর মন্দির (গৌড়ে তথাকথিত ফৎ খানের 'দোচালা' সমাধি যা পূর্বে একটি হিন্দুমন্দির ছিল বলে বলা হয় এবং ঘাটাল কোন্নগরের (মেদিনীপুর) সিংহবাহিনীর 'চারচালা' (১৪৯০ খ্রী.) সাক্ষ্য দেয় যে এই ধরনের মন্দির আরও কিছুকাল আগে থেকেই তৈরি হ'তে শুরু করেছিল। কিন্তু তখনও টেরাকোটা, মন্দিরসজ্জার অঙ্গরূপে প্রচলিত হয় নি। অবশ্য, মসজিদগাত্রের টেরাকোটা ফলকে ফুল লতা-পাতার নকশা অনেক আগেই স্থান পেতে থাকে। মন্দিরগাত্রেও এই ধরনের বহু নকশা ফলক স্থান পেয়েছিল। মন্দিরগাত্রে টেরাকোটা-অলংকরণের আদিপর্বে এই ধরণের নকশাফলক মূর্তির বদলে প্রথমে স্থান পেতে থাকে। পূর্বোক্ত কোন্নগরের 'চারচালা'য় আমরা এই ধরণের প্রাচীন নকশা ফলক লক্ষ্য করেছি। অবশ্য এর সঙ্গে দু'একটি

কৃষ্ণমূর্তিও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ষোড়শ শতকের শেষদিকে টেরাকোটা মূর্তিফলক অল্প সংখ্যায় কোন কোন মন্দিরে স্থান পেতে থাকে। কিন্তু তখনও নক্শার প্রাধান্য খর্ব হয়ে যায় নি। দৃষ্টান্ত, হুগলির বৈঁচিগ্রাম, (গোপালজীউ), মুর্শিদাবাদের গোকর্ণ (নৃসিংহদেব) এবং বর্ধমানের বৈদ্যপুর (শ্রীকৃষ্ণ)। প্রায় এই সময়কার ছিল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের 'রাসমঞ্চ'। পরীক্ষামূলকভাবে এই অগভীরভাবে খোদিত টেরাকোটা ফলকগুলো বসানো হয়েছিল বলে মনে হয়। বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চে কীর্তনের যে কয়েকটি ফলক পাই, সেগুলিও কতকটা এই ধরনের—এর মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল নব প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবধর্মের সুদূরপ্রসারী প্রভাব যা আরও পরবর্তীকালে টেরাকোটা-অলংকরণের বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ।

মধ্যযুগে নবপর্যায়ের এই টেরাকোটা-শিল্পের উদ্ভবের পশ্চাতে এই যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কথা উল্লেখ করা হল, তা প্রাচীন বাংলার তুলনায় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রিক। এই টেরাকোটা-শিল্পের মধ্যে লোকায়ত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে স্থান পেয়েছিল। 'গ্রাম্য কৃষিজীবী জনসাধারণের ভাব ও চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ' দেশীয় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ, মঙ্গলকাব্য, বারমাস্যা, গীতিগাথা, পদাবলীতে দেশ ও জাতির যে মর্মবাণী ব্যক্ত হয়েছিল[১০], তারই প্রতিধ্বনি ইঁটের তৈরি মন্দিরের অসংখ্য টেরাকোটা ফলকে যেন শুনতে পাওয়া যায়। আজও সেগুলি বাংলার পল্লীর আনাচে-কানাচে বা কোন কোন শহরাঞ্চলে সেযুগের মানুষের ভাব ও চিন্তার পরিচয় বহন করছে।

টেরাকোটা-শিল্পের এই নতুন ধারা জন্ম নিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সামাজিক প্রেক্ষাপটে। প্রকার ও প্রকৃতিতে এর ভিন্নভাবে রূপায়ণ ঘটল। টেরাকোটা-শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছিলেন রামায়ণ মহাভারত, পুরাণ ও বিভিন্ন মঙ্গল ও পাঁচালী কাব্যের কথকতা, যাত্রা পালাগান শ্রবণ ও দর্শন ক'রে। তাঁরা প্রথাবদ্ধ শিক্ষায় তেমন শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট 'টেরাকোটা' মূর্তি ফলকসমূহে চিন্তা ও মননশীলতার অসাধারণ ব্যাপ্তি বিস্ময় সৃষ্টি করে। সর্বোপরি, সমসাময়িক বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের মহাপ্লাবন তাদের মানসলোককে এক উচ্চ ভাবধারায় অভিষিঞ্চিত করেছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাদের সামনে উজ্জ্বল দীপবর্তিকার মত বিরাজমান ছিলেন। অসংখ্য 'টেরাকোটা' মূর্তিফলকে যে ছবিগুলি তাঁরা অঙ্কিত করেছিলেন, তার মধ্যে গ্রাম্য লোকায়ত জীবনযাত্রার সঙ্গে সমকালীন লোকধর্ম বৈষ্ণব ভক্তিবাদের এক সমন্বয় ঘটেছিল।

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় লক্ষ্য করা গেছে যে পনের-ষোল শতকের ইঁটের মন্দিরে টেরাকোটা মূর্তি ভাস্কর্যের তেমন প্রচলন ঘটেনি। শুধুমাত্র পুরানো ধাঁচের কিছু কিছু কাল্পনিক লতাপাতা ও ফুলের নকশা (যে নকশাগুলি সুলতানী আমলের কোন কোন মসজিদে লক্ষ্য করা গেছে) ও টেরাকোটা ফুল ও তার সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে দু'চারটি মূর্তি, যেমন, মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি মন্দিরের সামনের দিকে, বিশেষ ক'রে খিলানপ্রবেশ পথের ওপরে স্থাপন করা হোত। ষোল শতকের একেবারে শেষের দিকে সংকীর্তনদৃশ্যের ফলক স্বল্প সংখ্যায় সন্নিবেশিত হ'তে থাকে (উদাহরণ, বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ)। এর পর সতের শতক থেকে টেরাকোটামূর্তি মন্দিরের অলংকরণ রূপে বিপুল

জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সতের শতককে 'টেরাকোটা'-শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এইসময়ে বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় (১৬৪৩), কেষ্ট রায় (১৬৫৫), মদনমোহন (১৬৯৪), বাঁশবেড়িয়ার (হুগলি) অনন্তবাসুদেব (১৬৭৯) প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মানের মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। এগুলির দেওয়াল অসংখ্য টেরাকোটা ফলকে অলঙ্কৃত করা হয়। এছাড়া গ্রাম-বাংলার নির্জন প্রান্তে কত শত মন্দির যে এই শতকে তৈরি হয় তার সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে, গাঙ্গেয় উপত্যকা সন্নিহিত স্থানসমূহে নরম পলিমাটিতে গড়া অসংখ্য টেরাকোটা-ফলক মন্দির অলংকরণের জন্যে ব্যবহৃত হ'তে থাকে। আঠার ও উনিশ শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে এই টেরাকোটা-ফলকের সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সতের শতক, এমন কি, আঠার শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত টেরাকোটা ফলকগুলি ক্ষুদ্রায়তন ও সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত ছিল। মূর্তিগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছাঁচে তৈরি হলেও শিল্পীর নিপুণ হস্তে তা ত্রিমাত্রিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। এগুলির প্রায় সবই পার্শ্বচিত্র, 'বাস-রিলিফে' খোদাই করা, আয়ত বা বর্গক্ষেত্রাকার ফলকের চারপাশে সূক্ষ্ম নকশা কাটা (শ্যামরায়, কেষ্ট রায়, অনন্তবাসুদেব, মদনমোহন)। এক সামগ্রিক সৌন্দর্য এই সময়ের ফলকগুলিতে রূপায়িত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে আর দেখা যায় না।

নবপর্যায়ের এই 'টেরাকোটা'-মূর্তিসজ্জার বিষয় ও সংস্থান পদ্ধতির জন্য সাধারণভাবে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলা হোত। বিষয়বস্তুকে মোট তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—রাম-কাহিনী ও মহাভারত-উপাখ্যান, কৃষ্ণলীলা ও সামাজিক। এছাড়া, পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি সন্নিবেশও লক্ষ্য করা যায়। লক্ষণীয়, বৈষ্ণব, শাক্ত, এমনকি শিবের মন্দিরে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পারিষদবর্গের সংকীর্তন দৃশ্যফলক বিপুল সংখ্যায় বসানো হয়। রাম কাহিনীর মধ্যে আবার কয়েকটি ঘটনা, যেমন, সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন, মারীচবধ, সীতাহরণ ও জটায়ু, লঙ্কাযুদ্ধ, রাম-রাবণের মুখোমুখি সংঘর্ষ, রামরাজা টেরাকোটা-'মোটিফ' রূপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং টেরাকোটাসজ্জিত প্রায় প্রতিটি মন্দিরে পাওয়া যায়। মহাভারত-কাহিনী রামকথার মতো টেরাকোটা শিল্পীদের কাছে ততটা জনপ্রিয় হয়নি। কারণ, এর দৃশ্যফলক খুব কমই পাওয়া যায়। তবে, মহাভারতের জনপ্রিয় 'মোটিফ' কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা। মহাভারত ও পুরাণের কৃষ্ণের জনপ্রিয়তা এত বেশি যে মহাভারতের অন্য কাহিনী তার কাছে ম্লান হয়ে গেছে। কৃষ্ণলীলার অসংখ্য ফলক সতের-আঠার শতকের মন্দিরে অজস্র পাওয়া যায়। তবে বাল্যলীলার থেকে শ্রীকৃষ্ণের গোপীবিলাস বিশেষ গুরুত্ব পায়। বাল্যলীলার মধ্যে ননীচুরি, কালীয়দমন, শকটাসুর, তৃণবর্তা সুরবধ অনেক মন্দিরে দেখা গেলেও বস্ত্রহরণ, নৌকাবিলাসদৃশ্য প্রায় মন্দিরেই লক্ষ্য করা গেছে। এই কালের টেরাকোটা ফলকে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তির চেয়ে তাঁর দশাবতার মূর্তি বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু দশাবতারের অন্যতম বুদ্ধের বদলে জগন্নাথ বা কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের মূর্তি পাওয়া যায়। আর প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ দেবদেবীর যে মূর্তি ফলক পাওয়া যায়, এইকালে তা একেবারেই বিস্মৃত। পক্ষান্তরে, শিব, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী সরস্বতী প্রায় সব মন্দিরেই উপস্থিত। 'শিববিবাহ'

একটি জনপ্রিয় 'মোটিফ' রূপে বহু মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে বিশেষ করে আঠারো-উনিশ শতকের মন্দিরে। লৌকিক দেবীর মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলের 'কমলে-কামিনী'কে ধনপতি ও শ্রীপতির দুদিকে নৌকাযাত্রার মাঝখানে দেখানো হয়েছে।

সমাজজীবনের বিভিন্ন দৃশ্য এইসময়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর মধ্যে রাজা বা জমিদারের শিকারযাত্রা, যুদ্ধদৃশ্য, অপরাধীর শাস্তির জন্য হিংস্র জন্তুর মুখে নিঃক্ষেপ, হার্মাদদস্যু-রণতরী ও যুদ্ধজাহাজ, তামাকুসেবী বাবু, সাধু-সন্ন্যাসী, মোহন্ত, মুঘল-পাঠানসেনার যুদ্ধযাত্রা ও কুচকাওয়াজ, ফিরিঙ্গিসেনা, মিথুনদৃশ্য, ভালুকনাচ, বাজিকর, চড়কদৃশ্য, মহিলার শিব পূজা, হরিণশিকার, ঝাম্পানে জমিদারের গমন, য়ুরোপীয়দের তামাকুসেবন প্রভৃতির অজস্র 'টেরাকোটা'ফলক পাওয়া গেছে। ষোল শতকে এদেশে য়ুরোপীয়দের আগমন এবং দীর্ঘকাল ধ'রে বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রার বহু দৃশ্যফলকও শিল্পীরা তৈরি করেছিলেন।

মূর্তিফলক সন্নিবেশের যে পদ্ধতি বা নীতি এই সময়ে প্রচলিত হয়েছিল, তাতে দেখা যায়, একেবারে নীচের দিকে (ভিত্তিবেদির সংলগ্ন মন্দির দেওয়ালে) পশুপক্ষী ও অন্যান্য জীবজন্তুর ছবি, এর ঠিক ওপরের প্যানেলে আকর্ষণীয় সামাজিক দৃশ্য। এর পর স্তম্ভ এবং দুপাশের দেওয়ালের ছোট্ট ছোট্ট কুলুঙ্গীতে উল্লম্বভাবে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিফলক বসানো হোত। ছাদের সংলগ্ন বক্রাকৃতি কার্নিশের নীচে আনুভূমিক রেখায় অবস্থিত কুলুঙ্গীসমূহেও বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবী, সাধু-সন্ন্যাসীর মূর্তিফলক স্থাপনের রীতি প্রচলিত হয়। এর নীচে এবং খিলান প্রবেশ পথের উপরে যে বিস্তীর্ণ অংশ (প্রস্তার) থাকে, তাতে রামায়ণ বা মহাভারত কাহিনী, বিশেষ করে রাম-রাবণের সম্মুখ-যুদ্ধ এবং কৃষ্ণ-লীলার বিভিন্ন দৃশ্যফলক স্থাপন করা হোত । এই বিস্তীর্ণ অংশটিকে তিনটি ভাগে ভাগ ক'রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রস্থে লঙ্কাযুদ্ধ দৃশ্যকে আকর্ষনীয় করে তোলা হোত। এর দুপাশের প্রস্থে হয় রামায়ণের অন্যান্য কাহিনী অথবা কৃষ্ণলীলার নানা কাহিনীর ফলক বসানো হোত। যেসব মন্দিরের দুই বা তিনদিকের দেওয়ালেও টেরাকোটা ফলক বসানো হোত, (যেমন শ্যামরায়, কেষ্টরায়, মদনমোহন, অনন্তবাসুদেব) সেখানেও ঐ একই রীতি প্রচলিত ছিল।

নব পর্যায়ের এই 'টেরাকোটা'-শিল্পের অবক্ষয় শুরু হয় আঠার শতকের শেষ দিক থেকে। যদিও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বহু টেরাকোটা-অলংকরণযুক্ত মন্দির তৈরি হয়েছে, কিন্তু মূর্তিফলক ও ফুলকারি নক্‌শাগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্মতা ও ত্রিমাত্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টির সাধনা একসময় শিল্পীদের মন অধিকার ক'বত, তার বিশেষ অভাব দেখা দিল। পরিবর্তে, মূর্তিগুলির দেহসৌষ্ঠবে এল স্থূলত্ব ও রেখার বিন্যাস। ফলকগুলোতে মূর্তিকে সোজাসুজি দেখানো হ'তে থাকল। সুদক্ষ শিল্পীর অভাব ও এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাস পেল। অলংকরণবিহীন বহু মন্দির তৈরি হোল। উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বর্তমান বিংশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত মন্দিরেও 'টেরাকোটা' সন্নিবেশ দেখা যায়। কিন্তু তা নিতান্ত দায়সারা গোছের। তবুও মনে হয় এ শিল্পের মৃত্যু নেই।

সূত্রনির্দেশ

১। রায়, নীহাররঞ্জন, **বাঙ্গালীর ইতিহাস**. দে'জ ২য় সং ১৪০২, পৃ. ৬৫৬-৬৫৮
'এই চারি-পাঁচ শতাব্দীর শিল্পে বৃহৎ জনসাধারণের বিশেষ কোন স্থান নেই; যাঁহাদের আছে তাঁহারা পুরোহিত শ্রেণীর এবং অল্পবিস্তর বিত্তশালী সমৃদ্ধ সংকীর্ণায়তন গোষ্ঠীর লোক...'

২। রায় নীহাররঞ্জন, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৬৪৮-৬৪৯।

৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫৩।

৪। তদেব পৃ. ৬৫৪।

৫। তদেব পৃ. ৬৫৩।

৬। তদেব পৃ. ৬৫০

৭। সরস্বতী সরসীকুমার, রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত **'হিস্টরি অব্ বেঙ্গল'**, ভলিয়ু মঠ, স্কাল্‌পচার, পৃ.৪৫-৪৭, **হিস্টরি অব্ অ্যানসেন্ট বেঙ্গল**, পৃ ৬৩৩-৬৩৪

৮। মজুমদার রমেশচন্দ্র, **হিস্টরি অব অ্যানসেন্ট বেঙ্গল**, পৃঃ ৬৩৪-৬৩৬

৯। ম্যাককাচ্চন ডেভিড্, 'বাংলার মন্দিরে পোড়ামাটির অলঙ্করণ', **'পশ্চিমবঙ্গ'**, ৭ই জুলাই ১৯৭২, পৃ. ৬৮২ ('সাহিত্যপত্র' ১৩৭৭ এর আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত এবং **'পশ্চিমবঙ্গ'** পত্রিকায় সংক্ষেপে পুনর্মুদ্রিত)।

১০। রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত, পৃঃ .৬৫৪।

বিজয়নগর শহরের উত্থান ও পতন : একটি সমীক্ষা

অনিরুদ্ধ রায়

হাম্পি গ্রাম থেকে মাত্র কয়েকবছরের মধ্যে বিজয়নগরের সাম্রাজ্য তৈরী হওয়ার ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। অবশ্য স্বীকার্য্য যে এর পিছনের কার্য্যকারণ ভালোভাবে খোঁজা হয়নি। সমকালীন বাংলার রাজধানী গৌড়ের উত্থান এক শ্রেণীর, বিশেষত: উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতীক। ফলে গৌড়ের উপর অন্ততঃ রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘাটতি ছিল না। কিন্তু সমকালীন বিজয়নগর শহরের উপর লেখা বিরল।

ইংরাজ ঐতিহাসিক রবার্ট সিওয়েল।[১] ১৯০০ সালে বিজয়নগরের উপর যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তার প্রথমভাগে ছিল বিভিন্ন রাজবংশের রাজনৈতিক কার্য্যাবলীর ইতিহাস এবং শেষভাগে সমকালীন পর্তুগীজ ভ্রমণকারীদের বর্ণনার অনুবাদ।[২] উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কানিংহাম গৌড়কে "মুসলমান" ও "হিন্দু" শহর (লক্ষণাবর্তী)[৩] বলে নির্ধারণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, তখন সিওয়েল জঙ্গলে ঢাকা। মাটির তলায় লুকানো ও অবহেলিত "হিন্দু" শহরের খোঁজ পান। উল্লেখযোগ্য যে সিওয়েল মধ্যযুগের শহরটিকে রোমান্টিকতাব রাংতায় মুড়ে রাখলেও, ওঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে আছে প্রথম থেকেই।

বিজয়নগর শহব প্রতিষ্ঠার এগারটা পরম্পরা সিওয়েল উল্লেখ করেছেন।[৪] এর মধ্যে যেটি তিনি গ্রহণ করেছেন সেটি হল যে কুরুব জাতের দুই ভাই, হরিহর ও বুক্ক, ওয়ারাঙ্গল (তেলিঙ্গানারাজ্য) রাজার কোষাথানায় কাজ করতেন। ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানরা আক্রমণ করে লুঠতরাজ ও অগ্নি সংযোগ করলে, দুই ভাই পালিয়ে তুঙ্গভদ্রার তীরে আনেগুন্ডির রাজার কাছে কাজ নেয়। কিন্তু মুসলমানদের হাত থেকে ধর্ম ও রাজ্য রক্ষা করার জন্য তারা প্রতিজ্ঞা করে এবং আনেগুন্ডির রাজার মন্ত্রী ও কোষাধক্ষ্য পদে উন্নীত হয়। ১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দিল্লী থেকে পালিয়ে আসা মুহম্মদ এর ভাইপো বাহাউদ্দীনকে আশ্রয় দিলে সুলতান আনেগুন্ডি আক্রমণ করেন। যুদ্ধে সুলতান জিতে প্রথমে একজনকে রাজ্যভার দিলেও, কিছুকাল পরে হিন্দুদের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেন। কারণ ঐ অভিজাত হিন্দুদের দেশে রাজ্য চালাতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। সুলতান হরিহরকে রাজা ও বুক্ককে মন্ত্রী করে দেন[৫]।

উল্লেখযোগ্য যে উপরিউক্ত কাহিনীর পিছনে সম্পূর্ণ কোন পরম্পরা নেই—সিওয়েল

নিয়েছেন খণ্ডিত কিছু অংশ। বাকী অংশ পরবর্তীকালের পর্তুগীজ ভ্রমণকারীদের বাজার থেকে শোনা গল্প। আরো উল্লেখযোগ্য যে সিওয়েল যে পরম্পরাগুলি বাদ দিয়েছেন, তার মধ্যে ছিল সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যর দ্বারা বিজয়নগর শহরের প্রতিষ্ঠা। অন্ততঃ পাঁচটি পরম্পরার মধ্যেই ঐ বিদ্যারণ্য রয়েছে। কেন সিউয়েল এর একটিও নিলেন না খুব পরিষ্কার নয়। সম্ভবত: ঐ পরম্পরাগুলির মধ্যে মুসলমানের সঙ্গে সংঘাত নেই। ফলে মুসলমান বিদ্বেষও কম। পক্ষান্তরে সিওয়েল নির্ভর করেছেন ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের লেখার উপর যদিও ঐ সব ভ্রমণকারীরা ঘটনার অন্তত: দু'শ বছর পরে এসেছিলেন।

সিওয়েলের বক্তব্যর বিস্ময়কর পরিমার্জিত রূপ দেখা যায় সর্বভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ এর ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হাম্পি পুস্তিকাটিতে।[৬] এতে বিজয়নগরের উত্থানের ইতিহাস দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর ও মুহম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে দক্ষিণের রাজ্যগুলি প্রতিরোধ করতে থাকে যার চরম পরিণতি হচ্ছে বিজয়নগরের উত্থান, যেটি হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রধান স্তম্ভ হয়েছিল প্রায় চার শতাব্দী ধরে।[৭]

১৯৭৭ সালে বসুন্ধরা ফিলিওজা সিওয়েলের অনুদৃত অংশ পুন:প্রকাশ করেন। যার আব একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে।[৮] ভূমিকাটিতে ঐতিহাসিক তথ্য ভুল পরিবেশন করা হয়েছে এবং National Book Trust কিভাবে এই বই প্রকাশ করলেন, সেটাও আশ্চর্য্য। এই বইতে বসুন্ধরা বিজয়নগরের উত্থানের ইতিহাস এড়িয়ে গিয়েছেন কিন্তু যেহেতু শিলালেখ মিথ্যা বলে না, সেহেতু ১৩৪২ ও ১৩৪৫ সালের দুটি শিলালেখর সাহায্য নিয়েছেন।[৯] শিলালেখ দুটি জাল কিনা অর্থাৎ পরবর্তী কালে বানানো কিনা সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলেন নি। ১৯৮২ সালে প্রয়াত অধ্যাপক বার্টন ষ্টাইন বিজয়নগর নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন ১৩৫০ সাল থেকে যদিও কোন কারণ দেখান নি। কিন্তু নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর অভিমত "হিন্দু যোদ্ধা রাষ্ট্র" গ্রহণ করেছেন। অবশ্য ষ্টাইন বিজয়নগরের প্রসার যে শুধু ইসলামের অগ্রগতিকে ঠেকানোর জন্য হয়নি, এ কথা বলতে দ্বিধা করেন নি।[১০]

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দিল্লীর সুলতানদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে যার ফলে প্রান্তিক প্রদেশগুলিতে বিভিন্ন রাজবংশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পুরানো শহরগুলিতে এঁরা প্রথমে রাজধানী করলেও, পরে ঐ শহর ছেড়ে নূতন শহর বসিয়ে রাজধানী নিয়ে আসেন। বাহমণি সুলতানদের প্রথমে গুলবর্গাতে ও পরে বিদরে রাজধানী স্থানান্তরিত করা এই ধরনের দৃষ্টান্ত।

বিজয়নগরের উত্থানের আগে বিভিন্ন রাজবংশ হাম্পি নিজেদের অধীনে রেখে ছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাদামীর চালুক্যবংশ, কাদম্ব বংশ, হোয়সালা বংশ, যাদব, রাষ্ট্রকূট ও অনান্যরা। একাদশ শতাব্দীতে হাম্পির উনিশ কিলোমিটার দূরে পশ্চিম চালুক্যদের রাজধানী ছিল কাম্পিলিতে। হাম্পি এর অধীনে ছিল। ১৩২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে কাম্পিলি মুহম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

বহুকাল আগে পন্ডিত এস.কে আয়েঙ্গার লিখেছিলেন যে হোয়সালা বংশের রাজা বীর বল্লাল তৃতীয় বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এটির প্রতিষ্ঠার সময় দেন মুসলমানদের দ্বোর সমুদ্র আক্রমণের পরপরই। এই মতকে পরবর্তীকালে আরো প্রসারিত করা হয়েছে যে মালিক কাফুর বীর বল্লাল তৃতীয়কে দিল্লীতে বন্দী করে নিয়েছিলেন এবং সুলতান আলাউদ্দীন খলজী ওঁকে ছেড়ে দেন যার পরে বীর বল্লাল বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। আমীর খসরু এ সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। মনে হয় যে পরবর্তীকালের ফেরিস্তার রচনা থেকে এই অনুমান করা হয়েছে।[১২] বল্লালদেবের সমকালীন শিলালেখ থেকেও প্রমাণিত হয় যে তিনি দিল্লী যান নি। বল্লালদেব মারা যান ১৩৪২ সালে এবং দ্বোরসমুদ্রই তাঁর রাজধানী ছিল যেখান থেকে ওঁর শিলালেখ পাওয়া গিয়েছে।[১৩]

সমকালীন শিলালিপিগুলি ব্যবহার করে পন্ডিত ভেঙ্কটরামান্যা দেখাচ্ছেন যে বল্লালদেব বা তার পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় নরসিংহর সময়ে হাম্পি ছিল যাদব বংশের হাতে, হোয়সালা বংশের হাতে নয়। ১৩১০ সাল পর্য্যন্ত যাদবদের শাসন এখানে চলতে থাকে যার পর এটি কাম্পিলি ভীরাদেব এর হাতে যায়। ১৩২৭ সালে দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি মারা যান।[১৪]

এরপর প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে যে বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠাতা কে? দুটি তাম্র লেখনীতে (দুটোই ১৩৩৬ সালের) বলা হচ্ছে যে হরিহর প্রথম এর প্রতিষ্ঠাতা। দুটিই গ্রামদানের এবং গ্রামগুলির নাম ও সীমানা নিয়ে তফাৎ আছে। দুটি লেখনীতে বলা হচ্ছে যে হরিহর কুঞ্জর কোথায় রাজত্ব করতেন এবং তুঙ্গভদ্রা পেরিয়ে জঙ্গলে শিকার করতে করতে নানারকম অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হন। খোঁজাখুঁজির পর দেখা যায় বিরূপাক্ষ মন্দিরে সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্য তপস্যা করছেন যিনি ওখানে বিজয়নগর শহর প্রতিষ্ঠার অনুবোধ করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য দেখা গিয়েছে যে ঐ লেখনীপত্র জাল।[১৫] উল্লেখযোগ্য যে ধর্মীয় কাবণ আনুসাঙ্গিক এর মধ্যে থাকলেও, হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা মুসলমান বিদ্বেষ এর মধ্যে নেই। আরো দুটি শিলালেখ পাওয়া যায়—প্রথমটি ১৫৩৮ ও দ্বিতীয়টি ১৫৫৯ সালের। দুটিতেই বলা হচ্ছে যে প্রথম হরিহর শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্য শ্রীপাদ এব নামে বিদ্যানগর রাখেন। বলা প্রয়োজন যে বহু-শিলালেখতে বিদ্যানগর নামটি পাওয়া যায়, যদিও অনেকগুলি পরবর্তী কালে জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে বিদ্যারণ্য কোনভাবে এই প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফলে বলা যায় যে বিজয়নগরের আর একটি নাম ছিল বিদ্যানগর।[১৬]

সমস্যা এখানে যে ১৩৭৮ সালের একটি শিলালেখতে বলা হচ্ছে যে প্রথম হরিহরের কাছ থেকে সাম্রাজ্যের সমস্ত ধনরত্ন পেয়ে বুক্ক রাজা হেমকুন্ড পর্বতমালায় অদূরে শক্তপ্রাকার সমেত একটি বিশাল শহর তৈরী করেন।[১৭] কখন বুক্ক এই শহর তৈরী করেন? সমকালীন শিলালেখগুলি দেখলে বোঝা যায় যে বিজয়নগর শহর রাজধানী হিসাবে কাজ শুরু করে ১৩৪৭ সাল থেকে। যেহেতু প্রথম হরিহর ১৩৫৬ সাল পর্য্যন্ত বেঁচেছিলেন,

সেহেতু হরিহরও শহর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে প্রথম থেকেই বিজয়নগর স্বাধীন ছিল। অর্থাৎ তৃতীয় বল্লাল বা অন্য কারুর অধীনে ছিল না।

এবার আমরা দিল্লীর মুসলমান শাসকদের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে দক্ষিণ-ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গ একজোট হয়ে প্রতিরোধ করেছিল কিনা দেখব। বলা হয়েছে যে এই প্রতিরোধের চরম পরিণতি বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা।

কাম্পিলির মুম্মাদি সিঙ্গেঁয়া ১৩০০ সালে মারা গেলে পর তাঁর ছেলে খান্ডেয়রায় কাম্পিলদেব রাজা হন। ১৩০৩ সালে হোয়সালা বংশের তৃতীয় বল্লালকে আক্রমণ করে হঠিয়ে দেন। ১৩২৫ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ মাঝে মাঝে থেমে থেকে চলতে থাকে যার উল্লেখ সমকালীন শিলালেখতে পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের মধ্যে দিল্লির সুলতানদের আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। আগেই দেখেছি যে মালিক কাফুর রাজ্য অধিকার করেন নি—ধনরত্ন কেড়ে নিয়েছিলেন মাত্র। মুহম্মদ তুঘলক ১৩২৩ সালে ওয়ারাঙ্গল দখল করে তেলিঙ্গানাকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। কিন্তু তাঁর কাম্পিলি আক্রমণ আগ্রাসী নীতি নয়। মুহম্মদ এর সম্পর্কিত ভাই বাহাউদ্দীন শুরস্যাপ বিদ্রোহ করেন ও যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কাম্পিলিতে আশ্রয় নেন। মুহম্মদ-এর সেনাপতি খাজা জাহান কাম্পিলি দখল করেন ও রাজা যুদ্ধে নিহত হন। বাহাউদ্দীনকে তৃতীয় বল্লাল-এর কাছে পাঠানো হয়। খাজাজাহান অগ্রসর হলে পর তৃতীয় বল্লাল বাহাউদ্দীনকে খাজা জাহানের কাছে সমর্পণ করেন। একই সঙ্গে সুলতানের অধীনতা মেনে নেন।[১৮] সুতরাং একজোট হয়ে সশস্ত্র সামরিক প্রতিরোধের কাহিনী ঠিক নয়। এছাড়াও বলা হয় যে তৃতীয় বল্লাল যুদ্ধে বাহমণির আলাউদ্দীন হাসানকে পরাজিত করেছিলেন। বাহমণি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় ১৩৪৭ সালে এবং তৃতীয় বল্লালের মৃত্যু হয় ১৩৪২ সালে। সুতরাং ওদের মধ্যে কোন যুদ্ধ হয়নি।

১৩২৭ সালের পর কাম্পিলি দিল্লীর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে যায় ও ওখানে কাম্য নায়ক শাসনকর্তা হন মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে। ১৩৪৪ সালে তিনি আবার হিন্দু হয়ে বিদ্রোহ করে সফল হন।[১৯] কেউ কেউ একে বা এর ছেলেকে হরিহর বলেছেন। বিভিন্ন শিলালেখ থেকে জানা যায় যে ১৩৩৯ সাল থেকেই প্রথম হরিহর গুট্টি থেকে শাসন করছেন। ১৩৪০ সালের আর একটি শিলালেখতে দেখা যায় মহামন্ডলেশ্বর উপাধি নিয়ে বাদামীর উপর অধিকার বিস্তৃত করেছেন। ১৩৪৪ সালের আর একটি শিলালেখ থেকে জানা যায় যে বুক্ক বিদ্যানগর থেকে শাসন করছেন।[২০] সুতরাং কাম্পিলি রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর বিজয়নগর রাজ্য গড়ে উঠেছিল এবং কাব্য নায়ক বা তৃতীয় বল্লালের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি হরিহর যদি প্রথমে মুসলমান হয়ে পরে আবার হিন্দু হন, সমকালীন রাজনীতিতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ১৩৯৭ সালের সিমোগা শিলালেখ থেকে জানা যায় যে প্রথম বুক্কর (হরিহরের ভাই) একটি মুসলমান ছেলে ছিল।[২১] আসলে কাকতিয় বংশের সঙ্গে হরিহর-বুক্কর অনেক বেশী যোগ ছিল। কিন্তু সে প্রশ্ন আলাদা।

২৩ শে জানুয়ারী ১৫৬৫ সালে তালিকোটার যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়নগর-এর পরাজয় ঘটে। সিওয়েল দেখিয়েছেন যে এটি সম্মিলিত মুসলমান বাহিনীর আক্রমণ হিন্দু সৈন্যদের উপর। সিওয়েল লিখেছেন যে মুসলমানরা তৃতীয় দিনে শহরে পৌছায় ও লুটপাট করে এবং মন্দির, বাড়ী, প্রাসাদ ধ্বংস করে আগুন লাগিয়ে দেয়।[২২] এর আগে সিওয়েল লিখেছেন যে যুদ্ধের পরদিনই আশেপাশের উপজাতিরা শহরের দোকান, বাড়ী লুট করে সব ধন দৌলত নিয়ে গিয়েছে।[২৩] এর দুবছর পরে ইতালীয় পরিব্রাজক সিজার ফ্রেডারিকি এসেছিলেন। তিনি বলছেন বিজয়নগর শহর সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়নি। তখনো খালি বাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে ছিল যদিও শহরটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে বন্যজন্তুর আস্তানা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে এর মধ্যে তিনি বিজয়নগরের মুসলমান সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলেছেন এবং ঐ বিশ্বাসঘাতকতার প্রশংসা করেছেন।[২৪]

সর্বভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর পুস্তিকাতে শেষ যুদ্ধ ও পরাজয় একটু অন্যরকম ভাবে দেখানো হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে বিজয়নগরের সৈন্যরা প্রথমদিকে সাফল্য লাভ করেছিল এবং প্রায় যুদ্ধ জিতে গিয়েছিল। কিন্তু বিজয়নগরের দুজন মুসলমান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করায় অবস্থার পরিবর্তন হয় ও বিজয়নগরের সৈন্যদল পরাজিত হয়। কোথা থেকে এ তথ্য পাওয়া গেল তার কোন হদিস দেওয়া হয়নি।[২৫]

বসুন্ধরা ফিলিওজার লেখা ভূমিকাতে এটি আরো অন্যরকম। প্রথমে বলা হয় যে রামরায় (বিজয়নগরের রাজা) বিজাপুরের সুলতানের উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। কিন্তু বিজাপুরের সুলতান ও প্রায় দুহাজার মুসলমান বিজয়নগরের সৈন্য চরম মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। রামরায় তখন বৃদ্ধ এবং তিনি হাতীর পিঠে উঠে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন: কিন্তু হাতিটির আঘাতের ফলে উনি নেমে ঘোড়ায় চড়েন যারপর উনি বন্দী হন।[২৬] বসুন্ধরাও কোন সূত্র নির্দেশিকা দেন নি-ফলে কোথা থেকে এসূত্র পেলেন, সেটা বোঝা যায় না। কিন্তু ওঁর রচনা যে অনৈতিহাসিক তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

আলি আদিল শাহ বারবার রামরায় এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন প্রধানতঃ হোসেন নিজাম শাহর বিরুদ্ধে। কিন্তু রামরাজা এত ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করেন যে আলি আদিল শাহ রামরায় এর বিরুদ্ধে চলে যান। কুতুব শাহ ও আদিল শাহদের রাজ্যের বহু জায়গা তিনি দখল করে নেন। এর ফলে আলি আদিল শাহ চার রাজ্যের সম্মিলিত সৈন্যদল তৈরী করার আয়োজন করেন। সেসব খবর রামরায়ের কাছেও পৌছেছিল। অতএব ১৫৬৫ সালে রাম রায় ভাবতে পারেন না যে আলি আদিল শাহ তার পক্ষে লড়াই করবেন।[২৭]

যুদ্ধের বিবরণ[২৮] পাওয়া যায় ফেরিস্তার রচনাতে যিনি দাক্ষিণাত্যেই ছিলেন। তিনি লিখছেন যে রাম রায় তাঁর সেনাপতিদের অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে পাল্কী থেকে যুদ্ধ চালাবেন বলে মনস্থ করেন। তিনি হাতি বা ঘোড়া কোনটাই ব্যবহার করেন নি, যার ফলে সহজেই বন্দী হন। প্রথমদিকে সম্মিলিত বাহিনী পিছু হঠেছিল। এতে উৎসাহিত হয়ে

রাম রায় পাল্কী ছেড়ে একটি দামী সিংহাসনের উপর বসেন। সমকালীন পর্তুগীজ (unto) বা ফেরিস্তার রচনায় বিশ্বাসঘাতকতার কথা নেই। কিন্তু দুবছর পরে সিজার ফ্রেডারিকি দুজন মুসলমান সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলেন। যেটি পরে পল্লবিত হয়ে দুহাজারে দাঁড়ায়। হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শে তৈরী বিজয়নগরকে মুসলমান আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে অন্য কোন হিন্দু রাজা এগিয়ে আসেন নি। যুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যারা বিদ্রোহ করে, তারা কেউই মুসলমান নয়। মনে হয় ঐসব অভিজাত তালিকোটার যুদ্ধে রাম রায়কে সাহায্য করেনি। বিজয়নগরের ছয়লাখ সৈন্যের মধ্যে একটা ছোট অংশ যুদ্ধ করেছিল বলে মনে হয়। যুদ্ধের পরে যে সব উপজাতিরা শহর লুট করে তারা কেউই মুসলমান নয়। আসলে এত বড়, ধনী ও ক্ষমতাসম্পন্ন সাম্রাজ্য মাত্র একটা যুদ্ধে শেষ হয়ে গেল কেন সেটাই প্রশ্ন। আমরা সেটারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

৩

ইরফান হাবিব মধ্যযুগের শহরকে পরগাছা বলে অভিহিত করেছেন এই ভাবে যে গ্রামাঞ্চল থেকে সবকিছুই এখানে আসে যার বদলে গ্রামাঞ্চল কিছু পায় না। কিন্তু বহু শহরের প্রান্তে ছোট ছোট কারখানা ও শ্রমিক ছিল যারা গ্রামাঞ্চলের কাঁচা মাল কিনে শহরে পণ্য হিসাবে তৈরী করে বিক্রী করত। এতে গ্রামাঞ্চল কিছু পেত। বিজয়নগরের ক্ষেত্রে এটা কতটা পাওয়া যায় সেটি আমরা দেখব।

সমকালীন ভ্রমণকারীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী বলা যায় যে বিজয়নগর শহরের ব্যাসার্ধ প্রায় ষাট বর্গমাইল[২৯] যদিও শহরের মধ্যে অনেকটা জায়গা উঁচু পাহাড়ে ঢাকা। নানা দিক থেকে বিবেচনা করলে এর জনসংখ্যা ধরা যায় প্রায় পাঁচ লক্ষ, যে সংখ্যা সমকালীন গৌড় বা ফতেপুর সিক্রী শহরের প্রায় দ্বিগুণেরও বেশী। ফলে বিজয়নগরের জনসংখ্যার ঘনত্ব ঐ দুই শহরের থেকে কম—প্রায় ১২০০ লোক প্রতি বর্গমাইলে। যদি প্রাসাদ এলাকা, মন্দির, রাস্তা ইত্যাদি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে ঘনত্ব আরো বাড়বে।[৩০]

এই বিশাল জনবহুল শহরের প্রধান সমস্যা খাবার ও অনান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জোগান দেওয়া। সমকালীন ভ্রমণকারীরা বলেছেন যে শহরের মধ্যে কিছু জায়গায় ধান ও তরকারীর চাষ হয়, যেটি মধ্যযুগীয় শহরের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ঐ উৎপাদন অল্প কিছু লোকের চাহিদা মেটাতে পারে। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী নুণিজ বলেছেন যে শহরে কোন খাবার উৎপাদন হয় না—প্রতিদিন বলদে করে বাইরে থেকে মাল আসে। আর একজন ভ্রমণকারী বলেছেন যে দূরদূরান্ত, এমনকি মালাবার থেকেও মাল আসে।[৩১] ফলে বলা যায় যে শহরটি শুধু গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত ছিল তাই নয়, তাদের উপর নির্ভরশীলও ছিল। গ্রামাঞ্চলের খাজনার অর্ধেক আসত এই শহরে, যার অর্ধেক রাজা ব্যয় করতেন শহরে সৈন্য, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি রাখার জন্য।[৩২]

উল্লেখযোগ্য যে ভ্রমণকারীরা বলছেন যে বাইরের উৎপাদনের দামের তুলনায় শহরের ভিতরে দাম কম। কিন্তু এইসব মাল শহরে আসার জন্য কর দিতে হত।[৩৩] এসব সত্ত্বেও শহরের মধ্যে দাম কম কেন, সেটা দেখতে গেলে কর ব্যবস্থার স্বরূপ দেখা দরকার। এটাও

মনে রাখা দরকার যে বাইরে উৎপাদক যখন শহরের বাইরে সরাসরি বিক্রী করছে, তখন বেশী দাম পাচ্ছে।

রাজা প্রদেশের বিভিন্ন জায়গা অভিজাতদের কাছে ইজারা দেন। এমনকি বিজয়নগরের প্রধান দরজার করও ইজারা দেওয়া হত। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী বলছেন যে অভিজাতরা প্রদেশের উৎপাদনের নয়-দশমাংশ কর হিসাবে নিত, যদিও আইন ছিল এক-ষষ্ঠমাংশ কর নেওয়ার।[২৮] মনে হয় বেশী লাভ করার জন্য এই কর নেওয়া হত শস্যে, যেটি জমির ইজারাদাররা বণিকের কাছে বিক্রী করে দিতেন। ঐ বণিকরা বহু বলদে করে ঐ শস্য চালান দিত বিজয়নগরে, যেখানে কব দেবার পরও শস্যর দাম ছিল বাইরে খুচরো বিক্রেতার দামের থেকে কম। ফলে বিজয়নগর শহরে বড় বড় বাজার তৈরী হয়েছিল যেখানে প্রচুর শস্য ও অন্যান্য খাবার কম দামে পাওয়া যেত।

এই কর যে প্রায় জোর করে চাপানো হত তার বহু প্রমাণ আছে। কিছু জমি ছিল গ্রামের পঞ্চায়েতের হাতে। তাদের কর ছিল পরম্পরা অনুযায়ী বাঁধা। তার উপর কিছু বেশী দাবী করলে প্রতিবাদ হত—এমনকি চাষ আবাদ ছেড়ে গ্রামের লোকরা চলে যাচ্ছে, এবকম প্রমাণও রয়েছে। দাবী তুলে নিলে তারা ফিরে আসছে।[২৯] কিন্তু অন্যান্য জায়গায় এত বেশী কর দেবার ফলে কৃষকের অবস্থা ছিল শোচনীয়। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী বলছেন যে কৃষকরা ছিল অত্যন্ত গরীব। বিজয়নগরের কৃষি উৎপাদন বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হয়েছিল। এর ফলে শ্রেণী বিভাজন খুব স্পষ্ট হতে থাকে।

বিজয়নগর শহরের মধ্যেও শ্রেণী বিভাজনের চেহারা পাওয়া যায়। রাজপ্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন এলাকা অভিজাতদের জন্য আলাদা করা ছিল।[৩০] সূশাই বাজারের সামনের রাস্তায় তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার তৈরী করা হয়েছিল, যার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর জন্য বারান্দা দেওয়া বাড়ী ও নিম্নশ্রেণীর জন্য সাধারণ ছোট ঘর-এর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। রাজার জন্য অবশ্য আলাদা প্রাসাদ ছিল।[৩১] কৃষি উৎপাদনকে বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত করা, যা দিয়ে বাইরে থেকে অভিজাত ও সৈন্যদের জন্য ঘোড়া ও বিলাসদ্রব্য কেনা হত এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের সম্পর্ক শ্রেণী বিভাজনের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় বিজয়নগর শহর ক্রমশঃ বিলাসনগরীতে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যের আদর্শ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি এই বিলাস বৈভবকে টিকিয়ে রাখতে থাকে।

বিজয়নগর ব্রাহ্মণ্যধর্মকে আশ্রয় করলেও, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোরতা এখানে ছিল না। রাজা গরু ও বলদের মাংস ছাড়া আর সব ধরনের মাংস খেতেন। অভিজাতরা শুধু সব ধরনের জীবজন্তু রাজাকে উপহার দিচ্ছেন তাই নয়।[৩২] শহরের বাজারে সবরকম পশু, পাখী জীবন্ত বিক্রী হত।[৩৩] নবমীর উৎসবে মোষ বলি হত। সেটি পর্তুগীজ ভ্রমণকারী দেখেছেন।[৩৪] সুতরাং হিন্দুধর্মের কঠোরতা বিজয়নগরে দেখা যায় না।

বিজয়নগরের সৈন্যদলে বহু মুসলমান ছিল[৩৫] এবং তারা শহরের মধ্যে আলাদা জায়গায় বাস করত।[৩৬] এরকমও বলা হয়েছে যে রাজার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা ছিল মুসলমান। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলছেন যে বিজয়নগরের রাজারা ক্রমাগত মুসলমান রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও তাদের ধর্মে হাত দেন নি। তিনি আরো বলেছেন যে দ্বিতীয়

দেবরায় মসজিদ তৈরী করে দিয়েছিলেন, যদিও তার অবস্থান নিয়ে বিতর্ক আছে। এছাড়াও প্রচুর বিদেশী বণিক আসত। যার মধ্যে সম্ভবতঃ জৈনরাই বেশী। এছাড়া পর্তুগীজরা ও বৌদ্ধরাও আসত। প্রচুর জৈন ও বৌদ্ধ মন্দির পাওয়া গিয়েছে—এমনকি স্থাপত্যশৈলীতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও ইসলামীয় রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়।[illegible] অর্থাৎ বিজয়নগরে একটা মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যার ইঙ্গিত প্রয়াত বার্টন ষ্টাইন দিয়েছেন।

এই মিশ্র সংস্কৃতির চেহারা স্পষ্ট হয়ে আসে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বর্ণনার মধ্যে। পর্তুগীজ ভ্রমণকারীরা এগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন ও বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। এই সব বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ, ঘোড়া ও দেবদাসীদের নাচ ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ।[illegible] ফলে দেবদাসীদের অবস্থা খুব ভালো ছিল। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী পায়েস বলেছেন যে অচ্যুৎ রায়ের মন্দিরের সামনের রাস্তায় সারি সারি বাড়ী ছিল তাদের এবং এদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত ধনী।[illegible] অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোরতা আমরা বিজয়নগরের অনুষ্ঠানে পাই না। উল্লেখযোগ্য যে এই সব অনুষ্ঠানে তুঙ্গভদ্রা নদীর কোন স্থান নেই। শহর প্রসারিত হচ্ছে নদীর পাড় দিয়ে নয়, পশ্চাদভূমির দিকে যেখান থেকে খাজনা ও চালান আসবে। পাহাড় এখানে অনেক বড় ভূমিকা নিয়েছিল। অমর কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়েব রচনা সত্ত্বেও ব[illegible] যায় যে তুঙ্গভদ্রার তীর বিজয়নগরের জগতে উপেক্ষিত।

এই বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা, যেখানে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে চলেছে, কৃষিউৎপাদন বাজারী পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে শহরের বিলাস বৈভব ও শ্রেণী বিভাজন তৈরী করছে, যেটি মিশ্রসংস্কৃতির আদর্শ বলে মেনে নিচ্ছে। বিশাল শহর যেখানে গ্রামাঞ্চলের রসদে পরগাছায় পরিণত হচ্ছে। এই অবস্থায় আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে আসে যার প্রমাণ পাওয়া যায় সমকালীন শিলালেখতে সযত্নে রক্ষিত প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে। সুতরাং তালিকোটার যুদ্ধ এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ মাত্র। হিন্দু প্রতিরোধ হলে যুদ্ধের পরেই শহরে চারপাশের উপজাতিদের আক্রমণ হত না বা বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দু অভিজাতরা বিদ্রোহ করতনা। বিজয়নগরের প্রধান দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে গিয়ে শুধু মুষ্টিমেয় মুসলমান সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস লিখলে সত্য কোনদিনই উদঘাটিত হবে না।

সূত্রনির্দেশ

১। রবার্ট সিওয়েল: **এ ফরগটন এম্পায়ার**, ন্যাশনাল বুকট্রাস্ট, ১৯৭০

২। ঐ, ২২৮ পৃষ্ঠা থেকে শেষ।

৩। আলেকজাণ্ডার কানিংহামের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিবেদন, খণ্ড ১৫ (এ ট্যুর ইন বিহার এ্যাণ্ড বেঙ্গল ইন ১৮৭৯-৮০), কলিকাতা, ১৮৮২।

৪। সিওয়েল, পৃ. ১৯-২২।

৫। ঐ, পৃ. ২২।

৬। ডি. দেবকুঞ্জরী : **হাম্পি**, সর্বভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ, ১৯৮৩।

৭। ঐ, পৃ. ৫।

৮। বসুন্ধরা ফিলিওজা (সম্পাদিত) : **দ্য বিজয়নগর এম্পায়ার,** ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অব **ইন্ডিয়া**। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮০, প্রথম ষোল পাতা ভূমিকা।

৯। এই দুটি শিলালেখর সাহায্যে উনি বলছেন যে হরিহর ও বুক্ক হোয়সালাদের অধীনে কাজ করতেন (পৃ.১)।

১০। বার্টন স্টাইনর প্রবন্ধ "বিজয়নগর, আনুমানিক ১৩৫০-১৫৬৪" **দ্য ক্যাম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া**, প্রথম খণ্ড, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮২, পৃ. ১০২ এর পর।

১১। এস. কে আয়েঙ্গার। **সাউথ ইন্ডিয়া এ্যান্ড হার মহমেডান ইনভেডারস,** মাদ্রাজ ও প্রবন্ধ **কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া,** তৃতীয় খন্ড।

১২। মুহম্মদ কাসিম ফিরিস্তা বিরচিত **ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস** (বাংলা অনুবাদ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ (অনুবাদক : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)। কিন্তু ফিরিস্তা কোথাও বলেন নি যে তৃতীয় বল্লালসেনকে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

১৩। এন. ভেঙ্কট রামান্যা . **বিজয়নগর : অরিজিন অফ দ্য সিটি এ্যান্ড দ্য-এম্পায়ার,** নিউ দিল্লী, ১৯৯০ (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩), পৃ. ১৩-১৪।

১৪। ঐ। পৃ. ২০-২২। সুতরাং বসুন্ধরা ফিলিওজার মতামত যে হাম্পি হোয়সালা বংশের হাতে ছিল, এটা মানা যায় না।

১৫। ঐ। পৃ. ৪৮-৫০।

১৬। ঐ। বিস্তৃত আলোচনা। পৃ. ৪৮-৫৬।

১৭। ঐ। পৃ. ৫২-৫৩।

১৮। ফেরিস্তা। পৃ. ৩৩২-৩৩৪। উনি বল্লাল দেবকে বিলকদেব বলছেন।

১৯। জিয়াউদ্দিন বারানী বিরচিত **তারিখ-ই ফিরোজশাহী**। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২ (গোলাম সামদানী কোরায়শী অনুদৃত)। পৃ. ৩৯৯-৪০০।

২০। ভেঙ্কট রামান্যা, পৃ. ৯৪-৯৫।

২১। ঐ। পৃ. ৯৬।

২২। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক কুটোর লেখার উপর ভিত্তি করে সিওয়েল লিখেছেন (পৃ. ১৯৯-২০০)। কেন সিওয়েল ফেরিস্তার বর্ণনা নিলেন না বোঝা যায় না। ফেরিস্তা লিখেছেন যে দশদিন পরে সম্মিলিত বাহিনী বিজয়নগর শহরে পৌছায়।

২৩। সিওয়েল, পৃ ১৯৯।

২৪। জে.টি.হুইলার : **আর্লি ট্রাভেলস ইন ইন্ডিয়া,** ভারতীয় সংস্করণ, নিউদিল্লী, ১৯৭৪। পৃ ১৩৬-১৩৭, যার মধ্যে ফ্রেডারিকের বক্তব্য রয়েছে।

২৫। **হাম্পি,** পৃ. ১০।

২৬। **দ্য বিজয়নগর এম্পায়ার**। পৃ. ১২-১৩। যদি ফ্রেডারিকির লেখা থেকে নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সৈন্য সংখ্যা ভুল দেওয়া হয়েছে। ফ্রেডারিকি সাত বা আট হাজার সৈন্যর কথা বলেছেন (পৃ. ১৩৬)।

২৭। হারুণ খান শেরওয়ানী এই যুদ্ধের বিভিন্ন পর্য্যায় নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন প্রধানত : তারিখ-ই কুতুব শাহী ও ফেরিস্তার বিবরণের উপর ভিত্তি করে। রাম রায় বিভিন্ন সুলতানদের মধ্যে বিরোধ বাড়িয়েছিলেন এবং আলি আদিল শাহ ও ইব্রাহিম কুতুব শাহর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল। কিন্তু রাম রায়ের সৈন্যদের আহমদনগর লুট করা ও মসজিদগুলি অপবিত্র করার ফলে ইব্রাহিম ও আলি আদিল একজোট হয়ে রাম রায়

এর বিরুদ্ধে যান (**হিস্ট্রি অফ দ্য কুতুব শাহ ডাইনাস্টি**, নিউ দিল্লী, ১৯৭৪, পৃ. ১৪০-১৪১)।

২৮। যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন শেরওয়ানী বিভিন্ন সূত্র থেকে (ঐ, পৃ. ১৪২-১৫৬)। উনি একে বাণিহাট্টির যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন।

২৯। নিকোলাই কান্ট (দ্রষ্টব্য : আর.এইচ. মেজর : **ইন্ডিয়া ইন দ্য ফিফটিনথ সেঞ্চুরী**। নিউ দিল্লী, ১৯৭৪, পৃ. ৬)। ফ্রেডারিকি বলেছেন আশী মাইল (ঐ, পৃ. ১৪৩)।

৩০। আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য অনিরুদ্ধ রায়ের প্রবন্ধ "কোর্ট এ্যান্ড দ্য সিটি ইন মিডিয়াভাল ইন্ডিয়া" (এম. আইমার ও এম.এ. রোমানী (সম্পাদিত) : **লা কুর কম ইনস্টিটিউসন ইকনমিক**, প্যারিস, ১৯৯৮, পৃ. ১৯৮)।

৩১। সিওয়েলের অনুবাদ : পায়েস, পৃ. ২৪৮; নুণিজ, পৃ. ৩৪৭।

৩২। নুণিজ, পৃ. ৩৬০।

৩৩। ঐ। পৃ. ৩৪৭।

৩৪। ঐ। পৃ. ৩৬০।

৩৫। টি.ডি মহালিঙ্গম : **এ্যাডমিনিস্ট্রেসন এ্যান্ড সোসাল লাইফ আন্ডার বিজয়নগর**, মাদ্রাজ, ১৯৬৯, দুই খন্ড, খন্ড ১, পৃ. ৪৫ ও তারপর।

৩৬। দ্রষ্টব্য কে.ডি. মরিসনের প্রবন্ধ "প্যাটার্নস অফ আরবান অকুপেসন : সারফেস কনেকসন এ্যাট বিজয়নগর" (**সাউথ এশিয়ান আর্কিয়োলজী**, ১৯৮৭, পার্ট ২। পৃঃ ১১১১—১১২৫)।

৩৭। পায়েস, পৃ. ২৫১।

৩৮। নুণিজ, পৃ. ৩৫২।

৩৯। পায়েস, পৃ. ২৪৮ ২৪৯।

৪০। ঐ। পৃ. ২৬৪।

৪১। ঐ। পৃ. ২৬৭।

৪২। ঐ। পৃ. ২৪৭-২৪৮।

৪৩। এ.এইচ. লংহার্স্ট : **হাম্পি রাইনস**, ভারতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬ এ পুনমুদ্রণ। উনি স্থাপত্যশৈলীতে ইন্দো-সারাসেনিক রীতির কথা বলেছেন।

৪৪। মহানবমী উৎসবের বর্ণনা, পায়েস, পৃ. ২৫০ ও তারপর।

৪৫। পায়েস, পৃ. ২৬০।

মুদ্রা হিসাবে কড়ি

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

'সুবর্ণ, রজত, তাম্র প্রভৃতি ধাতু অতি প্রাচীন কাল হইতে বিনিময়ের স্থায়ী উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। স্থানে স্থানে লৌহ, সীসক, পিত্তল, এমন কি টিন পর্যন্ত বিনিময়ের উপকরণস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে।'[১] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'প্রাচীন মুদ্রা' নামক গ্রন্থে প্রাচীন কালের মুদ্রার উপকরণ হিসাবে কড়ির উল্লেখ করেন নাই। যদিও, 'প্রাচীন মুদ্রা' বাংলা ভাষায় মুদ্রা বিষয়ক একখানি তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। অবশ্য, প্রাচীন কাল হইতেই কড়ি মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং প্রাক-আধুনিক কালেও তাহার প্রচলন ছিল। তাহা ছাড়া, মুদ্রা হিসাবে কড়ি কেবল ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল তাহা নহে। ইহা মুদ্রা হিসাবে দক্ষিণ এশীয়দেশ, আফ্রিকা এবং ইউরোপেও কড়ি প্রচলিত ছিল। 'অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কড়ির চাহিদা ছিল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিল ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দের চৌঠা সেপ্টেম্বর তারিখের এক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন যে, সারাবৎসর যে সকল কড়ি রাজস্ব হিসাবে আদায় হইবে তাহা প্রতিমাসে থলিতে পুরিয়া এক্সপোর্ট ওয়ারহাউসের রক্ষকের নিকট পাঠাইতে হইবে। ইংলণ্ডে কড়ির অভাব অনুভব হইবার পূর্বেই উহা যেন জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে সরবরাহ করা যাইতে পারে।'[২] 'অতি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীর অনেক অংশের ন্যায় ভারতবর্ষেও মুদ্রা হিসাবে কড়ি ব্যবহারিত হইত।'[৩] 'মালদ্বীপের লোকেরা নিজেদের মধ্যে যা-কিছু কেনা বেচার কাজ কড়ি দিয়ে করে।...বাংলা দেশে কড়ির চলন আছে। ইয়েমেনের লোকেরাও নেয়।... সুদানেও কড়ির চল রয়েছে।'[৪] 'এমনকি আমেরিকার বিভিন্ন দ্বীপেও এগুলি (কড়িগুলি) সরবরাহ করে তারা (মালদ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীগণ) মুদ্রার চাহিদা মেটাতো।'[৫]

সুতরাং উপরের আলোচনা অন্তে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল মহাদেশেই কড়ির মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই ছিল। ধাতু-নির্মিত মুদ্রার সহিত কড়ি এক-সময় পর্যন্ত সমমর্যাদায় একটি নিম্নতম একক হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে কড়ির একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মর্যাদা ছিল। প্রাচীন কালের ভারতীয় মুদ্রা নিষ্ক (স্বর্ণমুদ্রা), পুরাণ বা ধরণ (রজত মুদ্রা), কার্যাপণ (তাম্র মুদ্রা) মুদ্রার নাম ছিল। এই সকল স্বর্ণ, রজত এবং তাম্র মুদ্রার সহিত কড়ির, স্বর্ণের সহিত রজত মুদ্রার অথবা স্বর্ণ ও রজতের সহিত তাম্র মুদ্রার সম্পর্ক নির্ণয় করা হইত। এই সম্পর্ক নির্ণয়ের কাজ যাহারা করিতেন তাহাদের 'পোদ্দার' বলা হইত।

পোদ্দার : পোদ্‌দার বা শরাফ মুদ্রাপরীক্ষক রাজকর্মচারী। মুদ্রাপরীক্ষার কাজকে পোদ্দারী বলে। ইহারা বাঁটা লইয়া নোট ভাঙ্গাইয়া দেয় বা সোনা রূপা বন্ধক রাখে বা কিনে।[৮] 'এরাই দেনা-পাওনা মেটায় বা হুন্ডী দেয় মহাজন হিসাবে। সাধারণভাবে এ-সব পোদ্দারদের সাথে একটা বোঝাপড়া রয়েছে প্রাদেশিক শাসনকর্তার। কড়ির সাথে পইসার ও পইসার সাথে টাকার বিনিময় হার যেমন খুশী বাড়ায় এরা। তুর্কী সাম্রাজ্যে যে সব ইহুদীরা পোদ্দারের ব্যবসা করে তারা তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা বা নৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু ভারতের পোদ্দাররা (এত নিপুণ যে) শিক্ষানবিশী করার বড় একটা প্রয়োজন বোধ করে না এদের কাছে।'[৭]

কড়ির বিনিময় মান : ভারতবর্ষে যে কড়ি ব্যবহৃত হইত তাহা মালদ্বীপ হইতে আসিত। মালদ্বীপে বহুকড়ি পাওয়া যাইত। মালদ্বীপ হইতে কড়ি উত্তর ভারতে গুজরাত বন্দর (সুরাত বন্দর) এবং পূর্বভারত ও বঙ্গে কড়ি আসিত বঙ্গদেশের বন্দর তাম্রলিপ্ত, দ্বিগঙ্গা বা সোনারগাঁও হইয়া। মালদ্বীপবাসীগণের কড়ি রপ্তানি একটি অর্থকরী ব্যবসা ছিল। ইবন বতুতা, ট্যাভারনিয়ার প্রভৃতির বিবরণ হইতে এ বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ইবন বতুতা ১৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর মালদ্বীপে পৌছান এবং ১৩৪৫-এর ১২ই সেপ্টেম্বর নাগাদ তিনি চূড়ান্তভাবে ত্যাগ করেন মালদ্বীপ।[৮] ট্যাভারনিয়ার ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত বেশ কয়েকবার ভারতবর্ষে এসেছেন এবং থেকেছেন। ভারতের শুল্ক, মুদ্রা, বিনিময়, ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিশেষ জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন।

ইবনবতুতার বিবরণ হইতে জানা যায় মালদ্বীপের 'লোকেরা নিজেদের মধ্যে যা-কিছু কেনাবেচার কাজ কড়ি দিয়ে করে। এই সকল কড়ি সাগর থেকে সংগ্রহ করা হয়।...এগুলি সাধারণতঃ এক সুবর্ণ দিনারে চার বুস্ত (চার লাখ) এই হারে কেনা-বেচা চলে। কখনও কখনও দাম পড়ে যায়। তখন এক দিনারের বদলে ১০ বুস্ত (দশ লাখ) পর্যন্ত মেলে।'[৯] 'একমাত্র মাল দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও কড়ি পাওয়া যায় না এগুলি (একথা ঠিক নয়)। মালদ্বীপপুঞ্জ এর প্রধান সরবরাহকারী ছিল। এই দ্বীপপুঞ্জের রাজার আয়ের একটি প্রধান উৎস ছিল কড়ি।'[১০] এই দ্বীপপুঞ্জে খাদ্যের অভাব ছিল। খাদ্য উৎপাদিত হইত না বলিলে চলে। তাহারা নারিকেলের দড়ি বানাইয়া নারকেলের দড়ি বা কনবর এবং কড়ি সংগ্রহ করিয়া তাহা রপ্তানি করিয়া খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করিত। 'এগুলি (কড়িগুলি) বাঙলার লোকদের কাছে চালের বদলে বেচা হয়। কেননা, বাঙলা দেশে কড়ির চলন রয়েছে।'[১১] কনবর বা নারিকেলের দড়ি 'চীন, ভারত ও ইয়েমেনে এগুলি রপ্তানি হয়।'[১২]

ভারতের ছোট মূল্যের মুদ্রাগুলি তৈরি করা হইত তামা ধাতুর সাহায্যে। এগুলির নাম পইসা। তামার আধ পইসা, দু পইসা এবং চার পইসার মুদ্রাও ছিল কিছু কিছু। এছাড়া আরো দুটি ক্ষুদে মুদ্রা ছিল। একটি তিতো বাদাম, অন্যটি কড়ি।[১৩] 'সাগরের কুলবর্তী এলাকায় একপইসার বিনিময়ে মেলে, এই কড়িগুলির আশিটি (মুঘল আমলে শাহজাহান ঔরঙ্গজেবের কালে)। আর, যতই ভেতর এলাকার দিকে যাবেন, পরিবহন খরচের দরুণ

ততই কমে আসবে এর পরিমাণ। ফলে, আগ্রা এলাকায় পয়সা পিছু পাবেন এগুলির ৫০ বা ৫৫টি।'[১২] সুতরাং স্থান বিশেষে যেমন কড়ির সঙ্গে পইসার মূল্যের হেরফের হইত তেমনি পোদ্দার নামক রাজকর্মচারীগণের ইচ্ছায় কড়ির সাথে পইসার বিনিময় হার হেরফের হইত। তাহা ছাড়া, সময়ের পার্থক্যের জন্যও পইসা ও কড়ির বিনিময় মূল্যের পার্থক্য হইত। যেমন, হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলে কড়ির বিনিময় মূল্য যাহা ছিল, সুলতানী ও মুঘল আমলে তাহা এক ছিল না। সুলতানী আমল হইতে মুঘল আমলে কড়ির বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং, কড়ির মূল্য কোন সময় স্থিতিশীল থাকিত না। ইহা একই প্রদেশে এক এক সময় এক এক স্থানে এক এক রকম হইত।

ভারতে কড়ি মুদ্রা হিসাবে ব্যবহারের সময় কাল : ভারতবর্ষে ঠিক কখন হইতে কড়ির ব্যবহার মুদ্রা হিসাবে আরম্ভ হয় তাহা সঠিক ভাবে বলা কঠিন। তবে রামায়ণ ও মহাভারত নামক মহাকাব্যদ্বয়ে মুদ্রা হিসাবে কড়ির ব্যবহারের উল্লেখ আছে। মহাভারতের ঘটনাবলির কাল দশম খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলিয়া ধরা হয়। 'মহাভারতের অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক ঘটনার সময় হইতেছে খ্রীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক ৯৫০ অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতকের মধ্যভাগে।'[১৩] হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীও একই মত পোষণ করেন। অধ্যাপক হেমচন্দ্র চৌধুরী 'এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কুরুপান্ডব যুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতকের ব্যাপার। [১৪] রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর অন্তত একশত বর্ষ পূর্বে স্থাপন করা যায়। 'রামায়ণের আদিরূপের রচনাকালকে খৃষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে স্থাপন করা যায়।'[১৫]

সুবোধ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডে রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানে মুদ্রা হিসাবে কড়ি ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

'হরিদাস বলে, আমি মড়াদাহ করি।

মড়াপ্রতি পঞ্চাশ কাহন দিবে তাহে কড়ি।।'[১৬] সুতরাং কড়ির ব্যবহারের সময় কাল খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করা যায়। পরবর্তীকালে মৌর্য্য যুগ, গুপ্ত যুগ, পাল যুগ, সেনযুগ ও সুলতানী আমল ও মুঘল পরবর্তী কালেও মুদ্রাকড়ির ব্যবহার দেখা যায়। 'চতুর্থ শতকে ফাহিয়াণ বলিতেছেন যে, লোকে ক্রয় বিক্রয়ে কড়িই ব্যবহার করিত। এবং নিম্নতম মান হিসাবে কড়ি একেবারে উনবিংশ শতক পর্যন্ত কোন দিনই ব্যবহারের বাহিরে চলিয়া যায় নাই'।[১৭] কিন্তু বাঙলাদেশ ও ভারতের অন্যপ্রদেশে কড়ির ব্যবহার উনবিংশ শতকের পরে না থাকিলেও, বাঙলার পাঠশালা সমূহে ঐ প্রাচীন গণনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত[১৮]। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, যে কড়ি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই মালদ্বীপ হইতে আসিত।[১৯] 'বাঙলা দেশ সহ ভারতের ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলে কড়ির মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু কোম্পানী শাসিত ব্রিটিশ ভারতে কড়ির মুদ্রা হিসাবে প্রচলন ছিল।[২০]

বাঙলাদেশে কড়ির ব্যবহার ঠিক কোন সময় হইতে আরম্ভ হয় তাহা বলা কঠিন। তবে, বাঙলাদেশে কড়ি কেবল মুদ্রা হিসাবেই ব্যবহার করা হইত না। কড়ি ধর্মীয় আচার আচরণে বাঙ্গালী-হিন্দুর ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হইত; এখনও হয়। গুপ্ত যুগ, শশাঙ্কের কালে যেমন পাল ও সেন যুগেও কড়ির মুদ্রাগত মান ছিল সর্বনিম্ন। পাল ও সেন আমলে কড়ির

মুদ্রা হিসাবে বহুল প্রচলন ছিল। সেই সময় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল না। পাল আমলে দ্রম্ম মুদ্রার প্রচলনের প্রমাণ আছে। দ্রম্ম মুদ্রা রৌপ্য মুদ্রা। 'গুপ্ত আমলে, যখন স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা বহুল প্রচলিত, তখনও মুদ্রার নিম্নতম মান কিন্তু কড়ি।'[26] 'সেন আমলে কড়িই মনে হইতেছে, সর্বে সর্বা।'[27] 'এমন-কি রাজাও যখন কাহাকেও কিছুদান করিতেন, কড়িদ্বারাই করিতেন। লক্ষ্মণ সেনের নিম্নতম দান ছিল একলক্ষ কড়ি।'[28] ইবনবতুতা চতুর্দশ শতকে যখন ভারত ভ্রমণে আসেন তখন বাঙলা দেশ চাউলের পরিবর্তে মালদ্বীপ হইতে কড়ি আমদানী করিত। মুঘল আমলেও মালদ্বীপ হইতে কড়ি আমদানী করা হইত। ইহা ট্যাভারনিয়ারের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। 'ত্রয়োদশ শতকেও কড়ির প্রচলনের সাক্ষ্য অন্যত্র পাইতেছি। পঞ্চদশ শতকে মা-হুয়ান একই সাক্ষ্য দিতেছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এবং বিদেশী পর্যটকদের সাক্ষ্যও একই প্রকার।'[29] 'মুদ্রার নিম্নতম মান ছিল কড়ি; উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই কড়ির প্রচলন সমগ্র বঙ্গদেশে ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হুগলী জেলায় কড়ি দিয়া কর আদায় হইত।'[30] 'গোবরডাঙ্গা নিবাসী রাম রাম কুন্ডু (আনুমানিক জীবনকাল ১৭৪৮ হইতে ১৮৩১ খ্রীঃ) প্রত্যহ ব্রাহ্মণদের কড়িদান করিতেন। তাঁহাদের প্রত্যহ বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনয়নের জন্য কয়েকটি পয়সার প্রয়োজন হইত।...সচরাচর তিন চারি পণ (২০ গন্ডায় এক পণ) কড়িতে বাজার হইয়া যাইত। ...ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের উপরোক্ত অভাব নিবারণের জন্য রাম রাম নিজ চন্ডী মন্ডপে বস্তা করিয়া রাশিকৃত কড়ি রাখিয়া দিতেন।'৩১

ধাতুমুদ্রা অত্যন্ত মহার্ঘ থাকার জন্য মুদ্রার পাশাপাশি কড়ি সেইসময় সর্বনিম্ন মুদ্রামান হিসাবে ব্যবহার করা হইত। ধাতু মুদ্রার সহিত কড়ির মূল্য ভিত্তিক সম্পর্ক ছিল। বঙ্গদেশে কড়িকে ভিত্তি করিয়া একটি গণনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। স্বাধীনোত্তর কালে তাহার ব্যবহারিক মূল্য না থাকলেও পাঠশালায় ঐ গণনা পদ্ধতি পড়ান হইত। এই গণনা পদ্ধতিতে কড়িকে সর্বনিম্ন একক হিসাবে ধরা হইয়াছিল। 'কড়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল 'কপর্দক' ও 'কড়ি'। তৎকালে 'ধারাপাত' বই পাঠশালায় পড়ান হইত। 'কড়াক্রান্তি' শিরনামে একটি ঐ ধারাপাতে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইতেছে।

সারণী :—

১ কড়া (১টি কড়ি) = সোয়া এক গন্ডা (১/৪ গন্ডা)

২ কড়া = আধাগন্ডা (১/২ গন্ডা);

৩ কড়া = পৌনে এক গন্ডা (১/৪ গন্ডা);

৪ কাড়ায় (চরিটি কড়িতে) = একগন্ডা;

৫ গন্ডায় = এক বুড়ি; (২০টি কড়ি);

৪ বুড়িতে = এক পণ (৮০টি কড়ি);

১৬ পণে = এক কাহন (১২৮০ কড়ি);

টাকা সস্তা হওয়া ও ধাতুর মুদ্রা নির্মাণ কারিগরী উন্নত হওয়ার জন্য কড়ির ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়। স্বাধীনতার পরে দশমিক পদ্ধতি চালু হয় এবং পুরাতন গণনা পদ্ধতি পড়াশুনার ক্ষেত্রেও পরিত্যক্ত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, কড়ির মূল্যমান বাজারে কড়ির প্রাচুর্য এবং যোগানের অভাবের উপর নির্ভর করিয়া উঠা নামা করিত। যখন কাশ্মীরে মুঘল আমলে ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এক আকবরী টাকায় চারিহাজার (৪০০০) কড়ি পাওয়া যাইত, পূর্বভারতে তখন টাকায় ৩২০০টি কড়ি পাওয়া যাইত। মালদ্বীপে এক টাকায় নয় হইতে দশ হাজার কড়ি ক্রয় করা হইত। কিন্তু তাহা বাংলাদেশে টাকায় আড়াই হাজার হইতে তিনহাজার দু'শত কড়ি বিক্রয় করা হইত।[৮] সুতরাং এক পয়সায় ৫০টি কড়ি পাওয়া যাইত। আগ্রায় পয়সায় ৫০ হইতে ৫৫টি কড়ি পাওয়া যাইত। কড়ির মূল্যমানের উঠা নামা এবং হিসাবের সুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া পয়সায় ৬০টি কড়ি ধরিলে টাকায় ৩৮৪০টি (তিন হাজার আটশত চল্লিশ) কড়ি হয়।

পূর্বে, একটাকা = ১৬ আনা

একআনা = ৪ পয়সা

এক পয়সা = ৪ পাই।

অতএব একটাকায় ৬৪ পয়সা

কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনা কাল আনুমানিক ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। এই পুঁথিতে তিনি তৎকালীন বাজার দরের একটি চিত্রপ্রদান করিয়াছেন 'দুবলার বেসাতি' বর্ণনা কালে। 'দুবলার বেসাতি' বর্ণনা কালে তিনি মুদ্রা হিসাবে কড়ি উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) 'দুবলা বাজারে যায়...কাহন পঞ্চাস লৈয়া কড়ি'

(২) তৈল ক্রয় করিয়া ছিল প্রতিসের দেড় বুড়িতে;

(৩) ৪ (চার) কাহণ কলা ক্রয় করে ২০ কাহণ কড়িতে;

(৪) আদা ২০ সেরের মূল্য দেড় বুড়ি;

(৫) একটি খাসীব মূল্য ৮ কাহণ কড়ি;

(৬) আলু, কচু, শাকপাতা প্রভৃতি তরকারীর মোট মূল্য = ৪ কাহন ৮ পণ;

উপরোক্ত দ্রব্যগুলির মূল্য টাকা ও পয়সায় রূপান্তরিত করিলে নিম্নরূপ দাঁড়াইবে—৬০ কড়ি = ১ পয়সা ধরিয়া

(১) তৈল প্রতিসের দেড় বুড়ি = ৩০ কড়ি = অর্ধপয়সা;

(২) ৪ কাহণ কলার মূল্য = ২০ কাহণ কাউ

১ কাহণ কলার মূল্য = ৫ কাহণ কড়ি

১ কলার মূল্য = ৫ কড়ি বা ১২টি কলার মূল্য = ১ পয়সা,

(৩) আদা ২০ সেরের মূল্য = দেড় বুড়ি = ৩০ কড়ি;

১ মণ আদার মূল্য = ১ পয়সা

(৪) একটি খাসীর মূল্য = ৮ কাহণ কড়ি = ১০২৪০ কড়ি

= ১৭০ পয়সা ২ পাই;

= ২ টাকা ১০ আনা ২ পয়সা ২ পাই;

(৫) আলু-কচু ইত্যাদি = ৪ কাহণ ৮ পণ;

= ৭২ পণ = ৫৭৬০ কড়ি = ৯৬ পয়সা;

= ১ টাকা ৩২ প = ১।৷. (দেড় টাকা);

দুর্বলা বাজারে লইয়া গিয়াছিল = ৫০ কাহণ কড়ি;
= ৬৪,০০০ কড়ি;
= ১৬ টাকা ১০ আ. ২ ১/২ পাই

সুতরাং স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা ও তাম্রমুদ্রার ন্যায় মুদ্রা কড়ি বা কড়ি-মুদ্রা বলা যাইতে পারে।

সূত্রনির্দেশ

১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, **প্রাচীন মুদ্রা**—পৃ. ১
২। সুধীর কুমার মিত্র **হুগলীজেলার ইতিহাস** (১ম) পৃ. ৫৭২ এ উদ্ধৃত।
৩। ডি.সি. সরকার, **স্টাডিস ইন ইন্ডিয়ান কয়েনস**
৪। প্রেমময় দাশগুপ্ত—**বিদেশীদের চোখে ভারতবর্ষ** পৃঃ ২৭৯(ইবনবতুতা) পৃ. ৯৬;
৫। ঐ। ট্যাভারনিয়ার পৃ. ১৭;
৬। **বঙ্গীয় শব্দকোষ** (২য়) পৃ. ১৩৬৪;
৭। ট্যাভারনিয়ার প্রাগুক্ত পৃ. ১৭;
৮। তদেব, ইবন বতুতা পৃ. মুখবন্ধ এগার;
৯। তদেব পৃ. ৯৬;
১০। ট্যাভারনিয়ার প্রাগুক্ত। পৃ. ১৭;
১১। ইবন বতুতা প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬;
১২। তদেব পৃ. ৯৬;
১৩। তদেব ট্যাভারানিয়র পৃ. ১৬;
১৪। তদেব পৃ. ১৭।
১৫। **ঋগ্‌বেদ সংহিতা**, রমেশ চন্দ্র দত্ত (ভূমিকা) পৃ. ৫;
১৬। তদেব পৃ. ৫;
১৭। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় **প্রসঙ্গ রামায়ণ** পৃ. ৫৭;
১৮। সুবোধ চন্দ্র মজুমদার পৃ. ৩২; **কৃত্তিবাসী রামায়ণ**
১৯। নীহাররঞ্জন রায় **বাঙালীর ইতিহাস** আদিপর্ব, পৃ. ১৬১;
২০। **স্টাডিজ্ ইন ইন্ডিয়ান কয়েনস্**—ডি.সি. সরকার—পৃঃ ২৮০
২১। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।
২২। '১৭৫০ খ্রী. ইংরাজ বণিকেরাও দেখিয়াছেন, কলিকাতার শহরে কর আদায় হইত কড়ি দিয়া, বাজারে অনেক ক্রয় বিক্রয়ও কড়ির সাহায্যেই হইত।' **বাঙ্গালীর ইতিহাস** পৃ. ১৬১।
২৩। নীহাররঞ্জন রায় প্রাগুক্ত পৃ. ১৬১;
২৪। তদেব পৃ. ১৬২;
২৫। তদেব পৃ. ১৬১;
২৬। তদেব পৃ. ১৬১;
২৭। সুধীর কুমার মিত্র প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২;
২৮। দুর্গাচরণ রক্ষিত সম্পাদিত **কুশদ্বীপ কাহিনী** পৃ. ৩৩৩,
২৯। ডি.সি. সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩-৮৩।

ওড়িশায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' কথাটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ব্যবহার করেছেন। এক সময় যাঁরা বৌদ্ধ ছিলেন এখন তাঁরা আর বৌদ্ধ নয়; অথচ তাঁদের আচার-আচরণ এবং সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ অবশেষ থেকে গেছে। এমনকি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-চর্চাতেও বৌদ্ধ আভাস মিলতে পারে। সেদিক থেকে তিনি বাংলাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের দেশ বলে চিহ্নিত করেছেন। সিসিল বেন্ডাল-এর প্রশ্ন 'বাংলার বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল?'[১] এর উত্তর খুঁজেছেন ও নানান তথ্য জোগাড় করেছেন, যার আলোয় বৌদ্ধ ইতিহাস ভাস্বর হয়েছে। বাংলা সমেত পূর্ব ভারতে হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু হীনযান বৌদ্ধধর্ম পরবর্তীকালে বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বিভিন্ন যানে ভাগ হয়ে যায়। এগুলি থেকে জন্ম নেয় তন্ত্রের। ফলে বৌদ্ধধর্ম তার প্রকৃত চরিত্র হারাতে থাকে। মন্ত্রযানের চর্চা হতো বিক্রমশীল মহাবিহারে। সেখানকার অধ্যাপক ততকর গুপ্তের **আদিকর্মরচনা**-তে মন্ত্রযানী বৌদ্ধদের জীবনচর্যার নিপুণ ছবি পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীতে লেখা এই পুথিটি বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তনের সাক্ষী। নেপালের বজ্রযানীরা ধর্মাচরণেব ক্ষেত্রে একজন সাধন সঙ্গিনী নিতেন, যিনি ওর বিবাহিতা স্ত্রী নন। তিনি শক্তি। বাংলায়ও এই পদ্ধতি চালু ছিল। পরে কালচক্রযান সাধনার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মের আরো পরিবর্তন হয়। হরপ্রসাদ কালচক্রযানের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—"The word Kala means time, death and destruction. Kalachakra is the wheel of destruction and Kalachakrayana means the vehicle for protection against the wheel of destruction."[২] এই পন্থা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রসারিত হয়। জগদ্দল বিহারের বিভূতিচন্দ্র ছিলেন কালচক্রযানের বিখ্যাত সাধক। বৌদ্ধদর্শন থেকে কালচক্রযানের দর্শন আলাদা। আরেকটি পন্থার সন্ধান পাওয়া যায়—নাথপন্থা। এদের ধর্মযোগ। এরা নাথযোগী। নাথযোগীরা বৌদ্ধ নয়, কিন্তু পরবর্তীকালে গৃহীত হয়েছে। নবম শতাব্দীতে আর একটি যানের উদ্ভব হয়েছিল—সহজযান—"The Sahajias found the great world i.e. the universe within the human body." সহজিয়ারা "made salvation easy by reaching it through carnel enjoyments."[৩] বাংলার সহজিয়ারা ধর্মঠাকুরের পূজারী। পুজোতে পাঁঠাবলির রীতি আছে। এদের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের মিল নেই। কিন্তু ধর্মপুজোয় বৌদ্ধ প্রতীক ও আচারের সন্ধান পেয়েছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধধর্ম বিবর্তিত হয়েছে। শাখা-উপশাখার সৃষ্টি হয়েছে। মূল দর্শন থেকে সরে এসেছে। নতুন ভাবধারাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন ধারায় দর্শনের চর্চা হয়েছে কিন্তু তা বৌদ্ধদর্শনের সমর্থন পায় নি। এই সমস্ত ধর্মীয় পন্থার উদ্ভব বৌদ্ধধর্ম থেকে হলেও শেষপর্যন্ত সেগুলি আর বৌদ্ধধর্ম থাকে নি। সেগুলি বৌদ্ধধর্মের বিচ্যুতি।

বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তনের ফলে অবিকৃত বৌদ্ধধর্ম আর রইল না। শাখা ধর্মগুলির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। সেন রাজাদের আমলে হিন্দু ধর্মের প্রাদুর্ভাব হল। হিন্দুরা বৌদ্ধদের গ্রাস করে নিল। এ ব্যাপারে ভবদেব ভট্টের বিশেষ ভূমিকা ছিল।[৫] তিনি বৌদ্ধদের শত্রু হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল। 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা' শব্দটি ব্যবহারে দ্বিধা আছে। কখনোই কি বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য ছিল? এখানে তো বৌদ্ধদেরই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল। তার আগে ছিল অনার্যদের অ-বৈদিক ধর্ম। পূর্ব ভারতে আর্যদের বেদ-নির্ভর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তেমন প্রতিষ্ঠা কখনোই পায় নি। বৌদ্ধধর্মও নিজস্ব এবং স্বতন্ত্রধারায় বিকশিত হয়েছিল। বিলয়ের কারণ তার বিস্তারের মধ্যেই নিহিত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধবাদ একেবারে মুছে যায় নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লুপ্ত বৌদ্ধধর্ম খুঁজেছেন **Discovery of Living Buddhism in Bengal** (1897) নামক ছোট্ট পুস্তিকায়। ধর্মপুজোর মধ্যে তিনি বৌদ্ধধর্মের অংশ খুঁজে পেলেন। তাঁর সারাজীবনের গবেষণায় এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। মুসলমান আক্রমণের ফলে বৌদ্ধধর্ম আঘাত পায়। এটাও বৌদ্ধধর্ম বিলোপের অন্যতম কারণ। নিম্নবর্গের অনেক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অত্যাচারে মুসলমান হয়ে যায়। হরপ্রসাদ 'Buddhism in Bengal since the Muhammadan Conquest' প্রবন্ধে লিখেছেন, "The helpless Buddhist would naturally be inclined more to Muhammadanism, which has no restriction of food, & C., than to Hinduism, which imposes thousands of restrictions on every action of life."[৬] যাঁরা মুসলমান হলেন না, তাঁদের অনেকেই ধর্মের পূজারী হলেন। হরপ্রসাদ লিখেছেন, "...Dharma, a deity whom I ventured to identify with Buddha-deva. One of the names of Buddha is Dharma-raja, and this is precisely the name by which the deity Dharma is spoken of by his worshippers."[৭]

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শুধু বাংলায় নয়, গোটা পূর্বভারতেই ছড়িয়ে আছে। ওড়িশাতেও বৌদ্ধদের অস্তিত্ব ছিল। বোধহয় একটু বেশি পরিমাণেই ছিল। নগেন্দ্রনাথ বসুর The Modern Buddhism and its followers in Orissa (১৯১১) বইয়ের দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শুধু ভূমিকাই নয়, নারায়ণ (চৈত্র ১৩২২) পত্রিকায় 'উড়িষ্যার জঙ্গলে' নামে একটি প্রবন্ধও লেখেন। তাতে আছে : "বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল খুঁজিতে খুঁজিতে বাংলার ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের শেষ বলিয়া বোধ হইল, তখন উড়িষ্যার জঙ্গলে আবার খোঁজ আরম্ভ হইল; যদি সেখানে পাওয়া যায়। সেখানে যে বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু আছে এরূপ প্রত্যাশা করিবার একটা কারণ এই যে, উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে একটি মহলের নাম বোধ অর্থাৎ বৌদ্ধ।"[৮] একটি মহলের নাম থেকে কোনো

সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। একটা সামান্য সূত্র পাওয়া যেতে পারে মাত্র। বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আরও উপাদান অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

ওড়িশায় 'সরাকি' নামে একটি জাতির পরিচয় পাওয়া গেছে। হরপ্রসাদের অনুমান : এরা বৌদ্ধ। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। গড়জাত, কিল্লাজাত, মোগলবন্দী পুরি, কটক অঞ্চলে এদের অবস্থান। এই অঞ্চলগুলিতেই 'সরাকি' জাতি বাস করে। এরা তাঁতি। এদের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মে বুদ্ধের পুজো হয়। ''সরাকি'' শব্দের বুৎপত্তি করিলে দেখা যায় উহা 'শ্রাবক' শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং সরাকিরা যে এককালে বৌদ্ধ ছিল ইহাতে আর সন্দেহ নাই। উড়িষ্যায় উহারা এখনো অনেকটা বৌদ্ধ।''[৮] বীরভূম-বাঁকুড়াতেও সরাকি আছে। তারাও তাঁতের কাজ করে, আবার কৃষিকাজও করে। তারাও কি আদিতে শ্রাবক? এ প্রশ্ন সঙ্গত। সঙ্গত এই কারণে যে দুই সরাকিতে মিল আছে কিনা দেখা দরকার। আদিতে এরা যদি এক হয়, সরাকিরা যে বৌদ্ধ এই তত্ত্ব দাঁড়িয়ে যায়। এই তত্ত্বের জোরে বাংলা ও ওড়িশার সরাকিদের মধ্যে সংযোগ খুঁজে পেতে পারি। তা হলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধতত্ত্ব শক্ত ভিত পায়। হরপ্রসাদ লিখেছেন, "Mr. Gait placed in my hands some materials from which it was found that the Saraki Tantis...still worship Buddha along with the Brahmanic Gods in all their religious ceremonies"...[৯]। কিন্তু বাঁকুড়া-বীরভূম-বর্ধমানের সরাকিরা প্রত্যক্ষত বুদ্ধ-পূজারী নয়। অন্তত এখন আর নয়। তারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুসারী হিন্দু। তবু এদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির অস্তিত্ব দেখা যেতে পারে। 'সরাকি' যদি শ্রাবকের অপভ্রংশ হয় তবে বাংলা ও ওড়িশার সরাকিরা মূলত বৌদ্ধ। গেইট অবশ্য সরাকদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মের সন্ধান পেয়েছেন।[১০] কিন্তু রিজ্‌লি বীরভূমের সরাকদের জৈন বলেছেন। আদিতে তারা জৈন, পরবর্তীকালে মিশ্র হিন্দু—কারণ জগন্নাথ, শ্যামচাঁদ তাদের উপাস্য দেবতা, আবার জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের উপাসনা করেন।[১১]

মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় থেকে ওড়িশা বৌদ্ধধর্মের বড় কেন্দ্র ছিল। সেখানে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়। মহাযান থেকে যে বজ্রযানের উৎপত্তি হয় একথা তারনাথ কর্তৃক সমর্থিত। বাংলায় বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের যেমন বিস্তার হয়েছিল তেমনি "'Pancha Sakha Dharma' and 'Mohima Dharma' of Orissa are also the out -comes of a popular assimilation of the religious ideas of the later Tantrik Buddhism with those of the later Tantrik Buddhism with those of Gaudiya Vaismavism represented by Chaitanyadev."[১২]। তাহলে ওড়িশার বৌদ্ধধর্মের পরিণতি পঞ্চসখা এবং মহিমা ধর্মে। এই ধর্মের মূল কথা 'শূন্যতা'। বাংলায়ও রচিত হয়েছিল 'শূন্য পুরাণ'। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের দর্শন বলা যেতে পারে। ওড়িশায় অচ্যুতানন্দ দাস লিখেছিলেন 'শূন্য সংহিতা'। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ। তাঁর ধর্মীয় দর্শনে যোগাচারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। নাগার্জুন, গোরক্ষনাথ, মল্লিকার্জুন প্রমুখের দর্শন ওড়িশায় প্রভাব ফেলেছিল। "It is evident from 'Sunya-Samhita' that all these schools and sects devoted to yogic practices. They represented the ideology of Tantrik Buddhism in Orissa during the sixteenth century

A.D.''[৩] বৈদান্তিক গোষ্ঠীও তন্ত্রের প্রভাব এড়াতে পারে নি। তন্ত্রকে বলা হত পঞ্চম বেদ।

তারনাথ ওড়িশার বৌদ্ধধর্মের কথা বলেছেন। তাঁর শুরু বুদ্ধ-গুপ্তনাথ দক্ষিণভারত থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। বুদ্ধ গুপ্তনাথ ওড়িশাতে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। পুরী ছিল বৌদ্ধদের প্রাচীন কেন্দ্র। জগন্নাথ বৌদ্ধ-উপাসকদের উপাস্য মূর্তি। এ নিয়ে বিতর্ক আছে। স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় নি। কিন্তু বুদ্ধ নবম অবতার হিসেবে হিন্দুদের স্বীকৃতি পেয়েছে। তারা বুদ্ধকে বিষ্ণু বলেছেন। ফলে জগন্নাথে বুদ্ধ ও বিষ্ণু একাকার হয়েছে। অচ্যুতানন্দ দাস 'গৌড়-গীতা' বইতে জগন্নাথকে বুদ্ধ অবতার হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৮] কিন্তু ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্র (রাজত্বকাল ১৪৯৭-১৫৪০ খৃ.) হিন্দু ধর্মের ধ্বজাধারী, বৌদ্ধ বিরোধী। তাঁর আমলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রাধান্য পায়। চৈতন্যদেব সমর্থিত হন। রাজাশ্রয়ে তাঁর ধর্মীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি স্থায়ীভাবে পুরীতে বসবাস করতে থাকেন। ওড়িশায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দাপটে বৌদ্ধরা প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধরা বৈষ্ণব আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করে নিয়ে জগন্নাথ উপাসনায় মেতে উঠল। এই চিত্র ষোড়শ শতাব্দী থেকে দেখা যায়। ফলে জগন্নাথ সেবক অনেক বৈষ্ণবই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

অচ্যুতানন্দ দাস, বলরাম দাস, যশোবন্ত দাস, অনন্তরাম দাস এবং জগন্নাথ দাস বৈষ্ণব ধর্মের আড়ালে যে ধর্মীয় দর্শন গড়ে তুলেছেন তা পঞ্চসখা ধর্ম হিসেবে পরিচিত। এঁদের ধর্মীয় দর্শন সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, যা আপাতদৃষ্টিতে বৈষ্ণব ধর্ম মনে হলেও বৌদ্ধধর্মেরই নামান্তর।

সূত্র-নির্দেশ

১। Shastri, H.P., ''Northern Buddhism'', **The Indian Historical Quarterly,** March 1925, p. 24.

২। Shastri, H.P., ''Introduction to Modern Buddhism'', in Nagendranath Vasu, **The Modern Buddhism and its followers in Orissa,** Calcutta, 1911.

৩। তদেব।

৪। Nikhileswar Sengupta, ''Revival of Brahmanism in Bengal under the aegis of Bhavadeva Bhatta'', N.R. Ray and P.N. Chakraborti (ed.) **Studies in Cultural Development of India**. (Collection of Essays in Honour of Prof. Jagadish Narayan Sarkar), Calcutta, 1991, pp. 96-104.

৫। **Journal of the Asiatic Society of Bengal,** 1895.

৬। তদেব।

৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ''উড়িষ্যার জঙ্গলে'', **হরপ্রসাদ রচনা-সংগ্রহ**, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৪১৭।

৮। তদেব। এ প্রসঙ্গে আরও দ্র. Gait, E.A., **Census of India,** Vol. I, Part II, 1911, p. 222; Risley, H.H., **The Tribes and Castes of Bengal,** Ethnographic Glossary, vol.II, Calcutta 1891; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ''আচার্য হরপ্রসাদ'', সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১২০।

৯। Shastri, H.P., "Introduction to Modern Buddhism", **পূর্বোল্লিখিত**।

১০। Gait, **পূর্বোল্লিখিত**।

১১। Risley, **পূর্বোল্লিখিত**।

১২। Das, Paritosh, **Sahajiya Cult of Bengal and Pancha Sakha Cult of Orissa,** Calcutta, 1988, p. 175.

১৩। তদেব, পৃ. ১৭৭।

মেদিনীপুরে বৈষ্ণবীয় মঠ ও মন্দির

রবীন্দ্রনাথ মন্ডল

মঠ বা মন্দিরকে বলা হয় দেবতাদের আবাসস্থল। মেদিনীপুর জেলায় ঠিক কোন সময়ে মন্দির স্থাপন শুরু হয়েছিল তা বলা যায় না। তবে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত শহরে তাঁর সময়ে প্রায় পঞ্চাশটি দেবমন্দির ও দশটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। কালের গতিতে ও তুর্কী আক্রমণের ফলে প্রাচীন মন্দির-মঠের সন্ধান আমাদের আলোচ্য অঞ্চলে এখন আর পাওয়া যায় না। মেদিনীপুর জেলায় যে সব বৈষ্ণবীয় মঠ-মন্দিরের কথা এখানে আলোচনা করা হবে সেগুলি ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে তৈরী, অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে তৈরী নয় বলে অনুমিত হচ্ছে।

প্রাচীনকালে বৈষ্ণবীয় মঠ-মন্দিরের সঠিক নিদর্শন না পাওয়া গেলেও বিষ্ণু পূজার প্রচলন যে এই জেলায় পাল-সেন যুগে ছিল তা এই জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে বিক্ষিপ্তভাবে প্রাপ্ত প্রায় বাইশটির বেশী বিষ্ণুমূর্তি থেকে জানা যায়। এমনকি তাম্রলিপ্তের বহুনামের অন্যতম নাম হল বিষ্ণুগৃহ। এটি তমলুকে প্রাচীনকালে যে বিষ্ণু আরাধনা হত তার সাক্ষ্য বহন করে। শ্রী চৈতন্যদেবের পূর্বে বৈষ্ণব ধর্মের চারটি শাখা শ্রী সম্প্রদায়, মাধবাচার্য রুদ্র (বিষ্ণুস্বামী) এবং নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। এমনকি বর্তমানে মেদিনীপুরে এই চারটি সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি মঠ ও মন্দির রয়েছে। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রকোনা থানার অধীনে নরহরিপুর গ্রামে 'রামানন্দী লস্করীয়' মঠ এবং এই থানার নয়াগঞ্জ পল্লীর রামানুজাচার্য মতাবলম্বী বৈষ্ণব সম্প্রদায় অর্থাৎ শ্রী সম্প্রদায়ের মঠ, পাঁশকুড়া থানার দক্ষিণ ময়নাডাল গ্রামে মধ্বাচার্য এবং দাসপুর থানার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মঠটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে উক্ত সম্প্রদায়গুলি এবং তাঁদের পরিচালিত মঠগুলির দ্বারা প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বৃহত্তর জনমানসে এর প্রভাব পড়েনি। এককথায় এঁদের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম জনসাধারণকে কাছে টানতে পারেনি।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত নব-বৈষ্ণবধর্ম মেদিনীপুরবাসীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ফলে এই জেলায় অজস্র বিষ্ণুমন্দির এবং ঘরে ঘরে রাধাকৃষ্ণ উপাসনা প্রবর্তিত হয়। এমনকি শ্রীচৈতন্যদেব যে বৈষ্ণবদের নিকট বিষ্ণুর অবতাররূপে পরিকল্পিত হয়ে পূজিত হয়ে চলেছেন। তমলুকে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতি বিজড়িত মহাপ্রভু মন্দির তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এছাড়া, পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত পাকুড়িয়া গ্রামে মহাপ্রভু মন্দির,

তমলুকে উত্তর অসুৎপুর গ্রামে মহাপ্রভু মন্দির, নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত ভেকুটিয়া গ্রামে মহাপ্রভুর মন্দির, দাসপুর থানার অন্তর্গত বাসুদেবপুর গ্রামে মহাপ্রভু মন্দির এবং এই জেলায় আরও কয়েকটি স্থানে মহাপ্রভু মন্দির শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পব নির্মিত হয়ে আজও স্বমহিমায় বিরাজ করছে।[৭]

আবার, শ্রীরামচন্দ্রকে বিষ্ণুর এক অবতাররূপে কল্পনা করে তাঁর প্রতিমূর্তি এই জেলার বিভিন্ন মন্দিরে পূজিত হচ্ছেন। কোন কোন মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র রঘুনাথ রূপে, আবার কোন মন্দিরে সীতাদেবীর সঙ্গে একসাথে পূজিত হচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মহিষাদল থানার অন্তর্গত রামবাগে রাজজীউর মন্দির, মোহনপুর থানার অন্তর্গত মোহনপুরে রঘুনাথ মন্দির, পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত লস্করদীঘি এবং রঘুনাথবাড়ী গ্রামে রঘুনাথের মন্দির পিংলা থানার জলচোক গ্রামে রামচন্দ্রের মন্দির খড়্গাপুর থানার বেড় জনার্দনপুরে সীতারাম এবং ঐ থানার অন্তর্গত আমোদপুর গ্রামে, চন্দ্রকোনা থানার অন্তর্গত পুরুষোত্তমপুর-লঙ্কাগড় গ্রামে রামচন্দ্রের মন্দির, ঘাটাল থানার অন্তর্গত কাটানগ্রামে গন্তীদের রঘুনাথের মন্দির এবং দাসপুর থানায় কাদিরপুর গ্রামে রঘুনাথের মন্দির ইত্যাদি রয়েছে।[৮]

চৈতন্যোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান দুই বৈষ্ণবাচার্য শ্রী শ্যামানন্দ ও শ্রী রসিকানন্দ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য বহু মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের প্রচেষ্টায় মেদিনীপুরে অসংখ্য বৈষ্ণবীয় মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ানের মতে এই জেলায় বৈষ্ণবীয় মন্দিরের সংখ্যা ১২০টি।[৯] কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধকারের অনুসন্ধানে জানা যায় যে মেদিনীপুরে এই মন্দিরের সংখ্যা ২৬০টির ও বেশী[১০]। শ্রী শ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দ যে দ্বাদশ শাখা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর হল তার প্রধান বা পাটকেন্দ্র। এছাড়া সুদূর উত্তর ভারতে শ্রী শ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দের প্রচেষ্টায় ৩০০টিরও বেশী বৈষ্ণবীয় মঠ-মন্দির গড়ে উঠেছে।[১১] এছাড়া, বহু বৈষ্ণব সাধক এই জেলার পত্যন্ত গ্রামে অনেক মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন।[১২]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বৈষ্ণবীয় মঠ-মন্দিরে বৈষ্ণবীয় দেবগোষ্ঠী পূজিত হয়ে চলেছেন। এই দেবগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণের লীলামূর্তি—বালগোপাল, বেণুগোপাল, মদনমোহন, রাধাকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র বা রঘুনাথ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ইত্যাদি। প্রতিদিনই মন্দিরে এঁরা পূজিত হয়ে চলেছেন ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে। অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে যে এই মন্দিরের পুরোহিতরা সবই হয় বৈষ্ণব না হয় ব্রাহ্মণ এবং প্রতিদিন দেবতার পূজা, বাল্যভোগ, ভোগারতি, শয়ন, জাগরণ ইত্যাদি কর্মগুলি সম্পন্ন করেন খুবই ভক্তি ও আন্তরিকতার সঙ্গে। কোন কোন মন্দিরে সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় হরিণাম সংকীর্তন হয়। তবে বছরের কয়েকটি বিশেষ তিথিতে অর্থাৎ জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা এবং মহান্ত গোস্বামীদের আবির্ভাব বা তিরোভাব দিবসে মন্দিরে বেশ জাঁকজমক সহকারে পূজা নিবেদন করা হয়। কোন কোন মন্দিরে হরিনাম সংকীর্তন হয় অষ্টপ্রহর, ষোল প্রহর বা চব্বিশ প্রহর ব্যাপী এবং শেষে

মহোৎসব করা হয়। এই জেলায় বেশ কয়েক বৎসর ধরে হরিনাম সংকীর্তন সহযোগে বড় ধরনের মহোৎসব করে আসছে এরূপ ৫০টিরও বেশী মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।[১৩] আর, ছোটখাটোভাবে মহোৎসব মেদিনীপুর জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামে অধিবাসীদের মধ্যে কোন না কোন পরিবার প্রতি বছরই করে থাকেন। মন্দিরের এই উৎসব অনুষ্ঠানকে ঘিরে মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় মেলা বা প্রদর্শনীর। অষ্টপ্রহর, ষোলপ্রহর, চব্বিশপ্রহর বা বত্রিশপ্রহর অখণ্ড হরিনাম সংকীর্ত্তন, ভাগবৎ পাঠ, ধর্মালোচনা, ভক্তিগীতি, নাট্যানুষ্ঠান বা চলচিত্র পরিবেশনের পাশাপাশি রকমারি দ্রব্য সম্ভারে সজ্জিত মেলা বা প্রদর্শনীর বর্ণাঢ্য পরিবেশ মন্দির প্রাঙ্গণকে নির্মল আনন্দ এবং ভক্তিরসের পবিত্র ক্ষেত্র করে তোলে। স্থানীয় অধিবাসীরা তো বটেই, দূর-দূরান্ত থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলবেঁধে মেলায় আসে, বেচাকেনা করে, একে অপরের সঙ্গে দেখাশুনা, মেলামেশা এবং ভাববিনিময়ের মাধ্যমে এক পরম আনন্দ লাভ করে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে আষাঢ় মাসে মহিষাদলে রথযাত্রার মেলা, পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত রঘুনাথ বাড়ির বিজয়াদশমীর উৎসব ও মেলা, পটাশপুর থানার অন্তর্গত পঁচেট গ্রামে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে রাস উৎসব ও মেলা, গড়বেতায় বগড়ি কৃষ্ণনগরের দোল উৎসব ও মেলা, জৈষ্ঠমাসে গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত গোপীবল্লভপুরে দন্ডমহোৎসব ও মেলা, সবং থানার অন্তর্গত কালন্দাগ্রামে কেলেঘাই নদীর তীরে তুলসী চারার মেলা, পটাশপুর থানার গোকুলপুর গ্রামে পৌষ-মাঘ মাসে গোকুলানন্দের তিরোধান উৎসব ও মেলা এবং এই থানার অন্তর্গত টেপর পাড়া গ্রামে আষাঢ় মাসে রথযাত্রার মেলা এবং রামনগর থানার অন্তর্গত বাগপুর গ্রামে আষাঢ় মাসে রথযাত্রার মেলার প্রাচীনত্ব এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করে চলেছে।[১৪] এছাড়া, এই জেলায় সাম্প্রতিক কালে শুরু হয়েছে এরূপ ১১০টিরও বেশী জায়গায় মেলা ও উৎসব হয়।[১৫]

পূজাচ্চর্নার স্থল হিসেবে মন্দিরগুলি নির্মিত হলেও এগুলি মানুষের ভাস্কর্য শিল্পের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে। মেদিনীপুরে বেশীরভাগ বৈষ্ণবীয় মঠ-মন্দির ষোড়শ শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে তৈরী হয়েছে। আবার, অনেক মন্দির ধ্বংস হয়ে গিয়েছে উপযুক্ত পরিচর্যা না নেওয়ার ফলে। তবে এই সময়ের মন্দিরগুলি পোড়া ইঁটের তৈরী। হয়তো এ জেলায় পাথর দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় মন্দিরগুলি ইট দ্বারা তৈরী হয়েছে। গঠনশৈলী অনুযায়ী মন্দিরগুলিকে 'চালা', 'রত্ন', 'দেউল', 'দালান' ও 'চাঁদনি' ইত্যাদি রীতিতে ভাগ করা যায়। 'চালা' রীতির মন্দিরগুলি আবার দোচালা, জোড়বাংলা, চারচালা, আটচালা, প্রভৃতি এবং 'রত্ন' রীতিটিও একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, ত্রয়োদশ রত্ন, সপ্তদশ রত্ন ইত্যাদি ভাবে হয়। মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে এই রীতিগুলির মন্দির বেশী দেখা যায়। এমনকি এই জেলার বহু বৈষ্ণব সাধকদের সমাধি মন্দিরগুলিও চারচালা, আটচালা, রত্ন ও দেউল রীতিতে তৈরী। কিন্তু এই জেলার পশ্চিমাঞ্চলে এই রীতিগুলির মন্দির খুব কম। এটি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। নিকটে উড়িষ্যা রাজ্য থাকায় এবং জেলাটি উড়িষ্যার অধীনে কিছুকাল থাকায় ওড়িশী সংস্কৃতি এই অঞ্চলের মানুষকে প্রভাবিত করে

এবং তারা শিল্পভাস্কর্যের মধ্যে সে প্রভাব ব্যক্ত করে। ফলে এই অঞ্চলে ওড়িশী রেখ-দেউল ও ভদ্ররীতির বেশ কিছু মন্দির তৈরী হয়। আবার, কোথাও মিশ্ররীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের ফলে বাংলার মন্দিরচর্চ্চায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে এবং এটি পরিপূর্ণতা লাভ করে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে। মেদিনীপুরেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে। যার ফলে অসংখ্য ইটের মন্দির তৈরী হয়। মন্দিরের পাশে রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ ও তুলসীমঞ্চগুলিও রত্নরীতিতে তৈরী। এই জেলার রাসমঞ্চগুলি বেশীর ভাগ নবরত্ন ও সপ্তদশরত্নরীতির। মেদিনীপুর জেলার বেশীরভাগ মন্দিরের বহিঃগাত্রে টেরাকোটা অলঙ্করণ করা হয়েছে। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে, দুই পাশে, এমনকি মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ পথের দেওয়ালেও টেরাকোটার কাজ লক্ষ্য করা যায়। পোড়ামাটির ফলকসজ্জায় তৎকালীন সমাজজীবনের চিত্র ছাড়াও মন্দির-গাত্রে চোখে পড়ে কৃষ্ণলীলা, বিষ্ণুর দশাবতার, রামলীলা, রামরাবণের যুদ্ধ ইত্যাদি পৌরাণিক দেব-দেবী লীলার দৃশ্য, শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদগণ এবং হরিনাম সংকীর্তনরত পার্ষদগণের চিত্র, মন্দিরের মহান্ত সম্প্রদায়ের চিত্র এবং নানারকম ফুল বা লতাপাতার প্রাকৃতিক চিত্র। পোড়ামাটির অলঙ্করণের সঙ্গে পঙ্খের অলঙ্করণও এ জেলায় বহু মন্দিরে দেখা যায়। শিল্পীরা যেমন মন্দিরের বহিঃগাত্রের অলঙ্করণ করে মন্দিরগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন, তেমনি মন্দিরের কাঠের দরজায় ও মন্দিরের অভ্যন্তরে দেব-দেবীর মূর্তিকেও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে তাঁদের নিপুণ হাতের স্পর্শে। বেশ কিছু মন্দিরের রাধা-কৃষ্ণের পিতলের যুগলমূর্তি, পাথরের মদনমোহন বা দারুকাঠের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মূর্তিগুলি তৎকালীন ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন বহন করছে। মন্দির গাত্রে প্রতিষ্ঠালিপিতে মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের স্থপতি বা কারিগরদের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালিপিগুলি বেশীর ভাগ বাংলা ভাষায়, তবে সংস্কৃত ভাষারও বেশ কিছু লিপি দেখা যায়।

এই জেলার মন্দিরলিপিতে প্রতিষ্ঠাতারও নাম এবং ঠিকানা চোখে পড়ে। এগুলি দেখা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই জেলার বহু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্থানীয় ভূ-স্বামী, জমিদার ও রাজপরিবার। বহুবিত্তবান বণিক তাঁদের ব্যবসায় উন্নতি হওয়ায় বা মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় এই জেলায় অনেক বৈষ্ণবমন্দির নির্মাণ করেছেন। আবার, কেউ কেউ বলেন পুণ্য অর্জনের জন্য তাঁরা মন্দির নির্মাণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, মহিষাদল থানার অন্তর্গত মহিষাদল রাজবাড়ির গোপালের নবরত্নমন্দির, ভগবানপুর থানার অন্তর্গত জুখিয়া (বেলুয়া) গ্রামে রানী হরিপ্রিয়া দেবী, জলমুঠা জমিদারী এস্টেট্ রাধাগোবিন্দের নবরত্ন মন্দির, গড়বেতা থানার অন্তর্গত গড়বেতা শহরে মল্লরাজ দুর্জন সিংহদেব প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভের আটচালা মন্দির, চন্দ্রকোনা থানার অন্তর্গত রামজীবনপুর গ্রামে বাবুরামপুর বাজারে জগমোহন দে (সুবর্ণ বণিক) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাধা দামোদরের পঞ্চরত্ন মন্দির ইত্যাদি।[৮]

রাজপরিবার, জমিদার, ভূ-স্বামী বা বিত্তবান্ বণিক ছাড়াও অনেক সম্পন্ন কৃষিজীবী পরিবার সেসময় রাধা-কৃষ্ণের মন্দির নির্মাণ করে কোন বৈষ্ণব গোস্বামী বা মোহান্তকে

দান করেছেন। তবে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু প্রবর্তিত নববৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এই জেলার নানা স্থানে মাহিষ্য ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণব মন্দির প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[১৭] প্রসঙ্গক্রমে দু'একটি উদাহরণ দেওয়া হল দাসপুর থানার অন্তর্গত রাণীচক গ্রামে মন্ডল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর গোবিন্দজীউর জোড়বাংলা মন্দির, ভগবানপুর থানার অন্তর্গত পাইকভেড়ি গ্রামে বেরা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরের চারচালা মন্দির, এগরা থানার অন্তর্গত পাঁচরোল গ্রামে মহাপাত্র পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধা-বিনোদের মন্দির ইত্যাদি।[১৮] আবার, সমাজে যারা উচ্চ জাতির মানুষ বলে পরিচিত যথা ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ, তাদের মধ্যে বৈষ্ণব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ দেখা গেছে।[১৯] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গড়বেতা থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ গ্রামে ঘটক পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্যামচাঁদের আটচালা মন্দির, চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত শ্রীনগর গ্রামে চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দজীউর মন্দির, দাসপুর থানার অন্তর্গত সিংহপাড়ায় সিংহ পরিবারের গোপীনাথ মন্দির ইত্যাদি। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই তারা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণবীয় দেবগোষ্ঠীর আরাধনার জন্য মঠ-মন্দির নির্মাণ করেছেন। বৈষ্ণবীয় দেবগোষ্ঠী রাধাকৃষ্ণ, গোপাল, মদনমোহন বা মহাপ্রভুকে তারা তাদের পরিবারের একজন সদস্যরূপে ধরে নিয়েছে এবং পূজার্চ্চনা, ভোগারতি, শয়ন-জাগরণ প্রভৃতি দ্বারা তাঁর যত্ন করে, ভক্তিশ্রদ্ধা করে। বাড়ির ক্ষেত খামারে কোন নতুন ফসল ফললে তা ঠাকুরেব উদ্দেশ্যে নিবেদন কবা হয়। পরিবারের লোকজন আরাধ্যদেবতার নিকট তাদের সুখ-দুঃখের কথা জানায়, তেমনি তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হলে খুব ধূমধাম সহকারে পূজাচ্চর্না করে। দেবতা ও দেবালয়গুলি পরিবারভুক্ত হওয়ায় পরিবারের বহু সদস্যরা বৈষ্ণবীয় জীবনের অনুশাসনগুলি মেনে চলে, যেমন-নিরামিষাহার, হরিনাম মন্ত্র জপ, তিলকধারণ, সত্য-ন্যায় নিষ্ঠ সহজ সরল জীবনধারণ। তবে যেসব মন্দিরগুলি গ্রামভিত্তিক নির্মিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে কেবল পূজক বা মোহান্তরাই বৈষ্ণবীয় জীবনাদর্শ অনুসরণ করে।

মেদিনীপুর জেলার বৈষ্ণবীয় মন্দিরগুলিকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি, যথা পারিবারিক ও গ্রামভিত্তিক। পারিবারিক মন্দিরগুলির পূজা উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয়িত অর্থ সেই পরিবারকেই বহন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নাড়াজোল রাজবাড়ী, কাশিজোড়ার রাজবাড়ি (রঘুনাথ বাড়ি), মহিষাদল রাজবাড়ী এবং চন্দ্রকোনায় চৌহান বংশীয় রাজাদের আরাধ্যদেবতার পূজার্চ্চনার খরচ রাজপরিবারকে বহন করতে হয়। এছাড়া, এই জেলায় বহু ধনী, মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র পরিবারের মন্দির রয়েছে এবং মন্দিরগুলির উৎসব অনুষ্ঠানের খরচ এই পরিবারগুলিকে বহন করতে হয়। আবার, এই জেলায় বহু মন্দিরের পূজার্চ্চনা গ্রাম্য কমিটির উপর দায়িত্ব থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রামনগর থানার অন্তর্গত বোধোড়া গ্রামে কৈবল্যদায়িনী সভার দ্বারা রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেবের পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠান করা হয়। আবার, বিশেষ কোন পরিবারের উদ্যোগে বৈষ্ণবীয় মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হলেও পরে ঐ মন্দিরের ব্যয়ভার বা দায়িত্ব গ্রাম্য কমিটির উপর এসে পড়েছে।

যাইহোক, এই জেলায় বৈষ্ণবীয় মন্দিরগুলি নির্মিত হওয়ার পর, এগুলিকে টিকিয়ে রাখার জন্য অর্থাৎ মন্দিরে পূজার্চ্চনা, ভোগদান, কীর্তন, উৎসব অনুষ্ঠানের খরচ বা

অতিথি সেবার জন্য স্থানীয় বহু জমিদার, ব্যবসায়ী, সহৃদয়ব্যক্তি, এমনকি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজনও নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি দান করেছেন। এমনকি দিল্লীর বাদশাহ বহু জমি জায়গা সনদ বা পাট্টা করে দিয়েছেন মন্দিরের বিগ্রহ বা মোহান্তের নামে।[১৩] হান্টারের বিবরণীতে এরূপ ২৭২টি বৈষ্ণবোত্তর জমির উল্লেখ আছে।[১৪] শুধু তাই নয়, বর্তমান প্রবন্ধকারের অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে যে প্রায় প্রতিটি বৈষ্ণবীয় মন্দিরে কিছু না কিছু ভূ-সম্পত্তি বা সোনাদানা আছে। তবুও কিছু কিছু মন্দিরে বাৎসরিক যা খরচপত্র হয় তা এই সম্পত্তির উপসত্ত্ব থেকে আসে না। তাই প্রয়োজনে মন্দিরগুলির পরিচালকমণ্ডলী বা মোহান্তরা তাদের ভক্তদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে বৈষ্ণবীয় মঠ-মন্দির এবং তার বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানগুলি এই জেলার বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্যের ইঙ্গিত বহন করে। কোন কোন পরিবার কাঁচাবাড়ি অর্থাৎ মাটির বাড়িতে বাস করে কিন্তু দেবতাকে স্থান দিয়েছে পাকাবাড়িতে। এ থেকে বোঝা যায় যে দেবতাদের প্রতি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা কত গভীর।

থেমে থাকে নি মন্দির নির্মাণের কাজ এই জেলায়। মাত্র গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জেলায় কিছু কিছু স্থানে মন্দির নির্মিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাঁশকুড়া থানার অধীনে জফুলি গ্রামে বর পরিবারের হরিমন্দির, তমলুক থানার অন্তর্গত হলদিচক গ্রামে রাধাকৃষ্ণের মন্দির, পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত চাঁইপুর গ্রামে হরির মন্দির ইত্যাদি।

সূত্র নির্দেশ

১। বিল. এস. বুদ্ধিষ্ট রেকর্ডস অফ দ্য ওয়েষ্টান ওয়ার্লড। দ্বিতীয় খণ্ড পৃ.-২০০; দাসগুপ্ত, প্রেমময় (সংকলন), **হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত**; পৃ. ১৪৮।

২। ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ছাড়াও, প্রণব রায়, **মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ**; তারাপদ সাঁতরা, **পুরাকীর্তি সমীক্ষা : মেদিনীপুর** থেকে এই তালিকা প্রস্তুত।

৩। প্রদ্যোতকুমার মাইতি, তাম্রলিপ্ত-তমলুকের সমাজ ও সংস্কৃতি পৃ. ৬১ ও ৯৩।

৪। ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও প্রণব রায় উদ্ধৃত. পৃ.

৫। বিনোদশঙ্কর দাস ও প্রণব রায় কর্তৃক সম্পাদিত, **মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন**, ২য় খণ্ড, অবতরণিকা

৬। প্রদ্যোত কুমার মাইতি, উদ্ধৃত পৃ. ৬১ ও পৃ. ৯৩।

৭। বর্তমান প্রবন্ধকারের অনুসন্ধান।

৮। প্রণব রায় উদ্ধৃত পৃ. তারাপদ সাঁতরা, উদ্ধৃত, পৃ.

৯। ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন **লেট মেডিয়াভেল টেম্পলস্ অফ্ বেঙ্গল** ও রমাকান্ত চক্রবর্তী, **বৈষ্ণবিজম ইন বেঙ্গল**, পৃ. ২৫৬,

১০। ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও প্রণব রায়, উদ্ধৃত পৃ. ও তারাপদ সাঁতরা, উদ্ধৃত পৃঃ

১১। বিষ্ণুপদ দাস, প্রবন্ধ-মেদিনীপুরে বৈষ্ণব ধর্ম : শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের অবদান।

১২। ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও "মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ",

১৩। তালিকা তৈরীতে সাহায্য করেছে অশোক মিত্র (সম্পাদিত) "পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা" তৃতীয় খণ্ড।

১৪। ঐ

১৫। ঐ

১৬। "মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ" ও "পুরাকীর্তি সমীক্ষা : মেদিনীপুর"

১৭। ঐ

১৮। ঐ

১৯। ঐ

২০। ড. বিষ্ণুপদ দাস "সাম আসপেক্ট...বৈষ্ণবিজম," পৃ.১২৭-২৮

২১। Hunter, "A Statistical Account of Bengal" পৃ. ৯৬।

মুঘলযুগে মেদিনীপুরের জমিদার

রাজর্ষি মহাপাত্র

মুঘল আমলে মেদিনীপুর ও হিজলী সুবা উড়িষ্যার অধীন ছিল। পরে এদের সুবা বাংলার অধীনে আনা হয। এ জেলার কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল যে এই জেলা কোনো একজন বৃহৎ জমিদারের অধীন ছিল না—যেমনটি ছিল বর্ধমান, নদীয়া, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলা। এখানে অনেক জমিদার সারা জেলায় ছড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু জংগল-মহাল এলাকা আজকের সিংভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার গভীর জংগলাকীর্ণ এলাকা তৎকালে মেদিনীপুরের মধ্যেই ছিল। ঐ জমিদাররা প্রায়ই নানা উপদ্রব সৃষ্টি করতেন। তাছাড়া মারাঠা বাহিনী এ জেলায নির্মম অত্যাচার ও লুঠতরাজ চালাতো। এজন্য সৈন্যসামন্তসহ একজন ফৌজদারের অধীনে সীমান্তবর্তী এ জেলার শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত। রাজস্ব ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতেন একজন দেওয়ান ও তাঁর অধীনস্থ সদর-চৌধুরী, যিনি ছিলেন জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে। সদর চৌধুরীর অধীনে থাকতেন একজন সদর কানুনগো যার হাতে থাকতো রাজস্ব দপ্তর। সদর চৌধুরী ও সদর কানুনগোর পদ ছিল বংশানুক্রমিক এবং পদাধিকার বলে বেশ কিছু তালুক এদের থাকতো নামমাত্র রাজস্বে। এছাড়া নানকার বা খোরপোষ জমিও প্রচুর থাকতো বিনা রাজস্বে। আবার এদের অধীনে মফঃস্বল চৌধুরী ও কানুনগো থাকতো––তাদের অধীনে থাকতো গোমস্তা, আক্রাজাত মোহরার ও পাটোয়ারী প্রত্যেক পরগনায়। তারা স্থানীয় জমিদারের অধীনেও কাজ করতো।[১]

মেদিনীপুরের জমিদারদের "খিদমদওজারী" জমিদার বলে অভিহিত করা যায়। দেশাচার নিয়মে বংশপরম্পরায় জমিদারী চালু ছিল। কিন্তু নূতন বংশধরদের আবার ফারমান নিতে হত। জমিদারদের রাজকর আদায় করা কর্তব্য ছিল। এদের রাজপথ সংস্কার ও দুষ্টের দমনও কর্তব্য ছিল। জেলার কুড়িটি মহালে পনেরটি দুর্গ ছিল, দুর্গে তীরন্দাজ, অশ্বারোহী, মশালবাহক সৈন্য থাকত এবং প্রয়োজনে রাজসরকারে সৈন্য সরবরাহ করতে হত। জমিদারদের কার্যাবলী পরিদর্শনের জন্য আমীন ও কানুনগো ইত্যাদি উচ্চপদস্থ আমলা থাকতো।[২]

তুর্কী-আফগান যুগে বঙ্গদেশের শাসন ছিল মোটামুটিভাবে সামন্ততান্ত্রিক। কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা স্থাপন করাই মুঘলদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যে পৌছতে মুঘলদের বঙ্গদেশে দীর্ঘদিন আঞ্চলিক ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

উড়িষ্যায় মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে মেদিনীপুরও মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল।

রাজা টোডরমল এই অধিকৃত অঞ্চলকে রাজস্ব আদায়ের জন্য ৫টি সরকার ও ৯৯টি মহালে বিভক্ত করেন। এর অধিকাংশই ছিল মেদিনীপুরের অন্তর্গত। প্রত্যেক মহালের শাসন সংরক্ষণ ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব একজন জমিদারের হাতে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যক্ষ শাসনের বাইরে যে সমস্ত অঞ্চল স্থানীয় শাসকদের দ্বারা পরিচালিত হত স্বাভাবিক কারণে সেখানকার শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সর্বত্র একইরকম ছিলনা। এই ধরনের স্থানীয় শাসন পরিচালনার অধিকার বঙ্গদেশের অনেক পুরোনো জমিদার পরিবার লাভ করেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েকজন জমিদারদের আবার ব্যক্তিগতভাবে প্রাদেশিক শাসকদের দরবারে উপস্থিত হয়ে আনুগত্য প্রকাশের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। এই বিরল ব্যতিক্রমের যারা শরিক হয়েছিলেন তাদের মধ্যে বীরভূম, পাচেৎ, চন্দ্রকোনা এবং হিজলীর জমিদারদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত জমিদারদের মধ্যে কাশিমখাঁর আমলে চন্দ্রকোনা জমিদার বীরহান বিদ্রোহী হলে ১৬১৭ খৃ. তার বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠানো হয়েছিল। যুবরাজ সুজার আমলে হিজলীর শাসক বাহাদুর খান বিদ্রোহী হলে তাকে বন্দী করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি বার্ষিক এক লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হওয়ায় শায়েস্তা খাঁ তাকে মুক্ত করে তার জমিদারী ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এই সমস্ত জমিদারের অধীন অঞ্চল সমূহে প্রশাসনিক কি ব্যবস্থা ছিল তা স্পষ্টভাবে বলা খুবই মুস্কিল। শাহজাহানের সময় তিনি এক ফরমান জারি করে তার রাজকীয় কর্মচারীদের জানিয়েছিলেন যে, নারায়ণগড় অঞ্চলের রাজাকে (জমিদার) নির্দিষ্ট বার্ষিক রাজস্বদানের প্রতিশ্রুতিতে তার অধীনস্থ অঞ্চলের শাসনকার্যে মুঘলেরা হস্তক্ষেপ করবেনা। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে অথবা ঐ অঞ্চলে শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হলে মুঘলেরা অভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করবে।[৫]

উল্লেখ্য যে ১৬১৭ খৃ. জাহাঙ্গীর বাদশাহ এবং তাঁর পুত্র খুররম্ (শাহজাহান)-এর সঙ্গে সর্দার রহিম খাঁন সেনা ছাউনি স্থাপন করেছিলেন কাশীজোড়া পরগণার অন্তর্গত মিঞার দমদমায় (সেনা নিবাসকে বলা হত দমদমা)। সর্দার রহিম খাঁন শাহজাহানের দিল্লীশ্বর হওয়ার স্মারক বা ঈদগা গড়ে তোলে জানুদীঘির পাড়ে এবং অনুরূপ আরও একটি মসজিদও গড়ে তোলেন কাজী মহল্লার কাছে শাহজাহানের মৃত্যুর স্মারক হিসেবে ১৬৫৯ সালে। জানুদীঘির পাড়ে ঈদগাসংলগ্ন রহিম খাঁনের কবর আজও রয়েছে।

'বাহারী স্থান-ই ঘায়েরী' নামে এক ফার্সীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে খ্রীষ্টিয় সতের শতকের প্রথমদিকে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলার জমিদারদের বিরুদ্ধে এক মুঘল অভিযান হয়। তার ফলে চন্দ্রকোনা, বরদা, ঘাটাল থানার অন্তর্গত এবং ঝাকরা প্রভৃতি এলাকার জমিদাররা মুঘল বশ্যতা স্বীকার না করায় মুঘল ফৌজদার মীর্জা মহম্মদ মুরাদ তাদের দণ্ডিত করে। এরপর থেকেই বহু ভূস্বামীদের পতন ঘটে। মুঘলদের অত্যাচারে ঝাকড়ার রাজবাড়ীসহ বহুরাজাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির দেবালয় মুঘলদের অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঝাকরা বা ঝাকড়া হল চন্দ্রকোনা থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এদিকে প্রচন্ড চাপেব মুখে কাশীজোড়ার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় অর্থনৈতিক এবং মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হন। আত্মসমর্পণ ছাড়া এই আঞ্চলিক রাজার কোনো উপায়ই ছিলনা। লক্ষ্মী নারায়ণের

মৃত্যুর পর ১৬৯২ খৃঃ দর্পনারায়ণ রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬৯২-১৭২০ খৃ. পর্যন্ত অত্যন্ত সতর্কতার সংগে রাজত্ব করেন কিন্তু জীবনের প্রান্তে এসে নবাবের অনুচরদের অত্যাচারিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন।[৫]

সতেরোশ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কাশীজোড়ার রাজা প্রতাপনারায়ণ একটি গড় বা দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। নাম হয় গড়কেল্লা। গোটা গড়কেল্লা মাটির উঁচু পরিখা আর জলঘেরি দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। **আইন-ই-আকবরীতেও** সেই সময় বাংলার বিভিন্ন বড় বড় কেল্লা বা দুর্গের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে 'গড়কেল্লার' উল্লেখ আছে। এখানে দুশো অশ্বারোহী, আড়াই হাজার গোলন্দাজ এবং তীরন্দাজ সৈন্য ছিল। **আইন-ই-আকবরী** গ্রন্থের সূত্রধরে বলা চলে আকবরের বাজত্বের সময়ই অজ্ঞাতনামা কোন রাজা বা ভূস্বামী এই গড় তৈরী করেন। প্রতাপনারায়ণ সেই গড় অধিকার করেছিলেন মাত্র।[৬]

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তমলুকের রাজা শ্রীমন্ত রায়ের রাজত্বকালের সময় সম্রাট আকবর বাংলা থেকে পাঠান শক্তির উচ্ছেদ সাধন করেন। আর ঠিক এই সময়ই সম্রাট কর্তৃক ভুঁইয়া প্রথারও প্রচলন বন্ধ হয়। তাই শ্রীমন্ত রায় ভুঁইয়া উপাধি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, নিখিলনাথ রায়, রজনীকান্ত গুপ্ত এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে শ্রীমন্ত রায় আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে সাধারণ জমিদারে পরিণত হন। **আইন-ই-আকবরী** থেকে জানা যায় সেই সময় তমলুকের রাজস্ব ছিল পঁচিশ লক্ষ একাত্তর হাজার চারশত ত্রিশ সিক্কা (২৫,৭১,৪৩০)। এই গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় ঐ সময় তমলুকে পাথরের তৈরী একটি দুর্গও ছিল। রাজা শ্রীমন্ত রায়ের আমলেই ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে কালোপাহাড় উড়িষ্যা বিজয় করেন। তমলুক দিয়েই কালোপাহাড়ের সৈন্যদল উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করেছিল। প্রবাদ আছে কালোপাহাড় অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করলেও বর্গভীমা মন্দির ধ্বংস করতে পারেননি।[৭] এছাড়া ঐতিহাসিক হান্টার লিখেছেন রাজা কেশব রায় মুঘল বাদশাহ কর্তৃক ১৬৪৫ খৃ. রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এই মতের সমর্থনে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আবুলফজলের বর্ণনা থেকে মনে হয় মুঘলপূর্ব যুগে বঙ্গদেশে প্রচলিত রাজস্বপ্রথা সমূহই আকবর বজায় রেখেছিলেন। বঙ্গদেশে মুঘলরা অধিকার ও শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা সরাসরি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মনস্থ করলেন। আকবর টোডরমলকে বঙ্গদেশে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করতে নির্দেশ দেন। ১৫৮২ খ্রী. তিনি বঙ্গদেশের যে পরিমাণ ভূমিরাজস্ব নির্দিষ্ট কবেছেন তা আসল জমা 'তুমার' নামে পরিচিত ছিল। তবে প্রকৃতপক্ষে মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা সর্বত্র একইরকম ছিল না। তবে এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। **আইন-ই-আকবরীতে** বঙ্গসুবার ১৯টি সরকার ও ৬৮৮টি মহালের প্রত্যেকটি রাজস্বের হিসেব আছে। আবুলফজলের এই হিসেবের মধ্যে দেখা যায় সরকার মান্দারনের মহাল ছিল ১৬টি ও তার বার্ষিক রাজস্ব ছিল ৯,৪০৩,৪০০ দাম।[৮]

মুঘল যুগে খালসা ও জায়গীর এই দুইরকম জমিতে জমিদারী প্রথা প্রচলিত ছিল। জমিদাররা ভূমিরাজস্ব রায়তদের কাছ থেকে সংগ্রহ কবতো। তবে জমির মালিক অথবা তাদের কর্মচারীদের সঙ্গে কৃষকদের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি ছিল তা সঠিকভাবে বলা খুবই

মুস্কিল। বিভিন্ন নথিপত্র অনুসারে মনে হয় কৃষকরা তাদের জমিতে কতকগুলি সুযোগ সুবিধে ভোগ করতো। তবে বৃহৎ জমির মালিকরা অনেক সময় জমির কাজের জন্য প্রচুর পরিমাণে স্ত্রী-পুরুষ ক্রীতদাস নিয়োগ করতেন। বঙ্গদেশে বহুসংখ্যক হিন্দু জোতদারদের সন্ধান পাওয়া যায়। এরা ছিল খুব ধনী। একদিকে ভূস্বামী অন্যদিকে কৃষকদের মধ্যে কাজের তদারকি করবার জন্য একদল পরিদর্শক তদারককারী গোষ্ঠী সমৃদ্ধশালী অঞ্চলগুলিতে দেখা যেত। আবুল ফজলের বর্ণনা অনুসারে বোঝা যায় আমাদের আলোচিত অঞ্চলের কৃষকদের অবস্থা ভালো ছিলনা।[৮]

জমিদাররা কৃষকদের উৎপাদনের একটি অংশের দাবিদার ছিল। বাংলাদেশের জমিদাররা রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়ে দিত এবং তাদের নিজের সংগ্রহের সংগে দেয় রাজস্বের পার্থক্যটাই ছিল তাদের লাভ। সেক্ষেত্রে তাদের রাষ্ট্রের জন্য রাজস্ব সংগ্রহকারী হিসেবে কম খাজনায় কিছু জমি ভোগ করতে দেওয়া হত।[১০]

অবশ্য সকল শ্রেণীর জমিদারই জাতি (Caste) বা গোষ্ঠীকে (Clan) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ প্রতিটি জমিদারই ছিলেন কোনো এক বিশিষ্ট অঞ্চলের প্রভাবশালী গোষ্ঠী-নেতা। ঐ গোষ্ঠীর লোকেদের নিয়ে তিনি নিজের সেনাবাহিনী গঠন করতেন। জমিদারদেব অনেকেরই দুর্গ ছিল এবং সেখানে সৈন্য মোতায়েন থাকতো। এছাড়াও স্থানীয় কৃষকদের ওপর জমিদারদের প্রভূত প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল—যা মুঘল শাসকদের ছিলনা। প্রকৃতপক্ষে গ্রামাঞ্চলের মানুষের ওপর মুঘল শাসক বা তাঁর কর্মচারীদের তুলনায় জমিদারদের নজর ও শাসন ছিল অধিকমাত্রায় প্রবল ও প্রত্যক্ষ।[১১]

জমিদাররা কোনো কোনো সময় মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিত। জমিদাররা যখন নিয়মিত রাজস্ব নিতে পারতো না তখনই মহাজনের দ্বারস্থ হত ঋণ নেবার জন্য। আবার মুঘল আমলে কৃষক বিদ্রোহের কথা সর্বজন স্বীকৃত সত্য। অবশ্য বিদ্রোহগুলির চরিত্র এক ছিলনা। এটা নিঃসন্দেহ কৃষক বিদ্রোহের মূলে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল অর্থনৈতিক। অতিরিক্ত কর বা 'আবওয়াব' কৃষকদের দিতে হত বলে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এছাড়া রাজস্বের পরিমাণ আইনত উৎপন্ন ফসলের বা শস্যের এক তৃতীয়াংশ থাকলেও কার্যত দুই-তৃতীয়াংশ আদায় করা হত। অবশ্য মেদিনীপুর জেলায় এ যুগে কৃষক-জমিদারের সম্মিলিত বিদ্রোহের দৃষ্টান্তও আছে। ঘাটাল মহকুমার দাশপুর-চিতুয়া-বরদা অঞ্চলের জমিদার শোভা সিংহের বিদ্রোহকে জমিদার ও কৃষক বাহিনীর বিদ্রোহের নিদর্শন হিসেবে ধরা যায়।[১২]

তৎকালীন জমিদার বা রাজারা শাসনকার্যের সুবিধার জন্য নিজের পরিচিত বৃত্তের যোগ্য ব্যক্তিদের নিজ অধিকৃত এলাকায় আনিয়ে বসত গড়ে দিতেন। আবার মুঘলযুগে জমির রাজস্ব হিসেবে ফসলের অংশ নেওয়ার থেকে মুদ্রায় নেওয়া রাজস্ব আদায়কারীরা বেশী পছন্দ করতেন। জমিরাজস্ব ছাড়াও ঔরঙ্গজেব জিজিয়া কর প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। হিন্দুরা ধর্মীয় ভিত্তিতে এই আত্মমর্যাদার ওপর আঘাত হানাকে মোটেই ভাল চোখে দেখেনি। তাদের এই অসন্তোষকে সম্বল করে অনেক সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি বা জমিদার নিজের আকাঙ্খিত উদ্দেশ্য চরিতার্থের পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। চেতুয়া

বরদার শোভা সিংহ এই পরিস্থিতিতেই ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা করেন[১৩] বলে কেউ কেউ মনে করেছেন।

'জমিদার' শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও জমিদার হিসেবে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে তার জমির ওপর যেমন স্থায়ী বা সাময়িক অধিকার ছিল তেমনই ছিল কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার। ১৪৭০ খৃ. বগড়ীর রাজা হাম্বির পুত্র রঘুনাথ সিংহ (বিষ্ণুপুরের নয়) নিজের হাতে শাসনভার গ্রহণ করে প্রজাদের কাছ থেকে উৎপন্ন শস্যের ১/৬, ১/৮ বা ১/১২ অংশ রাজস্ব স্থির করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও কৃষকরা বংশানুক্রমে জমির ওপর কিছু কিছু অধিকার ভোগ করত।

বাংলাদেশে সীমান্তবর্তী কিছু কিছু জমিদার বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করার স্বীকৃতিতে মুঘল সম্রাটকে সামান্য নজর পেশকাস দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জমিদারী চালাতেন। মান্দারনের অন্তর্ভুক্ত বরদা ও চন্দ্রকোনা ভূভাগের বা মহালের জমিদারকে পেশকাসের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।[১৪] বরদার জমিদার শোভাসিংহের সৈন্য সংখ্যা এক সময়ে হয়ে ছিল ১২,০০০। নবাবের প্রয়োজনে রামসিংহ এই সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতেন।[১৫]

বরদার জমিদার শোভাসিংহের সমসাময়িক পাশাপাশি জমিদারির জমিদারদের নামগুলি হল নাড়াজোলে সীতারাম খান, কর্নগড়ে রাম সিংহ, চন্দ্রকোনায় রঘুনাথ সিংহ, বগড়ীতে তেজচন্দ্র, বিষ্ণুপুরে দুর্জন সিংহ, বর্ধমানে কৃষ্ণরাম রায়, তাম্রলিপ্তে (তমলুক) রাজ্যের দুই অংশের দুই জমিদার রাজারাম রায় ও গম্ভীর রায়, কাশী জোড়ায় দর্পনারায়ণ রায়, ময়নায় মাধবানন্দ বাহুবলীন্দ্র প্রমুখ। উল্লেখ্য, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় ময়নায় গোবর্দ্ধন ও তাঁর পুত্র পরমানন্দ মুঘলদের নামেমাত্র আনুগত্য স্বীকার করেছিল; কাজকর্ম করতো নিজেদের ইচ্ছে মতই।[১৬]

জমিদারদের প্রশাসনিক ক্রিয়াকর্ম প্রাচীন গ্রামীণ হিন্দু পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন হত। মুসলমান ও হিন্দু রাজা বা জমিদারদের প্রজা পালন ছিল এক মহান কর্তব্য। বিশেষ করে হিন্দু জমিদারদের ধর্মীয় চিন্তায় ও নীতিগত দিক থেকে প্রজারা ছিলেন সন্তানতুল্য। তবে মুঘল সুবাদার তথা সম্রাটের নির্দেশে নিয়মিত রাজস্ব সম্রাটের কোষাগারে পাঠানো বাদে জমিদারদের তিনটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল জমিদারীর মধ্যে আইন ভঙ্গকারীদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন, জনপথ ও পথিকদের নিরাপত্তা বিধান এবং রায়তদের প্রতি সদয় ব্যবহার ও কৃষিতে উৎসাহ প্রদান এবং কৃষির উন্নতিতে সুব্যবস্থা গ্রহণ।[১৭]

মুঘলযুগে চন্দ্রকোনায় ভানবংশীয় জমিদারেরা প্রায় স্বাধীনভাবে বাদশাহকে সামান্য নজরানা দিয়ে রাজত্ব করতেন। তখন এই রাজ্যের নাম চন্দ্রকোনাই ছিল। তাঁরা মুঘলদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে আনুগত্যের মধ্যে আন্তরিকতা ছিলনা। আনুগত্যের শর্তানুসারে এইসব জমিদারদের সময়ে সময়ে মুঘলদের দরবারে হাজিরা দিতে হত, কোন যুদ্ধাভিযানে প্রয়োজনে নিজেদের সৈন্যসহ যোগদান করতে হত।[১৮]

প্রসঙ্গক্রমে দাঁতন জমিদারীর কথা বলা প্রয়োজন। দাঁতনের দুই মাইল উত্তরে মোগলমারী অবস্থিত। লছমীকান্ত সিংহ উত্তর রায় মোগলমারীর যুদ্ধের সময় এদেশে আসেন। জাতিতে রাজপুত লছমী কান্ত মুঘলবাহিনীর একজন সেনানায়ক ছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁর বীরত্বের জন্য মুঘল সরকার তাঁকে বীরবর উপাধি দিয়েছিলেন। উত্তর রায়বাড়ে তিনি বসবাস শুরু করেন। তিনিই দাঁতন জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা।[19]

তাছাড়া বালিচকের কেদার বা চণ্ডীপুর অঞ্চল শেরশাহের আমলে কেদার একটি পরগনায় পরিণত হয়। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে কেদার পরগণার নাম পাওয়া যায়। কেদারে একটি মন্দির আছে। যদিও মুঘল আমলের শেষের দিকে বর্গীরা কেদারনাথের মন্দিরটি অধিকার কবেছিল।[20]

যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের পর দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের, উত্তর ভারতে জাঠ এবং রাজপুতদের বিদ্রোহ দমন করতে সম্রাট ঔরঙ্গজেব যখন ব্যর্থ হলেন তখন সেই ব্যর্থতা উৎসাহ জোগালো বাংলার জমিদারদেরও খাজনা প্রদানের অস্বীকৃতিতে।[21] ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বাংলায় এলেন তখন ঠিক তার দু-বছর আগে শোভাসিংহ এবং রহিম খাঁ'র বিদ্রোহ ঘটে গেছে। প্রথম চারবছর তাঁরও কাটল জমিদারদের বিরুদ্ধে সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি চন্দ্রকোনার জমিদারের বিদ্রোহ দমন করেন।[22]

মুঘল রাজত্ব কিন্তু মেদিনীপুর জঙ্গল মহালগুলির কৃষি-অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। ওড়িশার দিকে তাকানো বন্ধ করে চাষী বণিক কারিগর জমিদাররা এবার দিল্লীর দিকে তাকাতে শুরু করলেন। তবে সব থেকে সমস্যা ছিল যখন খাজনা আদায়ের ভার কয়েকজন আদায়কারীর মধ্যে নিলামে বন্টন কবা হত। তারা তাদের পাইক-বরকন্দাজদের দিয়ে জোর করে যতটা দরকার খাজনা এবং অন্যান্য শুল্ক আদায় করতে লাগল। আদায়কারীদের সামাজিক অবস্থিতি অনেকটা পিরামিডের আকার নিল। সর্বোপরি সুবেদার, মাঝখানে জমিদার এবং সব নীচে. চাষী। তাই অনেকে এই রাজস্বব্যবস্থাকে 'ফিউডাল' বা সামন্ততন্ত্র আখ্যা দিয়েছিল।[23]

সামগ্রিক ভাবে বলা যায় আলোচ্য এলাকায় জমিদার মূলতঃ ভূম্যধিকারী হলেও এরা ছিল আধা-সামরিক শ্রেণী। প্রত্যেক জমিদারের নিজস্ব পল্টন এবং কেল্লা থাকতো যার সাহায্যে তিনি তাঁর অধিকারকে সুরক্ষিত রাখতেন। তাছাড়া জাতি বা বর্ণগত বিচারে গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে জমিদারের একটা যোগাযোগ ছিল। এর ফলে জমিদার তাঁর গ্রামের মানুষের সমর্থন পেতেন এবং বাদশাহরা সাধারণতঃ এদের বিপক্ষে যেতে চাইতেন না কারণ এরাই ছিল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ।

সূত্র-নির্দেশ

১। Bayley, H.V., Memoranda of Midnapore (1852) : বাংলা রূপান্তর রায়, নগেন্দ্রনাথ, উনিশ শতকের মেদিনীপুর, পৃ ১২, ১৯৯৮, বাকপ্রতিমা, মহিষাদল (মেদিনীপুর)

২। দাস, হরিসাধন, মেদিনীপুর দর্পণ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ১৩, দ্বিতীয় প্রকাশ (বাং ১৪০১), মেদিনীপুর

৩। সেনগুপ্ত, কান্তি প্রসন্ন, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস (মধ্যযুগ), পৃ. ৯৫-৯৭, ১৯৮৭, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

৪। নন্দী, হিমাংশু, কাশীজোড়া পরগণা ও কাশীজোড়া রাজবংশ, পৃ. ২১-২৩, ১৯৯৯, শ্রী দীপনারায়ণ মহাপাত্র, প্রতাপপুর, মেদিনীপুর।

৫। গোস্বামী, অভিজিৎ, গড়কেল্লার কথা (প্রবন্ধ), পৃ. ৮৮-৮৯, 'দর্শন' (বাৎসরিক পত্রিকা) শারদসং সম্পাদিক : আভা চক্রবর্তী, ১৯৯৭, খড়্গাপুর মেদিনীপুর।

৬। জানা, যুধিষ্ঠির, বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস, পৃ. ১৬১-১৬২, ১৩৭১ (বাং সন), কলকাতা পুস্তকালয়, কলকাতা

৭। Hunter, W.W., Statistical Account of Bengal, Vol.III, P.228, 1876

৮। সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ১০০-১০২।

৯। পূর্বোক্ত, গ্রন্থ, পৃ ১০২-১০৪।

১০। চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), পৃ. ২৬৬, ১৯৮৬, কাকলী প্রকাশনী, মেদিনীপুর

১১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৬৯-২৭০

১২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৭৪-২৭৫

১৩। মঙ্গল, রোহিনীনাথ, বিদ্রোহীরাজা শোভা সিংহ পৃ. ৪৩, ১৩৯৮ (বাংসন), প্রকাশক, কলকাতা।

১৪। বসু, যোগেশচন্দ্র, মেদিনীপুরের ইতিহাস, পৃ. ১৮০, ১৩৪৬ (বাংসন)

১৫। Mandal, Sushila, The History of Bengal, The Middle Age, Part-I P 14-15, 167, 199, 1970 Prakash Mandir Pvt Ltd, Calcutta

১৬। মঙ্গল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭১

১৭। পূর্বোক্ত

১৮। ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (২য় খন্ড), পৃঃ ৯৩-৯৪, ১৯৭৮, প্রকাশভবন, কলকাতা।

১৯। ব্যানার্জ্জী, গৌতম, রূপসী দাঁতনের রূপকথা (প্রবন্ধ) পৃ.৮৩-৮৪, 'দর্শন' বাৎসরিক পত্রিকা, পূর্বোক্ত

২০। গোস্বামী, অভিজিৎ, বালিচকের কেদারনাথ এবং সোলাঙ্কী রাজপুতদের ইতিহাস (প্রবন্ধ), পৃ. ৭১-৭২, 'দর্শন', পূর্বোক্ত

২১। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, সীতারাম, যদুনাথ সরকারের ভূমিকা, পৃ. ১০, বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩৫২ (বাংসন), কলকাতা এবং বসু, শ্যামাপ্রসাদ, অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী, পৃ.৭, ১৩৯৫ (বাংসন), কাকলী প্রকাশনী, মেদিনীপুর

২২। Inayetullah, Ahkam-i-Alamgiri, P.114

২৩। দাশ, বিনোদশঙ্কর ও রায়, প্রণব সম্পাদিত মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন (প্রথম খণ্ড) পৃ. ১৭৪-১৭৫, ১৯৮৯, সাহিত্যলোক, কলকাতা

মেদিনীপুরের লোক জীবন ও সংস্কৃতিতে দেবী শীতলা

তুষার মাইতি

পশ্চিম বাংলা তথা ভারতের অনেক প্রদেশে বসন্ত ও হাম ইত্যাদি রোগের অধিষ্ঠাত্রী শীতলা দেবীর পূজার প্রচলন রয়েছে। লৌকিক দেবী শীতলা উপরোক্ত রোগ প্রশমনকারী বলেও পূজিত হন। পশ্চিম বাংলার বহু গ্রামেই দেবীর স্থায়ী মন্দির আছে। তবে বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশেও দেবীর স্থায়ী মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। কাশীতে একটি প্রাচীন শীতলা মন্দির আছে এবং বিহারের সাসারামের নিকটও শীতলা মন্দির আছে। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরের ধাঙ্গড়দের মধ্যে শীতলা ভবানী নামে এক শীতলাদেবীর পূজোর প্রচলনের কথা জানা যায়। দেবীর পূজা আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সর্বত্র বহুল প্রচলিত। দিল্লীতে শীতলা দেবীর পূজার প্রচলনের কথাও জানা যায়। প্রজননের দেবীজ্ঞানে শীতলা পূজার প্রথা পুনা ও বোম্বাই এ চালু রয়েছে। পুনায় মেয়েদের বিবাহ উপলক্ষে দেবীর পূজা করা হয়। আবার বোম্বাই-এ সন্তান লাভের আশায় দেবীর পূজার প্রচলন রয়েছে।

ভারতবর্ষের বহুস্থানে শীতলাপূজার প্রচলন থাকলেও একথা নিঃশংসয়ে বলা চলে যে মেদিনীপুরের লোকজীবন ও সংস্কৃতিতে এই দেবীর প্রভাব যে কোন অঞ্চল থেকে যে বেশী, তা অনুন্ধানে প্রমাণিত। অনুন্নত সম্প্রদায় থেকে শুরু করে সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকেরা এই দেবীর পূজো করে থাকেন। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি, তমলুক ও ঘাটাল মহকুমায় শীতলা দেবীর অত্যধিক প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কোথাও কোথাও দেবীর বাৎসরিক বিশেষ পূজো উপলক্ষে মেলা বসে।

দীনেশচন্দ্র সেন বলেন যে বৌদ্ধদেবী হরীতীই বাংলার লোক সমাজে শীতলার রূপ পরিগ্রহ করেন এবং ঐ হরীতী বৌদ্ধ সাহিত্যে সন্তানদাত্রী হিসাবে কল্পিত। হরীতী থেকে শীতলার উৎপত্তি একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে না। তবে আমাদের বিশ্বাস হয়ত বৌদ্ধদেবী হরীতীর সন্তানদাত্রী... গুণটি পরবর্তীকালে শীতলা দেবীর মধ্যে স্থান পেয়েছে অথবা বাঙালী মানস কল্পনায় স্বাধীনভাবে শীতলা দেবীর মধ্যে সন্তানদাত্রী গুণটি আরোপ করা হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে শীতলা ও দাক্ষিণাত্যের শীতলম্মা একই সূত্র হতে উদ্ভূত। অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন বৌদ্ধদের 'পর্ণশবরী' দেবীই পরবর্তীকালে শীতলায় রূপলাভ করেছেন।

মেদিনীপুরে পরিলক্ষিত শীতলা দেবীর মূর্তিগুলি হল (১) পাথরের মূর্তি (২) ধাতু নির্মিত মূর্তি ও (৩) মৃন্ময় মূর্তি। পাথরের মূর্তিগুলি সাধারণত একখন্ড পাথরের উপর মুখমন্ডল, চোখ, কান ও নাক অঙ্কিত, নিম্নাংশটা কাপড়ে ঢাকা। এই ধরনের মূর্তিগুলি দেখতে পাওয়া যায় তমলুক

থানার নারায়ণদাঁড়ি, ময়না থানার পূর্ব্বদক্ষিণ ময়না, দক্ষিণ ময়না, কাঁথি থানার নাচিন্দা। ধাতু নির্মিত শীতলা দেবীর নারী মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় নন্দীগ্রাম থানার বাথুন আড়া, চন্দ্রকোনা থানার কাদড়া ও বামাড়িয়া আর মৃন্ময় মূর্তিগুলি দেখতে পাওয়া যায় দাশপুর থানার হরেকৃষ্ণপুর, পাঁশকুড়া থানার নৈপুর ও কেশিয়াড়ী থানার সুকরোলে।

প্রথমের দিকে দেবী বিভিন্ন গাছের তলায় অবস্থান করলেও বর্তমানে বেশীর ভাগ জায়গায় দেবী হয় পাকা নয়ত বা মাটির তৈরী মন্দিরে অবস্থিত রয়েছেন। এই সমস্ত মন্দিরে দেবী কোথাও একাকী আবার কোথাও অন্যান্য দেবদেবীর সাথে বিরাজমান। একাকী দেবীর অবস্থান নয়াগ্রাম থানার বাঙামেটে (৫টি) শীতলা দেবীর মূর্তি, খেজুরী থানার জাহানাবাদের (৫টি), চন্দ্রকোনা থানার বাগপোতায় (৩টি), নারায়ণগড় থানার আসাদায় (৩টি), খেজুরী থানার শেবমাচকে (৩টি) ও ময়না থানার শ্রীকন্যায় (৩টি)। অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে শীতলা দেবীর অবস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় তমলুকের হোগলবেড়্যা গ্রামে। দেবী এখানে আছেন পঞ্চানন্দ, রক্তাবতী, জ্বরাসুর, ওলাবিবি, শিব ও হরিঠাকুরের সঙ্গে, কাঁথির নামালডিহার শীতলার সঙ্গে থাকেন রক্তাবতী, স্বরাপাত্র, চণ্ডী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ। দাঁতনের মনোহরপুরে শীতলার মন্দিরে দেবীর সঙ্গে আছেন মনসা, রক্তাবতী, স্বরাপাত্র, ষষ্ঠী, ঘন্টাকর্ণ ও পঞ্চানন্দ।

বর্তমানে এই জেলার প্রায় সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়-এর মানুষ এর উপাসক, তবে কোথাও কোথাও মুসলমানরা হিন্দুর মারফৎ দেবীকে পূজা দিয়ে থাকেন। এর পূজারী কোথাও নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আবার কোথাও ব্রাহ্মণ। শীতলার বার্ষিকী পূজো সবস্থানেই বেশ ঘটাকরে হয়ে থাকে, কোন কোন স্থানে মেলাও বসে। পূজা ও মেলার দিন অবশ্যই হতে হয় শুক্লপক্ষের শনি বা মঙ্গলবার ধরে। এই সময় কোথাও কোথাও শীতলা মঙ্গল গানের আয়োজন করা হয়। মাস অনুযায়ী বার্ষিকী অনুষ্ঠানের একটি তালিকা দেওয়া হল।

বৈশাখ : চন্দ্রকোনা থানার কাছড়া, কঙ্কাবতী, ঘোলা, বাগপোতা, ভৈরবপুর, ঘাটাল থানার কামারবাড়, সুতাহাটা থানার বরদা, ঘাটাল থানার ঘাটাল, কনকপুর, ইড়পালা, দাসপুর থানার যদুপুর, পটাশপুর থানার বাগমারী, খেজুরী থানার চোদ্দচুলি, জাহানাবাদ, কাঁথি থানার নাচিন্দা ও মারিশদা, কেশিয়াড়ী থানার ভেলামপুর, সুকরোল, কেশপুর থানার সাকরই, মেদিনীপুর শহর শালবনী থানার কর্ণগড় ইত্যাদি।

জ্যৈষ্ঠ : দাসপুর থানার গোপালপুর, গড়বেতা থানার নলপা।

আষাঢ় : নন্দীগ্রাম থানার থানুভুঞ্যা—বৈশাখ থেকে আষাঢ় যে কোন শনিবারে (গ্রামবাসীর সুবিধামত)।

আশ্বিন : তমলুকের হোগলবেড়্যা।

পৌষ : বিনপুর থানার বেলাটিকরী, পাঁশকুড়া থানার দেউলিয়া, জশাড়।

মাঘ : গোপীবল্লভপুরের আলমপুর, সাকরাইল থানার সিঁদুরগোরী, কাঁথি থানার নামালডিহা, পটাশপুর থানার ভৈরবদাঁড়ি, টানিয়াবিলী, নারায়ণগড় থানার লাড়মা।

ফাল্গুন : পাঁশকুড়া থানার পূর্বচিল্কা, পটাশপুর থানার চাঁদপুরী, খেজুরী থানার কুলবাড়ি, তমলুক থানার টুল্যা।

চৈত্র ঃ নন্দীগ্রাম থানার বামুনআড়া, ময়না থানার শ্রীকণ্ঠা, দক্ষিণ-ময়না, সবং থানার বিষ্ণুপুর, ঝাড়গ্রাম থানার বল্লা, নারায়ণগড় থানার দেউলি ও পাহাড়পুর, খড়্গাপুর থানার গোকুলপুর, কাঁথি থানার নতুন বাজার।

হাম-বসন্ত ছাড়াও দেবী শীতলাকে অন্যান্য কারণে পূজা দেওয়া বা মানত করা হয়, যেমন রামনগর থানার দেপালের লোকেরা যে কোন রোগ প্রশমনের জন্য পাঁচ সিকে পয়সা দিয়ে দেবীর থানে মুদা ধরেন।

প্রাচীন পুরাণে দেবীকে ধনদাত্রী ও শিশু রক্ষাকারিনী বলে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু বাংলার গ্রাম জীবনে শীতলাকে এই সব জ্ঞানের জন্য পূজার খবর পাওয়া যায় না। শিশুদের মিলমিলাদি ছাড়া শিশু ঘটিত অন্য কোন কারণে কেউ শীতলার পূজা দেয়না। মনসা, চন্ডী, ও ধর্মঠাকুরের ন্যায় শীতলার পূজা প্রচার, মাহাত্ম্ম ও কাহিনী কথা নিয়ে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে কিছু কিছু কাব্য রচিত হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলি শীতলা মঙ্গল নামে পরিচিত। তবে এদের আদি কবি কে, তা বলা যায় না। এ কাব্যের বিখ্যাত কবি হলেন নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, বল্লভ, মানিকরাম গাঙ্গুলী, দেবকীনন্দন, শংকর, হরিদেব ও কৃষ্ণরাম দাস। মেদিনীপুরেও একজন কবির পরিচয় পাওয়া যায় যিনি আঠারো শতকে শীতলা মঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। ইনি হলেন কবীন্দ্র অকিঞ্চন চক্রবর্তী, যিনি ঘাটাল মহকুমার বরদা পরগনার অধিবাসী ছিলেন।

ঘাটাল শহরের শীতলা পূজা জেলার অন্যান্য অঞ্চলের থেকে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। শীতলার বার্ষিকী পূজা এই পৌর সভার প্রতিটি ওয়ার্ডেই আড়ম্বরের সহিত হয়। একে অনেক সময় দেশ পূজাও বলা হয়। ঘাটাল শহরের মাঝখানে আলনগঞ্জের শীতলার নাম 'বাজার বুড়ি'। ডাকিনী, যোগিনী, মনসা, পঞ্চানন্দ, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী সহ এই দেবী বিরাজমান। বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার তাঁর পূজা বার্ষিকী। দিনে পূজা হোলে ছাগবলি, রাত্রে দেবীর রূপোর খড়ম পেতলের এক সিংহাসনে বসিয়ে শোভাযাত্রা করে শহর পরিক্রমা। এছাড়াও ঘাটালের সাতপাড়ার পূজো উল্লেখযোগ্য। শহরের গয়লা পাড়া, মিস্ত্রিপাড়া, দত্তপাড়া, বারই পাড়া, কামার পাড়া, কুমোর পাড়া ও আচার্য পাড়া—এই সাতটি পাড়া মিলে এই বার্ষিকী।

পূজার পূর্বদিন জাগরণ গানের প্রচলন আছে। স্থানীয় গ্রাম্য কবিরা এই গান রচনা করেন তা যুবকগন কর্তৃক পথে পথে শোভা যাত্রা সহকারে গাওয়া হয়। রাত্রে ভ্রাম্যমান রঙ্গমঞ্চে নাটক ও বিচিত্রভাবে বাঈজী নৃত্য পরিলক্ষিত হয়। পুরুষ বাঈজী সেজে কোথাও কোথাও নাচে, সঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষ গায়ক থাকে। উভয় পক্ষের গান আবহ সঙ্গীতে অপূর্ব মাধুরীময় হয়ে ওঠে।

এই বার্ষিকী পূজার অন্যতম আচরণ হল 'ফুলপড়া'। এছাড়াও এই সময়ে মেয়েরা দেবীর ব্রত করেন। এই ফুলপড়া দেখার জন্য নিজ পাড়া ও বহুদূর থেকেও বহু ভক্তসমাগম ঘটে। ঘাটাল পৌরসভার কুশপাতার শীতলা দেবীর মন্দিরে এ উপলক্ষে বেশী ভীড় হয়। সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাটিতে ফুল না পড়লে অমঙ্গল আশঙ্কায় পাড়ার ভক্তরা বিচলিত হয়ে পড়েন। অনেকে স্থানীয় শীলাবতী নদীতে স্নান করে সিক্তবসনে, অনেকে আবার সারা শরীর নদীর পলিমাটি দ্বারা কর্দমাক্ত করে মাতৃমন্দিরে এসে হাত জোড় করে সাষ্টাঙ্গ হয়ে হৃদয়ের আকুতি জানায়। ঢাক-ঢোল, কাঁসার ব্যাগপাইপের সঙ্গে তীব্রভাবে ঢাকীরা ঢাক বাজায়। একএকটা পাড়ায় ৫০-৬০

টি ঢাক মিলিত ভাবে বাজে। সে যাই হোক ফুল এক সময় পড়ে যায়। পূজা সিদ্ধ হয়। ফুল না পড়লে আবার নতুন করে সে পাড়ায় পূজা করতে হয়। এটি এক জাতীয় ব্রাহ্মণের পরীক্ষা রূপে পরিগণিত হয়। ফুল পড়লে ব্রহ্মণের তেজ ভক্তদের হৃদয়ে উদ্দীপিত হয়।

এছাড়া 'বাজার বুড়ীর' বিশেষ পূজা আরো কদিন হয়। আষাঢ় মাসে রথের সময় তাঁর রথযাত্রা ঘটে দশহাত উঁচু পাঁচ চূড়া বিশিষ্ট একটি লোহার রথে যার প্রতিটি চূড়ায় থাকে একটি করে কলসী ও চক্র। রথ যাত্রায় শীতলার পূজানুষ্ঠানে প্রচণ্ড ভীড় হয়। এখানকার শীতলার রাস হয়, দোল হয়। দোলের আগের দিন চাঁচর হয়। সেদিনও দেবীর খড়ম সিংহাসনে বসিয়ে শহর পরিক্রমা করা হয়। শারদীয়া পূজোর সময় সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত শীতলার ঘটেই দুর্গাপূজা হয়। ঘাটালের ব্যবসায়ীরা পয়লা বৈশাখ ও অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মন্দিরে এসে হালখাতা করেন। একমাত্র ঘাটাল শহরের হালখাতাতেই লেখা থাকে 'শ্রী শ্রী শীতলামাতা সহায়'। সর্বত্র প্রচলিত গণেশের পরিবর্তে হালখাতায় শীতলা নামের ব্যবহার ব্যবসায়ী মহলেও শীতলার অপ্রতিহত প্রভাব সূচিত করে।

খড়্গপুরের খড়িদার শীতলার নাম 'মোলাম্মা'। এর পূজারী ও ভক্তরা হল তেলেগু সমাজ। মে মাসের (May) প্রথম সপ্তাহে বৈশাখের (১৬-২৫) এর পূজা। পূজা সাতদিন ধরে চলে। এই সাতদিন পূজা হয় খড়্গপুরের মন্দিরে খড়িদার মূর্তিটি আনিয়ে। সপ্তাহ শেষে পূজান্তে মূর্তিটি পুনরায় খড়িদায় রেখে আসা হয়।

নাচিন্দায় এক শীতলা দেবী আছেন যার খ্যাতি সমগ্র মেদিনীপুর ছাড়াও হাওড়া, হুগলী ও বাঁকুড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। কাঁথি-মেচেদা রোডের ধারেই দেবীর পাকা মন্দির। দেবী নাচিন্দা নামে পরিচিত। দেবীর নামে একটি বাসস্ট্যান্ডও আছে। লোক মুখে শোনা যায় যে ১২৪৬ সালের এক শনিবারে নাচিন্দার ঝাপু শ্রীর মা স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে তাঁর পুকুরের ঈশাণ কোণ থেকে দেবীর শীলামূর্তিটি তুলে এনে পাশের একটি বটগাছের তলায় দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে পূজা আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে মাটির মন্দিরে, তারও পরবর্তীকালে পাকা মন্দিরে দেবীর অবস্থান। ব্রাহ্মণ চক্ গ্রাম নিবাসী গোপীনাথ বেরা বর্তমান পাকা মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত দেবীর নিত্যপূজা করেন, তবে শনিবার ও মঙ্গলবার দেবীর বিশেষ পূজা হয়। এই সময় বিপুল সংখ্যক জনসমাগম হয়। দেবীকে প্রতিদিনই অন্নভোগ দেওয়া হয়। উপস্থিত সবাই সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন। হাম-বসন্ত ও শিশুদের মিলমিলাদি ছাড়াও পারিবারিক কল্যাণের জন্যেও দেবীর পূজা দেওয়া হয়।

বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়াতে দেবীর বাৎসরিক পূজা। এই পূজা উপলক্ষে পনের দিনের একটি মেলাও বসে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা ধরনের দোকান আসে। সয়ালগানসহ যাত্রাদল তাদের পালা অভিনয় করে যান। এছাড়াও দুর্গাপূজা ও কালী পূজার সময়ও দেবীর থানে মেলা বসে।

এই দেবীর অনেক অলৌকিক কাহিনী আছে। ১৩৯২ সালের ঘটনা। একদিন দেবী শীতলা ও চণ্ডী দুই সাধারণ রমণীর ছদ্মবেশে কলিকাতার বড়বাজারের এক মাড়োয়ারীর দোকানে গিয়ে দুইখানা দামী বস্ত্র পছন্দ করে নিতে চায় কিন্তু দোকানদার যখন দাম নিতে চান তখন ঐ দুই নারী

বলেন আমাদের কাছে কোন পয়সা কড়ি নাই—এ দুখানা আমাদের ধার দিতে হবে, এর টাকা নাচিন্দার মন্দিরের পুরোহিতের কাছে নিয়ে নিবে। কিন্তু ঐ মাড়োয়ারী কোন ভাবেই ওদেরকে ওগুলো দিল না। তখনই দেবী শীতলা ও চণ্ডী এখান থেকে বিলীন হয়ে যান। পরদিন সকাল বেলা পুরোহিত এসে দেখেন দুখানা নতুন শাড়ি। তিনি দেখে অবাক হয়ে যান এবং সবাইকে জ্ঞাত করান। ঐদিন দুপুর বেলা ঐ মাড়োয়াড়ী মন্দিরে এসে ৫০ পয়সা দক্ষিণা দিয়ে প্রধান পুরোহিতকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন এবং একটা মোটা অঙ্কের টাকা মন্দির এর তহবিলে দান করে যান।

অপর একটি কাহিনী হল একদিন দেবী ভ্রমণে গিয়ে জালাল পুরের ধরনী সামন্তের বাড়ীতে সাধারণ নারীর বেশে যান। ইচ্ছে করে দেবী তাঁর রৌপ্য পাদুকা দুটি ধরনীর সব্জী বাড়ীতে ছেড়ে আসেন। পরদিন সকালে ধরনী যখন তাঁর ঐ বাড়িতে আসেন, তখন তিনি ঐ রৌপ্য পাদুকা দুটি দেখতে পান, হবাক হয়ে উক্ত পাদুকা দুটি মন্দিরে পৌঁছে দেন ও সঙ্গে তাঁর বাড়ীর সব্জীও। বলা হয়ে থাকে দেবী নাকি কাঁচা সব্জী খেতে ভালবাসেন। তাই তিনি ইচ্ছাকরে পাদুকা দুটি ছেড়ে এসেছিলেন। এছাড়া এখানে হত্যে দেওয়ার প্রথাও আছে। পূর্বে বলি হত, বর্তমানে তা আর হয় না। এও জানা যায় যে মুসলমানরাও দেবীর নিকট মনস্কামনা পূরণের জন্য মানত করেন।

এখানকার দেবী শীতলা 'বর্ধমান শীতলা' নামে পরিচিত। এই নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলা হয় যে দেবী সমস্ত ভক্তবৃন্দের ইচ্ছা পূরণ করেন বলেই তাঁর এই নাম। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে দেবীর ইচ্ছানুযায়ী দেবী কেমাধব করের বাড়ী থেকে বামুন আড়ার শশ্মান ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কোন পাকা মন্দির ছিল না। পরবর্তীকালে অরঙ্গানগর পরগনার দামোদরপুর গ্রামের অভয়গিরি নামক এক ব্যক্তি দেবীর নির্দেশে দেবীর প্রসাদ বিক্রী করে যে অর্থ সঞ্চয় করেন তা দিয়ে বর্তমান পাকা মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

এই জেলার অনেক স্থানে শীতলা কুলদেবী হিসাবে পুজা পেয়ে থাকেন। এরকম এক স্থানের নাম হল পাঁশকুড়া থানার সুন্দরনগর গ্রামের নিম্নশ্রেণীর দোলই (দুলিয়া) পরিবারের লোকেরা দেবীকে কুলদেবী হিসাবে পুজো করেন। দুর্গা পূজার নবমী তিথিতে এর বার্ষিকী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় পূজা বেশ ধূমধামের সাথে হয়। এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূজা করেন। দেবীর কাছে এই সম্প্রদায়ের মানুষজন নিজ নিজ মনস্কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা জানায়। সন্তান কামনা তার মধ্যে অন্যতম। এই থানার পীতপুর গ্রামের শীতলাদেবীর কথা উল্লেখ করা যায়। মাহিষ্য বাড়ীতে দাগ শীতলা দেবীর প্রতিষ্ঠা, পৌরহিত্য করেন ঐ বাড়ীর লোকেরা।

এছাড়াও এই জেলার নন্দীগ্রাম থানার শাপুর গ্রামের শীতলা ও আমদাবাদ গ্রামের সানকীদের বাড়ীতে শীতলাদেবীর পুজো উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তির সময় মেলা বসে। ঐ থানার হানুভুঞ্যা গ্রামে আষাঢ় মাসে শীতলা দেবীর পূজা উপলক্ষে তিন দিনের মেলা বসে। সুতাহাটা থানার বরদা গ্রামের বৈশাখ মাসে সাতদিন ও তমলুক থানার টুল্যা গ্রামে দোল পূর্ণিমার দিন একদিনের জন্য মেলা বসে। এছাড়াও ঘাটাল থানার কনকপুর গ্রামে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিনের জন্য, খেজুরী থানার ফুলবাড়ি গ্রামে ৫ দিনের জন্য, ঐ থানার জাহানাবাদ গ্রামে ও চন্দ্রকোনা থানার কঙ্কাবতী গ্রামে বৈশাখ মাসে ছয় (৬) দিনের জন্যে শীতলা পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে। কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত পটাশপুর থানার মঙ্গলামাড়ো, অমর্ষি ইটাবেড়িয়া প্রভৃতি

জায়গায় শীতলা দেবীকে নিয়ে ব্রাহ্মণরা এক ধরনের আচার পালন করতেন কিন্তু বর্তমানে সেই আচারটি আর দেখতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণরা একটি ছোট শীতলা দেবীর মূর্তিকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি পরিক্রমা করতেন। প্রত্যেক বাড়িতে দেবীর আগমন ঘটলে বাড়ির সদস্যরা শঙ্খ বাজিয়ে দেবীর আগমনকে স্বাগত জানাত এবং ব্রাহ্মণদের চাল, ডাল, নানা রকম সব্জী প্রদান করত। দিনের শেষে ব্রাহ্মণ অনেক চাল সংগ্রহ করতেন। এই জেলার কোথাও বলির প্রচলন না থাকলেও কোলাঘাটের (পাঁশকুড়া-২) অন্তর্গত মানুয়া গ্রামে প্রতিবৎসর বাৎসরিক পূজার সময় এখানে ছাগ বলি হয় এবং পাঁশকুড়া থানার ধুলিযাপুর গ্রামেও বাৎসরিক পূজার সময় কেবলমাত্র নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষরা দেবীব মন্দির থেকে কিছু দুরে ছাগ বলি দেন।

আমাদের উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে মেদিনীপুরের লোক জীবন ও সংস্কৃতিতে দেবী শীতলার এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আমরা যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন চর্চায় দেবদেবীদের ঘরের মানুষ করে ফেলেছি তা দেবী শীতলার পূজার ব্যপকতা থেকে বোঝা যায়। আমাদের ধর্মবোধের সংগে দেবদেবীর সম্পর্ক যে সুদুর অতীত থেকে প্রবাহমান তাও বুঝতে অসুবিধে হয় না। তাই বোধ করি বিচিত্র মানব মন ও দেব ভাবনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

সূত্র-নির্দেশ

(১) মিহির চৌধুরি, কামিল্যা, 'আঞ্চলিক দেবতা' বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২

(২) ঘাটাল পৌরসভার ১২৫ বর্ষপূর্তিতে স্মরণিকা গ্রন্থ, ঘাটাল, ১৯৯৪

(৩) দাস, বিনোদশংকর ও রায়, প্রণব, 'মেদিনীপুরঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন' কলিকাতা, ১৯৯৮

(৪) ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

(৫) মাইতি, প্রদ্যোত কুমার, 'তাম্রলিপ্ত তমলুকের সমাজ ও সংস্কৃতি' কলিকাতা, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৮৭

(৬) মাইতি, প্রদ্যোত কুমার. 'বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি' কলিকাতা ১৯৮৮

(৭) মাইতি, সরোজ কুমার, নাচিন্দার দেবী শীতলার মাহাত্ম কাহিনী' নাচিন্দা, কাঁথি, মেদিনীপুর।

(৮) মুখোপাধ্যায়, তারাশিস, তমলুক মহকুমায় শীতলা পূজার বৈচিত্র্য' তমলুক। ১৯৭৫

(৯) মুখোপাধ্যায়, সুব্রত কুমার, 'কাল্ট অব গডেস শীতলা ইন বেঙ্গল' কলিকাতা, ১৯৯৪

(১০) সেনগুপ্ত, পল্লব, 'পূজা পার্বনের উৎস কথা' কলিকাতা ১৯৯০।

উত্তরবাংলার লৌকিক সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকে সুফী-পীর-ফকির—একটি সমীক্ষা

বিষ্ণু প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গৌড়বঙ্গে তুর্কীবিজয়ের পর যে নতুন চিন্তাভাবনাগুলির বিকাশ হয়েছিল সুফীভাবধারা তার মধ্যে প্রধান। সুফীসাধকেরা ইসলামের বিজয়ী শাসকের প্রাধান্য থেকে স্থানীয় মানুষদের ভাবনামুক্ত করে এদেশে ইসলামের এক জনগ্রাহ্যরূপ দেন। বাংলাদেশে সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে সমান অধিকারের আদর্শ স্থাপন করাই ছিল সুফীবাদের শ্রেষ্ঠ অবদান।

ইতিহাসের গতিপথে সুফীবাদের পর্যালোচনা বাংলা তথা উত্তরবঙ্গের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে দর্পণের ভূমিকা পালন করে থাকে। এই দর্পণের মাধ্যমেই উত্তরবঙ্গের লোকায়ত জীবনকে সঠিকভাবে জানা যায়। এ অঞ্চলের সমাজের বিবর্তনে এবং বিকাশে সুফীবাদের গুরুত্বের যথার্থ মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে।

সুফীসাধকেরা পশ্চিম এবং মধ্যএশিয়া থেকে উত্তরভারত হয়ে উত্তরবঙ্গে এসেছিলেন। তাঁদের এই অঞ্চলে আসার সময়কাল মূলত দুটি পর্যায়ে বিভক্ত (১) ভারতে মুসলিম বিজয়ের আগে এবং (২) গৌড়বঙ্গে মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে। তুর্কী বিজয়ের আগে যাঁরা এসেছিলেন বলে ধরা হয় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাবা আদমশহীদ, শাহসুলতান রুমী, শাহসুলতান মহীসওয়ার, মকদুম শাহগ জনভী, শেখ বায়েজিদ রোস্তামী প্রভৃতি। এই সুফীগণের অবদান এবং কার্যকলাপ অনেকটাই কিংবদন্তী নির্ভর এবং এরা বখ্‌তিয়ার খলজীর গমনের আগে এসেছিলেন কিনা বলা শক্ত। দ্বিতীয় পূর্বে অর্থাৎ গৌড়বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে বর্হিদেশ থেকে বহু সুফীসন্ত উত্তরবঙ্গে আসেন ; তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজী, শেখ আখি সিরাজউদ্দিন, শাহ ইসমাইলগাজী। এই সাধকগণই এতদ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারে ও প্রসারে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

সুফী মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর লেখা একটি চিঠি থেকে উত্তরবাংলায় সুফীবাদের প্রভাব সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন দেবগাও বা দেবকোটে (বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে), মহিসুনে (দিনাজপুর জেলার মহিগঞ্জ), দেওতলায় (পাণ্ডুয়ার ১৮ মাইল উত্তরে মালদহ জেলায়) বিভিন্ন সিলসিলার সুফীগণ অতিন্দ্রীয় সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন এবং সমাহিত হয়েছেন। উপরোক্ত স্থানগুলি সবই উত্তরবঙ্গের অর্ন্তভুক্ত। অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফীসাধক শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজীর দেওতলায় এতটাই প্রভাব ছিল যে তাঁর নাম অনুসারে সেখানকার নাম রাখা হয় তাব্রিজাবাদ। এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে সুলতানী শাসনকালে উত্তরবাংলায় সুফীবাদ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এতদ

অঞ্চলের স্থানীয় কয়েকজন সুফীসাধকের শিক্ষার ভিত্তিতে নতুন সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছিল। সিমনানীর পত্র থেকে তাদের নামগুলো জানা যায়, যথা—আলাই সম্প্রদায়ের উদ্ভব পাণ্ডুয়ার খ্যাতনামা দরবেশ আলাউল হকের শিক্ষা থেকে, শেখ হোসেন যুককর পোষ 'হোসেনী' সুফী মতের প্রবর্তক। রুহানিয়া, শাত্তারিয়া সম্প্রদায়েরও প্রসার ঘটে। এই শাখা প্রশাখার বিস্তার, অজস্র খানকাহ, দরগার অস্তিত্ব উত্তরবঙ্গে সুফীবাদের জনপ্রিয়তার স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে।

সুফী দরবেশ পীরদের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা নিজেদের জীবন শুধু খানকা'র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তৎকালীন পারিপার্শ্বিক সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁদের দরগাগুলোর অবস্থান থেকে তাঁদের কার্যকলাপের একটা ভৌগোলিক ধারণা পাওয়া যায়। পূর্বে চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, পশ্চিমে মঙ্গলকোট পূর্ণিয়া, দক্ষিণে বাগেরহাট থেকে উত্তরে কান্তাদুয়ার ও রংপুর পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে পড়েছিলেন। শুরু থেকেই সুফীদরবেশরা আধ্যাত্মিক কর্মের পাশাপাশি শিষ্য এবং জনগণকে শিক্ষিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। Stuartএর 'History of Bengal' বইটি থেকে জানা যায় গৌড়ে দরবেশ কুতুব আলম শাহের বিখ্যাত মাদ্রাসার খরচ চালানোর জন্য সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ জমি দান করেছিলেন। শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য শেখ আখি সিরাজউদ্দিন উসমান গুরুর কাছ থেকে কিছু বই নিয়ে লক্ষণাবতীতে আসেন এবং এগুলোকে কেন্দ্র করেই এখানে মরমীবাদের প্রথম গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। গৌড় পাণ্ডুয়ার অজস্র খানকাগুলোতে সুফীগুরুরা তাদের শিষ্যদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন। শেখ হুসামউদ্দিন মানিকপুরীর লেখা থেকে তাঁদের শিক্ষাধারার মর্মবস্তুটি জানা যায়। মাণিকপুরী লিখেছেন যে সুফীগুরুরা শিষ্যসহ সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতে, বিনয়ী হতে, শিশুবৃদ্ধের প্রতি যত্নবান হতে, সংযমী হতে, আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করতে, মুসলিম অমুসলিম সবার প্রতি সমান সৌজন্য এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা দেন। তাদেরকে দয়ায় সূর্যের মত, বিনয়ে জল এবং ধৈর্যে মাটির মত হতে বলেছিলেন। আর্তমানুষের সেবায়ও তাঁরা পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতি 'ফকিরি চিকিৎসা' নামে আজও প্রচলিত। তাঁদের মতে ঈশ্বর আরাধনা আব কিছুই নয়, বিপন্নকে সাহায্য করা, অসহায়ের সহায়তা করা এবং ক্ষুধার্তকে আহার দেওয়া। রাষ্ট্র ও শাসকদের প্রতি আচরণে সাধারণভাবে তাঁরা শাসকশ্রেণী থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন যাতে নিজেদের মূল কর্মক্ষেত্র অর্থাৎ জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়েন। অবশ্য এর ব্যাতিক্রমও ছিল। অনেক সময়ই তাঁরা সুলতানদের অধর্মীয় কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সংঘাতও হয়েছে। কঠোর শাস্তিও পেয়েছেন কিনতু নিজেদের পথ ও মত থেকে সরে আসেননি। এজন্যই মুসলিম শাসকদের থেকে পীর ফকির দরবেশদের সম্বন্ধে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ভালবাসা আজও বেশী।

উত্তরভারতের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ইসলামধর্ম বিস্তারে একটা মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়; তা হল উত্তরভারতে বহুদিন ধরেই মুসলিম শক্তি রাজক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও ইসলাম সেখানে মূলত শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, বিপরীতে উত্তরবঙ্গের গ্রামীন সমাজ বিপুল সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। সাধারণভাবে সামাজিক বৈষম্য, বর্ণগত বাধা, হিন্দু ও বৌদ্ধদের কলহকে এই ধর্মান্তকরণের অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়। অনেকগুলো কারণেই

ধর্মান্তকরণ হয়েছিল তবে প্রধানত সুফী দরবেশরা তাঁদের সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের বাণী দিয়েই উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ জীবনের বৃহত্তর অংশকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। তাই তাঁদের মৃত্যুর শত শত বছর পরেও আজও মাজার বা দরগাগুলো উত্তরবাংলার হিন্দু মুসলমানের মিলনতীর্থে পরিণত হয়েছে।

মুকুন্দরাম ও বিজয়গুপ্তের লেখা থেকে জানা যায় যে সুলতানী আমলে সুফীরা স্থানীয় জনসাধারণের কাছে 'পীর' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে পরিচিত ছিলেন। হিন্দু অবতারবাদের সঙ্গে পীরবাদের মিল লক্ষ্য করা যায়। সুফীবাদের প্রভাবেই বাংলার উত্তরের জেলাগুলিতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই সত্যপীরের পূজায় অংশ নেন, নিরামিষ শিরণী প্রসাদ দেন। মুসলমানদের পীরের ধারণা এবং হিন্দুদের স্থানীয় দেবদেবীর কল্পনার মিশ্রণেই সত্যপীরের উদ্ভব। এ ব্যাপারে গ্রামীণ ছড়া আছে,

হিন্দু কুলে নারায়ণ, মুসলমানের পীর।
দুই কুলে সিন্নি খান বাবা সত্যপীর।।

আজও মানিকপীর, ঘোড়াপীর, পাঁচপীর ইত্যাদি বহু কাল্পনিক পীরগণ উত্তরবাংলার সহজ সরল মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র।

গৌড়ে সুলতানী শাসনকালে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে যে সামাজিক বিবর্তন হয়েছিল সেখানে পণ্ডিত সমাজ বা শাসক শ্রেণীর চাইতে সুফীদের অবদানই বেশী ছিল। তাঁরা স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধচিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন। সুফীমতের সঙ্গে সহজেই গ্রামের প্রচলিত সাধনমার্গের সমন্বয় ঘটে এবং সমাজের লোকায়ত স্তরে প্রচলিত ইসলামধর্ম বাস্তবিকই 'মজম উল বহরেন' অর্থাৎ দুই সাগরের সম্মিলন হয়ে দাঁড়ায়। সুফীদরবেশরা সাধারণত হাদিশ শরিয়তে গুরুত্ব দিতেন না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাঁরা স্থানীয় সংস্কৃতিরও কোন বিরোধিতা করেননি। সেজন্য শুধুমাত্র ধর্মমত ছাড়া লোকাচার এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। বিভিন্ন লোকাচার, মেলা, বিবাহ, মন্দির নির্মাণ এমনকি পূজা অর্চনাতেও সমন্বয়ের ছাপ রয়েছে। উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ হিন্দু রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষেরা যে 'বারেলিয়া' পূজা করেন সেখানে এগারো জন হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে দ্বাদশ দেবতা হিসাবে একজন পীরসাহেব পূজিত হন। পাগলাপীরের ভক্তদের উপর হিন্দুদের মতই শনিমঙ্গল বারে পীরের ভর হয়। কোচবিহারের শিবের মন্দিরে গম্বুজের অবস্থান যদি ইসলামিক স্থাপত্য রীতির কথা মনে পড়িয়ে দেয় তবে দেখা যায় স্থানীয় পীরের কবর হয়েছে ইসলামিক রীতিতে কিন্তু তাঁর দরগা গঠিত হয়েছে হিন্দুরীতিতে। এখানকার দরগায় হিন্দু সেবাইতের উল্লেখ পাওয়া যায় যা অন্যত্র বিরল। কিছুদিন আগেও স্থানীয় মুসলিম মহিলারা বিবাহের সময় সিঁদুর পরতেন। মুসলিম সমাজে প্রচলিত 'যুগীর' গানের পদে ইন্দ্র, আল্লা, মহাদেব, মা ফতিমার উল্লেখ পাওয়া যায়। একইভাবে অপরদিকে গোরক্ষনাথের গানে দাড়িওয়ালা পীর সাহেবের অভ্যর্থনার কথা বলা হয়েছে। অসুখে বিসুখে কেউ বা করতেন 'শীতলা পূজা', কেউবা দিতেন ওলা বিবিকে সিন্নি। সেজন্য স্থানীয় প্রবাদ রয়েছে 'হ্যান্দুর ঘরের দেবীও যা, মোচরমানের বিবিও তা।'

সুফীবাদের ফসলই হচ্ছে এই সমন্বয়শীলতা। সুফীদরবেশদের সহিষ্ণুতা, সাম্য ও প্রেমের চেতনা উত্তরবঙ্গের লোকায়ত জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল যার ফলে হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বহু প্ররোচনাতেও ক্ষুণ্ণ করা যায়নি। গর্বের সাথে বলা যায় আজ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। সুফীবাদের এটিই সবচেয়ে বিজয়।

সূত্র নির্দেশ

(১) আবদুল করিম—বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, ঢাকা। প্রকাশকাল জুন, ১৯৯৩।।

(২) এম এ রহিম—বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঢাকা। প্রকাশকাল—১ম খন্ড, এপ্রিল ১৯৯৫ ২য় খন্ড, জানুয়ারী ১৯৯৬।

(৩) গোলাম সাকলায়েন—পশ্চিমবঙ্গের পীর ও সাধুসন্ত প্রসঙ্গ, কলিকাতা। প্রকাশকাল—অক্টোবর, ১৯৮৭।

(৪) বি নি. পাণ্ডে—ইসলাম ও ভারতীয় সংস্কৃতি, কলিকাতা। প্রকাশকাল—অক্টোবর, ১৯৮৭।

(৫) অরুণ মৈত্র—কামতা জনজীবন কথা, কলিকাতা। প্রকাশকাল—অক্টোবর, ১৯৮৭।

(৬) ধনঞ্জয় রায়—উত্তরবঙ্গের লোকজীবন চর্চা, কলিকাতা। প্রকাশকাল—অক্টোবর, ১৯৮৭।

(৭) সম্পাঃ অনিল বিশ্বাস—সম্প্রীতিঃ গণশক্তি, মার্চ ১৯৯৩।

(৮) সম্পাদকঃ নন্দনঃ ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও সমাজ সংখ্যা-সম্পাদক-বিপ্লব দাসগুপ্ত—(২৯ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা —নবপর্য্যায় তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) জানুয়ারী—১৯৯৩।

(৯) সম্পাদনা ২ মধুপর্ণী—মালদাহ জেলা সংখ্যা (১৩৯২), জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা (১৩৯৪), কোচবিহার জেলা সংখ্যা (১৩৯৬)।

অষ্টাদশ শতকের বাংলা ঃ
সমৃদ্ধি না অবক্ষয়

ফণীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী

আলোচ্য শতকে বাংলার অসংখ্য মানুষ নবাবী আমলে ও তৎপরবর্তী কালে আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির ভাগ কতটুকু পেয়েছিল—এটাই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। অষ্টাদশ শতকে নবাবী আমলে বাঙ্গালীর আর্থিক সঙ্গতির রূপ ও পরিকাঠামো কিরকম ছিল বা বাংলার সমৃদ্ধি ও বাঙ্গালীর সমৃদ্ধি একই অর্থ বহন করে কি না ইত্যাদি প্রশ্ন-উত্তর দেবার চেষ্টা এখানে করেছি।

ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় থেকে রমেশ চন্দ্র দত্ত, নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিন্‌হা, আব্দুল করিম, অমলেশ ত্রিপাঠি, সুশীল চৌধুরী প্রত্যেকেই সব বিষয়ে একমত না হলেও এই বিষয়ে একমত যে নবাবী আমলে বাংলা সমৃদ্ধিশালী ছিল। বাংলার বৈষয়িক সমৃদ্ধিকে যদি আমরা বাঙ্গালীর সমৃদ্ধি বলে ধরে নিই তাহলে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যদি তার বিপরীত হয় অর্থাৎ বাংলার সমৃদ্ধি আর বাঙ্গালীর সমৃদ্ধি সমার্থক না হয়; তাহলে সমস্যা আসে। এটি জটিল হয়ে পড়ে যখন আমরা মোরল্যান্ড-এর **ফ্রম আকবর টু ঔরঙ্গজেব**-এর প্রসঙ্গ এনে দেখি যে মোরল্যান্ড ব্রিটিশ আমলেই একমাত্র দেশের সমৃদ্ধি ঘটেছিল বলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে নবাবী আমলে বাঙ্গালীর সমৃদ্ধির প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

বৈষয়িক সমৃদ্ধি যে সমস্ত অবদান-এর উপর নির্ভর করে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। এখানে আমরা শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের বিষয়ের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব কারণ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যেই কৃষি ও শিল্পের পরিস্থিতিটাও কিছুটা বুঝা যাবে।

"সুবা জান্নাত উল বিলাদ বাংগালা"—অর্থাৎ সকল দেশের সেরা স্বর্গতুল্য বাংলার মাটির উর্বরতা স্মরণাতীত কাল থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই রকম একটি এলাকায় নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ বাণিজ্য প্রচলিত হয়েছিল। এখানেই আমাদের দেখা প্রয়োজন বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য কাদের দ্বারা পরিচালিত হোত? মূলধন কাদের হাতে ছিল? ইংলিশ ফ্যাক্টরী রেকর্ডস-এ বাংলায় ব্যবসারত ব্যবসায়ীদের অসংখ্য নাম আছে। যথা ক্ষেমচাঁদ (1672), চিন্তামন, সুখানন্দ, চতুরমল, দামুরমল, পুরণমল (1672) উদয়চাঁদ, গোকুল চাঁদ, ফতে চাঁদ, বিঠলদাস, দোয়ারকা দাস প্রভৃতি[১] যারা বাঙালী নন। খোজা পিদ্রুস, খোজা ফানোস-আর্মেনিয়ান।[২] ট্যাভারনিয়ার লিখিত বিবরণীতে আফগান বণিকের উল্লেখ আছে।[৩] ইংরেজ কুঠিয়াল স্ট্রেনসাম মাস্টার তাঁর রোজনামচাতে সপ্তদশ শতকের আশির দশকে ক্ষেমচাঁদ ও চিন্তামন-এর উল্লেখ

করেছেন।[৪] হুগলি ফ্যাক্টরী রেকর্ডস-এ নব্বই-এর দশকেও (1695) এদের বাণিজ্যিক কীর্তিকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়।[৫] অষ্টাদশ শতকে (1705) মথুরাদাস ও তার দুই পুত্র (বিঠলদাস ও দোয়ারকা দাস) বাংলার বাণিজ্যের সিংহভাগ দখলে রেখেছিল।[৬] স্রফ বা ব্যাংকার যারা ছিল যথা সুখানন্দ শা, চতুরমল শা[৭] বাঙ্গালী নয়। অষ্টাদশ শতকে নিম্ন গাঙ্গেয় এলাকা থেকে বাংলার সিল্ক পাটনায় নিয়ে আসত পাঠান ব্যবসায়ীরা।[৮] অর্থাৎ পুরো আর্থিক ব্যবস্থাটাই বাঙ্গালীর হাতের বাইরে ছিল। যাদের হাতে ছিল তাদের পরিবার পরিজন দেশে থাকত। সুতরাং উপার্জিত অর্থের সিংহভাগ বাংলার বাইরে চলে যেত।

বাঙ্গালী নাম যা পাওয়া যাচ্ছে যথা পরাণ, জয়কৃষ্ণ, উদয়চরণ, ঘনশ্যাম প্রভৃতি তারা কেউ ব্যবসায়ী নয়। তাদের বলা হচ্ছে দালাল, গোমস্তা, মুৎসুদ্ধি ইত্যাদি।[৯] এই কাজও বাঙ্গালীর একচেটিয়া ছিল না। এখানে তাদের প্রতিযোগিতা ছিল উত্তর ভারতের হৃদয় রাম তেওয়ারি, কিরপাল দালাল, সিরার্দবেগ, রামহুদ্দর[১০] ইত্যাদির সঙ্গে। বাণিজ্যে বাঙ্গালীর অনুপস্থিতি কিন্তু অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ আগমনের ফলশ্রুতি নয়। অভ্যান্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য থেকে বাঙ্গালী বিতাড়ন পর্তুগীজ বণিকদের দ্বারা শুরু হয় সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে যখন তারা বাংলার নবাবকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা করে দিয়ে স্থানীয় নুন ব্যবসার উপর একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করে।[১১] সামরিক শক্তির জোরে নদী ও সমুদ্রে বাধার সৃষ্টি করে বাঙ্গালী বণিকদের উৎখাত করার যে চেষ্টা তারা শুরু করেছিল পরবর্তী শতকে ইংরেজ কোম্পানির বণিকরা একই পদ্ধতি অনুসরণ করে বাণিজ্য থেকে বাঙ্গালীর অপসারণ সমাপ্ত করে। উপরন্তু ১৭১৭ সাল থেকে শুরু হয় আর এক নতুন পদ্ধতি। মুঘল সম্রাট ফারুখশিয়ার-এর ফারমান-এর বলে বলীয়ান ইংরেজ বণিক বাণিজ্য শুল্ক না দিয়ে বাংলার অভ্যান্তরীণ বাণিজ্যে ব্যক্তিগত ব্যবসা বলে যা শুরু করেছিল ১৭৬৫ সালের পর তাদের দাপটে গুজরাটি, আর্মেনিয়ান, ইহুদি প্রভৃতি ব্যবসায়ীরাও ধীরে ধীরে হটে যেতে থাকে।[১২] বাংলার তৎকালীন শাসকরা স্থানীয় মানুষদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সমর্থন যোগানোর কোন চেষ্টাই করেন নি।

যে কোন দেশের সরকার দেশীয় বণিকদের নিরাপত্তা দেবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে। বাংলায় আলিবর্দি ও মীরকাশিমের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কোন নবাবের পক্ষে এটা সম্ভব হয় নি। কেন হয়নি তার অনেক কারণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই সময়ের দিল্লীর শাসনকর্তারা দেশের স্বার্থ নিয়ে ভাবিত ছিল না। তাদের দৃষ্টি ছিল তাৎক্ষণিক লাভের প্রতি। তাই ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা এতটা বাড়তে পেরেছিল।

আলোচ্য শতকে দালাল, মুৎসুদ্ধি, গোমস্তা প্রভৃতি যে সব ইংরেজ কোম্পানির বাঙ্গালী কর্মচারীদের দেখতে পাচ্ছি তাদের নিয়োগের শর্ত ছিল কাজের বিনিময়ে তারা নির্দিষ্ট বেতন পাবে। কিন্তু নির্দিষ্ট বেতনে তারা সন্তুষ্ট ছিল না, তাই নানা প্রকার ছল চাতুরির সাহায্যে কিছু বেশী উপার্জনের চেষ্টা সর্বদাই করত। সেজন্য ইংরেজ কোম্পানি দু'টি পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিল। মাল কেনার জন্য এদের হাতে টাকা দিত। আর নির্দিষ্ট দামে মাল কিনে কোম্পানির গুদামে জমা

দিতে পারলে দস্তুরি দেওয়া হত।[১৩] আর দ্বিতীয়টি বেশ কিছু ব্যবসায়ীকে একত্রিত করে একটি সংস্থা গঠন। কিছু টাকা দিল সেই সংস্থার হাতে এবং নির্দেশ দিল গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কৃষক শিল্পীদের কাছ থেকে মাল কিনতে। আর শহরাঞ্চলে যেমন কাশিমবাজারে ইংরেজরা তাঁতিদের অগ্রিম ধরিয়ে দিল।[১৪]

কৃষকদের অগ্রিম দেবার এই ব্যবস্থা 'দাদনি ব্যবস্থা' ধীরে ধীরে সর্বাত্মক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল। মাল কেনার জন্য দালাল বা গোমস্তাদের হাতে কোম্পানি যে অগ্রিম দিল, তারা আবার কৃষক উৎপাদকদের তা দাদন হিসাবে দিল। এই ভাবে দাদন দিয়ে কৃষকদের বেঁধে ফেলা হল, তাঁতীদেরও। দালাল বা গোমস্তা কয়েক স্তর বিশিষ্ট ছিল যাকে ইংরেজীতে আমরা multi-tier system বলতে পারি। প্রত্যেক স্তর নিজেদের জন্য লাভ নিশ্চিত রাখার চেষ্টা করত বলে যতটা সম্ভব কম দামে কৃষক তাঁতীর কাছ থেকে মাল কেনার জন্য উৎপীড়ন চালাত। এছাড়া ভালো মানের কাপড় মোটা কাপড়ের দামে কেনা প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় অত্যাচার শুরু হল। ইংরেজ কোম্পানির প্রতি নিজেদের আনুগত্য নিশ্চিত করতে পারলে কখনো কখনো নিজের সামান্য পুঁজি খাটিয়ে ব্যবসা করতেও পারত। এটা জানার পর গোমস্তা, দালালদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় ;ক কত অনুগত তা প্রমাণ করার জন্য। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী কৃষক ও তাঁতী। দালাল, গোমস্তা, মুৎসুদ্দিদের মধ্যে কেউ কেউ কিছুটা আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল হয়েছিল। এলিট শ্রেণীর স্রষ্টাও এরাই। এদেরকেই comprador আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এরা নিজ স্বার্থেই কোম্পানির নামে নিজের দেশের মানুষের উপর অত্যাচার চালাত।

প্রকৃতির ঔদার্যের অভাবে উৎপাদন মার খেলেও পূর্বনির্দিষ্ট দামে মাল বিক্রি করা কৃষক তাঁতীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। ১৭৫৭-র পর কোম্পানি আর নবাবের মিলিত খিচুড়ি শাসন ব্যবস্থায় আইনের শাসন কিছুই ছিল না। মীরকাশিম মুঙ্গেরে রাজধানী সরিয়ে নেওয়ায় বাংলার মানুষকে রক্ষা করার আর কেউ রইল না। মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে কোম্পানি ও তার দেশীয় দালাল গোমস্তাদের কাছে বাংলা হয়ে দাঁড়ায় সুখের মৃগয়ার স্থান। রপ্তানি বাণিজ্যের এই আলোচনায় দেখা যাচ্ছে বাঙ্গালী উৎপাদকের আর্থিক সঙ্গতি বলে প্রায় কিছুই ছিল না। উৎপাদন ব্যবস্থা অ-লাভজনক হওয়ায় এই সংগঠনের উপর তার কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিসংখ্যান দেবার আগে আমরা আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বাঙ্গালীর স্থান কোথায় ছিল তা দেখে নিতে পারি।

অষ্টাদশ শতকের নথি 'বেঙ্গল পাবলিক কনসালটেশনস'-এ দেখা যাচ্ছে করমণ্ডল উপকূল থেকে বাংলায় আমদানি হত তামা, সিল্ক, টিন, তামাক, মশলা এবং মসলিপত্তমের বিখ্যাত চিন্‌ত্‌জ্ কাপড়।[১৫] কাশ্মীর থেকে উল[১৬], উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে নুন, আফিম, টিন, কার্পেট, মালাবার উপকূল থেকে গোলমরিচ[১৮] প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় পণ্য বাংলায় আসত গুজরাটি, আরব ও ইহুদিদের বাণিজ্য বহরের সঙ্গে। এখানে এসব পণ্যের ক্রেতা ছিল নবাব ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা। অধিকাংশটাই পুনরায় রপ্তানি হত উত্তর ভারতে বিশেষত দিল্লী ও

আগ্রায়।[১৯] আমদানি বাণিজ্যে লাভের পরিমাণ কি রকম ছিল? অষ্টাদশ শতকের সাক্ষ্য থেকে জানা যাচ্ছে মালাক্কা থেকে কেনা জিনিষের উপর সেখানে ৩০ শতাংশ শুল্ক দিয়ে বাংলায় বিক্রি করলে ২৫০-৩০০ শতাংশ লাভ হত।[২০] বাংলা থেকে কিনে সেগুলি উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে নিয়ে যাওয়া হোত। সেখানে আরও বেশী লাভে বিক্রি হোত ধরে নেওয়াই যেতে পারে। এত অর্থের হাত বদলে বাঙ্গালীর কোন ভূমিকা ছিল বললে বেশী বলা হবে।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য[২১] থেকে এই যে বিপুল লাভ তা বাংলাকে ছুঁয়ে যেত কিন্তু এর একটি পয়সাও বাংলার মানুষের হাতে আসত না। বাণিজ্য শুল্কের টাকা যতদিন নবাবরা ছিলেন ততদিন তাঁদের ও রাজকর্মচারীদের হাতে যেত। আর লাভের টাকা যেত গুজরাট, আরব বা অন্য কোথাও। বাংলার বন্দরগুলি ছিল প্রকৃত পক্ষে ট্রানসিট বন্দর। পদ্ধতি ছিল এইরকম: সমুদ্রগামী জাহাজে যারা বাণিজ্য করত তারা মালাক্কা, অচিন প্রভৃতি বন্দর থেকে মাল কিনে এনে নদীপথে যারা বাণিজ্য করত তাদের কাছে বিক্রি করত। যেহেতু কোন ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী বণিক ছিল না সেহেতু বাণিজ্য পুঁজি গড়ে তুলতে বাঙ্গালী পারে নি। আবার শিল্প ও কৃষি পুঁজি তৈরী হয়নি গোমস্তা, ফড়ে ও বিদেশী বণিকদের অত্যাচারে।[২২]

এখানে একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত[২৩] ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের আলোচনা সংক্ষেপে শেষ করে নেওয়া যাক। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা কেন সমুদ্রগামী নৌ বাণিজ্যবহর গড়ে তুলতে পারলো না? যদি ষোড়শ শতকেই এটা করা সম্ভব হোত তাহলে বাণিজ্য মূলধন তৈরী হত। সমকালীন ইউরোপীয় পর্যটকরা সোনার গাঁওয়ের নৌকো ও জাহাজ তৈরীর কারিগরদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মাঝি মাল্লা হিসাবেও বাঙ্গালীর খ্যাতি ছিল। অথচ বাঙ্গালী না সামুদ্রিক বাণিজ্যে না উপকূলীয় বাণিজ্যে কোন রকম উদ্যম দেখাল। চট্টগ্রাম ও হুগলি বন্দর থেকে বঙ্গোপসাগর হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে[২৪] বিরাট লাভের যে বাণিজ্য সম্ভাবনা ছিল বাঙ্গালী বণিকরা তা খতিয়ে দেখেছে বলে প্রমাণ নেই। অষ্টাদশ শতকের আগেই সুরাট বন্দরকে কেন্দ্র করে গুজরাটি বাণিয়ারা যে সামুদ্রিক বাণিজ্য সংগঠন গড়ে তুলেছিল সেই একই পরিস্থিতি ও সুযোগ বাঙ্গালীদেরও ছিল। দিল্লীর মুঘল দরবারে নিজেদের প্রতিনিধি রেখে দরবারের হালচাল বুঝার সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় বাণিজ্যের[২৫] সঙ্গে প্রতিযোগিতা এড়িয়ে কিভাবে নিজেদের বাণিজ্য বজায় রাখতে হয়, অথবা আরব সাগরে ইউরোপীয় জাহাজের দৌরাত্ম্য কি ভাবে বাগে রাখা যায় এ সব নিয়ে আব্দুল গফুর, বীরজি ভোরা, শিবজি ভোরা ইত্যাদি গুজরাটি বণিকরা চিন্তা ভাবনা করে নিজেদের সামুদ্রিক বাণিজ্য অক্ষত রেখেছিল। গুজরাটিদের অস্তিত্বই নির্ভরশীল ছিল সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর। এখানেই ছিল বাঙ্গালীদের সঙ্গে গুজরাটিদের তফাৎ।

বাঙ্গালীদের কাছে সামুদ্রিক বা উপকূলীয় বাণিজ্যের এরকম কোন আবেদন ছিল না। কারণ সম্ভবত বাংলার উর্বর ও সরেস মাটি যেখানে অল্প আয়াসেই শস্য ফলানো যায়। তাই অজানা, অচেনা গভীর সমুদ্রের হাতছানি আলোচ্য যুগে বাঙ্গালীকে আকর্ষণ করেনি। তার মূলধন এবং সম্ভবতঃ দুঃসাহসের পুঁজি উভয়ই ছিল সীমিত। নবাব দরবারে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি রেখে বাণিজ্যের জন্য নবাবকে প্রভাবিত করার কথা তাদের মনেও হয়নি। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও নৌ-বাণিজ্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও বাঙ্গালী বণিকদের একচেটিয়াত্ব ছিল না। স্ট্রেনসাম মাস্টার-এর রোজনামচা থেকে জানা যায় এক্ষেত্রে মারোয়ারি ও গুজরাটিদের সঙ্গে ইহুদি, আর্মেনিয় ও আরব

ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ছিল।[২৬] এর সঙ্গে পরে যোগ দেয় ইংরেজ কোম্পানির জাহাজ। সুরাট বন্দরই প্রথম ভারতের বাণিজ্য বহর গড়ে তোলে। ফলে আরব সাগরে সুরাটের সমৃদ্ধি যেমন চমকপ্রদ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়, চট্টগ্রাম বা হুগলি বন্দরে সে ঘটনা ঘটল না।
এবার আমরা দেখব বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের পরিস্থিতি কি রকম ছিল?

মুর্শিদকুলি একটাই মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে ১৭০০ খ্রীঃ বাংলা সুবার দেওয়ান পদে যোগ দেন, তা হচ্ছে দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধের রসদ যোগান দেওয়া। বাংলা থেকে খাজনা নিংড়ে আদায় করে পাঠিয়ে দেওয়া।[২৭] এর থেকে দুটি সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি। প্রথমত, সম্পদ নির্গমণ। দ্বিতীয়ত, প্রতি বছর বর্ধিত হারে খাজনা দেবার জন্য কৃষক উৎপাদকের উৎপাদনের কাজে আগ্রহের অভাব। খাজনা আদায়ের টাকা যদি বাংলাতেই থাকত তাহলে সেই টাকা ঘুরে কোন না কোন ভাবে উৎপাদকের হাতে ফিরে আসতই। সুতরাং কৃষি থেকে কৃষকদের কোন লাভ ছিল না। প্রতি বছর খাজনা আদায় বৃদ্ধি থেকে প্রমাণ করা অসম্ভব নয় যে কৃষি ফলন বৃদ্ধি পেয়েছিল, বিশেষ করে কৃষকদের ঋণ দেবার পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেওয়া যায় কৃষি পণ্যের দাম কমে গিয়েছিল। এ বিষয়ে প্রমাণও আছে।[২৯] কাজেই ফসল বিক্রি কবে খাজনার টাকা জোগাড় করা প্রজাদের পক্ষে অসম্ভব কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। মুর্শিদকুলি শুধু যে বিপুল পরিমাণ টাকা বাইরে পাঠাতেন তাই নয় নিজেও তিনি বছরে গড়ে ৯,৮০,০০০ টাকা উপার্জন করতেন।[৩০]

সামগ্রিক ভাবে বাঙালী সমাজের উপর এর বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়ার কোন বাস্তব ছবি নিয়ে সমকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ ব্যক্তিগত ব্যবসা নবাবী রাজশক্তিকে হটিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় ও অ-ভারতীয় বণিকরাও হটে গেল। বাংলায় ইংরেজ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বঙ্গোপসাগরে ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্য ও সামরিক শক্তি কর্তৃত্ব শুরু করল। ইংরেজ রাজশক্তি ও সামরিক শক্তি একত্রিত হবার পরিণামে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর অথবা বঙ্গোপসাগরে ভারতীয় বাণিজ্য বহর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামরিক ঘাঁটি তৈরীর প্রয়োজন তাদের হয়নি। দেশের অভ্যন্তরেই ইংরেজরা দেশীয় বণিকদের বাণিজ্য ধ্বংস করার সুযোগ পেয়েছিল। পর্তুগীজ ব্যক্তিগত ব্যবসা নির্ভরশীল ছিল ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সহযোগিতার উপর, কিন্তু ইংরেজদের ব্যাপারে তা নয়। ভারতের অভ্যন্তরে রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা তাদের ব্যবসাব সামগ্রিক চরিত্র পালটে দিয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরে খুচরো ও পাইকারী ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ইংরেজ কোম্পানি বাঙালীকে কম্প্রাদর (comprador) হতে সাহায্য করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে নবাবী আমলে ও পরে কোম্পানির শাসনে বাঙ্গালীর জান, মান ও সম্পত্তি বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কোন কিছুরই নিরাপত্তা ছিল না। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র শক্তির আর্থিক চাহিদা মেটাতে বাঙ্গালী নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয়ত, এই সমস্ত সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে উদ্যম ও ঝুঁকি নেবার প্রয়োজন ছিল বাঙ্গালী তা নিতে সাহস করেনি। এসবের নীট ফল আর্থিক দিক থেকে বাঙ্গালীর অবক্ষয়।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাঙ্গালীর ফিরিওয়ালা ব্যবসায়ী হবার গুণ একটু বেশী মাত্রায় আছে। ঐতিহাসিক ভ্যান লিউর ও স্টিন্‌স্‌গার্দ এশিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে "Peddling trade" বা 'ফিরিওয়ালার ব্যবসা'-এই কথাটি ব্যবহার করেছেন।[৩১] তাঁদের বক্তব্য অল্পমূলধন ও বাণিজ্য সামগ্রী নিয়ে বন্দর থেকে বন্দর ও দেশ থেকে দেশান্তরে গিয়ে বহুসংখ্যক বণিক একটি বৃহৎ বাণিজ্য কান্ড চালু রেখেছিল। ঐতিহাসিক কীর্তি নারায়ণ চৌধুরী এবং অশীন দাশগুপ্ত এই বক্তব্য মেনে নেননি। শুধু সুরাটের বণিকদের ক্ষেত্রে অশীনবাবু ভিন্নমত পোষণ করেছেন। বাংলার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের যথার্থতা নির্ধারণ করার চেষ্টা প্রয়োজন। বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে, হাটে, মেলায় অথবা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বাঙ্গালী 'হকার' বা ফিরিওয়ালা ও ছোট ব্যবসায়ীদের আধিক্য যে ছিল সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। তবে এদের মূলধন ছিল খুবই সীমিত। স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যের উপর এদের নিয়ন্ত্রণ ছিল খুবই কম। তাছাড়া জনসাধারণের চাহিদাও ছিল কম আর তার কারণও ছিল পয়সার অভাব। তাহলে সমৃদ্ধিটা কোথায়?

সূত্র নির্দেশ

১. মালদহ ডাইরী এ্যান্ড কনসালটেশন্‌স্‌ ১৬৮০-৮২, ৭৪।

২. আই. ও. এল লণ্ডন হুগলি ফ্যাক্টরী রেকর্ডস ভল্যু. ১০, ১৬৫।

৩. ট্যাভারনিয়ার, জে. বি., ট্র্যাভেলস ইন ইন্ডিয়া, ১৬৪০-৬৭, অনু: ভি. বল, লন্ডন, ১৮৮৯

৪. আই. ও. এল. লন্ডন, বেঙ্গল পাবলিক কনসালটেশন্‌স্‌, ১৭০৪-১৭১০ ভল্যু, ১, ৩৯১, ৩৯৪।

৫. রেকর্ডস্‌ অব্‌ ফোর্ট সেন্ট জর্জ, ডাইরী এ্যান্ড কনসালটেশন্‌ বুক, ১৬৭২-৭৮, ২৩।

৬. ডেসপ্যাচ বুক্‌স, ২৬ ফেব্রু., ১৭০৩, ভল্যু. ৯৫, ৫৮।

৭. ফ্যাক্টরী রেকর্ডস্‌, কাশিমবাজার, ভল্যু. ১, ডাইরী এ্যান্ড কনসাল্ট, ২৮ মে, ১৬৭৭; ২৫ মার্চ, ১৬৭৯; ১৫ জানুয়ারী, ১৬৮০; ফ্যাক্টরী রেকর্ডস, মালদহ, ভল্যু. ১, ডাইরী, ১৩ মে, ১৬৮০।

৮. স্ট্রেনসাম মাস্টার, ডাইরীজ (১৬৭৫-৮০), লন্ডন, ১৯১১, ভল্যু., ২, ১৪৬-৪৯, ২২২-২৪, ৩৭৬-৭৭।

৯ ভার্থেমা, এল., দ্য ট্র্যাভেলস ১৮৬৩, ১৫১।

১০. ফীচ, আর., দ্য ভয়েজ ...হোকলুয়ত ভল্যু. ১০, লন্ডন ১৯১০, ১৫১।

১১. মানরিক, এস., ট্র্যাভেলস ..... (১৬২৯-৪৩), ভল্যু., ২, অক্সফোর্ড ১৯২৭, ৪২৮।

১২. ১৬৮৬ সালে চিন্তামনের পণ্য বোঝাই জাহাজ ক্যাপ্টেন নিকলসন দখল করে নেয়। ফ্যাক্টরী রেকর্ডস, বালাসোর, ভল্যু. ১, কনসাল্ট, ১৬ নভে. ১৬৮৬। ১৬৯১ সালে বেঙ্গল মার্চেন্ট। নামে ইংরেজ জাহাজ ১৭ হাজার টাকায় কেনার প্রস্তব দিয়েছিল। ফ্যাক্টরী রেকর্ডস, ক্যালকাটা, ভল্যু., ৫, পার্ট, ২, ১৩২, ১৪২। ১০ হাজার মণ মাল

নিয়ে তার জাহাজ ১৬৯৫ সালেও তেনাসেরিম ও মালদ্বীপে গিয়েছিল। তার একখানা জাহাজের নাম **জগন্নাথ প্রসাদ**। ১৬৯৫ সালে তার মৃত্যুর পর তার বাণিজ্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ফ্যাক্টরী রেকর্ডস, ক্যালকাটা, ভল্যু., ১, পার্ট ২, ৩১, ৩৬। চিন্তামন ওড়িষার নবাব রসিদ খাঁনের গোমস্তা বা এজেন্ট হিসেবেও কাজ করত। ওরিজিন্যাল করসপন্ডেস, নং ৪৭২৬, ভল্যু., ৪১, ৮ জুলাই ১৬৮১।

১৩. **বেঙ্গল পাবলিক কনসালটেশন্‌স্‌**, রেঞ্জ ১, ভল্যু ১, ৩৯১, ৩৯৪।

১৪. **স্ট্রেনসাম মাস্টার**, প্রাগুক্ত।

১৫. ভার্থেমা. এল., প্রাগুক্ত।

১৬. বেঙ্গল পাবলিক কনসালটেশান্‌স্‌, প্রাগুক্ত

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. প্রাগুক্ত। দঃ পূঃ এশিয়ার সুমাত্রা থেকে লোহিত সমুদ্র পর্যন্ত গোলমরিচের ব্যবসা গড়ে তুলেছিল। দাশগুপ্ত, অশীন, **আরব সাগর ১৫০০-১৮০০**, (ক'লকাতা, ১৯৯৬)। ৫

১৯. প্রাগুক্ত

২০. "এনক্লোজার অব এ লেটার ফ্রম বেচার, দ্য রেসিডেন্ট এ্যাট দ্য দরবার টু দ্য সিলেক্ট কমিটি, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৭৬৯।

২১. একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭০০ থেকে ১৭২০ সনের মধ্যে বাংলা থেকে যে পরিমাণ মাল কিনেছিল ইংলন্ডে তার দাম হয়েছিল ৩২, ৪২, ৪১৮ পাউন্ড। কত টাকায় কিনেছিল তা জানা না গেলেও মালের দাম, পরিবহন খরচ প্রভৃতি বাদ দিয়ে যে টাকায় বিক্রি হয়েছিল তাতে কোম্পানির কর্তা ব্যক্তিরা উল্লসিত হয়েছিলেন। **অ্যাকাউন্ট জেনারেল ডিপার্টমেন্ট**, রেঞ্জ ১১, ভল্যু., ৫২, ৫৫, ৫৮।

২২. ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলা থেকে ১৬৬৪ সনে কাঁচা সিল্ক কিনেছে মণ প্রতি ১৫৫ টাকা দিয়ে। ৫৬ বছর পর ১৭২০ সালেও কিনেছে একই দাম (১৫৫ টাকা) দিয়ে। তাঁত বস্ত্র কিনেছে ১৯৬০ প. মণ প্রতি। ৫৬ বছর পর ১৭২০ সনে কিনেছে ১৪.১০ প. দিয়ে। **অ্যাকাউন্ট জেনারেল ডিপার্টমেন্ট**, প্রাগুক্ত। একটা কথা মনে রাখতে হবে অবিশ্বাস্য কম দামে জিনিষ কেনার মনোভাবের মধ্যেই অত্যাচারের জন্ম।

২৩. অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে এই প্রশ্নই তুলেছিলেন।

২৪. দঃ পূঃ এশিয়ার সুমাত্রা থেকে গোল মরিচের বিপুল লাভের বাণিজ্য গুজরাটি বণিকদের কুক্ষিগত ছিল।

২৫. আকবর থেকে শুরু করে শাহজাহান পর্যন্ত সকল সম্রাট এবং অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। লেখকের গ্রন্থ **দ্য রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অব ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া** কোম্পানি দ্রষ্টব্য।

২৬. স্ট্রেনসাম মাস্টার, প্রাগুক্ত ভলু., ১, ২৬, ৩২১, ৩৯৯।

২৭. বছরে এক কোটি টাকারও বেশী।

২৮. ১৭০০ সালে ১,১৭,২৮,৫৪১ টাকা খাজনা আদায় হয়েছিল। ১৭২১ সালে তা বেড়ে ১,৪১,০৯,১৯৪ টাকা। গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল, **রেভিনিউ প্রসিডিংস**, ভল্যু। ১২৬, অ্যাপেনডিক্স, ৫।

২৯. ১৬৩২ খ্রীঃ মুর্শিদাবাদে ১ টাকায় ৪/৫ মণ চাল পাওয়া যেত। মুর্শিদকুলির আমলেও দর একই ছিল। হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ভল্যু. ২ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯৪৮ ৪১৭। এর একটাই অর্থ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা তলানিতে এসে ঠেকেছিল।

৩০. স্যাব জন সোর-এর মিনিট থেকে দেখা যাচ্ছে মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর ৬,০৯৩,২২৭ টাকা পাওয়া গেছে তাঁর জমানো থেকে। **লেটার কপি বুক্‌স্ অব্ দ্য রেসিডেন্ট এ্যাট দ্য দরবার এ্যাট মুর্শিদাবাদ**, ভল্যু., ১XXIV মুর্শিদকুলি বড় বড় জমিদারদের উপর নতুন খাজনা আবওয়ার চাপিয়েছিলেন। বছরে প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

৩১. লিড্যাব, জে. ভ্যান, **ইন্দোএশিয়ান ট্রেড এ্যান্ড সোসাইটি**, দ্য হেগ, ১৯৫৫; স্টিনস্‌গার্দ, এন., **ক্যারাক্‌স্, ক্যারাভ্যান এ্যান্ড কোম্পানিজ** ...., কোপেন হেগেন, ১৯৭২; পুনর্মুদ্রিত, (চিকাগো, ১৯৭৪)।

উনিশ শতকে বাংলার কেরাণী ও তার জগৎ

অনামিকা নন্দী

নবযুগের শহর কলকাতায় যে সব নতুন গোষ্ঠীর উত্থান ঘটেছিল তার মধ্যে অন্যতম হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ঐতিহাসিক পোলার্ড (A.F.Pollard) বলেছেন, মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের সন্ধিক্ষণে যে নবজাগরণ বা রেনেসাস ইউরোপে হয়েছিল তা সম্ভবই হত না, যদি না সমাজের রঙ্গমঞ্চে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হত। কিন্তু ইউরোপের বিশেষ করে ইংলন্ডের মধ্যবিত্তের সঙ্গে বাঙালী মধ্যবিত্তের তুলনা করা চলে না, তার কারণ ইংলন্ডে একটি স্বাধীন মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্ম হয়েছিল বাণিজ্যিক ও শিল্প বিপ্লবের ফলে এ বং তারা আঠারো উনিশ শতকের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সমাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বাঙালী মধ্যবিত্তের জন্ম হয়েছিল ঔপনিবেশিক যুগে মূলত: বিদেশী শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র হিসেবে। তাদের অস্তিত্ব ঔপনিবেশিক শাসনের উপর নির্ভরশীল ছিল বলে তারা প্রথমদিকে ইংলন্ডের মধ্যবিত্তের মতন দেশীয় সমাজকে স্বাধীন নেতৃত্ব দিতে পারে নি। এর সঙ্গে একথা অস্বীকার করা চলে না যে নতুন কলকাতা শহরে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলেই বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল।

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যতম অংশ হল কেরাণী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কেরাণীবাবুদের ঠিক একটা বিশিষ্ট চাকুরীজীবী গোষ্ঠী হিসেবে কোনো ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যে পাওয়া যায় না। অথচ সরকারী ও বেসরকারী সদাগরী অফিসের কেরাণীর সংখ্যা উনিশ শতকের গোড়া থেকেই কলকাতা শহরে ক্রমে বাড়তে আরম্ভ করেছিল। কোম্পানির আমলে সাহেব কেরাণীদের যেমন ' writer' বলা হত, এদেশের কেরাণীরাও তেমনি দীর্ঘকাল ঐনামে পরিচিত ছিলেন। কেবল রাইটার কথার আগে 'নেটিভ' কথাটি যোগ করে তাদের বলা হত 'নেটিভ রাইটার'।[১] চাকরির ক্ষেত্রভেদে তখন কেরাণীবাবুদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যবোধ বেশ প্রখর ছিল। এই বোধ এখনো তাদের মধ্যে আছে, কিন্তু তা অবচেতনার স্তরে এবং এর প্রখরতাও তেমন নেই যা একশো দেড়শো বছর আগে ছিল। কোম্পানির কেরাণীরা নিশ্চয়ই নিজেদের পদমর্যাদার দিক থেকে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বলে মনে করতেন। নেটিভ রাইটারদের মধ্যে তারা ছিলেন সর্বোচ্চ স্তরে। তার পরেই ছিলেন কলকাতার বড় বড় সদাগরী অফিসের কেরাণীরা, বিশেষ করে বিদেশী 'হৌসের' কেরাণীরা (Agency Houses)। অনেক সময় দেখা যেত কোম্পানির কেরাণীদের চেয়ে বিদেশী হৌসের কেরাণীদের মর্যাদাবোধ বেশি ছিল।

ককারেল, পামার, ব্যাজেট-কলভিন, টুলো, র‍্যালি ব্রাদার্সের কেরাণীরা অনেক বেশি গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে চলতেন, অন্যান্য কেরাণীদের তো দূরের কথা, কোম্পানির কেরাণীদেরও তারা বিশেষ আমল দিতেন না।

উনিশ শতকের প্রথম অংশ থেকে কলকাতার সকল শ্রেণীর চাকরীজীবীদের মধ্যে বাঙালী কেরাণীদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। ১৮৪০ এর দশকে গ্রিফিন লিখেছেন . 'The native writers are a numerous class and always form the majority in merca tile offices.' বিদেশী সদাগরী অফিসের কেরাণীরা যদি সেদিনের চাকুরে সমাজে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে থাকতেন, তাহলে খুব অন্যায় করেননি। কোম্পাণীর কেরানী কুঠির Writers' Building চেয়ে ককারেল, পামার, টুলো প্রভৃতি সদাগরি অফিসের শুধু ভিতর বাহিরের চেহারাই অনেক বেশি জমকাল ছিল তা নয়, বেতনের পার্থক্যও ছিল লক্ষণীয়। ঘরের আসবাবপত্র ও কর্মচারীদের কাজকর্মের সুযোগ সুবিধাও ছিল যথেষ্ট। এদেশী কেরাণীরা প্রায় আট থেকে বারোজন একটি আলাদা ঘরে বসে কাজ করতেন। অনেকে মেঝের উপর আসন পেতে বসতেন, এবং সামনের একটি বাক্সের উপর খাতা রেখে লিখতেন। কেউ কেউ অবশ্য চেয়ারে বসে ডেস্কেও লিখতেন।

বাঙালী কেরাণীদের বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই লিখতে হত তাদের মাসিক বেতন ছিল চার টাকা থেকে দশ টাকা অন্য একটি ঘরে পাঁচ ছজন ফিরিঙ্গি কেরাণী কাজ করতেন, তাদের বেতন ছিল ষাট টাকা থেকে একশ টাকা। আরো জন বারো বাঙালী কেরাণী ছিলেন যারা একটু বেশি বেতন পেতেন, আট টাকা থেকে বিশ টাকা। বাঙালী কেরাণীরা সাদা কাপড় সুন্দর কাছাকোঁচা দিয়ে পরে, তার উপর একটি ফতুয়ার মতন সাদা বেনিয়ান গায়ে দিয়ে অফিসে আসতেন - ' White muslin, howing and graceful' বলে বর্ণনা পাওয়া যায়।[৮] বাঙালী কেরাণীদের পোষাক রুচিসম্পন্ন হলেও, তারা 'very slow in writing, and they will not be pushed'[৯] বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

একটি বিখ্যাত সদাগরী অফিসের কেরাণীদের এই বিবরণ থেকে আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে মোটামুটি তাদের অবস্থা কি রকম ছিল তা খানিকটা বোঝা যায়। মনে হয়, কেরাণীগিরির চাকরিতে বাঙালীদের অন্তত দুটি স্তর ছিল, আজকালকার 'লোয়ার' ও 'আপার' গ্রেডের মতন।[১০] যারা 'লোয়ার' গ্রেডের কেরাণী ছিলেন তারা বাংলাতেই খাতাপত্র লেখার কাজ করতেন। তাদের বেতন ছিল মাসিক চার টাকা থেকে দশ টাকা। যারা 'আপার' গ্রেডের কেরাণী ছিলেন তাদের বেতন ছিল বেশি, মাসিক আট টাকা থেকে বিশ টাকা এবং তারা বোধ হয় ইংরেজি লেখার কাজ করতেন।

গ্রিফিনের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ফিরিঙ্গি কেরাণীদের মর্যাদা বাঙালীদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং তাদের মর্যাদা মাসিক বেতনেই বিলক্ষণ প্রতিফলিত হত।[১১] প্রায় চার পাঁচগুণ বেশি বেতন পেতেন এরা 'আপার' গ্রেডের বাঙালী কেরাণীদের থেকে। বাঙালীদের সঙ্গে ফিরিঙ্গিদের এত পার্থক্য থাকলে অবিমিশ্র সাহেব কেরাণীদের সঙ্গে তাদের যে কি ভয়ঙ্কর ব্যবধান ছিল তা ভাবা যায় না। কেরানী জগতে ইংরেজরা প্রধান ফিরিঙ্গিরা দ্বিতীয় এবং বাঙালীরা তৃতীয় ছিলেন; অথচ চাকরীর ক্ষেত্রে

বাঙালী কেরানীরা তখন ছিলেন সততা ও নিষ্ঠার প্রতিমূর্তি। বড় বড় সদাগরী হৌস ও নিলাম হৌসে সরকারের ও কেশিয়ারের চাকরি বাঙালীদের জন্য বরাদ্দ থাকত। কোনো ট্যাসফিরিঙ্গি বা ইংরেজও সেই পদে নিযুক্ত হতেন না। সুতরাং বাঙালী কেরাণীদের মর্যাদা ছিল সাহেবদের কাছে এবং বিশ্বাসভাজনও তারা ছিলেন, কিন্তু তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল যে তারা 'ব্ল্যাক নেটিভ' হয়ে জন্মেছিলেন। তাই হতভাগ্য বাঙালী কেরাণীরা গাত্রবর্ণের ট্রপিকাল কৃষ্ণতার জন্য সেদিনের শহরে সমাজে মর্যাদা ও বেতন দুইই কম পেয়েছেন, যোগ্যতার অভাবের জন্য নয়। তবু সেদিনের চার - দশ টাকা ও আট-বিশ টাকার গ্রেডের বাঙালী কেরানীরা সমাজে যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, এবং যেরকম দাপট দেখিয়ে গেছেন, আজকের 'আপার' তো দূরের কথা, কোনো 'সুপার' গ্রেডের কেরানীও তা কল্পনা করতে পারেন না।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' পুস্তকে বিষয়ী ভদ্রলোকের ধারা ব্যাখ্যাকালে সাধারণ মধ্যবিত্তের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তা দেখলে সত্যই অবাক হতে হয়।[১০] খাঁটি সমাজবিজ্ঞানীর মতন তিনি বলেছেন, 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক তাহাদিগের অনেকের ঐ ধারা কেবল আহার ও দানাদি কর্ম্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয় প্রাবল্য বড় কারণ কেহ মুহুরি, কেহ মেট কেহবা বাজার সরকার ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, বিস্তর পথ হাঁটিতে হয়, পরে প্রায় প্রতিদিন রাত্রে গিয়া দেওয়ানজীর নিকট আজ্ঞে যে আজ্ঞে মহাশয় মহাশয় করিতে হয়, না করলেও নয়, পোড়া উদরের জ্বালায়।[১০] মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আর্থিক সংগ্রামের কঠোরতার কথা ভবানীচরণ বারংবার উল্লেখ করেছেন। দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের জন্য, এবং বাইরের সামান্য আবরণটুকু রক্ষা করার জন্য, তাদের যে কতখানি দাসত্বের অপমান সহ্য করতে হয় সেকথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বিস্তর পথ পায়ে হেঁটে এই বাজার সরকার, মুহুরি ও কেরানীদের প্রতিদিন কাজে যেতে হত।[১১] তখন শহরে ট্রাম-বাস ছিল না, সাধারণ লোকের জন্য ছ্যাকরা গাড়ি ও পালকি ছিল। অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্তরা শেয়ারে ছ্যাকরা ভাড়া করে অফিস-আদালতে যাতায়াত করতেন। দরিদ্রদের জন্য ছিল পালকি। কিন্তু পালকি ভাড়া মাইল পিছু এক আনা হলেও 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোকদের' পক্ষে কর্মস্থলে যাতায়াতের জন্য তা ব্যবহার করা সম্ভব হত না। অগত্যা পায়ে হেঁটেই তাদের শহরের মধ্যে বিস্তর পথ চলতে হত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতা শহরে কেরানীকুল বৃদ্ধি পেলেও তারা এ শহরকে তাদের স্থায়ী বাসস্থান হিসেবে ভাবতে পারে নি। এর ফলে একটি পার্থক্যের সৃষ্টি হয় বাসা ও বাড়ির ধারণার মধ্যে - বাসা অর্থাৎ একটি অনির্দিষ্ট বাসস্থান এবং বাড়ি অর্থাৎ একটি স্থায়ী পৈত্রিক বাসস্থান - যা কেরানীদের মানসিক আত্মসংকটের পরিচয় দেয়।[১২]

বিদেশী শাসনব্যবস্থার সংস্পর্শে এসে সেযুগের কেরানীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল বিদেশী ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী সময়মত অফিসে পৌঁছাতে কিছুমাত্র দেরী হলে সেদিনের বেতন থেকেই শুধু তাদের বঞ্চিত করা হত না, উপরন্তু উচ্চপদস্থ সাহেব

অফিসারের ভর্ৎসনাও সহ্য করতে হত, যার মধ্যে বর্ণবৈষম্যের স্পষ্ট ইতি পাওয়া যায়।[১৩] কাজের শেষেও কেরানীদের নিস্তার নেই। প্রতিদিন রাত্রে গিয়ে মালিকের কাছে 'আজ্ঞে যে আজ্ঞে মশায় মশায়' ইত্যাদি চাটুকারিতা করতে হত।

বর্হিজগতের শোষণের ফলস্বরূপ যে অস্তিত্বের সংকট, তার চাপকে হ্রাস করার জন্য পারিবারিক কাঠামোয় মধ্যবিত্ত কেরাণী চরম পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বময় রূপ ধারণ করেন। এর মধ্যে একটি দ্বিচারিতা লক্ষণীয়। একদিকে যেমন গৃহের মেয়েদের অন্দরে আবদ্ধ করে রাখার প্রবণতা অন্যদিকে তেমন দেশমাতৃকাকে দেবীরূপে কল্পনা করার ক্ষেত্রে অন্য জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে কেরানীদের কোন বিভেদ ছিল না। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন, এই সময় অনেক কেরানী আধ্যাত্মিকতা ও গুরুবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন।[১৪] এর প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে যারা অনেকেই পেশাগতভাবে কেরানী ছিলেন। বোধহয় অস্তিত্বের শূন্যতার সমাধান খুঁজতেই তাদের এই প্রবণতা।

অবশেষে একথা বলা যেতে পারে নতুন শহরে নতুন মধ্যবিত্তের এই বিচিত্র স্তরটিকে সাধারণত ঐতিহাসিকরা উপেক্ষা করে থাকেন। কিন্তু এই সাধারণ মানুষগুলিই ছিলেন উনিশ শতকের কথিত 'নবজাগরণের' সুবিস্তৃত ভিত্তিভূমি। অথচ তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে কোনো রোমাঞ্চ নেই, বিস্ময়কর ও আজগুবি উত্থানপতনও নেই। কেরানী থেকে কেউ বিরাট জমিদারী তদারক করতে আরম্ভ করেনি, কেউ লক্ষপতি হবার সুযোগও পাননি, তখনকার সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তিও তাদের বিশেষ কিছু ছিল না, কারণ সামাজিক মর্যাদার দুটি নতুন মানদন্ড, বিত্ত ও বিদ্যা, কোনোটাই তারা সুযোগের অভাবে ভাল করে আয়ত্ত্ব করতে পারেন নি। 'যে আজ্ঞে' বা 'মশাই, মশাই' হয়ত তারা এদেশী দেওয়ানজীদের কাছে করেছেন, সাহেবদের কাছে করতেও কুণ্ঠিত হন নি। দাসত্বের এই গ্লানি, ভদ্রতা ও জীবনধারণের জন্য তাদের সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তাদের দাসত্বের ভাবভঙ্গিমাব মধ্যে দারিদ্রের গ্লানিই প্রকাশ পেত বেশি. ধনিকের মতন অযথা কেনাগোলামের কলঙ্ক প্রকাশ পেত না। দাসত্বের মনোভাব ছিল না বলেই বোধ হয় উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কেরানীদের সক্রিয় যোগদান লক্ষ্য করা যায় এবং সম্ভবত একই কারণে পরবর্তী কালে শিল্পসংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বাঙালী কেরানীদের।

বেঙ্গল প্যাক্ট ১৯২৩ : হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার তৎকালীন সমাধান সূত্র

নির্মাল্যশঙ্কর চক্রবর্তী

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে স্বরাজ্য দল অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ঐ বৎসরই স্বরাজ্য দলের অন্যতম নেতা হিসাবে চিত্তরঞ্জন দাস বাংলার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য বেঙ্গল প্যাক্ট নামক রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই নানা কারণে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি লক্ষ্য করা যায়।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়িতে স্বরাজ্য দলের হিন্দু মুসলমান সদস্যদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা হয়। সেই সভায় মৌলভী আবদুল করিম অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি খসড়া চুক্তি জমা দেন ও সেটি ঐ সভায় গৃহীত হয়। এই খসড়া চুক্তিটিই বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর ও ১৮ই ডিসেম্বর যথাক্রমে স্বরাজ্য কাউন্সিলারদের আলোচনাসভা ও বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বেঙ্গল প্যাক্ট আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়।

বেঙ্গল প্যাক্টের শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপ

১। বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্বাচন লোক সংখ্যা অনুসারে এবং স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি অনুসারে হবে।

২। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আসন সংখ্যা হবে শতকরা ৬০টি এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আসনসংখ্যা হবে শতকরা ৪০টি।

৩। সরকারী দপ্তরে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫টি চাকরি সংরক্ষিত থাকবে।

৪। হিন্দু ওর মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বজায় রেখে চলতে হবে।

বেঙ্গল প্যাক্ট প্রকাশিত হওয়ার পরই প্যাক্টকে ঘিরে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মুসলমানরা সমর্থন করলেও বহু হিন্দু নেতা যেমন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখরা নানা কারণ দেখিয়ে এই

প্যাক্টের সমালোচনা করেন বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের ভিতরেও বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পর্কে বিতর্ক ও সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দেই বেঙ্গল প্যাক্ট জাতীয় কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করতে পারে নি। এরপর ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষনগর প্রাদেশিক সম্মেলনে ভোটাভুটির পর বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল হয়ে যায়।

অধ্যাপক মশিরুল হাসানের মতে বেঙ্গল প্যাক্টের ভিত্তি ছিল দুর্বল। কারণ, চিত্তরঞ্জন যে মূল্যে মুসলমানদের সঙ্গে আঁতাত ক্রয় করেছিলেন, তা হিন্দু সমাজ দিতে রাজী ছিল না। অধ্যাপক রজত রায়ের মতে "It is only fair to point out that Das was handling an extremely difficult political situation,full of pitfalls in whatevers direction he turned. চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর স্বরাজ্য দল কর্তৃক প্যাক্ট পরিত্যক্ত হওয়ায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। মৌলভী আবদুল গফুর তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'Since the Bengal pact things have rapidly changed and the relations between Hindus and Muhammedans have become much too strained' ইমাদউল হকের মত নেতার কাছে "the pact is nothing but bluff" ফজলুল হক প্যাক্টের ব্যর্থতার ফলে এই অধিবেশনে জোরালো ভাষায় মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভোটাধিকার দাবী করেন।

বেঙ্গল প্যাক্টের ব্যর্থতার পর কলকাতার মুসলমান রাজনীতিকরা নানা সাম্প্রদায়িক সংগঠনের দিকে ঝুঁকতে থাকে ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে আবদুল রহিম বেঙ্গলী মুসলিম পার্টি নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন এই বছরই মে মাসে ফজলুল হক, মৌলবী নাজিম আলির মত ২৫ জন শীর্ষস্থানীয় নেতারা ইউনাইটেড মুসলিম কাউন্সিল পার্টি গঠন করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি ইস্তেহার প্রকাশ করেন ১৯২৬এ কলকাতার দাঙ্গার কারণ হিসাবে গোপন সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে - "A contributory cause, which is by no means to be ignored, was the Bengal Hindu Moslem pact, which was arranged by the late Mr. C.R. Das in December, 1923." এই সময়েব রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রজত রায় যথার্থই বলেছেন "The Hindu-Muslim pact was now dead," এবং ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকরণের প্রতিক্রিয়া দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল ৩৮ জন নির্বাচিত মুসলিম সদস্যের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন স্বরাজপন্থী।

বঙ্গীয় আইন সভায় "বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন (সংশোধনী) বিল ১৯৩৭ ও আইন ১৯৩৮"

জাহানারা বেগম

ভূমিভিত্তিক অর্থনীতি ভারতের আর্থনীতি ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ভূমির সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আবর্তিত হয় কৃষকের জীবন, সমাজ ও প্রাণ। ইংরেজরা ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিকে কুক্ষিগত করার জন্য ভূমি ব্যবস্থার দিকে নজর দেয়। বৃটিশ শাসনে ভারতের ভূমি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক হল - চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রায়তওকারী ব্যবস্থা, মহলওয়ারী ব্যবস্থা। তখনকার দিনের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই বন্দোবস্ত হয় জমিদারদের সঙ্গে। জমিদাররা সরকারকে নির্দিষ্ট রাজস্বদানের বিনিময়ে জমির ভোগদখলের মালিক হন। তাঁরা রায়ত বা প্রজাদের ভূমি কর্ষণের দায়িত্ব দেন প্রজাদের উপর জমিদাররা খাজনা ধার্য করেন ইচ্ছামত। আসলে জমিদাররা নানাভাবে 'পত্তনি' দিতে থাকেন - পত্তন, উপপত্তনি, তস্য পত্তনি, তস্য তস্য পত্তনি ইত্যাদি শুরু হয়। মুঘল যুগ থেকে বিচ্যুতি লক্ষণীয়। ঐযুগে ভূমিতে রায়তদের অধিকার প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব বলেছেন যে 'আইন - ই - আকবরীতে peasant holding বা প্রজাদের ইজারার অস্তিত্বের উল্লেখ আছে দীর্ঘদিন ধরে রায়তরা ভূমির উপর যে অধিকার ভোগ করছিল দেখা যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় কার্ল মার্কস বলেন - "The permanent settlement was nothing sort of the confiscation of the ryotlands in favour of the zemindars. By a stroke of per Bengal's zemindars who had been collectors of revenue were turned into hereditary owners". চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজাপীড়নের ঘটনা পরবর্তীকালের অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতিতে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই ব্যবস্থায় প্রজারা নিদারুণভাবে শোষিত হতে থাকে। অন্যদিকে আবার সরকারের আয়ের মূল উৎস যে ভূমি রাজস্ব তা ১৫০ বৎসর একই অবস্থায় থাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি দূর করার জন্য ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে Rent act পাশ। এই আইনে বলা হয় যে 'রেন্ট' বা খাজনা হবে সুক্ষণ ও যুক্তিগ্রাহ্য। দখলী জমির পরিধি বাড়লে ও উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বাড়লে তবেই খাজনা বাড়বে। রায়তকে আদালতের মাধ্যমে উৎখাত করতে হবে। Rent act - এর নানা সীমাবদ্ধতা ছিল। সেগুলি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন" পাশ হয়। এই আইনের মূল বক্তব্য ছিল যে রায়ত যদি একনাগাড়ে ১২ বৎসর

নিজে বা উত্তরাধিকার সূত্রে জমি দখল করে তাহলে সেখানে তার স্বত্ব বর্তাবে। এই আইন রায়তদের আশা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে পারেনি বলে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদে সংশোধনী বিল আসে। ঐ বিল সিলেক্ট কমিটিতে যায় এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আইনে পরিণত হয়। সেহেতু আইন পরিষদে জমিদারদের সদস্যসংখ্যা বেশী ছিল সেহেতু ঐ আইনে জমিদারদের অগ্রাধিকার প্রকাশ পায়। এরপর ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের "ভারত সরকার আইন" অনুসারে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১১টি প্রদেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের প্রস্তাব অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - যার মধ্যে বাংলা ছিল অন্যতম এখানে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থা অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভা এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদ নীতি গৃহীত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, কৃষক প্রজাপার্টি ইত্যাদি কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। বলাবাহুল্য নির্বাচন হয় সীমাবদ্ধ ভোটদানের ভিত্তিতে, শতকরা প্রায় ১৪ভাগের বেশী ভোটদাতা ছিলেন না। যাহোক কৃষক প্রজাপার্টির নেতা আবুল কালোম ফজলুল হক কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিতভাবে মন্ত্রীসভা গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। শেষপর্যন্ত তিনি মুসলীম লীগের সঙ্গে জোট গঠনে মন্ত্রীসভা করতে বাধ্য হন। লীগ প্রজা মন্ত্রীসভা যুগ্ম ভাবে যে সমস্ত নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করে তার দ্বিতীয় দফাতেই ছিল "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন' । নতুন মন্ত্রীসভা ক্ষমতা গ্রহণের পরই আইন সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (সংশোধনী) বিল ১৯৩৭ পেশ করে। এই প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্যে ও কারণ সম্বন্ধে বলা হয় যে পূর্বের আইনে প্রজাদের উপর কঠোরতা প্রকাশ পেয়েছে। তাই বর্তমান বিলে আমূল সংস্কারের প্রস্তাব না এনে বরং কতকগুলি সংশোধনী প্রয়োজন এবং সেগুলি প্রজাদের স্বার্থে জরুরী। এই বিলের উপর ১৭৬৭ টি সংশোধনী প্রস্তাব আসে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয় ৭৫ টি সংক্ষিপ্ত নোটিশ দুদিনের মধ্যে সভার কর্ম বিভাগকে তৎপরতার সঙ্গে সমস্ত সংশোধনী "agenda" হিসাবে প্রস্তুত করতে হয়। আইনসভার মোট সাড়ে এগার দিন ধরে বিলটি আলোচিত হয়। বিলটির প্রধান সর্তগুলি ছিল নিম্নরূপ :-

(ক) জমিদারদের হস্তান্তর ফি ও অগ্রাধিকার বিলুপ্তি

(খ) জমিদারদের খাজনা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট ব্যবস্থা বাতিল,

(গ) বকেয়া খাজনার সুদ ১২ ১/২% থেকে ৬ ১/৪% কমানো

(ঘ) স্বত্বাধিকারী রায়ত ছাড়াও উপ-রায়তদের 'হস্তান্তর ফি'র অধিকার,

ঙ) জমিদারদেব বকেয়া খাজনার পুরা নয়, আংশিকের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ইত্যাদি।

বিলটি আইনসভায় উপস্থাপনের সময় রাজস্বমন্ত্রী বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দেন - " এটি কেবল মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ও তাঁর দলের ভোটারদের কাছে প্রতিশ্রুতি নয় ; কংগ্রেস, অকংগ্রেস হিন্দু - মুসলমান তপশিলী শ্রেণী এমনকি বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গসহ সকলে বাংলার জনগণেব দুর্দশা মোচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন"। যখন কংগ্রেস পার্লামেন্টারীদলের ডেপুটি লীডার তুলসী গোস্বামী

বিলটিকে "a dishonest measure", "a great deceit" বলেন তখনও রাজস্বমন্ত্রী তার পূর্বের কথার পুনরুক্তি করেন। আইনসভার ইউরোপীয় গোষ্ঠীর নেতা জর্জ ক্যামপবেল বিলটি বিতরণের আবেদন জানিয়ে বলেন - ''অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তা সদস্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে''। তিনি আরও বলেন যে এর দ্বারা চাষীরা কতটা উপকৃত হবে জানা নেই তবে জমিদারদের ক্ষমতা বাড়বে। এই মন্তব্যের পর তিনি বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাতে বলেন। অন্য এক ইউরোপীয় সদস্য ডব্লু . সি . ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেন যে বিলটির মধ্যে "class prejudice" রয়েছে এবং জমিদার প্রজা মধ্যস্বত্বভোগী ও সরকারের মধ্যে কোথায় ''সামাজিক ন্যায়'' রয়েছে তা খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা নেই। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর চিপ্পেনভেল বলেন যে এর মধ্যে তাঁদের গোষ্ঠীর স্বার্থ নেই ঠিকই, কিন্তু তাড়াতাড়ি করে বিলটি পাশ করিয়ে নিলে ফল ভাল হবে না, তাই বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো উচিত। আইন সভার আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে প্রথম থেকেই ইউরোপীয়রা বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক প্রজাস্বত্ব আইন পাশের ব্যাপারটি প্রজাস্বার্থেই দ্রুত পাশ করাতে চান এবং তিনি একথাও বলেন যে তা না হলে তিনি পদত্যাগ করবেন অবশেষে ইউরোপীয় গোষ্ঠী তাদের বাধা তুলে নেন এবং নিরপেক্ষ থাকেন।

জমিদারশ্রেণীর প্রতিভূ শিবশেমরেশ্বর রায়ের আইনসভায় বক্তব্যে জমিদারদের মানসিকতা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন - ''আমরা মনে করি যে এই বিলের ধারাগুলি দ্বারা জমিদারদের উপর বিরাট অবিচারকে চিরন্তন করার ব্যবস্থা হচ্ছে''। উচ্চকক্ষে অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদে জমিদার শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা বেশী থাকায় একই ধরনের মানসিকতার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম দিকে কংগ্রেস সিলেক্ট কমিটির কথা বললেও তাদের নেতা ও একই সঙ্গে বিরোধী দলের নেতা শরৎচন্দ্র বসু শেষ পর্যন্ত সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব তুলে নেন এবং এর পশ্চাতে দুটি কারণ দর্শান - প্রথমত: ৩৪ জন সদস্যের সিলেক্ট কমিটিকে তাঁর দল সমর্থন করে না। দ্বিতীয়ত: প্রজা পার্টির একটি গোষ্ঠীর কোন সদস্য প্রস্তাবিত সিলেক্ট কমিটিতে স্থান পাননি।

বহু আলোচনা ও সমালোচনার পর বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন (সংশোধনী) বিল ১৯৩৭ শেষপর্যন্ত আইনসভা পাশ করে ঐ বৎসর ৩০শে সেপ্টেম্বর। পরবৎসর কয়েকটি সংশোধনী দিয়ে উচ্চকক্ষ ১লা এপ্রিল বিলটিকে পাশ করায়। সেটিকে সংশোধনীসহ আইনসভা ৭ই এপ্রিল পুনরায় পাশ করে এবং অনুমোদনের জন্য গভর্নরের কাছে পাঠায়। গভর্নর তাঁর অনুমোদন দিতে বেশ দেরী করেন। আইনসভার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩১শে মে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গভর্নরের অনুমোদন আদায় করতে পারেননি বলে মন্ত্রীসভা সমালোচিত হন। ইন্ডিপেনডেন্ট প্রজা পার্টির সম্পাদক ড: সনোডিল্লা বলেন যে একমাস দেরীর অর্থ জঘন্য সালামী হিসাবেই কেবল গড়ে প্রায় তিনলক্ষ টাকা লোকসান। তিনি বাংলার কৃষকদের কাছে আবেদন রাখেন যে তারা যেন জনসভা করে প্রস্তাব পাশ করিয়ে মন্ত্রীসভার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য পদচ্যুতির দাবী তোলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯

শে জুলাই গভর্নর ভারত আইনের (১৯৩৫) ৭৫ নং ধারা অনুযায়ী দুটি সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে বিলটি আইনসভার ফেরৎ পাঠান এবং আইন সভাকে আর কোন সংশোধনী করতে নিষেধ করেন। শেষ পর্যন্ত গভর্নরের সুপারিশ অনুযায়ী ৩রা আগষ্ট, ১৯৩৮ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভা ও ১২ই আগষ্ট, ১৯৩৮ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদ বিলটি শেষবারের জন্য পাশ করে। ১৮ই আগষ্ট বিলটি কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় এবং ঐদিন থেকেই কার্যকরী হয়।"

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন ১৯৩৮ দ্বারা নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি সাধিত হয় :-

(১) জমিদারদের হস্তান্তর ফি ও অগ্রাধিকারের বিলুপ্তি ও রায়তদের অগ্রাধিকার দান;

(২) খাজনা বাড়ানোর শর্তগুলি ১৯৩৭ এর ২৭শে আগষ্ট থেকে ১০ বৎসরের জন্য বন্ধ থাকবে;

(৩) পলি জমিগুলিতে রায়তদের অধিকার থাকবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জমিদার চার বৎসরের বেশী খাজনা পাবেন ;

(৪) ভোগ দখলকারীরা তাদের দখলীস্বত্ব সমর্পণ করতে পারবে ;

(৫) জমিদারদের "সার্টিফিকেট প্রসিডিওর" বন্ধ হবে ;

(৬) উপরায়তদের অধিকারী রায়তের মত স্বত্ব বর্তাবে ;

(৭) উপরায়তরা অনির্দিষ্টকালের জন্য লীজ পাবে ;

(৮) জমি বন্ধকীর মেয়াদ ১৫ বৎসর পর শেষ হয়ে যাবে ;

(৯) সুদ কমবে শতকরা ১২ ১/২ ভাগ থেকে শতকরা ৬ ১/৪ ভাগে ;

(১০) জমিদার বা তার দালালরা "আবওয়াব" বা অতিরিক্ত কর ধার্য করলে "ফাইন" হবে ;

(১১) সম্পূর্ণ খাজনা নয়, তার একটা অংশের জন্য জমিদার মামলা করতে পারবেন, তবে ৯ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় মামলা করতে পারবেন না ;

(১২) ইজারাকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কার্যকরী করতে হবে,

(১৩) প্রজাকে রেজেষ্ট্রি ডাকে "এ ডি" সহ সমান দিতে হবে ডিক্রীর ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে "রেন্ট ডিক্রী" কার্যকরী হবে না ;

(১৪) ডিক্রীর পর সুদ দেওয়া হবে না।

আলোচিত আইনটি ফজলুল হক মন্ত্রীসভার গৌরব বাড়ায়। ফজলুল হকের জনকল্যাণমুখী কর্মসূচীতে রূপায়ণে এটি একটি বিরাট পদক্ষেপ। সাম্রাজ্যবাদী শাসন পরিকাঠামোর মধ্যে তাঁকে কার্যপরিচালনা করতে হয়। ত াই বাংলার সাংবিধানিক প্রধান গর্ভনর সাংবিধানের (১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত সরকার আইন) সুযোগ নিয়ে বিলে অনুমোদন দিতে ইচ্ছামত দেরী করেন। অনেক বাধা সত্বেও কিন্তু ফজলুল হক অনেকগুলি জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী যেমন প্রজাস্বত্ব আইন, ঋণদান আইন, ঋণসালিশী বোর্ড গঠন ইত্যাদি কাজ করেন। কিন্তু স্বার্থগোষ্ঠী প্রজাস্বত্ব আইনের সমালোচনা করলেও, ফজলুল

হক ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হন। সারা ভারত কিষান সভা সমালোচনার দৃষ্টিতে বলে যে প্রজাস্বত্ব আইন প্রজাদের দরিদ্রতম অংশ এবং ভাগচাষী বা বর্গাদার যাদের সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য প্রয়োজন তাদের স্বার্থ স্পর্শ করেনি। তবে কিষাণ সভা একথাও বলে যে হক মন্ত্রিসভা প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করে কিছু প্রজার কিছু মঙ্গল করেছেন।

ফজলুল হকের প্রজা পার্টির অনেক সদস্য এসেছিলেন গ্রাম বাংলা থেকে। সেখানকার রায়তদের দুর্দশার কথা তাঁরা বুঝেছিলেন। তাঁরা অনেকেই প্রজা স্বার্থে প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনের পক্ষে ছিলেন। কংগ্রেস সদস্যবর্গ সাধারনভাবে অনেকেই প্রজা স্বার্থের বিরোধী না হলেও কংগ্রেসকে বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠী নিয়ে কাজ করতে হত। তাদের মধ্যে ছিলেন জমিদার শিক্ষিত উচ্চবিত্তশ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইত্যাদি। ফলে কংগ্রেসের পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয়নি। শিবশেষরেশ্বরের মত জমিদার শ্রেণীর স্বার্থগোষ্ঠী এই আইনের বিরোধিতা করবেন স্বাভাবিক। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর জমিতে স্বার্থ না থাকায় তারা সরকার পক্ষের বিরোধিতা করেন নি।

বর্তমান প্রবন্ধকারের এই বিষয়ে ঔৎসুক্য থাকায় তদানীন্তন কালের আইনসভার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছিন। তাঁদের প্রতীকী কয়েকজনের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস সদস্য নগেন দাশগুপ্ত বলেন - "The congress could not match with Fazlul Huq's party regarding this urgent matter of tenaney problem where immediate reforms were needed" তদানীন্তন আইনসভায় সম্ভবত : paint of order উত্থাপনে এক নম্বর একান্ত সক্রিয় ও সজাগ কংগ্রেস সদস্য নলিনাক্ষ সান্যাল আলোচিত আইন প্রসঙ্গে বলেন - "It was trump card of Fazlul Huq". অন্য এক কংগ্রেস সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্যাল মন্তব্য করেন যে ঐ আইন দ্বারা প্রজারা নতুন জীবন পায়। ''ঐ সময়কার কালো মেঘের মধ্যে তারা রূপালী রেখা দেখতে পায়।' অসাময়িক কৃষক প্রজা নেতা আবুল মনসুর আবেদও বলেছেন যে আইনটি কৃষকদের চরম ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিল। বিরোধী সদস্যদের নানা মন্তব্য ও জনগণের স্বত:স্ফূর্ত উৎসাহ থেকে বোঝা যায় হক মন্ত্রীসভার প্রজাস্বত্ব আইন প্রজাদের পক্ষে মঙ্গলজনকই ছিল। পরবর্তীকালের ভূমি সংস্কারের ভিত্তি হিসাবে ঐ আইনের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

পার্বতীবাই ভোর

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

১৯২৯ - ৩০'র বিশ্ব ব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষের অর্থনীতিতেও সমস্যার সৃষ্টি করল। পরাধীন ভারতবর্ষে শাসক ইংরেজরা এদেশের কলকারখানা থেকে বেশী মুনাফা আদায় করতে শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিল শ্রমিকদের উপর। মজুরী কাটা, কাজের সময় বাড়িয়ে দিয়ে বেশী উৎপাদনের চেষ্টা এবং সেই সঙ্গে শ্রমিক ছাঁটাই - সবই শুরু হয়ে গেল।

ভারতের কলকারখানাগুলোতে মোট শ্রমিক সংখ্যার তুলনায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। নারী শ্রমিকদের মজুরীও ছিল পুরুষদের তুলনায় কম। ভারতবর্ষে তখন সবে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। কোথায়ও কোথায়ও শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নও গড়ে উঠেছে। তবে মেয়েরা সংগঠনের মধ্যে বড় একটা থাকতেন না, হয়ত তাদের ডাকাও হতো না। মেয়েদের সুযোগ সুবিধা, অধিকার এসব ভাবনাও তখন শ্রমিক সংগঠনগুলির ছিল বলে মনে হয়না। তবে কারখানার প্রত্যেক সংগ্রামে বা ট্রেড ইউনিয়ন যখন কোন আন্দোলনের ডাক দিয়েছে তখন নারী শ্রমিকদের তার মধ্যে আনতে চেষ্টা করেছে।

আমাদের দেশের শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে চোখে পড়েছে যে মেয়েরা প্রথম সারিতে থেকে (নেতৃত্বে নয়) সাহসের সঙ্গে লড়েছেন। 'ইউরোপের নানান দেশে যেমন ট্রেড ইউনিয়নের পাশে পাশে সহায়িকা নারী শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল এদেশে সেরকম কিছু হয়নি। ঐ সব দেশে সহায়িকা সংগঠনগুলি নারী শ্রমিক ও শ্রমিক পত্নীদের সদা সর্বদা কাজের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করে, যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজেরাই ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পারেন।"

তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে মেয়েরা পেছনে পড়ে ছিলেন না। বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে সন্তোষকুমারী দেবী, প্রভাবতী দাশগুপ্তা, সাকিনা বেগম, সুধা রায়, মৈত্রেয়ী বসু, দুখমত দিদির মত নেত্রীদের আমরা পেয়েছি প্রাক স্বাধীনতা পর্বে এবং স্বাধীনতা উত্তর যুগেও। চটকলে, বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে, কলকাতা কর্পোরেশনে ধাঙর মেথরদের মধ্যে এরা কাজ করেছেন, আন্দোলনে সামিল হতে সাহায্য করেছেন, দাবী আদায়ের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অবশ্য এরা প্রায় কেউই আলাদা ভাবে নারী শ্রমিকদের জন্য কিন্তু চিন্তা ভাবনা করেছেন বা নারী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সামিল করেছেন এমন কিছু জানা যায়নি। অবশ্য দুখমত দিদি এর ব্যতিক্রম। তিনি আলমবাজার

চটকলে নারী শ্রমিকদের সংগঠিত করেছেন, সাহস জুগিয়েছেন, লড়াইয়েও সামিল করেছেন।

মুম্বাইয়ের চিত্র অনেকটাই অন্যরকম। ইউরোপের কোন কোন দেশের মত সেখানেও নারী শ্রমিকদের নিয়ে সংগঠন গড়ার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। শ্রমিকনেতাদের স্ত্রী, যারা শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বে এসেছেন তারা পুরুষ নেতাদের কাছে অনেক সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছেন এবং প্রয়োজনে নিজেরাই (পুরুষ নির্দেশিত পথে নয়) আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। মুম্বাইয়ের বস্ত্র কলগুলির মেয়েরাও ছিল দুঃসাহসী। উষাভাই ডাঙ্গে, মীনাক্ষী সানে, মনিবেশ কারা, পার্বতী বাই ভোর শ্রমিকদেব সাথে মিশে গিয়েই তাদের সংগঠিত করেছেন, আন্দোলনে মেয়ে পুরুষকে সামিল করেছেন।

কাপড়ের কলগুলিতে কাজের সময় ছিল দশ ঘন্টা। শ্রমিকদের জন্য কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিলনা, মেয়েদের কাজের জায়গা অস্বাস্থ্যকর, শৌচাগার নেই. বাচ্চাদের রাখারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। বস্ত্র শিল্পে মেয়েদের নিয়ে অন্যান্যদের মত কাজ করতে এলেন পার্বতীবাই ভোর। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি নেতৃত্বে উঠলেন। তিনি মুম্বাইয়ের সুতাকল শ্রমিকদের সব থেকে বড় সংগঠন গিড়নি, কামগার ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদিকাও নির্বাচিত হয়েছিলেন। পার্বতী বাইয়ের ওপর যাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী ছিল তারা হলেন এস.এ. ডাঙ্গে, উষা ভাই ডাঙ্গে, পাটকর তাম্বিদকার, বেন ব্রাডলি প্রমুখরা।

পার্বতী বাই ভোরের একটি আত্মজীবনী আছে। এস.এ.ডাঙ্গের ৭৫ বছর পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে মুম্বাইয়ের শিবাজী পার্কে যে সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করা হয় সেই সভায় এদের সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন পার্বতী বাই ভোর। তিনি বলছেন এরা কত বড় বড় নেতা, আমি কি এদের মত সম্মানের যোগ্য। কিন্তু এখানে নানান কথা শুনতে শুনতে আমার মনে পরছিল সেই পুরোনো দিনের কথা। বার বার মনে হচ্ছিল পাটকারের কথা যিনি আমায় এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এদের মধ্যে একটা আগুন ছিল, যা আমাদের পথ দেখিয়েছে, সাহস জুগিয়েছে।

আমি কবে জন্মেছি জানিনা। আপ্পাকে (বাবাকে) জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন কে জানে তোমার জন্মদিন, আর জেনেই বা কি হবে? শুনেছি মহা শিবরাত্রির দিন জন্মেছি, তাই আমার নাম পার্বতী।

আমার পরিবার নাপিত পরিবার। বাবা চুল কাটার দোকান করেছিলেন। তার চারটি বিয়ে। ১৯টি ছেলেমেয়ের মধ্যে একমাত্র আমি বেঁচে ছিলাম। ছেলে মেয়ের তফাৎ ছেলেমানুষ বয়স থেকেই আমার ভাল লাগতো না। আমি স্বাধীন ভাবেই ঘুরে বেড়াতাম। বাবা তার ভাইয়ের এক ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। আমার এই দাদা আমাকে রাজনীতিতে আসতে কিছুটা সাহায্য করেছেন।

বোম্বাইতে যে ব্যারাকে আমরা থাকতাম তার পাশের ঘরেই থাকতেন বাবাসাহেব আম্বেদকর। আমি স্কুলে পড়তে চাইলে মা বলেন শুধু ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়েরাই স্কুলে পড়ে, আমরা ছোট জাত আমরা স্কুলে পড়তে পারবো না, কিন্তু বাবার জেদে আমি স্কুলে ভর্তি

হই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন প্রায় শেষ হতে চলেছে তখন ৯ বছর বয়সে আমার বিয়ে হয় আমাদের দোকানেরই এক কর্মচারী শঙ্করের সঙ্গে। তখন রাশিয়ায় বিপ্লব হয়ে গেছে।... মোরারজী ভাই যখন বম্বের মুখ্যমন্ত্রী তখন আমি জেলখানা দেখেছি—আমার শ্বশুর বাড়ী জেলখানার মতই। আমাদের মেয়েদের কোন স্বাধীনতা ছিলনা, আমাদের মুখ বড় ঘোমটা দিয়ে ঢেকে রাখতে হত, মঙ্গলসূত্র, বিন্দি এসব পরতেই হত। ১২ বছর বিবাহিত জীবনের পর আমি এই জেলখানা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলাম। আমার স্বামী আমাকে বাইরে তো বেরোতে দিতেনই না এমনকি বাড়িতেও কেউ এলে কথা বলতে পারতাম না। আমাদের হাতে কোন পয়সা থাকা নাকি পাপ। আমরা বাড়ির সব বউয়েরাই এ'সব মানতাম।

আমার বাবা আমার মাকে মারতেন। সেই মারের দাগ নিয়েই আমার মা মারা গেলেন। আমার স্বামী আমায় মারেননি, তবে এমন সব কথা বলতেন, যা মারের দাগের চেয়েও গভীর।

পাটকর এবং অম্বিদকরের সঙ্গে পার্বতীবাই কাজ শুরু করলেন। ১৯২৮-২৯ সালে, প্রায় ছয় মাস ধরে বোম্বাইয়ের দুই লক্ষেরও বেশী সুতাকল মজুর, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের নেতৃত্বের পরিচালনায় সাধারণ ধর্মঘট চালিয়ে গেল। কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট দরদী শ্রমিক নেতৃত্বই সাহায্য করলেন। লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠল গিড়নি কামগড় ইউনিয়ন। কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা কে.এন যোগলেকর বলছেন "ধর্মঘটের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শ্রমিকরা বুঝতে পারল তাদের শ্রেণী সংগঠনের তাৎপর্য। আর সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই অল্প কয়েকমাসের মধ্যেই তারা গড়ে তুলল শক্তিধর সংগঠন—গিড়নি কামগড় ইউনিয়ন" (কে.এন যোগলেকর, **মীরাট মামলার নথিপত্র**, পৃঃ ১৯৩৬।[৩]

১৯২৮ এর পাঁচই অক্টোবর বোম্বাইয়ে এক বিশাল শ্রমিক সমাবেশ হল। শ্রমিকরা ধর্মঘটের পর মাথা উঁচু করে কাজে যোগ দিল। বারই অক্টোবর শ্রমিকদের মধ্যে একটি ইস্তাহার বিলি করল গিড়নি কামগড় ইউনিয়ন। তাতে লেখা ছিল "সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট মুলতুবী রয়েছে, তার অবসান হয়নি।...ভবিষ্যতের জন্য সমস্ত সুতাকল শ্রমিককে প্রস্তুত থাকতে হবে—গিড়নি কামগড় ইউনিয়নের ১ লক্ষ সদস্য সংগ্রহ করতে হবে" (কার্ণিক, স্ট্রাইকস ইন ইন্ডিয়া, পৃঃ ১৯৯)[৪]।

পার্বতী বাই বোম্বাইয়ে এলেন এই সময়। তিনি দেখলেন এই ধর্মঘটে বহু নারী শ্রমিকও সামিল হয়েছে। উষা ভাইয়ের সঙ্গে পার্বতী বিটিয়া মিলস'র ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করতে যায়। এইভাবে পার্বতী শ্রমিকদেরই একজনে পরিণত হল।

এই সময় শ্রমিকদের রাজনীতির ক্লাশ নিতেন বি.টি. রনদিভে, দেশ পাণ্ডে প্রমুখরা। সম্ভবতঃ সারদেশাইর বোন এবং রনদিভের স্ত্রী বিমল রনদিভে এর কাছাকাছি সময় শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। পার্বতী এদের সঙ্গেই কাজ শুরু করেন। পার্বতী বলছেন "এই ক্লাশ এবং ধর্মঘটের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে কতখানি ছিল তা এগার বছর পরে বিটিয়া মিলসের ধর্মঘটের সময় আমরা বুঝতে পারলাম। সমাজের ধনীরাতো নয়ই

এমনকি শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাও শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশায় বিচলিত হননি। অথচ শ্রমিকদের জীবনে কি ছিল। খেলার তাসের মত তাদের জীবন। মেয়েদের যে কোন সময় ছাঁটাই করে দিচ্ছে। কোন নিরাপত্তা শ্রমিকদের জীবনে ছিলনা।"

দেশের রাজনীতিতেও দ্রুত পরিবর্তন আসছে। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা তৈরী হয়েছে। নতুন মন্ত্রীসভা এক আইন পাশ করে শ্রমিকদের ধর্মঘট বেআইনী করল। প্রচন্ড বিক্ষোভ ও উত্তেজনার মধ্যে শ্রমিকরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করল। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে হঠাৎ বিটিয়া মিলসের কাপড়ের দাম কমিয়ে দিল। শ্রমিকরা প্রতিবাদ করায় তাদের ভয় দেখান হল এবং মিল ছেড়ে চলে যেতে বলা হল। ইতিমধ্যে এগারই এপ্রিল মালিকপক্ষ সিদ্ধান্ত নিল যে একটা স্পিনিং মেশিনে দুইজন মহিলার বদলে একজন কাজ করবে। ফলে মেয়েদের শুধু কাজের চাপ বাড়ল তাই নয়, অনেক মেয়ের কাজ চলে গেল। এগারই এপ্রিল শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করল। দুশ শ্রমিক মেয়ে মিলে এসে ধর্না দিল; ছাঁটাই হওয়া মেয়েরা এসে মিল প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে মোদি এবং গোখেল দুই কর্তাব্যক্তিকে ঘেরাও করল। পাটকর, অম্বিদকর এবং পার্বতীবাই খবর পেয়েই সেখানে চলে গেলেন। মেয়েরা কি করতে পারে সেদিন তারা এর প্রমাণ পেলেন। দুশ দিন এই ধর্মঘট চলল। দেড় দিন মোদি এবং গোখেল ঘেরাও হয়ে রইলেন; শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মুন্সীর হস্তক্ষেপে মোদি এবং গোখেল বেরোতে পারলেন।

অবস্থানরত মেয়েদের পাশে শুরুর কর্মীরাও এসে দাঁড়ালো এবং কাছাকাছি ব্যারাক গুলো থেকে এদের খাবার জল আনতে লাগলো। পার্বতী-বাই প্রায় সর্বক্ষণের কর্মীর মত এই ধর্মঘটী নারী শ্রমিকদের সাহায্য করতে লাগলেন। পাটকর, অম্বিদকর অর্থ সংগ্রহ করে দিলেন যার মধ্যে নিজেদেরও অর্থ ছিল।

নভেম্বরে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হোল। ধর্মঘট দালাল দিয়ে ভাঙ্গতে চেষ্টা করেও মিল মালিকরা সফল হননি। অন্যান্য মিলের শ্রমিকরা বিটিয়া মিলসের ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি জানিয়েছে, অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছে। এমনকি এক হাজার টাকা ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য তুলে দিয়েছে।

লালজী কোন্দলে শ্রমিকদের পড়াতে শুরু করলেন। শ্রমিকদের পরিচিত জিনিস বা ঘটনার মধ্য দিয়ে, শ্রমিকদেরই ভাষায় তিনি পড়াতেন। ফলে শ্রমিকরা সহজেই তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারতো। পার্বতী বাই রোজ বাড়ির কাজ সেরে পার্টি অফিসে এবং মিলে যেতেন। এর জন্য তিনি সমাজে কম সমালোচিত হননি।

১৯৪০-এ আরম্ভ হয় মাগ্‌গী ভাতার জন্য বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট। যুদ্ধ শুরু হবার পর জিনিস পত্রের দাম প্রচন্ড বেড়েছে। শ্রমিকরাও টাকা প্রতি পাঁচ আনা মাগ্‌গী ভাতা দাবী করলো। তাছাড়াও বোনাসের দাবী এবং ন্যায্য মূল্যের দোকানের জন্য দাবী জানাল। মিল মালিকরা কোন দাবীর কথাতো শুনলই না, বরঞ্চ কাজের সময় বাড়িয়ে দিয়ে মুনাফা বাড়াবার মতলব করলো। শ্রমিকরা বাধা দিল। ছদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার হলেন ডাঙ্গে, রনদিভে , পাটকর, সিরাজকর সকলেই। তাদের রাখা হোল যার বেদা জেলে। পার্বতী বাই এগিয়ে এলেন ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্যে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে

টাকা তুলতে শুরু করলেন। ধনীরা কিছুই দিলনা, মধ্যবিত্তরা সামান্য তবে শ্রমিকরা বেতনের দিনে বহু টাকা দিল। পার্বতী কোহিনুর মিলে পিকেটিং করলেন। ততদিনে পার্বতী বাই কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সদস্য হয়েছেন। ১৯৪১-এ তিনি ইউনিয়নের সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে কাজ কর্ম করা এবং মিলগুলোতে যাওয়া—কোনদিনই তিনি রাত সাতটার আগে বাড়ী ফিরতে পারতেন না। এ নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হোত। কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি কাজ করে গেছেন।

এই সময় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের সিটিং হয় কানপুরে। সভাপতি নির্বাচিত হন এন এস্ যোশী। পার্বতী বাই এই প্রথম বোম্বাইয়ের বাইরে যান। এর পর নানান জায়গায় ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ আসতে থাকে এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে পার্বতী বাইও বিভিন্ন জায়গায় যান। সর্বত্র প্রায় নেতৃত্বের সম্মান পান। এই সময় পার্বতী বাই জনসভায় প্রথম ভাষণ দেন। অতি প্রাঞ্জল বলিষ্ঠ ভাষণ। ডাঙ্গে তার বক্তৃতার প্রশংসা করেন। এরপর শ্রমিক শ্রেণীর বক্তাদের মধ্যে তিনি এ'কজন প্রথম শ্রেণীর বক্তা হয়ে দাঁড়ান।

মাগ্‌গী ভাতা আদায়ের জন্য শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। কর্তৃপক্ষ মাগগী ভাতা দেবার নীতি গ্রহণ করে যেটি দেওয়ার রীতি এই সময় থেকেই প্রথম চালু হল।

যুদ্ধ ও দাঙ্গা শেষ হবার পর দেশ স্বাধীন হল। স্বাধীনতার দিন আরও অনেকের সঙ্গে পার্বতীও আনন্দে সামিল হলেন। তারপর কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হল। পার্বতী আত্মগোপন করে কাটালেন নানান বাড়িতে। দুবার আন্তর্জাতিক মহিলা ফেডারেশনের সভায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমন্ত্রিত হন ডেনমার্ক ও ভিয়েনা থেকে। মোরারজী দেশাইয়ের সরকার তাকে বাইরে যাবার অনুমতি দেয়না।

সত্তর বছর বয়সে পার্বতী বাই ভোর নিজের কথা লেখেন। ততদিনে অনেক কিছু পাল্টেছে এবং রাজনীতিতেও আমূল পরিবর্তন এসেছে। কমিউনিস্ট পার্টিও পার্বতীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে, মিথ্যা দুর্নাম দিয়েছে। স্বামী বা বাবার কাছ থেকে সব সময় ভাল ব্যবহার পাননি। ঠিকমত ছেলে মেয়েকে দেখতে পারেননি তার জন্যও নিন্দা সইতে হয়েছে তবু একটা স্বপ্ন দেখেছেন সমাজ পরিবর্তনের। নির্যাতিত অপমানিত শ্রমিকের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের আন্দোলনে শরিক হয়েছেন এই ভেবে যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকের জীবন পাল্টাবে। তাঁর কৃতকর্মের জন্য কোন অতৃপ্তি নেই, পার্টির বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করেন এই কারণে যে তিনি ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছেন যে মানুষই ইতিহাস তৈরী করবে।

সূত্র নির্দেশ

১। রেণু চক্রবর্তী; **ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা, ১৯৪০-৫০**।

২। গৌতম চট্টোপাধ্যায়; **পেশোয়ার থেকে মীরাট**, কলিকাতা, ১৯৮১।

৩। ঐ ঐ

রচনাটি মূলত পার্বতী বাই ভোরের আত্মজীবনী **An account of one Brave Woman** (মারাঠী ভাষা থেকে অনুবাদ) অবলম্বনেই রচিত।

এই আত্মজীবনীটির জন্য শ্রী সুশীল চক্রবর্তীর কাছে কৃতজ্ঞ।

অশ্বিনী কুমার দত্ত ঃ স্বদেশী আন্দোলন

ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলনের [illegible] বরিশালের অশ্বিনী কুমার দত্তর (১৮৫৬, ২৫ জানুয়ারী—১৯২৩, ৭ নভেম্বর) নির্দেশে বরিশালে বিদেশী দ্রব্য বিক্রয় প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কার্জনের 'সেটেল্ড [illegible] 'আনসেটেল্ড' করে দেবার জন্য বিদেশী দ্রব্য বয়কটের ডাককে তিনি সফল করে [illegible] আইনানুগ পথে। তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বরিশাল শহরের নবীন ও প্রবীণদের সংগঠিত [illegible] নেতৃসংঘ ও কর্মীসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

নিশিকান্ত বসুর সম্পাদনায় আঠারো জন শিক্ষক উকিল, যুবক প্রভৃতিকে নিয়ে 'কর্মীসংঘ' গঠিত হয়। তারিণী কুমার গুপ্ত, উকিল হরনাথ ঘোষ জমিদার উপেন্দ্রনাথ সেন, উকিল দীনবন্ধু সেন, উকিল রজনীকান্ত দাস, জমিদার কালীপ্রসন্ন গুহ চৌধুরী, প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বিনী দত্ত নেতৃসংঘ গঠন করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই দুটি সংঘই তাঁরই নেতৃত্বাধীন স্বদেশ বান্ধব সমিতিতে বিলীন হয়ে যায়। স্বদেশ বান্ধব সমিতির আন্দোলনের পথ ছিল মানুষকে বিদেশী দ্রব্য বয়কট, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বঙ্গবিচ্ছেদ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করা। একদিকে অশ্বিনী দত্ত বাজারের বিক্রেতাদের এ বিষয়ে চিঠি দিয়েছিলেন অপরদিকে তাঁর নেতৃত্বাধীন স্বেচ্ছাসেবকরা পিকেটিং এর মাধ্যমে জনগণকে বিদেশী দ্রব্য ক্রয়ে নিবৃত্ত করতো। এছাড়া অশ্বিনী দত্ত সহ নেতৃসংঘের পাচজন সদস্যের স্বাক্ষরিত একখানি পুস্তিকায় দেশবাসীর সর্বপ্রকার বিরোধ মীমাংসার জন্য সালিশি সভা স্থাপন এবং বিলাতী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হয়। এই প্রচেষ্টার সাফল্যের [illegible] বড় প্রমাণ—ফুলার স্বয়ং বরিশালে উপস্থিত হয়ে নেতৃস্থানীয় লেখক পাঁচজনকে ডেকে বইটি প্রত্যাহার করে নেবার নির্দেশ দেন। অশ্বিনী বাবু সহ লেখকরা সেই নির্দেশ মান্য করে পুস্তিকাটি প্রত্যাহার করেন। স্বাভাবিকভাবেই বরিশালের জনমানসে এই প্রত্যাহারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে অশ্বিনী দত্ত বিরত হননি কারণ শাসকবর্গের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িত হয়ে পড়ার তিনি বিরোধী। কিন্তু জিলা ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাক সাহেব বিজ্ঞপ্তিতে যখন লিখলেন যে পুস্তিকাটি 'রাজদ্রোহমূলক' বলেই লেখকরা প্রত্যাহার করেছেন সত্যনিষ্ঠ অশ্বিনী দত্ত আইনের দারস্থ হয়ে এই মিথ্যা বিবৃতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করে ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং ১০১ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়ও করেন। কিন্তু এই পুস্তিকাটি প্রত্যাহার থেকে শুরু করে প্রতিটি পদক্ষেপেই তিনি প্রমাণ করেছেন সর্বোতভাবেই তিনি মডারেট নেতা। যদিও অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর 'The

Extremist Challenge' বইতে লিখেছেন,—"In some definite cases of exploitation the extremists showed special interest, e.g. Lajpat in the plight of the Cheneb colonists or Aswini Kumar Datta in that of Barisal peasants"[২]। **জাতীয় চরিতাভিধান** (২য় খণ্ডে) বি.বি. মজুমদার অশ্বিনী দত্তের বিষয়ে লিখেছেন,—"The partition of Bengal transformed him from a Moderate to an Extremist" কিন্তু এ জাতীয় কোন পরিবর্তন যে তাঁর হয়নি তার প্রমাণ একাধিকক্ষেত্রেই মিলবে। অশ্বিনী দত্ত অবশ্য ১৮৯৭ সালের অমরাবতীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে তদানীন্তন মডারেট নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে কংগ্রেস অধিবেশনকে "তিন দিনের তামাশা"[৩] বলে অভিহিত করেন। কিন্তু যে কারণে তিনি কংগ্রেসের সমালোচনায় বাঙময় হন তা হচ্ছে কংগ্রেসের জনসংযোগহীনতা। অপরপক্ষে এই জনসংযোগই ছিল অশ্বিনী বাবুর প্রধান শক্তি।

(২)

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনই কিন্তু বরিশালের মানুষের সঙ্গে অশ্বিনী দত্তের সংযোগের সূত্রপাত নয়। ১৮৮০র দশকেই জিলা জজের পুত্র এই যুবক জাত ধর্ম বিত্ত সব কিছু নিরপেক্ষভাবে আর্ত মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ওলাওঠা মহামারীর রূপ নিলে এলাকার যুবশক্তিকে সংগঠিত করেও তিনি এর মোকাবিলা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল যুব সমাজের মধ্যে সুনীতি ও ধর্মানুরাগ জাগ্রত করা। কিন্তু এরজন্য তিনি ধর্মালোচনায় উপস্থাপিত করেছেন মুসলিম, খৃষ্টান ইত্যাদি সর্ব ধর্ম মতকেই। এই শিক্ষা যথেষ্ট কার্যকর করার জন্য ব্রজমোহন বিদ্যালয়েরই আর এক পথিকৃৎ শিক্ষক অক্ষয় কুমার সেন-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন বিষয়গতভাবে দশটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'লিটল ব্রাদার্স অফ দি পুয়োর' বা 'দরিদ্র বান্ধব সমিতি'। এই সমিতির মধ্যেই অশ্বিনী দত্তের বিরাট সাংগঠনিক ক্ষমতা ও ব্যাপক জনসংযোগের পরিচয় মেলে। এই সমিতি ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার দিনটি থেকেই 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'তে রূপান্তরিত হয়।[৪]

নিজ জিলা বরিশালে একটি মাত্র সরকারী ইংরাজী বিদ্যালয়ে স্থানাভাব সমস্যার সমাধানে অশ্বিনী দত্ত উদ্যোগী হয়ে সরকারেব সাহায্যে তাঁর পিতার নামে এন্ট্রান্স পর্যন্ত ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ২৭শে জুন, ১৮৮৪ সালে। ৮৪ জন ছাত্র নিয়ে ব্রজমোহন বিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। দ্বিতীয় দিনে ছাত্র সংখ্যা ১১৪, তৃতীয় দিনে ১৭৯, চতুর্থ দিনে ২৩৪, সরকারী বছর শেষ হবার আগে অর্থাৎ ৩১ শে মার্চ, ১৮৮৫ ছাত্র সংখ্যা ৩৭৫ এবং ১৮৮৬ সালের ৩১ শে মার্চ ছাত্রসংখ্যা ৪৪২ জন। অর্থাৎ বিদ্যালয় কেবলমাত্র সংখ্যা তত্ত্বের বিচারেই বর্দ্ধিত হয়নি—আদর্শ বিদ্যালয় হিসাবে—ভালো ছাত্রের সঙ্গে মানব সেবায় অগ্রণী, আদর্শবান, পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সুনামের সঙ্গে সর্বত্র পরিচিত হয়েছেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয় এর সুনাম এতই দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল যে সরকারী নিয়মানুযায়ী ন্যূনতম কার্যকাল পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করা মাত্রই ১৮৮৯ সালের ১৪ই জুন থেকে ব্রজমোহন বিদ্যালয় দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ হিসাবে কাজ শুরু করে। এই বিদ্যালয় ও কলেজই অশ্বিনী কুমারের প্রধান কর্মস্থল হয়ে ওঠে।

শুধু বিদ্যালয় স্থাপনই নয়, বরিশালের একমাত্র আইন ব্যবসায়ী অশ্বিনী দত্ত মাত্র তিন বছরে প্রচুর পসার সত্ত্বেও ওকালতি ত্যাগ করে ব্রজমোহন ইন্সটিটিউশানে শিক্ষকতা শুরু করেন। এর পাশাপাশি বরিশালের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় অংশ নিয়েও তিনি দেশ সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। ১৮৮৫ সালে বরিশাল মিউনিসিপ্যাল বোর্ড স্থাপিত হলে প্রথম বছর থেকেই তিনি কাউন্সিলার এবং পরের বছরে ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ১৮৯৭ সালে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৮৭ সালে গঠিত হয়েছিল জিলা পরিষদ বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড।[৫]

(৩)

বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হলে কেবলমাত্র সর্বান্তকরণেই তার প্রতিবাদই তিনি করেননি, জন প্রতিরোধও গড়ে তুলতে সহজেই সক্ষম হয়েছিলেন। অশ্বিনী দত্তের নেতৃত্বাধীন স্বদেশ বান্ধব সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা হাটে বাজারে মানুষকে বিদেশী জিনিস, কেনা বেচা না করার অনুরোধ করতো। কেবলমাত্র বিদেশী লবণ কেনা নিয়ে কোথাও কোথাও অসহিষ্ণুতা দেখানোর জন্য কয়েকজন কর্মী অভিযুক্ত হয়ে অশ্বিনী দত্তের দ্বারা দন্ড প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[৬] কোথাও আইনভঙ্গ তো দূরে থাক কারো উপর জুলুম পর্যন্ত করা হত না। অথচ বরিশাল জেলাতেই বয়কট আন্দোলন সফল হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। স্বদেশী আন্দোলন-এ বরিশালের সাফল্যের সূচক "নিখিল বঙ্গের কেবলমাত্র বরিশাল জিলায় 'কণ্ঠরোধের আইন' জারি করিয়া গভর্ণমেন্ট এই জিলাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।[৭]" অশ্বিনী দত্তের অসামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতার জন্যই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছিল। স্বদেশ বান্ধব সমিতির প্রচারক পদে দুইজন মুসলমানও হিন্দুদের সঙ্গে নিযুক্ত হন।[৮] এবং "স্বদেশী প্রচার ও বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদ করিবার জন্য বেতনভোগী চারিজন এবং অবৈতনিক পঁচিশ জন প্রচার কার্য্য করিতেন।[৯]" অবশ্য বেতন কোথা থেকে দেওয়া হত তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু অশ্বিনী দত্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে এই সফল প্রচারকরা যতই গ্রামে গঞ্জে প্রচার করে বেড়ান না কেন গ্রামের সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনকে কেবলমাত্র বক্তৃতার দ্বারা সাফল্য অর্জন করা যাবে না। তাই তিনি দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছিলেন—যা ভারত গীতিতে সংকলিত। মুকুন্দ দাসকে উৎসাহিত করেছিলেন স্বদেশী যাত্রাপালা, গান রচনা ও পরিবেশনে, মফিজদ্দিন বয়াতি প্রমুখ মুসলমান জারিওয়ালাদের দিয়ে লিখিয়েছিলেন স্বদেশী গান, সুকবি হেমচন্দ্র কবিরত্ন কাব্যবিশারদকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন নতুন ভাবের কথকতা আরম্ভ করতে। কিন্তু এই 'সব পথ এসে মিলে গেল শেষে' 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'র লক্ষ্যে ও কর্মে।

শরৎ কুমার রায়ের মতে ১৯০৬ সালের মধ্যে সমগ্র জেলায় স্বদেশ বান্ধব সমিতির দেড়শতের বেশী শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে প্রায় একশত শাখায় নিয়মিতভাবে সারা বছর ব্যাপী কাজ হত। অন্যগুলো প্রয়োজনমত কাজ করতো। পল্লীর এই সমিতিগুলিতে প্রয়োজন মত কাজ করবার জন্য ৫০ জন করে স্বেচ্ছাসেবক থাকত। সুতরাং দরকার হলেই দু' এক দিনের মধ্যে অশ্বিনী দত্ত প্রায় পাঁচ সহস্র স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতে পারতেন।[১০] অবশ্য এ প্রসঙ্গে হীরেণ চক্রবর্তী মশাই তাঁর বইতে লিখছেন—

"Under the direction of Dutt and Satish Chatterjee, who was one of the staff of the local B.M. College, the samiti grew rapidly. Owing to the efforts of its members, many of whom were students, the district of Bakergang became the stronghold of boycott movement. Within a year the Swadesh Bandhav Samiti organized 41 sister organizations throughout the district for the enforcement of boycott, engage two travelling speakers on swadeshi and boycott, settled 523 disputes by arbitration and socially ostracised 340 persons for using British goods."[১১]

এই প্রসঙ্গে শরৎ কুমার রায়ের বইএর সূত্রে এও জানা যায় যে বরিশাল জেলায় ৫২টি বিলাতি মদের দোকানের ৫০টিই বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

বরিশালের আপামর মানুষকে অশ্বিনী দত্ত কতখানি এই আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছিলেন তা বোঝা যায় একটি ঘটনা থেকে। এক স্বদেশসেবক নমঃশূদ্রকে স্বদেশী আন্দোলন বিরোধী এক ব্যক্তি বলেছিলেন যে, বাবুরা ত বন্দেমাতরম্ বলে ভাই ভাই এক ঠাঁই করেছেন কিন্তু তোমাদের নমঃশূদ্র বলে ঘৃণা করেন কেন? ভদ্রসমাজে তোমাদের জল চলে না, হুকা চলে না, তবু তোমরা তাদের ভাই, কথাটিত মন্দ নয়। এই কথা শুনে নমঃ শূদ্র ব্যক্তি অশ্বিনী দত্তের কাছে যান। অশ্বিনী বাবু নৌকায় নিজ শয্যায় বসেছিলেন। উক্ত ব্যক্তি অশ্বিনী বাবুর দরজায় দাঁড়িয়ে নমস্কার করতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে প্রতি নমস্কার করে আগত ব্যক্তির পরিচয় জেনে তাঁকে শয্যার পাশেই পাতা ফরাসের উপর তাঁকে নিয়ে বসেন। এর পরে ঐ ব্যক্তি জানান যে তিনি যে কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন তার উত্তর তিনি পেয়ে গেছেন।[১২]

অশ্বিনী দত্তের প্রভাবে বরিশাল জেলায় বয়কট আন্দোলনের সাফল্যের বহু ঘটনাই জানা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটির উল্লেখই যথেষ্ট। স্বদেশী আন্দোলন বিরোধী ঢাকার নবাব সালিমুল্লাহ্ হুকুম দেন বরিশালের একটি হাটে বিলাতী লবণ ও বিলাতী কাপড়ের দোকান বসবে। অশ্বিনী বাবুর হুকুমে নদীর অপর পারে নতুন হাট বসে। তখন বিলাতী হাট একেবারে পরিত্যক্ত হয়। সে অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই মুসলমান। নবাবের কর্মচারীরা এদের জিজ্ঞাসা করে যে কেন মুসলমানরা হিন্দুর হুকুমে নবাবের হুকুম অমান্য করছে। কৃষক জনগণ নির্ভয়ে জবাব দেয় যে আপদে বিপদে রক্ষা করেন 'বাবু' আকালের (দুর্ভিক্ষের) সময় অন্ন পাঠিয়ে দেন তিনি, গ্রামে ওলাওঠা লাগলে ওষুধ ও চিকিৎসক পাঠিয়ে দেন তিনি; এত কাল ত কই, নবাব আমাদের কোন খোঁজ রাখেন নি; আজ তাঁর হুকুমে 'বাবু'র মনে ব্যথা দিলে খোদা নারাজ হবেন।[১৩]

(৪)

১৯০৬ সালের ১৪ ও ১৫ই এপ্রিল জাতীয় কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয় বরিশালে। ঐ সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অশ্বিনী দত্তর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই প্রথম সম্মেলনের সভাপতি হন একজন মুসলমান নেতা আবদুল রসুল। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে তিনি সমগ্র জিলায় ব্যাপক প্রচার অভিযান চালান এবং সাধারণ

পল্লীবাসীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। আগত প্রতিনিধিদের নাম লিপিবদ্ধ করার সময় বোঝা যায় যে আশিটি গ্রাম থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফটেনান্ট গভর্ণর ব্যামফিল্ড ফুলার প্রকাশ্যে বন্দোমাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ করে আদেশজারী করেন। বরিশাল জেলার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ইমারসনকে অশ্বিনী দত্ত কথা দিয়েছিলেন যে প্রাদেশিক সম্মেলনের সময়ও এই নির্দেশ লঙ্ঘিত হবে না। ফলে ১৩ই এপ্রিল রাতে সম্মেলনের প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দের স্টীমার যখন বরিশালে উপস্থিত তখন নদীতীরে অভ্যর্থনারত স্বেচ্ছাসেবকরা প্রায় নিঃশব্দে আগত প্রতিনিধিদের বরণ করে। অশ্বিনী দত্তের নির্দেশ কিভাবে বরিশালে পালিত হত এও তার এক প্রমাণ। কিন্তু আগত প্রতিনিধিরা শাসকদের প্রতি এতটা বশ্যতা স্বীকারে বেশ ক্ষুব্ধ হন। সুরেন্দ্রনাথ সহ নেতৃবৃন্দকে বোঝান হয় যে অন্যথায় শান্তিপূর্ণভাবে সম্মেলন পরিচালনা সম্ভব নয় এবং আইন ভঙ্গকারী পথ অশ্বিনী দত্তর পছন্দও নয়। পরদিন সম্মেলন প্রতিনিধিদের একাংশ প্রকাশ্য রাজপথে বন্দেমাতরম ধ্বনি দেন। যদিও এই আশংকাতেই অশ্বিনী দত্ত তাঁর স্বদেশ বান্ধব সমিতির সদস্যদের ১৪ই এপ্রিলের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে দেননি।[১০] সুতরাং এই আইনভঙ্গকারী ঘটনায় অশ্বিনী দত্তের কোন হাত ছিল না। পুলিশও স্বীয় পন্থা অবলম্বন করে প্রচন্ড লাঠিচার্জ করে। লাঠির আঘাতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সহ বহু প্রতিনিধি আহত হন। লক্ষ্যণীয় এস.পি. বরিশাল কর্তৃক এই ঘটনার বিষয়ে সরকারী পদাধিকারীদের কাছে প্রেরিত রিপোর্ট—যেটি বিশ্লেষণ করে হীরেণ চক্রবর্তী লিখছেন—"The burnt ot the police attack was not burnt by the moderates but by the hot-headed student members of Anti Circular Society of Calcutta with Bipin Pal and Aurobindo Ghose in the wings. The report of the District Superintendent of Police shows that they thrust aside the local leaders, turned the whole proceedings into, as they themselves had admitted, an open challenge to the District Officer to restrain them if he could and set the local people an example (IPP 7312/165, June 1906, S.P. Barisal to C.S.E.B.A. 16th April 1906 and Commissioner of Dacca to C.S.E.B.A 18th April 1906). Extremist propaganda was resumed in full force.''[১১]

পুলিসি নির্যাতন বরিশাল জেলাকে সারা দেশের কাছে দৃষ্টিগোচর করলেও অশ্বিনী দত্ত যে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস থেকে একটুও বিচ্যুত হননি তার প্রমাণ মেলে ঐ সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে—

"May I be permitted to state that, in my humble opinion, National Education, Creation and Development of Indigenous Industries and the Foundation of Arbitration Committees and such other Institutions as would by self-help promote the general welfare of the people, should form the ground-work of the structure.

...Bengal is not dead...she will prosecute the agitation and the movement for the eschewance of British goods by all the lawful and righteous means she can command and will never desist until the partition is withdrawn she has adopted the motto of that intrepid washerwoman of Emerson's–"The more trouble, the more lion; that's my principle" and victory in this constitutional struggle is sure to be hers."[১৯]

এই ভাষণের মধ্যে এমন একটি কথাও নেই যা ব্রিটিশ শাসন অবসানের ইচ্ছা ইঙ্গিতকারী। এখানে দেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য তিনি জাতীয় শিক্ষা, দেশীয় শিল্প, সালিশি কমিটির উন্নতি আকাঙ্খা করেছেন। কিন্তু একটা সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তির শাসনাধীনে থেকে কোন পরাধীন দেশের মানুষের কোন পথেই উন্নয়ন সম্ভব নয়—একথা অশ্বিনী দত্ত কোন দিনই বোঝেন নি। ফলে ইংরাজ শাসন বিরোধী কোন কিছুই তিনি করেননি।

(৫)

অশ্বিনী দত্ত ইংরাজ শাসকদের সঙ্গে কোন প্রকার বিরোধের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়তে আগ্রহী না হলেও শাসক শ্রেণী তাঁকে এবং ব্রজমোহন ইন্সটিটিউশানকে তাদের নিপীড়নের যন্ত্রের বাইরে থাকতে দেয়নি। সরকার ছাত্র সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে কোনভাবেই রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে না পারে তারজন্য রিজলী সার্কুলার জারি করেছিলেন। বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের সময় এই সার্কুলার সত্ত্বেও ব্রজমোহন ইন্সটিটিউশনের ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে দেওয়া হবে কিনা এ নিয়ে এলাকার নেতৃত্বের মনে দ্বিধা দেখা দিলে অশ্বিনী দত্ত বলেন যে ছাত্ররা স্বেচ্ছায় স্বেচ্ছাসেবক হতে চাইলে তিনি তাদের গ্রহণ করায় আপত্তি করবেন না। এরপরই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হয়। কিন্তু এরফলে ঐ বিদ্যালয় ও কলেজ রাজরোষে পড়ে। তাছাড়া পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে বরিশালে বয়কট আন্দোলনের প্রধান সংগঠন স্বদেশ বান্ধব সমিতি শুরুতে ছিল বি.এম. বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়েই তৈরী প্রতিষ্ঠান। উপরন্তু বি.এম. কলেজের অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ, অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ চন্দ্র দাস প্রমুখ স্বদেশী প্রচার ও আন্দোলনে অশ্বিনী দত্তের সহযোগী হয়েছিলেন। এটিও রিজলী সার্কুলার এর পরিপন্থী। এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ বসু রাজনৈতিক বক্তব্যও রাখেন। সুতরাং সরকার তার নিপীড়ন নীতি অনুযায়ী উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়-এর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চায় যে ঐ ইন্সটিটিউশান রিজলী সার্কুলার আক্ষরিকভাবে মেনে চলবে। অন্যথায় এখানকার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হবে না। অধ্যক্ষ মহাশয় লিখিতভাবে এমন প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষমতা জানালে ১৯০৭ সালের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা থেকেই বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদের বৃত্তি সরকার বন্ধ করে দেয়। যদিও হীরেণ চক্রবর্ত্তীর বই থেকে জানা যায় যে ইংরেজ সরকারের পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক কাজে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণের অভিযোগ স্বীকৃত হয় না ঃ

"...students or ex-students accounted for only little over 17% of the

volunteers in six Bakerganj thanas with more than 100 volunteers in each. In Barisal itself the percentage was even lower with only 34 students or ex-students among 309 volunteers".[১৭] এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির অনুমোদন নাকচ করিয়ে এটিকে বিলুপ্ত করতেও উদ্যোগী হয়েছিল। এমনকি ফুলার স্বয়ংও সে ইচ্ছা প্রকাশ করায় বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিদর্শন করাতেও হয়। একাধিকবার একাধিক ব্যক্তিকে দিয়ে পরিদর্শন করিয়েও সরকার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিরোধী কোন রিপোর্ট সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়।

(৬)

এতদ্ সত্ত্বেও রাজরোষ থেকে মুক্তি পাননি অশ্বিনী দত্ত। ব্রজমোহন ইন্সটিটিউশানই যে অশ্বিনী দত্তের মূল কর্মকেন্দ্র—এই সরকারী ধারণার অবসান হয়নি কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত তাই অশ্বিনী দত্তকেই স্থানান্তরিত করে সরকার। অশ্বিনী দত্তের বিষয়ে সরকারী অভিযোগ জানা যায় বরিশালের তদানীন্তন জেলা শাসক হিউজেস বুলার ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশান আইন অনুযায়ী অশ্বিনী দত্তের শাস্তিবিধানের যে সুপারিশ পাঠান সেই নোটে—"I have no hesitation in saying that in the long course of agitation which has been going on in the district for two years, led by Babu Aswini Kumar Dutt, there is at the present movement hardly a simple individual other than Government Servants who is well-affected to the British Government. Even in the case of Government servants, I have yet reason to doubt their thorough loyalty." সুতরাং জেলা শাসক মনে করেছেন—"his further presence in the district a menace to tranquillity". ১৯০৭ সালের ২০শে জুন ঐ জেলা শাসক আরও লিখছেন—

"If we exclude Calcutta leaders like Surendranath Banerjee and Bipin Chandra Pal, it will be difficult to find any other agitator in the two provinces of Bengal and Eastern Bengal and Assam, whose name is so often quoted and to whose words so much weight is attached.[১৮]

লক্ষণীয়, এই মানুষটির বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণ তো দূরের কথা দায়ের পর্যন্ত করা যায়নি। ফলে অশ্বিনী দত্তকে ১৯০৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ১৮১৮ সালের ৩ নং আইনে নির্বাসিত হতে হয়। এমনকি এই একইভাবে তাঁর নেতৃত্বাধীন 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'কেও অন্য কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু উক্ত নোটেও ঐ সংগঠন বিষয় লিখতে হয়—"The Anushilan and Brati Samities are the most closely connected with violent crime. The Surhid Samiti which has intimate relations with the North of India, indulges in the widest aspirations of rebellion ; and the Swadesh Bandhav Samiti is the most successful discontent and in organizing resistance to the authority of Government".[১৯]

দেশপ্রেমিক অশ্বিনী দত্ত, যে কোন দিনই শাসক ইংরেজকে ভারতভূমি থেকে বিতাড়িত করতে চাননি—ইংরেজ সরকারের আইন যে কোন দিনই ভঙ্গ করেননি, কোন প্রকার

হত্যাকাণ্ড দ্বারা দেশসেবার নীতিকে যে কখনই সমর্থন করেননি এমনকি স্বদেশী আন্দোলন যে সত্যি এই নরমপন্থী নেতাকে এতটুকুও চরমপন্থী নেতায় পরিবর্তিত করতে পারেনি—এসবেই প্রমাণ মেলে ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে প্রদত্ত ভাষণে; যখন অশ্বিনী দত্ত দিল্লীতে সদ্য সংগঠিত লর্ড হার্ডিঞ্জের জীবননাশের চেষ্টাকে ধিক্কার জানান এবং বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রত্যাহারের জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি বিশেষভাবে বাংলার ঋণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।।[২০]

সূত্রনির্দেশ

১। শরৎকুমার রায়, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার—কলিকাতা, ১৩৩৯ (৪র্থ সং)

২। Amalesh Tripathi–The Extremist Challenge, India between 1890 and 1910. (Calcutta, 1967)

৩। Sumit Sarkar–The Swadeshi Movement in Bengal : 1903-1908

৪। Hiren Chakrabarti–Political Protest in Bengal Boycott and Terrorism 1905'-18 কলিকাতা, ১৯৯২।

৫। S.P. Sen (ed)–Ddictionary of National Biography (vol I) [Aswani Kumar Dutt by B.B. Majumder]. কলিকাতা, ১৯৭২।

৬। শরৎকুমার রায়, প্রাগুক্ত।

৭। তদেব

৮। তদেব

৯। তদেব

১০। তদেব

১১। প্রাগুক্ত।

১২। শরৎকুমার রায় প্রাগুক্ত

১৩। তদেব

১৪। Hiren Chakrabarti—প্রাগুক্ত।

১৫। তদেব

১৬। অশ্বিনী কুমার রচনা সম্ভার অশ্বিনী কুমার জন্মশতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে (পরিশিষ্ট অংশ) প্রকাশিত—কলিকাতা, ১৩৭৪।

১৭। Hiren chakrabarti—প্রাগুক্ত।

১৮। A.C. Guha–The First Shark of Revolution ওরিয়েন্ট সংখ্যান, ১৯৭১।

১৯। Proceeding No. 135 May 1909 Home Dept.–National Archives, New Delhi.

২০। অশ্বিনী কুমার রচনাসম্ভার—অশ্বিনীকুমার জন্মশতবার্ষিকা কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত কলিকাতা। ১৩৭৪। (পরিশিষ্ট অংশ)

কাকদ্বীপে তেভাগা আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ : একটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক সমীক্ষা

শ্রীদাম গিরি

তেভাগা আন্দোলনে কাকদ্বীপ অঞ্চলে কৃষক মহিলাদের ভূমিকা কতখানি এটিই হলো আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। ১৯৪৬-৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলাদেশের কৃষকদের শেষ বড় আন্দোলন এই তেভাগা আন্দোলন। অবিভক্ত বাংলার সাতাশটি জেলার মধ্যে মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান বাদে সব জেলায় আন্দোলন হলেও কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলনের প্রচারের অভিঘাত নিঃসন্দেহে সর্বাধিক। আন্দোলনরত বর্গাদারদের মূল দাবী ছিল ফসলের তিনভাগের দুভাগ তাদের দিতে হবে। উল্লেখ্য ১৯৪৭-৪৮ সালে অন্যান্য জায়গায় তেভাগা থেমে যাওয়ার পরেও এখানে তেভাগা চলেছিল এবং কৃষকরা নিজ খামারে ধান তুলেছিল। বলাবাহুল্য এই সংগ্রামে কৃষক মহিলাদের একটি গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা দেখা যায়। Peter Custer's–women in the Tebhaga uprising গ্রন্থে তেভাগা আন্দোলনে মহিলাদের বীরত্বপূর্ণ জঙ্গী ভূমিকার কথা লেখা হয়েছে। তাঁর মতে দরিদ্র কৃষক রমনীরা তেভাগা আন্দোলনের একটি অসংগঠিত শক্তি। ব্রততী হোড় ইতিহাস অনুসন্ধানে (৪র্থ খন্ডে) লিখেছেন তেভাগা আন্দোলনের অঞ্চলগুলিতে সর্বত্রই মেয়েদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গৌরব অধ্যায়। বহুক্ষেত্রে তারা নিজেরাই রণ কৌশল স্থির করেছেন এবং বিশেষত আন্দোলনের তৃতীয় পর্বে নারী রক্ষী বাহিনীর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে জঙ্গী। তেভাগার লড়াই স্মারক গ্রন্থে রানী দাশগুপ্তা- "তেভাগা আন্দোলনই প্রথম গ্রামের নারী সমাজকে জাগাইয়া তুলেছে" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "এই আন্দোলনে এক বিরাট সক্রিয় গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেন গ্রামের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ, নিরক্ষর, অবদমিত ও অবহেলিত কৃষক নারী সমাজ। এতদিন নানা সামাজিক কুসংস্কার ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে শিক্ষার জন্য নারী আন্দোলন প্রধানত শহর নগরেই সীমাবদ্ধ ছিল। তেভাগা আন্দোলন বাংলার গ্রামের নারী সমাজকে এই প্রথম জাগিয়ে তুলেছে। কৃষক নারী এই আন্দোলনে প্রচারপত্র বিলি করেছে। বক্তা হিসাবে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। গ্রাম পাহারা দিয়েছে, গ্রামে পুলিশ পিকেট থাকাকালে হাটে সওদা করতে যাওয়ার সাথে সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছে বিভিন্ন আন্দোলনের এলাকার মধ্যে। বাড়ীর পুরুষদের পুলিশ গ্রেপ্তার করতে এলে এই বীরাঙ্গনারা ঝাঁটা, বঁটি নিয়ে পুলিশের সংগে সংঘর্ষ করেছে, গ্রেপ্তার হয়েছে, অকথ্যভাবে নির্যাতিত হয়েছে। পুরুষরা গ্রেপ্তার বা

পলাতক হলে ঘরবাড়ী বা নিজের সম্মান রক্ষা করেছে''—কাকদ্বীপের মহিলাদের ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য অতীব সত্য।

কাকদ্বীপ অঞ্চলের মহিলাদের জঙ্গী ভূমিকা নিয়ে দুচার কথা বলতে হয়। Peter Custer কেই অনুসরণ করে বলতে হয় কাকদ্বীপ অঞ্চলে মহিলারা তেভাগা আন্দোলনে সবচেয়ে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার কারণ হিসাবে বলা যায়—

প্রথমতঃ তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে দরিদ্র ও নিপীড়িত। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যাকে মার্কস বলেছেন "এক কলমের খোঁচায় কর্নওয়ালিশ ও পীট গ্রামবাংলার মানুষকে কৃত্রিমভাবে ভূমিহীন করেছিলেন।" তারপর জমিদার শ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রাম বাংলায় তৈরী হয়েছিল আতঙ্কের স্বৈরতান্ত্রিক পরিবেশ। শুধু খাজনা বৃদ্ধি বা উচ্ছেদ নয়, ভাগচাষীর উপর এমন জোর জুলুম চলত যে তারা ভাগে একদানা শস্যও পেত না। ধান ভাগ হওয়ার পর ভাগচাষীর কাছে পার্বণ-মজুরী, তহুরী, ঈশ্বরবৃত্তি, খামার ছিলানি, কাকতাড়ানি, দারোয়ানী ইত্যাদি নানারকম জুলুমী আদায় করা হত। বাংলার শস্য ভান্ডার মাছ ভাত মধুর দেশ কাকদ্বীপের ভাগচাষী সুন্দরবনে বছরে তিন চার মাস শালুক খেয়ে বেঁচে থাকত। চালু ছিল ঘৃণ্য বেগার প্রথা। কথায় দরিদ্র ও ক্ষেতমজুরদের উপর জমির মালিকের অত্যাচার চলত।

দ্বিতীয়তঃ আর সবচেয়ে যেটা মহিলাদের ক্ষোভের কারণ ছিল তা হল কাকদ্বীপ অঞ্চলের কৃষক পরিবারের মেয়েরা প্রায়শই জমিদার, জোতদারদের লালসার শিকার হতো। নতুবা সেই পরিবারের পরের বৎসর বর্গার জমি মিলত না। ফলে বাধ্য হয়ে তারা গোপনে ইজ্জত দিয়ে আসছিল। কিন্তু জমিদার বা তার নায়েব গোমস্তারা সেই সব অন্ধকারের কাহিনী নিয়ে দিবালোকে কাছারি বাড়ীতে বসে খোস গল্প শুরু করলে নারীদের ইজ্জত ধূলায় লুণ্ঠিত হয়। তাই ইজ্জত বাঁচাতে কৃষক-পরিবারের মেয়েরা মরিয়া হয়ে তেভাগা সংগ্রামের সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিল।

একারণে যখন ১৯৪৬-৪৭ সালে আন্দোলন শুরু হয় তখন প্রথম পর্যায়ে এ অঞ্চলে তেভাগার দাবীর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে বেআইনী আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আর এক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সামনের সারিতে আত্মরক্ষার লড়াইয়ে নেমে পড়ে রাধানগর, চন্দনপিড়ি, হরিপুর, লয়ালগত বুধাখালি, ফটিকপুর, গোবিন্দরামপুর, নারায়ণপুর, মথুরাপুর ও মহেশপুরের মেয়েরা। কাকদ্বীপ অঞ্চলে নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী হওয়ায় ইশতেহার ইত্যাদি লিখিত প্রচার অপেক্ষা মিটিং এবং শ্লোগানে ঝোঁক বেশী ছিল। এবছর তেভাগা চাই, 'লাঙল যার জমি তার' এই শ্লোগানের ভিত্তিতে কৃষকরা জোট বেঁধে ছিলেন। কৃষকদের জঙ্গী মনোভাব যখন তীব্রতর হল তখন শ্লোগান উঠলো—'জান দেবতো ধান দেব না,' মিটিং এ উচ্চারিত এই শ্লোগানগুলির মাধ্যমে কাকদ্বীপের লড়াইয়ের আশে পাশে ছড়িয়ে পড়ে। শাঁখ বাজিয়ে বিপদ সংকেত জানিয়ে দেওয়া, গ্রামে পুলিশ এলে শাঁখ বাজিয়ে সকলকে সাবধান করা হত। আর এই কাজগুলি করত গ্রামের মেয়েরা। কমরেড অশোক বসু, কংসারী হালদার, গুণধর মাইতি, যতীন মাইতি, মন্মথ ঘোড়ই প্রমুখরা কৃষকদের সংগঠিত করেন। ১৯৪৮ সালের ধান কাটার মরশুমে কাকদ্বীপে

তেভাগার দাবীতে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। ছোট ছোট জমির মালিকরা বহুক্ষেত্রে মাঠেই বিচালি শুদ্ধ ধান ভাগ করে নিলে বড় জমির মালিকরা ১৪৪ ধারা জারি করে কৃষকদের অধিকার কেড়ে নিয়ে যায়। কৃষক খেত মজুররা প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। 'জান দেব তবু ধান দেব না' এই আওয়াজ তুলে শাসকগোষ্ঠীর জোতদারদের মোকাবিলায় তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়ে। জোতদাররা মরিয়া হয়ে প্রচন্ড অত্যাচার চালায়—লাঠি, গুলি, গ্রেপ্তার, অগ্নিসংযোগ, কৃষক রমণীদের ধর্ষণ ইত্যাদি সবই চলে।

কিন্তু কাকদ্বীপের কৃষকরা ছিল মরিয়া। ১৯৪৮ এর ৬ই নভেম্বর কাকদ্বীপের চন্দনপিড়িতে কৃষকরা জোতদারদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা ছিল সক্রিয়। খগেন্দ্রনাথ মাইতি 'সে এক রক্ত ঝরা দিন' প্রবন্ধে এ বিষয়ে যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তা তুলে ধরছি। ''কৃষক সমিতির সিদ্ধান্ত মত চন্দন পিড়ির বসন্ত মন্ডলের ঘেরিতে মিছিল করে গিয়ে ধান কাটা হবে সেদিন শাঁখ হাতে কৃষক রমণী ও কৃষকরা ঘেরির চারপাশে মিছিল করছিলেন। ঘেরিতে ধান কাটছিলেন ভাগচাষীরা। ইতিমধ্যে হরিপুর ক্যাম্প থেকে পুলিশ আসে। মিছিল আটকে দেয় তারা। নির্দেশ দেয় ধান কাটা বন্ধ রাখতে। কৃষকরা পুলিশী বাধা অগ্রাহ্য করে অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে অটল ছিলেন। শান্তিরক্ষার জন্য এর পরই পুলিশ শূন্যে গুলি ছোঁড়ে। কৃষক রমণী ও কৃষকরা তখনও অনড় অটল। শুরু হল পুলিশের নির্মম অত্যাচার। গুলিতে একে একে লুটিয়ে পড়ল অশ্বিনী দাস, অহল্যা দাসী, বাতাসী দাসী, সরোজিনী দাসী ও গজেন ভূইঞা। বীর কৃষকরা কিন্তু পিছু হটে নি, মরণপণ প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। ১৯৪৯ এর ৭ই নভেম্বর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির প্রকাশিত ইস্তাহারে (কমঃ অশোক বসুর লেখা) কাকদ্বীপের মহিলাদের বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা সর্ম্পকে জানা যায়। এই ইশতাহারে বলা হয়েছে, '৬ই নভেম্বর ভোরবেলা একই সঙ্গে ১০।১৫ খানা বোটে করে পাঁচশত সশস্ত্র পুলিশ এসে একই সঙ্গে কাকদ্বীপের সবকটি এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের পথ চিনিয়ে এনেছে সেনের কাছারির নায়েব ও কংগ্রেসী নেতা পরেশ দাস আর বসন্ত মন্ডল। সাত আট মাসের গর্ভবতী মা অহল্যা প্রচন্ড বেগে ঝাঁটা বসিয়ে দিয়েছে পরেশের মুখে। সরোজিনী গিয়ে চেপে ধরেছে একটা গুর্খা ফৌজের রাইফেলের মাথা...সরোজিনীর ভাই অশ্বিনীর দেহটা দু'হাতে বুকে জড়িয়ে পালাচ্ছিল—হঠাৎ গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। এবার অশ্বিনীর দেহ তুলে নিলেন মা অহল্যা। গুলি লাগল তার তলপেটে। কাছারি ও বড় লোকের রক্ষক আর একটি কংগ্রেসী ফৌজ ছুটে এসে সঙ্গীন দিয়ে চিরে ছিল অহল্যার গর্ভ।'

অহল্যার মতোই বুধাখালির পাখিরও আর মা হয়ে উঠা হয় নি। পুলিশ ও জোতদারদের লেঠেলের লাঠিতে আট মাসের গর্ভবতী পাখির সন্তান বুধাখালির আলো দেখেনি। লড়াকু মেয়েছিল বুধাখালির পাখি। তেভাগার ডাকে অন্যান্যদের সাথে পাখিও মাঠে নেমে ছিল। হাতে লাল ঝাণ্ডা, প্রায় আট মাসের গর্ভবতী ছিল পাখি। লেঠেলরা ঘিরে ফেলে জমির মধ্যেই। তারপর চলে অত্যাচার। রক্তাক্ত অবস্থার মধ্যেই পড়েছিল পাখি। পরে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গোপন আস্তানায় চিকিৎসার জন্য। গর্ভস্থ শিশু আর

কোন দিন বুধাখালির আলো দেখেনি। পাখি ছাড়াও যারা তেভাগার দাবীতে আন্দোলনে নেমেছিলেন তারা হলেন বুধাখালির কৌশল্যা, বাসন্তী মন্ডল, লক্ষ্মী সাউট্যারা, গুণধর মাইতি বলেছেন তেভাগার দিনগুলিতে কৌশল্যার মত মেয়েরাই ছিল সামনের সারিতে। "তেভাগায় মেয়েদের ভূমিকা অনেক বড়, যারা শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে তাদের কথাতো আছেই, পাশাপাশি বাতাসী দেবী, কৌশল্যাদির কথা খুব ভাবায়, কি কষ্ট করেছে ওরা আজ ভাবা মুশকিল। লক্ষ্মী সাউ, পাখির মতো মহিলাদের ভূমিকা ছিল সে সময় অনেক জরুরী। গোপন খবরাখবর দেওয়া নেওয়া, শত্রুর পথের খবর আনা, এমনকি পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই সবেতেই অবদান।"—একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রী গুণধর মাইতি।

একথা সংশয়াতীত তেভাগা আন্দোলনে কাকদ্বীপের নিপীড়িত ও দরিদ্র কৃষক রমনীরা লড়াই করেছিল বীরত্বপূর্ণ ভাবে। নারীর সমস্ত অপমান, লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে নতুন চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে তারা আন্দোলনের প্রথম সারিতে এগিয়ে এসেছিল। এদের তুলনাহীন সাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতি, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ক্ষমতা ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে থাকবে, তারা শুধুমাত্র পুলিশের সাথে খন্ড যুদ্ধ করেই নি, বন্দুক কেড়ে নিয়েছিল। লাঠি হাতে করে জমির ধান রক্ষা করেছিল। নির্ভয়ে বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভবানী সেন কমিউনিস্ট এ লিখেছেন "সবচেয়ে অবদমিত পশ্চাদপদ ও নিরক্ষর কৃষক রমনীর ধান রক্ষায় তাদের ঘরবাড়ী, সম্মান রক্ষায় আর রক্ত পতাকা রক্ষায় এক গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করে। তেভাগা সংগ্রাম রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে কৃষ্ণ বিনোদ রায় তেভাগা আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা প্রসঙ্গে লিখেছেন "নারীগণ, এই আন্দোলনে যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তা ইতিহাসে গাঁথা হয়ে থাকবে...তেভাগার সংগ্রাম মহিমান্বিত নারী সৃষ্টি করেছিল নিরক্ষর পশ্চাদপদ, গ্রাম্য মেয়েদের ও বধূদের মধ্য থেকে।"

সূত্র-নির্দেশ

১। তেভাগা আন্দোলনের নেতা গুণধর মাইতির একান্ত সাক্ষাৎকার, তারিখ 5-12-1998.

২। আন্দোলনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত লক্ষী সাউর একান্ত সাক্ষাৎকার, তারিখ 7-12-99.

৩। ছবি রায় 'বাংলার নারী আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকার দেড়শ বছর'।

৪। তেভাগা সংগ্রাম রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ (১৯৭৩)।

৫। ইতিহাস অনুসন্ধান (৪র্থ) প্রবন্ধ—'তেভাগা আন্দোলনে কৃষক মহিলাদের ভূমিকা'-ব্রততী হোড়।

৬। ডঃ সুনীল সেন—'Agrarian Struggle in Bengal 1946-47'.

৭। কুণাল চট্টোপাধ্যায়—'তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস'।

৮। 'তেভাগার লড়াই'—সংকলন ন্যাশানাল বুক এজেন্সী।

৯। হেমন্ত ঘোষাল—'সময় অসমের স্মৃতি'।

১০। বাংলার 'তেভাগা'—তেভাগার সংগ্রাম, জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

ব্রিটিশ ভারতে গোসাবায় স্যার ডানিয়েল হ্যামিল্টন প্রবর্তিত এক টাকার নোট ও একটি সমীক্ষা ঃ

সুধন্য কুমার মণ্ডল

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার নবাবের কাছ থেকে চব্বিশ পরগণার জমিদারী লাভ করার পর কয়েকজন ইংরেজ শাসক এখানকার জঙ্গলময় অনাবাদী জমি পরিষ্কার করে তা চাষের উপযোগী করে গড়ে তুলে জমিদারদের কাছে লীজ দেওয়ার প্রথা উদ্ভাবন করেন। 'ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর' এক কর্মচারী ক্লড রাসেল ১৭৭০-১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই লীজ দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।[১] কয়েক বছর পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে টিলম্যান হেঙ্কেল সেই জমিগুলিকে ছোট ছোট প্লটে বিভক্ত করে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করার কথা বলেন, অতঃপর ১৮১১-১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লেফটেন্যান্ট ডব্লু-ই মরিশন ও তার ছোট ভাই ক্যাপ্টেন হিউজ মরিশন চব্বিশ পরগনার (অধুনা দক্ষিণ ২৪ পরগনার) সুন্দরবন এলাকার সমস্ত জমি জরীপ করে একটি মানচিত্র তৈরী করেন। ১৮২২-২৩ খৃষ্টাব্দে মরিশনের ঐ মানচিত্রের সাহায্যেই প্রিন্সিপ সুন্দরবনের গভীর অরণ্য এলাকা জরীপ করে তা কয়েকটি ব্লকে বিভক্ত করেন। ১৮৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে মানচিত্রে উল্লিখিত এরূপ আটানব্বইটি জঙ্গলময় লট সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে অধুনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন এলাকার গোসাবা লটের চারটি গহীন বনাকীর্ণ লবণাক্ত দ্বীপ বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে লীজ হিসাবে গ্রহণ করেন এক ইংরেজ, স্যার ডানিয়েল হ্যামিল্টন।[২] প্রায় ২২০০০ (বাইশ হাজার) একর পরিমিত জায়গা নিয়ে দ্বীপ চারটি গঠিত ছিল।[৩] লবণাক্ত ও জঙ্গলময় এই দ্বীপ চারটির নাম ছিল (ক) গোসাবা (খ) রাঙাবেলিয়া (গ) সাতজেলিয়া ও (ঘ) লাক্সবাগান।

স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটন ছিলেন ব্রিটিশ ভারতে কলকাতার 'মেসার্স ম্যাকিংনাম ম্যাকেনজী অ্যান্ড কোম্পানীর' একজন অংশীদার। তিনি সুদুর চব্বিশ পরগণার গহীন বনাঞ্চল পরিষ্কার করে এক আদর্শ এস্টেট গঠনের মাধ্যমে সেখানকার মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণীকে উৎসাহ ও বিভিন্ন জীবিকা উপযোগী বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক সহ সামাজিক, বৌদ্ধিক ও আত্মিক ও শারীরিক উন্নতির বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণের চেষ্টা চালান। ব্রিটিশ ভারতে বিশেষ করে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রত্যেক ঘরের শিক্ষিত বেকারদের কথা চিন্তা করেই তাদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, যথা কৃষি প্রশিক্ষণ, পোল্ট্রি প্রশিক্ষণ, তাঁত প্রশিক্ষণ পশুপালন এবং প্রত্যন্ত গ্রামের গরীবদের জন্য শিশু থেকে বয়স্ক

পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষার সুব্যবস্থা, তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি ব্যবস্থা করে প্রত্যেককে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করেন। এক দিকে তিনি যেমন সার্বিক ও নিবিড় গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন অন্যদিকে তেমনি তিনি সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে এস্টেটের জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পাশাপাশি প্রত্যেকের মধ্যে সহযোগী মনোভাব গঠনের মাধ্যমে ঐক্যবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। ডানিয়েল হ্যামিল্টনের ভাষায়—"The cooperative Flag is India's National Flag, and all true nationalists will rally round it ; and all the world will do well to follow where it leads."[৭] তিনি মনে করেছিলেন বহু বর্ণ, ধর্ম, জাতি ও গোষ্ঠী বিভক্ত ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট ও জাতিবিশিষ্ট ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত করার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে একটি 'Co-operative Flag' প্রয়োজন, যার ছত্রতলে এসে প্রত্যেকে আবদ্ধ হবে নিবিড় সহযোগিতার ও সৌভ্রাতৃত্ববন্ধনে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই বৈষম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে ঐক্য স্থাপনে তৎপর না হলে ভারতে কখনোই শান্তি ফিরে আসবে না, ভারতবাসী পাবে না স্বাধীনতার স্বাদ। সুতরাং ভারতবর্ষে সমবায় সংগঠন ও তার মাধ্যমে অর্থের সুষম বন্টনের দ্বারা তিনি কৃষি নির্ভর ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং ভরতে জাতি গঠনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন।[৮] শুধু গোসাবা এস্টেট ছিল তার পরীক্ষামূলক একটি ক্ষেত্র। হ্যামিল্টন উপলব্ধি করেছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে এই ঐক্যের মূল্যবোধ জাগ্রত করে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিবর্তনের প্রয়োজন। এই একই কথা তখনকার Royal Agricultural Commission এর প্রতিবেদনেও উল্লেখ আছে যে—"If Co-operation fails there will fail the best hope of rural india."[৯] গোসাবায় চারটি দ্বীপের গ্রাম সমূহের সার্বিক উন্নয়নের জন্য স্যার ডানিয়েল হ্যামিল্টন কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, উন্নতমানের বীজধান সরবরাহ, গো প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন, গো প্রতিপালন, কুটির শিল্প প্রবর্তন এবং গ্রামে গ্রামে লোয়ার ও আপার প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার প্রবর্তন এবং গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা ও দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে সকল মানুষের উন্নয়নের চেষ্টা করেন।[৭] স্যার হ্যামিল্টন মনে করতেন যে গ্রামীণ মানুষের আত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি দৈহিক শিক্ষারও প্রয়োজন এবং প্রত্যেক শিক্ষিত বেকারদের স্বয়ংসম্পন্ন হওয়ার প্রতিও লক্ষ্য রাখেন।[৮]

শিক্ষার ও বিভিন্ন স্বনির্ভর সহায়ক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তিনি তাঁর জমিদারীতে গবেষণামূলক ও সহযোগিতামূলক কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন। প্রত্যেক রায়ত বা কৃষককে তিনি পঁচিশ বিঘা পরিমাণ জমি প্রদান করেছিলেন। সেই জমিতে গোসাবা কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে সৃষ্ট গোসাবা ২৯৮ ধান, গোসাবা ২৩ নং পাটনাই ধান, রূপশাল ও কুমড়োগোড় ধান চাষ করে বিশেষ ফসল পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়াও উন্নতমানের দার্জিলিং আলুর বীজ, বাঁধাকপি, ওলকপি, টমেটো, আখ, দীর্ঘ আঁশ যুক্ত তুলার বীজও সরবরাহ করে তিনি গোসাবায় কৃষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক চাষের জন্য বন্টন

করতেন। Central Model Farm-এর দলিল অনুযায়ী এ অঞ্চলে বছরে গড়ে ষাট ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হত। সেই অনুযায়ী জলবায়ু উপযোগী কৃষি ফসলের চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সর্বাধিক ফসল উৎপাদনকারী চাষীকে প্রতিবছর পুরষ্কারের ব্যবস্থা করে কৃষি ফসলের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়েছিলেন।[৯]

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের পর বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে জমিদারী গ্রহণ করার পর অন্যান্য অঞ্চলের জমিদাররা গরীব চাষীদের চাষের উন্নতির দিকে লক্ষ্য না করে যেমন উত্তরোত্তর খাজনা বৃদ্ধি করা ও তা জোরপূর্বক আদায় করার জন্য কড়া ব্যবস্থা নিয়েছিলেন গোসাবায়, ডানিয়েল প্রতিষ্ঠিত জমিদারীতে ছিল তার ঠিক বিপরীত। এই অর্থগৃধ্নুতার মনোভাব হ্যামিল্টনের মধ্যে কখনোই দেখা যায়নি। তিনি এদেশের মধ্যে বন্টিত জমির একর প্রতি মাত্র দুই টাকা চার আনা করে অর্থ আদায় করতেন।[১০] তাও আবার একর প্রতি দুই টাকা নেওয়া হোত শিক্ষক ও ডাক্তারদের বেতন দিতে এবং একর প্রতি চার আনা আদায় করতেন গোসাবায় প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতির কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য।[১১] খাজনা ধার্য বা আদায়ের প্রতি কখনো হ্যামিল্টনের দৃঢ় বা কঠোর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়নি বরং কৃষির উন্নতি কিংবা তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সমস্যা তিনি সরেজমিনে তদন্ত করতেন এবং তা সমাধানের উপায়ও করে দিতেন। সর্বোপরি তিনি বিভিন্ন গ্রামীণ বর্ণ ও ধর্মবিশিষ্ট মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ ও বৈষম্য ভুলে আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে সবাইকে একতার বন্ধনে বাধতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দিতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি গোসাবায় 'গ্রামীণ সমবায় সমিতি' গঠন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত চারটি দ্বীপের বিভিন্ন গ্রামে তিনি গোসাবার এই সমবায় সমিতির শাখা হিসাবে আরো প্রায় পনেরটি গ্রামীণ সমিতি গড়ে তোলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁরই প্রচেষ্টায় গঠিত হয় 'কনজুমারস্ কোপারেটিভ সোসাইটি' এখান থেকে কৃষি উপকরণগুলি যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে কৃষকদের প্রদান করা হোত। পরে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কৃষি ফসল বিক্রির জন্য গোসাবায়—"A paddy co-operative Sale society' গড়ে ওঠে। কৃষকদের কাছ থেকে দালালরা ঐ কৃষি উৎপাদিত ফসল কেনাবেচা করত। একাজে এদের মুনাফা জুটত প্রচুর।[১২]

ভারতবর্ষের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাসে বিভিন্ন রাজাদের প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রবর্তন দেখা যায়। কিন্তু আধুনিক যুগে ব্রিটিশ ভারতে জমিদারী ব্যবস্থার মধ্যে কোন জমিদার কর্তৃক তার নিজস্ব জমিদারী এলাকার মধ্যে কোন নোট প্রচলনের কৃতিত্ব নেই বললেই চলে। কেবলমাত্র চব্বিশ পরগনার সুদূর সুন্দরবনের গ্রামের জমিদারীতে এক ব্রিটিশ প্রজাহিতৈষী জমিদার ডানিয়েল হ্যামিল্টন কর্তৃক ১৯০৯ সালের পর তার লীজ নেওয়া বাইশ হাজার একর জমিতে বসবাসকারী গ্রামীণ গরীব কৃষকদের আর্থিক, সামাজিক ও বৌদ্ধিক উন্নয়নের পাশাপাশি সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তৎকালীন জমিদারী প্রথায় তা একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ। গোসাবায় তার জমিদারীতে শুধু কৃষক নয়, সেখানকার প্রত্যেকের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের চারিত্রিক, বৌদ্ধিক উন্নতির জন্য শিক্ষার ও

বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কৃষকদের কৃষি পণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের জন্য তিনি গঠন করেন কনজুমারস্। ১৯৩৬ সালে প্রবর্তন করেন নিজ নামাঙ্কিত এক টাকার একটি কাগজের নোট, যেটি শুধুমাত্র তাঁরই জমিদারী এলাকায় ব্যবহার করা যেত। এই নোটের দ্বারা প্রত্যেকেই গোসাবা সমবায় থেকে কিংবা তার শাখা সমবায়িকা থেকে কাপড়, চাল, তেল ছাড়াও অন্যান্য জিনিস বিনিময়ের মাধ্যমে কিনতে পেত।[৮] এই কাগজের নোটের একদিকে উল্লেখ ছিল—'The value received in exchange for this note may be given in the form of bunds constructed, or tanks excavated, or land reclaimed, or buildings created ; or in medical or educational service.'

এলাকার মানুষ প্রয়োজন মত সেই নোটগুলি আবার গোসাবা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই ভাঙ্গাতে পারত। এর জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে কোন বাড়তি টাকা প্রদান করতে হোত না। নোটের অপর দিকে উল্লেখ ছিল—Promises to pay the Bearer, on demand, at the Co-operative Bhunder in exchange for value received one Rupee worth of rice, cloth, oil or other goods.

ব্রিটিশ ভারতে অবশ্য এর পূর্ব থেকেই সরকারী অর্থনীতি বিভাগ ভারতের গ্রামীণ উন্নয়নের কথা চিন্তা করছিল। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক্ষেত্রে গ্রামীণ সমবায়ের মাধ্যমে ঋণদানের ব্যবস্থা করে প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষিব্যবস্থা জনপ্রিয় ও উন্নতির চেষ্টা চালাবার কথা উত্থাপন করেছিল। হ্যামিল্টনের মতে—"The Reserve Bank is being reserved chiefly for speculators in gunnies and Jute, in Cotton and gold and silver, rather than for the people to whom the reserves by right belong and by whose labour they were created."[৯]

সেই সময় ব্যাঙ্কের কোন উচ্চ অধিকর্তা বলেছিলেন "A Bank is not an institution for borrowing and lending money; it is a manufactory of credit,' The Reserve Bank is the King and people's Bank...". গোসাবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়েছিল। ডানিয়েল হ্যামিল্টন তখনকার বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্‌দের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত গোসাবা জমিদারীতে এক টাকার নোট প্রচলনের পর বলেছিলেন "If the currency were to circulate with the speed of light, one Gosaba Rupee note would Finance all India for all time.

গোসাবায় হ্যামিল্টন প্রবর্তিত ও প্রচলিত এই অর্থনৈতিক পদ্ধতি পুরোপুরি সফলতা ও ভারতবর্ষের ব্যাপক মানুষকে প্রভাবিত করতে না পারলেও ব্রিটিশ ভারতে যে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ সে সময় ইংল্যান্ডের জর্জ স্কাটর এবং লেডি স্কাটর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় ও উদযোগে বোলপুরে যেমন কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপক উদ্‌যোগ দেখেছিলেন, গোসাবায় এসে হ্যামিল্টন জমিদারীতে ও সেই একই উদ্‌যোগ পাশাপাশি দেখে তিনি অবাক হয়ে হ্যামিল্টনের কাছে জানতে চেয়েছিলেন গোসাবা ও বোলপুরের মধ্যেও এ বিষয়ে কোন যোগাযোগ আছে

কিনা। তাঁর কাজ দেখে স্কাটার হ্যামিল্টনকে বাংলা গভর্নমেন্টের সঙ্গে একত্রে গ্রামোন্নয়ন মূলক কাজ করতে বলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে গোসাবা পরিভ্রমণে এসে হ্যামিল্টনের ব্যাপক নিবিড় গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প দেখে বিস্মিত হন।

ডানিয়েল হ্যামিল্টন প্রবর্ত্তিত এক টাকা নোটের সাহায্যে কৃষকরা বা জনগণ শুধুমাত্র তাদের উৎপন্ন কৃষিফসল ও অন্যান্য উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর বিনিময় করতে পারত। কোন লোন বা খাজনা পরিশোধের জন্য তা ব্যবহার করা যেত না। এজন্য হ্যামিল্টন প্রতিবছর প্রায় দুশ তেরটি নতুন নোট প্রচলন করতেন। বহু ব্যবহারের পর জীর্ণ নোটগুলিকে তিনি বাতিল করে তার পরিবর্তে আবার নিজ নামাঙ্কিত নতুন নোট প্রতি বছর প্রচলন করেছিলেন। তখনকার Royal Currency Commission এর সম্মতিক্রমে ভারতীয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট রিজার্ভব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই একটাকার নোট চালাবার সম্মতি দিয়েছিলেন। এই নোট লোন পরিশোধ ল্যান্ড রেভিনিউ, রেলওয়ে রিসিপট্, পোস্টেজ ও টেলিগ্রাম প্রভৃতি ব্যাপারে কোন প্রয়োজন মেটানো যেত না বরং তা বাতিল বলে গণ্য করা হোত।[১৫]

জমিদার কর্তৃক প্রজাদের হিতসাধনের এবং তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক ও চারিত্রিক উন্নতির সর্বোতপ্রচেষ্টা এক প্রবাসী বৃটিশ জমিদারের মধ্যে যেভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল তৎকালীন ভারতীয় কোন দেশীয় জমিদারদের মধ্যে প্রজাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের তেমন কোন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় নি। নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও দক্ষ পরিচালনায় ভারতীয় প্রত্যন্ত গ্রামীণ সাধারণ মানুষদের সামাজিক ও স্বশাসনের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনা এবং তাদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য, সুচিন্তিত বৌদ্ধিক ও আত্মিক উন্নতি এবং পরিকল্পিত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যে নতুন পথ দেখিয়েছিলেন তা পরবর্তী কালীন বহু ভারতীয় হিতৈষী সমাজ সংস্কারক ও মনীষীদের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ। কিন্তু একান্ত নিজের ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ নিজের সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে যে আদর্শ গ্রাম সমাজ প্রতিষ্ঠায় তিনি ব্রতী হয়েছিলেন তা সমসাময়িক সময়ে সম্পূর্ণ সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য লোকের অভাবে অগ্রগতির ঐ ধারা ধরে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তবু তার ভাবাদর্শে ও তাঁরই পরিচালিত পথে আজও গোসাবা জনপদের অনেকে স্বচ্ছল বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে পরিণত হয়েছেন। আজও গোসাবার অগণিত মানুষের ডানিয়েল হ্যামিল্টনের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণের দ্বারা তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

সূত্রনির্দেশ

১। কমল চৌধুরী, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ইতিহাস, কলিকাতা ১৯৮৭, পৃ ১৪৯.

২। সুধাংশুভূষণ মজুমদার, এস্টেট ফার্মিং ইন ইন্ডিয়া, গোসাবা, ১৯৪২, পৃ. ৫৭৩

৩। তদেব P-573

৪। ডি এম হ্যামিল্টন, The india Act of 1935. and the cooperative movement, গোসাবা, বিশে ফেব্রুয়ারী। ১৯৩৯।

৫। Address Sir Danial Hamilton to the students of the Scottish Schurch College, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০।

৬। ডি এম হ্যামিল্টন, নিউ ইন্ডিয়া, কলিকাতা, ১৯২৯, পৃ. ৫০।

৭। গোপীনাথ বর্মন ঃ "সমবায় ও স্যার ডনিয়েল হ্যামিল্টন" লবনাক্ত পত্রিকা, ১৯৮৫, ডিসেম্বর, গোসাবা পৃ. ২।

৮। Address by Sir D.M. Hamilton to the Burdwan Divisional Co-operative Conference, held at Bolpur on 9th, 10th and 11th Feb, 1929. প্রকাশিত New India and How to get there, দ্বিতীয় সংস্করন কলিকাতা

৯। মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৪।

১০। ডি.এম. হ্যামিল্টন, ইন্ডিয়া এ্যাক্ট, পৃ. ১।

১১। ডি.এম হ্যামিল্টন, The Road of independence, কলিকাতা, পৃ. ৬।

১২। মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩।

১৩। ১৯৩৮ সালে ৩রা ডিসেম্বর স্যার ডানিয়েল হ্যামিল্টন প্রবর্তিত এক টাকার নোট থেকে জানা যায়।

১৪। ডি.এম হ্যামিল্টন দ্য রোড ইন্ডিপেন্ডস, পৃ. ৩,

১৫। তদেব।

ঔপনিবেশিক কারা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় হিজলী জেলের সংঘর্ষ

মনোজ ত্রিপাঠী

মিশেল ফুকোর তত্ত্ববিশ্বে প্রধান আকল্প হলো 'প্রতাপ সর্বত্র রয়েছে'। ফুকো আমাদের শরীরের তন্তুতে পর্যন্ত প্রতাপের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে, শাস্তির পদ্ধতি হিসেবে নির্বাসন বা পীড়ন গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র নামক প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে। ফ্রাঙ্কফুর্টের সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করতেন শিল্পায়ন ঋদ্ধ সমাজে যেহেতু শ্রমের মূল্য অনেকখানি তাই অপরাধী দন্ডিত ব্যক্তিদের কারাগারে বাধ্যতামূলক শ্রমে জুড়ে দেওয়া হয়। ফুকো একথা মানেননি। তাঁর মতে কারাগারে বাধ্যতামূলক শ্রমদান ও আসলে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির প্রতাপ প্রকাশের একটি ধরন। বন্দীশালার উদ্ভব এবং অপরাধীদের শাস্তিদানের প্রথা বিশ্লেষণ করে ফুকো দেখিয়েছেন, প্রতাপের কৃৎকৌশল আত্মস্থ করেই সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গগুলি, যেমন বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, আরক্ষী বাহিনী, সেনাবাহিনী, মনোবিকলন মূলকপ্রতিষ্ঠান—শৃংখলা ও শাস্তির বিধিব্যবস্থাকে রপ্ত করে ফেলে। কেন না শারীরিক শক্তি বা সন্ত্রাস দিয়ে সব সময় ইপ্সিত ফললাভ করা যায় না। ফুকো দেখিয়েছেন, যুগে যুগে রাষ্ট্র শক্তি মানব শরীরকে এমন এক প্রতাপের যন্ত্রে পরিণত করেছে যে তাকে ইচ্ছে মতো নিরীক্ষণ (Pan-optic view) করা যায়, প্রয়োজনমাফিক বিনির্মিত ও পুনর্গঠিতও করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রিক শৃংখলা। এই শৃংখলা কয়েকটি নির্দিষ্ট ধরনের বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য পরিসর ভাগ করে দেয়। মানসিক রোগীকে যেমন চিকিৎসালয় কিংবা অপরাধীকে যেমন বন্দীশালায় সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে আলাদা করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আটকে রাখা হয়।[১] ফুকোর প্রতাপ তত্ত্ব ইতিহাস নিরপেক্ষ বা বিমূর্তায়িত নয়, বরং ইতিহাস নির্ধারিত প্রাকরণিক পদ্ধতি হিসেবে তা কোন সমাজের বিশিষ্ট চরিত্র অনুযায়ী বিশেষ ভাবে গড়ে ওঠে। এই সত্যটিকে মেনে আমরা এই প্রবন্ধে হিজলী বন্দী শালার বন্দীত্ব, বন্দীশালার স্থাপত্য, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নিরীক্ষণ পদ্ধতি এবং সর্বোপরি প্রতাপের সাংগঠনিক আকরণ-প্রকরণ লক্ষ্য করব।

হিজলীতে বন্দী শিবির গঠনের বিষয়টির সঙ্গে একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত যুক্ত হয়ে গেছে। প্রশাসনিক কার্যের সুবিধার জন্য এক সময় মেদিনীপুর জেলাকে দুভাগে ভাগ করার এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আবহাওয়া এবং সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থার (কাছেই রেলজংশন খড়্গপুর) কারণে হিজলীকে জেলা সদর দপ্তর হিসাবে গড়ে তোলার

কথা ভাবা হয়। পাশাপাশি এটাও হিসেব করা যে ঠিক এই অঞ্চল থেকে জঙ্গল মহলের সম্ভাব্য বিদ্রোহকে দমন করা সহজেই সম্ভব হবে। ব্রিটিশ সরকার এই সমস্ত কারণে হিজলীকে নির্বাচন হয়েছিল। তাই প্রশাসনিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে কিছু ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সেই লক্ষ্য পূরণে এক কথায় ব্যর্থ হল। একদিকে বীরেন্দ্র নাথ শাসমলের অনমনীয় দৃঢ়তা, অন্যদিকে জনগণের সংঘবদ্ধ বিরোধিতা, সর্বোপরি ব্রিটিশ সরকার আর্থিক সংকটের মুখে পড়ে পূর্বেকার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত হতে বাধ্য হন। তবে পরে ১৯৩১ এর মার্চে যখন বন্দী শিবির নির্মাণে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন, তখন পূর্বেকার নির্মিত ভবনকেই বন্দী শিবির হিসেবে কাজে লাগান হয়েছিল। অর্থাৎ সমস্ত ঘরবাড়ীকে বন্দী শিবির হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল, যদিও সেগুলি ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়নি।[২] তৎকালীন জেলাশাসক রবার্ট ডগলাসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে জেলের পরিবেষ্টিত আয়তন একশচল্লিশ গজ, বর্হিচল্লিশ গজ। মূল ভবনটি দ্বিতল বিশিষ্ট। ভবনের মধ্যবর্তী স্থানে একশচল্লিশ ফুট উচ্চ একটি মিনার আছে। মিনারে বাইজেনটাইন স্থাপত্য রীতির ছাপ আছে। জেল সংলগ্ন অঞ্চলটির আয়তন চারশ গজ বর্হি দুশ তিরিশ গজ। জেল ভবনের সোজা দক্ষিণ পূর্বস্থানে মূল প্রবেশ দ্বারটি অবস্থিত। সমগ্র এলাকাটি দশ ফুট উচ্চ প্রাচীর যুক্ত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। এই ব্যবস্থা সহজেই একে একটি দুর্গে রূপান্তরিত করেছিল।[৩] অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে ত্রিশের আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কয়েকজনকে স্বল্প সময়ের জন্য এক তলা বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে রাখা হত।[৪] এইরকম বারোটি কক্ষের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মূলত পুরুষ বন্দীরা এই কক্ষগুলিতে থাকতেন। কক্ষগুলি মূল ভবনের পূর্বদিকে অবস্থিত। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো এই বন্দীশালায় স্বতন্ত্র কিছু কক্ষ ছিল, যেখানে মহিলা বন্দীরা অবস্থান করতেন। কক্ষগুলি জেল অফিসের দক্ষিণপূর্ব দিকে অবস্থিত। এটাই ছিল ভারতের সর্বপ্রথম মহিলা বন্দী নিবাস যেখানে বিচারাধীন মহিলারা ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন।[৫]

সংশ্লিষ্ট বন্দী নিবাসে অবস্থানরত বন্দীদের যে তালিকা পাওয়া গেছে তা থেকে কিছু প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিবর্গের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল। তালিকায় লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজন—

পুরুষ	মহিলা
1. সুধী প্রধান	1. কমলা মুখোপাধ্যায়
2. ভূপেন দত্ত	2. লীলা নাগ
3. ক্ষীতিশ দত্ত	3. বিমলা প্রতিভাদেবী
4. আব্দুল হালিম	4. রেণু সেন
5. বনবিহারী দাস	5. বনলতা দাশগুপ্ত
6. অমর কানুন গো	6. কমলা দাশগুপ্ত

এই রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে অনেকেই চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তারা অনেকেই মার্কসীয় মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত হন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—সুধী প্রধান ও ভূপেন দত্ত।

১৯৩১ এর ডিসেম্বর মাসে শান্তি ও সুনীতির মত দুজন কিশোরী কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট কে হত্যা করার পর ব্রিটিশ সরকার সন্দেহভাজন নারীদের গ্রেপ্তার করতে উদ্যোগী হলেন। সেই উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে ঐ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে এবং ১৯৩২ এর জানুয়ারীতে ঢাকার লীলা নাগ, বেনু সেন, প্রতিভা দেবী, কমলা মুখোপাধ্যায়কে বন্দী করে, এই বন্দীনিবাসে নিয়ে আসা হয়। কমলা মুখোপাধ্যায়ের **স্মৃতিচারণ** থেকে জানা যায় তিনি তাঁকে চট্টগ্রাম আস্ত্রাগার লুণ্ঠনে জড়িত ছিলেন, এই সন্দেহে গ্রেপ্তার করে এই বন্দীনিবাসে নিয়ে আসা হয়। তিনি আরো জানাচ্ছেন যে জেলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল; স্বাস্থ্যরক্ষার ন্যূনতম বিধি বন্দোবস্ত ছিল না। এখানে হিন্দু মহিলাদের পাশাপাশি মুসলীম মহিলারাও ছিলেন। তিনিই তাঁর **স্মৃতিচারণায়** সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন যে মাতঙ্গিনী হাজরাও এই বন্দী শিবিরে ছিলেন।[৮]

হিজলী বন্দী নিবাসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে লাডলী মোহন রায় চৌধুরী কিছু উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এখানে ঠিক জেল খানার কঠোরতা ছিল না। বন্দীদের 'আপেক্ষিক সচলতা' অনেক বেশী ছিল। খেলাধূলা, উৎসব, অনুষ্ঠান, রাত্রিদশটা পর্যন্ত শিবিরের নিকটবর্তী মাঠে ঘোরা এবং সংবাদপত্র পাঠের অনুমতিও ছিল। লেখক জনৈক বন্দীর (প্রফুল্ল গুপ্ত যিনি সামুগুপ্ত নামে সমধিক পরিচিত হতেন) সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।[৮] তবে লেখক উল্লেখ করেছেন যে অত্যাচার নিপীড়ন একেবারে ছিল না, এমন বললে সত্যের অপলাপ কবা হবে। কারাই হোক বা বন্দীশিবির হোক সবই একই মুদ্রার দুটি দিক। সবই ছিল উদ্ধত ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের প্রতীক।

(২)

১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ কর্তৃত্বের প্রতিনিধি মিঃ মার্শালের হাতেই তা ঘটল। কর্তৃপক্ষ নিরীহ বন্দীদের উপর গুলি চালালে তারকেশ্বর সেনগুপ্ত (১৫ April ১৯০৫-১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১) এবং সন্তোষ মিত্র (১৫ আগস্ট ১৯০০-১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১) ঘটনাস্থলে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন। বন্দী গোবিন্দ পদ দত্তের বাঁ হাত কেটে ফেলতে হয়। আরও কুড়ি জন গুরুতর রূপে আহত হলেন।[৮] এ ছিল এক 'সংগঠিত নৃশংস হত্যাকান্ড' একমাত্র জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের সঙ্গে তুলনা করা চলে। সম্ভবতঃ ঔপনিবেশিক কারাকাঠামোয় এটাই ছিল সর্বপ্রথম ঘটনা যেখানে কর্তৃপক্ষ সেই 'সংগঠিত হত্যাকান্ড' চালিয়ে ছিল। এই হত্যাকান্ডের প্রেক্ষিত নির্মিত হয়েছিল শিবিরের বাইরে। নীরদ রঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর এক লেখায় জানিয়েছেন যে কলকাতায় ইউরোপীয় বণিক সভার সভাপতি গার্লিক এর হত্যা পুলিশ ইনপেক্টর মার্শালকে উত্তেজিত করে এবং তার ভয়ে দিশেহারা হয়ে তিনি হিজলী বন্দী নিবাসের বন্দীদের উপর গুলি বর্ষণের প্ররোচনা দেন।[৮] শ্রী দাশগুপ্তের মতো নারায়ণ মান্নাও তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে হিজলী

বন্দীনিবাসে গুলি চালানোর এক বৃহত্তর প্রেক্ষিত খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে দীনেশ গুপ্তের বিচারক তাঁকে ফাঁসির আদেশ দিলে আলিপুর কোর্টে বিচাররত অবস্থায় গুপ্তঘাতকের গুলিতে তিনি মারা যান (২৭শে জুলাই ১৯৩১)। এই খবর বন্দী শিবিরে এসে পৌঁছালে বন্দীরা খুব আনন্দিত হয়ে শিবিরের কেন্দ্রীয় মিনারটিকে আলোক মালায় সজ্জিত করেন। বন্দীদের এই আচরণ পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেল মার্শালকে গুলি বর্ষণে প্ররোচিত করে।[১০] শ্যামাপদ ভৌমিকও এই নারকীয় হত্যাকান্ডকে সেই বৃহত্তর প্রেক্ষিত থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে ১৯৩১ এ পেডি সাহেবের হত্যা বাংলার আমলাদের মনে ভীতির সঞ্চার ঘটায় এবং তাঁদের মনোবল প্রায় ভেঙ্গে যায়। স্বরাষ্ট্র সদস্য এমার্সন এবং পুলিশের কর্তা উইলিয়ামসন তা স্বীকার করেছেন। হিজলী বন্দী শিবিরের গুলি চালনা ছিল সেই প্রতিহিংসার প্রবৃত্তির নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। সুধী প্রধান অবশ্য এই ঘটনার অন্য একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে মিঃ মার্শাল ছিলেন এক ইঙ্গ ভারতীয়। তাঁর কিছু অনুরক্ত সিপাহী ছিল। এদের সঙ্গে বন্দীদের প্রায়ই কিছু বিষয় নিয়ে বিরোধিতা হয়। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে ধ্বস্তাধস্তিও হয়েছে। অবস্থা এমন জটিল হয় যে ক্যাম্পের অধিনায়ক ই বি এইচ বেকার এর কাছে দাবী করা হয় যে মিঃ মার্শাল যেন কিছুতেই ক্যাম্পের মধ্যে না ঢোকেন। মিঃ বেকার সেই দাবী মেনে নেন। তাঁর মতে হিজলী ক্যাম্পের গুলি চালানোর প্রধান কারণ হচ্ছে এই বিরোধ।[১১] গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাঁর পর্যালোচনায় বিরোধের উৎস এবং গুলি চালানোর জন্য বন্দী স্থানান্তরের বিষয়টিকে চিহ্নিত করেছেন। পাশাপাশি তিনি বন্দী শিবিরের কিছু আভ্যন্তরীণ বিষয়কেও এই বিরোধের উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১২]

১৯৩১ এর ১৬ সেপ্টেম্বর ঐ নারকীয় ঘটনা ঘটে। পঞ্চাশ জন বন্দুকধারী পুলিশ এবং পঁচিশ জন লাঠি ও বেটনধারী সিপাহী বন্দীদের ব্যারাকগুলি ঘিরে ফেলে এবং একশ রাউন্ড গুলি চালায়। রাতে ৯.৩০ মিঃ (বুধবার) বন্দীরা শুনলো হিন্দুস্থানী পুলিশের গলার আওয়াজ 'শালা লোগকো মারো'। রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গেছে পুলিশের গলার আওয়াজ। বন্দীরা হতচকিত হয়ে পড়ে। তারা বিষয়টিকে বোঝার জন্য, কক্ষ ছেড়ে বাইরে আসে। সন্তোষ মিত্র নামে জনৈক বন্দী জেলের ভেতর হাসপাতাল বাড়ীর এক তলায় দাঁড়িয়ে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করছিলেন। আচমকা দুটি গুলি এসে তাঁকে আঘাত করে এবং জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। অসুস্থ তারকেশ্বর সেনগুপ্ত পূর্বসূরীর মতো বারান্দায় এসে ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করছিলেন। সহসা ছুটে আসা গুলি তারও জীবন কেড়ে নেয়। এইভাবে ঔপনিবেশিক আমলে বিনা প্ররোচনায় বন্দী নিবাসে গুলি চালিয়ে কর্তৃপক্ষ নিজেদের শ্রেণী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটালো। ঔপনিবেশিক শাসন যে কতটা দমনমূলক, নিপীড়নকারী তার প্রমাণ পুনরায় পাওয়া গেল।

বন্দী শিবিরের ১৬ই সেপ্টেম্বরের এই ঘটনা অভিনব পদ্ধতিতে আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে পৌঁছালো। বরিশালের দুই রাজবন্দীর (কালি বিলাস ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য্য) বিধবা মা এসেছিলেন ঘটনার পরের দিন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এর জন্য। বন্দীরা তাঁর হাতে দুই শহীদের স্কেচ (অঙ্কিত চিত্র) এবং একটি প্রতিবেদন সুরেশ চন্দ্র

মজুমদারের নিকট প্রেরণ করলেন, শ্রী মজুমদার আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ সংস্করণে সেই নারকীয় ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ প্রকাশ করলেন। এটা প্রকাশিত হওয়ার পরই সারা ভারতব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা, ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল। জাতীয়তাবাদী কমিউনিস্ট নেতারা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ। ঘটনার দশদিন পরে প্রায় লক্ষাধিকজন সমক্ষে বাঙ্গালী জাতির প্রতিভূরূপে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য মুদ্রিত করে পাঠ করেন। কবি মনুষ্যত্বহীন রাষ্ট্রনীতির অবশ্যম্ভাবী জীর্ণতার ও অবলুপ্তির কথা বলে লিখলেন ঃ "যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের অন্যায় প্রতিকারের আসা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর সেই সব শাসনকর্তা এবং তাঁদেরই কুটুম্বদের শ্রেয় বুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তিজীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।"[১০] আর্তমানবতার অতন্দ্র প্রহরী রবীন্দ্রনাথ সে দিন প্রতিবাদ না করে পারেননি। সত্তর বৎসরের কবি ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই প্রতিবাদ সভায় এলেন, এসে বললেন যে এত বড় জনসভায় যোগদান দেওয়া তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক, তথাপি ডাক যখন পড়ল তিনি না এসে থাকতে পারলেন না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতকের নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে। কবি সেই ঘটনাকে স্মরণ করে 'প্রশ্ন' কবিতাটি রচনা করেছিলেন। আপোষহীন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের প্রাদেশিক সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। শহীদদের মৃতদেহ গ্রহণ করার জন্য তিনি কলকাতা থেকে হিজলী এলেন যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে দেশবাসীর প্রতি এক লেখায় জানালেন যে—'তিনি হিজলী থেকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা নিয়ে ফিরেছেন। যখন তাঁদের বন্ধুরা জন্তুর ন্যায় ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দীশালার অভ্যন্তরে গুলি খেয়ে মৃত্যুবরণ করছেন, তখন তো মতাদর্শগত সংঘাতে না গিয়ে গণশত্রুর বিরুদ্ধে সংযুক্ত বৃহত্তর সংগ্রাম করা উচিত।'[১১]

খড়্গপুরের রেল শ্রমিক নেতা গডবোলে খড়্গপুরের শ্রমিক কর্মচারীদের সাহায্যে শবদেহ দুটি কলকাতায় প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। তিনি কফিনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ ট্রেনের দুটি কামরা সংরক্ষিত করার ব্যবস্থাও করেন। বন্দী নিবাসে আহত ও নিহতদের প্রতি রেল শ্রমিকরা এবং হাসপাতালের কর্মীরা যেভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন তা উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রশংসনীয়।[১২]

বিমূঢ় জহরলাল নেহেরু বললেন, এই ঘটনা 'unchivalrous and impardonable', দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র নাথ শাসমল বলেন 'আমি জিজ্ঞাসা করি যদি মাননীয় স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন মহাশয় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী রূপে অধিষ্ঠিত থাকতেন এবং কোন ব্রিটিশ জেলে এইরূপ একটি ঘটনা ঘটত এবং তিনি প্রশান্ত চিত্তে ডাউনিং স্ট্রীটে বা ওয়েস্ট মিনিস্টারে ঘুরে বেড়াতেন, তাহলে আমার বিশ্বাস ইংল্যান্ডের জনতা তাঁর দেহ খন্ড বিখন্ড করে ফেলতো।'

বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতেও এই মর্মান্তিক ঘটনার নিন্দা করা হয়। 'প্রবাসী' সম্পাদক মন্তব্য করেন—ফৌজদারী আইনে সিপাইদের বিচার হওয়া উচিত। ১৯৩১ এর ২৮শে সেপ্টেম্বর 'নায়ক' পত্রিকায় 'হিজলীতে নৃশংস কান্ড' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। এতে হিজলীর ঘটনা পুঙ্খনাপুঙ্খ ভাবে বর্ণিত ছিল ও তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছিল এবং যথাযোগ্য তদন্তের দাবী করা হয়েছিল।[১৬]

জনমতের চাপে ব্রিটিশ সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়। এই কমিটির সদস্য ছিলেন বিচারপতি মল্লিক এবং রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ ড্রামন্ড, আর.এস.পল, এবং স্টুয়ার্ট হিল। "P & G 0033/31–10th Dcc" প্রতিবেদনে বলা হল যে বন্দীরা নিজেরাই উত্তেজনা ছড়ায়, ফলে এই ঘটনা ঘটে। আরও বলা হল যে গুলি চলেছিল মাত্র ২৯ রাউন্ড। ময়না তদন্তের রিপোর্টে বলা হল যে মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে, সিপাহীদের বর্ণিত ব্যক্তিদের কোন মিল ছিল না।

আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল যে বন্দীরা মশারির ডান্ডা নিয়ে আক্রমণ করায় প্রহরীদের ধৈর্য্যহারাবার ফলে এই ঘটনা ঘটে।[১৭]

প্রতিবেদনটির সুপারিশ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। সরকারের মনে হয়েছিল যে প্রতিবেদনটি ছিল পক্ষপাতদুষ্ট। মেদিনীপুরের জেলা শাসক ডগলাস এই হত্যাকান্ড সম্বন্ধে যে প্রতিবেদন পেশ করেন, (১৭ই সেপ্টেম্বর ২১শে সেপ্টেম্বর) তাতে সিপাহীদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি।

মেদিনীপুরের বিপ্লবী যুবকেরা ডগলাসের এই আচরণকে ক্ষমা করতে পারেননি। তারা ডগলাসকে উচিত শিক্ষাদানের এক খসড়া তৈরী করেন। সেই খসড়ায় মূল বিষয় ছিল তাঁর মৃত্যুবিধান করা। এটাই ছিল হিজলীর বন্দী শিবিরের নিরপরাধ বন্দীদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালনার যোগ্য জবাব। বিপ্লবীরা (প্রদ্যোত ভট্টাচার্য্য ও প্রভাংশু পাল) ১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল জেলা বোর্ডের সাধারণ অধিবেশন চলাকালীন হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করে গুলি করে সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন হত্যালীলার বদলা নিলেন।

পরবর্তী সময়ে ধৃত প্রদ্যোতের পকেট থেকে পাওয়া যায় একটি কাগজে লেখা কয়েকটি ছত্র—

> –"Feeble protest against Hijli wrongs'
> Let their deaths open the eyes of the
> Britons
> Let our self sacrifice awaken India
> Bandemataram"[১৮]

(৩)

এটা পরিষ্কার যে বাংলার ঔপনিবেশিক প্রজাদের কাছে হিজলী বন্দী শিবির কঠোর শাসন এবং নৃশংসতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিশেষত ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় আমরা দেখি যে জনরোষ কী প্রচন্ডতায় সাম্রাজ্যবাদী শাসকের

প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গগুলির উপর বর্ষিত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী মননে তাই হিজলী বন্দী শিবির ব্রিটিশ কুশাসনে বিধ্বস্ত মানবিকতা এবং নৃশংস শোষণের প্রাতিষ্ঠানিক স্বরূপ হিসেবে দুঃস্বপ্নের স্মৃতি হিসেবে জাগরূপ ছিল। এই বন্দী শিবিরের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের প্রতিটি আঘাত তাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে।

সূত্রনির্দেশ

১। **Discipline and Punish–The Birth of the Prison,** লন্ডন ১৯৭৭; **Madness and civilization–A History of insonit gin the Age of Reason,** লন্ডন, 1959, **Power/Knowledge : selected Interview and other writing, 1972-1977,** ১৯৮০

২। নারায়ণ মান্না—হিজলী হত্যাকাণ্ড ও সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের একটি কলঙ্কিত অধ্যায়, **'মেদিনীপুর সমাচার'**

৩। S.T.H Abidi and others, Past and Present of I.I.T Kharagpur Changing Profile of Hijli. খড়্গপুর, জানুয়ারী, ১৯৯৬

৪। **Nehru Museum of Science and Technology, Indian Institude of Technology Khargpur. A commemorative Issue,** সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

৫। ঐ— (কৃ-ত)

৬। ঐ—কমলা মুখোপাধ্যায়, 'হিজলী নারী জেলে পাঁচ বৎসর—কিছু স্মৃতি' (পৃষ্ঠা ৯)

৭। লাডলী মোহন রায় চৌধুরী, 'আন্দামান হিজলী ও মান্দালয়' (**দেশ**, ১৯ অগাস্ট ১৯৮৯)

৮। শ্যামাপদ ভৌমিক, **খড়গপুর ঃ ইতিহাস সংস্কৃতি,** (পৃষ্ঠা ৫৭)

৯। নীরদ রঞ্জন দাশগুপ্ত, **'প্রবাসী'** ৩১ ভাগ, ১৩৩৮

১০। নারায়ণ মান্না, **পূর্বোক্ত**

১১। সুধী প্রধান '১৯৩১ সালে হিজলী বন্দী শিবিরে গুলি চালনা করা'—৭এর পাদটীকা।

১২। গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, **স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (পৃষ্ঠা ৮৮)**

১৩। **কালান্তর**, হিজলী ও চট্টগ্রাম, ১৯৬১ সা.

১৪। **Nehru Museum of Science and Technology,** I.I.T. Kharagpur, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৫।

১৫। তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, **স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর**

১৬। ঐ

১৭। P&G .033 / 31 – 10th Dec.

১৮। তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। **স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর।**

বিভাগপূর্ব বাংলার রাজনীতি এবং মুসলিম লীগ জাতীয় রক্ষীবাহিনী, ১৯৩৭—১৯৪৭

বিশ্বরূপ ঘোষ

সাম্প্রতিক কালে বাংলার জাতীয় আন্দোলন, মুসলিম রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে; কিন্তু কোথাও মুসলিম লীগ জাতীয় রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা হয়নি। অথচ এ কথা অনস্বীকার্য যে এই সংগঠনটিকে বাদ দিয়ে বিভাগপূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগ বা মুসলিমদের ভূমিকা যথার্থরূপে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। ১৯৩৭ সালে এর উৎপত্তি। পরবর্তী এক দশকে এর বৃদ্ধি ও বিকাশ। এমনকি ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের পরেও বেশ কিছু সময় সীমান্তের দুই পারেই এর সক্রিয়তা অব্যাহত থাকে।

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ এই দলের সাংগঠনিক শক্তিকে দৃঢ়তর করার জন্য একটি সুসংগঠিত কর্মীবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই মুসলিম স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের ব্যাপারে কংগ্রেস সেবাদল ও 'খুদা-ই-খিদমতগার' দের সংগঠন তথা কার্যকলাপ তাঁকে হয়তো বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

মুসলিম জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের কথা সর্বপ্রথম বলা হয় ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, লীগের লখনউ অধিবেশনে। সেখানে যারা স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করেছিল, তাদেরকে নিয়েই একটি সুসংবদ্ধ জঙ্গী সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্রতী হয়েছিলেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ এবং তাঁর পার্শ্বচরেরা।[১] এই কাজে যে তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সম্পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

এরপর অক্টোবর মাসে বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে নিখিল-বঙ্গ মুসলিম লীগ অধিবেশনে জনৈক ফজলুল হক বার্ক্‌লের নেতৃত্বে প্রায় একশত মুসলিম যুবক জিন্নাহ্‌কে গার্ড অব অনার প্রদর্শন করে। এই ঘটনায় প্রীত ও সন্তুষ্ট জিন্নাহ্, হক সাহেবকে এইসব যুবকদের নিয়ে বাংলা তথা ভারতব্যাপী একটি মুসলিম স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ক'রতে বলেন, যাতে ভবিষ্যতে তারা ভারতীয় মুসলিমদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে কাজ করতে সক্ষম হয়।

মুসলিম লীগ নেতৃবর্গ তাঁদের দলীয় সংবাদপত্র তথা বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে এই আন্দোলনকে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। লীগের মুখপত্রগুলিতে প্রকাশিত বিভিন্ন চিঠি ও সংবাদে এই তথ্য পাওয়া যায়। মুসলিম লীগ

নেতৃবর্গ বলেন যে চোদ্দ বৎসরের উর্ধ্বে সকল মুসলমানেরই উচিৎ এই রক্ষীদলে যোগদান করা। বিশেষ ক'রে তরুণ ও যুবকদের তাঁরা এই সংগঠনে যোগদান করতে আহ্বান জানান।[২]

এই রক্ষীবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের, মুসলিম লীগ আয়োজিত বিভিন্ন সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠানে তথা মিছিল, মিটিং, র‍্যালী, অধিবেশনে শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্বে থাকতে দেখা যেত। আবার ঈদ, মহরম, মিলাদ প্রভৃতি উৎসবে, মুসলিম ছাত্র লীগের অধিবেশনে, প্যালেস্টাইন দিবস বিক্ষোভে, বা কোনো বিশিষ্ট লীগ নেতার সফরকালে এরা স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন ক'রতো। এছাড়াও বাংলার সদ্যোগঠিত প্রজা-লীগ সরকারের সমর্থনে জনসভার আয়োজন, জনমত গঠন তথা হিন্দুপ্রধান কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অপপ্রচার এদের কার্যকলাপের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।[৩]

তৎকালীন পুলিশ রিপোর্টগুলিতে দেখা যায় যে লীগের প্রাদেশিক তথা সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ এইসময় থেকেই সারা বাংলায় বিশেষ ক'রে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে রাজনৈতিক প্রচারে আসেন এবং বিভিন্ন জেলাভিত্তিক এই রক্ষী বাহিনী গড়ে তোলার কথা বলেন। এই সময়েই সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে বিভিন্ন জেলায় নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই বাহিনী গঠনের কাজ চলতে থাকে। স্বরাষ্ট্র বিভাগকে দেওয়া এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঢাকা, পাবনা, খুলনা, নদীয়া এবং জলপাইগুড়ি জেলায় এই সাংগঠনের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার এই সময় থেকেই এই বাহিনী তাদের নিজস্ব পোষাক বা উর্দি সহকারে ড্রিল ও প্যারেড করা শুরু করে। বিশেষতঃ ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে জিন্নার কলকাতায় আগমনের সময় এবং এরপর মুসলিম লীগের কলকাতা অধিবেশনকালে, শহরে ও শহরতলিতে এদের সক্রিয়তা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৪]

কলকাতার বিশেষ কিছু অঞ্চলে, যেমন ব্রাউনফিল্ড্ পার্ক, ইস্টার্ন পার্ক, মহম্মদ আলি পার্ক ও মির্জাপুর পার্কে, এদের নিয়মিত দেখা যেত ড্রিল ও প্যারেড করতে। পুলিশ বা মিলিটারীর মতো খাকী বা সবুজ উর্দিতে এদের দেখা যেত এবং তা স্বরাষ্ট্র বিভাগের চিন্তার কারণও হয়েছিল। লীগ নেতৃত্ব এই সংগঠনটিকে একটি আধাসামরিক বাহিনী রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যাতে 'প্রয়োজনে' এদের কাজে লাগানো যায়। ১৯৩৮ সাল থেকেই অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে এদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৫]

এই সংগঠনটির মূল লক্ষ্য ছিল ইস্‌লামিক রীতিনীতি ও নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে এর সদস্যদের তথা সমগ্র মুসলিম সমাজের, বিশেষতঃ যুবশক্তির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক উন্নতিসাধন; তাছাড়া মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়সাধন করাও ছিল তাদের কর্তব্য, যাতে তারা 'শত্রুর' বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম ক'রতে পারে। এদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের ত্যাগ ও সেবার আদর্শের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে উদ্দীপ্ত করা এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ক'রে লীগের পতাকাতলে জড়ো করা। সেই সঙ্গে কংগ্রেস দ্বারা ঘোষিত 'মুসলিম গণসংযোগ পরিকল্পনার' বিরোধিতা করা ও নানা অপপ্রচারের মাধ্যমে তা ব্যর্থ করে দেওয়াই তাদের প্রধান কাজ ছিল।[৬]

মুসলিম লীগ নেতৃত্ব বুঝেছিল যে দলের সার্বিক উন্নতির জন্য একটি সংগঠিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুসলিম রক্ষীবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বাহিনী শুধু দলীয় স্বার্থই রক্ষা ক'রবে না, সেই সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকারও সুরক্ষিত ক'রবে। তাই সারা দেশজুড়েই এই সংঘঠনটিকে গড়ে তোলা হয় যাতে ভবিষ্যতে একটি মুসলিম মিলিশিয়া বা সমরবাহিনী রূপেও এটি দরকার মতো প্রস্তুত হ'তে ও কাজ ক'রতে পারে।[৮]

এই রক্ষীদলের সংবিধান অনুযায়ী এটি গঠিত হয়েছিল প্রধানতঃ তিনটি বিভাগে—(১) সক্রিয় বাহিনী (২) সংরক্ষিত বাহিনী ও (৩) কিশোর বাহিনী। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে একটি নারী বাহিনী ও একটি চিকিৎসাদল ও যুক্ত হয়েছিল। এই জাতীয় রক্ষীদল মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কাজ করলেও, এর সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারক সংস্থা ছিল 'মজলিস এ-আলা' (কর্মসমিতি) যা একজন 'সালার-এ-আলা' (সর্বাধিনায়ক) এবং চারজন 'নাজিম' (সহকারী) দ্বারা গঠিত হ'ত। এরা সকলেই লীগ সভাপতির অনুমোদনক্রমে নিযুক্ত হ'তেন।

প্রাদেশিক স্তরে এই বাহিনীর কার্যকারী বোর্ডের নাম ছিল 'সুবা-মজলিস'। এর সদস্য ছিল 'সালার-এ-সুবা' (প্রাদেশিক প্রধান) ও অন্য পাঁচজন মনোনীত ব্যক্তি। জেলাস্তরেব কমিটিগুলি প্রাদেশিক কমিটির অধীনে কাজ করত এবং শহর ও স্থানীয় শাখাগুলিও 'সালার-এ-সুবা' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত। জেলা ও শহরকমিটিগুলির নেতৃত্বে থাকত একজন 'সর্দার'। এই স্তরে সমস্ত পদাধিকারী প্রাদেশিক প্রধান কর্তৃক নিযুক্ত হ'লেও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের পছন্দ অপছন্দের উপর অনেকাংশেই এই নিয়োগ নির্ভর ক'রত। বিশেষ ক'রে তা ছিল প্রদেশ লীগ সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষ।

এই সংগঠনের নিম্নতম একককে বলা হ'ত 'দস্তা' যা ন্যূনতম দশজন মুসলিম ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হ'ত। এদের নেতা ছিল 'সাহিব-দস্তা'। কয়েকটি দস্তা নিয়ে যে বাহিনী গড়ে উঠত তার নেতৃত্বে থাকত একজন 'য়বর' এবং দু'জন 'য়বর'-এর উপরে থাকত একজন অধিনায়ক বা 'ক্যাপটেন'। এদের উপরে ছিল জেলা-প্রধান এবং শহর-প্রধানেরা—যাদের বলা হ'ত 'সর্দার'। এরা সুবা-মজলিসের তত্ত্বাবধানে কাজ করত। এই মুসলিম রক্ষীবাহিনীর পোষাকে ইংরাজীতে পেতলের এম, এন,জি অক্ষরগুলি লেখা থাকত। অফিসারদের কাঁধে তারকাচিহ্ন, চাঁদ-তারা, বা ক্রস্ড়্-সোর্ড চিহ্ন থাকত যার দ্বারা কোনো বিশেষ ব্যক্তির পদমর্যাদা ও গুরুত্ব জনসমক্ষে প্রকাশিত হ'ত।[৮]

মুসলিম জাতীয় রক্ষীবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের ১৯৪০ সালের পরবর্তী সময়ে প্রধান কাজ ছিল মুসলিম লীগের ভাবধারা রক্ষা করা, কংগ্রেসের বিরোধিতা, নির্বাচনের আগে লীগ-প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার চালানো এবং মুসলিম জনসাধারণের কাছে পাকিস্তানের মতাদর্শকে সঠিকবাবে তুলে ধরা। এজন্য এরা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বহু সভা, সমাবেশ, মিছিল, র‍্যালী প্রভৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানের সমর্থনে মুসলিম জনমত গঠন করার প্রচেষ্টা ক'রত এবং এই কাজে তারা যথেষ্ট সাফল্যলাভও করেছিল।

বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত মুসলিম লীগের শাখা সংগঠনগুলির সহয়তায় এই

স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগ করা হ'ত। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ এই সময়কালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে—শহর, শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলে মুসলিম জাতীয় রক্ষীবাহিনীর প্রসার ঘটে। প্রথমে এদের প্রধান কার্যালয় ছিল ওয়েলেসলী স্ট্রীটে। পরে তা টেরিটিবাজার স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। এই বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকেরা নিয়মিত ছিল ড্রিল, মার্চ ও প্যারেড করা ছাড়াও ছোরা ও লাঠিখেলায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত। বিভিন্ন জেলা থেকে বাছাই করা লোক পাঠানো হ'ত কলকাতায় এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ ক'রতে। এরা আবার ফিরে গিয়ে গ্রাম বাংলার সরল মুসলিম জনসাধারণেব মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাতো। বিশেষ ক'রে ১৯৪৬-৪৭ সালের সংকটময় পরিস্থিতিতে এদের কার্যকলাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৮]

১৯৪৬ সালে, সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই রক্ষীবাহিনীর সংবিধানে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভা মজলিস-এ-আলার পরিবর্তে সর্বোচ্চ পদাধিকারী রূপে সালার-এ-আলা ও তার সহকারী রূপে নায়েব সালার-এ-আলা এই সংগঠনের প্রধান ও উপপ্রধান নিযুক্ত হয়। অনুরূপভাবে প্রাদেশিক স্তরেও সুবা-এ-মজলিসের স্তলে সালার-এ-সুবা ও নায়ের সালার-এ-সুবার হাতে প্রাদেশিক মুসলিম রক্ষীবাহিনীর দায়িত্বভার অর্পিত হয়।

সালার-এ-সুবা নিজ পদাধিকারবলে জেলাস্তরের প্রধান, উপপ্রধান এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের নিয়োগ ক'রতো। নতুন সংবিধান অনুসারে 'সাহিব-দস্তা', 'য়বর', 'ক্যাপ্‌টেন' এবং 'সর্দার' পদগুলি যথাক্রমে 'সর-দস্তা', 'সর-গিরোহ্' 'সর-খেইল' এবং 'সালার-এ-জিলা' বা 'সালার-এ-শহর' এই নতুন নামে পরিচিত হয়েছিল।[১০]

কোনো সংকটের সময় এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী অত্যধিক সক্রিয় হয়ে উঠত। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা সংঘর্ষের সময় এই দল বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করত। অনেক সময় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের কাছে এই রক্ষীদল এক সমস্যা বলে গণ্য হ'ত। ১৬ই অগাস্ট ১৯৪৬'এর গোলযোগের আগে দীর্ঘ এক মাস ধরে মুসলিম জাতীয় রক্ষীবাহিনীর নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সভা-সমিতির আয়োজন ক'রে এবং বিভিন্ন প্রচারপত্রের মাধ্যমে মুসলিম জনসাধারণকে বিশেষতঃ যুবকদের এই বাহিনীতে যোগদান করার আবেদন জানায় এবং জেলায় জেলায় এই বাহিনীব প্রশিক্ষণ শিবির খুলে মুসলিমদের জঙ্গী প্রশিক্ষণ দানের আহ্বান জানানো হয়।[১১]

একটি গোপন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে কলকাতার দাঙ্গার অব্যবহিত পূর্বে (১৩.৮.৪৬) মুসলিম লীগ তথা মুসলিম জাতীয় রক্ষীবাহিনীর নেতৃস্থানীয় খবাজা নুরুদ্দীন কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম ব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে অনুদান স্বরূপ নগদ বাইশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এই ব্যবসায়ীরা মুসলিম লীগ তথা মুসলিম জাতীয় রক্ষীবাহিনীর প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ সহায়তাদানের আশ্বাস দেয়।[১২] এই অর্থ কোথায় কিভাবে ব্যয়িত হয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এছাড়াও তৎকালীন পুলিশ রিপোর্টে দেখা যায় যে বহু দুষ্কৃতী ও অপরাধী সেই দুঃসময়ে এই সংগঠনে যোগদান ক'রেছে এবং ঘৃণ্য অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে

পড়েছে। অন্য একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে বেশ কয়েকটি শাখা সংগঠন তাদের প্রধান কার্যালয়ে মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র, পিস্তল, রাইফেল, শিরস্ত্রাণ, ছোরাছুরি, লাঠি প্রভৃতির সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিল।[10] এর থেকে বোঝা যায় একটি রাজনৈতিক সংগঠন কিভাবে ধীরে ধীরে সমাজবিরোধী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছিল।

এই সময়েই লীগ নেতৃবৃন্দ তথা মুসলিম জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সংগঠকেরা মুসলিম জনসাধারণের কাছেও 'বলপূর্বক পাকিস্তান গঠনের' আবেদন জানিয়ে, ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে চলেছিল। এর সঙ্গে ছিল কংগ্রেসের 'মুসলিম-বিরোধী নীতি' ও 'হিন্দুপ্রেমী' চরিত্র নিয়ে নানারকম কুৎসা রটনা ও অপপ্রচার। গোপন রিপোর্টে দেখা যায় যে এই রক্ষীবাহিনীর অভ্যন্তরেই একটি গুপ্ত দল গঠন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা।[11]

১৯৪৬ সালের অক্টোবরে নোয়াখালি ও কুমিল্লায় দাঙ্গা ও গণহত্যার পর মহাত্মা গান্ধী যখন সেখানে শান্তির বার্তা বহন ক'রে স্বাভাবিক জনজীবন ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা করছিলেন, তখন এই মুসলিম জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কর্মীরা গান্ধীজীকে ইসলামের শত্রু ব'লে বর্ণনা ক'রে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। তারা সাধারণ মুসলিমদের কাছে আবেদন করে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা বয়কট করার জন্য।[12] এছাড়া জাতীয়তাবাদী মুসলিমদেরও সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং এই হীন কাজে এরা বহুলাংশে সাফল্যলাভ করেছিল।

১৯৪৬-৪৭ সালের এই অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে ও জঙ্গী মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে বিভিন্ন জেলা কমিটিগুলি কলকাতার প্রাদেশিক প্রধান কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের জন্য তাদের বাছাই করা কর্মীদের প্রেরণ করত। এরা ড্রিল, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণগ্রহণ ক'রে নিজ নিজ জেলায় ফিরে যেত। এ সবই করা হ'ত; যাতে এইসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা তাদের নিজেদের অঞ্চলের মুসলিম যুবকদের সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয় এবং অনুরূপ প্রশিক্ষণদান করতে পারে।[13]

বিহারের দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ডের পর বাংলার মুসলিম জাতীয় রক্ষীবাহিনী বিহারের ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিমদের জন্য চিকিৎসাদল ও অর্থসাহায্য পাঠায়। তাছাড়া এইসব গোলযোগের জন্য 'হিন্দু' কংগ্রেসকে দায়ী ক'রে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে জোর প্রচার চালায় তারা। লীগ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিও এ ব্যাপারে তাদের পূর্ণ সহায়তা করেছিল।[14] স্বাধীনতা ও বাংলা বিভাজনের পরে, পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘুদের পীড়ন ও বিতাড়নেও মুসলিম লীগ জাতীয় রক্ষীবাহিনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই নানাবিধ অপরাধমূলক কাজকর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী মনোভাবের জন্য এই সংগঠনটিকে ভারতে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। এর বহু নেতা ও কর্মী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। অনেকেই নূতন ভারতীয়

ইউনিয়নের প্রতি তথা কংগ্রেস দলের প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ততা জানিয়ে জাতীয় স্রোতের মূল ধারায় মিশে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এর পরেও বেশ কিছুকাল তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার এই সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করার পর রাষ্ট্রীয় দমনমূলক নীতির ফলে এপার বাংলায় এই দলের শেষ দিন ঘনিয়ে আসে।[১৮]

সূত্রনির্দেশ

১। নথি সং ২৮।৫।৪৭ রাষ্ট্রীয় অভিলেখাগার।

২। স্টার অব ইন্ডিয়া, তাং ১০।১১। ৩৭ ও ২৪।১১।৩৭।

৩। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা মেমো নং ৪০।এম.এ।৪০ ও বিশেষ শাখা নথি সং ৫১৮-৩৮।

৪। পূর্বোল্লিখিত।

৫। নথি সং ১৩৭৮৯-৩৭ এবং ৫১৮-৩৮।

৬। নথি সং ২৮।২।৪৩ রাষ্ট্রীয় অভিলেখাগার।

৭। নথি সং ৫১৮-৪৭ এবং ২৮।২।৪৩।

৮। পূর্বোল্লিখিত।

৯। নথি সং ৫১৮-৩৮, ৪০, ৪৪, ৪৭।

১০। নথি সং ২৮। ৪। ৪৬ রাঃ অভিলেখাগার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্তা মেমো নং ২২। এম.এ. । ৪৬-২।

১১। উর্দু প্রচারপত্র ‘কৌমী জংগ্ কা তব্‌ল্‌বাজ আয়া’।

১২। নথি সং ৫১৮-৪৪।

১৩। গোয়েন্দা বিভাগ, দিল্লী, মেমো সং এম ও এইচ ডি ৭৫ তাং ১৬-১১-৪৬ রাঃ অভিলেখাগার ২৮।৫।৪৭।

১৪। নথি সং ৫১৮-৪৪, ৪৭।

১৫। নথি সং ৫১৮-৪৭।

১৬। আজাদ ২৯-১১-৪৬ এবং ১-২-৪৭

১৭। আজাদ ২০-১২-৪৬ এবং ২৭-১২-৪৬; মর্ণিং নিউজ, ৩-১-৪৭।

১৮। নথি সং ৬৩৪-৪৪; ৫১৮-৪৭।

ছিন্নমূল ছেলেবেলা ঃ বাংলায় দেশভাগ জনিত পরিস্থিতির একটি দিক।

ত্রিদিব সন্তপা কুণ্ডু

দেশভাগ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক গবেষণা সচরাচর যতটা তার কারণ অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করেছে, তার ফলাফল নিরূপণের ক্ষেত্রে ততটা আগ্রহ দেখায় নি।[১] অথচ একথা বলাই বাহুল্য যে দেশভাগের ফলাফল, বিশেষ করে বাংলা ও পাঞ্জাবের মতো দুটি বিভক্ত প্রদেশে ছিল অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। সম্প্রতি পাঞ্জাবে এ সম্পর্কে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে।[২] কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের কাজ বিশেষ হয়নি। অতি সম্প্রতি এ সম্পর্কে কিছু গবেষণা শুরু হয়েছে।[৩] এই প্রবন্ধে আমরা দেখাবার চেষ্টা করব মোটামুটিভাবে পনেরো বছরের কম বয়েসী উদ্বাস্তু পরিবারের ছোট ছেলেমেয়েদের জীবনে দেশভাগ কি অপরিসীম দুর্ভোগ বয়ে এনেছিল। সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের এই নিদারুণ অপচয়ের সমান্তরাল দৃষ্টান্ত মেলা ভার। তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে সমস্যাটিকে উপস্থাপিত করা হবে,—উৎখাত হওয়ার সময় দেশান্তর গমন কালে এবং পুনর্বাসনকালে ছোটদের সমস্যা ও দুর্ভোগ।

বাস্তুভিটে থেকে আকস্মিকভাবে উৎখাত হওয়া যে কোন উদ্বাস্তুর কাছেই ছিল নিদারুণ কষ্টের অভিজ্ঞতা। ছোটরাও এর বাইরে ছিলনা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয় তাদেব ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। দেশত্যাগের ব্যথা তাদেরও কোন অংশে কম ছিলনা। অভিজিৎ সেনের স্মৃতিচারণা থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায় ঃ ''আমাদের জেলায় (বরিশাল) কোথাও কোথাও তার আগে থেকেই দাঙ্গা হচ্ছিল। গুজব ও আতঙ্ক আমাদের বয়স্ক শিশুদেরও আচ্ছন্ন করে রাখতো, সেকথা এখনও মনে আছে।... আমরা যেদিন চলে আসি সেদিনটার কথাও আমার মনে আছে। মা-বাবা এবং জেঠামশাই-জেঠিমা, আমার থেকেও বয়সে যারা ছোট তাদের নিয়ে দেশেই থেকে গিয়েছিলেন। আমরা বার-তের জন কলকাতার পথে রওনা হয়েছিলাম। বৈঠকখানা ঘরটা পেরোবার আগে পর্যন্ত কলকাতা যাবার উত্তেজনায় অন্য কিছু খেয়াল হয়নি। ঘরটা আধা-আধি পেরোবার পর টের পেয়েছিলাম যে আর হাঁটতে পারছি না।''[৪] বাংলা সাহিত্যে এধরণের বহু বিবরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অর্জুন[৫] উপন্যাসে এগারো বছরের অর্জুনকে বেদনাসিক্ত হৃদয়ে সদ্যবিধবা মা ও মানসিক ভারসাম্যহীন দাদার সঙ্গে দেশত্যাগ করতে হয়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষবাষ্পে অর্জুনের স্কুলের পরিবেশও দূষিত হয়ে যায়। অর্জুনকে যা সবথেকে বেশী নাড়া দেয় তা হল তাদের ঘনিষ্ঠ এক প্রতিবেশিনী অমলাদির

নৃশংস হত্যাকাণ্ড যার ক্ষতবিক্ষত শরীর পাটক্ষেতে পাওয়া যায়। অর্জুন ঐ দৃশ্য নিজের চোখে না দেখলেও সারা জীবন ঐ ঘটনা ভুলতে পারেনি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের **নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে** উপন্যাসের সোনার কাছেও দেশভাগ-দেশত্যাগ এক নিদারুণ দুঃখের অনুভূতি বহন করে আনে। সোনা বার বার ভাবছে বড়রা শেষপর্যন্ত হয়তো তাদেব দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবে। কিন্তু তার ভাবনার সঙ্গে বাস্তবের ফারাক ছিল দুস্তর। একদিন সকালে উঠে সে দেখলো কিছু লোক তাদের ঘরগুলোর ওপরে উঠে টিনের স্ক্রুগুলো. টিনগুলো আলাদা করে রাখছে। সোনা বুঝতে পারলো আর কোন আশা নাই, তাদের চলে যাবার দিন এগিয়ে এসেছে। সারাদিন সে বিষণ্ন মনে একা একা ঘুরে বেড়াতে লাগলো বাড়িটার চারপাশে। বড়রা যখন জিনিস পত্র বিক্রি বাটোয়ারা করতে ব্যস্ত সোনা তখন তার প্রিয় অর্জুন গাছের গায়ে ধারালো ছুরি দিয়ে তাদের নতুন ঠিকানা খোদাই করে রাখে তার প্রিয় হারিয়ে যাওয়া পাগল জ্যাঠামশাই এর উদ্দেশ্যে ঃ জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি, ইতি সোনা।[৮] শঙ্খ ঘোষের **সুপুরিবনের সারি**[৯] উপন্যাসের কিশোর নায়ক নীলুর অভিজ্ঞতাও স্বজন হারানোর বেদনায় আপ্লুত। দেশছাড়ার ব্যথা শুধু বড়দের নয়, ছোটদের মনকেও প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বহু ছোট ছেলেমেয়েকে আরও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার হতে হয়, বিশেষ করে যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অনাথ হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতা অনেক শিশুর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়।

দেশত্যাগের পথেও ছোটদের অপরিসীম কষ্টের শিকার হতে হয়। পথের ধকলের সঙ্গে যুক্ত হয় অনাহার ও রোগের প্রাদুর্ভাব। রমেশচন্দ্র সেনের "পথের কাঁটা" গল্পের কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করা যায় ঃ

"আর কতটা পথ বাবা? যাদবের কণ্ঠে কাতর প্রশ্ন। স্বর পাখীর ছানার চিঁচিঁর মতন করুণ। এগারো-বার বছরের ছেলে, শ্যামবর্ণ, সরু সরু হাত পা। পেটটা বড়। চোখ কটা। হাঁটিয়া হাঁটিয়া পা ভারী হইয়াছে আর পারে না। কিছুটা চলিয়াই নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য দাঁড়ায়। বাপ অমনি ধমক দেয়, এই হারামজাদা হইছে পথের কাঁটা। চল চল।"

ঐ গল্পেই আমবা দেখি দেশান্তরের পথে বহু মানুষ কলেরায় মারা যায় যাদের মধ্যে অনেকেই শিশু। অনাহারে ক্লিষ্ট শিশুরা একমুঠো ভাতের জন্য ভীড় জমায় অপরিচিতদের উনুনের চারপাশে।

বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করে যে সমস্ত ছোট ছেলেমেয়েরা শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছায় তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে তাদের অবস্থার খুব বেশী উন্নতি হয়নি। অনাথ বা পরিবার-বিচ্ছিন্নরা সর্বাধিক দুর্ভোগের শিকার হয়। এদের কিছু সরকারী পি.এল.ক্যাম্প ও সরকারী বেসরকারী হোমগুলিতে পুনর্বাসন পায় যেখানে তাদের পরবর্তী জীবন অতিবাহিত হয় সীমাহীন অকর্মণ্যতায় ও লাঞ্ছনায়। নারায়ণ সান্যালের **বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প** উপন্যাসের খোকা চরিত্র এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে এদের অধিকাংশই ক্রমে নিজেদেব উদ্যোগে জীবিকার্জনের পথ বেছে নেয়।

পরিবারের ছত্রছায়ায় থাকা ছোটদের অবস্থা যে খুব একটা ভালো ছিল একথা বলা যাবেনা। ক্ষুধা ও অনাহার অধিকাংশের জীবনের নিত্যসঙ্গী ছিল। ক্ষুধার জ্বালায় অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে প্রাণ হারানোর ঘটনা ক্যাম্প ও কলোনীগুলিতে প্রায়শঃই ঘটতো। এই ধরণের একটি ঘটনা বর্ধমান শহরের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত উদয়পল্লী কলোনীতে ঘটে যেখানে সাবিত্রী দাস (১৪) এবং হরিমোহন দাস (১০) নামে একই পরিবারের দুই অল্পবয়সী সদস্যের মৃত্যু হয়।[৯] লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই ধরণের ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিকার হত ছোট ছেলেমেয়েরাই। দেশত্যাগের ধকল, অনাহার, অপুষ্টি এক প্রজন্মের শিশুদের স্বাস্থ্যকে ভেঙ্গে দেয়। ফলে পরবর্তীকালে তারা অল্পেতেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারায়। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু ক্যাম্প ও কলোনীগুলিতে মূলতঃ এই কারণেই শিশু মৃত্যুর হার ছিল অত্যন্ত বেশী। ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরে ১৯৫০ সালে একমাসে ৬২৪ জন মারা যায় যার মধ্যে ৩০১ জন ছিল শিশু।[১০]

এছাড়াও ঐ ছেলেমেয়েরা স্নেহ-ভালোবাসা-যত্ন যথেষ্ট পরিমাণে পায়নি। উদ্বাস্তু পরিবারে শিশুপ্রহারের পৌনঃপুনিকতা থাকে সচরাচর একটু বেশী।[১১] হতাশাগ্রস্ত উদ্বাস্তু পিতামাতার পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এতে। শিক্ষার সুযোগ থেকে প্রায়শঃ বঞ্চিত ঐ সমস্ত হতভাগ্যদের ছোটখাট কাজে যুক্ত হতে হত নিজ নিজ পরিবারকে সাহায্য করতে। নারায়ণ সান্যালের **বল্মীক** উপন্যাসের বাবলু চরিত্র এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ধরণের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল নয়। সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রবণতা হল এই যে উদ্বাস্তু কিশোরদের একটা অংশ পরবর্তকালে চোরাচালান ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজকর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে বেশী উপায়ের আশায়। কলকাতার অপরাধ জগৎ নিয়ে অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস ও জয়ন্ত রায়ের গবেষণা থেকে এটা পরিষ্কার বেরিয়ে আসে যে কলকাতার গুণ্ডাদের একটা বড় অংশ উঠে এসেছিল উদ্বাস্তু পরিবারগুলি থেকে— রঞ্জিত দেবনাথ, সুকুমার চক্রবর্তী, সুবোধ চন্দ্র দে, অজয় ঘোষ প্রভৃতি নাম এ প্রসঙ্গে পাওয়া যায়।[১২] বাংলা সাহিত্যেও এই প্রবণতার সাক্ষ্য মেলে।

উদ্বাস্তু পরিবারের ছোট মেয়েদের অবস্থা একটু আলাদা করে আলোচনার দাবী রাখে। বাঙালী পরিবারে মেয়েরা এমনিতেই অপেক্ষাকৃত কম আকাঙ্ক্ষিত এবং সেই কারণে তাদের প্রতি যত্ন ও মনোযোগ দেওয়া হত কম। খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েরা পরিবারে বৈষম্যের শিকার হত। অশোক মিত্র তার "Take A Girl Like Her"[১৩] নিবন্ধে অনাদরে অবহেলায় বড় হয়ে ওঠা এক উদ্বাস্তু মেয়ের জীবনালেখ্য তুলে ধরেছেন সুন্দরভাবে। পরিবারের সবথেকে ছোট হলেও তার প্রতি কেউ কোন দিন বিশেষ নজর দেয়নি। অথচ সেই মেয়েই একদিন পরিবারের সমস্ত দায় বহন করে অমানুষিক পরিশ্রম করে এবং ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করে। এধরণের চরিত্র উদ্বাস্তু পরিবারের দুর্লভ ছিল না।[১৪] দৈনন্দিন গৃহস্থ কাজকর্মের সহায়তার পাশাপাশি উদ্বাস্তু পরিবারের ছোটমেয়েরা বড়দের সঙ্গে বিভিন্ন অর্থকরী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হত, যেমন বিড়ি, ঠোঙ্গা, বড়ি, আচার, পাঁপড় ইত্যাদি তৈরীর কাজে।[১৫] উদ্বাস্তু পরিবারের বহু কিশোরীর জীবন চরমতর দুর্ভোগের আবর্তে নিমজ্জিত হয়। ধীরে ধীরে তারা অন্ধকার জগতে হারিয়ে যায়। প্রতিভা

বসুর "দুকূল হারা" গল্পে দুষ্কৃতীদের কুটিল চক্রান্তে মিলু নামে চোদ্দ বছরের এক কিশোরী ও তার মা একই সঙ্গে একটি পতিতালয়ে বিক্রি হয়ে যাবার কাহিনী পাই।[১৫] তৎকালীন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকেও জানা যায় যে শিয়ালদহ স্টেশান ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে একটি দল বিশেষ সক্রিয় ছিল উদ্বাস্তু কিশোর-কিশোরীদের বিপথে চালিত করার উদ্দেশ্যে।[১৬]

সূত্রনির্দেশ

১। Talbot, Ian, "Literature and Human Drama of the 1947 Partition", **South Asia,** vol XVIII, Special Issue (1995), pp 37.

২। এ প্রসঙ্গে উর্বসী বুতালিয়া, কমলা ভাসিন, ঋতু মেনন প্রমুখের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩। দ্রষ্টব্য কুণ্ডু, ত্রিদিব সন্তপা, "বাঙালী নারী জীবনে দেশভাগের প্রভাব", চট্টোপাধ্যায়, গৌতম (সম্পাদিত), **ইতিহাস অনুসন্ধান—১৪** কলিকাতা, ফার্মা কে.এল.এম.প্রা.লি, ১৯৯৯, পৃ. ৫৮৯-৫৯৯।

৪। **কোরক** সাহিত্যপত্রিকা, শারদীয়া ১৩৯৭।

৫। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, **অর্জুন,** কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৭০।

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, **নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে** (২য় খন্ড), কলিকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ১৯৫-১৯৭।

৭। ঘোষ শঙ্খ, **সুপুরি বনের সারি,** কলিকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯০।

৮। সেন, রমেশচন্দ্র, "পথের কাঁটা", **অগ্রন্থিত রমেশচন্দ্র,** প্রথম খন্ড, কলিকাতা, দে বুক স্টোর, ১৩৯৫।

৯। **আনন্দবাজার পত্রিকা,** ২০ জানুয়ারী, ১৯৪৯।

১০। ঐ, ১৪ জুলাই, ১৯৫০।

১১। Keller, Stephen L, **Uprooting and Social Change : The Role of Refugees in Development,** Delhi, Monohan, 1975.

১২। Das, Suranjan and Roy, Jayanta Kr., **The Goondas : Towards a Reconstruction of Calcutta Underwould,** Calcutta, Farma, 1996.

১৩। Mitra, Ashok, **Calcutta Diary,** Calcutta, Rupa & Co, 1979 pp 16-20.

১৪। সাক্ষাৎকার ঃ সরসীবালা রায় (৬৫ বছর) ছোটনীলপুর, বর্ধমান এবং সন্তোষ গাঙ্গুলী (৭৭ বছর), ৩ নং শাঁখারী পুকুর, বর্ধমান।

১৫। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত), **দেশ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প সংকলন,** ১৯৩৩-৮৩, কলিকাতা, আনন্দ, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮৫।

১৬। **আনন্দবাজার পত্রিকা,** ১৪ মার্চ, ১৯৫০।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির লাইন পরিবর্তন ঃ বিভিন্ন দলিলের আলোকে এক বিশ্লেষণ

অমিতাভ চন্দ্র

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির লাইনে ও অবস্থানে দেখা গিয়েছিল এক মৌলিক গুণগত পরিবর্তন। বর্জিত হয়েছিল 'জনযুদ্ধ'কালীন 'সংগ্রামবিমুখতা'র পার্টি লাইন। পরিবর্তে গৃহীত হয়েছিল যুদ্ধ পরবর্তী যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ ও চূড়ান্ত সংগ্রামের লাইন। রাজনৈতিক 'নরমপন্থা' বা 'মধ্যপন্থা' থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই) যাত্রা শুরু করেছিল 'সংগ্রামী' রাজনীতির অভিমুখে, যা প্রায়শই গ্রহণ করেছিল রাজনৈতিক 'চরমপন্থা'র রূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগে সি পি আই-এর বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যেমন এই লাইন ও অবস্থান পরিবর্তনের বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, তেমনই তা প্রতিফলিত হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ অবয়ব গ্রহণ করেছিল পার্টির এই কালপর্বের বিভিন্ন দলিলে। এই দলিলগুলি পাঠের মধ্য দিয়েই আমরা পরিচিত হতে পারি কমিউনিস্ট পার্টির সেই যুগের লাইন ও অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে। বিভিন্ন দলিলের আলোকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির লাইন পরিবর্তনের বিষয়টির বিবরণ ও বিশ্লেষণই বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তু।

দীর্ঘ ছ' বছর চলার পর ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের সার্বিক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল ১৯৪৫ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আবার এক গুণগত পরিবর্তন ঘটাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন শত্রু ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হওয়ার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চোখে প্রধানতম শত্রু হিসাবে পরিগণিত হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে আবার তার লাইন পরিবর্তনের পথে নিয়ে গেল। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং-এ সি পি আই তার 'জনযুদ্ধ'-এর যুগের সাধারণভাবে 'জনযুদ্ধ'-এর লাইন বলে পরিচিত 'ধর্মঘটবিমুখতা'র ও 'সংগ্রামবিমুখতা'র লাইন পরিবর্তন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ ও চূড়ান্ত সংগ্রামের লাইন গ্রহণ করল।[১] সি পি আই সোৎসাহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামগুলিতে অংশগ্রহণ করা শুরু করল। প্রাথমিক

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-জড়তা কাটিয়ে উঠে সি পি আই আবার নেমে এল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ময়দানে। ক্রমশঃ সি পি আই-এর মধ্যে দেখা দিল সংগ্রামী উদ্দীপনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে সি পি আই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এই যুগের বিভিন্ন শ্রমিক-কৃষক সংগ্রাম মুখ্যতঃ সংগঠিত করার ও এই শ্রমিক-কৃষক সংগ্রামগুলিতে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিল সি পি আই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ব্যাপক গণ আন্দোলনগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্টরা ক্রমশঃ চলে এসেছিলেন যুদ্ধ পরবর্তী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রামের পিছনের সারি থেকে সামনের সারিতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যে ব্যাপক গণ সংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সি পি আই-এর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ময়দানে প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল, তা ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর বন্দীদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন, যা আই এন এ বন্দীদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন হিসাবেই সমধিক পরিচিত হয়ে আছে।

আই এন এ বন্দীদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতা মহানগরীকে ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে ও ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বাংলার কমিউনিস্টরা সক্রিয়ভাবেই অংশগ্রহণ করেছিলেন এই দুই ব্যাপক গণ আন্দোলনে। ১৯৪৬ সালের ১৮ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐতিহাসিক নৌ বিদ্রোহ। এই নৌ বিদ্রোহকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল সি পি আই। ১৯৪৬ সালের ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক নৌ বিদ্রোহের সমর্থনে ও তার সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হল গণ আন্দোলন, পালিত হল সর্বাত্মক ধর্মঘট—বোম্বাইতে ও কলকাতায়। এই গণ আন্দোলনগুলিতে উন্মাদনাময় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্টরা ক্রমশঃ তাঁদের স্থান করে নিয়েছিলেন যুদ্ধ পরবর্তী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ সংগ্রামের একেবারে সামনের সারিতে।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা দরকার, ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে বাংলার কমিউনিস্টরা যখন আই এন এ বন্দীদের মুক্তির দাবিতে উত্তাল গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তখনও কমিউনিস্ট পার্টি সাধারণভাবে সুভাষ-বিদ্বেষের আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নি এবং তখনও কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিক ভাবে তার 'জনযুদ্ধ'-এর লাইন অর্থাৎ 'ধর্মঘটবিমুখতা'র ও 'সংগ্রামবিমুখতা'র লাইন পরিত্যাগ করে নি। এ কথা অবশ্যই লেখা যেতে পারে যে, আই এন এ বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ব্যাপক গণ আন্দোলনে বাংলার কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ সাধারণ ভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে অনেকটাই সাহায্য করেছিল সুভাষ-বিদ্বেষের আবহাওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করতে এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে প্রণোদিত করেছিল 'জনযুদ্ধ'-এর লাইন পরিত্যাগ করে আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের লাইন গ্রহণ করতে।

১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসের এবং ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আই এন এ বন্দীদের মুক্তির দাবিতে গণ আন্দোলন দুটিতে কমিউনিস্টদের তুলনায় অকমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তিসমূহ আরও বেশি সক্রিয় ছিল। আন্দোলনের প্রাথমিক নেতৃত্বও এসেছিল

এই শক্তিগুলির কাছ থেকেই। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার তৎকালীন সোভিয়েত-বিদ্বেষ ও সোভিয়েত-ভীতি থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে এক করে দেখে কমিউনিস্টদেরই তার চরম শত্রু হিসাবে বিবেচনা করে এই আন্দোলনগুলির পিছনে 'প্রধান উস্কানিদাতা' ও 'প্রধান শক্তি' হিসাবে কমিউনিস্টদের চিহ্নিত করেছিল এবং যাবতীয় 'গণ্ডগোল সৃষ্টির' জন্য কমিউনিস্টদেরই দায়ী করেছিল।[৮] এমন কি ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে কমিউনিস্ট পার্টিকে আবার নিষিদ্ধ করার কথাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভেবেছিল,[৫] যদিও সেই ভাবনাকে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর বাস্তবে রূপ দেয় নি। কমিউনিস্ট পার্টি নিঃসন্দেহে তখন আবার সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তার তৎকালীন সংগ্রামী ভূমিকার তুলনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াটা ছিল আরও বেশি তীব্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল বিভিন্ন শ্রমিক ধর্মঘট ও কৃষক সংগ্রাম। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় তেভাগার দাবিতে শুরু হয়েছিল ব্যাপক কৃষক সংগ্রাম। বাংলার কৃষকদের এই তেভাগার লড়াই সংগঠিত করেছিল এবং এই লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল সি পি আই। এই সময়েই শুরু হয়েছিল অন্ধ্র প্রদেশের তেলেঙ্গানায় ব্যাপক কৃষক সংগ্রাম। এই তেলেঙ্গানার সংগ্রাম সংগঠনে ও এই সংগ্রামের নেতৃত্বেও আমরা দেখি সি পি আই-কে। কেরলের পুন্নাপ্রা-ভায়ালারের সংগ্রাম সংগঠনে ও পরিচালনাতেও আমরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূ-মিকায় দেখতে পাই সি পি আই-কেই। তেভাগা-তেলেঙ্গানা-পুন্নাপ্রা-ভায়ালারের পাশাপাশিই কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল ও পরিচালিত হয়েছিল বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট। যুদ্ধ পরবর্তী যুগের বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনেও তাঁদের ছিল সক্রিয় ও উৎসাহী অংশগ্রহণ। এই পর্বে কমিউনিস্টরা তাঁদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকায় ও কার্যকলাপে সম্পূর্ণভাবেই নিরত ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এই যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ ও চূড়ান্ত সংগ্রামের উদ্দীপক আহ্বান জানিয়েছিল সি পি আই। কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত করেছিল 'সকলেরই একমাত্র সাধারণ শত্রু'('the only common enemy of all')[৬] হিসাবে এবং 'সকল ভ্রাতৃপ্রতিম দেশপ্রেমিক' কেই ('all Brother Patriots')[৭] ডাক দিয়েছিল এই 'সাধারণ শত্রু'র বিরুদ্ধে তাঁদের সমস্ত শক্তি সংহত করে আঘাত হানার। 'স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামের লক্ষ্যে সমগ্র ভারতীয় জনগণের বৈপ্লবিক ঐক্য' ('the revolutionary unity of the Indian people for the final fight for Independence and Democracy')[৮] গড়ে তোলার আহ্বানও জানিয়েছিল সি পি আই এবং দেশপ্রেমিক শক্তিবর্গের কাছে আবেদন রেখেছিল এই ব্যাপারে প্রয়াসী হওয়ার। এই 'বৈপ্লবিক ঐক্য' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সচেষ্টও হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি।

কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফ থেকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অব্যাহত রাখা হয়েছিল সর্ববিধ কুৎসা-নিন্দাবাদ-আক্রমণ। ফলে সমগ্র রাজনৈতিক পরিমণ্ডলটিকেই পরিব্যাপ্ত

করে রেখেছিল ব্যাপক 'কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ' ('Communist baiting')-এর আবহাওয়া। কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের বিবৃতি ও বক্তব্যে এবং কমিউনিস্ট দলিলে এই পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছিল 'কমিউনিস্টদের প্রতি কংগ্রেসের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি' ('new attitude taken by the Congress towards the Communists')[৭] হিসাবে, যেন এর পূর্ববর্তী যুগে 'জনযুদ্ধ'-এর কালপর্বে কমিউনিস্টদের প্রতি কংগ্রেস-এর দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ছিল এবং কংগ্রেসের তরফ থেকে 'কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ'-এর আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয় নি। যাই হোক্, 'কমিউনিস্টদের প্রতি কংগ্রেসের' এই 'নতুন দৃষ্টিভঙ্গি'র প্রতিবাদে অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি (এ আই সি সি)-র কমিউনিস্ট সদস্যসমূহ ব্যতীত অন্যান্য সকল কমিউনিস্টই ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে পদত্যাগ করে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।[৮] ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি (সি ডব্লিউ সি) এ আই সি সি সহ কংগ্রেসের সমস্ত নির্বাচিত পদ থেকে কমিউনিস্টদের সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করল এবং এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ মাসেই কমিউনিস্টদের কংগ্রেস থেকে বিতাড়ন করা হল।[৯]

কমিউনিস্টদের কংগ্রেস ত্যাগ এবং কংগ্রেস থেকে কমিউনিস্টদের বিতাড়নের মত ঘটনাবলী সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে মৌলিক কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। কংগ্রেসের উপর সি পি আই-এর আস্থা অটুটই ছিল, এবং এই দলের চোখে কংগ্রেসই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি এবং এই সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং সি পি আই—এই তিন দলের এক যৌথ ফ্রন্ট (joint front) গঠনের ডাক দিয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করেছিল ঃ

> In the extremely critical and difficult period that is coming ahead, we will ceaselessly work for Congress-League unity as also for Congress-Communist Unity and create the basis of Congress-League-Communist unity inside one joint front for Indian freedom. With full faith in the patriotism of our Congress and League brothers we will work as unity-crusaders, patiently explaining the just viewpoint of the one to the other and by ourselves going out to resist the unjust claim of the one against the other.[১০]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এই যুগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমন্বয়ে গঠিত এক জাতীয় সরকারের কাছে আশু ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করেছিল। সি পি আই কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ও সহমতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল, এবং আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, যদি সম্ভবপর হয়, সেক্ষেত্রে কংগ্রেস-লীগ- সি পি আই ঐক্য ও সহমতের উপরই আরোপ করেছিল যাবতীয় গুরুত্ব। সি পি আই এমনও

ঘোষণা করেছিল যে, 'জাতীয় ঐক্য' অর্থাৎ 'ভারতের ঐক্য'-এর অতীব প্রয়োজনীয় স্বার্থে এই দল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারীর ও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেও প্রস্তুত। সুতরাং যুদ্ধ পরবর্তী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সেই উত্তাল সময়েও কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হাত থেকে লাগাম কেড়ে নেওয়ার কোনও চেষ্টাই করেনি, প্রয়াসী হয়নি এই দুই দলের হাত থেকে উদ্যোগ ছিনিয়ে নিয়ে নিজের হাতে তুলে নেওয়ার। পরিবর্তে এই দল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দর কষাকষিতে ব্যস্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের উপরই অর্পণ করেছিল আস্থা ও নির্ভরশীলতা, এবং এই দুই দলের হাতে ভারতের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত দেখার ব্যাপারে খুশিমনেই আগ্রহী ছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সম্পর্কিত এই অতিরিক্ত আস্থা-মোহের অনিবার্য ও যৌক্তিক পরিণতি হিসাবেই ১৯৪৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ক্ষমতায় আরোহণকারী জওহরলাল নেহ্রুর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের (interim government) 'পিছনে দাঁড়ানোর' ('stand behind')[১১] জন্য সমগ্র জনসাধারণকে ডাক দিয়েছিল সি পি আই, কারণ এই দলের মতে এই সরকারের সঙ্গেই ছিল 'আমাদের জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন' ('the support of the overwhelming majority of our people')[১২]। আর তাই যেদিন কংগ্রেস সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল, সেই স্বাধীনতা দিবস (Independence Day)-কে সি পি আই উদ্‌যাপন করেছিল 'জাতীয় আনন্দের দিন' ('the day of national rejoining')[১৩] হিসাবে। শুধু তাই নয়, জওহরলাল নেহ্রুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারকে সমর্থনও যুগিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি, কারণ এই দলের চোখে এই সরকার ছিল 'জাতীয় অগ্রগতি' ('national advance')[১৪]-র সরকার, এবং দ্ব্যর্থহীনভাবেই ঘোষণা করেছিল যে, স্বাধীন ভারতে সি পি আই 'অনুগত বিরোধীপক্ষ' ('loyal opposition')[১৫]-এর ভূমিকাই পালন করবে। স্বাধীনতা প্রাপ্তি তথা ক্ষমতা হস্তান্তর-এর চার মাসের মধ্যেই অবশ্য সি পি আই-এর অবস্থান সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই পর্বেই কমিউনিস্ট পার্টির লাইন ক্রমশঃ পরিবর্তিত হচ্ছিল রাজনৈতিক 'নরমপন্থা' বা 'মধ্যপন্থা' ('moderation')-র থেকে 'সংগ্রামী' রাজনীতির ('militancy') অভিমুখে। কিন্তু এই লাইন পরিবর্তনের বিষয়টি আদৌ মসৃণ বা সুগম ছিল না, তার মধ্যে ছিল দোলাচল, ছিল দোদুল্যমানতা, ছিল দুই লাইনের দ্বন্দ্ব। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক 'নরমপন্থা' বা 'মধ্যপন্থা' ('moderation')-র লাইনের সঙ্গে 'সংগ্রামী' রাজনীতির বা রাজনৈতিক 'চরমপন্থা' ('militancy')-র লাইনের দ্বন্দ্ব চলছিলই। সি পি আই-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি পেল এবং ঘোষিত হল 'সংগ্রামী' রাজনীতির লাইন বা রাজনৈতিক 'চরমপন্থা'র লাইন ('militant' line)। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ও আন্দোলনের ইতিহাসে এই দ্বিতীয় কংগ্রেস তাই চিহ্নিত ও স্বীকৃত হয়ে আছে এক সন্ধিক্ষণ হিসাবে।

মর্মান্তিক দেশবিভাগকে সঙ্গী করে, ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপ ধরে এল জাতীয় স্বাধীনতা—১৫ অগস্ট ১৯৪৭। 'জাতীয় অগ্রগতির সরকার নেহ্রু সরকারকে অকুণ্ঠ

সমর্থন' জানিয়ে স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির যাত্রারম্ভ হল। ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ ভরতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও লাইন দুটোই পাল্‌টাল এই কংগ্রেসে। লাইন পরিবর্তনের ব্যাপারটি আদৌ আকস্মিক ছিল না। ১৯৪৬ সালের অগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাব **For the Final Assault! Tasks of the Indian People in the Present Phase of Indian Revolution**[১৬]-এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের জন্য শেষ সংগ্রামের আহ্বানের মধ্যেই লাইন পরিবর্তনের ইঙ্গিত ছিল। তবে তা ছিল ইঙ্গিত মাত্র। লাইন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই দলিলটিকে একেবারেই নিয়ন্ত্রিত একটি সূচনা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, অভিহিত করা যেতে পারে রাজনৈতিক 'নরমপন্থা' ('moderation') এবং 'চরমপন্থা' ('militancy')-র মধ্যে এক আপস-প্রয়াস হিসাবে। গঙ্গাধর অধিকারীর লেখা **Resurgent India at the Crossroads: 1946 in Review**[১৭] (January, 1947)-এও ছিল 'সংগ্রামী' রাজনীতিরই অভিব্যক্তি। কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৪৭ সালের জুন মাসের রাজনৈতিক প্রস্তাব **Mountbatten Award and After**[১৮]-এ 'মাউন্টব্যাটেন অ্যাওয়ার্ড' সম্পর্কে এক মিশ্র দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়—এই ক্ষমতা হস্তান্তর দেশের অগ্রগতির সূচনা করেছে, জনগণ একে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু এটা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। পরবর্তীকালের 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'-এর বীজও এখানেই নিহিত ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৪৭ সালের জুন মাসের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব রাজনৈতিক 'চরমপন্থা'র পালে আরও বেশ কিছুটা বাতাস লাগিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছিল রাজনৈতিক 'নরমপন্থা'রই, এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতেই স্বাধীনতার সময়ে এবং ঠিক তার অব্যবহিত পরবর্তী কালে সি পি আই নেহ্‌রু সরকারকেই অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ৭ থেকে ১৬ ডিসেম্বর বোম্বাইতে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে কেন্দ্রীয় কমিটি **For the Struggle for Full Independence and People's Democracy**[১৯] এবং **On the Present Policy and Tasks of the Communist Party of India**[২০] নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই দুই দলিলেই রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তনের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপরই আসছে দ্বিতীয় কংগ্রেসে পরিবর্তিত রাজনৈতিক লাইন। কিন্তু এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক লাইনের অর্থাৎ রাজনৈতিক 'চরমপন্থা'র বা 'সংগ্রামী' রাজনৈতিক লাইনের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল কেন্দ্রীয় কমিটিব ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের এই দুটি রাজনৈতিক প্রস্তাবেই।

রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তনের সঙ্গে নেতৃত্ব পরিবর্তনের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবেই জড়িত ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বও পরিবর্তিত হল এই দ্বিতীয় কংগ্রেসেই। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের সময় কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশীর

আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব বজায় থাকলেও রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগ তখনই যোশীর হাতছাড়া হয়ে গেছে। পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত হলেন এক দশকেরও অধিক সময় এই পদে অবস্থানকারী, সেই সময় 'সংস্কারপন্থী' হিসাবে চিহ্নিত ও সমালোচিত পি সি যোশী। তাঁর জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হলেন 'সংগ্রামী' বি টি রণদিভে। রণদিভের নেতৃত্বে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত হল নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি। নেতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক লাইনও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হল দ্বিতীয় কংগ্রেসেই। 'জাতীয় অগ্রগতির সরকার নেহ্‌রু সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন' জ্ঞাপনের 'সংস্কারবাদী' অবস্থান সম্পূর্ণ বর্জিত হল কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে। পরিবর্তে দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত **Political Thesis**[২১]-এ 'জাতীয় আত্মসমর্পণের সরকার, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও তার সঙ্গে আপসকামীদের সরকার নেহ্‌রু সরকার'-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতের আহ্বান জানানো হল। ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ অনুষ্ঠিত এই ঐতিহাসিক দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিল ঃ

> We characterize here the National Government as the Government of national surrender, of collaborators, a Government of national compromise. Thus in place of our former characterization about the Government as one of an advance, with whom we should have a joint front, we have now the characterization that it is a Government of national surrender and collaboration ; the conclusion that follows, therefore, is that it is the basic policy of the working class and its Party to oppose this Government, and this is what we have sharply underlined.[২২]

কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের এই 'সংগ্রামী' ও 'চরমপন্থী' রাজনৈতিক লাইন এই দলকে নিয়ে গেল জওহরলাল নেহ্‌রুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে 'বৈপ্লবিক সশস্ত্র অভ্যুত্থান' ('revolutionary armed insurrection')-এর ডাক দেওয়ার পথে। দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত সবকটি রিপোর্ট ও প্রস্তাবেই প্রত্যক্ষ সংঘাতের এই মেজাজটি অক্ষুণ্ণ রাখা হল। পার্টি কংগ্রেসের শেষে কলকাতা ময়দানের প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করা হল—'তেলেঙ্গানার পথ আমাদের পথ'।

দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হওয়ার ঠিক কুড়ি দিনের মাথায় ২৬ মার্চ ১৯৪৮ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এই রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করল। পরাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘ আট বছর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এবার কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হল স্বাধীন ভারতের একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে। সেদিনই ভোর থেকে শুরু হয়ে গেল ব্যাপক ধরপাকড়, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সীল হয়ে গেল কমিউনিস্ট পার্টির অফিস, সীল হয়ে গেল কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক

মুখপত্র 'স্বাধীনতা'-র অফিস। পশ্চিমবাংলার সর্বত্র গ্রেপ্তার হলেন ও হতে থাকলেন বহু কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী।

দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির লাইন হল দেশজোড়া বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের লাইন, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের লাইন। কিন্তু ভারতের তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি তখন এই লাইন বাস্তবায়নের পক্ষে অনুকূল ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 'জনযুদ্ধ'কালীন 'সংগ্রামবিমুখতা'র লাইন পরিত্যাগ করে আবার ফিরে এসেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের পথে। কিন্তু এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি অক্ষুণ্ণ রেখেছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের উপর তার সবিশেষ আস্থা ও নির্ভরশীলতা। ফলে সংগ্রাম পরিচালনার যে উদ্যোগ কমিউনিস্ট পার্টির নিজের হাতে তুলে নেওয়া উচিত ছিল, তা তারা নেয়নি। সদ্য স্বাধীন ভারতে বেশ কিছুটা আকস্মিক ভাবেই কমিউনিস্ট পার্টি ডাক দিল দেশজোড়া 'বৈপ্লবিক সশস্ত্র অভ্যুত্থান' -এর, গ্রহণ করল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের লাইন। কিন্তু তার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিরও নিজস্ব প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছিল না, আর সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের জনসাধারণও আশু বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে অনিবার্য পরিণতি হিসাবে উত্তাল চল্লিশের বিপ্লব প্রয়াস অসমাপ্তই থেকে গেল, বিপ্লব আর সমাপ্ত হল না।

সূত্রনির্দেশ

১। 'The New Situation And Our Tasks', Resolution of the Central Committee (C C) of the Communist Party of India (CPI) passed at its meeting in December 1945, in T G Jacob (ed.), **National Question in India: CPI Documents : 1942-47,** Odyssey Press, New Delhi, May 1988, pp. 158-78. See also PC Joshi, **For the Final Bid For Power! The Communist Plan Explained : Freedom Programme of Indian Communists,** People's Publishing House, Bombay, Undated, (probably published early in 1946), pp. 1-100; **Election Manifesto of the Communist Party of India,** Appendix to **For The Final Bid For Power!**, op. cit., pp. 101-22; **For The Final Bid for Power! The Communist Plan Explained,** also in Jacob (ed.), op. cit., pp. 241-325.

২। Home/Poll./F.Nos. 21/16/1945, 5/8/1946, 5/22/1946 and 18/2/1946 (February).

৩। **National Herald,** Lucknow. March 27, 1946, and **National Call,** Delhi, March 28, 1946, Home/Poll./F.No. PR 1/103/1946.

৪। **People's Age.** weekly organ of the Communist Party of India (CPI),

Bombay, Vol. IV, No. 28, January 6, 1946.

৫। Ibid.

৬। Gangadhar Adhikari, **Resurgent India at the Crossroads : 1946 in Review,** People's Publishing House, Bombay, January, 1947, p.18.

৭। Statement of PC Joshi, quoted in Nripendra Nath Mitra (ed.), **The Indian Annual Register,** Calcutta, 28th year of Issue, Volume II, July-December, 1945, p. 119.

৮। Ibid., pp. 119-21; **Amrita Bazar Patrika,** Calcutta, October 8, 1945, p. 3.

৯। **Amrita Bazar Patrika,** December 12, 1945, p. 1 ; December 13, 1945, p.5, Nripendra Nath Mitra (ed.), **The Indian Annual Register,** Volume II, July-December, 1945, pp. 112-19, 122, especially pp. 118-19, AM Zaidi and SG Zaidi (ed.), **Encyclopaedia of the Indian National Congress,** Volume 12, pp. 492, 615-16; Home / Poll. / F.No. PR 1 / 103 / 1946.

১০। P.C Joshi, **Communists and Congress : Why Communists Resigned from the Congress,** People's Publishing House, Bombay, 1945, pp. 23-24; **Communists and Congress : Why Communists Resigned from the Congress,** also in TG Jacob (ed.), op. cit., p. 125.

১১। 'Draft Resolution for the Constituent Assembly', tabled by Somnath Lahiri, CPI member of the Constituent Assembly, at the Constituent Assembly meeting held in New Delhi late in 1946, in Jacob (ed.), op. cit., p. 234.

১২। Ibid., p. 230.

১৩। **People's Age,** August 3, 1947, p.1.

১৪। **Mountbatten Award and After,** Political Resolution of the Central Committee (C C) of the Communist Party of India (CPI), June, 1947, People's Publishing House Ltd., Bombay, p.6; **Mountbatten Award and After,** also in Jacob (ed.), op. cit., p. 215.

১৫। বিস্তারিত বিবরণ-বিশ্লেষণ-আলোচনার জন্য দেখুন : 'The New Situation And Our Tasks', in Jacob (ed.), op. cit., pp. 158-78; PC Joshi, **For a Free and Happy India : Election Policy of Indian Communists,** pp. 1-17, and **Communists and Congress : Why Communists Resigned from the Congress,** pp. 17-24; also in Jacob (ed.), pp. 105-18, 119-25; PC Joshi, **For The Final Bid For Power! The Communist Plan Explained,** pp.1-100; also in Jacob (ed.),

pp. 241-325 ; **Election Manifesto of the CPI,** Appendix to **For The Final Bid For Power,** pp. 101-22 ; R Palme Dutt, **Freedom For India,** pp. 1-33 ; also in Jacob (ed.). pp 179-209 ; R Palme Dutt, **A New Chapter in Divide and Rule, Rajani Palme Dutt Exposes Cabinet Mission's Plan,** pp.1-31 ; 'Memorandum of the Communist Party of India to the British Cabinet Mission', 15 April 1946, submitted by PC Joshi, General Secretary of the CPI, in April 1946, in Nripendra Nath Mitra (ed.), **The Indian Annual Register,** Volume I, January-June, 1946, pp. 220-21 , also in Gangadhar Adhikari (ed.), **Marxist Miscellany,** Volume Eight, October, 1946, Bombay, pp. 120-24 , also in Asit Sen (ed), **Liberation War,** Volume One, No.1, February, 1971, Calcutta, pp. 56-60 ; also in Jacob (ed.), op. cit., pp. 235-40 ; **For the Final Assault! Tasks of the Indian People in the Present Phase of Indian Revolution,** Political Resolution of the CC of the CPI, August, 1946, pp. 1-20 ; 'Draft Resolution for the Constituent Assembly', tabled by Somnath Lahiri, in Jacob (ed.), pp 229-34 ; **Mountbatten Award and After,** pp. 1-15 ; also in Jacob (ed.), op. cit., pp 210-28 ; **People's Age,** November 25, 1945–November 30, 1947, **passim.**

এ ছাড়াও দেখুন ঃ Gene D Overstreet and Marshall Windmiller, **Communism in India,** The Perennial Press, Bombay, 1960, pp. 218-70.

১৬। **For the Final Assault! Tasks of the Indian People in the Present Phase of Indian Revolution,** Political Resolution of the Central Committee of the Communist Party of India, August, 1946, People's Publishing House, Bombay, pp 1-20.

১৭। Gangadhar Adhikari, **Resurgent India at the Crossroads : 1946 in Review,** People's Publishing House, Bombay, January, 1947, pp. 1-24.

'সংগ্রামী' রাজনীতির বা রাজনৈতিক 'চরমপন্থা'র লাইনের পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিত দলিলটিতেও ঃ Romesh Chandra, **"Operation Asylum"**, An exposure of British military plans to crush the Indian Revolution ; based on authentic top-secret military documents. with a preface by Gangadhar Adhikari, pp. i+ 1-14.

১৮। **Mountbatten Award and After,** Political Resolution of the Central Committee of the Communist Party of India, June, 1947, People's Publishing House Ltd., Bombay, pp. 1-15.

১৯। **Communist Statement of Policy : For the Struggle for Full Inde-**

pendence and People's Democracy, Resolution on the present political situation passed by the Central Committee of the Communist Party of India at its meeting held in Bombay from 7th to 16th December, 1947, People's Publishing House Ltd., Bombay, December, 1947, pp. 1-14.

২০। **On the Present Policy and Tasks of the Communist Party of India,** Adopted by the Central Committee of the CPI at its meeting held in Bombay from December 7 to 16, 1947.

২১। **Political Thesis of the Commumit Party of India,** Adopted at the Second Congress, February 28-March 6, 1948, Calcutta, Published by the Communist Party of India, Bombay, July, 1948, pp. i-v + 1-118 ; 'Political Thesis of the Communist Party of India', Adopted at the Second Congress, February 28 to March 6, 1948, Calcutta, in MB Rao (ed.), **Documents of the History of the Communist Party of India,** (hereafter **Documents**), Volume VII (1948-1950), People's Publishing House, New Delhi, January, 1976, pp 1-118.

২২। **Opening Report by Comrade B.T. Ranadive on the Draft Political Thesis,** 29 February 1948, Second Congress of the CPI, published as a pamphlet along with **Comrade Bhowani Sen's Speech on the Report on Pakistan,** 1 March 1948, CPI, Bombay, p. 13. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন ঃ ibid., pp. 1-25.

ভারতবর্ষে জাতিসত্বার প্রশ্ন ঃ
কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীর ক্রমবিকাশ

দেবনারায়ণ মোদক

ভাবতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ শাসনাধীন সময়কালেই জাতিসত্বার প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান নির্ণয়ে প্রয়াস গ্রহণ করে। ঔপনিবেশিক ভারতের এক সংকটময় সন্ধিক্ষণে এই জটিল বিষয়ে নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে পার্টিকে ঘরে বাইরে নানা জটিলতার মুখোমুখি হয়ে বারংবার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হয়। আবার, উপনিবেশ-উত্তর স্বাধীন ভারতের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতিসত্বার প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীতে নূতনত্ব আসে। একদিকে যেমন বৃহত্তর জনমানসে পার্টির গৃহীত নীতির প্রতিক্রিয়া, অন্যদিকে তেমনই আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম এই দুটি বিষয়ের টানাপোড়েনেই জাতিসত্বার প্রশ্নে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী একটি নির্দ্দিষ্ট পরিণতি লাভ করেছে। পরবর্তী সময়ে পার্টি-বিভাজনের বিষয়টিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে জাতিসত্বার প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীর এই ক্রমবিকাশের ধারাটি অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

।। এক ।।

অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বেই ভারতে জাতিসত্বার প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গী রচনায় মনোনিবেশ করে। জাতিপ্রশ্নে মার্কসীয় তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটেই[১] পার্টি এ বিষয়ে অবস্থান গ্রহণে সচেষ্ট হয়। ১৯৩০-এর এক পার্টি দলিলে[২] জাতিপ্রশ্নে ভারতবর্ষে সোভিয়েত নীতি প্রয়োগের প্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। ঐ দলিলে বলা হয় যে, "ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র জাতীয় সংখ্যালঘুদের বিচ্ছিন্নতার অধিকারসহ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদানে সক্ষম হবে।" মূলতঃ চল্লিশের দশকের সূচনালগ্ন থেকেই এ বিষয়ে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী বিকশিত হতে থাকে এবং তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে মোটামুটি ভাবে দু-বৎসর (১৯৪০-৪২) সময় লাগে। প্রকৃত অর্থে মুসলিম লীগ কর্তৃক পাকিস্তানের দাবি উত্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতেই পার্টি জাতিপ্রশ্নে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করে। ভারতের জাতিসত্বার প্রশ্নে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম প্রধান তত্ত্বকার গঙ্গাধর অধিকারী নিজেই লিখেছেন ঃ

১৯৩৮-এ ও আমরা অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের মতোই ভুলক্রমে ভারতকে এক জাতি বলেই মনে করেছি এবং মুসলমানদের একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু বলেই

ভেবেছি। কিন্তু মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর প্রেক্ষিতে এদেশের বহু-জাতিক চরিত্রটি আমাদের কাছে স্বচ্ছভাবে ধরা পড়ে।[৮]

১৯৪০-এর জুন মাসে সর্ব্বপ্রথম নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একজন কমিউনিস্ট সদস্য, ড. কে. এম. আশরফ এক বিবৃতিতে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিম জনগণের ঐক্য স্থাপনে জাতীয় কংগ্রেসের ব্যর্থতা এবং মুসলিম জনগণের বিচ্ছিন্নতাবোধের কথা উল্লেখ করেন। তিনি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী "মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গী" আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখান করলেও মুসলিম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে লঘু করে দেখতে চান নি।[৮] ক্রমশই পার্টির বিভিন্ন মহলে বিশেষতঃ ছাত্র সংগঠনে এই ধরনের মতামত প্রসার লাভ করতে থাকে এবং ১৯৪০-এর শেষ দিকে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের (AISF) বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী এবং হিন্দু মহাসভার হিন্দুস্তান দাবী কে "প্রতিক্রিয়াশীল ও ধ্বংসাত্মক' বলে ঘোষণা করা হয়। এই প্রস্তাবে দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার জন্য জাতীয় কংগ্রেসকে দায়ী করা হয় এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ভারতবর্ষে "আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের এক স্বেচ্ছামূলক যুক্তরাষ্ট্র" গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।[৮]

এ বিষয়ে প্রথম পার্টি দলিল পার্টি চিঠি-র আকারে ১৯৪১-এর মে মাসে প্রকাশিত হয় এবং তা পার্টি সদস্যদের মধ্যে প্রচারিত হয়, যেখানে সর্ব্বপ্রথম "বহু-জাতিক ভারতবর্ষ"-এর ধারণা অন্তর্ভুক্ত হয়।[৮] এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ১৯৪২-এর ১৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে গৃহীত হয় এবং ১৯৪৩-এর অনুষ্ঠিত প্রথম পার্টি কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়। এই প্রস্তাবে ভারতবর্ষকে "বহু গোষ্ঠীর বাসভূমি" হিসাবে উল্লেখ করে ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্য ঘোষিত হয়। প্রস্তাবে প্রতিটি "সুনির্দ্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠী"-র জন্য বিচ্ছিন্নতার অধিকার (Right to secede) সহ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অথবা ইউনিয়নের মধ্যে সার্ব্বভৌম ও স্বশাসিত (দুটি শব্দ সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত) স্বীকৃতি প্রদানের কথা উল্লিখিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় ঃ

...আগামী দিনের স্বাধীন ভারত হয়ে উঠবে পাঠান, পশ্চিম পাঞ্জাবী (প্রধানতঃ মুসলিম), শিখ, সিন্ধী, হিন্দুস্তানী, রাজস্থানী, গুজরাটী, বাঙালী, অসমীয়া, ওড়িয়া, অন্ধ্র, তামিল, কর্নাটকী, মারাঠী, মালয়ালী ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীর মিলিত যুক্তরাষ্ট্র অথবা স্বশাসিত রাষ্ট্র সমূহের ইউনিয়ন।[৮]

প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে ঃ

ভারতীয় জনগণের প্রতিটি অংশ যাদের বাসভূমি হিসাবে একটি সংলগ্ন (contiguous) ভূখন্ড, একই ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, সাধারণ ভাষা, সংস্কৃতি, মানসিক চরিত্র এবং এক অর্থনৈতিক জীবন রয়েছে, তাদেরই সুনির্দ্দিষ্ট জাতি হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে স্বাধীন ভারতীয় ইউনিয়ন অথবা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার অধিকারসহ স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া উচিত।[৮]

ভারতের জাতিপ্রশ্নে এরূপ অবস্থানে দাঁড়িয়েই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি হিন্দু-মুসলিম সমস্যার একটি সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে প্রয়াসী হয়েছিল। পাকিস্তান দাবীর "ন্যায়সঙ্গত মর্ম্ম" স্বীকার করেও কমিউনিস্ট পার্টি একে "ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারত-

ভাগের বিচ্ছিন্নতাবাদী তত্ত্ব" আখ্যা দিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাব চেষ্টা করে। "পারস্পরিক অবিশ্বাস দূরীভূত হলে বর্তমানে যেমন ঐক্যবদ্ধ কর্ম্মপ্রয়াস গৃহীত হতে পারে, তেমনই আগামী দিনের স্বাধীন ভারতে বৃহত্তর ঐক্যের ভিত্তিও রচিত হতে পারে।"[৮]

পার্টির এই অবস্থান বিশ্লেষণ করে অধিকারী লিখেছেন ঃ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর অস্বীকৃতি স্বাধীন ভারতে প্রতিটি জাতির সমানাধিকার ও স্বাধীনতা অস্বীকারের সামিল। তার মতে, এই দাবি অস্বীকৃত হলে দেশের ঐক্য বিপর্যস্ত হবে। অপরদিকে, এই দাবির স্বীকৃতি দেশের ঐক্যকে অধিকতর সুদৃঢ় করে তুলবে। তিনি লিখেছেন যে জাতীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসমূহের স্বাতন্ত্র্যের সংগ্রামের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী ছিল। যেহেতু কতকগুলি ভারতীয় জাতিগোষ্ঠী ; যেমন বালুচ, পাখতুন, সিন্ধী, পশ্চিমপাঞ্জাবী, পূর্ব্ববঙ্গীয়রা প্রধানতঃ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই পাকিস্তান দাবীর মধ্যে তাদের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি মনে করেছেন যে, কমিউনিস্টরা, যারা বিচ্ছিন্নতার অধিকার সহ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে, তারা অস্বীকার করতে পারেন না যে, মুসলমানদেরও এই অধিকার রয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, ভারতবর্ষের মূল ভাষাগোষ্ঠী গুলিও এক একটি জাতির প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী ন্যায়সঙ্গত। তার মতে, দেশের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর এই অধিকার মেনে নিলে পারস্পরিক অবিশ্বাস দূরীভূত হবে এবং ঐক্যের শক্তি জোবদার হবে। মূল লক্ষ্য ঃ দেশ বিভাগ নয়, ঐক্যসাধন।[১০]

এই পর্ব্বে কমিউনিস্ট পার্টি মুসলিম লীগের বক্তব্যের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য তুলে ধরতে চাইলেও বাস্তবে তা পাকিস্তান দাবির প্রতি সমর্থনেই পর্যবসিত হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, ধর্ম্মকে জাতীয়তাবাদের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা সঙ্গত কি না। বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা বি.টি. রনদিভে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যে, "কমিউনিস্টরা ধর্ম্মকে জাতীয়তাবাদের একমাত্র ভিত্তি বলে মনে করে না এবং এখানেই জিন্নাব সঙ্গে তাদের পার্থক্য।... এর অর্থ এই নয় যে, কোন এলাকায় মুসলিমদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। ... কোন কোন ভৌগলিক এলাকায় মুসলিমরা সুস্পষ্ট জাতি হিসাবে গড়ে উঠেছে। একথা স্বীকার করার অর্থ ধর্ম্মকে একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা নয়।"[১১]

এর থেকে প্রতীয়মান যে, কমিউনিস্ট পার্টি এই পর্বে বিচ্ছিন্নতার অধিকার সহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমেই দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য বিধানের নীতি গ্রহণ করে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে জোরদার করে তুলতে এই ঐক্যকে তারা খুবই জরুরী বলে মনে করেছেন, কারণ, তাদের মতে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণই ছিল সেই সময়ের প্রধানতম জাতিগত শোষণ। সে কারণেই জাতীয় আন্দোলনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঐক্যসাধন সেই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির "প্রধান কর্তব্য" হিসাবে পরিগণিত হয়। পার্টি গান্ধীজীকে এমন কর্ম্মসূচী গ্রহণের অনুরোধ করে যাতে "কংগ্রেস-লীগ যুক্তফ্রন্ট" গঠন সম্ভব হয়।[১২] দেশের ঐক্য সুনিশ্চিত করতে পার্টি জাতীয় কংগ্রেসকে মুসলিম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর প্রতি স্বীকৃতি জানাতে ; মুসলিম

লীগকে কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবীতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ; এবং সর্ব্বোপরি মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানায়। সুতরাং এই সময়কালে কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং ঐক্য—এই দুটি শ্লোগানকে সামনে রেখে। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক ব্রেন ব্রাডলেও কংগ্রেস-লীগ যুক্তফ্রন্ট গঠনের এই নীতির প্রতি সমর্থন জানান এবং এজন্য তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে অভিনন্দিত করেন।[৩০]

।। দুই ।।

১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত জাতিসত্বার পশ্নে পার্টির এই অবস্থানে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্য ঐ বৎসবেরই ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটি নূতন পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যগুলি খতিয়ে দেখতে গিয়ে মন্তব্য করে যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের একতরফাভাবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস রক্ষার প্রচেষ্টা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যৌথ সংগ্রামকে জোরদার করার পরিবর্তে পারস্পরিক দ্বন্দ্বকেই তীব্র কবে তুলেছে। ''মুসলিম লীগের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা নবজাগ্রত মুসলিম সংহতি মুসলিম পুনরুত্থানবাদে পর্যবসিত হয়েছে; হিন্দু-প্রাধান্যের ভীতি পরিণত হয়েছে হিন্দু-বিদ্বেষে; নিজেদের বাসভূমি হিসাবে পাকিস্তানের প্রতি ভালোবাসা, পরিণত হয়েছে অন্যায় ভৌগলিক এলাকার দাবীসহ দেশভাগের দাবীতে।'' পার্টির মতে, এর ফলে নূতন বিপদ সূচিত হয়েছে। এমতাবস্থায় নিজেদের গৃহীত নীতিরও পুনমূল্যায়ন জরুরী বলে পার্টি মনে করেছে।[৩১]

আত্মসমালোচনার সুরে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, পার্টি যুদ্ধকালীন সময়ে জাতিপ্রশ্নে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গী নূতন পরিস্থিতিতেও বহাল রেখেছে এবং যান্ত্রিকভাবে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের শ্লোগানকে কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট ঐক্যের শ্লোগানে সম্প্রসারিত করেছে। কংগ্রেস যখন একটি সংবিধান সভার দাবিতে সরব হয়েছে; লীগ দাবি করেছে দুটি পৃথক সভার; তখন কমিউনিস্টদের ১৭টি সংবিধান সভার দাবী সঠিক হলেও ইউটোপিয় বলে মনে হয়েছে। এই প্রস্তাবে অবশ্য সময়ের দাবি অনুযায়ী জাতীয় আন্দোলনে নূতন প্রেরণা সৃষ্টির দায়িত্বগ্রহণের ঘোষণা ছাড়া দৃষ্টিভঙ্গীগত কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয় নি। গৃহীত প্রস্তাবে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত একটি সংবিধানসভা গড়ে তোলার কথা বলা হলেও প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনবোধে পৃথক সভা নির্বাচনের অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছে।[৩২]

কিন্তু পরের বৎসরেই (১৯৪৬) মার্চ মাসে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্তের হস্তক্ষেপে জাতিপ্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়। **Labour Monthly**-তে প্রকাশিত দত্তের নিবন্ধ ''India and Pakistan'' জাতিপ্রশ্নে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যকে সাধারণভাবে সমর্থন জানালেও পাকিস্তান প্রশ্নে তার তীব্র সমালোচনা করা হয়। দত্ত মন্তব্য করেন যে, পার্টির গৃহীত নীতির মধ্যেই 'কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানের সমর্থক'—এরূপ অপব্যাখার সুযোগ রয়েছে, যদিও বাস্তবে

মুসলিম লীগের দাবি এবং কমিউনিস্টদের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির মধ্যে প্রভেদ অনেক। কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক "মুসলিম জাতীয়তা"-র ধারণা গ্রহণের ক্ষেত্রেও দত্তের আপত্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।[১৬] তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী পাকিস্তান দাবীর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল প্রশ্নটি জাতিসত্বার নয়, ধর্ম্মের; লীগ সারা ভারতে মুসলমানদের সংগঠিত করতে চেয়েছে ব্রিটিশ বিরোধিতার জন্য নয়, হিন্দু বিরোধিতার জন্য; পাকিস্তানের দাবী তোলা হয়েছে কোন গণভোট ছাড়াই খেয়ালখুশিমত এমন সব সীমানা অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে নানা জাতির লোক বাস করেন।[১৭] "Freedom For India" এই শিরোনামে অপর একটি দীর্ঘ রচনায় তিনি সমস্যাটি বিশদভাবে আলোচনা করেন। এই নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে, ধর্ম্মকে জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে ধরে নিলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেও এ দাবি অসঙ্গত। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের শ্লোগান প্রত্যক্ষভাবে উদীয়মান জাতীয় চেতনার প্রকাশ নয়; কারণ তা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করে না—একটি মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চায়। তিনি বলেন যে, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর স্বীকৃতি বাস্তবে বিচ্ছিন্নতা কামনা করে না। তবে, যে কোন ইউনিয়ন কেবল মাত্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ঐক্যের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি জাতি-গোষ্ঠী সমূহকে স্বাধীনভাবে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের অধিকার দেবে এবং সেই ভিত্তিতেই গঠিত হবে সর্ব্বভারতীয় ইউনিয়ন। তিনি আরো বলেন যে, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি ভারতীয় জনগনের এবং তারাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন, এ বিষয়ে কোন সমাধান আরোপ করার এক্তিয়ার ব্রিটিশ জনগণের নেই।[১৮]

রজনী পাম দত্তের এই মূল্যায়ন পার্টিতে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। ঐ বৎসরই এপ্রিল মাসে তিনি ভারতে এসে তাঁর বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় আন্তঃপার্টি আলোচনা। 'On Palme Dutt's Article "India and Pakistan" in the **Labour Monthly**, (March 1946)' এই শিরোনামাঙ্কিত পার্টি চিঠি সদস্যদের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি এ বিষয়ে তাদের পূর্ব্বের অবস্থান পরিবর্তন করে। ক্যাবিনেট মিশনের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়। এই স্মারকলিপিতে পাকিস্তান দাবীর প্রতি সমর্থনের উল্লেখ বর্জন করে তার পরিবর্তে ভাষাভিত্তিক প্রদেশগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী উল্লিখিত হয়। এখানে বলা হয় ঃ

> "কমিউনিস্ট পার্টি সার্বভৌম ইউনিটগুলির স্বাধীন, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভারতীয় ইউনিয়নের সমর্থক। পার্টি নিশ্চিতভাবেই মনে করে যে, ভারতীয় জনগণের সর্ব্বোত্তম স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন এক ইউনিয়নের মধ্যে একত্রিত হওয়া, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং দারিদ্রের সমস্যার সমাধান, যার জন্য চাই সকলের সহযোগিতা। কেবলমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির প্রয়োগের ভিত্তিতেই...এই ভারতীয় ঐক্য সুরক্ষিত থাকতে পারে।"[১৯]

১৯৪৬-এর আগস্টে গৃহীত প্রস্তাবেও পার্টি ঘোষণা করে যে, পাকিস্তান দাবির মধ্যে

প্রতিফলিত হয়েছে মুসলিম বুর্জোয়া সামন্ততান্ত্রিক কায়েমী স্বার্থের, যারা খণ্ডিত ভারতে প্রশাসনিক ক্ষমতার অংশ লাভের জন্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করতে চায়।[২০] সাজ্জাদ জাহিরও লীগের সমালোচনা করে বলেন যে, "তাদের মতে সার্ব্বভৌমত্ব হাজার একটি সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বন্ধনে আবদ্ধ সমভাষাভাষী সমগ্র মানুষের মধ্যে নিহিত নেই ; আছে শুধু তার একটি অংশের—মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে।[২১] অধিকারীও এই পর্ব্বে তাঁর পূর্বের অভিমত সংশোধন করে পাকিস্তান দাবীর "অগণতান্ত্রিক এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী" চরিত্র উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানের দাবী অসমীয়া, পাঠান, সিন্ধী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী অস্বীকার করে।[২২]

গণ পরিষদের একমাত্র কমিউনিস্ট সদস্য সোমনাথ লাহিড়ী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবেও কমিউনিস্ট পার্টির এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়। গণ পরিষদে লাহিড়ী কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করে বলেন যে, লীগ নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ধর্ম্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদের জিগির তুলে যদি বেশ কয়েকটি জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে বিকৃত করতে পেরে থাকে, জনগোষ্ঠী সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর প্রতি স্বীকৃতি না দেওয়ায় কংগ্রেসই তার জন্য দায়ী।[২৩] পার্টির এই সময়ের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করে তৎকালীন সম্পাদক পি.সি. জোশী লিখেছেন ঃ "আমাদের পার্টি কংগ্রেস উত্থাপিত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী সমর্থন করে, কিন্তু অনুরূপভাবে আশা করে যে, স্বাধীন ভারতের রূপরেখা নির্দ্ধারণে কংগ্রেসও এই আত্মনিয়ন্ত্রমের নীতি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেবে।" তিনি জোরের সঙ্গে বলেন যে, "ভারতবাসীদের লড়াই ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে নয়; সকল ভারতবাসীকে অবশ্যই ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে—এটাই কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র আহ্বান।"[২৪]

এই মর্ম্মে কমিউনিস্ট পার্টির সর্ব্বশেষ প্রয়াস প্রতিফলিত হয় তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৪৭-এর জুন মাসের প্রস্তাবে। সেখানেও ব্রিটিশ শাসকদের ভাগ করে শাসন করার নীতি এবং হিন্দু-মুসলিম বিবাদ থেকে সুবিধা আদায়ের নীতির পরিণতি হিসাবে দেশ ভাগের যে অনিবার্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা প্রতিরোধ করার জন্য প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে হস্তক্ষেপ করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, "দেশবিভাগ আমাদের সমস্যাসমূহের সমাধান করবে না, বরং সেগুলিকে বাড়িয়েই তুলবে।" তাই কমিউনিস্ট পার্টি নূতনভাবে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও দেশের ঐক্যের জন্য সংগ্রামে সর্ব্বশক্তি নিয়োগের সংকল্প ঘোষণা করে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এই শেষ সংগ্রামে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য অংশগ্রহণের আবেদন জানায়।[২৫]

কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। ১৯৪৭-এর আগস্টে দেশ-ভাগের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা আসে। এই পর্ব্বে স্বাধীনতার চরিত্র নিয়ে যেমন পার্টির অভ্যন্তরে মতানৈক্য দেখা দেয়, তেমনই জাতিপ্রশ্নেও পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

।। তিন ।।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৪৮-এ অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক

থিসিসে সকল জাতিগোষ্ঠীর জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর পুনরুল্লেখ করে সংবিধানে তার অন্তর্ভুক্তি দাবী করা হয়। এই থিসিসে কংগ্রেসের আপোষকামী মনোভাব এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর অস্বীকৃতিকেই দেশভাগের ভয়ানক পরিণতির কারণ হিসাবে উল্লেখ করে বলা হয় যে, এই দাবী পুনরায় অস্বীকৃত হলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠবে এবং আগামীদিনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ কর্তৃক তাঁদের অসন্তোষকে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে।[২৬] এই পার্টি কংগ্রেসেই "সংস্কারবাদী বিচ্যুতি" সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ কবে বি.টি. রণদিভে বলেন যে, জাতিপ্রশ্নে একটি সঠিক বিপ্লবী অবস্থান গ্রহণ করা সত্ত্বেও পার্টি ক্রমশই বুর্জোয়াদের লেজুড় বৃত্তি করতে গিয়ে ধ্বংসাত্মক সংস্কারবাদের শিকার হয়ে পড়েছে। জাতিপ্রশ্নে পার্টির চিন্তায় শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য পায় নি। তাই পাকিস্তান দাবীর সঠিক চরিত্র তাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। কেবলমাত্র রজনী পাম দত্তের সমালোচনার পর থেকেই পার্টি এ বিষয়ে সচেতন হয়েছে বলে তিনি মতপ্রকাশ করেছেন।[২৭] তাঁর বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি পরোক্ষে মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্নতাকামী পাকিস্তান দাবীকেই সমর্থন জুগিয়েছে। তাঁর মতে, এক্ষেত্রে পার্টি মৌল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিক প্রয়োগ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে।[২৮] এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি.সি. জোশী নির্দয় ভাবে নিজের ভুলগুলির সমালোচনা করেন, যদিও তাঁর বক্তব্যে আবেগের প্রাধান্য লক্ষণীয় ছিল।

এই সময়ে পার্টির অভ্যন্তরে তীব্র মতাদর্শগত সংঘাত চলতে থাকে এবং তার পরিণতিতে দ্বিতীয় কংগ্রেসে নির্ব্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৫০-এ পুনর্গঠিত হয়। নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি নিজেদের মতাদর্শগত অবস্থান বিবৃত করে এক পার্টি চিঠি প্রকাশ করেন। এখানে বলা হয় যে, কমিউনিস্ট পার্টি সকল জাতি এবং বিকাশমান জনজাতিসমূহের সমানাধিকারের দাবির প্রতি সমর্থন জানাবে এবং তা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করবে; তাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক জীবনের সমান বিকাশের প্রয়াস চালাবে এবং বিচ্ছিন্নতার অধিকারসহ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী স্বীকার করে এক স্বেচ্ছামূলক ইউনিয়নের মধ্যে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর দাঁড়িয়ে নূতন কেন্দ্রীয় কমিটি সকল ভাষার প্রতি সমানাধিকারের দাবি সহ ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবী গ্রহণ করে এবং এই সংগ্রামকে জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণতন্ত্রের বৃহত্তর সংগ্রামের সাথে যুক্ত করতে আহ্বান জানায়।[২৯] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই সময়েই অন্ধ্র প্রদেশ থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ পার্টির অভ্যন্তরে বামপন্থী বিচ্যুতি সম্পর্কিত এক প্রতিবেদন পেশ করেন, যা কেন্দ্রীয় কমিটির মে-জুন মাসের অধিবেশনে গৃহীত হয়। ঐ প্রতিবেদনেও জাতিপ্রশ্নে আলোকপাত করা হয় এবং তাতে উপরোক্ত পার্টি চিঠির বক্তব্যই প্রতিফলিত হয়।[৩০]

এইরূপ অনেক মতাদর্শগত সংঘাতের পথ বেয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৫১ সালে তাদের প্রথম কর্ম্মসূচী প্রণয়নে সক্ষম হয়। এই কর্মসূচীর ২৬ নং ধারায় বলা হয় : "সকল জাতিরই আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ভারতের বিভিন্ন জাতির

জনসাধারণকে একই সাধারণ রাষ্ট্রগঠনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করবে তাদের সকলের স্বেচ্ছামূলক সম্মতির ভিত্তিতে; বলপ্রয়োগের ভিত্তিতে নয়।"[৩] লক্ষ্যণীয় যে, এই কর্ম্মসূচীতে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি উল্লিখিত হলেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারের কোন উল্লেখ নেই।

।। চার ।।

গোটা চল্লিশের দশক জুড়েই কমিউনিস্ট পার্টিতে জাতিপ্রশ্নে যে মতাদর্শগত আলোচনা দানা বেঁধে উঠেছিল তারই স্বাভাবিক প্রতিফলন ঘটেছিল ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের আন্দোলনে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, যদিও জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ভারতবর্ষে তার প্রয়োগ সম্পর্কে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গী সবসময় বাস্তবানুগ ছিল না এবং সোভিয়েত অভিজ্ঞতাকে যান্ত্রিকভাবে ভারতবর্ষে প্রয়োগ করতে গিয়ে তাঁরা নানা ধরনের বিপত্তি সৃষ্টি করে ফেলেছেন; তা সত্ত্বেও এদেশের বহু-জাতিক চরিত্রটিকে তাঁরা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—একথা অস্বীকার করা যায় না। তাই তাঁরা বৃহৎ জাতিসত্বাগুলির ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্খার বাস্তবায়নের জন্য ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং তৎসহ ক্ষুদ্র জাতিসত্বা ও আদিবাসী জনসাধারণের জন্য স্বায়ত্বশাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।

১৯৪৫-৪৬-এর প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্ব্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি বিশাল অন্ধ্র, ঐক্য কেরালা এবং সংযুক্ত মহারাষ্ট্র গঠনের দাবীর প্রতি সমর্থন জানায়। ক্যাবিনেট মিশনের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপি, গণপরিষদে সোমনাথ লাহিড়ী উত্থাপিত প্রস্তাব এবং ১৯৪৭-এর জুন মাসে গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে সুনির্দ্দিষ্টভাবে এই দাবী উল্লিখিত হয়। ১৯৫১ সালে গৃহীত পার্টি কর্ম্মসূচীতেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয় যে, "ভারতীয় ইউনিয়নের রাজ্যসমূহের বর্তমান সীমানা পরিবর্তন করে সাধারণ ভাষার নীতি অনুযায়ী তা পুনর্গঠিত করা হবে। দেশীয় রাজ্যসমূহ, যা এখনও রয়েছে, তার অবলুপ্তি ঘটিয়ে সংলগ্ন জাতিসত্বা অধ্যুষিত রাজ্যের অঙ্গীভূত করা হবে; এবং বিদেশী নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলিকে উদ্ধার করে একই নীতি অনুযায়ী পুনর্গঠিত করা হবে।" কর্ম্মসূচীতে আদিবাসী এলাকা ও জাতীয় সংখ্যালঘু এলাকাগুলির জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রদানেরও উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] বস্তুতঃ পক্ষে স্বাধীনোত্তর কালপর্ব্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পার্টি ভাষাভিত্তিক প্রদেশগঠনের আন্দোলনেই অধিকতর উৎসাহী হয়ে ওঠে। পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে এবং বাইরে এ বিষয়ে পার্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশদ আলোচনায়[৩] না গিয়েও বলা যায় যে, প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে পার্টি ভাষাপ্রশ্নে পৃথকভাবে মনোনিবেশ করেনি; যদিও সামগ্রিকভাবে জাতিপ্রশ্নে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গেই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ছিল। সংবিধান সভায় বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে কমিউনিস্টরা এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন। ভারতবর্ষের মতো বহু-ভাষাভাষী মানুষের দেশে সকল ভাষার সমানাধিকারের নীতি গ্রহণ এবং সর্ব্বভারতীয় যোগাযোগরক্ষাকারী ভাষার নামে

জোরপূর্ব্বক কোন ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা—ভাষাপ্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানতঃ এই দুটি নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার বিকাশের দাবীতে গুরুত্ব প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ভাষাকে শিক্ষা ও প্রশাসনের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি পার্টির ভাবনায় সর্ব্বাধিক গুরুত্বলাভ করেছে। একই সঙ্গে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণেও পার্টি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সর্ব্ব-ভারতীয় যোগাযোগ রক্ষাকাবী ভাষার প্রশ্নে অবশ্য পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীতে বিভিন্ন সময় পরিবর্তন এসেছে এবং এ বিষয়ে আভ্যন্তরীণ বিতর্কও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক পর্ব্বে পার্টি "হিন্দুস্তানী"-র পক্ষে মতপ্রকাশ করলেও পরবর্তী সময়ে হিন্দীভাষাকে সর্ব্বভারতীয় যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণের পক্ষে ও বিপক্ষে পার্টিতে পরস্পর বিরোধী মত গড়ে উঠেছে। যদিও শেষ পর্য্যন্ত পার্টি হিন্দীকেই সর্ব্বভারতীয় যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসাবে মেনে নিয়েছে, তা সত্ত্বেও জবরদস্তি হিন্দী চাপানোর ঝোঁকের বিবোধিতায় পার্টি বরাবরই সরব থেকেছে।

।। পাঁচ ।।

জাতিপ্রশ্নে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী এইভাবে এক দীর্ঘ ক্রমবিকাশের পথ বেয়ে স্বাধীনোত্তব কালপর্ব্বে সুনির্দ্দিষ্ট পরিণতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে পার্টির অভ্যন্তবে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মতাদর্শগত সংঘাতের তীব্রতার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৪ সালে পার্টি দ্বিখণ্ডিত হয় এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কস্‌বাদী) আত্মপ্রকাশ করে। ঐ বৎসরই কলকাতায় অনুষ্ঠিত নবগঠিত পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে (যদিও একঅর্থে এটি প্রথম কংগ্রেস, তা সত্ত্বেও মূল কমিউনিস্ট পার্টির ধারাবাহিকতা অনুসরণে একে সপ্তম কংগ্রেস বলা হয়েছে।) নূতন কর্ম্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতিপ্রশ্নে কোন সুনির্দ্দিষ্ট অবস্থান গৃহীত হয় নি। বিষযটির বিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করে পার্টি বিশদ আলোচনাব তাগিদে এই প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুলতুবী রাখে। ১৯৭১-এ কেন্দ্রীয় কমিটি জাতিপ্রশ্নে একটি নোট[৩৪] প্রস্তুত করে এবং বিস্তারিত আলোচনার পর ১৯৭২-এ মাদুরাই তে অনুষ্ঠিত পার্টির নবম কংগ্রেসে তা গৃহীত হয় এবং তদনুযায়ী পার্টি কর্মসূচীর ৮৮ নং ধারা সংশোধিত হয়। এই সংশোধিত ধারায় বলা হয় ঃ

"জনগণতান্ত্রিক ভারত হবে ভারতের জাতিসমূহের স্বেচ্ছামূলক ইউনিয়ন। স্বায়ত্বশাসন অস্বীকার কবে শাসক শ্রেণীগুলি যে কেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কস্‌বাদী) তার ঘোর বিরোধী এবং সমস্ত বিভেদকামী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনেরও বিরোধী।

দেশে যে বিভিন্ন জাতিসমূহ বসবাস করছে তাদের প্রভূত সমানাধিকার ও স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কস্‌বাদী) ভারতীয় ইউনিয়নের ঐক্যরক্ষার এবং সেই ঐক্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো তৈরী করার জন্য কাজ করছে।"[৩৫]

অন্যদিকে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (CPI) আরো চার বৎসর তাদের পূর্ব্বের

কর্ম্মসূচীই বহাল রাখে। ১৯৬৮ সালে পার্টি যে নূতন কর্ম্মসূচী গ্রহণ করে সেখানে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারসহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার ভারতের রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিহীন বিবেচনা করে বাদ দেওয়া হয় এবং গণতান্ত্রিক সমানাধিকার ও জাতিসমূহের স্বায়ত্বশাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৬৮]

উপসংহারে বলা যায় যে, যদিও কমিউনিস্ট পার্টি জাতিপ্রশ্নে ভারতীয় প্রেক্ষিত অনুযায়ী মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের মূলনীতিসমূহ প্রয়োগের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল; তা সত্ত্বেও প্রথমাবধি এ বিষয়ে পার্টির যথেষ্ট দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ভারতবর্ষে জাতিসমস্যার বাস্তবতা অনুধাবনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার কারণে সোভিয়েত অভিজ্ঞতার যান্ত্রিক অনুসরণ পার্টিকে কার্যতঃ দিশাহীন করে তুলেছে। প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বে জাতিপ্রশ্নে বারংবার অবস্থান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই দিশাহীনতা প্রকটিত হয়েছে। আবার, পার্টির অভ্যন্তরে মতাদর্শগত বিতর্ক এ বিষয়ে পার্টি দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বচ্ছতর করে তোলার পরিবর্তে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। ফলে, এমন ধারণাও সৃষ্টি হয়েছে যে, জাতিপ্রশ্নে পার্টির গৃহীত অবস্থান যতখানি মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ সম্মত তার চেয়ে অনেক বেশী তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রয়োজন-সঞ্জাত। স্বাধীনোত্তর কালপর্বে অবশ্য পার্টি জাতিপ্রশ্নে শেষ পর্য্যন্ত একটি গণতান্ত্রিক অবস্থান গ্রহণে সক্ষম হয় এবং ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারই ফলে বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে সেই সময় পার্টি যথেষ্ট অগ্রগতিলাভে সমর্থ হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, ১৯৫০-৬০-এর দশকের এই সীমাবদ্ধ সাফল্যের ক্রমপ্রসারের মাধ্যমে ভারতবর্ষের জনজাতিসমূহের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্খার বাস্তব রূপায়ণের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের ভূমিকা এখনও পর্য্যন্ত আশাব্যঞ্জক নয়।

সূত্রনির্দেশ

১। বর্তমান নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে মার্কসীয় তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে লেখকের অপর নিবন্ধ, "জাতিপ্রশ্ন, মার্কসবাদ ও ভারতবর্ষ ঃ একটি তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট," **সমাজ জিজ্ঞাসা**, ২য় বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃঃ ৯৭-১০৮, দ্রষ্টব্য।

২। C.P.I., "1930 Draft Platform of Action of Indian Communists" as reprinted in V.B. Karnick (ed.), **Indian Communist Party Documents, 1930-56,** Bombay, 1957.

৩। Gangadhar Adhikari, "Pakistan and National Unity" in T.G. Jacob (ed.), **National Question in India : CPI Documents, 1942-47.** Odyssey Press, New Delhi, 1988, p-49.

৪। Quoted in Gene D. Overstreet and Marshall Windmiller, **Communism**

in India, Berkeley, 1959, p-491.

৫। **Ibid,** p-492.

৬। **Ibid,** p -

৭। C.P.I., "On Pakistan and National Unity" as reprinted in T.G. Jacob, **op. cit,** p-31.

৮। **Ibid,** pp-30-31.

৯। **Ibid,** pp- 31-32.

১০। Gangadhar Adhikari, "Pakistan and National Unity" in T.G. Jacob, **op. cit.,** pp 63-64.

১১। B.T. Randive, "National Unity and the League", **People's War,** September 20, 1942.

১২। P.C. Joshi, "They Must Meet Again", as quoted in Bhawani Sen Gupta, **Commnuism in Indian Politics,** New York, 1972, p-17.

১৩। **People's War,** February 7, 1943.

১৪। C.P.I., "New Situation and our Tasks" as reprinted in T.G. Jacob, op.cit, p-159.

১৫। Ibid, p-175-78.

১৬। R.P. Dutt, "India and Pakistan" in **Labour Monthly,** March. 1946, pp-83-93.

১৭। R.P. Dutt, "Monthly Notes", **Labour Monthly**, March, 1946, p-

১৮। R.P. Dutt "Freedom for India" in T.G. Jacob, **op.cit,** p-179.

১৯। C.P.I. "Memorandum of the CPI to the British Cabinet Mission", **People's Age,** April 21, 1946

২০। C.P.I., Central Committee Resolutions as quoted in Sri Prakash, "CPI and Pakistan Movement" in Bipan Chandra (ed.), **The Indian Left : Critical Appraisals,** Vikas, New Delhi, p-254.

২১। S. Zaheer, "League Convention", **People's Age**, April 21, 1946.

২২। Gangadhar Adhikari. "Resurgent India at the Crossroads", January, 1947, as quoted in Sri Prakash, **op.cit,** p-255.

২৩। CPI, "Draft Resolutions for the Constituent Assembly", **People's Age,** December 15, 1946.

২৪। Somenath Lahiri, "Speech in the Constituent Assembly" in **People's Age,** December 29, 1946.

২৫। C.P.I., "Mountbatten and After" as reprinted in T.G. Jacob, op.cit., p-212.

২৬। C.P.I., Political Thesis adopted at the Second Congress, M.B. Rao(ed.), **Documents of the History of the Communist Party or India,** People's Publishing House, New Delhi, 1976, p-115.

২৭। B.T. Randive, "Report on Reformist Deviations", Ibid, pp. 167-177.

২৮। Ibid, p-175.

২৯। C.P.I., Letter of the New Central Committee, Ibid, pp-651-52.

৩০। C.P.I., Report on Left Deviation Inside the CPI, Ibid, p-764.

৩১। C.P.I., 1951 The Programme of the CPI, **Documents of the History of the Communist Party of India,** Vol VIII, PPH, New Delhi, 1977, p-10.

৩২। Ibid pp. 10-11.

৩৩। ভাষাপ্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনার জন্য লেখকের অপর নিবন্ধ ঃ "Language Syndrome in Post Independence India . A Note on the Communist Discourse in the Sixties", **Politics and Society,** Vol II, 1997-98, দ্রষ্টব্য।

৩৪। C.P.I (M), "Central Committee's Note on National Question in India" in **People's Democracy,** VII (48), November 28, 1971.

৩৫। C.P.I. (M), **Programme of the CPI (M)** [as amended in 1972], New Delhi, 1977, Para 88

৩৬। C.P.I., **Programme of the CPI,** New Delhi, 1968, p-50.

চারু মজুমদারের 'আটটি দলিল' : একটি পর্যালোচনা

চন্দন বসু

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়বস্তু নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রধানতম নেতা চারু মজুমদারের বিখ্যাত 'আটটি দলিল' বা 'Eight Documents' এর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা।[১] সমগ্র আলোচনাটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, চারু মজুমদার কোন প্রেক্ষিতে এই আটটি দলিল লিখেছিলেন। দ্বিতীয়ত, এই আটটি দলিলে তাঁর মূল বক্তব্য কি? তৃতীয়ত, সামগ্রিকভাবে এই আটটি দলিলের সঙ্গে নকশালবাড়ী আন্দোলনের সম্পর্ক কি?

সাধারণভাবে একথা বলা যেতে পারে চারু মজুমদারের আটটি দলিল নকশালবাড়ী আন্দোলনের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং এর গতিধারাকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল। চারু মজুমদার এই আটটি দলিল রচনা করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও সর্বোপরি দেশব্যাপী আর্থ-সামাজিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে১৯৬৪ সাল একটি জলবিভাজিকা বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্টপার্টিতে ভাঙন ঘটে এবং ফলশ্রুতিরূপে CPI(M) এর জন্ম হয়। চারু মজুমদার CPI(M) এর গঠনকে সমর্থন জানান কারণ তাঁর মনে হয়েছিল নতুন পার্টির প্রতিষ্ঠার ফলে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে 'বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার সুযোগ' পাওয়া যাবে।[২] চারু মজুমদার এই সময় বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার সম্ভাবনায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন। সৌরেন বসুর লেখা থেকে জানা যায়' ৬৫ সালের গোড়া থেকেই কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়। এর ফলে CPI(M) এর অধিকাংশ নেতা কারারুদ্ধ হন। অসুস্থতার জন্য চারু মজুমদার বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে অনুপস্থিত থাকতেন। সম্ভবত এই কারণে তিনি গ্রেপ্তারী এড়াতে সক্ষম হন।[৩] এই সময় চারু মজুমদারের মনে হয় যেহেতু সরকারী নিপীড়নের ফলে প্রথম সারির অধিকাংশ নেতাই কারারুদ্ধ,পার্টির কর্মসূচী বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয় অথচ পার্টির কর্মীরা এই জাতীয় বিশ্লেষণ সাগ্রহে চাইছে, তাই প্রথমেই প্রয়োজন বর্তমান পরিস্থিতিকে পার্টি কর্মীদের সামনে বিশ্লেষণ করা। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই চারু মজুমদারের একক দলিল রচনা শুরু হয়, ৬৫ সালের জানুয়ারীর শেষ ভাগ থেকে। প্রথম পাঁচটি দলিল রচিত হয় ১৯৬৫ এর জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। ষষ্ঠ দলিল রচিত হয় ১৯৬৬ তে। সপ্তম ও অষ্টম দলিল রচিত হয় ১৯৬৭ এর এপ্রিলের মধ্যে।

প্রথম দলিল 'Our Task in the Present Situation' এ তিনি ধনতন্ত্রের সঙ্কটের প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট কর্মীদের কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে গণতন্ত্রের উপর

আঘাত হল ধনতান্ত্রিক সঙ্কটের প্রধানতম লক্ষণ। এই প্রেক্ষিতে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রধান কর্তব্য এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করা সম্ভব কেবলমাত্র বিপ্লবী পার্টির বিকাশের মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে খুব স্পষ্ট ভাবে মনে রাখা দরকার চারু মজুমদার কিন্তু প্রকাশ্য পার্টি সংগঠনের কথা ভাবেননি। তিনি গোপন পার্টির কথাই ভেবেছিলেন। এই গোপন পার্টির মূল ভিত্তি হবে গোপন সক্রিয় কর্মী দল বা Activist group।[৪] এই গোপন পার্টির মূল কার্যসূচী হবে কৃষি বিপ্লব সফল করা। কৃষি বিপ্লবের প্রশ্নে তাঁর উপর মাও সে তুঙের চিন্তা এবং চীন বিপ্লবের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

পরবর্তী বিভিন্ন দলিলে (বিশেষত দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম) চারু মজুমদার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেন।[৫] এই প্রসঙ্গে তিনি শুধু মাত্র আর্থিক দাবির ভিত্তিতে শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণীর আন্দোলনকে সংঘটিত করার প্রচেষ্টাকে তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁর মতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নকে বাদ দিলে শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণীর আন্দোলন সংশোধনবাদী মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তাই শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর আশু কর্তব্য রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য নিজেদের সংগঠিত করা। চতুর্থ ও পঞ্চম দলিলে তিনি গোপন কর্মীদের মাধ্যমে সশস্ত্র সংগ্রামকে বিকশিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গোপন কর্মীদের লক্ষ্য হবে এলাকা ভিত্তিক ক্ষমতা দখল করা।[৬]

ষষ্ঠ দলিলে চারু মজুমদার আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে যথাক্রমে সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে চীন হল বর্তমানে বিশ্ব বিপ্লবের কেন্দ্র। ফলতঃ চীনের কমিউনিস্টপার্টির বিরোধিতা করার অর্থ বিপ্লবী রাজনীতি ও শোষিত জনগণের বিরোধিতা করা।[৭]

সপ্তম দলিলে চারু মজুমদার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধী আন্দোলনকে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরিত করার কথা বলেন। তিনি বলেন ভারতের মত আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষকই প্রধান সামাজিক শক্তি—সুতরাং সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলই ভারতে প্রধান রাজনৈতিক কাজ। এর জন্য প্রয়োজন শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রী স্থাপন। তিনি মন্তব্য করেন, "The people of India have become rebellious against this intolerable situation. In this situation, the revolutionary resistance movement or armed partisan struggle of the revolutionary Marxist-Leninst Party against reaction and the passive resistance movement of the revisionist Party have today become the main part of the Party's politics. So every Party member and revolutionary cadre will have to grasp this tactic of struggle. They should learn to practise it and temper the revolutionary spirit of the masses through propaganda among the mases."[৮]

অষ্টম দলিলে চারু মজুমদার সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সশস্ত্র সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। CPI(M) কে তিনি সংশোধনবাদী দল বলে চিহ্নিত করেন কারণ CPI(M) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা বলে। তাঁর মতে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারী ক্ষমতা দখল করা সংশোধনবাদের পরিচায়ক, এই সময় বরং প্রয়োজন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ধ্বংস করা। অষ্টম দলিল তিনি শেষ করেন তিনটি

স্লোগানের মাধ্যমে :—

(১) Revolutionaries of the world unite!

(২) Long live the revolutionary unity of workers and peasants!

(৩) Long live Chairman Mao Tse-tung!

চারু মজুমদারের এই আটটি দলিলকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি প্রথম থেকেই গোপন পার্টি সংগঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। গণভিত্তি ও জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলেন। এই দিক থেকে দেখলে সপ্তম দলিলের বক্তব্য অন্য দলিলগুলির থেকে আলাদা। এই প্রসঙ্গে আরো মনে রাখা দরকার গোপন পার্টি সংগঠন গড়ার প্রয়াস চারু মজুমদারকে প্ররোচিত করেছে ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির স্বাধিকারের বিরোধিতা করতে। একইভাবে খতম অভিযানকেই তিনি কৃষি বিপ্লব সফল করাব একমাত্র উপায় বলে মনে করেছেন।

চারু মজুমদারের চিন্তার নানা টানাপোড়েন ও বৈপরীত্য এই আটটি দলিলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে তিনি শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যের কথা বলেছেন, আবার অন্যদিকে গোপন সংগঠনের মাধ্যমে খতম অভিযানের কথা বলেছেন। আবার একই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির আন্দোলন বর্জন করার কথাও বলেছেন। তাঁর চিন্তার এই টানাপোড়েন ও পরবর্তীকালে CPI(ML) এর একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত দল রূপে গড়ে ওঠার ব্যর্থতার মধ্যে নিঃসন্দেহে সমীকরণ টানা যায়। CPI(ML) এর আন্দোলনের মধ্যে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্থাপনের প্রচেষ্টার চেয়ে খতম অভিযানের মাধ্যমে দ্রুত বিপ্লব ঘটানোর এক উগ্র বিপ্লবী স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার চেষ্টা ও প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়।

উপসংহারে বলা যায় নকশালপন্থী রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গোপন সংগঠনের প্রভাব ও গণসংগঠনের অভাবে এই আন্দোলন গণতন্ত্র বর্জিত হয়ে পড়ে। গণতন্ত্র বর্জিত কোন আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সফল হয়না।

সূত্রনির্দেশ

১। নকশালবাড়ী আন্দোলন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য শঙ্কর ঘোষের **The Naxalite Movement** (কলিকাতা, ১৯৭৪), বিপ্লব দাশগুপ্ত, **The Naxalite Movement** (নতুন দিল্লী, ১৯৭৪), এ কে রায় **The Spring Thunder and After** (কলিকাতা, ১৯৭৫), সুমন্ত ব্যানার্জী **In The Wake of Naxalbari** (কলিকাতা, ১৯৮০), মারিয়াস দামাস, **Approaching Naxalbari** (কলিকাতা, ১৯৯১) প্রভৃতি। চারু মজুমদারের 'আটটি দলিলের' জন্য মারিয়াস দামাসের **Approaching Naxalbari**-এর পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। এছাড়া নকশালবাড়ী আন্দোলনের পূর্বক্ষণের আন্তঃপার্টি সংগ্রাম ও বিভিন্ন দলিলের উপর বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য প্রদীপ বসু রচিত 'নকশালবাড়ীর পূর্বক্ষণ—কিছু পোস্ট মডার্ণ ভাবনা' (কলিকাতা, ১৯৯৮)।

২ সৌরেন বসু, ' চারু মজুমদারের কথা' (কলিকাতা, ১৯৮৯) পৃ-৮৪।

৩ তদেব, পৃ ৮৪-৮৫।

৪ এই প্রসঙ্গে চারু মজুমদারের বক্তব্য, "What is the main basis for building up a revolutionary organisation? Comrade Stalin has said: 'The main basis for building up a revlolutionary organisation is the revolutionary cadre.' Who

is a revolutionary cadre? A revolutionary cadre is he who can analyse the situation at his own initiative and can adopt policies according to that. He does not wait for any one's help. Every party member must form at least one Activist group of five. He will educate the cadres of this activist group in political education." এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য মারিয়াস দামাসের '**Approaching Naxalbari**', পৃ-২৪২-২৪৫।

৫) দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দলিলের নাম যথাক্রমে 'Make the People's Democratic Revolution Successful by Fighting Against Revisionism,' 'What is the Source of the Spontaneous Revolutionary Outburst in India,' 'Carry on the Struggle Against Modern Revisionism,' 'What Possibility The Year 1965 is Indicating?, তদেব, পৃ ২৪৪-২৫৯।

৬) এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "Among the peasant masses the most urgent and the main task of the party will be to form party groups and explain the programme of the agrarian revolution and the tactics of area-wise seizure of power. Through this programme, the poor and landless peasants will be established in the leadership of the peasant movement.", তদেব, পৃ ২৫৫।

৭) ষষ্ঠ দলিলের শিরোনাম 'The Main Task Today is the Struggle to Bulid Up the True Revolutionary Party Through Uncompromising Struggle Against Revisionism., তদেব, পৃ ২৬০।

৮) দ্রষ্টব্য সপ্তম দলিল: 'Take This Opportunity', তদেব, পৃ ২৬৫।

৯) দ্রষ্টব্য অষ্টম দলিল ঃ 'Carry Forward the Peasant Struggle By Fighting Revisionism, তদেব, পৃ ২৬৭।

ভারতীয় পরিবেশের সংকটের প্রেক্ষিতে চোরাশিকার ও সংরক্ষণ আইন ঃ স্বাধীনতা উত্তর যুগ

মহুয়া সরকার

পরিবেশবাদ ও পরিবেশসংক্রান্ত ভাবনাচিন্তাকে আধুনিক যুগের উত্তরসূরী বলা হয়। ঔপনিবেশিক ভারতে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে অরণ্য আইন ও নানা সংরক্ষণ আইনের মাধ্যমে পরিবেশভাবনার উদ্ভব হয়। ১৮৬৪ সালে বনদপ্তর সৃষ্ট হয় এবং ১৮৬৫ সালে প্রথম ভারতীয় অরণ্য আইনের জন্ম হয়।[১] সেই থেকে সূচনা হয় বনদপ্তরের দ্বারা গভীর, মধ্যবর্তী ও গভীরতর অরণ্যের চিহ্নিতকরণ। চোরাশিকার বন্ধ করার জন্য একের পর এক আইন বলবৎ হতে থাকে। ১৮৭৮ সালে দ্বিতীয় অরণ্য আইনের দ্বারা ভারতীয় মননে পরিবেশসংক্রান্ত ঔপনিবেশিক ভাবনা আরো দৃঢ়মূলে প্রোথিত হয়।[২]

এই আইনগুলির মাধ্যমে পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতীয় স্বকীয়তা ক্ষুণ্ণ হয় এবং উপনিবেশের সংস্কৃতির দ্বন্দ্বও পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল স্বাধীনতাপরবর্তী যুগেও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে ভারতীয় আইনে সংরক্ষণ নিয়ে যথার্থ চিন্তাভাবনা হল কিনা তার অনুসন্ধান করা।

বিশেষ ভাবে দুটি ভারতীয় বন্যপ্রাণী—বাঘ ও হাতির বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে বর্তমান প্রবন্ধে সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বাঘ ও হাতি সম্পর্কে আলোচনায় প্রাথমিকভাবে বলা যায় যে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ও সমস্ত জনজাতিদের মধ্যেই প্রাচীন যুগ থেকেই এই দুটি প্রাণীকে সংরক্ষণ করার বিশেষ পদ্ধতি ও প্রণালী ছিল, তার প্রকাশ ঘটে এই দুটি প্রাণীকেকেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্মাচরণ, গান, ছড়া ও টোটেমের মাধ্যমে। বাংলায় হিন্দুদের মধ্যে বাঘ জগদ্ধাত্রী বা নারী শক্তির বাহনরূপে পরিচিত; কেরালায় ব্যাঘ্ররাজা আয়াপ্পানের কাহিনী, দক্ষিণ ও উত্তর বাংলায় দক্ষিণরায়ের গানের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।[৩] এছাড়া সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হস্তীরূপে গণেশ দেবতার পূজা, বাংলায় মাহুত, মইলের গান, ছৌ নাচে বাঘ ও হাতিপুজার যে নৃত্যভঙ্গি[৪], তা দেখে মনে হয় যে এই দুটি প্রাণী সম্পর্কে অজস্র কিংবদন্তী, ভয়মিশ্রিত ভক্তি ও সংরক্ষণেরও নিজস্ব কিছু কিছু রীতি প্রচলিত ছিল। ঔপনিবেশিক যুগে সৃষ্ট ভারতীয় আইন, যুক্তিবাদ, ও তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক পরিবেশবাদ এই দেশজ ধারাকে স্বীকৃতি দেয় নি। কারণ, ঔপনিবেশিক পরিবেশভাবনায় ছিল শোষণমূলক অর্থনীতি বনাম সংরক্ষণের এক বিচিত্র সংকটময় অস্তিত্ব। একদিকে অরণ্যধ্বংসের বা বৃক্ষছেদনের বিরুদ্ধে আইন, অন্যদিকে জাহাজ তৈরী. রেলের স্লিপার নির্মাণ ইত্যাদির জন্য বিপুল গাছকাটার আয়োজন। এই সংকটের দ্বারা ভারতীয় পরিবেশ ভাবনা ব্যাহত হয়।[৫]

শিল্পসম্মত পাশ্চাত্য দুনিয়ার দ্রুত পরিবর্তনশীল ভোগ্য সংস্কৃতির চাহিদা মেটাতে ভারতীয় ট্রপিক্যাল (সরলবর্গীয়) ফরেস্ট এবং বণ্যপ্রাণীর ব্যাপক নিধন শুরু হয়ে যায়। বাঘের ক্ষেত্রে বাঘের চামড়া, হাড় ও দাঁতের শৌখিন বাজার, হাতির ক্ষেত্রে হাতির দাঁতের সর্বাঙ্গীন চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পূর্বেকার ক্ষুদ্রায়তন বাজারের পরিবর্তে বৃহৎ আন্তর্জাতিক বাজারের যোগান মেটাতে উপনিবেশের অরণ্যের বৃক্ষছেদন ও পশু নিধনের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।[৬]

স্বাধীনতার পরে, ভারতবর্ষে resource use-এর এই প্রবণতায় কোন পরিবর্তন হয় নি। আইনতঃ IUCN Red list অনুসারে ভারতীয় রাষ্ট্র হাতিকে বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের তালিকায় এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রেখেছে (১৯৭২)।[৭] ১৯৭৬ সালে স্টকহোলম্ শহরে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের CITES বা (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) সম্মেলনে ভারত ছিল প্রথম সাক্ষরকারী দেশ।[৮] সেখানে হাতিসংক্রান্ত সমস্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়। তারও অনেক পরে ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আভ্যন্তরীণ হাতির দাঁতের বাণিজ্যকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[৯] বাঘের ক্ষেত্রেও জে.জে. দত্ত কমিটি বা ১৯৭০ সালের সুব্রহ্মণ্যম কমিটির রিপোর্টে ব্যাঘ্র নিরাপত্তা বিষয়ক অনেক আইন প্রচলন করার কথা বলা হয়।[১০]

অথচ, কার্যতঃ এই আইনগুলি প্রচলন বা যথাযথভাবে কার্যকর করা হয় নি। ক্রমবর্ধমান শিকার ও চোরাশিকারীদের বৃদ্ধি ও দমনের প্রক্রিয়া ব্যর্থ হবার অনেকগুলো কারণ আছে। ভারত স্বাধীন হলেও পরিবেশসংক্রান্ত চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আইন ও সংস্কৃতির পরিকাঠামো থেকে ভারতীয় মনন মুক্তি পায় নি। সংরক্ষণ, শিকার, চোরাশিকার ইত্যাদি প্রতিটি ভারতীয় ধারণাই পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক বা পশ্চিম দর্শন থেকে উদ্ভূত।[১১] ঔপনিবেশিকরা ভারতীয় কল্পনায় বন্যপ্রাচ্য বা Wild Orient সম্পর্কে কয়েকটি কৃত্রিম নির্মিতির সৃষ্টি করেছিল, যা ভারতীয় চেতনায় আজ অবধি অব্যাহত আছে।

তাই হাতি ও বাঘের মত অরণ্যসম্পদের সংখ্যা ক্রমশঃই বিলীয়মান হচ্ছে। ১৯৯০ সালের শান্তিয়াপিল্লাই ও জ্যাকসন রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান ভারতে দশটি হাতির দলও নেই, যাতে ১০০০টি হাতির সংখ্যা আছে।[১২] প্রোজেক্ট টাইগার-এর প্রাথমিক সাফল্যের পর ভারতে বাঘের সংখ্যা ১৯৮৯ সালে ৪৩৪৪ থেকে ১৯৯৩ তে ৩৭৫০, তে এসে পৌছেছে।[১৩]

এই সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার অনেক কারণ আছে। ১৯৯২ সালের ৩১শে অক্টোবর উড়িষ্যা জেলার বারিপদায় একটি বিচারালয়ে এই সর্বপ্রথম ৬ জনের মধ্যে মাত্র একজনের নীলগিরি রেঞ্জে চোরাশিকার করার জন্য শাস্তি হয়েছে।[১৪] এই অপরাধীদের শাস্তিপ্রদানের উদাহরণ প্রায় বিরল। বিশেষ করে চোরাশিকারীরা প্রায়শঃই অর্থনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করে। চোরাশিকারের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ আইনকে কার্যকরী করার সমস্যা অনেক। কেন্দ্র ও রাজ্যের সংরক্ষিত অঞ্চলগুলির মধ্যে বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য নেই। দেশের অরণ্যদপ্তরকে প্রয়োজনীয় অর্থ, শিক্ষা, ও সরঞ্জাম দিয়ে শক্তিশালী করে তোলা হয় নি। Non-wildlife enforcement agency বা বিভিন্ন বেসরকারী (N.G.O.) বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির সঙ্গে সরকারের প্রকৃত যোগাযোগ স্থাপন করা হয়নি।

এছাড়া, অসংরক্ষিত বলে চিহ্নিত এলাকা, যা হাতিদের চলাচলের পথ, সেই অঞ্চলে চোরাশিকারের বিরুদ্ধে কোন action squad গড়ে তোলা হয় নি। আক্ষরিক অর্থে গোয়েন্দা বিভাগেরই এই বিষয়ে যথার্থ সচেতনতার অভাব দেখা যায়। অরণ্যদপ্তরের রক্ষীদের উন্নতমানের সুযোগসুবিধা দিয়ে তাদের সঙ্গে চোরাশিকারীদের গোপন লেনদেন বন্ধ করারও চেষ্টা সেভাবে হয়নি। অতিদ্রুত ময়নাতদন্ত ও toxiological test কে আরো বিজ্ঞানসম্মত করলেও সমস্যার আংশিক সমাধান করা যায়। Salt Leak বা নুনিগুলিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে ঐ স্থানে বা হ্রদের জলে বিষপ্রয়োগকে বন্ধ করা যায়। মিউজিয়াম, ব্যক্তিগত ধনীগৃহ, মন্দির ও কাষ্ঠব্যবসায়ীদের গৃহে যথার্থ অনুসন্ধানের মাধ্যমেও চোরাশিকারীদের দ্রব্যবিক্রয় বন্ধ করা যায়। পুলিশ, শুল্কবিভাগ ও পার্লামেন্টের নানা কার্যকলাপের মাধ্যমে চোরাশিকারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট জনমত গঠন করাও একান্ত প্রয়োজন। প্রতিটি প্রদেশের মধ্যে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গেও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বোঝাপড়া করা উচিত। কারণ, সীমান্ত-সংলগ্ন অরণ্য এলাকাগুলিতেই চোরাশিকারের সমস্যা বেশি। এই সমস্যা প্রায়শঃই স্বাভাবিক কারণেই রাজনৈতিক আকার ধারণ করে।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতের পরিবেশের সংকটের প্রেক্ষিতেই চোরাশিকার বন্ধ করতে নতুন ভাবে সংরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। ব্রিটিশ সৃষ্ট আইনের পরিকাঠামোর বাইরে নতুন স্বকীয় চিন্তাচেতনার প্রয়োজন, যা ভারতীয় পরিবেশ ভাবনাকে নতুন মাত্রা দেবে। উন্নয়নখাতে রসদের ব্যবহারের বিষয়টি সম্পর্কেও নতুন করে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন।

সূত্রনির্দেশ

১। **শতবর্ষ স্মরণিকা**, ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দেরাদুন, ১৯৬৫, পৃ ১-৩।

২। তদেব, পৃ. ১০-১৩।

৩। করণ সিং, **কৈলাশ সাংখালা স্মৃতি বক্তৃতা** ডবলিউ ডবলিউ এফ-ইন্ডিয়া সেক্রেটারিয়েট, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৯৫।

৪। আর বেদী, **এলিফ্যান্ট, লর্ড অফ দি জাংগল**, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নিউ দিল্লী।

৫। বিস্তারিতভাবে জানার জন্য,

(ক) রামচন্দ্র গুহ, **দিস ফিশারড ল্যাণ্ড**, নিউ দিল্লী, ১৯৯৩ (খ) মহেশ রঙ্গরাজন, **ফেনসিং দ্য ফরেস্ট**, নিউ দিল্লী, ১৯৯৬।

৬। তদেব।

৭। এ্যানন, **দ্য এলিফ্যান্ট ডিলেমা**, CITES, আন্তর্জাতিক পত্রিকা, আরজেনটিনা, ১৯৯৫, পৃ. ২৫।

৮। ই.বি. মার্টিন, 'দ্য রাইজ এন্ড ফল অফ দ্য আইভরি মার্কেট' মূল গ্রন্থ—**এলিফ্যান্টসঃ ম্যাজেস্টিক ক্রীচার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড**, লন্ডন, ১৯৯০, পৃ. ৩০।

৯। ভি মেনন., **ওয়াইল্ডলাইফ ট্রেড**, নিউ দিল্লী, ১৯৯৪, পৃ.২।

১০। ভি মেনন, রামন সুকুমার, অশোককুমার, **এ গড ইন ডিসট্রেস**, নিউ দিল্লী, ১৯৯৭।

১১। রঞ্জন চক্রবর্তী, **দ্য জাঙ্গল, দ্য ইম্পিরিয়াল হান্ট এন্ড ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজম**, মূল গ্রন্থ—পালিত ও ভট্টাচার্য, **সায়েন্স, টেকনলজি, মেডিসিন এন্ড এনভারনমেন্ট ইন ইন্ডিয়া**, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২০৪-২১৭।

১২। সি. শান্তিয়াপিল্লাই ও পি.জ্যাকসন, **IUCN SSC, এশিয়ান এলিফ্যান্ট এ্যাকশন প্ল্যান**, দিল্লী, ১৯৯০।

১৩। দ্য টাইগার কল, WWF, নিউ দিল্লী, মার্চ, ১৯৯৬, ভূমিকা।

১৪। সাক্ষাৎকার, বি মহান্তি, সেক্রেটারি, Wildlife Society of Orissa, 1997.

ত্রিপুরি কংগ্রেস : একটি পর্যালোচনা

গিরিশচন্দ্র মাইতি

ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৩৯-এর মার্চ মাসে ত্রিপুরিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনকে একটি সন্ধিকাল বলা যেতে পারে। আগের বছরের কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু বামপন্থীদের সমর্থনে গান্ধী-মনোনীত প্রার্থী ডা. পট্টভি সীতারামায়াকে নির্বাচনদ্বন্দ্বে পরাজিত করে এই কংগ্রেসের সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন। ত্রিপুরি কংগ্রেসের সামনে প্রধান প্রশ্ন ছিল দেশকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে পরিচালিত করা হবে না তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসা হবে? এই প্রশ্নের যে-মীমাংসা ত্রিপুরি কংগ্রেসে হয়েছিল তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছিল। সেই ইতিহাস পর্যালোচনাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

এক

১৯৩৪ সালে আইন অমান্য আন্দোলন চূড়ান্ত ভাবে প্রত্যাহারের পর থেকে দক্ষিণপন্থীরা বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক পথে স্বরাজ লাভের স্বপ্ন দেখছিলেন। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন কার্যকর করতে পারলে তাঁদের সেই স্বপ্ন সফল হবে বলে তাঁরা ভেবেছিলেন। ১৯৩৭-এ এই আইনের প্রাদেশিক অংশ কার্যকর করার পর তাঁদের নেতা গান্ধী 'কংগ্রেস মন্ত্রিসভা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন . এই ভাবে দু' পক্ষ—কংগ্রেস ও ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা—নিজের নিজের ইতিহাস, শিক্ষাদীক্ষা ও লক্ষ্যের কথা মনে রেখে একে অপরকে রূপান্তরিত করবে। যদি ইংরেজরা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারে তা হলে এক বিন্দুও রক্ত না ঝরিয়ে স্বাধীনতা এসে যাবে।[১] তাঁদের পরবর্তী কর্মসূচি ছিল ভারত শাসন আইনের অপর অংশটি অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা।

অন্যদিকে, তিরিশের দশকে শক্তিশালী হয়ে ওঠা বামপন্থীরা চাইছিলেন সংগ্রামী কর্মপন্থা অনুসরণ করতে। তাই তাঁরা ভারত শাসন আইনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেস এর প্রাদেশিক অংশটি কার্যকর করেছিল। সভাপতি জওহরলাল এই আইনকে 'দাসত্বের সনদ' আখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিষয়ে তিনি দক্ষিণপন্থীদের চাপের কাছে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করেন। ১৯৩৮-এ কংগ্রেস সভাপতি হয়ে সুভাষচন্দ্র প্রথম থেকেই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৯৩৭-এর অক্টোবরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং পরে হরিপুরা কংগ্রেস এই পরিকল্পনাকে ধিক্কার জানিয়ে এর সম্পূর্ণ বিরোধিতার প্রস্তাব নেয়। তা সত্ত্বেও গান্ধী ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীরা একে

শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করার বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে গোপন আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন।[২] এই গোপন আলোচনার সংবাদ ব্রিটিশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর সুভাষচন্দ্র এ ধরনের প্রচেষ্টার প্রবল বিরোধিতা করেন।[৩] তিনি চেয়েছিলেন কোনও প্রকার বোঝাপড়ায় না গিয়ে আসন্ন আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করতে। সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিখ চুক্তির পর তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন ইউরোপ দ্রুত যুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংগ্রাম যাতে শুরু করা যায় সেই উদ্দেশ্যে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে চরমপত্রের আকারে ভারতের দাবি পেশ করার কথা বলেন। সারা দেশে এ নিয়ে তিনি প্রচারও শুরু করেন এবং তা দেশের মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[৪] গান্ধী এতে বিরক্ত হন। ২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৮-এ তিনি সুভাষচন্দ্রকে লেখেন, 'যুক্তরাষ্ট্র ও চরমপত্র নিয়ে তোমার অবিরাম ভীতি প্রদর্শন আমি পছন্দ করছি না।'[৫]

সুভাষের প্রতি গান্ধীর বিরাগের আরও কিছু কারণ ছিল। সেগুলির একটি হল, বিভিন্ন রাজ্যে কৃষক সংগ্রামের প্রতি কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির নীতি ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি দক্ষিণপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বামপন্থীদের ক্ষোভের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতৈক্য।[৬] ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে নাগরিক অধিকার সম্পর্কে গান্ধীর মুসাবিদা করা প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বামপন্থীরা সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন। তাঁদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় এবং তাঁরা সভা থেকে বেরিয়ে যান। প্রস্তাবের ওপর আলোচনার সময় সভাপতি সুভাষচন্দ্র তাঁদের অনেককে দীর্ঘ সময় ধরে বলার সুযোগ দিয়েছিলেন। বামপন্থীদের প্রতি সুভাষচন্দ্রের এই সহমর্মিতা গান্ধী ও তাঁর অনুগামীরা মোটেই সুনজরে দেখেননি।[৭] ১৫ অক্টোবর 'হরিজন' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে গান্ধী বামপন্থীদের সভা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনারও কড়া সমালোচনা করেন। তিনি লেখেন ১৯২০ সাল থেকে কংগ্রেস এক ইচ্ছাশক্তি, এক নীতি, এক লক্ষ্য এবং যথাযথ শৃঙ্খলা মেনে চলেছে। এই সবের যাঁরা বিরোধী তাঁদের তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করতে বলেন। আর তা যদি না হয়, তাঁর মতে, দেশের পক্ষে ভাল হবে সংখ্যালঘুদের হাতে কংগ্রেসের পরিচালন ভার তুলে দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠদের কংগ্রেসের নাম ব্যবহার না করে কংগ্রেসের কর্মসূচি অনুসরণ করা। সবশেষে তিনি সতর্ক করে দেন 'বিশৃঙ্খলা যদি রোধ করতে হয়, উপযুক্ত ব্যবস্থা যথা সময়ে নিতে হবে।'[৮] উপযুক্ত ব্যবস্থা বলতে গান্ধী চেয়েছিলেন বামপন্থীদের কঠোরভাবে মোকাবিলা করতে এবং সুভাষকে সামনের বছর সভাপতির পদে না রাখতে। বল্লভভাই প্যাটেলের মেয়ে মণিবেনের চিঠির জবাবে ২৮ অক্টোবর গান্ধী তাঁকে লেখেন : 'সুভাষবাবুকে নিয়ে যা ঘটছে তা আমার চিন্তার বাইরে নেই।...কিন্তু বাবার (প্যাটেলের) মত, জওহরলাল ফিরে আসা (ইউরোপ থেকে) পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। তাই আমি নীরব আছি। সভাপতি নির্বাচনে এবার কিছু বাধা আসতে বাধ্য।'[৯] গান্ধী বামপন্থীদের দিক থেকে বাধা আশঙ্কা করছিলেন এবং জওহরলালকে সঙ্গে পেতে চাইছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা প্রতিরোধে এবং আগামী জাতীয় সংগ্রামের স্বার্থে বামপন্থীরা

চাইলেন সুভাষচন্দ্রই পরের বছরের জন্য কংগ্রেস সভাপতি থাকুন। তাঁকেই তাঁরা সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করেছিলেন। সে সময়ের এক বিশিষ্ট বামপন্থী ব্যক্তিত্ব ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদ লিখেছেন ঃ 'কংগ্রেসের বামপন্থীদের মধ্যে এই মত ব্যাপকতা লাভ করেছিল যে, গান্ধী এবং অন্য দক্ষিণপন্থী নেতারা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যথেষ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নন। কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে আপস করার ব্যাপারে বিড়লার মতো নেতৃস্থানীয় পুঁজিপতিরা পর্দার আড়ালে যে-সব চেষ্টা করছিলেন তা ভাল ভাবেই জানা ছিল। এটা ব্যাপক ভাবে মনে করা হত যে, এই সব প্রচেষ্টাকে আটকাতে হলে সভাপতিব পদে বসুর থাকা উচিত। নেহরুর মতো না হয়ে, বসু দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বিরোধিতায় কঠোর ছিলেন, যার জন্য বামপন্থীরা তাঁর পেছনে সমবেত হয়েছিলেন।'[১০] কমিউনিস্টদের মুখপত্র 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'-এ ১৯৩৮-এর ১৬ অক্টোবর প্রথম এই দাবি জানানো হয়।[১১] কয়েকটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও তাঁকে পরের বছরের জন্য সভাপতি করার সুপারিশ করে।

অন্য দিকে, গান্ধী ও তাঁর অনুগামীরা নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করে স্থির করেন পরের বছরের জন্য তাঁরা মৌলানা আজাদকে সভাপতি করবেন। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। গান্ধী তখন জওহরলালকে বললেন আবার সভাপতি হতে। তিনিও এগিয়ে এলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা পট্টভি সীতারামায়াকে প্রার্থী করেন। জওহরলালকে সঙ্গে রেখেই সব আলোচনা এবং শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।[১২]

ত্রিপুরি কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য সুভাষচন্দ্র ও পট্টভির দ্বন্দ্ব কোনও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ছিল না, ছিল দু'টি নীতি ও কর্মপন্থার দ্বন্দ্ব। সভাপতি নির্বাচনের ঠিক আগের দিন ২৮ জানুয়ারি, ১৯৩৯-এ গান্ধী তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় মন্তব্য করেন ঃ 'কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থায় আমি দেশের সামনে অরাজকতা ও লাল সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই দেখছি না। ত্রিপুরিতে কি আমরা সেই কঠিন সত্যের মুখোমুখি হব?'[১৩] তাঁর ইঙ্গিত ছিল খুবই স্পষ্ট। তবুও স্বচ্ছন্দ গরিষ্ঠতায় সুভাষচন্দ্র জয়ী হন। নির্বাচনী ফল সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ৩১ জানুয়ারি একটি বিবৃতিতে গান্ধী পট্টভির পরাজয়কে তাঁর নিজের এবং তাঁর 'নীতি ও কর্মপন্থার' পরাজয় বলে বর্ণনা করলেন। এই সঙ্গে তিনি সংখ্যালঘুদের প্রয়োজনে কংগ্রেস ত্যাগ করে আসতে আহ্বান জানালেন।[১৪] লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলার প্রবক্তা খোলাখুলি শৃঙ্খলা ভাঙতে বললেন। সংখ্যালঘুদের অবশ্য কংগ্রেস ত্যাগ করার প্রয়োজন হয়নি। কিছু দিনের মধ্যে তাঁরাই সংখ্যাগুরু হয়ে ওঠেন এবং গান্ধীর 'নীতি ও কর্মপন্থা' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর এই বিবৃতির পর পট পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ত্রিপুরিতে তা চূড়ান্ত রূপ নেয়।

দুই

ত্রিপুরি কংগ্রেস শুরু হয় ৭ মার্চ। গান্ধী পরিকল্পিতভাবে অনুপস্থিত থাকলেন। ৩ ফেব্রুয়ারি জওহরলালকে চিঠি লিখে তিনি জানিয়ে দেন, 'নির্বাচনে যেভাবে লড়াই হল, তারপরে আমি ভাবছি যে, আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে অনুপস্থিত থেকে দেশের সেবা

করব।'[১৫] তারও আগে ২৭ জানুয়ারী তাঁর একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই বিড়লাকে লিখেছিলেন, পট্টভি যদি জেতেন গান্ধী ত্রিপুরি কংগ্রেসে যোগ দেবেন, সুভাষচন্দ্র জিতলে যোগ নাও দিতে পারেন।[১৬] ২৭ ফেব্রুয়ারি গান্ধী রাজকোট রওনা হয়ে যান। ৬ মার্চ ১০৩ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরি পৌছন। ৮ মার্চ বিষয় নির্বাচনী সভায় পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ গান্ধীর নীতি ও কার্যক্রমের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে, বিগত বছরের ওয়ার্কিং কমিটির কাজে আস্থা প্রকাশ করে এবং এই কমিটির কোনও সদস্যের নামে অপবাদ দেওয়া হয়ে থাকলে সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাতে ওয়ার্কিং কমিটির গঠন সম্পর্কে বলা হয় : 'কংগ্রেস এটা আবশ্যিক মনে করে যে, কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক অঙ্গ তাঁর (গান্ধীর) সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হওয়া দরকার এবং সভাপতিকে অনুরোধ জানাচ্ছে তিনি যেন গান্ধীজির ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করেন।'[১৭] প্রস্তাবটির প্রধান রচয়িতা ছিলেন রাজাগোপালাচারী।[১৮] কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা, মানবেন্দ্রনাথ রায়, নীহারেন্দু দত্তমজুমদার প্রমুখ বামপন্থীরা সংশোধনী প্রস্তাব আনেন।[১৯] দু'দিন ধরে বিতর্ক চলার পর ২১৮-১৩৫ ভোটের ব্যবধানে সংশোধনীগুলি পরাজিত হয় এবং পন্থ-প্রস্তাব পাশ হয়।[২০] এর চূড়ান্ত অনুমোদন নির্ভর করছিল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশনের ওপর।

প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হয় ১০ মার্চ। অসুস্থ শরীর নিয়ে সুভাষচন্দ্র বিষয় নির্বাচনী সভায় দু'দিন উপস্থিত থাকলেও প্রকাশ্য অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি। মৌলানা আজাদ সভাপতিত্ব করেন। শুরুতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গেবিন্দ দাস তাঁর ভাষনে মুসোলিনি, হিটলার ও স্ট্যালিনের সঙ্গে গান্ধীর তুলনা করে বলেন, কংগ্রেসে তিনিই সর্বেসর্বা এবং রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর পছন্দের ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা ও ওয়ার্কিং কমিটির বেশির ভাগ সদস্য পদে তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তিদের মনোনীত করা একটা অলিখিত নিয়ম। পণ্ডিত পন্থও তাঁর প্রস্তাবের ওপর বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, 'যেখানেই জাতিরা এগিয়ে গেছে একজনেরই নেতৃত্বে তারা তা পেরেছে।' দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি জার্মানিতে হিটলার, ইটালিতে মুসোলিনি ও রাশিয়ায় লেনিনের ভূমিকার উল্লেখ করেন এবং প্রতিনিধিদের মনে করিয়ে দেন, 'আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধী আছেন, যাঁর কোনও গোপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নেই। তা হলে আমরা কেন সেই পরিস্থিতির সুযোগ নেব না?'[২১] গান্ধীর সমর্থকরা 'মহাত্মাজি কী জয়। হিন্দুস্থান কী হিটলার কী জয়।' বলে জয়ধ্বনিও দেন[২২]। রবীন্দ্রনাথ এসবে গভীর ব্যাথা পান। ১৭ মার্চ অমিয় চক্রবর্তীকে এক খোলা চিঠিতে তিনি লেখেন : 'অবশেষে আজ, এমন কি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল। ছোঁয়াচ লেগেছে। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট, সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে। ...ডান হাত দিয়ে নেশনের স্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে তাকে স্বাধীনতার ঢোঁক গিলিয়ে দেবার আশ্বাস দেওয়া কেবল ব্যক্তি বিশেষেরই অধিকারায়ত্ত এই সর্বনেশে মত দেশকে খোকা করে রাখবার উপায়।'[২৩]

বামপন্থীদের বড় দল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি বিষয় নির্বাচনী সভায় অন্য বামপন্থীদের সঙ্গে মিলে পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও প্রকাশ্য অধিবেশনে এর চূড়ান্ত অনুমোদনের সময় কংগ্রেসে ঐক্য বজায় রাখার যুক্তিতে নিরপেক্ষ থাকে। দলের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ কিছু সদস্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। কমিউনিস্টরা ও রায়পন্থীরা যথারীতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের কথা ভেবে কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো প্রথমে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু প্রধানত বাংলার প্রতিনিধিদের চাপে কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরি বৈঠকে পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত বাতিল করে পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২৪] নীহারেন্দু দত্তমজুমদার বলেছেন, সেই সিদ্ধান্তও পি.সি. জোশী উল্টে দেন, আবার বৈঠক করে তা ঠিকঠাক করতে হয়।[২৫] পন্থ-প্রস্তাবের ওপর কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের বক্তৃতায় পার্টির ভিতরের এই মতবিরোধের প্রতিফলন ঘটেছিল।[২৬] ভোটে তা প্রতিফলিত হয়েছিল কিনা তা নিশ্চিত ভাবে জানা নেই।[২৭] তবে ত্রিপুরির পর কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 'গান্ধীজির পরিচালনায় ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের' (united leadership under the guidance of Gandhiji) পক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেন এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে 'গান্ধীবাদ ও গান্ধীবাদী নেতৃত্বের প্রতি বামপন্থীদের পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলার দরকার যে নেই শুধু তা নয়, তাঁরা অবশ্যই সেই মনোভাব নিয়ে চলবেন না' (the Leftists not only do not need to but must not continue their old attitude towards Gandhism and Gandhian leadership.)।[২৮] যাই হোক, পন্থ-প্রস্তাব চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হয় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নিরপেক্ষ থাকার কারণে।

প্রকাশ্য অধিবেশনে অনুপস্থিত সভাপতির ভাষণ পাঠ করেন শরৎ বসু। এই ভাষণে সুভাষচন্দ্র চরমপত্রের আকারে জাতীয় দাবি সরকারের কাছে পেশ করার এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া গেলে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন-সহ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমস্ত সংগঠন ও দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণকে নিয়ে ব্যাপকতম সংগ্রাম শুরু করার প্রস্তাব রাখেন।[২৯] তাঁর এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হল। জওহরলালের মুসাবিদা করা জাতীয় দাবির ওপর প্রস্তাব উত্থাপন করেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। প্রস্তাবে বলা হয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কার্যকর করলে তা প্রতিরোধ করতে আন্দোলন করা হবে। যদি সরকার তা মুলতুবি রেখে আগের আইনেই কাজ চালিয়ে যায় তা হলে কী করা হবে বলা হল না। শরৎ বসু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁর বক্তৃতায় প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'কেবলই কথা, কথা, কথা, অকেজো কথা, প্রাণহীন কথা'।[৩০] এই প্রস্তাবই পাশ হয়। কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের সঙ্গে মিলে কমিউনিস্টরাও একে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ত্রিপুরি কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে পারত। কিন্তু বামপন্থীদের অনৈক্য সেই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেয়।

অধিবেশন-পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর অসুস্থ সুভাষচন্দ্র পন্থ-প্রস্তাবের নির্দেশ অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের জন্য চিঠিপত্রের মাধ্যমে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। ২৫

মার্চ তিনি গান্ধীর কাছে প্রস্তাব রাখেন : 'আমার মতে কংগ্রেসের মধ্যে দু'টি প্রধান পার্টি বা গোষ্ঠী আছে। খুব সম্ভবত তারা কম বেশি সমান সমান। সভাপতি নির্বাচনে আমরা ছিলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ। ত্রিপুরিতে হল অন্যরকম, তবে তা হয়েছিল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মনোভাবের দরুণ।... আমি যদি সাতজন সদস্যের নাম প্রস্তাব করি এবং আপনি যদি সর্দারকে সাতজনের নাম প্রস্তাব করতে বলেন, তা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হবে বলে আমার মনে হয়।'[৩১] ৩১ মার্চের চিঠিতে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার ব্যাপারে গান্ধীর কাছে তিনি আবেদন রাখেন : 'আমি শুধু এইটুকু চাই, আপনি এবং কংগ্রেস এই সঙ্কট মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উঠে স্বরাজের জন্য আবার সংগ্রাম শুরু করুন। যদি নিজেকে মুছে ফেললে জাতীয় লক্ষ্য ত্বরান্বিত হয়, আমি পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে মুছে ফেলতে প্রস্তুত। আমি মনে করি এইটুকু করতে পারার মতো যথেষ্ট ভালবাসা আমার দেশেব প্রতি আছে।'[৩২] ২ এপ্রিল গান্ধী তাঁকে পরামর্শ দেন : 'সব দিক বিবেচনার পর আমার এই মত, তুমি পুরোপুরি তোমার মতাবলম্বীদের নিয়ে অবিলম্বে তোমার নিজস্ব ক্যাবিনেট গঠন কর, সুস্পষ্ট ভাবে তোমার কার্যক্রম স্থির কর এবং আসন্ন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উপস্থাপিত কর। ... পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের কথা বাদ দিয়েই আমি তোমাকে এই উপদেশ দিচ্ছি'। আন্দোলন শুরু করার প্রশ্নে গান্ধী যুক্তি দেখালেন : 'বাতাসে আমি হিংসার গন্ধ পাচ্ছি। কিন্তু হিংসা সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করেছে। আমাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস হিংসারই একটা কদর্য রূপ। হিন্দু-মুসলমানের যে ব্যবধান বেড়ে চলেছে তাও একই জিনিস ইঙ্গিত করে। ...কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতির পরিমাণ সম্পর্কেও আমাদের মতভেদ আছে। আমার ধারণা এটা বাড়ছে। ...এই পরিস্থিতির মধ্যে অহিংস গণ-আন্দোলনের পরিবেশ আমি দেখছি না।'[৩৩] সুভাষচন্দ্র তখন ৬ এপ্রিল গান্ধীর কাছে প্রশ্ন রাখেন : 'আপনি যদি একমতাবলম্বী ক্যাবিনেটের উপদেশ দেন এবং সেই মতো ক্যাবিনেট গঠিত হয় তা হলে হয়তো এ কথা বলা যেতে পারে যে তা ''আপনার ইচ্ছানুযায়ী'' গঠিত হয়েছে। কিন্তু তাকে আপনার আস্থাভাজন বলে কি দাবি করা যেতে পারে? নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে দাঁড়িয়ে সদস্যদের কাছে এ কথা কি আমি বলতে পারব যে, আপনি সমমতাবলম্বী ক্যাবিনেট গঠন করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং নতুন ক্যাবিনেট আপনার আস্থাভাজন হয়েছে?'[৩৪] এর উত্তরে ১০ এপ্রিল তিনি সুভাষকে লেখেন : 'পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। যতই তা পড়ছি ততই তা খারাপ লাগছে। ... তোমার ক্যাবিনেটকে এবং নীতিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অনুমোদন করবে এমন নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি না।'[৩৫] পন্থ-প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধী যা খুশি মনে করতে পারতেন বা বলতে পারতেন। তাঁর কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। কেননা তিনি কংগ্রেসের সদস্য নন। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের পক্ষে কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধী কোনও কাজ করা সম্ভব ছিল না। তাই ১৩ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র গান্ধীকে জানান : 'আপনার উপদেশ কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যায়। সেই প্রস্তাবে বলা আছে ওয়ার্কিং কমিটিকে আপনার সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হতে হবে।'[৩৬]

ওয়ার্কিং কমিটি গঠন নিয়ে এই অচলাবস্থার পরিণতিতে সুভাষচন্দ্র কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ২৯ এপ্রিল সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। পন্থ-প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর গান্ধীর পরাজয় অনেকাংশে বিজয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগে তা পূর্ণতা পেল। ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রামের স্বার্থে সব ধরনের মতামতের প্রতিফলন ঘটে এমন এক মিশ্র ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের যথাসাধ্য চেষ্টা সুভাষচন্দ্র করেছিলেন। সুকৌশলে রচিত পন্থ-প্রস্তাব এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গান্ধীর ভূমিকা—দুয়েরই উদ্দেশ্য ছিল এক অচলাবস্থা সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সভাপতিকে পদত্যাগে বাধ্য করা। গান্ধীর তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল তা-ই। ৫ মে, ১৯৩৯-এ বৃন্দাবনে গান্ধী সেবা সংঘের অধিবেশনে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি অকপটে জানিয়েছিলেন, ওয়ার্ধায় তাঁর অনুগামীদের তিনি বলেছিলেন, 'যদি তাঁদের সাহস থাকে তাঁদের উচিত সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা।'[৩৭] সোজাসুজি তা না করে তাঁরা পন্থ-প্রস্তাব এনেছিলেন। নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখতে হলে গান্ধীর সামনে আর অন্য কোনও পথ ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন সুভাষচন্দ্র শুধু কংগ্রেস সভাপতি হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চান না, তিনি জাতিকে সংগ্রামের পথে পরিচালিত করতে চান। গান্ধী তা আদৌ চাইছিলেন না। ১৯৪০-এর ১৬ জানুয়ারি তিনি স্বীকার করেন : 'আমি লড়াইয়ের জন্য উন্মুখ নই, আমি একে এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করছি। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে সত্য যাই হোক না কেন, আমি সুভাষবাবুর অভিযোগ মেনে নিচ্ছি যে, আমি ব্রিটেনের সঙ্গে আপস করতে আগ্রহী যদি এটা সম্মানের সঙ্গে হয়। বস্তুত সত্যাগ্রহ এটাই দাবি করে।...ব্রিটেনের ওপর আমি আস্থা হারাইনি।'[৩৮]

ত্রিপুরিতে সুভাষচন্দ্র যা চেয়েছিলেন পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় গান্ধী তা চাইলেন ১৯৪২-এ। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিলেন তিনি। কিন্তু ব্রিটিশের দুর্বলতম মুহূর্ত তখন অতিক্রান্ত। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : 'প্রধান কারণ—আন্দোলনের কালানৌচিত্য (wrong timing)। মনে থাকতে পারে সুভাষ বসু ১৯৩৯ এই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন শুরু করতে বলেছিলেন এবং গান্ধী সাম্প্রদায়িকতা ও প্রস্তুতির অভাবের অজুহাতে তাতে বাধা দিয়েছিলেন। ১৯৩৯-এর ভারতে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষবাবুর কথা ফেলবার মত নয়। ১৯৪০ সালে ইউরোপীয় রণাঙ্গনে শোচনীয় পরাজয়ের পর তাদের মনোবলও শূন্যে ঠেকেছিল। অথচ কালহরণের ফলে ১৯৪২-এর আগস্টের পূর্বেই ব্রিটিশ সমরসজ্জা অনেক বেশি প্রসারিত ও সুসংহত হয়েছিল; মার্কিন সৈন্য দলে দলে তার বলবৃদ্ধি করেছিল।'[৩৯]

সূত্র নির্দেশ

1. *The Collected Works of Mahatma Gandhi* (hereafter *CWMG*) *Vol. 65*, Publications Division, Govt. of India, New Delhi, 1976, p. 408.

2. *CWMG, Vol. 67,* New Delhi, 1976, pp. 332, 441 ; S. Gopal (ed.), *Selected Works of Jawaharlal Nehru* (hereafter *SWJN*), *Vol. 9,* Orient Longman, New Delhi, 1976, pp. 103, 128, 131-5 ; G.D. Birla, *Bapu : A Unique Association Vol. 3,* Bharatiya Vidya Bhawan, Bombay, 1977, pp. 104-5, 131-2, 144, 145-6, 148 ; Tara Chand, *History of the Freedom Movement in India, Vol. 4,* Publications Division, Govt of India, New Delhi, 1983 reprint, pp. 272-3 ; অমলেশ ত্রিপাঠী, **স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস**, ১৮৮৫-১৯৪৭, আনন্দ পাবলিশার্স লি, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ২৪৯-৫০, ২৫৪-৫।

3. Sisir Kumar Bose and Sugata Bose (ed.), *Netaji Collected Works* (hereafter *NCW*), *Vol. 9,* Oxford University Press, Delhi, 1995, pp. 39-43.

4. Subhas Chandra Bose, *The Indian Struggle 1935-1942,* Chuckerverttty, Chatterjee & Company Limited, Calcutta, 1952, pp. 19, 21.

5. Nirad C Chaudhuri, *Thy Hand Great Anarch,* Chatto & Windus, London, 1987, p. 507 ; অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮। *CWMG*-তেচিঠিটি অন্তর্ভূত হয়নি।

6. E.M.S. Namboodiripad, *A History of Indian Freedom Struggle,* Social Scientist Press, Trivandrum, 1986, pp. 671-2.

7. *CWMG, Vol. 67,* op. cit., p. 401, Jawaharlal Nehru, *A Bunch of Old Letters,* Asia Publishing House, Bombay, 1960, 2nd edn., p. 369 ; *NCW, Vol. 9,* op. cit., pp. 195-6.

8. *CWMG, Vol. 67,* op. cit., pp. 401-2.

9. *CWMG, Vol. 68,* New Delhi, 1977, p. 72.

10. Namboodiripad, op. cit., p. 672.

11. *National Front, Vol. 1, No. 35,* October 16,1938, *editorial, 'The Congress Election Campaign'* p.4.

12. *CWMG, Vol. 68,* op. cit., pp. 198, 227 ; *NCW, Vol.9,* op. cit., p. 77 ; *A Bunch of Old letters,* op. cit., pp. 358-9.

13. *CWMG, Vol. 68,* op. cit., p. 321.

14. Ibid., pp. 359-60.

15. Ibid., p. 368.

16. *Bapu, vol.3* op. cit., p.220.

17. Dr. Pattabhi Sitaramayya, *The History of the Indian National Congress, Vol. 2, 1935-1947,* Padma Publications Ltd., Bombay, 1947, p.110.

18. Rajmohan Gandhi, *The Rajaji Story,* 1937-1972, Bharatiya Vidya Bhawan, Bombay, 1984, p. 37 ; Rajmohan Gandhi, *Patel : A Life,* Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1990, p. 280.

19. Leonard A.Gordon, *Bengal : The Nationalist Movement, 1876-1940,* Manohar, New Delhi, 1979, pp. 272-3 ; Leonard A. Gordon, *Brothers Against the Raj : A Biography of Sarat and Subhas Chandra Bose,* Viking, New Delhi, 1989, p. 379.

20. Ibid., p. 379.

21. N.N. Mitra (ed.) *The Indian Annual Register, 1939, Vol. 1,* pp. 324, 335.

22. নেপাল মজুমদার, **রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র**, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ১৬৬।

23. **প্রবাসী**, বৈশাখ, ১৩৪৬।

24. Jaiprakash Narayan & P.C. Joshi, 'On Tripuri', *National Front, Vol. 2, No.6,* 19th March, 1939, p. 89 ; J.P. Papers, File No. 218/1936-47, cited in Buddhadeva Bhattacharyya, *Origins of the RSP,* Publicity Concern, Calcutta, 1982. p. 41 ; *NCW, Vol.9,* op.cit., pp. 140, 289 ; Gordon, *Brothers Against the Raj,* op. cit., pp. 379-80.

25. Mihir Bose, *The Lost Hero,* Quartet Books, London, 1982, p. 132.

জওহরলাল নেহরু ১৬ মার্চ, ১৯৩৯-এ ভি.কে. কৃষ্ণ মেননকে লিখেছিলেন : 'The Communist Party people ... changed their attitude three times in the course of the two days, largely owing to pressure from Bengal and some other people.' *SWJN Vol 9,* New Delhi, 1976, p. 524.

26. P.C. Joshi, 'Tripuri', *National Front, Vol. 2, No.6,* 19th March, 1939, pp. 97, 100.

27. ঐতিহাসিক সুমিত সরকার লিখেছেন, ত্রিপুরিতে সোস্যালিস্টরা, রায়পন্থীরা এবং কমিউনিস্টরা (বঙ্কিম মুখার্জির মতো কয়েকজন বাংলার কমিউনিস্ট বাদে) পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি। কিন্তু তিনি এই বক্তব্যের সমর্থনে কোনও তথ্যসূত্রের উল্লেখ করেননি।

দ্র. Sumit Sarkar, *Modern India 1885-1947,* Macmillan, Madras, 1983, p. 373.

28. P.C. Joshi, 'Tripuri', op. cit., p. 96 ; S.G. Sardesai, 'Activise the Base', *National Front, Vol.2, No.12,* 30th April, 1939, p. 189.

29. *NCW, Vol. 9,* op. cit., pp. 92-4.

30. *Report of the Fifty-second Indian National Congress,* Tripuri, 1939, p. 93, cited in Michael Brecher, *Nehru : A Political Biography,* Oxford University Press, London, 1959, p. 250.

31. *NCW Vol.9,* op. cit., p. 128.

32. Ibid., p. 142.

33. *CWMG, Vol. 69,* New Delhi, 1977, pp. 96-7.

34. *NCW, Vol.9,* op. cit., pp. 151-2

35. *CWMG. Vol. 69,* op. cit., p. 126.

36. *NCW, Vol. 9,* op. cit., p. 171.

37. CWMG, *Vol. 69,* op. cit., p. 207.

38. CWMG, *Vol.71,* New Delhi 1978, p 114.

39. অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে চট্টগ্রাম

মোহাম্মদ আলী চৌধুরী

ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচ্য। বঙ্গভঙ্গের কারণ, প্রকৃতি ও ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেশবিদেশেব নানা গবেষক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভূমিকা নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন। অথচ, বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা (১৯০৩) প্রকাশের অনেক আগে থেকেই চট্টগ্রামের আপামর জনগণ এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তা অনেকেরই অজানা। বিভিন্ন সভা সমিতি ও লেখনির মাধ্যমে চট্টগ্রামের রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

বাংলা বিভাগ তথা বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের রাজনীতিতে এক নতুনমাত্রা সংযোজিত হয়। চট্টগ্রামকে বাংলা প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেয়ার সরকারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামবাসীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ত্রিপুরা, কুমিল্লা ও নোয়াখালীর অধিবাসীরাও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। এ উদ্দেশ্যে ১৯০১ সালের শেষদিকে "চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মিলন" নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়।[১] ১৯০২ সালের ২৯ ও ৩০ মার্চ দু'দিনব্যাপী চট্টগ্রাম প্যারেড ময়দানে যাত্রামোহন সেনের সভাপতিত্বে "চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মিলনের" প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় ত্রিপুরা ও নোয়াখালি থেকে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি যোগদান করেন।[২] চট্টগ্রামকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার সরকারী মনোভাব যখন আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে ঠিক তদ্রুপ পরিস্থিতিতে ১৯০৩ সালের ১৩-১৪ মার্চ কুমিল্লা টাউন হল সংলগ্ন প্রশস্ত ময়দানে (পাবলিক লাইব্রেরী কম্পাউন্ড) চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মিলনের "দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন" অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় চট্টগ্রাম থেকে যাত্রামোহন সেন, মিঃ এস. আর.পার্শিভ্যাল, শশাঙ্কমোহন সেন, অন্নদাচরণ দত্ত, মৌলভী আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী, মাস্টার কাজেম আলী, নগেন্দ্র কুমার রায় সহ মোট বিশজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মিলনে অর্ভ্যথনা সমিতির সভাপতি ছিলেন হাইকোর্টের উকিল মৌলভী সামশুল হুদা এবং মূল অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন নোয়াখালীর প্রবীন উকিল রাধাকান্ত আইচ। সভায় গৃহীত ১১ টি প্রস্তাবের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবটি ছিল "চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে অন্তর্ভূক্ত না করার জন্য

বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের যোগে ভারত গভর্ণমেন্ট সমীপে আবেদন।" প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন, অনুমোদন করেন ত্রিপুরার উকিল কৈলাস চন্দ্র দত্ত এবং সমর্থন করেন নোয়াখালীর জগবন্ধু দত্ত। উল্লেখ্য যে, সম্মিলনে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম থেকে ৮ জন বিশিষ্ট মুসলমান প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।[৩] চট্টগ্রামের বিভাগীয় সম্মিলনের কর্মসূচী ছাড়াও চট্টগ্রামকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার সরকারী পরিকল্পনার প্রতিবাদে চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণ বিভিন্ন সভা সমিতির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। ১৯০৩ সালের ১লা অক্টোবর স্থানীয় প্যারেড ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা উদ্বোধন করেন প্রভাবশালী জমিদার সালামত আলী খাঁ এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন খ্যাতনামা রায়বাহাদুর প্রসন্ন কুমার রায়।[৪] চট্টগ্রামের এ সকল প্রতিবাদ কর্মসূচীর প্রতিক্রিয়া ঢাকা বিভাগেব অধিবাসীদের মধ্যেও অনুভূত হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে তারাও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এ আশঙ্কায় ১৯০৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী (২০শে চৈত্র, ১৩১১) বুড়ীগঙ্গার তীরে এক বিশাল জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়।[৫] ঢাকায় অনুষ্ঠিত জনসমাবেশের পরপর অর্থাৎ ১৯০৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে চট্টগ্রামের জনগণ পুনরায় স্থানীয় প্যারেড ময়দানে বিরাট প্রতিবাদ সভায় মিলিত হন। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জমিদার এবং District Board এর সদস্য চৌধুরী আনোয়ার আলী খান। District Board এর অপর এক সদস্য মৌলভী ফজল কবির খান এবং প্রসন্ন কুমার রায় সভায় উপস্থিত থাকতে না পারায় পত্রদ্বারা তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এ ছাড়া Chittagong Association[৬] এর সভাপতি কমলকান্ত সেন, যাত্রামোহন সেন, কান্তপ্রসাদ হাজারী, ওবেদুর রহমান খান, মিঞা রেয়াজুদ্দিন আহাম্মদ মুন্সী, J.R.Percival, নগেন্দ্র কুমার রায়, শশাঙ্কমোহন সেন, জগচ্ছন্দ্র রক্ষিত, রমেশচন্দ্র সেন, মুন্সী মলখত রহমান সহ সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কলিকাতাস্থ বেলেভেডিয়ারে ছোটলাটের নিকট একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৭] ইতোমধ্যে Chittagong Association এর পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঐ দলে ছিলেন প্রসন্ন কুমার রায়, যাত্রামোহন সেন, কমলাকান্ত সেন, মৌলভী আমির আলী, শেখ সোবহান চৌধুরী, অন্নদাচরণ চৌধুরী, মৌলভী ওবেদুর রহমান খান, J.R.Percival, বেনী মোহন দাস, নগেন্দ্র কুমার রায় ও মৌলভী রেয়াজুদ্দিন। তাঁরা ঐদিন চট্টগ্রামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার প্রতিবাদ সম্বলিত একখানা স্মারকলিপি কমিশনারের হাতে অর্পণ করেন। এর কয়েকদিন পর ছোটলাটের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য চট্টগ্রাম থেকে প্রসন্ন কুমার রায়, কমলা কান্ত সেন, নগেন্দ্র কুমার রায়, মৌলভী আনোয়ার আলী, J.R. Percival কলিকাতা গমন করেন এবং১০ই এপ্রিল বুধবার ছোটলাট Sir Andrew Fraser এর সাথে সাক্ষাৎ করে অনুরূপ আরেকটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।[৮]

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যখন প্রতিবাদমুখর তখন পূর্ববঙ্গের

জনগণের মনোভাব যাচাইয়ের জন্য ১৯০৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী লর্ড কার্জনের চট্টগ্রাম সফরের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এ সফরের পূর্বেই অর্থাৎ ১২ই ফেব্রুয়ারী Chittagong Association চট্টগ্রামকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সরকারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে লর্ড কার্জনের নিকট এক টেলিগ্রাম বার্তা প্রেরণ করেন।[৯] ১৫ই ফেব্রুয়ারী লর্ড কার্জন Guide নামক ষ্টীমারে করে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছান। ঐদিন বিকাল ৪ ঘটিকার সময় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। চট্টগ্রাম বণিক সমিতি, পৌরসভা এবং Chittagong Association কর্তৃক পৃথক পৃথক সংবর্ধনা দেয়া হয়। Chittagong Association কর্তৃক প্রদত্ত মানপত্রটি কার্জনের হাতে সমর্পন করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি কমলাকান্ত সেন। চট্টগ্রামবাসীর এ উষ্ণ সংবর্ধনায় জবাবে কার্জন নিজেই উল্লেখ করেন যে, বঙ্গ বিভক্ত হবে তবে চট্টগ্রামের ব্যাপারে স্থানীয় সরকারের অভিমত না জানা পর্যন্ত ভারত সরকার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেনা। এমনিতর পরিস্থিতিতে ১৯০৪ সালের ২-৩ এপ্রিল (২০-২১ চৈত্র, ১৩১১) নোয়াখালীতে "চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মিলনে"র তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মৌলভী মোজাফ্‌ফর আহমেদ অধিবেশনের সভাপতি ও উপস্থিত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান।[১০]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে আরো গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার জন্য ১৯০৫ সালের প্রথম দিকে অর্থাৎ সরকারীভাবে বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত ঘোষণার পূর্বেই রাউজান থানার কোয়েপাড়া গ্রামনিবাসী যামিনীকান্ত সেনের উদ্যোগে "চট্টল হিতসাধিনী সভা" নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১] পটিয়ার ধলঘাট গ্রামের কবি শশাঙ্কমোহন সেন, আনোয়ার জঙ্গলখাইন গ্রামের বিপিন বিহারী নন্দী, চন্দনাইশের (সাবেক পটিয়া) বরমা গ্রামের যাত্রামোহন সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যামিনীকান্ত তাঁর অগ্রজ স্বর্গীয় নলিনীকান্তের সাংগঠনিক কর্মপন্থা অনুসারে তরুণদের সংগঠিত করার কাজে সক্রিয় ও সচেষ্ট ছিলেন। চট্টল হিতসাধিনী সভার কর্মসূচীতে ছিল বিভিন্ন খেলাধূলা, কর্ণফুলি নদীতে সাঁতার প্রতিযোগিতা, ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন, শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তরুণ যুবকদের মনে দেশপ্রেম সঞ্চারই ছিল হিতসাধিনী সভার উদ্যোক্তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।[১২]

১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই সিমলা থেকে বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর সমগ্র বাংলাদেশে আন্দোলনের জোয়ার তীব্র আকার ধারণ করে। "Chittagong Association" ও "চট্টল হিতসাধিনী সভা"র যৌথ উদ্যোগে ১৯০৫ সালের ৬ ও ৭ই আগষ্ট থেকে চট্টগ্রামে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও এর অনেক আগে অর্থাৎ ১৮৯৫-৯৬ সালের দিকে নলিনীকান্ত সেনের (১৮৭৮-১৯০১) উদ্যোগে স্বদেশের শিল্পকর্মকে উৎসাহিত করার জন্য চট্টগ্রামে "জাতীয় শিল্প রক্ষিনী সমিতি' গঠিত হয়েছিল।[১৩] উল্লেখ্য যে, আসামের সঙ্গে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও

রাজশাহী বিভাগ যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের গভর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম পরিদর্শনে এলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এক বিশাল জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ এই বিক্ষোভ মিছিলে লাঠিচার্জ করে।[১৪] ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা স্কুল ত্যাগ করে আন্দোলনে যোগ দেয়। এদের মধ্যে কলেজিয়েট স্কুলের মহিমচন্দ্র দাস (পরবর্তীতে জিলা কংগ্রেস সভাপতি ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য), কাজেম আলী স্কুলের মৌঃ কাজেম আলী (পরে শেখ-এ-চট্টগ্রাম নামে খ্যাত), খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ের বিপিনবিহারী চৌধুরীর (পরবর্তীতে পাহাড়তলী রেলওয়ে হাইস্কুল ও পাথরঘাটা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন) নাম উল্লেখযোগ্য।[১৫] তাছাড়া, ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা ভুপেন্দ্র নাথ বসু স্বদেশীমত প্রচাবের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম আগমন করেন এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে বিলেতী দ্রব্য বর্জন উৎসবে যোগ দেন।[১৬] এর ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ ১৯০৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বিখ্যাত স্বদেশী নেতা বিপিন চন্দ্র পালও চট্টগ্রামে আসেন। স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন।[১৭]

ইংরেজদের ''ভাগকর ও শাসনকর'' নীতিকে অকার্যকর করার লক্ষ্যে তখন ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই স্বদেশী আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। এ আন্দোলনকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য চট্টগ্রামের জ্ঞান-তাপস- আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে গভীর সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ''অর্চনা'' পত্রিকার ১৩১৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় ''স্বদেশী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজ'' নামক এক প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেনঃ

''গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বঙ্গের ব্যবচ্ছেদ ক্রিয়া প্রস্তাবিত হওয়া অবধি আমরা বাঙ্গালীরা অনেক নিষ্ফল কান্নাকাটিই করিয়াছি। সরকার বাহাদুর কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অধিকতর আগ্রহ সহকারেই সেই শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। এই নিদারুণ আঘাতে ব্যথিত ও মর্দ্দিত হইয়া কোন এক মহাত্মার হৃদয়ে হঠাৎ স্বদেশপ্রীতি উৎসারিত হইয়া উঠে! ব্যক্তি বিশেষের হৃদয় সহজাত সেই স্বদেশপ্রীতি সৌভাগ্যবশতঃ পরে বাঙ্গালী সাধারণের হৃদয়ে সংক্রমিত হইয়া তাহা ''স্বদেশী আন্দোলন'' রূপে দেখা দিয়াছে। হায়! এত করুণবিলাপ , এত তৈলমর্দ্দন এবং এত উচ্চ চিৎকারেও আমাদের উপর সরকার বাহাদুরের দয়ার উদ্রেক হইলনা। তবে আর রাজার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে ফল কি? এখন আমাদিগকে নিজের পথ নিজেকেই অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে। যত প্রকার আমাদের হিত সাধিত হওয়া সম্ভব, তন্মধ্যে স্বদেশীয় শিল্পাদির পুনঃপ্রতিষ্ঠাই সর্বাপেক্ষা প্রধান। উহাই আমাদের একমাত্র শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়াই আমরা স্বদেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি।[১৮]

উক্ত প্রবন্ধে তিনি আরো উল্লেখ করেন :

'ইতিমধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট নানা

বেআইনী উপায় অবলম্বন করিয়া শান্তিপ্রিয় প্রকৃতিপুঞ্জকে সন্ত্রস্থ করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু ইহার ফল যে শুভসূচক হইতেছে না, তাহা সকলেই দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন। নদী স্রোতে বাঁধা দিতে চেষ্টা করিলে যেমন স্রোতের বেগ ক্রমে অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে, তেমনি আমাদের স্বদেশপ্রীতিও প্রতিহত হইয়া আরো গাঢ়তর ও দৃঢ়তররূপে লোকহৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে। ইংরেজের ভেদনীতি আপাত মনোরম মাকাল ফল বই আর কিছুই নহে। উহার বাহ্য চাক্যচিক্য মুগ্ধ হইয়া মুসলমানগণ যতই নাচিতেছেন, ততই যে তাঁহারা হইতেছেন, তাহা আজও তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।....

এই স্বদেশী আন্দোলন মাতৃসেবার অপর প্রকার ভেদমাত্র। জননীরূপিনী মাতৃভূমির কল্যাণই সন্তানের কল্যাণ। ভাই হিন্দু। ভাই মুসলমান। তোমাদের মধ্যে এমন নরাধম কেহ আছে কি; যে মায়ের কল্যাণার্থে নিজের তুচ্ছ প্রাণ উৎসর্গ করিতে না পারে? আমরা স্বদেশ সেবাব্রত ভিন্ন অপর কোন দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। স্বদেশ সেবায় প্রতিকূল শক্তির অন্যায় বাধা বিঘ্নে প্রাণ গেলেও বা তাহাতে অগৌরবের কি আছে? অতএব আইস ভাই। সকলে মিলিয়া সমস্বরে সোনার বাঙ্গলার জয়গীতি গাহিয়া জীবন সার্থক করি।[১৯]

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় চট্টগ্রামে রবীন্দ্রনাথের আগমন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনে তাঁর উদ্যোগ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে আরো ত্বরান্বিত করে। ইতোমধ্যে তিনি চট্টগ্রামের বেশকিছু সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসেন। এদের মধ্যে নবীনচন্দ্র সেন, নবীন চন্দ্র দাস, শশাঙ্কমোহন সেন, তারক চন্দ্র দাস, আবদুল করিম, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, জীবেন্দ্র কুমার দত্ত, বিপিনবিহারী নন্দী, ক্ষেমেস চন্দ্র রক্ষিত, রজনী রঞ্জন সেন,জগচ্ছন্দ্র ভট্টাচার্য, মোহনীরঞ্জন সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া চট্টগ্রামের কামিনীকান্ত সেন (চট্টল হিতসাধিনী সভার মূল উদ্যোক্তা) ও কেদারনাথ দাশগুপ্ত (১৮৭৮-১৯৪২) কবির এতো সান্নিধ্যে এসেছিলেন যে, কামিনীকান্ত হাইকোর্টের আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে কবির আহ্বানে বিনা বেতনে শান্তি নিকেতনের শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন।[২০] অপরদিকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল উত্তেজনার সময় কেদারনাথ দাশগুপ্ত চট্টগ্রাম থেকে কলিকাতায় গমন করে "লক্ষীর ভান্ডার" নামে দেশীয় দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবসা শুরু করেন এবং 'ভান্ডার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।[২১] অবশেষে তার প্রবল আগ্রহ ও অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'ভান্ডার' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২২]

১৯০৫ সালের ২৫ শে আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কলিকাতা টাউন হলে পঠিত 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ নির্বিশেষে সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপনের নিমিত্তে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ স্থাপন ও বাৎসরিক সম্মিলন অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেয়া হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯০৬ সালের ১৪-১৫ই এপ্রিল বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের আয়োজন করা হয় এবং উক্ত সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। সম্মিলন শেষে চট্টগ্রামের প্রবীণ জননেতা যাত্রামোহন সেন এর পরামর্শক্রমে 'চট্টল হিতসাধিনী সভা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যামিনী কান্ত সেন রবীন্দ্রনাথকে চট্টগ্রাম আগমনের আমন্ত্রণ জানান।[২৩]

চট্টগ্রামে রবীন্দ্রনাথের আগমন ও সংবর্ধনা সম্পর্কে যামিনীকান্ত সেন তাঁর স্মৃতিকথায় সুন্দর বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, "১৯০৭ সালে আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র চট্টগ্রামের জনসাধারণ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হন চট্টগ্রামে। সাধারণতঃ তিনি কলিকাতার বাইরে এ শ্রেণীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারতেন না-চট্টগ্রাম সে পথ কেটে দেয়।[২৪] তিনি আরও উল্লেখ করেন, "চট্টগ্রামের সংবর্ধনা সভায় তিনি কোন প্রবন্ধ পাঠ করেন নি। একটি চমৎকার বক্তৃতা দান করেন। সমগ্র হলের জনতা নিস্তব্ধভাবে তা শোনে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা হয় অতুলনীয়, কলিকাতার বাইরে সেযুগে এরূপ দৃশ্য দুর্লভ ছিল। সেকালে সাহিত্যিকরূপে এরূপ বিরাট অর্ঘ্য পাওয়া শুধু এখানেই (চট্টগ্রাম) সম্ভব ছিল।[২৫]

চট্টগ্রামে প্রদত্ত সংর্বধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানান এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ১৯০৭ সনের ২০ শে জুন তারিখের 'বন্দে মাতরম' পত্রিকায় চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব সাংবাদিক কর্তৃক প্রেরিত এ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তার আংশিক নিম্নরূপ:

Chittagong, June 18: Srijut Rabindranath Tagore arrived here yesterday morning and was received at the railway station by the leading gentleman. Today he presided at a meeting convenced by the Swadeshi Samaj and expressed his views on the present situation. He said that he was saying what he had said long before and which was a mere truism. He said that none thinks of this country as his Swadesh as none does any real work. He said we should try to ameliorate our own condition without malice to the government. The government may not do its duty, but we should do ours. He belongs, he said , to no party, he deprecated petitioning as begging, We are giving up our birth rights . He said that the old party is preaching facing westward and the new party preaches facing eastward; but no party is doing real work. The new party gives no programme. Real work lies in coming into touch with the masses, in teaching them that this country is theirs, in mixing with them and in showing that the educated people sympathise with them and share their miseries. He said that this want of contact is the cause of the recent Hindu-Mahomedan conflict. If this feeling existed officials could no have set up Mahomedans against Hindus. We should educate ourselves, make arrangements to improve the sanitary condition of the country. If we can make everything we want,then Swarayj would be given by the English, then that will not be begging but making a demand which none can deny...[২৬]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও বিলাতী দ্রব্য বর্জন নীতির সমর্থনে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের চট্টগ্রাম আগমন চরমপন্থীদের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল। সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই ছিল চরমপন্থীদের মূল লক্ষ্য।

এ সময়ে চট্টগ্রামে 'অনুশীলন দলের' শাখা স্থাপন করা হয়। অনুশীলন দল চট্টগ্রাম

শাখার নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চন্দ্র শেখর দে, চারু বিকাশ দত্ত, গিরিজা শঙ্কর চৌধুরী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সঞ্জীব প্রসাদ সেন, যশোদা রঞ্জন চক্রবর্তী, সুরেন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের উপর অনুশীলন দলের কেন্দ্রীয় নেতা ত্রৈলক্য মহারাজের প্রভূত প্রভাব ছিল। তিনি ১৯১০ খ্রীঃ চট্টগ্রামে আসেন।[২৭] স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে যখন সারাদেশ প্লাবিত তখন চট্টগ্রামে অনেক স্বদেশীকে গ্রেফতার করা হয় এবং শতাধিক যুবকের উপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়।[২৮] এমনকি 'বন্দে মাতারম সঙ্গীত' রচনা ও প্রকাশনার জন্য বরদাচরণ চক্রবর্তী ও রমনী মোহন দাশকে গ্রেফতার করতঃ তিন থেকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।[২৯] তথাপি, আন্দোলন স্তব্ধ করা যায়নি। চট্টগ্রাম থেকে ১৯১১ সালে কামিনীকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত স্বদেশী গাঁথা প্রকাশিত হয়।[৩০] এভাবে সমগ্র বাঙ্গলা যখন উত্তপ্ত তখন অনন্যোপায় হয়ে ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ঐতিহাসিক দিল্লী দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

সূত্র-নির্দেশ

১. অখিলচন্দ্র নন্দী, শাশ্বত ত্রিপুরা, "ত্রিপুরাঃ স্বাধীনতা সংগ্রাম"; ১৮৭২-১৯৭২, ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার শতবার্ষিকী স্মারক সংকলন।

২. 'চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মেলন'—ঢাকা প্রকাশ, ২৩শে চৈত্র, ১৩০৮, পৃঃ ৪।

৩. ঢাকা প্রকাশ, ২২শে মার্চ, ১৯০৩ (৮ই চৈত্র, ১৩০৯)।

৪. The India Nation, 5th October, 1903.

৫. ঢাকা প্রকাশ, ১০ই জানুয়ারী, ১৯০৪ (২৬শে পৌষ, ১৩১১)।

৬. ১৮৭৫ সালের ২৯শে জানুয়ারী চট্টগ্রামে Chittagong Association প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে স্থাপিত ঐ সংস্থা নিঃসন্দেহে চট্টগ্রামের তদানীন্তন জননায়কদের প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার পরিচয় বহন করে। এ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন চট্টগ্রামের অগ্রণী পুরুষ বিখ্যাত উকিল কমলাকান্ত সেন (১৮৪৭-১৯০৬)। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এপদে বহাল ছিলেন। উকিল দুর্গাদাস দস্তিদার ছিলেন এ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক।

৭. ঢাকা প্রকাশ, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯০৪, পৃঃ ৩ (১০ই মাঘ, ১৩১১)।

৮. ঢাকা প্রকাশ, ১৪ই ফেব্রুয়ারী (২ ফাল্গুন, ১৩১১) পৃঃ ২।

৯. The Bengal Times, 17th February, 1904, p. 4.

১০. ঢাকা প্রকাশ, ১০ই এপ্রিল, ১৯০৪ (২৮শে চৈত্র, ১৩১১), পৃঃ ৩।

১১. পূর্ণেন্দু দস্তিদার, স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম; দ্বিতীয় সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭৬, চট্টগ্রাম, পৃঃ ১৩।

১২. তদেব, পৃঃ ১৪।

১৩. নলিনীকান্ত সেন, একখানি পুরাতন চিঠি, ভাণ্ডার, ফাল্গুন, ১৩২২, পৃঃ ২৫৪।

১৪. পূর্ণেন্দু দস্তিদার, প্রাগুক্ত।

১৫. তদেব।

১৬. পাঞ্চজন্য, ১৩৪৫, পৃঃ ১০৫।

১৭. তদেব।

১৮. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, "স্বদেশী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজ"; অর্চনা, বৈশাখ, ১৩১৩।

১৯. তদেব, পৃঃ ২৩১-৩৩।

২০. যামিনীকান্ত সেন, "রবীন্দ্রনাথ-যেমনটি দেখেছি ও বুঝেছি"—প্রবর্তক, কার্তিক, ১৩৪৮, পৃঃ ৫৩।

২১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'অবিস্মরণীয় কেদারনাথ গুপ্ত', কথা সাহিত্য, মাঘ, ১৩৮৫।

২২. রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, ১৯৭৭, পৃঃ ১৫৮।

২৩. সুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্ত, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ১৯৮৫, পৃঃ ১১।

২৪. যামিনীকান্ত সেন, প্রাগুক্ত, ১৩৪৯, কার্তিক, পৃঃ ৫৬।

২৫. তদেব.

২৬. Bande Matarm, 20th June, 1907.

২৭. Suniti Bushan Qanungo, The Chittagong Revolt, 1930-34, Chittagong, 1994, p. 22.

২৮. তদেব, পৃঃ ১৩।

২৯. তদেব,

৩০. তদেব.

ইতিহাস অনুসন্ধানে মৌখিক ইতিহাস : মেদিনীপুর জেলায় একটি যৌথ ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রাথমিক রিপোর্ট

নিবেদিতা ভৌমিক, পূরবী বসু, অমল মাইতি, নবেন্দু বেরা, অচিন্ত্য আচার্য্য

সমাজবিজ্ঞানী মহলে ইতিহাস গবেষণার নানা স্বীকৃত পদ্ধতি রয়েছে, যে পদ্ধতিগুলি মূলত লিখিত এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে দেশে বিদেশে গবেষণা পদ্ধতির যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে তা বলতে অনেকটাই বোঝায়, আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা নতুন নতুন উপাদানগুলির ব্যবহার যোগ্যতা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা, যে উপাদানগুলি এ পর্যন্ত পন্ডিতমহলে যথেষ্ট অবহেলিত ছিল বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়নি। এরকম একটি উপাদান হিসাবে মৌখিক ইতিহাস বা Oral history-র কথা বলা যেতে পারে, যা কেবল মুখের বক্তব্যে প্রতিফলিত হয় এবং যার কোন লিখিত আকার নেই। তৎসত্ত্বেও এটি ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা হিসাবে প্রচীনকালে বিশেষত: লিপির আবির্ভাবের পূর্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। লিপির প্রচলনের পর সৃষ্ট সাহিত্য মূলত: শহুরে; ফলে গ্রামে-গঞ্জে বিশেষত: মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার তুলনামূলক অনগ্রসরতার কারণে প্রাচীন ঐতিহ্যকে অনেকটাই ধরে রাখা হয়েছে স্মৃতিতে এবং প্রকাশ করা হয়েছে মুখের ভাষায়। ফলে ইতিহাস চর্চার প্রশ্নে লিখিত এবং অলিখিত উপাদানের উভয় ধারার অস্তিত্বই খুব প্রাচীন এবং সমানভাবে পাশাপাশি বহমান। লক্ষণীয় বিষয় হলো, অতীতের শিক্ষাদীক্ষার তুলনামূলক অনগ্রসরতার সময় থেকে শুরু করে আধুনিক কালের জ্ঞানবিজ্ঞানের চূড়ান্ত উন্নতির যুগেও আমাদের সমাজের এক বৃহদংশে মৌখিক ইতিহাসের অস্তিত্ব বজায় আছে। এই মৌখিক বিবরণীতে অতীতের এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় যা অন্য মাধ্যমগুলিতে লভ্য নয়। তবে এই পদ্ধতির ত্রুটি হলো যেহেতু ব্যক্তি তার স্মৃতি নির্ভর জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নিজের মানসিক উপলব্ধির মাধ্যমে প্রকাশ করেন তাই এতে অনিবার্যভাবে তথ্য বিকৃতি, আবেগদৃপ্ত উপস্থাপনা, অতিরঞ্জন, উদ্দেশ্যপূর্ণ উপস্থাপনা প্রভৃতি ত্রুটির সম্ভাবনা থেকে যায়।

সব মিলিয়ে বলা যায় অতীত বক্তার নিজস্ব উপলব্ধি, চেতনা বা সংস্কৃতির মাধ্যমে processed হয়ে শ্রোতার কাছে উপস্থিত হয়, যাতে স্বভাবত:ই বহুল পরিমাণে subjectivity অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং অতীতের objective উপস্থাপনার আদর্শ ব্যাহত হয়। কিন্তু প্রশিক্ষিত সমীক্ষক নিজস্ব বিচারবোধের মাধ্যমে তুলনামূলক বিশ্লেষণের সাহায্যে এই ত্রুটিগুলিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দূর করতে পারেন। তাছাড়া মনে রাখা দরকার objectivity অর্জনের

চেষ্টা সত্ত্বেও বক্তব্যেব subjectivity সমাজবিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বলা যায় ভিন্নতর একটি উপাদান হিসাবে সমাজবিজ্ঞানী মহলে মৌখিক ইতিহাসের প্রতি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং এই গবেষণার সঙ্গে প্রযুক্তিগত সুবিধাকে ব্যবহার কবে উপনীত অনুমানগুলিকে নিখুঁত করে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।

এই ধাবণা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ কবে ইতিহাস তথা সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষত গ্রামীণ সমাজের মানুষেব আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তন জানার প্রশ্নে, কি ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব, সে বিষযে মেদিনীপুর জেলায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য একটি অনুসন্ধানমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল Centre for Women's Development Studies (C.W.D.S)-এর পরিচালনায় এবং তত্ত্বাবধানে। এই প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়েব নৃতত্ত্ব ও ইতিহাস বিভাগের পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রীব একটি যৌথ দল মেদিনীপুর জেলাব ঝাড়গ্রাম মহকুমাব পাঁচটি গ্রামকে অনুসন্ধানেব ক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচন কবে ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ শুরু করে। ঝাড়গ্রাম মহকুমার এই গ্রামগুলি হলো মহুলবনী, আমলাতোড়া, বড়শোল, আশাকাঁথি, বাজকুসমা। এই গ্রামগুলির নিকটে শিবির স্থাপন করে দলটি একটি দীর্ঘকালীন অনুসন্ধান চালায়। এব ফলে গ্রামবাসীদের স্মৃতি নির্ভর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব কথা মৌখিক বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয এবং মৌখিক ইতিহাসের রূপবেখাগুলি স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ কবে।

দলটির কাছেব মূল ক্ষেত্রের গ্রামগুলির মধ্যে তিনটি এডগোদা এবং দুটি কাপগাড়ি পঞ্চায়েত এর অন্তর্গত। এই পাঁচটি গ্রামের মোট জনসংখ্যা ১৮৭২ জন (পুরুষ- ৯৪৯, মহিলা ৯২৩)। এই গ্রামগুলিতে সদগোপ, তাঁতি, ভূমিজ, বাগাল, হাঁড়ি, কামাব, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, বৈষ্ণব, তিলি, মাহাতো-এই সব caste-এব মধ্যে কাজ কবা হয়েছে, যাঁদেব মধ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ও আছে।

উক্ত তথ্য আহরণের জন্য যে পদ্ধতিগুলি অনুসবণ করা হয়েছে, তা হলো-

১। পর্যবেক্ষণ

২। প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক কথোপকথন সংগ্রহ

৩। মৌখিক জীবনী লিপিবদ্ধ করণ

৪। সামাজিক ঘটনাবলী ও বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গির পবিপ্রেক্ষিতে জীবনেব কথাগুলিব তুলনামূলক বিশ্লেষণ — এই তথ্য আহরণের জন্য C.Oppong & K. Abu-র 7-role frame work[১] ব্যবহার করা হযেছে।

এই প্রক্রিয়া থেকে যে তথ্য আহবণ কবা হয়েছে সেগুলির নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগ সম্ভব এবং প্রয়োজনানুযাযী উদাহবণ সহযোগে তা আলোচিত হল।

১। জাতি বৈষম্য :

"আমাব ননদ মাহাতো ছেলেকে বিযে কবেছে। আমাদের আদিবাসীদের নিজে পছন্দ করে বিযে হয়। তবে নিজেদেব[২] মধ্যেই। তা করলে কিছু হতো না। কেউ মেনে নেয়নি। ওরা দুজনে কোথায় পালিয়ে গেছে। মাহাতোদেব ঘবে তো নেবেই না। আমবাও না।"—ঐ

ছেলেটির মাকে তাব ছেলে মেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি অন্য সব ছেলেব কথা বলেন। কিন্তু ঐ ছেলের কথা এড়িয়ে গিয়ে এইটুকু বলেন—"ছেলে ট্রাকেব ড্রাইভার, ঘরে প্রায় আসে না। বিয়ে কবেনি।"

"ছোটবেলায় একবার আমাকে আদিবাসী ঘরে খেতে বলিছিল। আমি বলি—'ও, সাঁওতাল ঘবে কে খায়!' আসলে ওবা গরু-কাঁড়া সিঁজে[৩] দেখে খেতে মন যায়নি।"

"আমাব স্বামীর সাথে একবার ঝাড়গ্রামে গেছলাম। আমার স্বামী দোকানে বসে মিষ্টি খেল, আমি দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলাম। খিদা পাচ্ছিল। তবে, ভয়ে, খাবো বলে একবারও বলিনি। জানি, দোকানে কোন খাবার কিনে খেলেই নির্যাতনের শেষ থাকবে না। আমার স্বামীব খাওয়ার পর, আমি জল খাবো বলেছিলাম। তখন আমার স্বামী একটা বাড়ি থেকে দড়ি, বালতি চেয়ে আনে। আমি সেই বালতি আর দড়ি দিয়ে নিজেব হাতে কুঁয়ো থেকে জল তুলে খেয়েছিলাম।"

"বড় ছেলে বছব খানেকের তখন একবার আদিবাসী সাঙাৎ[৪]-এব বাড়ি গিয়েছিলি'। আদিবাসী সাঙাতিন্ খুব জোব করিছিল রাতে থেকে যাবাব তরে। রই নি। দুপুরে সব জিনিষপত্র মেজে ঘষে দিল, চাল, ডাল, তবিতবকারি দিল। রান্না করি খাই করি এলাম। সাঙাৎ আমার হাতে খেযেছে। ওরা আদিবাসী ওদের হাতে আমরা খাই না।"

২। নারী-পুরুষের শ্রম বিভাজন :

"জ্ঞান হওয়ার পব থেকে খেলাধূলা কর্বেছি বলে মনে পড়ে না। আমাদের জমি ছিল না। মা-বাবা দুজনেই বিলে খাটতে যেত। মা বান্না কবে সকালবেলা আমাদের খাইয়ে দিয়ে চলে যেত। আমি সারাদিন বোনদের ধবতাম।"

"আমরা ভাইবোনরা সেভাবে খেলাধূলা কোনদিন করিনি। বাবা মাবা খাওয়ার পর থেকেই বড়দাদা একজনেব ঘরে বাগাল থাকত। ছোটদাদা আমাকে দেখাশুনা কবত। মা ঘরের সমস্ত কাজ, রান্না-বান্না করে লোকের ঘরে কামিন খাটতে যেত। কোটা[৫] ব্যবসাও করত। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ঘরের গরু, ছাগল, ভেড়া নিয়ে মাঠে চলে যেতাম। যে বয়সে ছোটদাদা আমাকে দেখাশুনা কবত সে বয়স থেকে তো ঝাঁট-পাট, রান্না-বান্না এসব করতাম। গরীবের সংসার করতে তো হবেই।"

৩। শিক্ষার সুযোগ

"স্কুলে পড়তে ভালো লাগত। কিন্তু ঘাটালীব সংসাব, প্যান্ট-জামা নেই, কি করে যাবো?"

"তখনকার দিনে বুড়োরা বলত 'ঘরে ভাত রান্না করবি, বিটি ছানা পড়াশোনা করে কি হবে?' বাবাও তাই বলত। আব এখনকাব দিনে বলে 'লেখাপড়া না শেখালে বিয়ে হবে না।"

"বাবা মিস্ত্রীর কাজ করলেও আমাদেব অবস্থা ভালো ছিল না। আমরা চার বোন, তিনভাই। দাদাকে মামাবাড়িতে আর দু-ভাইকে বাবা পড়িয়েছে; আমাদেব ঘাটালির সংসার তো তাই বাবা কোন বোনকে পড়াতে পারেনি। দিদিব যদিও অনেক আগে বিয়ে হয়ে যায়।"

৪। **চিকিৎসার সুযোগ :**

"নাতি নাতনিদের পোলিও খাইয়েছে-এদের কিছু একটা হলেই শিলদার হাসপাতালে ছেলে বৌমারা দেখাতে নিয়ে যায়। আমাব তিনটে ছেলেমেয়ে, ওদেরকে এতোসব করতে হয়নি। তখনকার দিনে এত রোগ অসুখ ছিল না। হলেও ডাক্তার দেখাতে হতো না।"

"...আগে ছেলের জ্বব হলো, তাবপরে স্বামীর জ্বর হলো। ভুরষাতোলার ডাঃ আনল খুড়শ্বশুব। ওষুধ খাওয়াব পরে সেদিন রাত্রে স্বামী মারা গেল। ছেলে ওষুধ খেয়েছিল কিন্তু একই রকম ছিল। সেদিন আবার বড় মেয়েব জ্বর হলো। আমি কি করবো বুঝে পাচ্ছিলাম না। পরের দিন সকালে ভাইদের সঙ্গে ছেলেকে কাপগাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। স্বামীর সাইকেল বন্ধক দিয়ে চিকিৎসা করতে বললাম। সেই টাকায় নুনিয়াতে খাঁদু ডাক্তারকে দেখালো। মেয়েকে গাঁয়েব ওষুধ খাওয়ানো হল।"

৫। **বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ :**

একমাত্র গবান[১] পূজায় সমস্ত Community-র লোকেরা অংশগ্রহণ করে। এছাড়া এক community-ব লোকেবা অন্য community-র পূজায় অংশগ্রহণ করে না। মেয়েরা লক্ষ্মীপূজা ছাড়া আব কোন পূজা করতে পাবে না।

সাধাবণতঃ বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, নামকরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে প্রত্যেকে তাদের সম্প্রদাযেব লোককে ডাকে। অবশ্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচিতকে নিমন্ত্রণ কবলেও সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র পুরুষেরা নিমন্ত্রিত হয়।

৬। **নিজের প্রয়োজনে ইচ্ছামত কাজ করার সুযোগ :**

"আমাব স্বামীর একটু পড়াশোনা আছে, কিন্তু নিজে কোন রোজগার করতো না। এমনকি ঘবের কাজও কবতো না। কিন্তু সংসারের সব ব্যাপারে তার মত শুনতে হতো। এখন তো ছেলেমেয়েদেব বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, সংসারের চিন্তাভাবনা বেশি নেই। এখন স্বামীও সংসারের কোন কথাতে থাকতে চায না। বলে 'আমি পারবো না, তোরা দ্যাখ।' এখন তাই চাষ কিংবা সংসাবেব যে কোন ব্যাপাবে ছেলের সঙ্গে কথা বলে আমি সিদ্ধান্ত নিই।"

৭। **নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ ও পণ নেওয়া :**

৫৫ বছর বয়স্ক মাহাতো সম্প্রদায়ের একজনের কথা-"আমি পাড়ার একটা মেয়েকে ভালোবাসতাম। বাবা মা সবাই জানত। বিশেষ করে সে কারণেই বাবা অন্য জায়গায় আমার সম্বন্ধ কবে বিয়ে দেয়। আমি একদম চাইনি, কিন্তু 'বিয়ে করবো না' বাবাকে একথাও বলতে পাবিনি। আমার বিয়ের সময় ও খুব কেঁদেছিল। আমি সুখী হতে পারিনি। আজ মনে হয় ওর সঙ্গে বিয়ে হলে ভালো হতো। বাবা মারা যাওয়ার কষ্টের থেকেও এটা বেশি কষ্টের। আমার ছেলেবা নিজে পছন্দ করে বিয়ে কবলে আমি বিন্দুমাত্র আপত্তি করবো না।"

২৯ বছরের সদগোপ সম্প্রদায়ের একজনের কথায়-"আমার অত তাডাতাড়ি বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমাব বোনের বিয়েতে পণ দেওয়ার টাকা ছিল না। বাবা বলেছিল-আমার বিয়ের পণেব টাকায় বোনের বিয়ে হবে। তাই আমি চাপে পড়ে বিয়ে করেছি। বিয়েতে বাবা ২০,০০০ টাকা পণ নিয়েছিল।"

"আমাকে যখন দেখাশুনা করতে এল তখন উয়ার (স্বামী) পছন্দ হয়েছিল বলে তারা এখানে কথা করল। আমাব পছন্দ কিনা তা কেউ জিজ্ঞাসা করেনি।"

আদিবাসী সমাজে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বিবাহ স্বীকৃত। "আমি ও আমার সমস্ত ভাইবোনেরা নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছি। বিয়ের আগে থেকেই আমরা মেলামেশা করতাম। তারপর একদিন ওর বাড়ি চলে যাই। ওর সঙ্গে সংসাব করার বছর খানেক পরে আমার সিঁদুর দান হয়। আমাদেব এরকমই। ছেলেমেয়ে হয়ে যাওয়ার পরও হতে পারে। তবে ছেলেমেয়ের তা দেখা চলবে না।"

"আমার সাত বছরে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের সময় শ্বশুর ঘর থেকে ১০০ টাকা কণে পণ, আমাকে, মা আর ভাইদের কাপড় দিয়েছিল। তখন বরপণ ছিল না। আর আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছি ১৪ বছর বয়সে। বিয়েতে ৬০০ টাকা বরপণ ও দানের বাসন দিতে হযেছে। তাও তখন বরপণ কম ছিল। এখন হলে যে কি করে মেয়ের বিয়ে দিতাম!"

৮। আর্থিক অবস্থা :

"মেয়ে যখন তিন-চার বছরের হলো তখন আমরা দু জন নামালে যেতাম। এখানে বিলে' খাটলে তো কোনমতে দুবেলা ভাত জুটবে। আমাব তো একটাই মাত্র মেয়ে তাকে ভালো ক'রে পড়াতে হবে, বিয়ে দিতে হবে-নামালে" না গেলে টাকা পাবো কি করে? নামালে বছরে দুবাব যেতাম। তাই দিয়ে মেয়েকে ছয় ক্লাস পড়িয়েছি। মেযের বিয়ে দিয়েছি ৬০০ টাকা পণ দিয়ে। তারপরে শাশুড়ী মারা যাওয়ার পরও গেছি। বুড়ো বযসে জামাই যদি না দেখে তাহলে আমাদের চলবে কি করে? তখন তো আর খেটে খেতে পারবো না।"

"আমাদের জমি থেকেই সাবাবছরের খাওয়া-পরা চলে যায। বাইরে আর খাটতে যেতে হয় না।"

"বড় ছেলে হওয়ার পর আমি ও বিলে খাটতে যাই। আগে স্বামী একা যেত। একজন খাটলে আমাদের দুজনেরই কষ্ট করে চলত, সেখানে ছেলেমেয়েদেব খাওয়াবো কি?"

"এখন আমাদের সংসার বেশ ভালোভাবে চলে। দুটো ছেলে কলেজে পড়ে। ওবা হস্টেলে থাকে। আমার স্বামী প্রাইমারী স্কুলে চাকরি করে। আমাদের ১২ বিঘা জমি। আমরা ভালোভাবেই থাকি।"

৯। কাজের প্রকৃতি :

এক আদিবাসী মহিলার কথা—

"চাষের সময় বিলে খাটতে যাই। জঙ্গলে থেকে পাতা" এনে টিপি। হাটবারে হাটবারে রাস্তায় বসে হাড়িয়া বিক্রি করি। একা মানুষ এতেই চলে যায়।"

মাহাতো সম্প্রদায়ের একজন পুরুষের কথা—

"আমাদের তো নিজেদের জমি আছে। চাষের সময় তাতেই কাজ করি। অন্য সময় বিড়ি পাতার ব্যবসা, গ্রাম থেকে টেপা শালপাতা কিনে বিক্রি কবি। আবাব ধানের ব্যবসাও করি। সব থেকে আয় বেশি বিড়ি পাতায়।"

তাঁতী মহিলা বলেছিল—"মেয়ে ছোট বলে নামালে যাই না। গাঁযে ঘরে চাষের কাজ

করি। আমার স্বামী নামাল যায়। না গেলে সংসার চলবে না। আমি প্রতিদিন জঙ্গল যাই পাত তুলি, গাছ কাটি আনি।"

১০। শ্রমের মূল্য :

ধান বোয়া ও কাটাব পারিশ্রমিক ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকার মধ্যে থাকে। সব গ্রামে এই মূল্য মহিলা-পুরুষদের ক্ষেত্রে সমান নয়। কোথাও কোথাও মহিলারা পুরুষদের চেয়ে অন্ততঃ ৫ টাকা কম পারিশ্রমিক পায়। কৃষিক্ষেত্র ছাড়া অন্যক্ষেত্রে পাবিশ্রমিক বেশী। পঞ্চায়েতের তবফে রাস্তা সংস্কার, পুকুর কাটা ইত্যাদি কাজেব জন্য ৪০-৪৮ টাকা মজুরী পাওয়া যায়। একাজে মহিলা-পুরুষের মজুবীর পার্থক্য নেই। ঘর ছাওয়া, কাঠের কাজ ইত্যাদি কেবলমাত্র পুরুষরাই করে থাকেন। একাজের জন্য প্রতিদিন ৪০-৬০ টাকা পারিশ্রমিক পাওয়া যায়। কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকেব বাড়া কমা নির্ভব কবে চাহিদা অনুযাযী শ্রমিকের উপস্থিতি ও ফলনের কমবেশি হওযার উপর।

১১। ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রবণতা :

৫৫ বছব বয়স্কা একজনের কথায—

"আমার অনেক ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছে। তখন বিয়ে মানে বিবাট ব্যাপার ছিল। তিনদিন আগে থেকে গায়ে হলুদ আর কত কি অনুষ্ঠান ! আর আজকাল তো একদিনেই সব মিটে যায।"

৮৫ বছবেব এক বয়স্ক ব্যক্তি বলেছিলেন—

"আমার বাবার আমলে গাঁযের সব ছেলেই পাতা নাচ, ছৌ-নাচ, লাঠি খেলা—এইসব জানত। আমরাও আখডায় লাঠি খেলা শিখেছি। এটা শুধু শখ ছিল না। ডাকাত পড়লে আমরা তাদের ঠেকানোর জন্যও শিখতাম। আর এখন ছেলেরা এসব জানেও না। শেখার ইচ্ছাও নেই। শুধু তাস খেলে, রেডিও শুনে, টি.ভি দেখে অবসর সময় কাটায।"

মাহাতো সম্প্রদাযের ১৬ বছরের কিশোবীব কথা—

"টুসু গান আমাদেব ঘবে কেউ করে না। গাঁয়ে অনেকে কবলেও আমাদেব ভালো লাগে না।"

১২। স্থানীয় আইন ও বিচারব্যবস্থা :

অতীতে স্থানীয আইন ও বিচার ব্যবস্থা ছিল। আদিবাসীদেব মাঝি ও অন্যান্যদের মোড়ল ছিল নিজেদের সমাজের প্রধান। এঁরা অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিচার ব্যবস্থারও প্রধান হিসেবে কাজ করতো। এক্ষেত্রে গোডেত ও কোটাল পদটি দেখা যায়। এই পদগুলি উত্তরাধিকাব সূত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্র পেয়ে থাকে। বর্তমানে এই পদগুলি নামেমাত্র টিঁকে আছে এবং এঁদের ক্ষমতা কিছুই নেই। তবে উৎসব অনুষ্ঠানে এরা এখনো আমন্ত্রিত হয প্রধান হিসাবে।

১৩। আত্মসচেতনতা ও পরিবার সম্পর্কে সচেতনতা :

গ্রামের মহিলাব কথা—

"বাড়ির কোন জিনিষই আমার নামে লেখাপড়া করা নেই। সেদিক দিয়ে দেখলে কোন কিছুতেই অধিকার নেই। আবাব অন্যদিকে দেখলে সবেই আমার অধিকার আছে।"

"আমার স্বামী আমার বোনকে দেখতে এসেছিল। বয়স বেশি বলে মা বাবা আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে। আমি বিয়ে করতে চাইনি। বলোছিলাম 'আমাকে তো দ্যাখেনি, বোনকে দেখেছে। বিয়ের পরে যদি আমাকে না ভালোবাসে ? না দেখে ? তখন তোমরা আমাকে দেখবে ?"

১৪। সময় সচেতনতা :

এঁদেব ঘড়ি সংক্রান্ত সময় সচেতনতা আছে, যা সূর্যবশ্মির অগ্রগতি থেকে নিরূপিত হয়। তাছাড়া পূর্বপুরুষদের অতীত প্রসঙ্গ সম্পর্কেও এবা সচেতন। তবে সন, তারিখ এগুলো বলতে না পারলেও ঘটনার পরম্পরা সম্পর্কে এরা সচেতন।

এইসব তথ্য থেকে ব্যক্তির জীবন কথা-র পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে গ্রামগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কাঠামো সম্পর্কে সমীক্ষক দলের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুমানে উপনীত হওয়া যায়। এগুলি নিম্নরূপ:

১. অসবর্ণ বিবাহ এখনো সমাজ স্বীকৃত নয়।
অতীতে অস্পৃশ্যতা প্রকট ছিল। বর্তমান প্রজন্ম এ ব্যাপারে অনেকাংশে উদার। তাহলেও কোন কোন ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতা অব্যাহত, বিশেষত মেয়েদের মধ্যে।

২. ছেলেমেয়েদের নিজেব ইচ্ছামত বিবাহ করার সুযোগ নেই, তা পবিবাবেব বয়োজ্যেষ্ঠদের ইচ্ছার উপব নির্ভব করে। শুধু আদিবাসীদেব আছে তবে অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ সমাজ-স্বীকৃত নয়।

৩. বর্তমানে জাতিগত পার্থক্যেব থেকেও অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্য শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন একটি বাড়িতে একজনকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে সেক্ষেত্রে ছেলেদেরই সুযোগ দেওয়া হয়। তবে আগে নারী-পুরুষের শিক্ষার অধিকার সমান ছিল না, সেটা অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করতো না। বর্তমানে এই বৈষম্য অনেকাংশে কমেছে।
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ আগের থেকে বেড়েছে, তবে তা স্কুল স্তব পর্যন্ত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ বা formal education অনেকেই ব্যবহাবিক জীবনে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

৪. বর্তমানে গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরানো চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রবণতা লক্ষ্য কবা যায়। তবে চিকিৎসার সুযোগ লাভের পার্থক্য ঘটে অর্থনৈতিক অবস্থাব পার্থক্যের জন্য। তাছাড়া মহিলারা পুরুষদের থেকে চিকিৎসা লাভের সুযোগ থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়।

৫. বর্তমানে চাষ ও বনজ সম্পদ আহবণ বেশীর ভাগ লোকেব প্রধান জীবিকা। আগে বনজসম্পদ নিজেদের ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত হতো অর্থাৎ জ্বালানি করতো। বর্তমানে আয়ের উৎস হিসাবেও তা ব্যবহৃত হয়।
অর্থনৈতিক কাজে বর্তমানে সদগোপ সম্প্রদায়ের মহিলাবা ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহিলা ও পুরুষ অংশগ্রহণ করে। তবে তা মূলতঃ চাষের কাজ, পুকুর কাটা, রাস্তা

সারানো, বনজ সম্পদ আহরণ ইত্যাদি। আবার চাষের কাজের লাঙল মেয়েরা করে না।

৬. পরিবারে একজন উপার্জনশীল পুরুষের থেকে উপার্জনশীল মহিলার গুরুত্ব অনেক কম এবং কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও মহিলাদের কম। অবশ্য সব caste এর ক্ষেত্রে সমান নয়। আদিবাসী মহিলারা এ ব্যাপারে অনেক বেশী ক্ষমতা পায় অন্যদের থেকে।

৭. বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে caste অনুযায়ী পার্থক্য দেখা যায়। তবে অনেকক্ষেত্রে গ্রামের সবাই কোন অনুষ্ঠানে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে। কোন কোন অনুষ্ঠানে মহিলা-পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করলেও মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ অনেক ক্ষেত্রে কম।

৮. নিজেদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখবার এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে ছড়িয়ে দেওয়াব প্রবণতা ক্রম হ্রাসমান। এরফলে বর্তমান প্রজন্মের যুব সমাজের কাছে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি খুব স্পষ্ট নয়।

৯. সময় সচেতনতা আছে। এছাড়া এদের আত্ম-সচেতনতা আছে, তবে তা নিজ পরিবাব সংক্রান্ত চেতনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন।

সূত্র নির্দেশ

১. A handbook for data collection and analysis on seven roles and statuses of women—
Cristine Oppong and Katharine Abu.
(Published with the financial support of the United Nations Fund for Population activities (UNFPA). International Labour Office Geneva)

২. নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থাৎ সাঁওতালরা কেবলমাত্র সাঁওতালদের বিযে করতে পারবে।

৩ কাটা

৪. আনুষ্ঠানিক ভাবে পাতানো বন্ধু

৫. ধান কিনে চাল তৈবী কবে, সেই চাল বিক্রির ব্যবসা।

৬. গ্রাম দেবতা

৭. জমি

৮. নির্দিষ্ট সময়ে এক জাযগা থেকে অন্য জায়গায় (যা নীচু ও উর্বর) কৃষি শ্রমিক হিসাবে যাওয়া।

৯. পাতা।

মুখের কথায় ইতিহাস : দাঁতনে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন

শঙ্কর কুমার দাস

॥ এক ॥

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস এক বিশাল মহাভারত তুল্য ইতিহাস। দীর্ঘকালব্যাপী এই ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল মুক্তি সংগ্রামে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করেছে। এহেতু সাম্প্রতিককালে মুক্তি সংগ্রামের পূর্ণ ইতিহাস বচনার প্রয়োজনে প্রতিটি প্রদেশেব প্রতিটি অঞ্চলে পৃথক পৃথক ভূমিকা পালনের বিষয়গুলির উপব গুকত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে এক একটি অঞ্চলের ইতিহাস তার স্বকীয়তা নিয়ে স্বতন্ত্র ভাবে ফুটে উঠেছে।

মুক্তি সংগ্রামে বাংলার মেদিনীপুর জেলার ভূমিকা আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। বাংলার এক সীমান্তে অবস্থিত হওয়ার কারণে একাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মেদিনীপুরকে উড়িষ্যার গঙ্গা রাজশক্তি ও মোঘল বাদশাহী শক্তি এবং মাবাঠাবগী বাহিনীব দ্বারা বহুবারই উপদ্রুত হতে হয়। দীর্ঘকাল ধরে অজস্র অত্যাচার ও অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতির কারণে সমগ্র মেদিনীপুর জেলা বিশেষ করে সদর দক্ষিণ মহকুমার মানুষ জনের মনে এক প্রতিরোধী সত্তার উন্মেষ ঘটেছিল।

ইতিহাসের পটপরিবর্তনের সূত্রে মোঘল বাদশাহী স্থলে ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্বের দিনগুলিতে মেদিনীপুরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমের সীমান্ত অঞ্চলগুলি বিদেশী শাসকের জোর জুলুম ও শোষণ পীড়নের কাছে সবসময় মাথা নত করে থাকেনি। সময় ও সুযোগ ক্রমে তারা বিদ্রোহের ধ্বজা উড়ায়। আবার শেষ পর্যন্ত অসহায়তার কাবণে কোম্পানী শাসনের কাছে মাথা নত করে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হতে মুক্তি আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতির কাল তথা ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জনের দিন পর্যন্ত পর্বগুলিতে দক্ষিণ পশ্চিমের সীমান্ত বাংলা কখনো অসংগঠিত ভাবে আবার কখন ওরা সংগঠিত হয়ে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। এই সীমান্ত বাংলার সংগ্রামী রূপটি "৪২"-এর "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। মেদিনীপুর জেলাব সদর দক্ষিণ মহকুমার দাঁতন থানার ইতিহাসকে দৃষ্টান্ত হিসাবে নিয়ে "৪২"-এর আন্দোলনে সীমান্ত বাংলার এক গভীব প্রতিরোধী সংগ্রামের পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

আলোচ্য প্রবন্ধটি '৪২-এর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সংগ্রামী রাধাকৃষ্ণ মিশ্রের (বর্তমান দাঁতন ২নং ব্লকের নারায়ণচক গ্রামের) সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ হল:-

"ভারত ছাড়ো" আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে (১৯৩৭-৩৯) দাঁতনে ভূপেন দত্ত, পতিত বর্মন, মন্মথ ষাঁড়েশ্বরী প্রমুখ গান্ধী পন্থীদের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন চলে। এ হেতু ব্রিটিশ সবকাব ভূপেন দত্ত ও ব্রজেন্দ্র নাথ ঘোষের বাড়ী পুড়িয়ে দেয় এবং রাধাকৃষ্ণ মিশ্র ও স্ব-গ্রামের (নারায়ণ চক) অন্যান্য কয়েক জনের বাড়ি ভাঙচুর করে। এছাড়া সংগ্রামী ভূপেন দত্তকে অর্ধমৃত অবস্থায় মাঠে জুন পুকুরের কাঁটা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে যায়। শুধু তাই নয় তৎকালীন এস. ডি. ও. শঙ্কর সেন দাঁতন থেকে ফেরার সময় (অঘোর চন্দ-নন্দকুড়িয়া, কেদার জানা-কেশরম্ভা, গজেন্দ্র নাথ মান্না - শোলেমানপুর, শশীভূষণ আদক - শোলেমানপুর) জোর পূর্ব্বক পাল্কি বহনে বাধ্য কবেন। তা সত্বেও আন্দোলনের তীব্রতার কারণে দাঁতনে ১৫টি অঞ্চল পঞ্চায়েতের মধ্যে ৬টিতে ইউনিযন বোর্ড স্থাপিত হয়নি। আর এই সাফল্য আন্দোলনকারীদের মনোবল বিশেষভাবে বাড়িয়ে দেয়। ফলে সংগ্রামীগণ আন্দোলনকে সুসংহত করার ও সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে সামিল করার বিষয়ে প্রয়াস হন। এ সময় সংগ্রামী রাধাকৃষ্ণ মিশ্রের বয়স প্রায় ১৪ বৎসর। তিনি মধ্যবিত্ত কৃষক পবিবারের সন্তান। কিন্তু এ সময় বড মোহনপুর মধ্য ইংরেজী স্কুলের হোস্টেলে থাকার সুবাদে স্কুলের প্রধান শিক্ষক (সুবেশ মজুমদার) ও সম্পাদক মহাশয়ের (অতুল কানুনগো) কাছে মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী শুনে শুনে আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিষয়ে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। পরে (১৯৪০) স্ব-গ্রামেরই আত্মীয় ভূপেন দত্তের সংস্পর্শে আসার সুবাদে তিনি মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে দাঁতনে জন সংগঠন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এ কারণে ১৯৪০ এর মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ সরকার হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সংগ্রামী নবীন দাস মহাপাত্রের প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়নি। কারণ দাঁতনে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক ছিল ভাই-ভাই।

এদিকে বিশ্বযুদ্ধ কালীন পবিস্থিতিতে দাঁতনে তীব্র খাদ্য সংকট ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব দেখা দেয়। ফলে দাঁতন আন্দোলন মুখর হয়ে উঠে এবং ১৯৪২ এর গোড়ায় দাঁতন বিপ্লবের জ্বালামুখে এসে হাজির হয়। এহেতু ভূপেন দত্ত, পতিত বর্মন, মন্মথ ষাঁড়েশ্বরী, চারুচন্দ্র মহান্তি, প্রসন্ন গিরি, নগেন্দ্র নাথ মাইতি, অতুল দে, বিলায়েৎ খাঁ, চাঁদ মহম্মদ, জব্বর মহম্মদ, শেখ ইশাহাক্, আব্দুল ওহাহেদ মল্লিক, রাজা মিঞা প্রমুখ গান্ধী পন্থী ও অন্যান্য স্থানীয় বিশিষ্ট মানুষজন থানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। যার ফলে জুন ও জুলাই মাসে দুইবার থানা আক্রমণ হয়। কিন্তু তারা থানা দখলে ব্যর্থ হন। কারণ এই সময় দাঁতনের জাতীয় আন্দোলন কেবলমাত্র শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আন্দোলনের এই দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে নেতৃবর্গ সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে সামিলের চেষ্টা করেন।

ইতিমধ্যে ৯ই আগষ্ট (১৯৪২) শুরু হওয়া "ভারতছাড়ো" আন্দোলনের জোয়ারে দাঁতনও ভেসে যায়। তবে এখানকার আন্দোলনে থানা আক্রমণ সর্বাগ্রে প্রাধান্য পায়। ফলে আগষ্ট ২৫/২৬শে (কোন তারিখটি ঠিক সে সম্পর্কে সংশয় রয়েছে) পুনরায় থানা আক্রমণ হয়। কিন্তু এবারে প্রায় তিন হাজার সংগ্রামী সামিল হলেও থানা দখল সম্ভব হয়নি। উপর্যুপরি তিনবার ধরে থানা দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণে থানা জাতীয় নেতৃবর্গের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে—থানা বাসী মানুষ জনের মধ্যে ব্রিটিশ সরকাব বিরোধী মনোভাব দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠেনি। এসময় তারা চিন্তা করেন মানুষ জনের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না হলে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার এবং ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় অভিযান সফল হতে পারেনি। এহেতু তারা শিক্ষা প্রসারের বিষয়ে উদ্যোগী হয়। তুরকা গ্রামে একটি উচ্চবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে তারা স্থানীয় জন সাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করেন এবং এভাবে জাতীয় চিন্তা ভাবনা বিশেষ করে ব্রিটিশ বিরোধী চিন্তা ভাবনা প্রায় সকল স্তরের স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এবং তারা ক্রমশঃ জাতীয় আন্দোলনে সামিল হতে থাকেন।

এভাবে দাঁতনে জাতীয় আন্দোলনের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে। সেপ্টেম্বরে দাঁতনবাসী সংগ্রামী জনতা নতুনভাবে থানা আক্রমণ করে। এবারে ৮-১০ হাজার সংগ্রামী থানা দখলের অভিযানে সামিল হয় এবং তারা প্রভূত ঝুঁকির মধ্য দিয়ে থানা দখল করে ফেলেন।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ প্রসাশন শোলেমানপুরকে নিষিদ্ধ এলাকা বলে চিহ্নিত করে। তার জবাবে সংগ্রামীগণ সেখানে পথসভা করেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী বক্তব্য বাখেন। একারণে ভূপেন দত্ত, রাধাকৃষ্ণ মিশ্র, কেদার জানা, গোবিন্দ দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে দেশীয় আইনজীবিদের প্রচেষ্টায় স্বল্পকালের মধ্যে তারা মুক্তি পান। ফলে তারা ব্রিটিশ শাসন হতে মুক্তির জন্য সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে সামিল করার বিশেষ চেষ্টা চালান।

এদিকে ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২ তমলুকে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে দাঁতনেও এই ধরণের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভূপেন দত্ত ও রাধাকৃষ্ণ মিশ্র তমলুকে যাত্রা করেন। সেখানে গিয়ে তারা অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশ সামন্ত ও সুশীল ধাড়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারেন কম পক্ষে ৯৫ শতাংশ লোকের লিখিত সমর্থন পেলে জাতীয় সরকার গড়া যেতে পারে। কিন্তু ফিরে এলে পরিস্থিতি অনুকূল না থাকার কারণে তারা ওই প্রয়াস হতে সরে দাঁড়ান। এহেতু ১৯৪৩-৪৪ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ অধিক খাজনা ও কর দেওয়া এবং বেগার খাটার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তবে আন্দোলন যতই জোরদার হতে থাকে ব্রিটিশের অত্যাচারও ততই বাড়তে থাকে এবং সাধারণ মানুষ ততই আন্দোলনে সামিল হতে থাকে। এভাবে আন্দোলনকারীগণ শোষিত শ্রেণীর (শ্রমিক ও কৃষক) স্বার্থে ঔপনিবেশিক কাঠামোর বিরোধীতা করেন এবং তার পরিবর্তনের বিষয়ে প্রয়াসী হয়ে উঠেন।

॥ দুই ॥

দাঁতনে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন মুক্তি সংগ্রাম পর্বের বিভিন্ন স্থানীয় আন্দোলনের মতোই বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশেষিতঃ—

থানাটিতে ইউনিয়ন স্থাপন সংক্রান্ত সবকারী উদ্যোগ ও নির্দেশের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ গান্ধীপন্থী আন্দোলন চালিয়ে থানাবাসী বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল। উল্লেখ করা যায় দাঁতনের ১৫টি ইউনিযনের মধ্যে ৬টি ইউনিয়নের সংগ্রামীরা বোর্ড গঠন করতে দেয়নি। থানা সংগ্রামীদের এই সাফল্যেব রেশ পরবর্তীকালে অমলিন ও অক্ষুণ্ণ থাকে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন পর্বে নতুন করে বিদেশী বিজাতীয় সরকারেব বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলে থানবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে সামিল হয়। গান্ধীপন্থী সংগ্রামী আদর্শ এবং কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ গৌণভাবে হলেও সহিংস কার্যক্রম আন্দোলনের সঙ্গে কিছুটা মুক্ত হয়ে যায়। অবশ্য কংগ্রেস High Command-এর বাঁধাধবা বিধিনিষেধ দাঁতনের সংগ্রামী আন্দোলনের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেনি। গান্ধীব নেতৃত্বে ইংরেজ ভারত ছাড়তে বাধ্য হবে—এরূপ একটা প্রত্যাশা জনচিত্তে যে উন্মাদনা সৃষ্টি কবে তারই জোয়াবে থানাবাসী ভাসতে থাকে। উঁচুমানের কোন নেতা গান্ধী আদর্শেব ছক মেনে আন্দোলন চালানোর কথা ভাবেননি। ফলে আন্দোলন অহিংস ও সহিংস এই ধাবা দুটির মিশ্ররূপ হিসাবে হাজির হয়। দাঁতনের সংগ্রামীদেব কাছে গান্ধী নয়, গান্ধীব সংগ্রামী আদর্শ বিশেষ গুরুত্ব পেযেছিল। ফলে গান্ধীপন্থী ও অগান্ধীপন্থী সব ধরণের ও সব বয়সের মানুষজন আন্দোলনে সামিল হয়েছিল।

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মানুষজনের সিংহভাগই স্কুল কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত হননি। তবে স্বদেশ ও বিদেশী শাসন এবং গান্ধী ভাবিত রামরাজ্য ও শাসনের নামে বিদেশী সরকাবের চরিত্র সম্পর্কে তারা সচেতন ছিলেন এবং আপামর থানাবাসীকে তারা এ বিষযে সচেতন করেছিলেন।

আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী নেতৃবর্গ প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষজন ছিলেন। পোষাক-পবিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার এবং মানুষজনেব সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করার ক্ষমতা তাদের ব্যক্তি জীবন ও চরিত্রকে পরিচিত গন্ডীর থানাবাসীদের আকৃষ্ট করেছিল। ঐ সব নেতৃবর্গ আদৌ বক্তৃতাবাজ নেতা ছিলেন না। সংগঠন ধর্মী এবং সেই সঙ্গে প্রগতিবাদী হওয়ার সূত্রে জনচিত্তে তাদের বিশেষ ছাপ পড়েছিল। একারণে 'ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো' এবং 'করেঙ্গে ইযে মবেঙ্গে' ডাক তাদের কানে পৌঁছলে তারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ বিষয়ে বিশেষ উন্মুখ হযে উঠেন। আর মরুৎ পাথারে বারুদের ঘ্রাণ পেয়ে স্থানীয় নেতৃবর্গ আন্দোলন ধীরে সুস্থে বাড়তে থাকে এবং অল্পকালের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে বিশেষ ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে।

আন্দোলনে অংশগ্রহণকাবী মানুষ জনের সিংহভাগই কৃষক পরিবারের লোক। অবশ্য স্বল্পবিত্ত মানুষজনও এদের মধ্যে ছিলেন। আন্দোলন পর্বে দাঁতনে শিক্ষা বিশেষ একটা প্রসার ঘটেনি। পার্শ্ববর্তী কাঁথি মহকুমা শহবে গিয়ে লেখা পড়া শিখে আসার মত অর্থকৌলিন্য এবং সেই সঙ্গে উচ্চ শিক্ষাব মানসিকতা খুব অল্প জনেরই ছিল। সেই হেতু দাঁতনের আন্দোলনে

শিক্ষিত মানুষ জনের প্রভাব খুব সামান্যই লক্ষ্য করা যায়।

দাঁতন থানার অধিবাসীদেব বেশীর ভাগই বর্ণ হিন্দু। এদেব উচ্চ বর্গীয় পর্যায়ভুক্ত করা চলে। নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে হাড়ি, মুচি, বাগ্‌দি, জেলে, কাহার প্রভৃতিদেব সংখ্যা খুবই সামান্য।

দাঁতনে মুসলমান সম্প্রদায়েব মানুষজনেব সংখ্যা হিন্দু জনসংখ্যাব অনুপাতে খুবই কম। হিন্দু গ্রামগুলির মাঝে মাঝে দু-একটি মুসলমান গ্রাম ছিল। তবে একেবাবে পুবোপুবি হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম কিংবা মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম দাঁতনে ছিল না। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হলে দেখা যায় নিম্নবর্গীয় হিন্দু মানুষজন, উচ্চবর্গীয় মুসলমানদেব খুব সামান্য ব্যতীত এবং সাধারণ স্তরে মুসলমান আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখাযনি। অথচ উচ্চবর্গীয়দেব ক্ষেত্রে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে একটা বাড়াবাড়ি ভাবছিল। সে জন্য কবির কথায়---- "আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান/তাবই লাগি কাড়াকাড়ি।" এতৎসত্ত্বেও প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় -আন্দোলন সম্পর্কে অনীহা থাকলেও সামগ্রিকভাবে দাঁতনে মুসলমান সম্প্রদায এবং নিম্নবর্গীয় হিন্দু মানুষজন আন্দোলন সম্পর্কে কোনরূপ বিবোধী মনোভাব প্রকাশ কবেনি কিংবা কোন ধরণের বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ কবেনি। অবশ্যই এ প্রসঙ্গে আবোও বলা যায়— আন্দোলন শুরু হওয়াব অল্পকাল পরে নিম্নবর্গীয় হিন্দু এবং কোন কোন ইউনিয়নেব বেশ কিছু সংখ্যক প্রাগ্রসর দেশপ্রেমিক মুসলমান আন্দোলনে সামিল হযেছিলেন। তবে এবা প্রতিক্ষেত্রে গান্ধীবাদী আদর্শের অনুসাবী ছিলেন।

দাঁতনের আন্দোলনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তার একরূপতা ও একধর্মিতা উচ্চবর্গীয় নিম্নবর্গীয় এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধাবা আন্দোলনের কোন স্তবে দানা বেঁধে উঠেনি। সে কারণে আন্দোলন নিজস্ব বেগেই চলতে থাকে। বাধাহীন, বন্ধনহীন দাঁতনে এই স্ব- নির্ভব আন্দোলন অবশ্য অদৃশ্যভাবে হলেও জাতীয় কংগ্রেসের পথবেখা ধরে গতিশীল ছিল। সেহেতু গান্ধী আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে দাঁতনের আন্দোলন শুদ্ধ হয়ে যায়। আন্দোলন শেষে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির অংক মেলানোর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু পাওনার ঘরের শূন্য গন্ডার কাবণে আন্দোলনের নেতৃত্বকে ও সেই সঙ্গে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের কি একটা বিশেষ অবসাদ গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তাদের এই আশা নিরাশার ঘোব কেটে যায়। শুরু হয় নতুনের সাধনা, আগামী দিনের সাধনা। স্থানীয় নেতৃত্ব এবং সংগ্রামী মানুষজন এইভাবে নিশ্চিত হন—নতুন করে আবার কোন আন্দোলন হবে। গান্ধী মহাবাজ আগেব মতোই নতুন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু সেটা কবে ও কিভাবে? সেদিন হযতো তাদেব এ প্রশ্ন ছিল,—'নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার খুলিতে বিলম্ব কত আব?'

সূত্র নির্দেশ

দাঁতন ২নং ব্লকের অর্ন্তভুক্ত নারায়ণ চক গ্রামবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী রাধাকৃষ্ণ মিশ্রের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার (ডিসেম্বর ১৯৯৮ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯)।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার প্রথম শহীদ

রাসবিহারী মিশ্র

সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে বিদ্রোহ-বিপ্লবের ঢেউ ছুটছে। অহিংস সহিংস দুই নীতির ধারক বাহকেই আপন আপন বিশ্বাস ও শক্তি নিয়ে আঘাত হানছে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূলে, শুধু মেদিনীপুরই কি পিছিয়ে থাকবে এই মুক্তিযুদ্ধের আয়োজন হতে ?

১৯৪২ এর ৯ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ জাতীয় অভ্যুত্থান। গান্ধীজির "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের প্রস্তাব "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" মধ্য দিয়ে ভারতবাসীকে নতুন পথ দেখালো, গান্ধিজী ও কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদে সমগ্র দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়লো, শুরু হলো দেশব্যাপী প্রকাশ্য বিদ্রোহ—আগষ্ট বিপ্লব।

এই স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর জেলা কোন অংশে পিছিয়ে ছিল না। কাবণ সব ব্যক্তিগত, জাতপাত, শ্রেণীগত বিরোধের চেয়ে বড় করে উঠেছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পাবার তাগিদ, নেতারা দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়েছিল "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে" এই বাণী তখনকার কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল, ৯ই আগষ্ট "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনেই অবিভক্ত তমলুক মহকুমার অগ্রণী ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ইংরেজের নির্যাতন ও অত্যাচার মেদিনীপুবের মানুষ নীরবে সহ্য করেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণডঙ্কা তখন দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত, ইংরেজ প্রশাসন যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে মন দিল। যুক্তি ছিল খাদ্য দ্রব্যের ভাণ্ডার যাতে শত্রুর জিম্মায় না চলে যায় সেজন্য সৈন্যদের খাদ্য সংগ্রহ করা—এই ছিল সরকারের সংরক্ষণ নীতি। সৈন্যদের খাদ্য যোগানদার এজেন্ট ইস্পাহানী কোং হাজার হাজার মন চাউল সংগ্রহ করে কোলকাতা চালান দিত। চারিদিকে খাদ্যেব অভাব এই অবস্থায় জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব জেলা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে ছিল—জেলায় দারুণ খাদ্যাভাব চলছে এই জেলা থেকে ধানচাল যেন বাহিরে রপ্তানী বন্ধ করা হয়—সেজন্য জনসাধারণকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল। এই অঞ্চলের মানুষদিগকে অভুক্ত রেখে নির্বিচারে হাজার হাজাব মণ চাল রূপনারায়ণ নদীর দুপাশে সমস্ত রাইস্‌মিল থেকে এজেন্ট মারফৎ চালান যাচ্ছে। ঘটনার আগের দিন ৭ই সেপ্টেম্বর স্থানীয়ভাবে রাসবিহারী মিশ্র, গুরুচরণ অধিকারী, ধীরেন জানা, গোবিন্দ মাইতি, বেণু মহাপাত্র, অমূল্য বেরা ও ঈশ্বব মাইতি আমবা কয়েকজন দানপুর চালকলের মালিকদেব কাছে আবেদন

রাখি—মিলিটারী সরবরাহকারী এজেন্ট ইস্পাহানি কোং চাল না দিয়ে স্থানীয় মানুষদিগকে ন্যায্যমূল্যে চাল দিন। কিন্তু মালিকপক্ষ আমাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ্ না করে বেশী মুনাফার লোভে ইস্পাহানী কোং কে চাল সরবরাহ্ করবে এই সিদ্ধান্তে অটুট থাকলো। মালিকপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণসহ আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যেকোনভাবে এই অবস্থায় চাল চালান বন্ধ করতে হবে, সিদ্ধান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমূল্য বেবা সহ কয়েকজন যুবক নদীতে ঝাঁপ দিয়ে চলমান চালের নৌকাকে আটকায়। নৌকার মাঝি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নৌকা ঘাটে ফিরিয়ে নিযে আসে। বাধাপ্রাপ্ত চালের বোটগুলিকে সারারাত্রি ধরে আমরা পাহারা দিয়ে রাখি—যাতে রাতের অন্ধকারে চালান হয়ে না যায়। উৎশৃঙ্খল জনতাকে সাযেস্তা করার জন্য মালিকপক্ষ মহিষাদল থানায় খবর পাঠাবার পরদিন ৮ই সেপ্টেম্বর সকালে মহিষাদল থানার পুলিশ অফিসার সুধীর সরকার ছয়জন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে দনিপুর রাইস মিলে উপস্থিত হয়ে পুলিশ পাহারায় চালের বোটগুলিকে কলিকাতা পাঠাবার জন্য উদ্যোগ নেয়। পুলিশ পাহারায় চালের বোটগুলি পাঠাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে—তখন কয়েকজন মহিলা শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনতাকে আহ্বান করা হোল, নিমেষের মধ্যে প্রায় পাঁচ/ছয় হাজার বিক্ষুব্ধ জনতা দনিপুর হাটের কিছুটা দূরে জড় হয়ে দাবী উঠলো এখনই চালের নৌকা আটক করতে হবে। রাসবিহারী মিশ্র, গুরুচরণ অধিকারী, বেণু মহাপাত্র, ধীরেন জানার নেতৃত্বে সুশৃঙ্খল জনতা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে মিল গেটের দিকে চলছে। থানা অথবা মহকুমা কংগ্রেস কমিটির কোন নির্দেশিকা ছিল না। মনে হলো এক স্বত:স্ফূর্ত গণ অবস্থান। পুলিশ চালের বোটের মাঝিদিগকে নৌকা ছাড়ার নির্দেশ দিচ্ছে—সেই সময় মিছিল পুলিশ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলো। মিছিল থেকে জনতার বলিষ্ঠ আওয়াজ উঠলো আমাদিগকে অভুক্ত রেখে সৈন্যদের জন্য চাল পাঠানো বন্ধ করতে হবে। বাধাপ্রাপ্ত নৌকার মাঝিরা কোন ঝুঁকি না নিয়ে চাল বোঝাই বোটগুলি ঘাটে নোঙ্গর করলো। জনতা তাদের দাবীতে অনড় কিন্তু কোন সতর্কবার্তা না দিয়ে অহিংস জনতার উপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালো। গুলিতে তিনজন যুবক মৃত্যুর কোলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। সুরেন্দ্রনাথ কর, শশীভূষণ মান্না ও ধীরেন্দ্রনাথ দীগার শহীদ হলো। রাস্তার উপর তিনটি মৃতদেহ পড়ে থাকে, ছত্রভঙ্গ মিছিল বেশ কিছুটা দূরে অপেক্ষা করছে। এই ঘটনার পর মহিষাদল কংগ্রেস অফিসে সংবাদ যাওয়ামাত্র প্রায় চল্লিশজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত হয। ইতিমধ্যে তমলুকের তৃতীয় অফিসার অপূর্ব ঘোষ প্রায় চল্লিশজন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তিনটি মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। পুনরায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সহ জনতা পুলিশ অফিসারের কাছে দাবী রাখে চাল রপ্তানী বন্ধ করতে হবে এবং মৃতদেহগুলি আমাদের হাতে দিতে হবে। তীব্র বাদানুবাদের পর স্থির হয় মৃতদেহগুলি ময়না তদন্তের পর মৃতের আত্মীয়দের হাতে দেওয়া হবে, কিন্তু পুলিশ সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। ময়না তদন্তের পর পুলিশ রাতের অন্ধকারে নদীতে ফেলে দেয়। সারা এলাকা থমথমে অবস্থা, ঐ রাত্রে জেলাশাসক এম. এন. খাঁন সাতশত গাড়োয়াল সৈন্য নিয়ে দনিপুর হাটে উপস্থিত হয়ে ছয়টি গ্রাম ঘেরাও করার পরিকল্পনা করছে। সৈন্যদের উপস্থিতি সংবাদ বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে গেল সর্বত্র। এই অবস্থায় নেতৃত্বের মধ্যে অনেকেই এইভাবে ধরা না দিয়ে গ্রাম

ছেড়ে পালালো।

রাত্রে সৈন্যরা মার্চ কবে দনিপুর হাটের সংলগ্ন ছয়টি গ্রাম ঘেরাও করলো, সকালে ঘেরাও করা গ্রামগুলির বাড়ী তল্লাসী কবে পুরুষদিগকে মাবতে মাবতে ধরে নিযে যাচ্ছে, প্রায় চারশত মানুষকে সৈন্যরা ধরে নিয়ে গিয়ে ভাদ্রমাসের প্রখর বৌদ্রে রাইসমিলের মাঠে বসিযে বাখে। সাবাদিন একবিন্দু পানীয় জল এবং এককণা খাদ্যও দেয় নাই। আটকানো গ্রামের লোকদেব কাছে কোন কথাব উত্তর না পাওয়ায় সৈন্যরা মাবধর শুরু করে। সৈন্যদের অত্যাচারে মানুষদের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয নাই। এদেব মধ্যে অমূল্য বেরা, রসিকলাল, হরিপদ ভৌমিক ও নন্দ মাইতি সহ তেরজনকে তমলুক কোর্টে চালান দেয়। বিচারে ঐ তেরজনের দুই বৎসর করে সাজা হয়।

এই অঞ্চলেব মানুষদেব উৎসাহ, উদ্দিপনা ও সাহস বৃদ্ধি পায়। মেদিনীপুর জেলায আগষ্ট বিপ্লবের প্রথম রক্তস্নান এই দনিপুরে। শান্তিকামী মানুষের উপর পুলিশের নির্বিচাবে গুলি চালনার নির্লজ্জ আক্রমণ সেদিন মেদিনীপুব জেলাবাসীদের মনে তিন শহীদের রক্তে প্রতিশোধের আগুন সারা জেলাকে পথ দেখানো — তার পরিণতি "তাম্রলিপ্ত জাতীয সরকাব"।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সুতাহাটা : মুখের কথায়

শ্রী ভবতোষ পাত্র

স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ করে '৪২-এর আন্দোলনে থানা সুতাহাটার ভূমিকা সম্পর্কে এযাবৎ প্রকাশিত পুস্তক পুস্তিকা গুলিতে অতিস্বল্প তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। সংগ্রামী বঙ্কিম ব্রহ্মচারীর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে সুতাহাটা' ও বিপ্লবী গোপীনন্দন গোস্বামীর 'বাংলার হলদিঘাট তমলুক' এবং আন্দোলন চলাকালে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তার মুখ পত্র 'বিপ্লবী'-তে সুতাহাটা থানা জাতীয় সরকারের এবং সুতাহাটাবাসীব সংগ্রামী কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য রয়েছে। ঐসব তথ্যসূত্রে সুতাহাটা থানাবাসীর বিপ্লবী কর্মতৎপরতার পুরো ছবিটি ফুটে উঠেনি। সে কারণে সেদিনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা জীবিত সংগ্রামী শ্রী সুধীর চন্দ্র পট্টনায়ক এবং সেবানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আলোচনা করে এবং সে দিনের সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেনি অথচ সংগ্রামকালীন ঘটনাবলীর পুরো ছবিটি যাদের স্মৃতিপটে আজও অমলিন রয়েছে এমন সব মানুষ জনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান নিবন্ধটি রচিত হয়েছে।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার ছ'টি থানার মধ্যে সুতাহাটা হল একেবারে এক সীমান্ত থানা। রূপনারায়ণ, হুগলী ও হলদি এই তিনটি নদী তার তিন দিক ঘিরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্য ইংরেজ আমলে সুতাহাটা বিশেষ কোন দিক থেকে প্রাগ্রসর হয়ে উঠতে পারেনি। সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণ, মধ্যযুগীয় ধর্ম-ধারণা ও ধর্মাচার, সাবেকী ধরণের চাষবাস ও নদী-নালায় মাছ ধরা এবং মাঝি-মাল্লার বৃত্তি প্রধানত এই নিয়েই গড়ে উঠেছিল সুতাহাটা বাসীর জীবন চর্যা।

চিরস্থায়ী ভূমিবন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে সুতাহাটাবাসী কখনও কখনও জমিদারী জুলুমের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তবে তাদের ঐ প্রতিবাদ ইতিহাসের বিষয় হয়ে উঠেনি। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পরবর্তী দুই দশকে সুতাহাটাবাসীর জাতীয় চেতনা জাগরণের বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণ নেই। তবে স্বদেশী আন্দোলনের পর্বে সুতাহাটায় স্বদেশ চেতনা ও স্বাদেশিকতার প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিপ্লবী কুমার চন্দ্র জানা স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসাবে সুতাহাটাব গ্রামগঞ্জে পরাধীন জাতিব মর্মবেদনা ও তার অসহায়তা এবং স্বদেশ প্রেম ও স্বাদেশিকতার পক্ষে প্রচার চালান। এই সূত্রে স্বল্পকালের জন্য হলেও সুতাহাটাবাসীর দেশপ্রেমের মরাগাঙ্গে আন্দোলনের বান আসে।

অবশ্য অল্পকালের মধ্যে ঐ প্লাবনের বেগ স্তিমিত হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সার্বিক সংকট পর্বে সুতাহাটাসহ তমলুকের অন্যান্য অঞ্চলে মুক্তি আন্দোলনের তেমন কোন প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন ও আইন-অমান্য আন্দোলন পর্বে সুতাহাটাবাসী তাদের স্থানীয় নেতৃবর্গের প্রেরণায় দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। ক্ষেতখামারে কাজ করার সময় ও মানুষজন বলাবলি শুরু করে-গান্ধী মহারাজের নেতৃত্বে নতুন কিছু হতে চলেছে। এই নতুন কিছু হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে সুতাহাটাবাসী লবণ আইন অমান্য আন্দোলন ও চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তুমুল উদ্দীপনাসহকারে সাড়া দেয়। আর আইন অমান্য করতে গিয়ে তারা দলে দলে হাজতবাস করে ও কারাদন্ড ভোগ করে। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সংগ্রামী শ্রী সুধীর চন্দ্র পট্টনায়কের কথায় দেশকে ভালবাসার জন্য পুলিশের পিটুনি, হাজতবাস ও কারাদণ্ড এ সবই গৌরবের। স্থানীয় নেতৃবর্গ যেমন কুমার চন্দ্র জানা, ডঃ জনার্দন হাজরা, কানাইলাল জানা ও শ্রী সুধীর চন্দ্র পট্টনায়ক প্রমুখ সংগ্রামীরা আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বে সুতাহাটার নিম্নবর্গীয় মানুষজনের মনে দেশপ্রেমের চেতনা গেঁথে দেন। আর ঐ প্রতিষ্ঠিত চেতনা তাদিগকে পরবর্তী সংগ্রামের জন্য একান্ত অঙ্গীকারসারে প্রস্তুত করে দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র ভারতে এক গম্ভীর রাজনৈতিক সংকট তৈরী করে। যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে পূর্ব এশীয় রণাঙ্গনে জাপানের আক্রমণে মিত্র বাহিনীর ক্রমাগত পরাজয় ঘটতে থাকে। খাস কলকাতাতেও বোমা পড়ে। রাতে Black out জারী হয়ে যায়। চরম খাদ্য সংকট, কেরোসিনের আকাল, রেশন ব্যবস্থা ও দ্রব্য মূল্যের চরম বৃদ্ধি মানুষজনকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন করে তোলে। এই অনিশ্চয়তা ও সার্বিক সংকটের সময় সরকারী নির্দেশে নদ নদী সংলগ্ন অঞ্চলগুলির সমস্ত জলযান ডুবিয়ে দেওয়া হয়। জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় সরকার পোড়া মাটির নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে নদী-উপকূল অঞ্চলগুলি থেকে খাদ্য সামগ্রী বিশেষ করে ধান ও চাল সরিয়ে নিতে থাকে। সেকারণে এক কৃত্রিম খাদ্য সংকটের সৃষ্টি হয়। একদিকে খাদ্য সংকট অন্যদিকে কেরোসিনের সংকট গ্রাম বাংলাকে এক অসহায় অবস্থায় ফেলে।

যুদ্ধ পরিস্থিতির অবনতির কারণে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক সংকট ঘণীভূত হয়ে উঠে। সেহেতু জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে শেষ চরম সংগ্রামের ডাক দেয়। এই ডাক হল 'ভারত ছাড়ো'-র ডাক, এই ডাক হল 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'-র ডাক। সেই সূত্রে এই ডাক হল 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারই লাগি কাড়া কাড়ি'র ডাক।

১৯৪২ এর ৮ই অগষ্ট রাতে জাতীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সমিতি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ঘোষণা করে। কাল বিলম্ব না করে সরকার জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। আর পরদিন ৯ই অগষ্ট থেকে সমগ্র দেশ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠে। ভারতের প্রতিটি প্রদেশ প্রতিটি জেলা এমনকি প্রতিটি জেলার এক একটি মহকুমা ও তার থানা অঞ্চলগুলি "ভারত ছাড়ো" শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠে, এবং আন্দোলন জোরদার করার জন্য বিবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই সূত্রে তমলুক মহকুমা এক বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা

গ্রহণ করে। সতীশ চন্দ্র সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, বরদা কুইতি, সতীশ চন্দ্র শাহু ও সুশীল ধাড়া প্রমুখ প্রথম সারির নেতৃবর্গ আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রতিটি থানায় স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গড়ে তোলেন। এসব বাহিনীর কাজ হল যুদ্ধ সম্পর্কে মানুষজন কে ভীত মুক্ত করা এবং যাতে সরকার এক একটি অঞ্চলের খাদ্য অনাত্র সরিয়ে নিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা, তাছাড়া গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে গণসংযোগ রক্ষা করা। উল্লেখ্য, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগুলির প্রধানদের নিয়ে 'বিদ্যুৎবাহিনী' গড়ে উঠে এবং স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীগুলির প্রধানদের নিয়ে 'ভগিনী সেনাবাহিনী' গড়ে তোলা হয়। উল্লেখ করা যায় এই দুই বাহিনীর সদস্য-সদস্যারা পোষাক-পরিচ্ছদ হিসেবে খদ্দরের সাদা হাফ প্যান্ট, হাফ সার্ট ও গেরুয়া গান্ধী টুপি পরতেন। সার্ট এর দুই পকেটের একটিতে জাতীয় পতাকার ব্যাজ এবং অন্যটিতে 'করব না হয় মরব' এই মহাবাণীটি উৎকীর্ণ করা থাকত। এছাড়া বৃহত্তর আন্দোলনের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে মহকুমার বিভিন্ন থানায় প্রস্তুতি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং ঐসব সভায় আন্দোলনের আঞ্চলিক কর্মসূচী গহীত হয়।

বর্তমান নিবন্ধে '৪২ এর আন্দোলনে থানা সুতাহাটার বিপ্লবী ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য- '৪২-এর অগস্টেই থানা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী দুটির সদস্য-সদস্যারা যে কোন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার বিষয়ে, এমনকি আত্মত্যাগের বিষয়ে প্রতিশ্রুত হয়। এছাড়া দুই বাহিনীর মধ্য থেকে ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা নিয়ে একটি 'সুসাইড স্কোয়াড' গঠিত হয়। 'সুসাইড স্কোয়াড' এর সদস্যদের মধ্যে কুমুদিনী ডাকুয়া, বাসন্তী কর, প্রভাবতীদেবী ও রেণুকা পাত্র বিশেষ বিশিষ্ট ছিলেন। পুরুষদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন সুকদেব দাস, নারায়ণ জানা, নিরঞ্জন মাইতি, নকুল প্রামানিক ও যদুপতি জানা।

বিদ্যুৎবাহিনী ও ভগিনী সেনা বাহিনীর সদস্য ও সদস্যাদের নিয়মিত প্যারেডে যোগদিতে হত। বিপ্লবী সুশীল ধাড়া-র নেতৃত্বে তারা গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল শিখতেন এবং স্থানীয় ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে তারা আহত লোকদের ও রোগগ্রস্তদের সেবা শুশ্রূষার প্রাথমিক ব্যবস্থা শিখে নিতেন। উল্লেখ্য, ভগিনী সেনা বাহিনীর সদস্যাদের হাতে ১০০০ ছোরা তুলে দেওয়া হয়েছিল-১৯৪৩এর মার্চ মাসে 'বিপ্লবী' বুলেটিনে এরূপ উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে-ভগিনী সেনার সদস্যারা আক্রমণের জন্য ছোরা ব্যবহার না করলেও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এমনকি আত্মত্যাগের প্রয়োজনে ছোরার ব্যবহার শিখতেন।

১৯৪২এর ২৪শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস এক গোপন কর্মী সম্মেলনে থানা আক্রমণের কর্মসূচী গ্রহণ করে। ২৭শে সেপ্টেম্বর মহকুমা নেতৃবৃন্দ সুতাহাটার থানা আক্রমণের বিষয়ে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য সুশীল ধাড়াকে প্রেরণ করে। এ সময় ধাড়া 'সুসাইড স্কোয়াড'কে স্মরণ করিয়ে দেন থানা আক্রমণ কালে বন্দুকের গুলির সামনে তাদের বুক পেতে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ২৮শে সেপ্টেম্বর রাতের মধ্যেই থানা আক্রমণের পরিকল্পনার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় --- রাস্তাঘাট কেটে, কালভার্ট ভেঙ্গে ও রাস্তার উপরে গাছ ফেলে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়া থানা কর্মী সম্মেলনে থানার ১১টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটি হতে বাছাই করা নেতৃস্থানীয় মানুষজন

নিয়ে থানা কমিটি গঠিত হবে। উল্লেখ্য, সেই অনুসারে অতি তৎপরতার সঙ্গে থানা কমিটি গঠিত হয়েছিল।

থানা কমিটি থানা আক্রমণের দিন হিসেবে ২৯শে সেপ্টেম্বরকে ধার্য করে। ধার্য দিনে 'সুসাইড স্কোযাড' এব নেতৃত্বে থানা অভিযান শুরু হয়। শাবল, গাঁইতি, কুড়ুল, বল্লম, হাতুড়ি, বাল্লি, কাঁচ-ভাঙা এইসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংগ্রামীরা থানা আক্রমণ করে। ৩০-৪০ হাজাবের মতো সংগ্রামীদেব আক্রমণে থানার ভিত টলে উঠে। থানা অফিসার বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করে। এই সময়ে সংগ্রামী জনতাব একাংশ শাবল ও গাঁইতি চালিয়ে থানা ও তৎসংলগ্ন ঘব বাড়ি ভেঙে দেয়।

সুতাহাটা থানা আক্রমণ ও ধ্বংসের বিষয়টি রেডিও গ্রাম মারফৎ ডালিম্বচকে অবস্থানকারী মিলিটারীবা ফোর্ট উইলিয়ম সেনানিবাসে পাঠিয়ে দেয়। এহেতু অল্প সময়ের মধ্যে দুটি উড়োজাহাজ সুতাহাটার উপর এসে চক্কব দিতে শুরু করে এবং দুটি বোমা ফেলে। এতৎসত্ত্বেও সংগ্রামী জনতা ছত্রভঙ্গ হযে যায়নি। থানা দখলের পর তারা অসীম উদ্দীপনা ও উৎসাহ নিয়ে একে একে সুতাহাটার সমূহ সবকারী অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস এবং পোষ্ট অফিস ধ্বংস করে। এবপব তারা কুকডাহাটীতে উপস্থিত হয়ে বেজিস্ট্রি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়।

সুতাহাটা থানা দখলেব অল্পকাল পরে সংগ্রামী জনতার কাছে খবব আসে ইতিমধ্যে মহিষাদল থানা দখলের ক্ষেত্রে সংগ্রামীরা ব্যর্থ হযেছেন এবং বাজপরিবারের জনৈক দেহরক্ষী জি. সাহেবের গুলিতে বহু সংখ্যক সংগ্রামী প্রাণ হারিয়েছেন। এই সংবাদে সুতাহাটার সংগ্রামী জনতা একান্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সংগ্রামীরা দেউলপোতা, বসানচক্ প্রভৃতি স্থানে গিয়ে মহিষাদল বাজাব কাছারি বাড়ি ধ্বংস করে দেয়।

থানা দখলের কয়েকদিন পবে ইংরেজ টমি সৈনিকরা বাহালুড়ি খাল পাড়ে এসে হাজির হলে সুতাহাটার সংগ্রামী জনতা তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। ঐসব সৈনিকদেব গুলিতে এসময় এক ১৭ বৎসরের তরুণ ব্রজগোপাল দাস নিহত হন এবং কয়েকজন আহত হন।

অক্টোববের শুরু থেকে ইংবেজ সৈন্যরা গ্রামে গ্রামে ঢুকে গৃহদাহ লুন্ঠন নারী ধর্ষন ও ব্যাপক ধড পাকড এবং মারধর চালাতে থাকে। ইংরেজ সেনা ও স্থানীয় পুলিশ বাহিনী এবং পঞ্চম বাহিনীব অত্যাচারের কাবণে সুতাহাটার সংগ্রামী আন্দোলন কিছুটা মন্দীভূত হয়। তবে ১৯৪২ এব ১৭ই ডিসেম্বর সর্বাধিনায়ক শ্রী সতীশ চন্দ্র সামন্ত-ব নেতৃত্বে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকাবের প্রতিষ্ঠা হলে সংগ্রামী আন্দোলনে নতুন করে উত্তেজনা আসে। ১৯৪৩-এর ২৬শে জানুয়ারী তাম্রলিপ্ত জাতীয় সবকারের নির্দেশে থানা জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। সুতাহাটা থানা সবকাবেব প্রথম অধিনায়ক ডঃ জনার্দন হাজরার নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকারের কাজকর্ম চলতে থাকে। থানা সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বিভাগ, বিচার বিভাগ, যুদ্ধ বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ ও জননিরাপত্তা বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, প্রচার বিভাগ এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের কাজকর্ম সুষ্ঠভাবে পরিচালনাব দায়িত্ব বিশিষ্ট সংগ্রামীদের উপর ন্যস্ত হয়। সুতাহাটা থানা জাতীয় সরকার বিবাদ বিসম্বাদ নিরসনের মাধ্যমে গ্রামের মানুষজনের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হয় এবং পঞ্চম বাহিনীর লোকজনের শাস্তিদানের জন্য তৎপর হয়। উল্লেখ্য, থানা

জাতীয় সরকারের উদ্যোগক্রমে সুতাহাটায় চুরি ডাকাতি এ সময় বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৪ এর ৯ই অগষ্ট তমলুক মহকুমা সংগ্রামী নেতৃত্ব গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় সরকারের অবসান ঘোষণা করেন, এবং বিপ্লবীরা একে একে তমলুক কোর্টে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অবসান সমগ্র মহকুমাকে অবসাদে আচ্ছন্ন করে ফেলে। '৪২ এর আন্দোলনে সুতাহাটার একান্ত অংশ গ্রহণের বিষয়টি কয়েকটি পরিসংখ্যান সূত্রে স্পষ্ট হয়। আন্দোলন কালে সুতাহাটা থানার বাসুদেবপুরের ব্রজগোপাল দাস এবং দ্বারিবেড়্যার অন্নদা সামন্ত শহীদ হন। ৩২৫ জন সংগ্রামী হাজত বাসের দন্ড ও কারাদন্ডে দন্ডিত হন। ৭৫টি বাসগৃহ আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ছ'জন মহিলা ইংরেজ সৈন্য ও পুলিশের দ্বারা ধর্ষিত হন। তাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এ ধরণের দৃষ্টান্ত বিরল।

আন্দোলনকালীন সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ ও নারীর সতীত্ব লুন্ঠন এবং ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ শুধুমাত্র পরিসংখ্যানের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে না। কেননা, ৫০ বৎসরের অধিককাল আগে সংঘটিত সংগ্রামী আন্দোলনের প্রকৃত ও পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে জীবিত সংগ্রামী শ্রী সুধীর চন্দ্র পট্টনায়ক ও সেবানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কথা বলে এবং সুতাহাটার সেদিনের সংগ্রামের কাহিনী সম্পর্কে স্থানীয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার (যেমন শ্রী শ্যামপদ পাত্র, শ্রী সুধীর চন্দ্র দাস অধিকারী, শ্রী লক্ষ্মী পদ পাত্র ও মাধবী দাস) কাছ থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে সংগ্রামের স্বকীয়তা বিশেষ করে তার আন্তর তেজের স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়।

তমলুক মহকুমা নেতৃত্বের নির্দেশের অধীন হয়ে থাকলেও সুতাহাটার সংগ্রাম একান্তই সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত হয়েছিল। বিদ্যুৎবাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুশীল ধাড়া-র নেতৃত্বের অধীন হওয়া সত্ত্বেও মহিষাদলের থানা দখল ব্যর্থ হয়। পাঁশকুড়া ময়না এবং তমলুকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যর্থতা এসেছিল। কিন্তু সুতাহাটার থানা দখল প্রথম প্রচেষ্টাতেই সফল হয়েছিল। এই বিষয়টি থানা বিপ্লবী নেতৃত্বের নিখুঁত পরিকল্পনা, সক্রিয়তা এবং বিপ্লবী থানাবাসীর অসীম সাহসিকতার পরিচয় তুলে ধরে। বস্তুত: জীবন ও মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে সেদিনের সুতাহাটার তরুণ ও তরুণীরা যে 'সুসাইড স্কোয়াড' গঠন করেছিলেন তা আজকের শ্রীলঙ্কার L.T.T.E-র 'সুসাইড স্কোয়াড' এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীতে তরুণীদের অর্ন্তভুক্তির বিষয়টি সেদিনের বাংলায় এক বিস্ময়ের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবী সুতাহাটা থানা দখলের জন্য সমবেত হওয়া জনতাকে ভীতসন্ত্রস্ত করে ছত্রভঙ্গ করার জন্য এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলার ঘটনাটি থেকেও স্পষ্ট হয়—বাংলার ব্রিটিশরাজ সুতাহাটাবাসীর সংগ্রামী চরিত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল।

'৪২-এর আন্দোলনে সুতাহাটাবাসীর অংশ গ্রহণের বিষয়টিও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

থানার বিপ্লবী নেতৃত্ব 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কে মানুষ জনের মনে এক অভাবনীয় উদ্দীপনা সঞ্চার করে ছিলেন। এই সুবাদে স্কুলের ছাত্ররা অধিক সংখ্যায় আন্দোলনের শরিক হয়ে উঠেছিল। ভাবনাহীন শঙ্কাহীন চিত্তে তারা থানা দখলের কাজে এগিয়ে গিয়েছিল। আরো

উল্লেখ্য, থানা দখলের পরেও পুলিশের মারধরকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে তারা সরকার বিরোধী পিকেটিং চালিয়ে ছিল।

সেদিনের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী তরুণ শ্রী সুধীর চন্দ্র পট্টনায়কের কথায় সেদিন শুধু সুতাহাটা ও তমলুক নয় বাংলার সর্বত্র উদ্দীপনার বারুদ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছিল। বিশেষ করে সেদিনের সুতাহাটার সবাই যেন বারুদ হযে উঠেছিল। বিপ্লবী তরুণের কাছে বাপ--মা বারুদ। তাঁর পড়শিও বারুদ। শুধু তাই নয়, বারুদ কে যে হয়ে উঠেনি সেটাই তরুণ সংগ্রামী শ্রী সুধীর চন্দ্র পট্টনায়ক (আজকের বৃদ্ধ)-এর প্রশ্ন ছিল এবং এ কাবণে ঐ তরুণ সংগ্রামীব আকুতি "ও অজয় (মুখোপাধ্যায়) তোর পাযে পডি আগুন ঠুকে দে।"

ক্ষেত খামারের কৃষকেরা ইতিপূর্বে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন থেকে বিপ্লবী চেতনার অংশভাক হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধকালীন সার্বিক সংকট তাগিদকে মনে প্রাণে বিপ্লবী করে তোলে। এরা প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ না কলেও এদেব অনেকেই সংগ্রামী। প্রকৃত অর্থে এবা বিপ্লবী। এরা নিজ নিজ গৃহে বিস্তব ঝুঁকি নিযেও বিপ্লবীদেব এবং সংগ্রামীদেব আত্মগোপন করে থাকতে সহাযতা কবেছেন। সাথে সাথে অন্ন বস্ত্র ও যুগিয়েছেন। শুধু পুরুষেরা নয়, সুতাহাটার নাবীরাও বিপ্লবী চেতনায় বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। পুলিশি তান্ডব ও টমি সোলজারদের অত্যাচাবের কথা জেনেও আন্দোলন থেকে তাদেব অনেকেই সরে দাঁড়াননি। এক্ষেত্রে বিপ্লবী চারুশীলা জানা-র কথা স্মবণ কবা যেতে পাবে। '৪২-ব আন্দোলনে যোগ দিযে তাকে কারাদন্ড ভোগ কবতে হয। পুলিশেব শত প্রলোভন ও নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি আন্দোলন হতে সরে দাঁড়াননি। তিনি নিজ সন্তান সন্ততিব ভবিষ্যতেব কথা ভাবেননি। তিনি সাহসভবে বলেছিলেন ইংরেজদেব পা চেটে পরিবাব পরিজন পালন করার শিক্ষা [illegible] শেখা যদি ভুলে যায় তাহলে দেশেব ভাল হবে। সুবোধ বালা কুইতি আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে হাজত খেটেছেন, কাবাগাবে থেকেছেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি বিপ্লবী থানা নেতৃত্বেব গোপন সংগঠনেব কথা পুলিশকে বলেননি। এই প্রসঙ্গে সংগ্রামী সেনা[illegible] ব্রজকান্তীর কথা স্মরণ কবা যেতে পারে। আন্দোলনে অংশগ্রহণেব কাবণে পুলিশের অত্যাচার ও নির্যাতন সত্ত্বেও আন্দোলন হতে সবে দাঁড়ানোব কথা ভাবেননি।

'৪২-এব আন্দোলন পর্বে সুতাহাটা থানাব কোন কোন জমিদার বিশেষ করে- শ্যামাচরণ ত্রিপাঠী বিপ্লবীদেব গোপনে সহায়তা কবেছিলেন, এমনকি অর্থ সাহায্য ও দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, কুকডাহাটীব মাঝি মাল্লাবা ইংবেজ সৈন্য পাবাপার করতে হবে বলে তাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন নিজ নিজ খেয়া- নৌকাগুলি জলে ডুবিয়ে বেখেছিল।

আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা ঃ

থানা সুতাহাটার লোকসংখ্যার প্রায ৩৫% মুসলমান। এদেব মধ্যে বেশিবভাগই নিম্নবর্গীয় জোলা তাঁতি ও মাঝিমাল্লা এবং জন মজুরেব কাজ নিয়েই তারা জীবিকা নির্বাহ করত। জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে তাদের বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। ঐ সব মুসলমান প্রধানত মসজিদ-মাদ্রাসাব মুন্সী ও মৌলানাদের পবামর্শে চালিত হত।

মুসলিম লীগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনকে সমর্থন করে। সে কারণে ভারতেব মুসলমানবা

ব্রিটিশ বিরোধী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সমর্থন করেনি। অবশ্য জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা ব্যতিক্রম ছিলেন। তবে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকালে সুতাহাটাব মুসলমানদের বিষেশ এক অংশ থানা আক্রমণে সামিল হয়। কেননা, ঐসব মুসলমান কলকাতায় রাজমিস্ত্রির কাজ করত। আবার ওদের কিছু সংখ্যক কলকাতায় গার্ডেনরীচ ও মেটিয়া বুরুজে কুলি-কামিন ও বন্দর শ্রমিকের কাজ করত। কলকাতায় বোমা পড়ায় তারা কাজকর্ম খুইয়ে সুতাহাটায় ফিরে আসে। অথচ ঐ সময় সুতাহাটায় খাদ্য সংকট এবং দিন মজুরের কাজকর্মের অভাব ছিল। কেননা, ঐ সময় চাষবাসের কাজ ছিল না। এহেতু ঐসব অভাবী মুসলমান মুসলিম লীগের ফতোয়া এবং মুন্সী মৌলানার নির্দেশ অমান্য করে জাতীয় আন্দোলনে সামিল হয়। তবে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন চিন্তা ছিল না।

পরিশেষে বলা যায় '৪২-এর আন্দোলনে থানা সুতাহাটার অংশগ্রহণ এক অনন্য ইতিহাস। এই আন্দোলন খঞ্জনচকের গান্ধী আশ্রম থেকে শুরু হলেও আন্দোলন গান্ধী পন্থাকে আঁকড়ে থাকেনি। ক্ষেত্র বিশেষে আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠে ছিল। আবার বিপ্লবী মহানায়ক গান্ধীর নির্দেশে খাপ থেকে বেরিয়ে আসা তলোয়ার খাপে আশ্রয় নিলেও সুতাহাটাব সংগ্রামী মানুষ আন্দোলনেব মূল লক্ষ্য থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ভাবতে পারেনি। লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার এবং বোম্বাই দরিয়ায বিদ্রোহের সংবাদ সুতাহাটাবাসীকে আবার বিপ্লবী আবেগ ও উন্মাদনায় চঞ্চল কবে তোলে। আব পরাধীনতাব কালবাত্রিব শেষে নতুন ঊষার স্বর্ণদাব ভেঙে স্বাধীনতার সূর্য ফুটে বেরোলে সমগ্র ভারতবাসীর সঙ্গে সুতাহাটাবাসীও অসীম উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দে তাকে বরণ কবে নেয়।

সূত্র নির্দেশ

১। প্রাথমিক সূত্র

ক) জীবিত সংগ্রামীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য.

খ) আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে আলোচনা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

২। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকাবের প্রকাশিত বুলেটিন 'বিপ্লবী'তে মুদ্রিত সুতাহাটা সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য।

৩। আন্দোলন সংক্রান্ত প্রকাশিত গ্রন্থ

বঙ্কিম ব্রহ্মচাবী - 'স্বাধীনতা সংগ্রামে সুতাহাটা'

গোপীনন্দন গোস্বামী - 'বাংলাব হলদিঘাট তমলুক'

৪। একান্ত সাক্ষাতকার - শ্রী সুধীর চন্দ্র পট্টনায়ক (কিশমত শিববাম নগব) শ্রী শ্যামপদ পাত্র, শ্রী সুধীর চন্দ্র দাস অধিকাবী (কিশমত শিববাম নগর) সেবানন্দ ব্রহ্মচাবী (গোবিন্দপুব) মাধবী দাস (নন্দকুমাব)।

কন্টাই ষ্টেশন রোড (বেলদা) থেকে কাঁথি : একটি অসমাপ্ত রেলপথ প্রকল্প ১৯১৪-১৯৩৪

বিমল কুমার শীট

পবাধীন ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বেলপথ স্থাপিত হয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে""The construction of railways had a revolutionary impact on the life, culture, and economy of Indian people."[১] এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কন্টাই ষ্টেশন রোড থেকে কাঁথি মহকুমা শহর পর্যন্ত রেলপথ স্থাপনের প্রস্তাব কেন বাতিল হয়ে গেল সেটা বোঝা শক্ত।

মেদিনীপুর শহর থেকে কাঁথির দূরত্ব ৫৮ মাইল। কাঁথি শহব থেকে মেদিনীপুর শহরে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা মেদিনীপুর কাঁথি ১৮৪৪ সালে ডাক বাস্তা হিসাবে তৈরী হয়।[২] ডাক সড়কটি জেলা বোর্ডের রাস্তা। মফঃস্বল পরিদর্শনের জন্য জেলার সিভিল বিভাগের কি রাজস্ব বিভাগের উচ্চ রাজপুরুষগণকে বৎসরে একাধিকবার এ পথেই যাতায়াত করতে হত। এই ডাক সড়কে এত বেশী সংখ্যক লোকের যাতায়াত করার পক্ষে স্থানীয় অসংখ্য গরুরগাড়ী যথেষ্ট নয়। দু-তিনটি যাত্রী ও মালবাহক কোম্পানী কখন উটের গাড়ী, কখন বৃহৎ বয়াল গাড়ী সারা বৎসর এই পথে চালিযে থাকেন। বর্ষাকালে উটের গাড়ী চলাচল একেবারে অসম্ভব এবং ঐ সময় একটি মাত্র কোম্পানী রয়াল গাড়ী চালাত। এব ফলে বর্ষাকালে গাড়ীব ভাড়ার হারও অত্যন্ত বেড়ে যায়। এজন্য অল্প বিত্ত ব্যক্তিদের পাযে হেঁটে এই ১৭/১৮ ক্রোশ ব্যাপী পথে যাতায়াত করতে হয়।[৩] এই অঞ্চলেব মানুষের তাই কষ্ট লাঘবের জন্য, আর্থিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য রেলপথ স্থাপনের দাবি ছিল যথার্থ। তাই গভর্ণব কারমাইকেল কাঁথি আগমন কবলে তাব কাছে বেলপথ স্থাপনেব দাবি করা হয।

লর্ড কারমাইকেল ১৯১১ খ্রী: মাদ্রাজের গভর্ণর হয়ে ভারতে আসেন। বাংলা স্বতন্ত্র প্রদেশে পবিণত হলে তিনি উ: প্রদেশের প্রথম শাসন কর্তা নিযুক্ত হন (১৯১২ খ্রী:)। নতুন গভর্ণব কারমাইকেল তাঁর পূর্বসূবীদের মত ছিলেন না। জাতীয়তাবাদীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। তিনি জনসাধারণেব ক্ষোভ বা তাদের মতামত জানবার চেষ্টা কবতেন।[৪] কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রথম চেষ্টা করেন যাতে লাট সাহেব একবার কাঁথি এসে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যান। তাঁর চেষ্টার ফলে গভর্ণর কাঁথি পরিদর্শনে এসেছিলেন ৯ই নভেম্বর ১৯১৪[৫]। এ সম্পর্কে স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকাতে লেখা হয়েছিল, -"৯ই নভেম্বব শাসনকর্তা লর্ড কারমাইকেল কাঁথি শুভাগমন করিয়াছেন। বঙ্গেব শাসনকর্তা ইতি-পূর্বে কাঁথি আগমন করেন নাই; কারমাইকেলের শুভাগমন বড়ই গৌরবের।...আমাদের স্বদেশ হিতৈষী

ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সরকারী উকিল শ্রী উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, শ্রী বারাসী বন্দ্যোপাধ্যায প্রভৃতি সপরিষদ গভর্ণর মহোদয়ের পবিদর্শনের সময়ে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। মি: শাসমল, এবং বারাণসী বাবু প্রভৃতি কাঁথিব সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগকে বলিযা ছিলেন। গভর্ণব মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য একটি ডেপুটেশন গঠিত হয়। এই ডেপুটেশনে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, স্থানীয় জনহিতৈষী প্রসিদ্ধ উকিল বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায, মহন্ত রায়, রাধাশ্যাম দাস, অধিরাজ বাহাদুর প্রভৃতি গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করিয়া প্রজাদের দুববস্থা ও কাঁথিতে জেলা এবং বেল হওয়াব প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁহাকে বলেন।"[৬]

সম্ভবত: এই প্রথম রেলপথ হওয়ার জন্য প্রস্তাব করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন রেলপথ স্থাপনের প্রস্তাব বোধ হয সঠিক সময় ছিল না। বার বাব বেলপথ স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও তা শেষপর্যন্ত রূপাযিত হয়নি।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সভা বসেছিল। মেদিনীপুর লাইট রেলেব ব্যবস্থাই তার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। তাতে মেদিনীপুরের বেলদা হতে কাঁথি, চন্দ্রকোণা রোড স্টেশন হতে ঘাটাল এবং তমলুক হতে পাঁশকুডা পর্যন্ত এই তিনটি ব্রাঞ্চ লাইট বেল লাইন খুলবার জন্য মের্সাস মার্টিন কোম্পানীর সঙ্গে বাস্তা প্রস্তুতেব বন্দোবস্ত করা হয়। মেদিনীপুব জেলা বোর্ড এ জন্য মার্টিন কোম্পানীব কাছে মাইল প্রতি বার্ষিক অন্তত একশত টাকা করে চেযেছিলেন।[৭]

বেঙ্গল নাগপুর বেলওয়ে কোম্পানী বেলদা কাঁথি রাস্তা খোলাব জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে কোম্পানীর লোকজন কাঁথিতে পৌঁছে যায় এবং জরিপ কার্য্য আরম্ভ করবে বলে ঠিক করে।[৮] পত্রিকায় প্রকাশিত হয় "সম্প্রতি 'কলিকাতা গেজেটে' ঘোষণা কবা হযেছে যে, বাঙ্গালা গভর্ণমেন্ট কাঁথি রেলওয়ে স্টেশন হইতে কাঁথি শহর পর্যন্ত বেলওযে নির্মাণেব জন্য বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীকে জমি জরিপ করিবার অনুমতি ও ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর জনৈক ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়াব, একজন এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়াব এবং ওভারসিয়ার প্রভৃতি কর্মচারীগণ গত সপ্তাহ হইতে এখানে অবস্থান পূর্বক রেলরাস্তার লাইন নির্দ্ধারণ এবং জরীপাদি কার্য্য সমাধা করিতেছেন।"[৯] ঐ সময় ঠিক হয় যে বেলদা-কাঁথি রেল স্টেশন হতে কাঁথি বেলদা বাস্তার দক্ষিণ পাশ দিয়ে কাঁথি শহর পর্যন্ত রেলবাস্তা নির্মিত হবে এবং ঐ রাস্তায় প্রথমত প্রতি ৫ মাইল অন্তব এক একটি রেল স্টেশন নির্মাণ করা হবে।[১০] এই রেলরাস্তা প্রস্তুত করতে যত টাকা ব্যয় হবে তার একটা হিসাব কবে রাস্তার নক্সার সঙ্গে সরকারের কাছে প্রেরণ করা হবে। এই হিসাব মঞ্জুর এবং সরকারের কাছ থেকে রেলরাস্তার জমি গ্রহণ করা হলে, তবেই রেলরাস্তাব নির্মাণ কাজ আরম্ভ হবে বলে বলা হয়েছিল।[১১]

পত্রিকায় হতাশা প্রকাশ করা হয়,-"সুতরাং রেল চলিতে যে কতদিন লাগিবে তাহা স্থিব করিয়া বলা যায় না। তবে আমাদের বঙ্গীয় গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় গত নভেম্বর মাসে কাঁথি পরিদর্শনে আসিয়া কাঁথি বেলদা রাস্তার যথা সত্ত্বর রেল নির্মাণের আশা দিয়া গিয়াছেন, অন্যদিকে কাঁথি যেরূপ সমুদ্রোপকূলবতী এক কোণে অবস্থিত এবং সত্ত্বর যাতায়াতের

যেমন কোন সুবিধা নেই, তাহাতে মনে হয় ঐ কার্য্যে আর অধিককাল বিলম্ব ঘটিবে না।[১২] ঐ সময় কাঁথি বেলদা রাস্তা নির্মাণের সঙ্গে কাঁথি থেকে দীঘা পর্যন্ত একটি রেল লাইন তৈরীরও প্রস্তাব ছিল।[১৩] কাঁথি থেকে বেলদা বা কন্টাই স্টেশন রোড পর্যন্ত বর্তমান পথের দুরত্ব ৩৬ মাইল। কিন্তু রেল কোম্পানী ঐ বেলদা হতে এমন সোজাসুজিভাবে কাঁথি পর্যন্ত নতুন রেলরাস্তা নির্মাণ করবেন যে, সেই রাস্তার দূরত্ব কাঁথি হতে বেলদা পর্যন্ত মোট ২৪ মাইল হবে। শহরের পশ্চিম প্রান্তে ও বালিআড়ির উত্তরে দুনুকলার পুকুরের কাছে কাঁথি রেল স্টেশন নির্মাণ করা হবে বলে স্থির হয়েছিল। সরকার জমি ক্রয়ের ব্যবস্থা করে দিলে কাজ আরম্ভ হবে বলে বলা হয়। কিন্তু নভেম্বর মাসের পূর্বে যে কাজ আরম্ভ হবে না, কেননা মাঠ শুকনো না হলে কার্য্যারম্ভের কোন উপায় ছিল না।[১৪] সর্বসাধারণের অসুবিধায় বিচলিত হয়ে শ্রী উপেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার রেল সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

হোর মিলাব এণ্ড কোম্পানী এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়ে ছিল যে বি এন আর কোম্পানী কাঁথি বেলদা পথ জরিপ কাজ সমাধান করে রেলপথ নির্মানের ব্যয় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যদি এই জেলার জমিদাব ও প্রধান প্রধান ভদ্রলোকের এই নতুন কোম্পানীর যথোপযুক্ত অংশ ক্রয় করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে ১৯১৫ সালের মধ্যে কোম্পানী গঠিত হতে পারবে। এ জেলার অর্থশালী জমিদার, তালুকদার, ব্যবসায়ী, ব্যারিষ্টার, উকিল মোক্তরের অসদ্ভাব নেই যারা অর্থ ব্যয় করে অংশ ক্রয় কববেন ও লাভের টাকার অল্প পাবেন।[১৫] পত্রিকায় আশাপ্রকাশ করা হয-"এরূপ ঐহিক ও পারলৌকিক লাভজনক কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য আমরা এই জেলাবাসী প্রত্যেক অর্থশালী ব্যক্তিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশাকরি প্রত্যেক অংশের মূল্য কত হইবে, সে সম্বাদ আনাইয়া উপেনবাবু আমাদিগকে জ্ঞাত করাইবেন। যেন আমরা এখন হইতে তাহা পত্রস্থ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে ও তৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিব।[১৬] ইতিমধ্যে পূর্বের তুলনায় কাঁথির জন সংখ্যা অনেকগুণ বেড়েছিল। রাজস্ব বিষয় ও অন্যান্য অনেক বিষয় কার্যের জটিলতা ও পরিমাণ বেড়েছিল যাব ফলে সব সময় বেলদা কাঁথি ডাক সড়কের উপর চাপ পড়তে থাকে। এ অবস্থায় কাঁথি হতে বেলদা পর্যন্ত মোটর যান নিয়মিত ভাবে না চলায় কাঁথিবাসীকে অনেক বেশী অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে।[১৭]

নীহার পত্রিকা ধনী ও ভদ্রলোকদের কাছে অনুরোধ জানিয়ে ছিল অংশগ্রহণের দ্বারা সাহায্য করার জন্য এবং উপেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারকে অনুরোধ করেছিল প্রত্যেক অংশের মূল্য কত হবে তা জানানোর জন্য। উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার জানিয়েছিলেন যে, কোম্পানী সংগৃহীত অর্থের প্রত্যেক অংশের মূল্য একশত টাকা এবং তিনি নিজে কয়েকটি অংশ কিনবেন।[১৮]

বার বার প্রস্তাব সত্ত্বের রেলপথ হল না। রেল রাস্তা না হওয়ার পিছনে যথেষ্ট কারণ ছিল। যে সময় রেল রাস্তা স্থাপনেব কথা উঠেছিল তখন সময়টা উপযুক্ত ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধের আর্থিক প্রভাব ভারতের উপর পড়ছিল। এই যুদ্ধে দশ লক্ষের বেশী ভারতবাসীকে বিদেশে পাঠানো হয় এবং যুদ্ধের খরচ হয় ১২৭ মিলিয়ন পাউন্ড এর কাছে। ভারতের জাতীয় ঋণ শতকরা ত্রিশ ভাগ বেড়ে যায় যার চাপ পড়ছিল ভারতবাসীর উপর।[১৯] ম্যাকআলপিন বলেছেন ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত কৃষির পণ্য বিপণণের অবনতি

ঘটে। ধনিক ও বণিক শ্রেণী যুদ্ধের ফলে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২০] যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে দারিদ্রপীড়িত ভারতবর্ষকে প্রচুর পরিমাণে ধন ও সম্পদ যোগাতে হয়েছিল। তার ফলে অর্থনৈতিক বোঝা মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পণ্যমূল্য বৃদ্ধিও নির্দয় মুনাফা বৃদ্ধি দেশের জনসাধারণকে চূড়ান্ত দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।[২১] শেয়ার না কেনার কারণ ছিল বিশ্বযুদ্ধজনিত আর্থিক পরিস্থিতি। তাই ধনী ব্যক্তিরা শেয়ার কেনেননি। কিন্তু তবুও মানুষ আশা ছাড়েনি। ইংরাজ কমিশনার এর কাঁথি আগমনকালে উক্ত রেলপথ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে দরখাস্তও দেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন জেলা বোর্ডের অধিবেশনেও বেলদা থেকে কাঁথি রেলরাস্তার কথা পুনরায় উঠেছিল। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর এজেন্ট জানিয়েছিল যে জলেশ্বর রেলপথ থেকে শাখা রেলপথ খুললে সুবিধা হবে।[২২] কিন্তু তার অসুবিধা ছিল। সুবর্ণরেখা নদীল জল বর্ষাকালে প্রস্তাবিত স্থান পর্যন্ত এসে থাকে।[২৩] সেই সময় রেল সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় আলোচনার জন্য জেলা বোর্ড থেকে একটি কমিটি গড়া হয়েছিল। সেই কমিটিতে সাবডিবিজানাল অফিসার সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কমিটির বিবেচ্য বিষয় ছিল জেলার সর্বত্র যাতে মোটর সার্ভিস ও রেল চলতে পারে তার ব্যবস্থা করা।[২৪]

পত্রিকায় হতাশা প্রকাশ করা হয়, 'কাঁথি বেলদা রাস্তায় রেল চালাইবার উদ্যোগ আয়োজন কতকাল ধরিয়া চলিয়াছে, কিন্তু উহা যে কবে কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা অর্ন্তযামীই জানেন।''[২৫] বেলপথ না হওয়ার কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এবং দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে এবং নিজ দায়ীত্বে পরিচালিত আন্দোলনকে সরকাব ব্যর্থ করতে পারেনি। অধিকন্তু সরকার বাধ্য হয়ে সমগ্র জেলা থেকে ইউনিয়ন বোর্ড তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। সামরিক রাজনৈতিক গোলযোগ বেলপথ স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

১৯২৬ খ্রী: নাগাদ আবার রেলপথ স্থাপনের কথা শোনা যায়। কিন্তু তখন আর এক সমস্যার সৃষ্টি হয়। রেলপথের প্রাথমিক স্তম্ভ জরিপ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং স্থানে স্থানে পথ নির্দেশক ইটের স্তম্ভও তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৭ ও ১৯২৮ সাল নাগাদ তার আর কিছুই দেখা যায়নি। পুনরায় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী সত্বর রেলপথ নির্ম্মাণ কাজে অগ্রসর হবে বলে ঘোষণা করে ছিল। ফলে ঐ প্রস্তাবিত রেলপথের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিদের এক সমস্যায় পড়তে হয়েছে। যে সকল জমির ওপর ঐ রেল লাইনের স্তম্ভ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি এবং তার পার্শ্ববর্তী জমি সকল এখন লোকে আর কোনরূপ ক্রয় বা বিক্রয় করতে পারছে না। দেশে উপর্যুপরি কয়েক বৎসর শস্যহানি হওয়ায় লোকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছে। এ জন্য অনেক রেল লাইনস্থিত ও তার পার্শ্ববর্তী জমি কোন প্রকার দায় আবদ্ধ বা বিক্রি করতে চাইলেও তা কেউ নিতে চাচ্ছে না।[২৬] এই সময় আরো শোনা গিয়েছিল কলকাতা প্রবাসী সাহেবদের অল্প সময় ও কম খরচে কলকাতা হতে সরাসবি কাঁথি তমলুক পথ বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী জুনপুট পর্যন্ত রেলপথের ব্যবস্থা হবে।[২৭] ১৯২৭ সালে বি. এন. আর কোম্পানীর সাহেবরা এসে জুনপুট পর্যন্ত রাস্তা দেখে বিবেচনা করেছেন যে পাঁশকুড়া রেল

স্টেশন হতে কাঁথি পর্যন্ত বেলপথ স্থাপন কবা সুবিধা জনক। এতে কাঁথি বেলদা রেল রাস্তা অপেক্ষা বাব মাইল বাস্তা কম হবে।

দোসবা মার্চ ১৯২৮ এ বেঙ্গল নাগপুব বেলওয়ের কলিকাতা পরামর্শ সমিতির চতুর্দ্দশ অধিবেশনে সভাপতি বলেছেন যে কাঁথি রোড অর্থাৎ বেলদা কাঁথি পর্যন্ত শাখা রেল লাইন তৈবীর কাজ শীঘ্র হবে। ঐ সম্বন্ধে সমস্ত আযোজনই ঠিক হয়েছে এখন বাকী কেবল বেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদন। তাও সত্ত্বব পাওযা যাবে বলে পত্রিকা আশা প্রকাশ করেছিল। সেই সঙ্গে সভাপতি বলেছিলেন যে গত বৎসর অপেক্ষা ১৯২৮ সালে বেল কোম্পানীব ৫৯ লক্ষ টাকা আয বেশী হযেছে।[২৮]

১৯২৮ এব অক্টোবব মাসে শোনা যায যে বেলেব এসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার মি: পাইপার কাঁথি এসে কাঁথি এবং সাতমাইল প্রভৃতি স্থানে স্টেশনের স্থান পরিদর্শন করে গেছেন। কাঁথিতে পাদ্রী সাহেবেব কুঠীতে এখন তাঁদেব হেড অফিস হবে এবং ঐ নতুন বেলপথের ও ষ্টেশনাদিব জন্য কোথায কি পরিমাণ জমি আবশ্যক হবে তা নির্ধারণের জন্য সার্ভে কাজ কববার জন্য সত্বর একদল কর্মচাবী আসবেন। মাঠের ধান উঠে গেলে কাজ আবম্ভ হবে।[২৯] আশংকা প্রকাশ কবা হয "বহু কাল ধবিয়া এই রেল রাস্তা তৈযাবীর যে রূপ গডিমসী ব্যাপার চলিয়াছে, তাহাতে উহা কার্য্যে পবিণত হইবে কিনা তাহা এক ভবিতব্যই জানেন।"[৩০] ২৩শে নভেম্বর ১৯২৮ এ কলিকাতা বেলওয়ে পবামর্শ সমিতিব এক সভা হয়। সেই সভায চেযাবম্যান প্রকাশ কবেন যে কাঁথি বেলদা শাখা বেল নির্মাণেব যে কথা ছিল, তা কিছু কালেব জন্য স্থগিত বাখা হয়েছে। এব কাবণ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, এখন সাধারণভাবে সমস্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণের প্রস্তাব সম্বন্ধে পুনবায আলোচনা হওযাই এই স্থগিত রাখাব প্রধান কারণ।[৩১] অবশেষে সমস্ত জল্পনাব অবসান ঘটিযে ইষ্ট ইন্ডিয়া বেলওযে ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে উভয়েই স্থিব করেছিল যে পাঁচ বৎসরেব মধ্যে অনেক দিকে নতুন বেলপথ বিস্তার করবে। এর আনুমানিক ব্যয ধরা হয়েছিল ১৪ কোটি টাকা। ইষ্ট ইন্ডিযা বেল ১৯২৮ সালে মোট ১৭টি নতুন লাইন খুলবে ঠিক কবে। সমস্ত লাইনের দৈর্ঘ্যেব পবিমাপ পায ১৪৪২ মাইল। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে সর্বশুদ্ধ ১১টি লাইন খুলবে, তাব পরিমাপ প্রায ৮৩৮ মাইল।[৩২] ঐ বছর তারা ৪টি লাইন খুলবে। পত্রিকায মন্তব্য কবা হয-"কাঁথি বেলদা বেল লাইন এতদিনে মঞ্জুব হইল, বর্তমান ১৯২৮ খ্রী: মার্চে কাজ আরম্ভ হইবে। সেজন্য বেলওযে বোঁড পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুর কবিযাছেন।"[৩৩] জুন মাসে ভারত সরকাব এই কাঁথি বেলদা বেল নির্ম্মাণেব অনুমোদন কবেন। ঐ রেল ৪.১১ ফুট চওডা হবে এবং তার নাম কন্টাই বেল রোড-কন্টাই হবে ঠিক হয।[৩৪] কাঁথি বেলদা বেলের কার্য্য সূত্রপাত হয়েছিল। সরকাব এই রেল লাইনের উপব রেল স্টেশন, জলনিকাশেব পুল এবং লাইন পাবাপাব পথের বিবরণ সহ রেলপথের ম্যাপ পাঠায। এ সম্বন্ধে সুবিধা অসুবিধা বিষযে সাধাবণের মত গ্রহণ করেছিল। ঐ নক্সায় দেখা যায় যে বেলদা অর্থাৎ কাঁথি রোড স্টেশন হতে কাঁথি বেলদা রাস্তায় আধ মাইল থেকে দেড় মাইল পর্যন্ত বরাবর দক্ষিণ দিক দিয়ে কাঁথি পর্যন্ত প্রায় ৩৪ মাইল দীর্ঘ এই নতুন রেল রাস্তা তৈরী হবে। কাঁথি বোড স্টেশন হতে আরম্ভ হয়ে মনোহরপুর, আমরাই, কেদার, লালপুর, খাকুড়দা,

সাবড়া, খন্ডকই, নহঞ্জরা, বারিদা, কশবা এগরা, কামারডিহা, বালীঘাই, বারানিধি, ছত্রী, বাসুদেবপুর, বাদলপুর, নৈশালী ও টেঙ্কুনিয়া মৌজার মধ্য দিয়ে কাঁথিতে এসে থামবে এবং কাঁথির এক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ও কাঁথি রামনগব রাস্তার সিকি মাইল উত্তরে কাঁথি বেল স্টেশন তৈরী হবে। ঐ রাস্তায় খাকুড়দা, কশবা, এগরা, বালীঘাই, সাতমাইল ও কাঁথি এই পাঁচটি নতুন রেল স্টেশন তৈবী হবে। কাঁথি বেলদা জেলাবোর্ড রাস্তা হতে যথাক্রমে এক, সওয়া ও পৌনে মাইল দূরে দূরে খাকুড়দা, এগরা ও বালীঘাই স্টেশন এবং পৌনে এক মাইল দূরে ও উড়িষ্যা "কোষ্ট কেনেল" এর আধ মাইল পশ্চিমে সাতমাইল স্টেশন নির্মিত হবে। ঐ খালের উপব একটি সেতু এবং বাঘুই নদীর উপর আর একটি সেতু তৈরী হবে। এ ছাড়া জল নিকাশের জন্য আরও শতাধিক জাযগায় ছোট বড় পুল থাকবে। এছাডা বালীঘাই-জলেশ্বব রাস্তার উপর রেল লাইন পারাপাবের জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর রেল গেট ও অন্যান্য জায়গায দ্বিতীয় শ্রেণীব তিনটি এবং তৃতীয় শ্রেণীব ৪১টী পাবাপাব পথ থাকবে।[৩৫] বেলবাস্তা নির্মাণ হলে জল নিকাশেব ও পাবাপাবের সুবিধা অসুবিধা হবে কি না তা অনুসন্ধান করে বিপোর্ট প্রদানেব জন্য লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র মাল, সভ্য শ্রী নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি, শ্রী রমণীকান্ত মাইতি, কাঁথিব জল নিকাশ সমিতির সম্পাদক শ্রী ভূতেশ্বর পড়্যা এবং ওভারসিয়াবগণকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়, পবে রেল কোম্পানী সেই বাস্তাব কোন কোন অংশ পরিবর্তন করে সংশোধিত নক্সা তৈরী করা হয়েছিল। এর ফলে সংশোধিত বেল রাস্তার দূরত্ব ৩৩ মাইল দাঁড়ায়। পত্রিকায় পুনঃআশঙ্কা প্রকাশ কবা হয, "কাঁথি বেলদা রেল রাস্তার ঐ রূপ ভাঙ্গাগড়া কার্য্য বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছে এবং আবও কতকাল যে এইরূপ কাটিয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পাবে।"[৩৬]

১৯২৯এর পর-স্বাধীনতা পর্যন্ত বেলদা কাঁথি রেলপথের কথা আব শোনা যায না। এব প্রধান কারণ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক। ১৯২৯-৩৩ সালেব মধ্যে ছিল বিশ্বব্যাপী মন্দা যার ফলে কৃষিপণ্যের দাম ভীষণ কমে যায়। অন্যদিকে খাজনা, কব, সুদ ইত্যাদি উৎপাদকেব দেয় অর্থের ভার বেড়ে যায়।[৩৭] ১৯৩০-১৯৪৭ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলাব রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল নজর কাড়ার মতো। ১৯৩০-১৯৩৪ সাল পর্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলন মেদিনীপুর জেলায় বেশ ভালোভাবেই হয়েছিল। তার মধ্যে কাঁথি কেন্দ্রটি ছিল অনন্য। বিপ্লবী আন্দোলন ছিল জেলায় উল্লেখ করার মতো। ১৯৩১ খ্রী: ৭ই এপ্রিল জেলা শাসক পেডি, ১৯৩২ এর ৩০শে এপ্রিল জেলা শাসক ডগলাস, ১৯৩৩ এব ২রা সেপ্টেম্বব জেলা শাসক বার্জকে মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা হত্যা করেন। ১৯৪২ এব ভাবত ছাড আন্দোলন ছিল জেলায় অন্যতম শেষ গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। এই সময ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তাই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারত সরকার রেলপথ স্থাপনের কথা আব মাথায় আনেনি। একপ বাজনৈতিক গোলযোগ পূর্ণ কেন্দ্রে রেলপথ স্থাপন সরকারের পক্ষে ছিল বাস্তবিক কষ্টকর। কোম্পানী এগিয়ে না আসার কারণ ছিল অদূর ভবিষ্যতে লাভের আশা ছিল অনিশ্চিত।

কিন্তু বেলদা-কাঁথি রেলপথ স্থাপন প্রকল্পটি বাতিল হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি একমাত্র নয়। ১৯২৭ খ্রী: নারখোদ-অমবাবতী রেলপ্রকল্পটিও বাতিল হযে গিয়েছিল। ঐ সময় তার খরচ

ধরা হয়েছিল ৬৩ লক্ষ টাকা।

এই রেলপথটি স্থাপিত হলে কাঁথি মহকুমার অভূত-পূর্ব উন্নতি যে হতে পারত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। বাজনৈতিক ও আর্থিক দিক দিয়ে কাঁথি মহকুমাবাসী উপকৃত হতেন আর তার প্রভাব জেলার রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর পড়ত। রাজস্ব ও অন্যান্য অনেক কাজের জটিলতা ও পবিমাণ পূর্বের অপেক্ষা দিনের পর দিন বাড়তে থাকায় অনেক বেশি লোককে মেদিনীপুব যেতে হত বেলদা-কাঁথি ডাক সড়ক পথে। রেলপথ স্থাপিত হলে সে কষ্ট লাঘব হত। রাজনৈতিক দিক দিয়ে সচেতন কাঁথি মহকুমায আন্দোলন আরো প্রবল হতে পারত। দেশের অন্যান্য প্রদেশেব সঙ্গে যোগাযোগ সহজে গড়ে উঠত। রেলপথ স্থাপনের ফলে সমুদ্র উপকূলে এই শহরে যেমন কলকারখানা গড়ে উঠত তেমনি ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটত।

সূত্র নির্দেশ

১। বিপান চন্দ্র- দ্য বাইজ এ্যাণ্ড গ্রোথ অফ ইকনমিক ন্যাশানালিজিম, নিউ দিল্লী, ১৯৭৭, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৭, পৃ: ১৭।
২। নগেন্দ্র নারায়ণ বায় (অনুদিত), উনিশ শতকেব মেদিনীপুর (এইচ. ভি. বেইলিব ১৮৫২ সালের মেমরেন্ডাম কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ: ১৫৫।
৩। নীহাব, সাপ্তাহিক, কাঁথি, ১৬ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা ২০শে ভাদ্র, ১৩২২, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৬।
৪। শচীন্দ্রলাল ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৩ পৃ: ৮৬।
৫। নীহার, কাঁথি, ১৪ ভাগ, ১৪ সংখ্যা, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩২৬, ১৭ই নভেম্বব, ১৯১৪।
৬। ঐ
৭। ঐ ১৪ ভাগ ৩৭ সংখ্যা, ১৪ বৈশাখ ১৩২২, ২৭শে এপ্রিল ১৯১৫।
৮। ঐ
৯। ঐ ১৪ ভাগ ৩৮ সংখ্যা, ২১এ বৈশাখ ১৩২২ বঙ্গাব্দ ৪ঠা মে ১৯১৫।
১০। ঐ
১১। ঐ
১২। ঐ
১৩। ঐ
১৪। ঐ ১৪ ভাগ ৩৯ সংখ্যা ২৮ শে বৈশাখ ১৩২২, ১১ই মে ১৯১৫।
১৫। ঐ ১৪ ভাগ ৪৭ সংখ্যা ২১ এ আষাঢ়, ১৩২২, ৬ই জুলাই ১৯১৫।
১৬। ঐ।
১৭। ঐ ১৬শ ভাগ, ৪ সংখ্যা, ২৭ ভাদ্র, ১৩২৩।
১৮। ঐ ১৪ ভাগ, ৪৯ সংখ্যা, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২২।
১৯। বিপান চন্দ্র। ফ্রিডম স্ট্রাগল, ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, দশম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৯, পৃ: ১১৩।

২০। অমলেশ ত্রিপাঠী - স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতেব জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭) কলিকাতা, ১৩৯৭, পৃ: ৭৬

২১। রজনীনাথ দত্ত - আজিকাব ভারত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, (১৯৮১ অনুদৃত) পৃ ৪৮।

২২। নীহাব, ২০ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ২৬ আশ্বিন ১৩২৭ ১২ই অক্টোবর ১৯২০।

২৩। ঐ

২৪। ঐ, ২০ ভাগ, ২য সংখ্যা ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩২৭, ২৩শে নভেম্বর ১৯২০।

২৫। ঐ ২০ ভাগ, ৩৩ সংখ্যা, ১৩ই বৈশাখ ১৩২৮, ২৬শে এপ্রিল ১৯২১।

২৬। ঐ ২৬ ভাগ, ১৫ সংখ্যা ১৩ পৌষ, ১৩৩৩, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯২৬।

২৭। ঐ

২৮। ঐ ২৭ ভাগ, ২৪ সংখ্যা ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৪, ১৩ই মার্চ, ১৯২৮।

২৯। ঐ ২৮ ভাগ, ৬ সংখ্যা ১৬ আশ্বিন ১৩৩৫ ২রা অক্টোবর ১৯২৮

৩০। ঐ ২৮ ভাগ, ৯ম সংখ্যা, ৩০এ আশ্বিন ১৩৩৫ ১৬ অক্টোবব ১৯২৮।

৩১। ঐ ২৮ ভাগ, ১১শ সংখ্যা, ১৮ ই ভাদ্র ১৩৩৫।

৩২। ঐ ২৭ ভাগ, ৪১ সংখ্যা, ১২ আষাঢ় ১৩৩৫, ২৬শে জুন ১৯২৮।

৩৩। ঐ ২৭ ভাগ, ৪৪ সংখ্যা, ১লা শ্রাবণ, ১৩৩৫, ১৭ই জুলাই ১৯২৮।

৩৪। ঐ, ২৮ ভাগ, ৫ সংখ্যা, ৯ই আশ্বিন ১৩৩৫, ২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮।

৩৫। ঐ

৩৬। ঐ, ২৯ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩২৬, ১৯শে নভেম্বর ১৯২৯।

৩৭। অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রাগুক্ত পৃ: ১৫২।

“ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম”

জয়দীপ পণ্ডা

ভারতের স্বাধীনতার আজ পঞ্চাশ বছব অতিক্রান্ত। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংবেজ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে মেদিনীপুব কি অহিংস কি সহিংস সর্বক্ষেত্রেই যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তা ইতিহাস স্বীকৃত। এই জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমা ছিল বিপ্লবেব অগ্নিগর্ভ স্থান। এই স্থানটি যে কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তা নয় তার সাথে সমভাবে জনসেবাতেও এগিয়ে চলেছে এবং তা সম্ভব হচ্ছে তমলুকে প্রতিষ্ঠিত “রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম” প্রতিষ্ঠানটিব মাধ্যমে। বর্তমান প্রবন্ধে অবিভক্ত তমলুক মহকুমায় “রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম” কি ভূমিকা পালন করেছে তার একটি রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করা হল।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ “আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ” অর্থাৎ “জগতের মঙ্গল হইলে আমার মুক্তি হইবে”—এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য ১৮৯৭ সালের ৫ই মে বেলুড়ে তাঁব গুরুদেব শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের নামানুসারে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯১৪ সালে মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী রজনীকান্ত প্রামাণিক, শ্রী গিরিজা চরণ অধিকারী, শ্রী গজেন্দ্রনাথ গুড়্যা, শ্রী অচ্যুতানন্দ দাস, শ্রী শরৎ চন্দ্র দাস, শ্রী বিপ্রচরণ মাইতি, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডল, শ্রী ভবতারণ আদক প্রমুখ মহৎ ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায়।

তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম প্রথমে তমলুকে অবস্থিত ফৌজদারী আদালতের নিকট মোক্তর লাইব্রেরীব গৃহের নীচের তলাব একটি কক্ষে স্থাপিত হয়। কিন্তু মাত্র এক বছর পবে অর্থাৎ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে নানা কারণে সেবাশ্রম লাইব্রেরী গৃহ থেকে স্থানান্তরিত হয় তমলুকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বর্গভীমা মায়ের মন্দির সংলগ্ন শ্রী গিরিজা চরণ অধিকারী মহাশয়েব বাড়ীর একটি কক্ষে।

সেই সময় এতদঞ্চলে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়; এবং তা মহামারীর আকার ধারণ করতে থাকে। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম সেই সময় থেকেই দরিদ্র অসহায় রোগগ্রস্থ জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু দেবী বর্গভীমা মায়ের মন্দির থেকে যাতায়াতের অসুবিধে থাকায় এবং নানা সামাজিক কাবণে এই প্রতিষ্ঠানটিকে অন্যত্র স্থানান্তবিত করার চিন্তা করা হয়; আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় প্রচেষ্টা ধীর গতিতে চলতে থাকে। এই সকল খবর বেলুড় মঠে

পৌঁছোন মাত্র সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বেলুড় মঠ থেকে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ ৭ই নভেম্বর ১৯১৫ সালে (মতান্তরে ১৯১৭ সাল) তমলুকে আসেন। ওঁর উপস্থিতিতে তমলুক হ্যামিলটন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এক বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে শত শত গরীব দুঃখীদের অন্ন বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই বিশাল আয়োজনের সমস্ত আর্থিক ব্যয়ভার বহন করেন রামকৃষ্ণ দেবের একনিষ্ঠ শিষ্য তমলুকের বিখ্যাত উকিল শ্রীপতি বসু মহাশয়।

শ্রীপতি বসু মহাশয় মিশন সেবাশ্রম নির্মাণের উদ্দেশ্যে শঙ্কর আড়া খালের উত্তরাংশে ও পাকা রাস্তার দক্ষিণে অবস্থিত একটি জায়গা দান করনে ১৯১৭ সালে। ঐ বছর বসু মহাশয়ের প্রদত্ত স্থানেই মাটি, বাঁশ, টালি দিয়েই নির্মিত হয় সেবাশ্রমটি। এই সেবাশ্রমে দরিদ্র নরনারায়ণের সেবা করার জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় (এলোপ্যাথি) গড়ে তোলা হয়। এই আশ্রম পরিচালনার জন্য যথেষ্টভাবে সাহায্য করেন নন্দীগ্রাম নিবাসী ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণ নামক যুবক। সেদিনের ঐসব ব্যক্তিদের সহযোগিতা সত্যই ভাবা যায় না।

মিশন প্রতিষ্ঠিত এই চিকিৎসাকেন্দ্রটি নিয়মিতভাবে দরিদ্র অসহায় অসুস্থ নরনারীদের সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় সেবা করে চলেছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে বন্যার ফলে এই মিশন গৃহটি নষ্ট হয়ে যায়। এই বন্যার ফলে তমলুক মহকুমার অন্তর্গত তমলুক, ময়না ও পাঁশকুড়া থানার অধিবাসীদের ভীষণ দুর্গতি হয়। এই সংবাদ বেলুড় মঠে পৌঁছলে বন্যা পীড়িত দরিদ্র জনগণকে সাহায্য করার জন্য বেলুড়মঠের শ্রীমৎ স্বামী ভবানন্দ মহারাজের নির্দেশে এতদ অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে ত্রাণকেন্দ্র স্থাপন করে বন্যাপীড়িত দরিদ্র জনসাধারণের সেবা করা হয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন বর্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ ও.এন.কুক সাহেব এবং বাংলার লাট সাহেব এর দেওয়া বিবরণে। আশ্রমের এই জনহিতকর কাজ দেখে তাঁরা আশ্রমের যথেষ্ট প্রশংসা করে যান। এই ত্রাণ কার্যের জন্য বহুস্থান থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন শ্রী ভূতনাথ সেন মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

প্রবল বন্যায় আশ্রমটি ভেঙে গেলে ১৯২১ সালে হোরমিলার স্টীমার কোম্পানীর অফিস ঘরের পাশের একটি কক্ষে আশ্রম উঠে আসে। এর কিছুদিন পরে ১৯২২ সালে সেখান থেকে উঠে বাংলা স্কুলের পশ্চিম পার্শ্বে শ্রীযুত-শশীভূষণ আচার্য মহাশয়ের তিন কামরা পাকা বাড়ীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু আচার্য মহাশয়ের বাড়ীতে নানা সামাজিক কারণে আশ্রম স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। বর্তমানে যেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে পূর্বে ওখানে শ্রীযুত তারিণী ভূঞ্যা মহাশয়ের বাড়ী ছিল। আশ্রম কমিটি ১৯২৪ সালে তারিণী বাবুর কাছ থেকে বাড়ীটি ক্রয় করে নেয়। কিন্তু আশ্রম তহবিলে আর্থিক অনটন দেখা দেওয়ায় আশ্রম কর্তৃপক্ষকে তমলুক লোন অফিস থেকে টাকা ধার করতে হয়। এই ঋণভার হতে আশ্রমকে ঋণমুক্ত করেন ভবানীপুর নিবাসী ডাঃ শরৎ চন্দ্র মিশ্র মহাশয়ের সহায়তায় কল্যাণচক্ নিবাসী শ্রীভবতারণ পাহাড়ী ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী শশীভূষণদেবী। তারিণী বাবুর বাড়ীটি ক্রয় করিবার পর ঐ স্থানে বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সেবাশ্রমের পাশেই একটি হাসপাতাল নির্মিত হয়। হাসপাতালটি নির্মাণে যথেষ্টভাবে সাহায্য করেন গেঁওখালী নিবাসী শ্রীযুত চিন্তামণি

বাগ মহাশয়। ওঁর আর্থিক সাহায্যেই রোগী থাকবার শয্যার উপযোগী দু কামরা যুক্ত হাসপাতালের পাকা বাড়ীটি নির্মিত হয়।

এইভাবেই তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম নানা বিবর্তনের মধ্যদিয়ে তার স্থায়ী গৃহ লাভ করে। বর্তমানে শহরেব মাঝখানে প্রায় ১৫ একব জমির উপর মিশনটি অবস্থিত। ১৯২৬ সালে তমলুক পুনরায় ভয়াবহ বন্যার প্রকোপে পড়ল। তমলুক, কাঁথি, ভগবানপুর, নরঘাট একেবারেই জলমগ্ন হল। ফলে তমলুক বাসীর দূর্দশার সীমা রইল না। কিন্তু তমলুক মিশন সেবাশ্রম দরিদ্র নরনারায়ণের ত্রাণকার্য শুরু করল। এই সেবাশ্রমের সংগে সাহায্যেব হাত বাডিয়ে দিল বেলুড় মঠ। বেলুড় মঠের স্বামী নির্বানানন্দ মহারাজেব নেতৃত্বে এতদ অঞ্চলে ব্যাপক ত্রাণকার্য শুরু করেছিল।

১৯২৬-২৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত কালোই গ্রামের শ্রী গোবর্দ্ধন প্রামাণিক স্বামীজীর ভাবধাবা প্রচার ও পূজাদির জন্য তিন হাজার টাকার একটি স্থাযী তহবিল তমলুক মিশন সেবাশ্রমের নামে করে দেন।

মিশনের বহুমুখী কর্মসূচী তমলুকে এক উন্নত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচার ও রামকৃষ্ণদেবের কীর্তিগাথা নিয়ে আলোচনা সভা ইত্যাদি এখানকার জনগণের মধ্যে এক উন্নত মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এসব লক্ষ্য কবে ১৯২৯ সালে বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ তমলুক মিশনকে শাখা রূপে পরিণত করে। এ যে যথেষ্ট গৌরবেব তা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। সেই থেকে উত্তরোত্তব তমলুক রামকৃষ্ণ মিশনের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে এবং জনমানসের উপর মিশনেব প্রভাব যে কত গভীব তা একটু খোঁজ নিলেই বোঝা যাবে।

১৯৩৩ সালে বেলুড় মঠের সহ সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহাবাজ তমলুক মিশন সেবাশ্রমে আসেন। তিনি এখানে হস্তশিল্প বিভাগীয় স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি এখানে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ৩২ জন ভক্তকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। ঐ সালে গেঁওখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি বাগ মহাশয় বর্তমানে যে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাব দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করে দেন।

১৯৩৮ সালে আশ্রমের রন্ধনশালাটি নির্মাণে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন লক্ষ্যা নিবাসী শ্রী মুবারী মোহন মাইতি মহাশয়। ঐ বছরই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। ১৯৩৮ সালেব ১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি রূপে গণসংযোগের উদ্দেশ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তমলুক শহরে এসে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে আসেন এবং ওখানকার ভিজিটারস বুকে লিখে গিয়েছেনঃ "তমলুকে আসিয়া রামকৃষ্ণ মিশন পরিদর্শন করিবার সুযোগ পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। যেরূপ শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতার সহিত জনসেবা করা হয় তাহা প্রশংসনীয়। প্রত্যেক শহরে যদি এরূপ প্রতিষ্ঠান থাকিত তাহা হইলে কত উপকার না হইত। এই প্রতিষ্ঠানটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।"

১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবর দূর্গাপূজোর মহাষ্টমীর দিন সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস (Cyclone) এবং প্রলয়ঙ্কর বন্যা ও ঝড় ঝঞ্ঝার ফলে মেদিনীপুর জেলায় বিশেষত কাঁথি ও

তমলুক মহকুমায় প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সরকারী হিসেব মতে এই বন্যায় কেবলমাত্র তমলুক মহকুমাতেই তিন হাজার আটশ সাঁইত্রিশ জনের মৃত্যু হয়। বহু জন আহত হন, বহু গবাদি পশু মারা যায়, বহু ঘরবাড়ি জমির ফসল নষ্ট হয়। ঐ সময় বন্যা কবলিত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়ায় তমলুক মিশন সেবাশ্রম। বন্যা পীড়িত নরনারীদের ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়। তাদেব দুবেলা খিচুড়ি রান্না করে দেওয়া হয়। ১৯৪৩ সালে ফজলুল হক মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায বন্যা পীড়িত স্থান পবিদর্শনে তমলুকে আসেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম পরিদর্শন কবে ভিজিটারস বুকে লিখে যানঃ "Saw the indoor and outdoor arrangements of Ramakrishna Mission at Tamluk. It is very nicely kept and wellarranged though in a small scale. Institution of this nature is a boon for the suffering humanity.

The care and attention bestowed upon the poor and the destitutes by the Swamijies cannot be too highly spoken of. I am much impressed with the neatness and cleanliness of the surroundings and the sanitations of the atmosphere pervading the whole of the ashrama."

১৯৪৫ সালে বেলুড মঠের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ তমলুক মিশন সেবাশ্রমে আসেন। যেখানে বর্তমানে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের মর্মর মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তিনি সেই মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি যে এখানে এসেছিলেন তার প্রমাণ পাই স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সম্পাদিত "অতীতের স্মৃতি" (স্বামী বিবজানন্দ ও সমসাময়িক স্মৃতিকথা) পুস্তকে। উক্ত পুস্তকের ৩৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, "...১৯৪৫ সালের জানুয়ারীর শেষভাগ। তমলুক হইতে আহ্বান আসিয়াছে—তমলুককে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র মেদিনীপুরের আহ্বান। ...পাঁশকুড়া স্টেশনে বিকালে দুইশত গ্রামবাসী শঙ্খ বাজাইয়া সন্ন্যাসী অতিথিকে স্বাগত জানাইল। ছিন্ন তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র, গায়ে একটি ময়লা গেঞ্জি বা গামছা কাহারও আছে, কাহারও নাই, কিন্তু চোখে মুখে অপরাজেয় সংগ্রাম দৃঢ়তার ছাপ। ....যে গাড়িটি হইতে বিরজানন্দজী নামিলেন উহাতে একদল গোরা সৈনিক উচ্ছৃঙ্খল হল্লা করিয়া যাইতে ছিল। তাহারা মলিন বস্ত্র পরিহিত জনতাকে দেখিয়া বিদ্রুপ করিয়া গেল। ...নারিকেল গাছের ছায়ার মধ্যে ক্ষুদ্র তমলুক শহরটি বহু শতাব্দীর ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বিরজানন্দজী এখানকার আশ্রমে সাতদিন ছিলেন...।"

১৯৬৩ সালে বেলুড় মঠের সহ সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্ববানন্দ মহারাজ তমলুক মিশন সেবাশ্রম পরিদর্শনে আসেন। তিনি ১৯৬৩ সালের ৩১শে জানুযারী শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের মর্মর মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামীজী যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্বেতপাথরের মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এক আড়ম্বর পূর্ণ যজ্ঞ হয়েছিল। এরূপ ঠিক হয়েছিল যজ্ঞে যে হোম হবে সেই হোমের অগ্নি কাঠে কাঠ ঘষে জ্বালাতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সময় বিভিন্ন স্থান থেকে আগত উপস্থিত কোন ব্যক্তিই আগুন জ্বালাতে সক্ষম হল না। সেই সময় আশ্রমে কর্মরত এক যুবক যজ্ঞের আগুন জ্বালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই যুবক হলেন নিশ্চিন্তবসান নিবাসী শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের মন্ত্র শিষ্য শ্রীযুত

বুদ্ধদেব পন্ডা মহাশয়। উনি বর্তমানে মহিষাদল থানার অন্তর্গত গোপালপুর হাইস্কুলের শিক্ষক। উনি এখনও মিশনের সমস্ত কাজে জড়িত রয়েছেন।

১৯২৯ সাল থেকে তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম বেলুড় মঠের শাখারূপে পরিগণিত হয়। তখন থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিশোকাত্মানন্দ মহারাজ। কিন্তু বেলুড় মঠের নির্দেশে ওনাকে ১৯৪৫ সালের ২রা এপ্রিল মেদিনীপুর আশ্রমের ভার গ্রহণ করতে হয়। সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করেছেন। ওঁর পর তমলুক আশ্রমের অধ্যক্ষ হন যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী অমেয়ানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী ভবানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী সুশান্তনন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী অন্নদানন্দ মহারাজ (১৯৫৯ সাল), অন্নদানন্দজীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আশ্রমের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি Community Hall, আশ্রম লাইব্রেরী, প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। উনি অবসর গ্রহণ করায় ওঁর স্থলাভিষিক্ত হন শ্রীমৎ স্বামী অচ্যুতানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী অচিন্ত্যানন্দ মহারাজ এবং বর্তমানে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ মহারাজ।

তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ছিল তমলুকের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণার উৎসস্থল। বিপ্লবতীর্থ তমলুকের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে যাঁরা প্রথম সারির নেতা রূপে স্বীকৃত তাঁদের প্রায় সকলেই রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। এঁবা হলেন তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের বিদ্যুত বাহিনী ও ভগিনী সেনার প্রধান শ্রী সুশীল কুমার ধাড়া, পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রী রজনীকান্ত প্রামানিক, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক শ্রী সতীশ চন্দ্র সামন্ত, শ্রী বিপ্রচরণ মাইতি, শ্রী গুণধর ভৌমিক। সুশীলবাবু যখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র তখন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। রজনীবাবু মা সারদামণির কাছে দীক্ষা নেন। এঁরা ছিলেন দেশবাসীর জন্য উৎসগীকৃত প্রাণ। রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবাদর্শপুষ্ট ছিলেন বলেই এদের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হযেছিল। বিবেকানন্দের ন্যায় এদের অনেকে সংসার ধর্মও পালন করেননি।

বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ২৯শে সেপ্টেম্বর যে থানা, সরকারী অফিস আদালত দখল অভিযান চালানো হয় ঐ সময় বহু ব্যক্তিশহীদ হন এবং অনেকে আহত হন। তখন আহতদের সেবার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত চিকিৎসা কেন্দ্রটি যে ভূমিকা পালন করেছিল তাও আমাদের অজানা নয়। এমনকি আমাদের জাতীয় গৌরব ৭৩ বছরের বীরাঙ্গনা শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার মরদেহ নিয়ে আসার দায়িত্বও মিশন কর্তৃপক্ষ নিতে ভুলেননি। ঐ সময়কার মিশনের অন্যতম স্বামীজী শ্রীমৎ স্বামী বিশোকাত্মানন্দ মহারাজ নিজে মর্গ থেকে অন্যান্যদের সঙ্গে মাতঙ্গিনী মায়ের পবিত্র মরদেহ আনতে গিয়েছিলেন এবং এদেরই চেষ্টায় শেষকৃত্য করা হয় তমলুক শ্মশানে।

১৯৯৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে তমলুকে আসেন। তিনি ঐদিন তমলুকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বর্গভীমা মায়ের মন্দিরের সামনে স্বামী

বিবেকানন্দের একটি আবক্ষ্য মূর্তি উম্মোচন করেন। এর পূর্বে ১৯৯১ সালে তমলুকের অদূরে নিশ্চিন্তবসান গ্রামে ডাঃ যতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী নির্মিত মার্চ হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে যান। ১৯৯৬ সালো ২৭শে নভেম্বর বেলুড় মঠের সহসভাপতি শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দ মহারাজ তমলুকে এসে দেবী বর্গভীমা মায়ের মন্দিরে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য প্রেমানন্দ যাত্রী নিবাস স্থাপন করেন। এঁরা ছাড়া বেলুড় মঠের তাবৎ অন্যান্য স্বামীজীরা প্রায়ই বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তমলুক মিশনে আসেন। এদের উপস্থিতিতে এখানকার জনগণের মহত্তর নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক জীবন যাপনে যে বিশেষ সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে চলেছে তা বুঝিতে অসুবিধে হয় না।

বর্তমানে মিশন পরিচালিত যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন, এগুলি হল-

(ক) দাতব্য চিকিৎসালয় — তমলুকেব এতদঞ্চলে বহু এলোপ্যাথি চিকিৎসালয় গড়ে ওঠার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন এলোপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়ের স্থলে বর্তমানে দুটি হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই দুটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের একটি তমলুক আশ্রমে এবং অপরটি তমলুক শহর হতে ৬ মাইল উত্তরে তমলুক-মেচেদা বাসরুটের উপর কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামে।

(খ) শিল্প — সেবাশ্রম পরিচালিত একটি বৈতনিক দারুশিল্প শিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সাল হইতে সেবাশ্রম সরকারের সহায়তায় এই দারুশিল্প শিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্র প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্দেশ্য হল দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা। অল্প শিক্ষিত যুবকগণকে এই বিভাগে ৩ বছর ধরে শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে দুজন বৈতনিক শিক্ষক শিক্ষাদান করে থাকেন। এর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

(গ) প্রাথমিক বিদ্যালয় — মিশন সেবাশ্রম পরিচালিত একটি পৃথক প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী) দশজন শিক্ষক ও দুজন অশিক্ষক কর্মচারী আছেন। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা চারশো।

(ঘ) ছাত্রাবাস — রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম পরিচালিত দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। দুঃস্থ অসহায় ছাত্রদের সম্পূর্ণ বিনা খরচে খাওয়া, থাকা ও পড়াশুনোর ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে এই ছাত্রাবাসে চারজন দারুশিল্প বিভাগে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

বর্তমানে আশ্রম পরিচালিত পূর্বোক্ত যেসব প্রতিষ্ঠান গুলো রয়েছে সেগুলো ছাড়াও পূর্বে আরও কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন-নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় (১৯৫৬ সাল), আর্থিক অসঙ্গতি পূর্ণ অসহায় শিশুদের শিক্ষার সহায়তার জন্য প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৬৭ সাল), অশিক্ষিত বয়স্ক-বয়স্কাদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় (১৯৭১ সাল) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক অভাবে ও সরকারের উদাসীনতার ফলে এগুলি বর্তমানে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি, তবে

প্রচেষ্টা চলছে।

তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বরা এসেছেন এবং তাঁরা আশ্রম সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জানিযে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, সুভাষ বসুব অগ্রজ শ্রী শরৎচন্দ্র বসু, অমৃত বাজাব পত্রিকার সম্পাদক শ্রী তুষার কান্তি ঘোষ, স্বধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহবলাল নেহেরুব ভগ্নি শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত তমলুক মিশন সেবাশ্রম পরিদর্শন করে মন্তব্য করেছেন ঃ "It has given me pleasure to visit the Ramakrishna Mission Sevashrama. As distress is every form. My best wishes for the good work which is being done and my humble tribute of admiration for those who serve the poor and helpless."

শ্রী শরৎচন্দ্র বসু মন্তব্য করেন ঃ "তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম দেখে বিশেষ সুখী হইলাম। পরিষ্কাব পরিচ্ছন্নতা-যা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না-এখানকাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য জিনিস। রোগীদের প্রতি যেরূপ যত্ন নেওয়া হয় তা প্রশংসনীয। এই সেবাশ্রমের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।"

শ্রী তুষাবকান্তি ঘোষের মন্তব্য হল ঃ "অদ্য তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম পবিদর্শন করিলাম। স্থানটি বড় সুন্দর মনে হইল। এখানে একটি হাসপাতাল ঘর আছে। Infectious রোগী ছাড়া অপর সকল বকম রোগী লওয়া হয়। লাইব্রেরীটিও বেশ বড় বলিযা মনে হইল। ইহাদের সেবার কথা অধিক লেখাই বাহুল্য। আমি এই আশ্রমের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।"

বর্তমানে এই আশ্রমে চারজন মহারাজ ও দুজন ব্রহ্মচারী রয়েছেন। বর্তমানে এই আশ্রমের তত্ত্বাবধানে পাঁশকুড়া ও ঘাটালে দুটি রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত হচ্ছে। হিন্দু-মুসলমান বিভিন্ন ব্যক্তিব, যাঁদের মধ্যে মহিলারাও রয়েছেন। আর্থিক সাহায্যে নির্মিত এই সেবাশ্রমটি বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার একটি অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। প্রত্যহ বহু দর্শনার্থী নরনারীর উপস্থিতি এই মন্দিরকে এক বিশেষরূপ দান করেছে।

সূত্র নির্দেশ

১। 'বিংশ শতাব্দীব তমলুক"-শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী (পার্ব্বতীপুর, তমলুক ১লা আশ্বিন ১৩৮২, পৃষ্ঠা: ৫০-৫৪)।

২। "স্বামী ভূতেশানন্দ"-প্রকাশক স্বামী বঙ্গনাথানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড, হাওড়া ৭১১ ২০২, ২২শে আগষ্ট ৯৮, পৃষ্ঠা: ১৩)।

৩। "শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা" (২য় ভাগ) সম্পাদনা-স্বামী গম্ভীরানন্দ (উদ্বোধন কার্যালয় কলিকাতা ৩, ১৯৯৫ পৃষ্ঠা: ১১১)।

৪। "অতীতের স্মৃতি-স্বামী বিরজানন্দ ও সমসাময়িক স্মৃতিকথা" (সম্পাদনা - স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পৃষ্ঠা: ৩৪৮)।

৫। "উদ্বোধন" (চৈত্র ১৪০৪ এর ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ২৬১)।

৬। "শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, তমলুক, মেদিনীপুর কার্যবিবরণী" (১৯৪০-৪৭ সম্পাদনা স্বামী অমেয়ানন্দ, জানুয়ারী, ১৯৪৮)।

৭। "শ্রী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, তমলুক, মেদিনীপুব কার্যবিববণী" (১৯৭১-৭২, সম্পাদনা স্বামী অন্নদানন্দ, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃষ্ঠা: ৪-৭)।

৮। "যাদের চরণ স্পর্শে তমলুক ধন্য"-জয়দীপ পন্ডা ('রুচিরা', তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয় বাৎসরিক পত্রিকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা: ১৯-২০)।

৯। উপরোক্ত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি ছাড়াও এই প্রবন্ধ লিখতে আমায় বিশেষভাবে সহায়তা করেন আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ মহারাজ, আমার শিক্ষাগুরু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গবেষক ড: প্রদ্যোত কুমার মাইতি, শ্রীযুত বুদ্ধদেব পন্ডা, শ্রী সুকুমার ধাড়া এবং তমলুকের কিছু সহৃদয় মানুষ।

ইতিহাস চর্চায় মেদিনীপুরের লোকায়ত গান

শ্যামল বেরা

আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের ধারাটিকে বুঝতে হলে লোকায়ত গানের আশ্রয় নেওয়া একান্ত জরুরি। কেননা, এইসব গানগুলি এমনই এক প্রমাণ-চিহ্ন যা আমাদের অজানা সত্যকে জানিয়ে দেয়। আমবা যদি প্রতি জেলার লোকায়ত গানগুলি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করি, তা হলে জেলাগুলির ইতিহাস চর্চায় তা তাৎপর্যময় হয়ে উঠবে। এই ধারার গানগুলিকে শুধুমাত্র সংগীতের ইতিহাস বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্বের আলোচনায় আনলে দেখা যাবে বহু সমস্যার জট খুলতে গানগুলি সহায়ক হয়ে উঠেছে।

যাইহোক, আমার আলোচ্য বিষয় মেদিনীপুর জেলার লোকায়ত গানের ধারাটির প্রসঙ্গ-কথা তুলে ধরা। মেদিনীপুর জেলায় বহু বিচিত্র জন-জাতির বসবাস। বর্তমান সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা এবং অন্যান্য বহুবিধ প্রয়োজনে অন্যান্য রাজ্যের বহু মানুষজনও এখানে বসতি স্থাপন করেছেন। ফলে, মেদিনীপুর জেলার লোকায়ত গানের যেমন ব্যাপ্তি ঘটেছে, তেমনি বহু ধারায় উৎসারিত হয়েছে।

তবে, এ ধারা ক্রমবিলীয়মান অবস্থায় কারো কারো স্মৃতিতে টিকে রয়েছে। এসব এখনই সংগ্রহ করে নিতে না পারলে পরে আফশোসের অন্ত থাকবে না। মেদিনীপুরের লোকায়ত গানের মধ্যে আমরা পাচ্ছি - পাতানাচের গান। করম ঠাকুরের পূজা উপলক্ষে পরিবেশিত হয় বলে এ নাচ করমনাচ নামেও পরিচিত। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই নৃত্যরত অবস্থায় এ গান পরিবেশন করেন। অনেকে আবার এই গানকে দাঁড় ঝুমুর নামেও অভিহিত করেন। ঝুমুরের পাশাপাশি ভাদু, টুসু, ছৌ, বাধনা পরবের গানে, পটের গানে মেদিনীপুর মুখরিত। এ সব গানের কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে, কিন্তু পীরের গান, ভাঁড় যাত্রার গান, কৃষ্ণ যাত্রার গান, ঘেঁটুর গান, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিয়ের গান, সঙের গান, শুমলাঘরের গান, তর্জাগান, দেহতত্ত্বের গান, ভাটিয়ালী প্রভৃতি ধারাব সংগ্রহ ও আলোচনা তেমন হয়নি। গানগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং বিষয় ভাবনার পর্যালোচনা থেকে আমবা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিবর্তনের ইতিহাসটি পেতে পারি।

প্রথমেই বিয়ের গানের প্রসঙ্গে আসা যাক। "কালা গেছে মেদ্নীপুর / আনবে কালা কানের দুল"-এটি মেদিনীপুরেব একটি বিয়ের গানের প্রথম দু'কলি। হাতে তালি দিয়ে কোমর দুলিয়ে

হাসি-মস্করা করতে করতে এ গান পরিবেশিত হয়। যাইহোক, আজ আমরা বহু বর্ণে, বহু গোষ্ঠীতে বিভক্তহলেও আমাদের জীবন যাপনের, আশা-স্বপ্নেব মৌল চাহিদা এবং প্রকাশ যে মূলত: একই, তা আমাদের সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিয়ের গানগুলির পর্যালোচনা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায়। নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা, নারীদের দ্বারা সৃষ্ট এসব গানগুলি আমাদের সমাজ সত্য উদঘাটনে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার ঘারুই অঞ্চলের রহিলা বিবির কাছ থেকে সংগ্রহ করা একটি মুসলিম বিয়ের গান-

কোলকাতা মেরা পড়ুয়া দামাদ
দেশবা মেরা কামিনী
ঢেঁকি কুটা সোঁদা বাটা
রাঙতায় মোড়া সিঁদুর গো
মেছোয়া বাজারের মোকো কাঙই
ফুলন তেলের বোতল গো
তবে তো হইবে কালো কেশের যতন গো
কোলকাতা মেরা পড়ুয়া দামাদ
দেশবা মেরা কামিনী।

কলকাতার লেখাপড়া জানা দামাদ (বর) দেশের কামিনীকে সাদী করবে। গানটির মধ্যে উৎসারিত হয়েছে 'রাঙতা মোড়া সিঁদুর গো'। খুব তাৎপর্যপূর্ণ পংক্তি। সিঁদুর ব্যবহারের ইতিহাসটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সিঁদুর ব্যবহার করেন হিন্দু সধবারা। বহু প্রাচীনকালে আদিবাসী সমাজে সিঁদুরের প্রচলন হয়। হিন্দুরা সে ঐতিহ্য গ্রহণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় দ্রুত ধর্মান্তরিত হওয়ার পর্বে অনেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেও বিবাহোত্তর পর্বে সিঁদুর ব্যবহারের অনুষ্ঠানটিকে ধরে রেখেছেন।

ঘেঁটুর গানও ক্রমবিলীয়মান। ঘেঁটু ঠাকুর বা ঘন্টা কর্ণ হলেন অনাথ দেবতা। ঘেঁটু ঠাকুরের পূজা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে আমাদের যাদু নির্ভর লোকজীবনের দিকটিকে মনে করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয়-আমাদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উত্তরাধিকারের দিকটিকে। ফাল্গুনের সংক্রান্তিতে এ পূজার শুরু, তার পর্বটি চলে সারা চৈত্র মাস। তেমাথার মোড়ে কিংবা জলাশয়ের ধারে মুড়ি ভাজার কালো হাঁড়ির ওপর একতাল গোবর দিয়ে দু'টো কড়ি বসিয়ে পূজা হয়। পূজার পরে তা ভেঙে ফেলা হয়। এরপর সন্ধ্যা বেলায় ছেলেমেয়ের দল প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘেঁটুর গান শুনিয়ে চাল পয়সা তোলে। কোলাঘাট থেকে দক্ষিণে আচাইপুর গ্রামের চন্ডী মাজির কাছ থেকে সংগৃহীত একটি ঘেঁটুর গান-

আকাটা পুকুরে ঘেঁটু নাইতে নেমেছে
নাইতে নেমেছে গো সখি শঙ্খ বাজাচ্ছে।
শিল আর শিলের নোড়া
তাতে কলা ডাঁটা সুতোর ঘেরা
তার ভিতরে ঘেঁটু রাজা

ঘেঁটুর বউ সাথে।
ঘেঁটুর যত শালি-শালা
ঘেঁটুরে লয়ে করছে খেলা
কতই ঠকচ্ছে।
হরিতকী আর হলুদ কড়ি
খুঁজে পায় না ঘেঁটুর বউড়ী।
খুঁজে পায় না ঘেঁটুর বউড়ী
কান্না জুড়েছে।
আকাটা পুকুবে ঘেঁটু কান্না জুড়েছে।

পীবের গানেব মধ্যে অন্যতম গান হ'ল আঁটকুড়া রাজার গান। অপুত্রক রাজা পীরের আশীর্বাদ পেয়ে কিভাবে পুত্র লাভ করলেন- তা নিয়ে রচিত হয়েছে এ গান। আঁটকুড়া রাজার পালাগান ও লোককাহিনী নিয়ে বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে ১৯৭৯ সালে একটি সংকলন 'লোকসাহিত্য: পঞ্চদশ খণ্ড' প্রকাশিত হয়েছে। সংকলনটিতে রংপুর, মোমেনশাহী, সিলেট, টাঙ্গাইল, ফরিদপুব, বাজশাহী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ছ'টি পালা-কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুব থানার সরবেড়িয়া গ্রামের ফকিরদের কাছ থেকেও এ ধবণের গান সংগৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে এ জেলার গানের মূল পার্থক্য হ'ল- এখানে অপুত্রক রাজা পীরের আশীর্বাদ পেয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের গানে পীরের অনুপস্থিতিটি লক্ষ্য করার মত। যাইহোক, পীরের গানগুলি থেকে আমাদের আচার-আচরণ ও সমাজ জীবনের এক বিশ্বস্ত ছবি পাওয়া যায়। আঁটকুড়া রাজার গানের অংশ বিশেষ হল-

রয়ে রয়ে মনে পড়ে গো, গাজী বাবার নাম।
বযে রয়ে মনে পড়ে গো, পীর বাবার নাম।
আরে বন্দনা করিতে কেমন, যাবে অনেকক্ষণ।
গানীর চরণে সব জানাবে প্রণাম॥
বিরাট নগরে রাজা ছিলেনও তিনি।
তেনার ঘরে ভগবান পুত্র নাইকো দায॥
তেনার ঘরে ভগবান পুত্র নাইকো দিল।
দয়াময পীর দেবতা সাধনা করিল॥
ধীরে ধীবে পীরবাবার সাধনা করিল।
ফকিব রূপে পীব গো গমন করিল॥
রাজার বাড়িতে পীর গো দরশন দিল।
সাতরাণী দেখে তারা বড় খুশী হল॥
সোনাব পাত্রতে করে চাল পয়সা দিল।
দযাময় পীর দেবতা হাসিতে লাগিল॥
আর দেখিয়া শুনিয়া পীর গো হাসিতে লাগিল।

তোমার হাতেব চাল পয়সা আমি নাইকো লুব ।।
তোমার হাতের চাল পয়সা আমি নাইকো লুব।
থাকিবে যাব কোলে পুত্র, তার হাতে দিও ।।
সাতরাণী শুনে মাগো কেঁদে আকুল হয়।
সাতরাণীর কোলে ঠাকুর পুত্র নাইকো দায় ।।

ভাঁড়যাত্রা মেদিনীপুর জেলার একটি লুপ্ত প্রায় লোকনাট্য। ভাঁড় যাত্রা সম্পর্কে যেকথা বলা ভালো-তা হল এটি বাংলার একটি উপেক্ষিত লোকনাট্য। মেদিনীপুর ছাড়া হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা, বাঁকুড়া জেলাতেও এ যাত্রার চল ছিল। ভাঁড়যাত্রা মূলত নৃত্য-গীত প্রধান। কাশ্মীরে 'ভাঁড়পথর' নামে যে লোকনাট্যের চল রয়েছে, তাব কিছুটা কাছাকাছি হ'ল বাংলার ভাঁড়যাত্রা। এ যাত্রাব গানে বয়েছে আমাদেব লোকাযত জীবনের নানান তথ্য। গানগুলির মধ্যে আদিরসাত্মক গান যেমন রয়েছে, তেমনি বয়েছে সমাজ সমস্যা মূলক বহু গান। আপাতত একটি কৌতুক রসের গান তুলে ধরা যাক-

পায়ে আলতা পথে কাদা
যাই কেমন করে থাকতো যদি তোমাব দাদা
মুছে দিত পায়ের কাদা
অতি সাধের আলতা আমার
কে যতন করে
ও-ঠাকুর পো, লওগো কোলে করে।

এইসব গানে পাশাপাশি রযেছে রূপনারায়ণের ভাটিয়ালী গান, তর্জাগান, শুম লাগবের গান, কৃষ্ণযাত্রা বা কেষ্ট যাত্রার গান, কীর্তনগান, পটের গান, স্বদেশী গান, একানে গান, লোককথার গান, বার-ব্রত অনুষ্ঠানের গান, দেহতত্ত্বের গান, গাজন তলার গান ইত্যাদি। এসব গানের সংগ্রহ ও বিচার বিশ্লেষণ থেকে আমাদের সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের আলোচনার পথ আরো বিস্তৃত হয়ে উঠবে। আমাদের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে লোকায়ত গানের তাৎপর্যময় দিকটি ভাবা খুবই জরুরি।

সূত্র নির্দেশ

প্রেমেন্দ মজুমদার সম্পাদিত 'লৌকিক উদ্যান'-এর প্রসঙ্গ লোকসংগীত: বিশেষ সংগ্রাহক সংখ্যায়, সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা' পত্রিকার 'নারী: বাঙলার লোকসংস্কৃতি গবেষণা' পত্রিকার 'নারী: বাঙলার লোকসংস্কৃতিতে', দেবাশিস বসু সম্পাদিত 'কৌশিকী' ৯৮ সংখ্যায় এর বিজয় পাল সম্পাদিত 'শব্দের মিছিল' মেদিনীপুরে লোকসংস্কৃতি সংখ্যায় - বর্তমান প্রতিবেদকের এ নিয়ে যে সব লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তার কিছু কিছু অংশ আলোচ্য প্রতিবেদনে ব্যবহৃত হয়েছে। সম্পাদককে কৃতজ্ঞতা জানাই।

মন্দির নির্মাণে মেদিনীপুরের তাম্বুলী সম্প্রদায়ের ভূমিকা

চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী

মেদিনীপুরের তাম্বুলী সম্প্রদায় বলতে আমরা বিশেষত: মল্লিক, কর, পিরি, রক্ষিত, দে এদেরই দেখতে পাই। ঔপনিবেশিক আমলে এরা মেদিনীপুর শহর মধ্যবর্তী স্থানের অধিবাসী হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, তাম্বুলীদের বড় অংশ মল্লিকরা চন্দ্রকোণার মলিঘাট নামক স্থান থেকে এসেছিল, মল্লিকদের মুখেই শোনা যায় মলিঘাট ছেড়ে আসার কারণ। মূলত: মলিঘাটে মল্লিকদের বংশ এতই বিস্তারিত হয়েছিল, যে তাদের একাংশ ঐ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

বস্তুত:পক্ষে তাম্বুলী নামের বুৎপত্তি গত অর্থ এরা তাম্বুলের সঙ্গে সম্পর্কিত, অর্থাৎ পান, পান মশলা, খুলি চুন প্রভৃতিব ব্যবসাই ছিল এই শ্রেণীর জীবিকা অর্জনের পথ।

মেদিনীপুরের তাম্বুলীদের কথা বলতে গেলেই মূলত: মল্লিকদের কথাই বেশী বলতে হয়, কারণ পূর্ব থেকে তাম্বুলী সম্প্রদায়ের এই মল্লিকদের একচেটিয়া কৃতিত্ব দেখা যায়। এই মল্লিকদের পাশাপাশি অন্য তাম্বুলীদের কর্মের তেমন উল্লেখযোগ্য দিক নেই। ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম দিকে মেদিনীপুরের যে স্থানে তারা এখনও স্থায়ী বাসিন্দা সেখানে তারা এসেছিল।

বাংলার নিজস্ব শিল্প বলতে, সুতো, নুন, বিড়ি, বড়শি, প্রভৃতিকে বোঝায়। তবে ঔপনিবেশিক যুগরে মাঝামাঝি দিক থেকে বাংলার শিল্পের নানা দিকে বিশেষত: কুটির শিল্প ভিত্তিক কিছু মাত্রায় উন্নতি দেখা গিয়েছিল, যদিও বিদেশী হস্তক্ষেপের দরুণ তখন বাংলার যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে। তাম্বুলীরা পান, মশলা, চুন, সুতো, নুন, বিড়ি, বড়শি, ধান, চাল, তামাক এ সকলকে নিজেদের ব্যবসার অন্তভূর্ক্ত করে। ঔপনিবেশিক আমল শুরু হওয়ার অনেক দিন পরেও তাম্বুলীরা স্টিমার যোগে ব্যবসা কবত, শোনা যায়। এছাড়া অন্যভাবেও তাদের ব্যবসা কার্য চলত, একে কোনওভাবেই বাণিজ্য বলা যাবে না, এই ধরণের ক্রয় বিক্রয়ের প্রথাকে ব্যবসা বলাই সঙ্গত।

ঔপনিবেশিক আমলেই তাম্বুলীদের আর্থিক উন্নতি ঘটেছিল (মেদিনীপুরে)। আর্থিক উত্থানের পাশাপাশি তখন তাদের প্রয়োজন হয়েছিল, সমাজে ধর্মকেন্দ্রিক উত্তোরণের। তাই আর্থিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পরে পরেই, তারা তাদের সামাজিক অবস্থানকে তুলে ধরার জন্য ও নির্দিষ্ট করে নেওয়ার জন্য মূলত: নিজেদের সম্প্রদায় গত ঐতিহ্যকে লোক সমাজে বৃদ্ধি

করার জন্য ধর্মক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেছিল। ১৭৯৩ সালের পর থেকে মেদিনীপুরে বেশী মন্দির স্থাপনা হয়েছে, যার বেশীরভাগটাই তাম্বুলীদের অর্থে ও প্রচেষ্টায়। (ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে)

বাস্তবিকই মেদিনীপুর জেলার বিশেষত: শহরের ধর্মীয় ইতিহাসে তাম্বুলীদের একচেটিয়া অর্থদান (সাহায্য) ধর্মীয় প্রসঙ্গে তাদের যুক্ত থাকার প্রমাণও মিলেছে। শহরের বাইরেও অনেক মন্দিরে, মূর্তি নির্মাণে, প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনে এদের ভূমিকা ও আগ্রহের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এক কথায় সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্যই এদের এত প্রয়াস দেখা গিয়েছিল।

মেদিনীপুর একটি ঐতিহাসিক স্থান, তবে ধর্মীয় দিক দিয়েও এর গতি যথেষ্ট। একচেটিয়া বহু মন্দির এই শহরে বিদ্যমান, বিশেষভাবে ১৭৯৩ ও সমকালীন মন্দির গুলির মধ্যে পড়ে, বর্তমান মল্লিক চকের দূর্গা মন্দির, এই মন্দির মল্লিকদের জমিদার গৃহ সংলগ্ন। ঐ স্থানের সারি বদ্ধভাবে দ্বাদশ শিবের মন্দির, অর্থাৎ বারোটি শিব মন্দির, রাধাকান্তদেবের মন্দির, বর্তমান সুহাগঞ্জের জগন্নাথ মন্দির প্রভৃতি।

শোনা যায় এখানকার তাম্বুলীরা শহর ছাড়িয়ে দূরেও অনেক মন্দির পীঠ স্থানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত। যেমন তমলুকে বর্গভীমার মন্দির, গড়বেতার সিংহবাহিনী প্রভৃতি।

মন্দির রীতির বিশ্লেষণ মূলক ব্যাখ্যা করলে বলতে হয়, বাংলার নিজস্ব মৌলিক শিল্পরীতি বলতে, চালা মন্দির স্থাপত্য রীতির কথা উল্লেখ, চালা মন্দির রীতির থেকে আটচালা রীতির উদ্ভব যা বাংলার নিজস্ব রীতি এবং যার উৎপত্তি স্থল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে বলতে হয়। বাংলার খোড়ো চালাকে কেন্দ্র করে এর উদ্ভব হয়েছিল। তুর্কী স্থাপত্যের গম্বুজ রীতির সঙ্গেও এর যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সাধারণত: একথা বলা যায়, বাংলার মৌলিক চালা রীতি ও উড়িষ্যার রেখদেউল রীতির মিলিত রূপ হল রত্নমন্দির রীতি। মেদিনীপুরের তাম্বুলীদের মন্দির গুলিকে নির্দিষ্টভাবে রত্ন মন্দির বলা উচিত নয়। কেননা পুরোপুরি মন্দির গুলিতে রত্নরীতি অনুসৃত হয়নি। মন্দির সংলগ্ন জগমোহন বা নাটমন্দির রীতিও সব মন্দিরে সমানভাবে গৃহীত হয়নি, মন্দির গুলিতে সব মিলিয়ে কিছু মাত্রায় ভিন্ন প্রকৃতির মিশ্ররীতি গঠিত হয়। তবে রাধাকান্তদেবের মন্দিরে, জগন্নাথদেবের মন্দিরের গায়ে কুলুঙ্গী করে পোড়ামাটির ও চুন সুরকীর মূর্তি নির্মিত টাইল বসানো আছে।

মন্দির সংলগ্ন মন্দির ও মল্লিক বাড়ী যার বর্তমান নাম মল্লিকচক, এই স্থান তাম্বুলীদের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান, পুরোন দিন থেকেই এঁরা "বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ" বাংলার এই প্রবাদ রীতিকে মেনে আসছে। এখানের বাৎসরিক পূজা ও উৎসব সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠান মেদিনীপুরে বহুদিনের ঐতিহ্যমন্ডিত বিষয়। এই পূজা উৎসব অনুষ্ঠানের মূল ভূমিকা কিন্তু তাম্বুলীদের দূর্গাপূজা প্রতিবৎসর প্রতিপদ থেকে, শ্রীশ্রী চন্ডীমাতার আহ্বানের মধ্য দিয়ে, দশমী তিথি যাবৎ দশদিন ধরে, পূজানুষ্ঠান এবং এই পূজানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সারা দিন রাত্রি

ধরে চলত আরও নানা অনুষ্ঠান।

রাধাকান্ত দেবের পূজানুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল রাসযাত্রা, রথযাত্রা, দোল উৎসব। এই সকল পূজা অনুষ্ঠানের সঙ্গে আনুসঙ্গিক যে সকল অনুষ্ঠান পরিবেশিত হত, সেগুলি যথাক্রমে, গান, যাত্রাপালা বিশেষ করে স্বদেশী যাত্রা, বালক সঙ্গীত (পুরা সংস্কৃতি ভিত্তিক অনুষ্ঠান) হত। ঢাক, ঢোল, সানাই, কাঁসি, বাঁশি প্রভৃতি বাদ্য সহযোগে মন্ডপের গাম্ভীর্য বজায় থাকত। সেই উৎসব ও অনুষ্ঠানের আভিজাত্য ও মধুরতা ছিল উল্লেখের বিষয়।

রাস উৎসব চলাকালীন তিনদিন ধরে রাসমঞ্চে ঠাকুরের উত্থান সন্ধ্যাকালে হয়। বাজী পোড়ানো, দিনরাত্রি আসরে অনুষ্ঠান ও আসর ভরা লোক, কত গ্রাম থেকে মানুষজন এসে ভীড় জমাতো রাস্তাব দুইধাবে, মেলাব দোকানপাট ভরে যেত। আর্য অপেরা, নাট্যসংস্থা, চন্ডী অপেরা, ভান্ডারী অপেরা, নিউগণেশ অপেবা কলিকাতা থেকে এসে উৎসবে যাত্রাপালা গান করত। পুতুল নাচ এরও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সদাভারত অনুষ্ঠান রাসমঞ্চের সংলগ্ন আসরে চলত দিনরাত্রি। এই অনুষ্ঠান ছিল ছন্দযুক্ত সুবেলা শ্লোক সমষ্টি (ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ, বেদ, পুরাণ, বামায়ণ, মহাভারত ও বৈষ্ণব পদাবলী শাক্ত পদাবলী, মঙ্গলকাব্য এই শ্লোকের অংশে গীত হত) কমক হাতে চামর নিয়ে আসরের মধ্যস্থলে কাথকতী করতেন, দুঃখ-সুখ, হাসি-তামাশা-কান্না মিশ্রিত থাকত শ্লোক গুলিতে।

কীর্ত্তনীয়ার দল কীর্ত্তনের আসরে পদগান পরিবেশিত করে আসর মজাতো। অনুষ্ঠানের সব দিনই নহবৎখানায় নহবৎ সুর, পরিবেশ সজাগ রাখতো। এসবই তাম্বুলীদের ধর্ম চিন্তার পাশাপাশি, তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প মানসিকতাব বিশেষ পরিচয় বহন করে। ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাদের ভক্তিশ্রদ্ধাব দিকটি পরিস্ফুট করে।

সামাজিক অর্থ প্রতিপত্তি লাভের পর, তাম্বুলীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ দেখা যায়, সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়দেব, পাশাপাশি এরাও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল।

মূলত: তাম্বুলীদের বিষয়ে একটু বিশেষ দিকে আলোকপাতের প্রয়োজন আছে, তাম্বুলীদের মধ্যে থেকে মল্লিকরাই প্রথম সমাজে নিজেদের তুলে ধরেছিল। মল্লিকদের জমিদারী মেদিনীপুবের আঞ্চলিক ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্ব বলা যায়। চৌধুরী ফকির চাঁদ মল্লিক মেদিনীপুরের আদি বাসিন্দা, তাঁর পুত্র দাতারাম মল্লিক এবং ছাতারাম মল্লিকের পুত্র জন্মেঞ্জয় মল্লিকের সময়তেই মল্লিকদের তথা তাম্বুলীদের মন্দির নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা চোখে পড়ে। জন্মেঞ্জয় মল্লিক নামক জমিদার পুরুষটি যদিও শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাব পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ধার্মিক ছিলেন, দয়ালু ছিলেন, জ্ঞানী গুণী মানুষদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন, সর্বোপরি তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, তাঁরই বংশের অপর কোনও পুরুষের মধ্যে প্রকাশিত হয়নি। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য তাঁর মৃত্যুর পর থেকে মল্লিকদের পারিবারিক দ্বন্দ্ব প্রবল আকার নিতে শুরু করে। মূলত: মল্লিকদের মূল পদবী রক্ষিত, মল্লিক উপাধি তারা পেয়েছিল, মুসলমান শাষনের সময়, এরপরে ইংরেজদের কাছে তাঁরা চৌধুরী পদবী লাভ করে ও পরে তাদের নামের আগে চৌধুরী ও নামের পরে মল্লিক উপাধী ব্যবহার হতে থাকে, রক্ষিত পদবী প্রায় উহ্য হয়ে গেছে।

তাম্বুলীদের অন্যদের মধ্যে কর, পিরি এরাও উল্লেখযোগ্য, ব্যবসায় এরা আগাগোড়া যুক্ত ছিল, আর্থিক প্রতিপত্তি এদেরও বৃদ্ধি হয়েছিল তবে, এরা বিশেষ করে মল্লিকদের পাশাপাশিই হেঁটেছে, এবং মল্লিকরাই এদের সকলের থেকে এগিয়েছিল।

এই তাম্বুলী সম্প্রদায় আদৌ রক্ষণশীল নয়, বা সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতের মুখে এরা নিজেদের ভাবধারাকেও বদলে ফেলেছে অনেক। এমনকি তাম্বুলীদের বর্তমান উৎসব অনুষ্ঠানে অনেক পরিবর্তন এসেছে। যুক্তি, সমাজ, অর্থনীতি, মানসিকতার অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে তার প্রমাণ তাদের বর্তমান জীবন যাত্রা।

মল্লিকদের জমিদারীর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এদের জমিদারী প্রবলভাবে প্রসারিত হয়েছিল। সবং, মুন্ডমারী, পিংলা, করকাই (কর্কাই) বালিচক, পাঁচঘুরী, মহারাজপুর, মুন্সী পাটনা, দাসপুর, ঘাটাল, জকপুর, মাধপুর, খড়গপুর অর্থাৎ দিকে দিকে এদের জমিদারী প্রসারিত হয়েছিল, জমিদারীর আয় ছিল বড়মাপের, ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তরফে জমিদারী লীজ দেওয়া থাকায় বাৎসরিক আয় একটা ছিলই। দেবোত্তর ছিল উল্লেখ করার মতোই। পুবোন জমিদারী সূত্র ধরে গর্ভনমেন্ট এখনও বাৎসরিক এগারো হাজার টাকা দেন।

সব মিলিয়ে, একথা বলা যায় যে, মেদিনীপুবের শহব ও শহর পার্শ্বস্থ বহু মানুষের কাছেই এখানকার তাম্বুলী সম্প্রদায়-এর একটা উজ্জ্বল দিক রয়েছে। ধর্মসংক্রান্ত কাজ কর্মে এরা প্রবল উৎসাহী ছিল, বর্তমানে জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এদের ভূমিকা আগের মত নেই, তবে সেই অতীত সুনামকে এরা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তাম্বুলীদের ভাবমূর্তি এবং তাদেব ধর্ম চিন্তার দিকটিই এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

তাম্বুলীদের নিয়ে, এর আগে তেমন বিশেষভাবে আলোচনা কোথাও হয়নি, তবে তাম্বুলীদের নিয়ে আলোচনার ও এই বিষয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য তাম্বুলীদের বহু কথা নিয়ে আজ বিতর্কের সূচনা হয় এবং তথ্য প্রমাণের বিশেষ অভাব থাকায় হঠাৎ সিদ্ধান্তে আসা যায় না। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে, তাম্বুলীদের নিয়ে অনেক কিংবদন্তীও রয়েছে।

যাই হোক, পরিশেষে একথা বলা যায় যে; মন্দির নির্মানে মেদিনীপুরের তাম্বুলী সম্প্রদায়ের ভূমিকা ছিল একটি উল্লেখ করার মতোই বিষয়।

এই প্রবন্ধের মূলসূত্র বা উপাদানগুলি।

১। তাম্বুলীদের মৌখিক ইতিহাস - (সিতেশ মল্লিক, রোহিণী মল্লিক, মদন মোহন খাঁন, কালীপদ কর, ভবানী প্রসাদ মল্লিক, উমাপদ চক্রবর্ত্তী, দীপঙ্কর দাস, এ্যাডভোকেট) প্রমুখ ব্যক্তিদের মুখের ইতিহাস।

২। তাম্বুলীদের বার্ষিক সভা ও সাধারণ পত্রিকা

৩। জমিদার বাড়ীর তৈলচিত্র।

৪। ভগ্ন মন্দির ও ফলক

৫। কর্মকারদের বৈঠক।

৬। বাংলার ইতিহাস।

পৌন্ড্রক্ষত্রিয় বাসভূমি পরিবৃত্তিকরণ : গ্রাম বানেশ্বর চক, দোর (দুব্‌নান) পরগণা-একটি প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান

তেজোময় দাস

মেদিনীপুর জেলার তমলুক (তাম্রলিপ্ত) মহকুমাব পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত দুব্‌নান (Dumnan) পরগণা। বর্তমান হলদিয়া, সুতাহাটা প্রভৃতিস্থান এই পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুব্‌নান পরগণার আয়তন ছিল ৪৫,২৮২ একর অথবা ৭০.৭৫ বর্গমাইল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই পরগণা ৫০টি তালুকে এবং ২৫৮টি গ্রামের দ্বারা গঠিত হয়েছিল।[১]

বলা যায় প্রতিনিয়ত বিশ্বের সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক ঘটনা প্রবাহ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। যা বিবর্তনের পাতায় ইতিহাস রূপে সংগৃহীত হয়। এমনই এক বিবর্তিত ইতিহাস হল পৌন্ড্রক্ষত্রিয়দের বাসভূমি পরিবর্তন। প্রায় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষেরা তাদের বসবাস গড়ে তোলে নবসৃষ্ট দুব্‌নান পরগণার বানেশ্বর চকগ্রামে। সমসাময়িক দলিল ও অন্যান্য নথিপত্র হতে জানা যায় পৌন্ড্রক্ষত্রিয়রা জাতিতে ছিল বৈষ্ণব এদের পেশা ছিল চাষবাস।

দুব্‌নান পরগণার উদ্ভব এবং পরবর্তী পর্যায়ে নানা জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষের বসবাস এই দিকটি ইতিহাস রচনার নিরীখে অহসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে দেখা যায় ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই অঞ্চল সমুদ্রের গর্ভ থেকে মাথাতুলে দাঁড়াল। মাটি শক্ত হতে আরো প্রায় শতবর্ষ কেটে গেল। উল্লেখ্য সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় হতে এই অঞ্চলের কিয়দংশ বসবাসপোযোগী হয়ে ওঠে।[১]

বর্তমান বানেশ্বর চক গ্রামে বসবাসকারী পৌন্ড্রসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের প্রাচীন বা আদি বাসভূমি ছিল হাওড়া জেলার মন্ডলঘাট অঞ্চল। ১৭৯০ সাল নাগাদ নথিপত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে মন্ডলঘাট অঞ্চল প্রায়ই জলমগ্ন হত। পাশাপাশি অবস্থিত অন্যান্য পরগণার তুলনায় মন্ডলঘাট পরগণা ছিল যথেষ্ট নাবাল। ফল স্বরূপ বন্যা, শষ্যের ক্ষতি, বাসভূমির অনিশ্চয়তা প্রভৃতি ভীতি জনগণের মনে দানা বাঁধে। এছাড়া এই পরগণার জমিদাবী বর্ধমানের মহারাজা নিলামে উঠিয়ে দাম নীচু কবে দিয়েছিলেন।[৩] সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে অত্যধিক জলমগ্নতার কারণে এই অঞ্চলের তৎকালীন সময়ে বসবাসকারী পৌন্ড্রক্ষত্রিয় বাসভূমি পরিবৃত্তিকবনের ইচ্ছা মনে মনে পোষন করত।

প্রশ্ন থেকে যায় ঠিক কোন সময়ে মন্ডলঘাটের পৌন্ড্রক্ষত্রিয়রা তাদের বাসভূমি পরিবর্তন করে নবসৃষ্ট দুব্‌নান পরগণায় তাদের বাসভূমি গড়ে তোলে এবং সৃষ্টির (উদ্ভবের) প্রথম

অবস্থায় এই পরগণার পরিস্থিতি কি ছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় উদ্ভবের প্রথম অবস্থায় দুব্‌নান পরগণা ছিল হরকোচ, কেয়া, হেঁতাল, গরান, কেওড়া প্রভৃতি বৃক্ষাদি পরিপূর্ণ। মাটিতে গরমের সময় সাদাটে এক ধরণের আবরণ পড়ত অর্থাৎ মাটিতে লবণের পরিমাণ অধিক ছিল। এছাড়া নবোদ্ভূত এই ভূমিতে মাঝে মাঝে ছোট ছোট নালা ও খালের বেষ্টনী ছিল। বানেশ্বর চক গ্রামের সীমানা প্রান্ত থেকে প্রবাহিত "ঢোল সমুদ্রের খাল" ছিল বিখ্যাত। যা বর্তমান সময়েও অতীতের স্মৃতি বহন করে (পূর্ব থেকে পশ্চিম) প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বর্তমানে ঐ খাল দুটি গ্রামের সীমানা নির্ধারক। আরও জানা যায় রাজা যাদবরাম রায়চৌধুরী (মাজনা মুঠার জমিদার বা কিশোরনগর রাজবংশের রাজা) এর শাসনকালে দুব্‌নান পরগণার বানেশ্বর চক গ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা তাদের বাসস্থান গড়ে তোলে।[৪]

জানা যায় উদ্ভবকালে এই পরগণার উত্তর ও পূর্বদিক থেকে প্রবহমান ছিল রূপনারায়ণ-হুগলী নদী সেই সঙ্গে দক্ষিণে যুক্ত হয়েছিল হলদি নদী। অর্থাৎ তিনদিক নদীবেষ্টিত স্থলভূমি।[৫] যদিও নদী প্রবাহের এই ধারা এখনও অব্যাহত।

যাদব রায়চৌধুরী ১৭৪৫ সালে মাজনামুঠার জমিদারী লাভ করেন। মাজনামুঠা নামের অর্থ থেকে এই অঞ্চলের প্রাথমিক পরিবেশগত পরিস্থিতির কথা জানা যায়। মাজনা শব্দের অর্থ হাজা-মজা আর মুঠা শব্দের অর্থ স্থান বিশেষ। মাজনামুঠার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত যে পরগণাগুলি ছিল সেগুলি হল—মাজনামুঠা, দুব্‌নান, নাড়ুয়ামুঠা, কশবাহিজলী, হড়িঞ্চি, হাসিয়াবাদ, নয়াবাদ (দেবমুঠা), শরীফাবাদ, আমিরাবাদ, বালিজোড়া, পটাশপুর, কিসমৎ-শীপুর।[৬]

দেখা যায় যাদব রায়চৌধুরী, এঁর উপাধি রায়চৌধুরী হলেও পূর্বপুরুষ উড়িয়া ছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাই এদের প্রাক্তন পদবী পট্টনায়ক থেকে। ঈশ্বরী পট্টনায়ক ছিলেন এই বংশের আদি পুরুষ। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরী পট্টনায়ক মাজনামুঠা জমিদারের ভিত্তি স্থাপন করেন।[৭] এঁরা ছিলেন মধ্য শ্রেণীর কায়স্থ। "তদানীন্তন হিজলীর রাজা মছলন্দী বা তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার দেওয়ান ছিলেন ভীমসেন মহাপাত্র। ঈশ্বরী পট্টনায়ক ছিলেন ভীমসেনের কর্মচারী। ভীমসেনের মৃত্যুর পর ঈশ্বরী স্বীয় দক্ষতাগুণে রাজ সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করেন। মসনদ-ই-আলার পুত্র ও জামাতা পরলোক গমন করলে ঈশ্বরী তৎকালীন সুবেদারের কাছ থেকে সনদ পেয়ে মাজনামুঠা রাজবংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। এঁদের প্রতিষ্ঠিত ৺শ্রীশ্রী কিশোর জিউর মন্দিরের বিগ্রহের নামানুসারে কিশোর নগর এই নামকরণ হয়।"[৮]

মাজনামুঠা প্রথমে ছিল স্বাধীন উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মারাঠা নেতা ভাস্কর পন্ডিতের মৃত্যুর পর (হত্যাকান্ডে ভীত হয়ে) মারাঠারা বাংলা ও উড়িষ্যা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলে ও চতুর্থ মারাঠা আক্রমণে উড়িষ্যা মারাঠাদের করায়ত্ত হল। নবাব আলিবর্দী খাঁ বাংলার সীমানা মেদিনীপুর পর্যন্ত করলেন যা পূর্বে উড়িষ্যা পর্যন্ত বহাল ছিল। যাদবরামের নাবালক অবস্থায় তাহার পিতামহ দ্বারকানাথের ভ্রাতুঃস্পুত্র (রাজকিশোরের পুত্র) ভূপতিচরণ এর চক্রান্তে যাদবরাম পৈত্রিক সম্পত্তিচ্যুত হন। যাদবরাম তৎকালীন পরিস্থিতির সুরাহা করার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদে গিয়ে সবকিছু নিবেদন করেছিলেন। নবাব তাঁর অধ্যবসায়,

বিনয় ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাঁকে "রাজা" উপাধি দিয়ে মাজনামুঠায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।[৯] অতঃপর মেদিনীপুর ইংরেজ কোম্পানীকে হস্তান্তর করা হয় ১৭৬০ সালে। যাদবরাম হিজলীর লবণ মহলের ইজারাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এইভাবে লবণ ব্যবসায়ের ইজারাদার, জমিদারী প্রভৃতি উৎস হতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন রাজা যাদবরাম। তা সত্ত্বেও দেবতা ও ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল বলে জানা যায়। বিভিন্ন সমসাময়িক গ্রন্থ হতে জানা যায় তিনি প্রতিদিন পর্যাপ্ত দান না করে জল গ্রহণ করতেন না। তাঁর দানের খ্যাতি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে সুদূর কাশী, গঞ্জাম, পুরী, কটক, নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, হালিশহর প্রভৃতি স্থানের বহু ব্রাহ্মণগণ রাজা যাদবরামের কাছ হতে নিস্কর ভূসম্পত্তি পেতে থাকেন।[১০]

রাজা যাদব রায়চৌধুরী তাহার মাজনামুঠা জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত বিরল জনবসতি এলাকা দুব্‌নান পরগণায় প্রজা বসানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বিনা করে জনগণের বাসস্থান স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রাচীন কাহিনী উল্লেখ করে বলা যেতে পারে চণ্ডীমঙ্গলে রাজা কালকেতু যেমন নূতন রাজ্য স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছিলেন সেইরূপ রাজা যাদবরামের দুব্‌নান পরগণায় প্রজা বসানোর দিক্‌টি অনেকখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আগত জনগণ জঙ্গল কেটে দুব্‌নান পরগণায় বসবাস যোগ্য ও চাষবাসের জমি স্থাপন করেছিলেন। এই সময়েই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বানেশ্বর চক গ্রামে তাদের বসতি স্থাপন করেছিলেন।[১১] কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রশ্ন থেকে যায় ঠিক কোন সময়ে পৌণ্ড্র সম্প্রদায় ভুক্তমানুষেরা বসবাস স্থাপন করে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে যাদবরাম রায়চৌধুরী দুব্‌নান পরগণা বাসযোগ্য ও চাষযোগ্য এলাকা করেই ব্রাহ্মণদের উক্ত ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন। ভাটপাড়া ওহালি শহরের ব্রাহ্মণরাই দান সম্পত্তি হিসাবে দুব্‌নান পরগণার বিভিন্ন স্থান গ্রহণ করেছিলেন। আবার মুর্শিদাবাদের তৎকালীন নবাব মিরজাফর রাজা যাদবরামকে দান করার প্রবণতা থেকে বিরত করার জন্য কঠোর শাস্তি প্রদানও করেছিলেন।[১২] সুতরাং বলা যায় ১৭৪৫-৫৯ খ্রী: এর কোন এক সময়ে বানেশ্বর চকগ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বসতি স্থাপন করে। অতঃপর রাজা যাদবরাম ঐ বিরল জনবসতি এলাকা দুব্‌নান পরগণার বিভিন্ন স্থান ব্রাহ্মণদের দান করেন।

ফলতঃ উপকূলবর্তী উড়িষ্যার বৈষ্ণব প্রভাব রাজা যাদব রামের উপর পড়েছিল বলে অনুমান করা হয়। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মল্লভূমের জমিদারদের প্রভাবে গৌড়িয় বৈষ্ণব চর্চার ক্ষেত্রভূমিও তৈরী হয়েছিল। উল্লেখ্য হালিশহর ও ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণগণ তাদের প্রাপ্ত দান সম্পত্তি দুব্‌নান পরগণা থেকে যথারীতি খাজনা আদায় করতেন। খাজনা হিসাবে উল্লেখ করা যায় তৎকালীন সময়ে এক বিঘা (২০ কাঠা বা ৪৬ ডেঃ) জমি চাষ করার জন্য চার মণ ধান রাজস্ব বা খাজনা হিসাবে দিতে হত। অর্থমূল্যে ২০ মান বা ৪ মণ ধানের দাম ছিল মাত্র ২ টাকা। অধিকাংশ জনগণ খাজনা হিসাবে অর্থের পবিবর্তে ধান বিনিময় করতেন। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে ধান নেওয়াও যথেষ্ট দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ প্রথমত: খাজনা স্বরূপ ধান বহন করে সুদূর হালিশহর ও ভাটপাড়াতে বহন করে নিয়ে যাওয়া যথেষ্ট ব্যয়বহুল ছিল।

দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণদের ধান ক্রয় করার জন্য দুব্নান পরগণায় ক্রেতাও অধিক সংখ্যক ছিল না।[১৩]

১৭৮৮ এর বাজে জমিন রেগুলেশনের ফলে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ও লাখেরাজ বা রাজস্ব অদেয় জমি রাজস্ব দেয় জমিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ ১৭৮৮ সালের পর হতে ইংরেজ কোম্পানী উক্ত পরগণার জনগণের উপর বাড়তি করের বোঝা চাপিয়ে দেয়। অপরদিকে ব্রাহ্মণেরাও তাদের খাজনার দাবী নাকচ করতে নারাজ ছিলেন।

নৃতত্ত্ববিদ্ গোপাল চক্রবর্তীর মতে[১৪] প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এলাকার মানুষদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। ব্রাহ্মণেরা স্থানীয় মানুষদের যথেষ্ট বিশ্বাস করতেন। ফল স্বরূপ অনেক সময় স্থানীয় ঐ পরগণার মানুষেরা নিজেদের খাজনা (যা ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি থেকে ব্রাহ্মণদেব প্রাপ্য) নদীপথে নৌকাযোগে ব্রাহ্মণদের নিকটে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে স্থানীয় মানুষেরা ব্রাহ্মণদের বিশ্বস্ততার সুযোগে শষ্যের ক্ষতি,.(খরা, জলাভূমিতে অত্যধিক জল চাপ) ইত্যাদি নানান অজুহাতে খাজনা হ্রাস বা ফাঁকি দিতে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে দুরাবস্থিত হালিশহরে যজন-যাজনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের পক্ষে মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত প্রান্তে চাষের নজরদারী করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া যে জমি খোস্বায় বা খয়রাৎ কিংবা ইনাম হিসাবে পাওয়া সেই জমির জন্য ইংরেজ কোম্পানীকে রাজস্ব দেওয়ার দিক্টা তাদের (ব্রাহ্মণদের) কাছে অলাভজনকই মনে হয়েছিল। এমতাবস্থায় উক্ত জমির কিংয়দংশ রক্ষণাবেক্ষণকারী পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় পবিবারগুলোকে চাষের অধিকার দিয়ে ব্রাহ্মণেরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। কালক্রমে ঐ জমির উপর থেকে ব্রাহ্মণদের লাগাম ক্রমশ: দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৮৮৫ এর Survey Settlement অনুসারে উক্ত জমি উল্লেখিত পৌন্ড্রক্ষত্রিয়দের সত্তাধিকারী আসে বলে মনে করা হয়।

আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় এই প্রবন্ধে উল্লেখিত পৌন্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতি-বৈষ্ণব পেশা চাষ হলেও এরা কিন্তু নিজেদের ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সম্মানের অধিকারী বলে মনে করত। এদের কিছু অংশ দুব্নান পরগণায় ভূস্বামী ও জমিদার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বানেশ্বরচক গ্রামে জমিদার সমতুল্য মানুষ ছাড়াও বাকীরা চাষবাস, নৌ-চালানোর কাজ ও বিভিন্ন ব্যবসায়ের কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। রিস্লে (H.H. Risley) তাঁর গ্রন্থে[১৫] এদেরকে চাষী, জেলে, ঘরামী, স্বর্ণকার, লৌহকার, ইত্যাদি জীবিকার মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই গ্রামের পৌন্ড্রক্ষত্রিয়দের একমাত্র চাষ ছাড়া বাকী পেশাগুলোর (জেলে, ঘরামী, স্বর্ণকার, লৌহকার) ঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই ভিন্ন জীবিকার কর্মসূমহকে এঁরা সম্মান হানিকর বা নিন্দনীয় বলে মনে করত।

এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে জাতি বৈষ্ণব এবং পেশা চাষ কিন্তু আমরা জানতে পারি যে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা থেকে গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষে জাতিতে বৈষ্ণব হয়ে চাষ করা ছিল ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। এখানে কৃষক সত্তার সঙ্গে গৌড়িয় বৈষ্ণবসত্তার দ্বন্দ্বও লক্ষ্যণীয়। বানেশ্বর চক গ্রামের পৌন্ড্রক্ষত্রিয়দের লাঙ্গল ধরাকে নিয়েও যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি এমন নয়। এদের পদবীর দিক্টি আলোচনা করলে দেখা যায় বেশ কিছু মানুষ তাদের

মূল দাস অধিকারী পদবী থেকে অধিকারী কথাটি লুপ্ত করে শুধুমাত্র দাস পদবীতেই সন্তুষ্ট থেকেছে। এক্ষেত্রে অধিকারী কথাটি বাদ দেওয়ার কারণ হল লাঙ্গল ধরাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে অর্ন্তকলহ। সমসাময়িক দলিল ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা যায় পিতা ও পুত্রের পদবী যথাক্রমে দাস অধিকারী ও শুধুমাত্র দাস। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ পদবী[১৬] পন্ডিতদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু ভাবনার দিকটি জাগ্রত করে তোলে।

উল্লেখ পঞ্জী

১। Statistical Account of Midnapore : W.W. Hunter; (Vol-3. Part-I) Page No-194

২। স্বাধীনতা সংগ্রামে সুতাহাটা-বঙ্কিম ব্রহ্মচারী (প্রথম খন্ড) পৃষ্ঠা নং-২

৩। Land Market in Eastern India (I.S H.R): Binay Choudhiry.

৪। বয়বৃদ্ধদের সহিত কথোপকথন (প্রাণকৃষ্ণ দাস, বয়স - ৭৮, গ্রাম বানেশ্বরচক, আলোচনা - ২৬/১১/৯৮ এবং ২২/১২/৯৮; নিবঞ্জন পরামাণিক, বয়স ৬৬, গ্রাম বানেশ্বরচক আলোচনা ৪/১২/৯৮। পুলিন বিহারী দাস, বয়স-৭২, গ্রাম বানেশ্বরচক, আলোচনা ১৭/১২/৯৮। গণেশ চন্দ্র পাত্র, বয়স ৯৩, গ্রাম গোলাপ চক, আলোচনা ৯/১/৯৯)

৫। Bengal Gazeeteers - Midnapore : L.S.S. Omalley (1911) Page No. 7.

৬। ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত: প্রবোধ চন্দ্র বসু (প্রবুদ্ধ) পৃ: ৬৯ Grants Analysis, Farminger Page No. 365-366

৭। মেদিনীপুর: তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ: ১৯৫

৮। ভগবানপুব থানার ইতিবৃত্ত: প্রবোধচন্দ্র বসু (প্রবুদ্ধ) পৃ: ১৯৫

৯। ঐ পৃ: ৭২

১০। হিজলীব মসনদ-ই-আলাঃ মহেন্দ্রনাথ করন

১১। বয়ঃবৃদ্ধদের সহিত কথোপকথন

১২। ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত পৃ: ৭৫-৭৬

১৩। বয়:বৃদ্ধদের সহিত কথোপকথন

১৪। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ: গোপাল চক্রবর্তী, অধ্যাপক নৃতত্ত্ব বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর

১৫। The Tribes & Caste of Bengal (Vol. 2): H.H. Risley, (1891)

১৬। সমসাময়িক দলিল।

মেদিনীপুরের ডোম সম্প্রদায়ের বিবর্তন

শ্যামাপদ ভৌমিক

ডোম বা ডোম্ব শব্দ খুব পুরাতন নয়। ষষ্ঠ শতকের পূর্বে, এমনকি অমরকোষের শূদ্রবর্গেও ডোম জাতিব নাম নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরানে ডমঃ বলে একটি জাতেব নাম পাওয়া যায়-যা বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ। আবার মৎস্যসূক্তন্ত্রের ৪৯ পটলে ডোমদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে ডোম, চন্ডাল এবং ঘোষককে (সম্ভবতঃ বাজানিয়া ডোম বা ঢাকী) একস্তরে ধরা হয়েছে। যেমন-

'চন্ডালশ্চৈব ডোমশ্চ জ্ঞানকশ্চ-তথা ইতি
দন্ডীরশ্চৈব ভন্ডীরো ভৃষুন্ডশ্চ বৃথাশ্রমী'॥[১]

নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে ডোমদের উৎস নিয়ে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ মনে করেন-ডোমরা কোলগোষ্ঠীর। আবার অনেকের মতে ডোমরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর। এক্ষেত্রে ড্যাল্টনের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে ডোমবা কোলগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তারা দ্রাবিড়দের মত উত্তর-পশ্চিমাংশ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে নি, করেছে ভারতের উত্তর-পূর্বাংশ দিয়ে।[২] রিজলের অভিমত ড্যাল্টনের ঠিক উল্টো। তিনি মনে করেন, ডোমরা শূদ্রশ্রেণীভুক্ত ছিল। আর ইন্দো-এরিয়ান ট্রাডিশানের শূদ্ররা এক সময় মৌলিকভাবে (Originally) দ্রাবিড় জাতি গোষ্ঠীভুক্ত ছিল।[৩] তারা যে গোষ্ঠীরই হোক-চর্যাপদে তফসিল জাতি হিসাবে ডোমেদের স্থান সর্বাগ্রে। ডোম জাতি উল্লেখ আছে চর্যাপদের ১০,১৪,১৮,১৯ ও ৪৭ সংখ্যক পদে। একাদশ শতকে রচিত কলহনের 'রাজ তরঙ্গিনী' ও অষ্টাদশ শতকের ধর্মপূজা পদ্ধতিতে ডোমেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। আরও উল্লেখ পাওয়া যায় দ্বিজমাধবের চন্ডীমঙ্গলে। প্রাচীনকালে ডোমদের অবস্থান মূলতঃ বাংলা, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সমূহে সীমাবদ্ধ ছিল। আজ ভারতের বহু জায়গায় এই আধা যাযাবর জাতি ছড়িয়ে পড়েছে কয়েকটি শাখা উপশাখায় বিভক্ত হয়ে। ডোমেদের একটি শাখা মগইয়া (Magaiya) নামে পরিচিত। এরা একসময় স্বভাবজাত চোর বা সিঁদেল চোর ছিল। এদের আর একটি সম্প্রদায় যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে মোটামুটি স্থায়ীভাবে গ্রামে বা শহরের প্রান্তে বসবাস শুরু করে।[৪] যুগের প্রবাহে এই আধা-যাযাবর আদিবাসীর যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে, তা সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রের কাছেই চিত্তাকর্ষক।

ডোমেরা কিছুকাল আগে পর্যন্ত সমাজে একেবারে অস্পৃশ্য ছিল। থাকতো শহরের বাইরে। দিনের বেলায় প্রাচীনকালে সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষেরা তাদের ছোঁয়া এড়িয়ে চলতো। হঠাৎ

ছোঁয়ায়, নানান সামাজিক আচার করে শুদ্ধ হতো। অথচ এই সব উচ্চবর্ণের মানুষদের অনেকেই, এমনকি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরাও তাদের দেহসঙ্গ লাভের জন্য রাতের আঁধারে ডোম্বীনিদের কুঁড়ে ঘরে যেতো। ডোম্বীনিরা তাদের দেহদান করে আনন্দ দিত। এর জন্য ডোম্বীনিদের বিশেষ আর্থিক লাভ যে হতো তা নয়। এটিকে তারা তাদের সামাজিক কর্তব্যের অন্যতম অঙ্গ বলে মনে করতো। শুধু তাই নয়, তান্ত্রিক কাপালিকদের তন্ত্রসাধনায় সঙ্গদান করে সহজিয়া সাধনতন্ত্রের সহায়ক হতো। এই প্রসঙ্গে চর্যাপদের ১০ সংখ্যক পদের একটি অনুবাদ উল্লেখযোগ্য—

> "আরে ডোম্বি, নগরের প্রান্তে তোর কুঁড়ে
> আর নিয়মিত আলিঙ্গন করিস নেড়া ব্রাহ্মণকে
> হ্যাঁরে ডোম্বী আমিও তোর সহসঙ্গ করব,
> কারণ আমি কাহ্নপাদ তান্ত্রিক কাপালিক-উলঙ্গ হয়েই আছি।"[৫]

পদকর্তা কৃষ্ণাচার্য ডোম্বীর দুটি স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। ডোম্বীনিরা বদ্ধ ও মুক্ত এই দু-জাতীয় লোক নিয়ে লীলা করে। সমাজের কেউ কেউ যেমন তাকে কটু কথা বলে-তেমনি আবার কেউ কেউ তাকে সর্বদাই কন্ঠলগ্ন করে রাখে। ডোম্বীনি যেমন কর্মকুশলা, তেমনি তার থেকে অধিকতর দুষ্টা রমনী এককালে সমাজে ছিল না।[৬] বর্তমানে ডোম্বীনিদের সামাজিক অবস্থান বদলেছে। এই পেশা সমাজে আজ স্বীকৃত নয়। মেয়েদের মধ্যে, আংশিক হলেও, প্রাথমিক শিক্ষার প্রবেশ ঘটেছে। ছেলেদের অবস্থাও তথৈবচ। ১৯৬২ সালে সারা পশ্চিমবাংলায় মাত্র ৫৩০ জন ডোম সম্প্রদায়ের ছাত্র বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছে।[৭] যে সমস্ত ডোম অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে সমীক্ষা চালানো হয়েছে তাতে দেখা গেছে কয়েকজন মাত্র মাধ্যমিক পাশ করেছে। সরকারের বিভিন্ন রকম আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার যথাযথ বিস্তার না হওয়ার কারণ আছে। এক, শিক্ষালাভের জন্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের কোথায় কি সুযোগ রয়েছে তার সন্ধান অনেক ডোম সম্প্রদায়ের মানুষ জানে না। দুই, চরম দারিদ্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছেলে মেয়েদের কোন না কোন কাজে লাগিয়ে দেয়। তিন, ডোম সম্প্রদায়ের অনেক মানুষের আজও ধারণা উচ্চ-শিক্ষা, চাকরি-বাকরি তাদের জন্য নয়, ও সব 'বাবু'দের জন্য।[৮]

মেদিনীপুর জেলার ডোমদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। সমাজে পুরুষের প্রাধান্য বেশি হলেও নারীরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিছুটা ভোগ করে। তবে শহরে বসবাসকারী ডোম মহিলারা বেশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। অনেক পরিবারে লক্ষ্য করা গেছে-মেয়েদের উপার্জ্জনেই সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণ চলে। পুরুষ সদস্যরা তাদের অর্জিত অর্থের অনেকটাই নেশা ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করে। বর্তমানে সামাজিক মেলামেশায় মেদিনীপুর জেলার কোথাও কোথাও ডোম সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দৈহিক শৈথিল্য কিছুটা দেখা দেয় ঠিকই, কিন্তু তাতে তেমন দোষের কিছু নয়, সমাজে তা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ডোমেদের বিচিত্র সব পেশা ছিল। আজও আছে। তারা যুগ যুগ ধরে বাঁশ ও বেতের কাজ করে আসছে। শুধু তাই নয়, বস্ত্রশিল্পেও তারা পারদর্শী ছিল। চর্য্যাপদে

পাওয়া যায়-

'আরে ডোম্বি তুই তাঁত বিক্রয় করিস, চাঙ্গেড়া বিক্রয় করিস
তোর পাশে এসে আমি নাচের পোশাক ছেড়ে ফেলি '।[৯]

বর্তমানে মেদিনীপুরের কোন ডোম পাড়ায় বা গ্রামে তাঁতের কাজ চলে না। তারা কি কারণে পেশাটিকে পরিত্যাগ করেছে তা বোঝা যায় না। অনেক ডোম সম্প্রদায়ের মানুষই জানে না যে তাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁতের কাজ করতো। তবে চাঙ্গেড়া ইত্যাদি বানানোকে তারা আজও তাদের অন্যতম মূল পেশ হিসাবে রেখেছে। কোথাও কোথাও তারা খেজুর পাতার চাটা এবং মাদুর তৈরী করে।[১০] তারা বাঁশ ও বেতের সাহায্যে আজও ঘরের কাজের বা অলংকরণের জিনিসপত্র বানায়। যেমন-ঝুড়ি, কুলা, সাজি, পাখা, টোকা (গ্রামে চাল ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়), চাঁচ, জালা রিক্সার হুড, মুটে মজুরের ঝাঁকা বা গুনচিহ্ন (x) আকারের চানাওয়ালার টুকরী। প্লাস্টিকের জিনিসপত্রের দৌরাত্মে তাদের সযত্নে রক্ষিত বহুদিনের কুটীর শিল্পটি আজ প্রায় ধ্বংসের মুখে। শিল্পটির যেটুকু আজও টিকে আছে তা দু-একটি জেদী ও ধৈর্য্যবান শিল্পীর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়াসে। অথচ এই কাজ ও শিল্পটিই ডোমেদের আদি পেশা (original profession) এবং এই পেশায় অধিক নিযুক্ত হোতো ডোম মহিলারা। আজ পুরুষ ও মহিলা উভয়েই এই কাজ করে।

পূর্বে ডোমেদের অন্যতম পেশা ছিল মাছের কারবার করা। পুরুষরা মাছ ধরতো। আর মেয়েরা তা বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতো। অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব ছিল যৌথ। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল থেকে জানতে পারি-

'মাছোনি বসিছে মৎস্যের পসার লইয়া কোলে।
পসার হোন্তে মৎস ভাঁড়ু বাছি বাছি তোলে
মৎসধরি ডোমনীয়ে করে টানাটানি।
কড়ি না দিয়া মৈছ্য লৈয়া যাও কেনি।
ভাঁড়ু দত্ত বোলে ডোমনী বলিরে তোমারে।
এথকাল মৎস বেচ কর দেয় কারে।
ডোমনীয়ে বোলে ভাঁড়ু তুই তার কে।
করের লাগি ধরিবেক জোয়াতি হয় যে। (ভাঁড়ু দত্তে বেসাতি)

হাটে জিনিস বিক্রির জন্য কর দেওয়ার রীতি বহুদিনের। বাজারে যে তাদের উপর জুলুম চলতো তা বেশ বোঝা যায়। আজকাল মেদিনীপুর জেলার ডোমদের মধ্যে মাছ বিক্রি পেশা নেই বল্লেই চলে। মাছ চাষ ও ব্যবসা বর্তমানে আর বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দীঘার সমুদ্রে মাছ ধরা ও ব্যবসায়ে উচ্চবর্ণের মানুষও নিযুক্ত।

প্রাচীন কাল থেকেই ডোমেদের অন্যতম পেশা উৎসব আনন্দে বাজনা বাজানো। যারা বাজনা বাজায় তারা 'বাজানিয়া ডোম' নামে সমাজে পরিচিত।[১২] ডোম-নারীরা কেবল তাদের স্বজাতির বিবাহে উৎসবে নাচগান করে থাকে। অন্যজাতির উৎসব আনন্দে ডোমনারীরা অংশগ্রহণ করাকে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও হাস্যকর বিবেচনা করে।[১৩] উপজাতিদের বাদ্যসঙ্গীত

আজও সমাজে বিশেষ স্থান লাভ করে আছে। স্বল্প সময়ের জন্য কাজের খোঁজে অন্যত্র কোথাও গেলে তারা আজও বাঁশি, মাদল, প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে যায়। সারা দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যে বেলায় তাদের অস্থায়ী অস্বাস্থ্যকর কুঁড়ে ঘরটি বাঁশি মাদলের তালে তালে সঙ্গীত মুখর হয়ে ওঠে। ড: সুহৃদকুমার ভৌমিক মহাশয় মনে করেন ডুম ডুম করে বাজনা বাজানো থেকেই 'ডোম' শব্দের উৎপত্তি। ডোম শব্দটি ধন্যাত্মক।[১৪] বর্তমানেও অনেক ডোম ঢাক, ঢোল, সানাই বাজানোয় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে যেমন-সানাইবাদক হিসাবে একসময় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল খড়গপুব শহব সংলগ্ন ডোমপাড়ার ওস্তাদ রমানাথ মাদুলী। বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে একসময় ডোমেবা নাচে গানেও বিশেষ পটু ছিল। কেউ কেউ মনে করেন-অধুনা কালের ধাঙ্গড় নাচটিই ডোমনাচের ঐতিহ্যবাহী। সাঁওতালদের বিবাহে আজও ডোমেদের নাচ গান বাজনার বিশেষ স্থান আছে। তবে ডোমেদের এই শৈল্পিক সত্ত্বাটি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে আধুনিক আমোদ প্রমোদের করালগ্রাসে। আজকাল ডোম বিবাহ-বাসরে তাদের নিজস্ব গান বাজনার বদলে সারা রাত ধরে ভি.ডি.ও চলে। নিম্নমানের দৃশ্য দেখতে অনেকে ভালোবাসে। কারণ-তারা বাবু সমাজের উলঙ্গ দৈনিক জীবন দেখে মজা পায় ও হাসে।

মেদিনীপুরের একটি বিশাল অঞ্চল জঙ্গলমহল নামে পরিচিত ছিল। ঐসব এলাকার অধিকাংশ জমিদাবের অধীনে ডোমরাই ছিল লেঠেল, বরকন্দাজ, কাহার, ঢালি অথবা বিশ্বস্ত অনুচর। এরা যে ঢাল আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার করতো তা বেত দিয়া তৈরী হত এবং বানাতো তারা নিজেবাই। এই থেকেই সম্ভবত: লড়াকু ডোম জাতি বেত-বাঁশের শিল্পকর্মে অনুপ্রবেশের দরজা খুঁজে পেয়েছিল। ডোমরা একদা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য সমাজে বিশেষ সমাদৃত হতো। মানিকচন্দ্র রাজার গানে উল্লেখ আছে যে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মাতা রাজাকে (পুত্রকে) এক হাড়ি জাতীয় গুরুব কাছে দীক্ষা ও শিক্ষা নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। একটি বহু প্রচলিত পুবানো ছড়া থেকে ডোমদের সমরকৌশলের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম ঘোড়াডোম সাজে
ঢাক ঝাঁঝর মাদল বাজে
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি'-ইত্যাদি

জমিদারী প্রথা উঠে যাওয়াব সাথে সাথেই ডোমেদের এই পেশাটিও উঠে যায়। তাদের অধিকাংশই পেশা হিসেবে বেছে নেয় কৃষিকাজকে। বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার শতকরা পঞ্চাশভাগেরও বেশি ডোম কৃষিকাজ করে। তবে বহুদিন তারা ছিল ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক, প্রধানত: ক্ষেত মজুরের কাজে লিপ্ত। বামফ্রন্টেব আমলে ভূমি সংস্কারের ফলে তাদের বসবাসের জমিটিতে পাট্টা হয়েছে। চাষের জন্য লাভ করেছে কিছু খাস জমি। ভাগ চাষও তারা করে। তবে প্রাপ্ত জমিটুকুর আয় দিয়ে তাদের সমবৎসর ভরণপোষণ চলে না। তাই অন্নসংস্থানের জন্য তাদের বেছে নিতে হয়েছে অন্যকাজ। যেমন-দিন মজুরী খাটা, পাহারাদাবের কাজ করা, ছোটখাট ব্যবসা চালান, রিক্সা চালান, দরজির কাজ করা, নগরের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা, মৃতদেহ সৎকার করা প্রভৃতি।[১৫] কোন কোন ডোম ঘাতকের কাজও কবতো। বর্তমানে

থানায় বা হাসপাতালে পোষ্টমর্টেমের জন্য লাশ নিয়ে যাবে কে ? ডোম। হাসপাতালে শরীর ব্যবচ্ছেদে সাহায্য করবে কে ? শহরের নোংরা পরিষ্কার করবে কে? -সবই ডোম। সমাজের যত ঘৃন্য ও নিকৃষ্টতম কাজগুলি ডোমদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হতো। হিন্দুসমাজের বর্ণ শ্রেষ্ঠদের তাদের প্রতি অবিচার কয়েক বছর আগে পর্যন্তও চলেছে এই কারণেই E.T. Daltton মন্তব্য করেছেন, I do not doubt that the Aryans had their helots, and I consider that we have in the really servile castes "the Chandlas, the lowest of men', Pariahs, Doms, and others, the people to whom, from the time immemorial, the vilest offices have been assigned, and who so seldom rise from their abject condition, The descendants of those very helots; but I find no reason for the assertion that the progenitors of the modern Sudras were helots"[১৬]

ডোম সম্প্রদায়ের মানুষেরা এক সময় নৌ-চলাচলের সাথে যুক্ত ছিল। চর্যাপদের দশম সংখ্যক পদে দেখা যায় —

"হাঁ লো ডোম্বি এখন তোকে ভালভাবেই জিজ্ঞেস করি -
তুই কার নৌকায় যাওয়া আসা করিস"[১৭]

আবাব অনেক সময় ডোমসম্প্রদায় নৌ-বাহনের মাধ্যমে সমাজ সেবা কবত নিঃস্বার্থভাবে। যাত্রীদের কাছ থেকে নৌ-পারাপারের জন্য কোন পয়সা বা বিনিময় সেবা গ্রহন করতো না।[১৮]

বর্তমানে মেদিনীপুরে নৌচলাচলের ব্যবস্থা নেই বল্লেই চলে। আর যেটুকু আছে তা মূলতঃ মাঝি সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই পেশাটি ডোমগন কেন পরিত্যাগ কবেছে তা বলা কঠিন। তবে আসাম উপত্যকায় আজও কিছু ডোমকে ধীবর ও নৌ চালকের ভূমিকায় দেখা যায়।

ডোমেদেব মধ্যে স্ববর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহ চলতো। তবে অসবর্ণ বিবাহেরই আধিক্য ছিল। তাদের মধ্যে গোত্র ও 'টোটেম' উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। মেদিনীপুরের ডোমদের বর্তমান গোত্র হল সান্ডেল্য (শোল মাছ খায় না), ময়ূর চাঁদ (চাঁদা মাছ খায় না) প্রভৃতি। বহুকাল ধরে ডোমদের মধ্যে স্ববর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহ চালু চিল। তাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বহু বিবাহ করে। বিবাহের পূর্বে প্রাচীন প্রথামত কিছু কন্যাপণ দিতে হয়। তারপর কন্যার বাড়ি থেকে বরকে নগদ টাকা ও ঘড়ি, সাইকেল, ইত্যাদি উপহার দেওয়া হয়।

মেদিনীপুরে ডোমদের বিবাহের রীতি নীতি সর্বত্র এক নয়। তবে আজকাল অধিকাংশ জায়গায় হিন্দু সমাজের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে কোন কোন অঞ্চল তাদে সাবেক রীতি বজায় রেখেছে। যেমন-বিয়ের অনুষ্ঠানের পূর্বে পাঁচজন সধবা মহিলা সাদা আলতা পাড় শাড়ী পরে তিনটি কলসী ও শাঁখ নিয়ে পুকুর ঘাটে যায় এবং পরস্পর ছোঁয়াছুয়ি করে জলভরে ঘরে আসে। একটি শিলের চারধার চারটি তীরকাঠি ও সূতো দিয়ে বেষ্টন করে পান, সুপারী দিয়ে পূজা করে। তার সামনে পাত্রপাত্রীর গায়ে হলুদের পর গ্রামের লোকজনের উপস্থিতিতে মালাবদল ও সিঁদুরদান হয়। বিয়েতে ব্রাহ্মণের কোন ভূমিকা নেই। আত্মীয় স্বজনরাই বিবাহ কার্য সম্পন্ন করে।[১৯] তবে কোন কোন গ্রামে কোন পরিবারে ডোমদের বিয়েতে ব্রাহ্মণদেরও প্রয়োজন পড়ে। এদের কাছে ব্রাহ্মণ দুরকমের। কম মূল্যের ব্রাহ্মণ ও বেশি মূল্যের ব্রাহ্মণ।

ডোমেদের কেউ যদি নিজেই গলায় পৈতা নেয় এবং তাদের দশ কর্ম করায়, এমনকি নিজের সম্প্রদায়ের ছোঁয়া জলটুকু পর্যন্ত না খায়-তাকে তাদের পুরুত বলে মেনে নেয়। এইসব ব্রাহ্মণ কিভাবে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মনদের মন্ত্র নকল করে বিয়ে দিত এবং তাই নিয়ে কিভাবে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি চলত তার একটি সুন্দর উদাহরণ আছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত উপন্যাসে। যেমন—

"রাখাল পন্ডিত (ডোম বামুন) বরকে বলিল— বল, মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।

বর আবৃত্তি করিল—মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।

রাখাল কন্যাকে বলিলেন— বল, ভগবতী ডোমায় পুত্রায় নমঃ।

.....এমন সময় শিবু পন্ডিত দু হাত তুলিয়া বজ্রগর্জনে সকলকে চমকিত করিয়া বলিয়া উঠিল, ও মন্তরই নয়। বিয়েই হল না ...শিবু পন্ডিত তখন ঔদার্য দেখাইয়া কহিলেন, রাখালের দোষ নেই, আসল মন্তর আমি ছাড়া এ অঞ্চলে আর কেউ জানেই না।...এই বলিয়া সেই শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং পরাজিত রাখাল নিরীহ ভাল মানুষটির মত বর-কন্যাকে আবৃত্তি করাইতে লাগিলেন।

শিবু কহিলেন, বল, মধু ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ।

বর আবৃত্তি করিল, মধু ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ।

শিবু কহিলেন, মধু এবার তুমি বল, ভগবতী ডোমায় পুত্রায় সম্প্রদানং নমঃ।

সকন্যা মধু ইহাই আবৃত্তি করিল। সকলেই নীরব, স্থির। ভাবে বোধ হইল শিবুর মত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ইতি পূর্বে এ অঞ্চলে পদার্পন করে নাই। শিবু বরের হাতে ফুল দিয়া কহিলেন, বিপিন, তুবি বল, যতদিন জীবনং ততদিন ভাত-কাপড় প্রদানং স্বাহা। বিপিন থামিয়া থামিয়া বহু দু:খে বহু সময়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিল। শিবু কহিলেন, বর-কন্যা দুজনেই বল, যুগল মিলনং নম:। বর ও কন্যার হইয়া মধু ইহা আবৃত্তি করিল। ইহার পরে বিরাট হরিধ্বনি সহকারে বর-কন্যাকে বাটীর মধ্যে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। আমার চতুষ্পার্শ্বে একটা গুঞ্জন রোল উঠিল সকলেই একবাক্য স্বীকার করিতে লাগিল যে, হ্যাঁ, একজন শাস্ত্রজানা লোক বটে! মন্তর পড়াল বটে! রাখাল পন্ডিত এতকাল আমাদের কেবল ঠকিয়েই খাচ্ছিল"।[২০] এই উদাহরণ অনার্য সমাজে আর্য সামাজিক প্রক্রিয়ার অনুপ্রবেশের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উচ্চবর্ণের রীতিনীতি অনুসরণ করার সামাজিক মানসিকতা এতে প্রতিফলিত। মন্ত্রগুলো ঋষিরুবাচ না হোক, তবু তো এ মন্ত্র বিবাহবন্ধনে শিথিল নয়। বর্তমানে অনেক গ্রামে উচ্চবর্ণের জন্য নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণেরাও ভাল দক্ষিণাদি পেলে ডোম বা অন্য উপজাতিদের বৈদিক মন্ত্র পাঠদান পূর্ব্বক বিবাহ কার্য সমাধা করে দেন। বিবাহের আচার অনুষ্ঠান বর্ণ হিন্দুদের মত পালন করা হয়।[২১]

জেলায় ডোমেদের ধর্ম পালনের ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। বর্ণ হিন্দুদের আঞ্চলিক প্রভাব ডোমেদের উপর প্রতীয়মান। বর্তমানে ডোমেদের অনেকেই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে রাধাকৃষ্ণের পূজা করে। মনসা পূজা, জুগনী পূজা, টুসু ও ভাদু পূজা, কালী পূজা, শীতলা পূজা প্রভৃতি প্রচলিত প্রায় সব পূজাই মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত ডোমেরা করে। পূজাকে কেন্দ্র করে মুরগী, পাঁঠা, পায়রা, ঘুঘু প্রভৃতি বলি দেওয়া হয় এবং দেশী মদের আয়োজন করা হয়।

বয়স্কদের সামনে কিশোর কিশোরীরাও কোথাও কোথাও নেশা করে। একে সামাজিক অপরাধ রূপে গণ্য করা হয় না।[২২] মেদিনীপুরের বেশ কিছু অঞ্চলে আজও ধর্মপূজার প্রচলন আছে। আজও ধর্মপূজার প্রধান অধিকারী ডোমেরা, যদিও এখন কৈবর্ত, শুঁড়ি, বাগদী, ধোপা প্রভৃতিদের ভিতরও ধর্মপূজার পুরোহিত বিরল নয়।

বহুদিন ডোমেরা প্রথাগত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। আজকাল তাদের মধ্যে কিছুটা শিক্ষার বিস্তার হয়েছে। তবু ৫% অধিক স্বাক্ষরলাভ সম্পন্ন হয় নি। মাধ্যমিক পাশের সংখ্যা খুবই কম। মেয়েদের মধ্যে পড়াশুনার চল নেই বল্লেই চলে। এর প্রধান কারণ চেতনার অভাব। আর্থিক অনটন অবশ্যই দায়ী। তবে ডোম সমাজে নারীদের শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা আজও অনেক পুরুষ স্বীকার করে না। পূর্বে ডোম নারী যে স্বাধীনতা ভোগ করত আজ তা অনেকাংশে খর্বিত। উচ্চশিক্ষার সুযোগ সারা জেলায় ২ / ১ জন ডোম তরুণ গ্রহণ করেছে মাত্র। বর্তমানে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রের সংখ্যা মাত্র একজন।[২৩]

মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থাপনায় ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। এরা বহুকাল ধরে মৃতদেহ হয় কবর দেয় নতুবা দাহ করে। আর্থিক অসচ্ছলতা কবর দেওয়ার মূল কারণ। মৃতদেহ সৎকারের পর স্নান করে একটি লৌহ খন্ড, একটি পাথর, কিছু গোবর স্পর্শ করে মৃতব্যক্তির পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে ভাত ও মদ উৎসর্গ করে ঘরে ঢোকে। মৃতব্যক্তির আত্মীয় স্বজন ৯ দিন, কোথাও ১২ অথবা ১১দিন অশৌচ পালন করার সময় মাছ মাংস খায় না। শ্রাদ্ধের দিন কোথাও শূয়োর, কোথাও ছাগল কেটে রান্না করা হয়। সম্পূর্ণ নেশা না হওয়া পর্যন্ত মাংসের সাথে দেশী মদ খাওয়া চলে। কোন কোন জায়গায় ব্রাহ্মণের সাহায্য না নিয়ে নিজেই মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে। কোন কোন জায়গায় আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। ব্রাহ্মণদের দিয়ে বামুন কায়েত ঘরের মত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। কিছুটা আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ও শিক্ষিত ডোম পরিবারের মধ্যে এটি পরিলক্ষিত হয়। মৃতব্যক্তির সম্পত্তি তার বিধবা স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে সমানভাগে বন্টিত হয়।

কথিত হয়, বল্লাল সেনের আমলে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় হাড়ি, চামার, মুচি, বাউড়ী, ও ডোম সর্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীভুক্ত ছিল। এদের কাছ থেকে ব্রাহ্মণ সহ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা জল ও মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করতো না। বর্ণ হিন্দুদের ধোপা, নাপিত প্রভৃতিরাও তাদের বাড়িতে কাজ করতো না। এদের অপরাধ ছিল সর্বপ্রকারের অপরিচ্ছন্ন খাদ্য খাওয়া।[২৪] তাদের খাদ্যের তালিকায় ছিল গরুর মাংস, শূকর মাংস, ঘোড়ার মাংস, ধানের ক্ষেতের মধ্যে গর্ত করে থাকা ইঁদুর, এমনকি যে সমস্ত জন্তু জানোয়ার স্বাভাবিকভাবে মারা যেত-সেই মরা জন্তুর মাংস।[২৫] এ সমস্ত খাদ্য গোঁড়া হিন্দুদের কাছে ছিল চরম নিষিদ্ধ।

তবে আজকের অনেক উচ্চবর্ণের হিন্দুর হেঁসেলে ডোমেদের অবাধ বিচরণ। হাঁড়ি কলস মাজা থেকে রান্না করা পর্যন্ত। সমাজে আজ আর তারা ব্রাত্য নয়। আগে ডোমেদের একাংশ অভাবের তাড়নায় মরা ছাগলের মাংস খেত। বর্তমানে আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে তা বর্জিত হয়েছে। তবে ডোমদের মধ্যে নেশার প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও এ কবলে পড়ছে। কোন কোন রাজনৈতিক দল ভোট লাভের আশায় মাঝে মাঝে মদের যোগান

দেয়। সব রাজনৈতিক দলের কম বেশি লক্ষ্য হল যেনতেন প্রকারে রাজনীতির বাজারে তাদের সমর্থন আদায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি ও আর্থিক উন্নতির বিষয়ে তারা প্রায় উদাসীন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পঞ্চাশ বছর পরেও ডোমেদের আর্থিক উন্নতি হয়নি বল্লেই চলে। অথচ তাদের আর্থিক উন্নতিব জন্য সরকার অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তবে আশার কথা-পূর্বে ডোম সহ অন্যান্য আদিবাসী সমাজ যেভাবে অবহেলিত হত তা আজ আর হয় না। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে আজকের মতো আদিবাসীদের বিভিন্ন জাতি হিসাবে দেখা হত না। তারা অবলীলাক্রমে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরে বিচিত্র কাজের ভার নিয়ে যোগ দিত। তারপর ধীরে ধীরে ধাপের পর ধাপ ডিঙ্গিয়ে পুরাতন পবিচয় ফেলে হিন্দু সমাজের বিচিত্র শ্রমজীবী দলে বিলীন হয়ে যেত। বর্তমানেও পুরানো প্রবাহে নতুন করে জোয়ার এসেছে। একথা ঠিকই, মেদিনীপুর জেলার ডোম সম্প্রদায়ের অনেকেই আজও দবিদ্র, শিক্ষাব আলো থেকে বঞ্চিত, নিরক্ষর তথাপি তারা আব অস্পৃশ্য নয়, ব্রাত্য নয়- তাবা বর্তমান বাংলার আর্থ সামাজিক বিবর্তনের অন্যতম ক্লান্তিহীন পথিক।

টীকা

১। ৪৯ পটল, মৎস্যসূক্ত তন্ত্র। ডঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিকের 'আদিবাসীদেব ভাষা ও বাঙলা' গ্রন্থে ৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত

২। Descriptive Ethonology of Bengal, Edward Tuite Dalton, Calcutta, 1872, P 235.

৩। The People of India, Sir Herbet H. Risley, Edited by W. Crooke, Second Edition, Delhi, 1969 P. 76.

৪। (Description of) *Plate xxxv.* Sir Herbert H. Risley, op.cit.

৫। 'নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িয়া॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব মা সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ॥'
চর্য্যাপদের ১০ সংখ্যক পদের অংশ বিশেষ।

৬। 'কেহো কেহো তোহেরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন লোঅ তোরেঁ কন্ঠ ন মেলই॥
কাহ্নে গাই তু কাম চণ্ডালী।
ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিনালী।'
চর্য্যাপদ ১৮ সংখ্যক পদের অংশ বিশেষ।

৭। Hand Book on Scheduled Castes And Scheduled Tribes of West Bengal, Amal Kumar Das, Bidyut Kumar Roy Chowdhury and Manis Kumar Raha (Special Series No-8.) Bulletin of the Cultural Research Institute. Tribal Welfare Department, Government of West Bengal, Calcutta, 1966 P. 32.

৮। তথ্যদাতা-পরেশ ধাড়া (ডোম), গ্রাম-গোপকালী, ৩নং অঞ্চল, ডেবরা থানা, জেলা-মেদিনীপুর, তারিখ - ৪/১/৯৯.

৯। 'তান্তি বিকনঅ ডোম্বি অবরনা চাংগেড়
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড-পেড়া ॥'
চর্য্যাপদেব ১০ সংখ্যক পদের অংশ বিশেষ।

১০। Hand Book on Scheduled Castes And Scheduled Tribes of West Bengal, op cit, P31.

১১। The Tribes And Castes of Bengal, Vol. I. H. H Risley, Calcutta, 1981 P. 250.

১২। Hand Book on Scheduled Castes and Scheduled Tribes of West Bengal, op. cit, p. 31.

১৩। The Tribes And Castes of Bengal, Vol. I, op. cit, P 250

১৪। আদিবাসীদের ভাষা ও বাঙলা, ডাঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক, মেদিনীপুব, ১৯৯১, পৃঃ-৩৪.

১৫। Hand Book on Scheduled Castes and Scheduled Tribes of West Bengal, op cit, P.51.

১৬। Descriptive Ethnology of Bengal, E. T. Dalton, op. cit., P. 314

১৭। 'হালো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহারি নাবেঁ ॥'
চর্য্যাপদের ১০ সংখ্যক পদের অংশ বিশেষ।

১৮। 'গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ নীলে পার করেই ॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদগুরু পাঅপসাত্র জাইব পুনু জিনউরা ॥
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই।
চর্য্যাপদের ১৪ সংখ্যক পদের অংশ বিশেষ।

১৯। তথ্যদাতা-নিমাই মণ্ডল, ইন্দা, খড়গপুর।

২০। শরৎসাহিত্য সমগ্র-১, সম্পাদক, সুকুমার সেন, কালকাতা, ১৪০০ (২য় মুদ্রণ), পৃঃ-৪০৪-৪০৫।

২১। তথ্যদাতা-দুঃখুরাম বেরা (মোড়ল), গ্রাঃ-কৃষ্ণনগর, থানা-খড়গপুর (গ্রাঃ), মেদিনীপুর।

২২। তথ্যদাতা-সদানন্দ ঘোড়ুই, গ্রাম ধোবাশোল, থানা-সাঁকরাইল, মেদিনীপুর।

২৩। তথ্যদাতা-বিশ্বজিৎ বানা, কমলাপুরিয়া, নয়াগ্রাম, মেদিনীপুর।

২৪। The People of India, Sir Herbert Risley, op cit, PP. 120-121.

২৫। Ibid, Description of Plate xxxv.

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাস রচনা

"The people from whom illumination comes are those who can, or want to, speak freely, preferably if they have no responsibility for great affairs." —Eric Hobsbawm in Age of Extremes (1994)[১]

অভিজিত গুহ

মুখবন্ধ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল আশির দশকে। মেদিনীপুর জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন এই জেলারই কিছু শিক্ষানুরাগী মানুষ। এঁদের নেতৃত্ব দেন খড়গপুর আই.আই.টি.র (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি) প্রখ্যাত অধ্যাপক অনিল কুমার গায়েন। অধ্যাপক গায়েন ও মেদিনীপুরবাসীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন মেদিনীপুর জেলায় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার সম্মতি দেন। এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য বিধানসভায় ১৯৮১ সালে 'বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন' পাশ কবান। মেদিনীপুর শহবের মূল কেন্দ্র থেকে বেশ কিছুটা দূরে, পশ্চিমপ্রান্তে ১৫০ একর জমি রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় তৈরীর জন্য দেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং রাজ্য সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার পেছনে কয়েকটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলেন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা একটি প্রবন্ধে ও রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় আইনে এইসব উদ্দেশ্যের কথা পাওয়া যায়। উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলা হয়েছিল। কথাটি এরকমঃ "to make such academic studies as may contribute to the improvement of economic conditions and welfare of the people in general and the tribal people in particular" (The Vidyasagar University Act, 1981, Chapter II, P.6)[২] এরপর ১৯৮৭-৮৮ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা ছোট একটি প্রবন্ধ ""The Vidyasagar University : It's objectives and Character"এই শিবোনামে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত Journal of Higher Education এ ছাপা হয়। এই প্রবন্ধে ভূপেশচন্দ্র বলেনঃ "The UGC clearance was obtained on condition that the new University will have special features and programmes on non-tradtional lines, augmenting the existing educational standards and upliftment of backward areas and removal of regional imbalance."[৩] এইসব কথাবার্তা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে মেদিনীপুরের শিক্ষানুরাগী মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বাজ্য সরকার ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ—এঁরা সকলেই এই

বিশ্ববিদ্যালয়টিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটু অন্যরকমভাবে। আর এই অন্যরকমভাবে গড়ে তোলার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও পড়াশোনাকে নিম্নবর্গের মানুষের উন্নতির জন্য ব্যবহার করার একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু এরপর থেকে যত সময় কেটেছে ততই বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কর্মকান্ডের মধ্যে নিম্নবর্গের মানুষের জন্য পড়াশোনা ও গবেষণাকে নিয়োজিত করার বিষয়টি ক্রমেই দূরে সরে গেছে। আর এই মানসিকতার সবচেয়ে বড় প্রকাশ ঘটেছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস সংরক্ষণ ও তার প্রসার ঘটানোর ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে।

তাত্ত্বিক পটভূমি

এই প্রবন্ধ তৈরীর পেছনে একটা তাত্ত্বিক কাঠামো কাজ করেছে। আর সেই তাত্ত্বিক কাঠামো আদর্শ নিরপেক্ষ নয়। কাজেই প্রথমেই সেই আদর্শগত পক্ষপাতের (ideological bias) কথা খোলাখুলি বলে নেওয়া ভাল। ব্যাপারটা এরকম। সাধারণভাবে শুধু বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় নয় বা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, যে কোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের বেশ খানিকটা দূরে সরিয়ে রাখে। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভব শ্রেনী-নিরপেক্ষ কোন ঘটনা নয়। অথচ এইসব উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেই নিম্নবর্গের শোষিত নিপীড়িত মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণ ও তার প্রতিকারের বিষয়ে নানা গবেষণা ও পঠনপাঠনের চর্চা করা হয়। একদিকে জনসাধারণের করের টাকায় এইসব প্রতিষ্ঠান চলে আবার অন্যদিকে সমাজের উচ্চকোটির মানুষের বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার বিচরণক্ষেত্র হিসাবেও প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠে। এক এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেশের সেরা এবং বিলুপ্ত প্রায় নানাবর্ণের বুদ্ধিজীবীদের অভয়ারণ্য বলে মনে হয়। কিন্তু জ্ঞানের এই বিস্তীর্ন রাজ্যেরও কতগুলি বস্তুগত পরিকাঠামোর প্রয়োজন। এরজন্যও প্রয়োজন জমি, রাস্তাঘাট, সাজানো ফুলের বাগান, বিচিত্র ধরনের ঘরবাড়ি, ও সর্বোপরি এসব বক্ষা করার জন্য একটি সংগঠিত ব্যবস্থা। আর এই সব জায়গাজমি, বাগান ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য সংগ্রহ করে দেন দেশের সরকার। সাম্প্রতিককালে বেসবকারী ব্যবসায়িক সংস্থাগুলিও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এইগুলি যোগাড় এবং রক্ষনাবেক্ষন কতে গেলে আইনকানুন, প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সবই দরকাব। এইভাবে দেখলে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় বা যেকোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র নয়, আইনকানুন ও আর্থরাজনৈতিক কাঠামোয় মোড়া পুরোদস্তুর প্রতিষ্ঠান বিশেষ। অন্যদিকে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছেন অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে নির্বাচিত উপাচার্য, কোর্ট এবং এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ-এদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও ক্যাম্পাসের রক্ষনাবেক্ষণ সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হচ্ছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেসব কথা এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের বইতে আছে, সেই অবস্থান থেকে কর্তৃপক্ষ এখন অনেকটা সরে এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মকান্ডের বিবর্তনের একটা ইতিহাস আছে। এই প্রবন্ধে সেটাও দেখবার একটা চেষ্টা করা হয়েছে। আসলে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোল-সতের বছরের (বিশ্ববিদ্যালয় আইন তৈরীর বছবকে শুরু ধরলে) যে চলমান ইতিহাস

রচনার চেষ্টা করেছি তা প্রকৃতপক্ষে দুধরনের সমাজব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে প্রতিনিয়ত যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলছে তার একটা বিবরণ। একপাশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী একটি প্রতিষ্ঠান; অন্যদিকে দরিদ্র, আদিবাসী ও নিম্নবর্গের একদল অসংগঠিত মানুষ আর এসবের বৃহত্তর পটভূমি হল দ্রুত উচ্চশিক্ষার বেসরকারীকরণ ও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত জনমুখী এক বামফ্রন্ট সরকার। এর একটা অন্তর্নিহিত টানাপোড়েন সবসময়েই চলছে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ও এই আবর্তের বাইরে নয়। নানারকমের সূত্র ধরে চলমান এই ইতিহাসের ঘাত প্রতিঘাতের বিবরণ তৈরীর আর একটি উদ্দেশ্য হল অবস্থাটাকে শুধু জানা নয়, যতটুকু পারা যায় পাল্টানো। কাজেই এই ইতিহাস রচনা শুধু অতীতের চর্বিতচর্বন নয়, বর্তমানের গতিপ্রকৃতি বোঝাও এব অন্যতম উদ্দেশ্য যাতে করে বিদ্যাসাগব বিশ্ববিদ্যালয় তার আদি উদ্দেশ্যগুলির দিকে একটা নতুন যাত্রা শুরু করতে পারে।

পদ্ধতি সম্বন্ধে দু-চার কথা

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও তার চারপাশের নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাস রচনায় একইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পদ্ধতিগুলি মোটামুটিভাবে এরকমঃ (১) বিশ্ববিদ্যালয়েব ক্যাম্পাসকে স্থানীয় মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করেন। এসম্পর্কে যতটা সম্ভব পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নানা তথ্য সংগ্রহ কবা হয়েছে বিগত প্রায় বছর তিনেক ধরে। একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে স্থানীয় মানুষেব নানাধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও পর্যবক্ষেণ কবা হয়েছে। (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য এবং তার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত নানা প্রবন্ধ, সংবাদ ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। (৩) বিশ্ববিদ্যালযের চাবপাশে নানাধরনেব মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে মেলামেশা ও কথোপকথনেব মাধ্যমেও বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এইসব কথোপকথনের মধ্য দিযে চারপাশেব মানুষ আমাদের এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে কি ভাবেন, কি চোখে আমাদেব দেখেন, আব অতীতে এই ক্যাম্পাসের মাঠটি কিরকমভাবে ওবা ব্যবহার কবতেন এসব বিষয়ে নানা খবর সংগ্রহ করা হয়েছে।

ওদের চোখে আমরা

বিদ্যাসাগব বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান তার প্রথাবহির্ভূত ও উন্নয়নমূলক গবেষনার উদ্দেশ্যগুলিব দিক থেকে আদর্শ জাযগায় প্রতিষ্ঠিত। মেদিনীপুর রেল স্টেশন (যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫ মিটার উপবে অবস্থিত) থেকে প্রায ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে লাল মাটি শাল জঙ্গল (বিশ্ববিদ্যালয থেকে ৫ কিলোমিটারেব মধ্যে) ও আদিবাসী ও নিম্নবর্নেব মানুষদের গ্রাম দিয়ে ঘেরা এক প্রাকৃতিক পবিবশেব মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়েব ১৫০ একরের মস্ত ক্যাম্পাস। এই এলাকাটি সাম্প্রতিককালে মেদিনীপুব পৌরসভাব ২১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই ওয়ার্ডটি এবং এর সংলগ্ন ২০ নম্বর ওয়ার্ড এখনও গ্রামেরই মত। বিস্তীর্ন প্রান্তর, কৃষিজমি, গাছপালা নিয়ে এই দুটি ওযার্ড। জাতীয় মানচিত্র সংস্থার ১৯৯২ সালের হিসেব অনুযায়ী ২০ এবং ২১ নম্বব ওয়ার্ডের জনসংখ্যার ঘনত্ব যথাক্রমে প্রতি হেকটরে ১২.৮৪ এবং ২৩.৬৫। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মেদিনীপুর শহরের জনসংখ্যার ঘনত্ব হল ৪৭.৫০।[৪] বিদ্যাসাগর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের সারা শরীরে গ্রামের সুস্পষ্ট ছাপ। ১৫০ একরের বিস্তীর্ণ এই ক্যাম্পাসের রুক্ষ লালমাটির জমির উপর কয়েকটি অট্টালিকা, কিছুটা ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি আর কাজুগাছের ছোটবাগান ছাড়া প্রায় পুরোটাই এখনও শহুরে চোখে পতিত জমি। মাঝে মাঝে কিছু কৃষ্ণচূড়া আর শিরীশ গাছ। ক্যাম্পাসের দক্ষিন পশ্চিম প্রান্তে উপাচার্যের বাংলোব পাশে কিছুটা জায়গা তারের শক্ত বেড়া দিয়ে ঘিরে শাল, সেগুন, মেহগিনি, গামার গাছের একটি বাগান করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় সেবা যোজনাব উদ্যোগে। বাগানটির বয়স বছর দুয়েক। সিমেন্টের ফলকে লেখা আছে 'সবুজায়ন'। কি ধরনের গাছ লাগিয়ে এবং কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিবেশকে সবুজ করতে চান তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগান। একটাও ফলেব গাছ নেই এই বাগানে। স্থানীয় মানুষজনকে এই বাগান সংবক্ষনের কাজে লাগানোর কথা রাষ্ট্রীয় সেবা যোজনার পরিচালন বিভাগের কর্মকর্তাদের মাথায় আসেই নি। ক্যাম্পাসের পশ্চিমপ্রান্তে একটি গ্রাম আছে। গ্রামটির নাম মুড়াডাঙ্গা। মুন্ডা এবং ওঁরাও জাতিব বসবাস এই গ্রামে। এদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কটা খুব মধুর নয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচিলের ভাঙ্গাচোরা চেহাবায়। বহু জায়গাতেই এই পাঁচিল ভাঙ্গা। কর্তৃপক্ষ প্রথমদিকে চেষ্টাও করেছিলেন ভাঙ্গা পাঁচিল সারিয়ে তুলতে, কিন্তু সারালেও পাঁচিল আবার ভেঙ্গে দেওয়া হয়। আর সেই ভাঙ্গা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে আশপাশের গ্রামের মানুযবা যাতায়াত করেন যাত্রাপথটাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য। মুড়াডাঙ্গার মেয়েরা শহবে জনমজুরীর কাজ সেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোকিত পথ ধরে সার বেঁধে বাড়ি ফেরেন। কখনও এরা নিজেদের গান করেন। কোনদিন এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি করেছেন বলে শোনা যায়নি। নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানরত এক ছাত্রকে মুড়াডাঙ্গার অধিবাসী এক যুবক বলেছিল যে "তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা যেমন বাঁচাবার জন্য স্কুটারে চড়ে যাতায়াত কবে আমরাও তেমনি কম সময়ে বাড়ি থেকে শহরে যাবার জন্য তোমাদের জায়গা ব্যবহার কবি। আমাদেবও তো সময়ের দাম আছে!" তবে শুধু যাতায়াত নয় ক্যাম্পাসের খোলামাঠে আশপাশের দরিদ্র গ্রামবাসীর গরু বলদ ছাগল চড়ে বেড়ায়। শুকনো পাতা, কাঠকুটো, শালপাতা জোড়া দেবার সরু সরু কাঠি, ঝাঁটা বানাবার লম্বা ঘাস, গোবর এসব প্রাকৃতিক সম্পদও সংগৃহীত হয় ক্যাম্পাসের মাঠ থেকে। এ অধিকার ওদের বহুদিনের। স্থানীয় ভূস্বামীবর্গ আদিবাসী ও নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীগুলিকে এই ধরনের যৌথ সম্পদেব উপর অধিকার ভোগ করতে দিতেন। এখনও রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা কলেজেব ক্যাম্পাসের মধ্যে বনবিবিব পুজো ও মেলা হয়। এই পুজো করেন নিম্নবর্ণের অব্রাহ্মণ পুরোহিত, এই কলেজ আগে নারাজোলের "রাজাদের" প্রাসাদ ছিল। "রাজারাই" পুজো এবং মেলার জন্য ওদের এলাকা স্থানীয় মানুষকে ব্যবহার করতে দিতেন। আজও সেই প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক বছব পৌষ সংক্রান্তির পরদিন ওই একই জায়গায় বনবিবির মেলা হয়। স্থানীয় মানুষের চোখে এখনও রাজারা অনেক কাছের মানুষ। আর এরাও বংশানুক্রমিকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর এই ধরনের গোষ্ঠীগত অধিকার ভোগ করে এসেছেন বহুকাল ধরে। ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক কৃষিজমির উপর এইসব অধিকার প্রথম আঘাতপ্রাপ্ত হয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। এরফলে নানা বিদ্রোহও হয়েছিল।

এসব বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস যা কিনা শহুরে চোখে "পতিত জমি" তা কিন্তু এই ধারাবাহিক ইতিহাসের বাইরে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচিল তোলার চেষ্টা ও গ্রামের মানুষের তা ভেঙ্গে দেবার ঘটনা আজকের গণমাধ্যমগুলির কাছে হয়ত কোন খবরই নয়, কিন্তু নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাস রচয়িতার কাছে ক্যাম্পাসের এইসব ঘটনা অত্যন্ত জীবন্ত এক চলমান দলিল। আর এখানেই নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও পরিবেশবিদ্যা মিলেমিশে এক হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত মুড়াডাঙ্গা গ্রামের এক বৃদ্ধের কাছে ক্যাম্পাস তৈরীর আগে এই জায়গাটা কেমন ছিল সে সম্বন্ধে নানা গল্প শুনতাম। বৃদ্ধের নাম রঘুনাথ সিং। জমিজমা প্রায় কিছুই ছিল না। একটা ভাড়ার রিক্সা চালাত। প্রায় ৭০ বছর বয়স হয়েছিল রঘুনাথের, বছর পাঁচেক আগে মারা গেল রঘুনাথ। ও ছেলেবেলায় এইসব জায়গায় নেকড়ে বেরুত। বাঘও নাকি দেখেছে রঘুনাথের বাপ ঠাকুর্দা, আর জঙ্গল তখন আরও কাছে ছিল। এসব জায়গায় শালগাছ ছিল। সব বাইরে থেকে লোকজন এসে কেটে নিয়ে গেল রঘুনাথরা তীরধনুক নিয়ে শিকারে বেরত। এসব জায়গা গোপের রাজাদের, কিন্তু এখানে কাঠকুটো সংগ্রহ করলে বা গরু চরালে রাজারা কিছু বলত না। কেন বলবে ? আমরা তো ওদের প্রজা। এইসব বলত রঘুনাথ রিক্সা চালাতে চালাতে। আর মাঝে মাঝে ডাকাত আসত। তীর-কাঁড়া নিয়ে সারা গ্রামের লোক ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করত। আমাদের একজনের উপর আক্রমণ হলে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। এখন আর সেরকম মিল কোথায় ? রঘুনাথের গল্পের মধ্যে একটা সমাজের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ইতিহাস একটা গোষ্ঠীবদ্ধ আদিবাসী জীবনের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস। তাদের চারপাশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিলুপ্ত হয়ে যাবার এবং সেই সম্পদের উপর তাদের বংশানুক্রমিক অধিকার হারিয়ে যাবার ইতিহাস। মুডাডাঙ্গার রঘুনাথের কাছ থেকে এবার আমরা যাব শালতোলার সূরজ সিং-এর কাছে। এই শালতোলার কাহিনীও বিশ্ববিদ্যালযেব ক্যাম্পাসের ইতিহাস ও ভূগোলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের পঞ্চদশ বার্ষিক সম্মেলন ২৪-২৬ জানুয়ারী বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ওই সম্মেলনের এক বিশেষ বক্তৃতায় ঐতিহাসিক অতীশ দাশগুপ্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে জঙ্গলমহলের কৃষিজীবী ও নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীগুলির বিদ্রোহের ইতিহাস "শহুরে মানসিকতা" নিয়ে যে বোঝা যাবে না একথা অতীশবাবু অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের চারপাশের নিম্নবর্গের মানুষজনের সাম্প্রতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অথচ ক্যাম্পাসের উন্নয়নের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত যা কিছু করেছেন তার প্রতিটি পদক্ষেপেই ওই শহুরে মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আধিকারিক, অধ্যাপক বা ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন যে "শালতোলা" কোথায়, তাহলেই এই মানসিকতার খানিকটা পরিচয় পাবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর পাবেনঃ "সেটা আবার কোথায় ? জানিনা তো !" কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করেন "কুষ্ঠপল্লীটা কোথায় ?" তখনই শুনবেন "ওইতো আমাদের ক্যাম্পাসের পাশের মেয়েদের হস্টেলের

একেবারে গা ঘেঁষে একটা কুষ্ঠরোগীদের বসতি আছে।" হ্যাঁ বসতি একটা আছে ঠিকই আর সেই বসতিটা গড়ে উঠেছিল সমাজ থেকে বিতাড়িত একদল কুষ্ঠরোগীদের নিয়ে আজ থেকে প্রায় ১৮-১৯ বছর আগে। তখনও এখানে শালগাছ ছিল। তাই ওরা বলেন "শালতোলা" বা "শালডাঙ্গা" আর আমরা বলি "কুষ্ঠপল্লী"। শালতোলার শালগাছের একটা কাহিনী আছে। এ কাহিনী পল্লীর অত্যন্ত কর্মঠ চাষী নগেন আরির মুখে শোনা। নগেন আরির বয়স ৫০ হয়ে গেছে। দোহারা ঋজু গড়নের মানুষ। জাতিতে শবর। থাকতেন কাছেই, গোকুলপুরে। স্ত্রীর কুষ্ঠরোগ হয়েছিল। ফলে গ্রাম ছেড়ে আসেন। উনিই প্রথম শালতোলায় আসেন। এখনও শুধু বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে চমৎকার শবজি ফলান। খানিকটা জমি আছে। নগেন একদিন বলছিলেনঃ "আমি যখন আসি তখন সবে পার্টি (সি.পি.এম.) এসেছে। আমাদের পল্লীর পূর্বদিকে মস্ত একটা শালগাছ ছিল। এমন বড় যে দু-তিন জন মিলেও ওর গুঁড়িটা বেড় দিয়ে ধরতে পারত না। বহুদিনের গাছ। তারপর একদিন পঞ্চায়েতের বাবুরা এলেন। বললেন গাছটা কেটে নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ আমি বাধা দিয়েছিলাম। আমরা গাছটার ছায়ায় বসতাম। ওরা শুনল না। বলল আপিসের দরজা জানলা বানাবে। করাত দিয়ে গাছটা কেটে ফেলল। কিন্তু ভেতরটা ফোঁপড়া হয়ে গেছে। বেশি কাঠ পেল না। আমরা আগেই বলেছিলাম। শালতোলা নামটা আমাদেরই দেওয়া। গাছটা তো ছিল। তাই শালতোলা।" নগেন আরি শালতোলা ছেড়ে যাবেন না কিছুতেই।

এই রুখাসুখা জায়গাটিকে সবুজ একটা গ্রামে পরিনত করেছিল এই মানুষগুলো। এদের অনেকেই রোগের কোপে প্রতিবন্ধী। অনেকেই ভিক্ষার উপর নির্ভরশীল। তবু শালতোলার সবুজায়ন দেখবার মত। আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে এইসব দেশীয় গাছে ভর্তি এই ছোট পল্লীটি। আর ৪১টি পরিবারের মধ্যে অছে নানা জাতি ও গোষ্ঠীর মানুষ। একটা সুন্দর গ্রাম গড়ে তুলেছেন এরা।[৫] কেউ কেউ তরিতরকারীর চাষও করছেন। অথচ এঁরা এখনও এই ছোট একটুকরো জমির উপর (দেড় একরের মত) সরকারী দলিল বা পাট্টা পাননি। অর্থাৎ যেকোনো সময় এদের এখান থেকে উঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। আর সম্প্রতি হচ্ছেও তাই। এদের জন্য কিছুদুরে পাকাবাড়ি তৈরী হয়েছে আর একটা রুক্ষ জমির উপর। কিছু কিছু পরিবার নিজেদের হাতে লাগানো ফলের গাছ ব্যবসায়ীদের কাছে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে দিয়ে ওই পাকাবাড়িতে গিয়ে উঠছেন। চলে তো যেতেই হবে তাই যাচ্ছেন। আজও শালতোলার বেশ কয়েকটি পরিবার ভিক্ষাবৃত্তির উপরই নির্ভরশীল। কি করে এদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে সরিয়ে আনা যায় সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা না করে ওদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়াই যেন বর্তমান জেলা প্রশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে এখনও বেশ কয়েকটি পরিবার মাটি কামড়ে পরে আছেন। আর এরা সম্প্রতি পাট্টার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনও করেছেন। এই শালতোলার সূরয সিং আমাকে একটা ঘটনার কথা বলেছিল। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে "কতদিন আগে থেকে তোমরা এখানে আছ?" ও বলেছিল "সে অনেকদিন হয়ে গেল। চারদিকটা তখন শুকনো ডাঙ্গা, আমরাই তো এসে গাছ লাগালাম। তারপর তো ইনভারসিটি হল।" তো, সূরয সিং (ওকে পল্লীতে সকলে মজা করে দারা সিং ও

বলে) বলেছিল যে একদিন ও শহরে কাজ সেরে ফিরছিল এইসব ফাঁকা পথ ধরে এখন যেখানে ক্যাম্পাস। এখানে মিলিটারিদের একটা লোহার সাইনবোর্ড ছিল। "সেই কত নম্বর বেটালিয়নের যে নাম লেখা। ওটা বোধহয় ব্রিটিশ আমলের।" এমন সময় হঠাৎ একদল বড় বড় হনুমান এসে এই মরচে পড়া সাইনবোর্ডটাকে ভাঙ্গতে শুরু করল। সূরয সিংয়ের নিজের চোখে দেখা। "আর তারপরই তো ইনভারসিটি হল। কাজেই বুঝলেন সার, আমরা কতদিনের লোক"!

স্থানীয় মানুষের চোখে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত বেশিদিনের নয়। এই ক্যাম্পাস গড়ে ওঠার ঘটনা এই তো সেদিনকার অথচ এরই মধ্যে কতদ্রুত সব কিছু ঘটে গেল। ওদের গোচারণভূমি, ওদের যাতযাতের পথ, এসব বহুদিনকার। ওরা এই ভূমির সন্তান, কিন্তু এখন সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়, প্রহরী, পাঁচিল আরও কত কি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশের মানুষজনের মানসিকতার মধ্যে এইভাব পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। ওদের চোখে আমরা এখনও বহিরাগত।

আমাদের চোখে ওরা

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত ক্যাম্পাসের চারপাশের দরিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মনোভাব আর পাঁচটা সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মতই। অর্থাৎ ক্যাম্পাসের জায়গাটা এখন আমাদের এবং আশপাশের গ্রামের মানুষরা এটিকে বেআইনিভাবে ব্যবহার করছে। সেজন্য পাঁচিল তুলতে হবে। প্রহরী নিযুক্ত করে ওদের গরু ছাগল তাড়াতে হবে। আর সেসব করতে না পারলে আমাদের ক্যাম্পাসের উন্নয়ন বা সৌন্দর্যবৃদ্ধি কোনটাই হবে না। চারপাশের গ্রামের মানুষদের এটা বংশানুক্রমিক যৌথ সম্পদ ছিল, এর উপর এদের অধিকার বোধ হঠাৎ করে অবলুপ্ত হবে না, ফলে এদেরকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পাস উন্নয়ন করা উচিত এরকম কোন চিন্তাভাবনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এপর্যন্ত প্রকাশ করেনি। অথচ ঘরের কাছেই মেদিনীপুরের আরাবাড়ির যৌথ বনসংরক্ষণ প্রকল্প, যেখানে স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় বেশ কয়েকশো হেক্টর বনাঞ্চল আজ দরিদ্র গ্রামবাসীর সহযোগিতায় সংরক্ষিত হচ্ছে অথচ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০ একরের ক্যাম্পাসে স্থানীয় আদিবাসী ও অন্যান্য নিম্নবর্গের মানুষকে নিয়ে দেশীয় গাছপালা লাগিয়ে, পুকুর খুঁড়ে একটা সুন্দর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করা যাচ্ছে না। এরজন্য টাকার চেয়েও বেশি প্রয়োজন একধরনের গ্রামমুখী ও পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গী।[৬] এ প্রসঙ্গে একটা বিষয়ের অবতারনা না করে পারছি না। ১৯৯৯ সালের ৫ই মার্চ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তন উৎসবে উপাচার্য অমিয় দেব মহাশয় তাঁর ভাষণের শেষদিকে বলেছেনঃ "This year I will speak of tolerance and support, for without tolerance and support a system like a university cannot function."[৭] উপাচার্য তাঁর ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, রাজ্যসরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সকলের সহযোগিতা ও সহনশীলতার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু একবারও ওঁর মনে হয়নি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসটা এতকাল যাদের যৌথ সম্পদ ছিল, এখনও যারা এখান থেকে তাদের বেঁচে থাকার নিত্য নৈমিত্তিক উপকরণ বহুকষ্টে সংগ্রহ করছেন তাদের সহনশীলতা

ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয গড়ে তোলাই সম্ভব হত না। ভবিষ্যতেব কোনও ঐতিহাসিক যদি বিদ্যাসাগব বিশ্ববিদ্যালযের ইতিহাস রচনার জন্য সমাবর্তন ভাষণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন কাগজপত্র ও দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটেন তাহলে ক্যাম্পাসের উপর নির্ভরশীল দবিদ্র মানুষজনের সংকটের কথা জানতেই পারবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্রে ক্যাম্পাসের চাবপাশের মানুষরা "অনুপ্রবেশকারী" ছাডা আব কিছুই নয়।

ক্যাম্পাসের জমির উপর থেকে স্থানীয় মানুষেব অধিকার কমিয়ে ফেলাব জন্য বিশ্ববিদ্যালয কর্তৃপক্ষ প্রথমে পাঁচিল তোলেন। তারপর যখন কিছুতেই ওই পাঁচিল দাঁড় কবিযে রাখা সম্ভব হল না তখন একটি বেসবকারী পাহাবাদাব বাহিনী নিযোগ কবা হল বছর তিনেক আগে। এদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাসে আনুমানিক ৩৫ থেকে ৪০ হাজাব টাকা খরচ কবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এখন তাই একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাওযা যায়। দৃশ্যটি এরকম - নীল উর্দি পবিহিত গাদা বন্দুক কাঁধে প্রহরীবা মুডাডাঙ্গা এবং আশেপাশেব আরও কিছু গ্রামের মানুষের গরু ছাগল তাডাচ্ছে আব চারপাশে মৃতপ্রায় কিছু গাছের চারা। ১৯৯৮ সালেব বর্ষাকালে মেদিনীপুব জেলা পরিষদ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হাজাব দশেক নানা প্রজাতির গাছের চা৷ রোপন কবাব ব্যবস্থা কবে দিয়েছিলেন। আজ ১৯৯৯ সালে এই দশ হাজার গাছের চাবাব ৫ শতাংশ গাছও বেঁচে নেই। কিন্তু এব ফলে বিশ্ববিদ্যালয কর্তৃপক্ষের আশপাশেব গ্রামেব মানুষদের সম্পর্কে ধারণা আবও খাবাপ হযেছে। কয়েকদিন আগে এক উচ্চপদাধিকারী আধিকাবিক এ বিষযে আলোচনা শুরু কবতেই বলে ফেললেনঃ "আমাদের চারদিকে গ্রাম কোথায় ? আমবা তো একদল চোর ডাকাত দ্বাবা পবিবেষ্টিত !"

এই ধারণাটিই নানা চেহারায় আমাদেব চিন্তাভাবনা ও ক্রিযা কর্মেব মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে যায়। এবিষয়ে আর একটি অলিখিত তথ্য এবাব উল্লেখ কবব। যে বছর স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে দেশ জুড়ে নানা ধুমধাম হল, সেই ১৯৯৭ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, আধিকাবিক, শিক্ষাকর্মী সকলে মিলে স্থিব করেন যে ১৫ই অগষ্ট সকালে উপাচার্যকে নিয়ে একটি মিছিল শহরের নানা পথ পরিক্রমা কববে। তখন কেউ কেউ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে ওইদিন যদি আমরা দরিদ্র মানুষের মধ্যে কিছু ফল বিতবণ করি তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয এবং ঠিক কবা হয় আমাদের ক্যাম্পাসের পূর্বপ্রান্তের কুষ্ঠরোগীদের বসতিতে (যাব নাম 'শালতোলা') গিয়ে ফল বিতরণ করা হবে। এরপর হঠাৎই প্রশ্ন ওঠে যে শালতোলায় যাওযাটা হয়ত ঠিক হবে না কারণ যতই হোক ওই জায়গাটা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের একটা ভীতি আছে। ক্রমে এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দেয় এবং শালতোলায যাওয়াটা বাতিল কবা হয়। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়েব অনেকেই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য। অবশেষে ঠিক হয ফল বিতবণ কবা হবে জেলা সদব হাসপাতালে। আমাদেব মিছিল স্বাধীনতাব পঞ্চাশ বছবে শালতোলার পাশ দিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে গেছিল ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মর্মরমূর্তিব গলায় মালা দেবাব জন্য। শালতোলার মানুষরা এবকম মিছিল আগে কখনো দেখেনি। ওরাও সার বেঁধে দাঁড়িযে ছিলেন। সেদিন ওবা ভিক্ষায় বেবোয়নি এবং বলা বাহুল্য যে ওদের সঙ্গে আমাদেব দূরত্বটা এতটুকু কমেনি।

এবার "ওরা" এবং "আমরা" এই দ্বিমাত্রিক বিভাজনের আর একটি উদাহরণ দেব। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয় ১৯৯৫ সালের ৯ই জানুয়ারী। সমাবর্তন ভাষণে তদানীন্তন উপাচার্য অধ্যাপক সত্যনারাযণ ঘোষ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অভাবের কথা বলতে গিয়ে একটা খবর দিয়ে ফেলেনঃ ""Recently, about 44 acres of additional land has been received from the State Government, but an acute paucity of funds has prevented the construction of new buildings and the completion of the ones started earlier to meet the basic and urgent development needs.""[৮] এর পর প্রায় দুবছর কেটে যায়। মুড়াডাঙ্গার ওই ৪৪ একর জমির (যার কিছু কিছু জায়গায় কয়েকটি পরিবার চাষ করতেন) উপর জেলা পরিষদের সহযোগিতায় কিছু গাছ লাগিয়ে কয়েকদিন পাহারা দেবার ব্যবস্থা হয়। এই জমির চারদিকে পাঁচিল তোলার মত সঙ্গতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল না। এইসব গাছ যত্নের অভাবে অল্পদিনের মধ্যেই মারা যায় এবং পুরো এলাকাটি আবার গোচারণ ভূমিতে পরিণত হয়। গ্রামের আদিবাসীরা অবশ্য বলেন যে এইজমিতে একসময় চাষ হত। জলের অভাবে চাষ বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কয়েকবছর আগে থেকে। জল পেলে এই জমিতে ভাল ফসল ফলবে। একদিন ওই জমির উপর দাঁড়িয়ে আমি ও আমার ছাত্র গৌর মান্ডি কথা বলছিলাম কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে। ওরা খোলাখুলিই বললেন "আপনারা এই জমির উপর কিছু করলেন না আমরাও এ জমিতে কিছু করতে পারছি না। এখন গরু চরানো ছাড়া উপায় কি"? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একেবারে কিছু করেন নি একথা কিন্তু ঠিক নয়। বিশ্ববিদ্যালয় এই জমির একটি নাম দিয়ে ফেলেছেন। ওদের ভাষায় এটি আমাদের third plot বা তৃতীয় ভূমিখণ্ড। ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলস্ ফব পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ এর সেক্রেটারীর ১৯৯৭ সালের প্রথম দিককার এক দীর্ঘ নোটের প্রথম অনুচ্ছেদ থেকে জানা যায় যে তৃতীয় ভূমিখন্ডের উপর "সাম্প্রতিক অনুপ্রবেশের" চেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে একটি টাস্ক ফোর্স তৈরী করা হয়েছে এবং ১৮/১১/৯৬ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকটি স্নাতোকোত্তর বিভাগের প্রধানদের নিয়ে এ বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্তসভায় নয়টি বিভাগ ওই ৪৪ একর জমির উপর নানাধরনের প্রয়োগভিত্তিক ও বৃত্তিমূলক পঠনপাঠন ও গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ইতিহাস বিভাগের প্রস্তাব ছিল নৃতত্ত্বের সঙ্গে যৌথভাবে স্থানীয় আদিবাসী সমাজের মুখের কথায় ইতিহাস রচনার গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা। এরপর ১০/৭/৯৭ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার আবার ওই নয়টি বিভাগের প্রধানদের কাছে ওইসব প্রস্তাবগুলিকে আরও বিশদভাবে তৈরী করে সাতদিনের মধ্যে তাঁর কাছে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেন।[৯] বিভাগগুলি যথাসময়ে তাঁদের প্রস্তাব রেজিষ্ট্রারের কাছে পাঠান। বলা বাহুল্য যে উক্ত প্রস্তাবগুলির প্রায় সবকটিতেই মুড়াডাঙ্গার অধিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে নানা উন্নয়নমূলক গবেষণার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু আজ ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাস শেষ হতে চলল এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছুই হয়নি। এবিষয়ে ৯ জুলাই ১৯৯৮ সালে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সাংবাদিককে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ডেপুটি রেজিষ্ট্রার জানিয়েছিলেন যে নয়টি বিভাগের ওইসব প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করতে গেলে যে টাকা পয়সার

প্রয়োজন তা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই।[১০] যদিও উক্ত সংবাদে তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলী জেলায় স্থানীয় দরিদ্র গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে নানাধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষাকে উন্নয়নের কাজে লাগানোর খবর পাওয়া যায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কথায় বিদ্যাসাগরে এসব করা সম্ভব নয়। ফলে আমরা যে তিমিরে থাকার সেখানেই রয়ে গেছি। আমাদের চোখে তৃতীয় ভূমিখন্ডের উপর "অনুপ্রবেশ" চলছে আর ওদের চোখে "আমরা কিছুই করছি না"। এই অবস্থা পাল্টাচ্ছে না। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ও তার চারপাশের নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত আর কোনও নতুন মাত্রা যুক্ত হয়নি। ফলে লেভিস্ট্রাউজের "ওরা" এবং "আমরা" এই দুইমাত্রার মানসিকতাই বলবৎ। এখনও পর্যন্ত এটাই আমাদেব ইতিহাস।

তথ্যসূত্র

১। Hobsbawm, Eric 1994 Age of Extremes, Viking.

২। The Vidyasagar University Act, 1981, Calcutta.

৩। Mukherjee, B.C. ""The Vidyasagar University : Its objectives and character - 1985-86 " in Journal of Higher Education. Vol. 13, Nos. 1-3, 1987-88.

৪। Medinipur (Urban studies series) 1996 National Atlas and Thematic Mapping Organisation. Govt. of India.

৫। Bhuniya, Satinath, Abhijit Guha and Rajat Kanti Das. 1996. ""Beggars May have Choice : A socio-demographic study of the Lepers in Medinipur Town, West Bengal." In Journal of the Indian Anthropological Society 31:273-278 (1996).

৬। গুহ, অভিজিত ১৯৯৭ "বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও ক্যাম্পাসের উন্নয়ন", কালান্তর ১৩ জুলাই ১৯৯৭ (পৃঃ ৪)

৭। Dev, Amiya Kumar 1999. Fourth Convocation Address, 5 March 1999, Vidyasagar University.

৮। Ghosh, S. N. 1995 First Convocation Address. 9 January 1995, Vidyasagar University.

৯। Letter of Registrar, Vidyasagar University bearing reference No. VU/R/Land/ 630/97 dated 10.07.97.

১০। "A tale of two university hundreds of miles apart" The Statesman 9 July 1996 (p. 3).

মুর্শিদাবাদে আঞ্চলিক সংবাদপত্রের বিকাশ : উনিশ শতক ও পরবর্তী যুগ

অনিরুদ্ধ দাস

ঊনবিংশ শতাব্দীব বাংলাব নবজাগবণেব অন্যতম প্রধান ইতিবাচক দিক ছিল বাংলায় সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রেব প্রচলন ও বিস্তাব। কোন কোন গবেষকের মতে শিল্পে বা স্থাপত্যে নয়, বাংলার-রেনেশাঁসেব মূল প্রভাব পড়েছিল বাংলা সাহিত্যেব ওপর। অনেকে আবার মন্তব্য কবেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগবণের ইতিহাস মুখ্যত বাংলা সংবাদপত্রেরই ইতিহাস। বাংলা সংবাদপত্রেব ইতিহাসেব ধারায় কলকাতা অগ্রগণ্য। আব কলকাতার পরই মফঃস্বল বাংলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রেব প্রেক্ষাপটে নাম আসে মুর্শিদাবাদের।

বাংলার - নব্যশিক্ষিত শ্রেণী কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাস কবত। পরবর্তীকালে শিক্ষাব প্রসারের সঙ্গে মফঃস্বল বাংলা থেকেও সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয়। মুর্শিদাবাদের প্রাচীন সংবাদপত্রগুলি বেশীদিন ধবে চলেনি। এগুলিব পুবনো সংখ্যাও পাওযা দুষ্কর, কাবণ সংরক্ষণ যথাযথ নয়। তাই কিছু সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়।

অখন্ড বাংলা অর্থাৎ বাংলা, বিহাব, ওড়িশা, আসাম সহ সমগ্র পূর্ব ভারতে কলকাতাব বাইরে মফঃস্বল থেকে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র সাপ্তাহিক "মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী"। মুর্শিদাবাদ জেলাব কাশিমবাজাব থেকে ১৮৪০ সালের ১০মে এর প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক ছিলেন গুরুদয়াল চৌধুবী। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কাশিমবাজাব রাজা কৃষ্ণনাথ রায়। বিলাত ও কলকাতা থেকে আমদানি কবেছিলেন ছাপাখানার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। ঐ বছরেরই ১৪ মে কলকাতা থেকে জি. এইচ. হাটম্যান কর্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক 'Calcutta Courier' পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায 'Indian News' শিরোনাম ছাপা হয় - A new Bengally Newspaper - The first number of new Bengally paper called the 'Moorshedabad SengbadPutri' has just made its appearance. It is, we believe, published under the auspices of Kowar Kissennath Roy of Moorshedabad.' কিন্তু মাত্র এক বছর চলার পরই এর প্রকাশনা বন্ধ কবে দিতে হয। সবকাবী কর্মচারীব কাজের সমালোচনা করার জন্য কালেকটার মি: পিয়ার্স টেলব ও ম্যাজিস্ট্রেট মি: হ্যারী এলিযট পত্রিকাটির বিরুদ্ধে বিপোর্ট করেন। অবশেষে ভার্নাকুলাব প্রেস এ্যাকটেব দাওযাইয়ে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৮৪১ সালেব ১০ এপ্রিল সংবাদ ভাষ্কব লিখেছে, "রাজা কৃষ্ণনাথ বায় বাহাদুর সর্বাগ্রে স্বকীয রাজধানীতে মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী নামে এক সংবাদপত্র

প্রকাশ করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের কোপে উক্ত রাজা বাহাদুরের বর্তমানেই তার প্রাণবিয়োগ হয়। ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাকটের দাপট এড়াতে রাজা কৃষ্ণনাথ 'মুর্শিদাবাদ নিউজ' নামে একটি প্রত্রিকা প্রকাশ করেন। সম্পাদক ছিলেন মি: ল্যামবার্ট। কিন্তু সে পত্রিকাও বেশী দিন চলেনি। রাজা কৃষ্ণনাথের অল্প বয়সে আত্মহত্যা অবশ্য এর একটা কারণ।

মুর্শিদাবাদে সংবাদপত্রের প্রকাশনা এরপর প্রায় ২০ বছর বন্ধ থাকে। মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ থেকে বিশ্বমনোরঞ্জন নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। প্রকাশক ও সত্বাধিকারী নবকিশোর সেনের ধনসিন্ধু প্রেস থেকে এটি ছাপা হত। ১৮৬৩ সালে নবকিশোর সেনের তত্ত্বাবধানেই আরেকটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয। নাম ভারতবন্ধু। ১৮৬৪ সালে নবকিশোর সেন ভারতরঞ্জন নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। অনেকে মনে করেন পূর্ববর্তী দুটি পত্রিকা তৃতীয়টিতে একীভূত হয়েছিল। ১২৭১ সালের শ্রাবণ মাসে 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'-য় মন্তব্য করা হয়, "পত্রিকা দু খানির পরিবর্তে একখানি হইয়াছে, এক্ষণে উত্তমরূপে চলতে পারে।" ১৮৬৪ সালের জুলাই মাসে নবকিশোর সেনের মৃত্যুর পর 'ধনসিন্ধু যন্ত্রালয়' আজিমগঞ্জ থেকে বহরমপুরে চলে আসে। এবং ভারতরঞ্জন বহরমপুর থেকেই প্রকাশিত হতে শুরু করে। এর প্রচার সংখ্যা ছিল ২৫০। ধনসিন্ধু প্রেস থেকে মাধুকরী ও সাপ্তাহিক সমবেদক নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হত বলে কোথাও কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতকের শেষ তিনটি দশকে মুর্শিদাবাদ থেকে বেশ উল্লেখযোগ্য কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হত। সাহিত্য ভাবনায় মুর্শিদাবাদের স্থান ছিল অন্যান্য জেলা গুলির তুলনায় অগ্রগণ্য। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, মনীশ ঘটক প্রমুখ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন মুর্শিদাবাদের সাহিত্য ভাবনাকে ও সেই সঙ্গে মুর্শিদাবাদের সংবাদপত্রের ইতিহাসকে। এই সময় মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত হয় 'প্রতিকার', 'মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি', 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' প্রভৃতি। এর সঙ্গে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন'।

বাংলা ১২৮২-১৩২৭ মোট ৪৫ বছর টিকে ছিল সাপ্তাহিক 'প্রতিকার'। প্রকাশিত হত কামাখ্যানাথ গাঙ্গুলীর প্রতিকার প্রেস থেকে। এই সময়ই সৈদাবাদ সত্যরত্ন প্রেস থেকে হরিমোহন সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি'। যদিও শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মুর্শিদাবাদ কথা' গ্রন্থে জানান মুর্শিদাবাদ সম্বাপত্রীর পরই মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধির - আবির্ভাব। আজিমগঞ্জের - স্বর্গীয় রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুরের দ্বারা যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে প্রথম পর্যায়ে মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি কয়েক বছর প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। ১৩০০ সালে প্রকাশিত হয় বিখ্যাত বাবু বৈকুন্ঠনাথ সেনের সম্পাদনায় 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী'। মুশিদাবাদে বর্তমানে প্রচলিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন। একশো বছরের বেশী সময় ধরে একটি পত্রিকা একটানাভাবে মুর্শিদাবাদে ইতিপূর্বে চলেনি। বৈকুন্ঠনাথ সেন ছিলেন আইনজীবী। তাঁর পর সম্পাদক হন আরেক আইনজীবী বনওয়ারীলাল গোস্বামী। তারপর ঐ পদে আসেন তাঁর পৌত্র। বনওয়ারীবাবুর সময় সাপ্তাহিকটিব মুদ্রাকর ছিলেন

শশীভূষণ ঘোষ। বর্তমান প্রকাশক বিশ্বনাথ ঘোষ। জানা গেল জমিদারী যুগে জজ কোর্টের নিলাম ইস্তাহার নোটিশ ইত্যাদি বিজ্ঞাপন দিয়ে চলত। ১৯৫৭ সাল থেকে জমিদারী প্রথা বন্ধ হওয়া থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। সবকারী বিজ্ঞাপন পাওয়া গেলেও বেসরকারী বিজ্ঞাপন নেই।

১৮৭৪ সালের ৮ ও ১৫ জানুযাবী অমৃতবাজার পত্রিকার একটি সংবাদ থেকে জানা যায় ঐ সময় 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা ছিল। ঐ দু'দিনে অমৃতবাজার পত্রিকা মুর্শিদাবাদ পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশ করে। বহবমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু বঙ্কিমবাবুর পালকি একটি মাঠে নেমে যায এবং সেখানে ক্রীড়ারত সাহেব কর্নেল ডাফিন বঙ্কিমবাবুকে শাবীবিকভাবে নিগৃহীত করেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র এরপর তাঁর বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করলে হাজার দর্শকের সামনে কর্নেল ডাফিন ক্ষমা চেয়ে নেন।

বহরমপুরে এই সময় সাহিত্য চর্চা চলত; মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামদাস সেন, রামগতি ন্যায়রত্ন, দীনবন্ধু মিত্র, রেভারেন্স জেমস লর্ড প্রমুখ ছিলেন সেই চর্চার জ্যোতিষ্ক। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম পর্যায়ে (১৮৭২ সালের এপ্রিল মাস) 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করতেন বহরমপুর থেকেই। আর তা ছাপা হত কলকাতায়।

১৩২১ বঙ্গাব্দে বঘুনাথগঞ্জ থেকে দাদাঠাকুর শরৎ চন্দ্র পণ্ডিতের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে শুরু করে 'জঙ্গীপুর সংবাদ'। ১৩১০ সালে বাই বছর বয়সে মাত্র ছেচল্লিশ টাকায় প্রেসের সাজ সবঞ্জাম কিনে প্রেস মালিক হন তিনি। একাই ছিলেন কম্পোজিটার, প্রুফ রীডার, ইঙ্কম্যান। ১৩২৯ সালে দাদাঠাকুব 'বিদূষক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার আগাগোড়া সমস্ত কাজ নিজে করে আবার তিনি তা কলকাতায় গিযে ফিরি করতেন। জঙ্গীপুর সংবাদের ৩০ ভাদ্র, ১৩১১-র একটি সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে বাৎসরিক মূল্য ১।।০ বা দেড় টাকা, নগদ মূল্য ৫ বা এক পয়সা। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার ডানদিকে একটি মন্দির এবং বাম দিকে মসজিদের ছবি। মাঝে দু লাইনের একটি কবিতা—

'মন বসনা সাফ কর ধর গরিবী বেশ
মিঠি বোলি লেকে চল সবহি তু মাহা দেশ।।'

জঙ্গীপুর সংবাদের বর্তমান সম্পাদক অনুপম পণ্ডিত জানালেন, প্রথম দিকে এটা ডবল ফুলস্কেপ মাপের কাগজ ছাপা হলেও তারপর ১/৪ ডিমাই মাপের কাগজে ছাপানো হত। ১৯৭৫ সাল থেকে এটি ১/৪ ডবল ক্রাউন মাপের কাগজে ছাপা হয়। এই পত্রিকায় ১৯৬২ সালের একটি সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে নগদ মূল্য ৬ নয়া পয়সা। বার্ষিক ২ টাকা ২৫ পয়সা। বিজ্ঞাপনের হাত প্রতি লাইন ৫০ পয়সা। দু'টাকার কম বিজ্ঞাপন ছাপানো হয় না। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের হার বাংলার দ্বিগুণ। দু'একটি সস্তার বিজ্ঞাপন ও আদালতের নিলাম ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন ছিল এই পত্রিকার মূল আয়। সমসাময়িক বাংলার অন্যান্য পত্রিকার মত এই দাদাঠাকুরের পত্রিকাতেও সি. কে. সেনের জবাকুসুম তৈল ও কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেনের কেশরঞ্জন তৈলের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত।

এখনো চলা আরেকটি পরিচিত সংবাদ সাপ্তাহিক 'কান্দী বান্ধব'। কান্দী শকুন্তলা প্রেসের

সত্বাধিকারী গোপালচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের উৎসাহ ও ব্যয়ে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের প্রথম মাস থেকে এই পত্রিকার প্রকাশ শুরু। ব্যবহারজীবী নলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে এর সম্পাদক নবকুমার মুখোপাধ্যায় ও কল্যাণ মুখোপাধ্যায়।

১৯৭১ সালে এর দাম ছিল ১৫ পয়সা। ঐ বছরেব ১৫ ডিসেম্বর নবগঠিত প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে 'কান্দী বান্ধব'-এর স্বাগত জানানোর ভাষা ছিল—

"বিশ্বকবির সোনার বাংলা ০ নজরুলের বাংলাদেশ
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা ০ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ।

মুক্তির রশ্মিছটায় স্বাধীনতার নব অরুনোদয়ের ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্বাগত জানাই প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে।"

১৯৮০ সালে এর দাম বেড়ে দাঁড়ায় প্রতি সংখ্যাব জন্য ২৫ পয়সা।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত অন্যতম প্রধান সংবাদপত্র ছিল 'গণরাজ'। ১৯৮১ সালের গণকণ্ঠ বিশেষ সংখ্যায় 'মুর্শিদাবাদের সংবাদপত্র ও গণকণ্ঠ' প্রবন্ধে - কমল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "কিছু তরুণ কংগ্রেসী একখানি নতুন ধরণের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হলেন ১৯৪৭ সালে। মাথাব ওপর মৌলভী রেজাউল করীম, আর তাঁর সঙ্গে বিজয় গুপ্ত, শোভেন সেন, কমল বাড়ুজ্যে এবং উমানাথ সিংহ। ...স্বাধীনতা লাভের পর মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম সংবাদ সাপ্তাহিক। ....গণরাজ নিলাম ইস্তেহার কখনো নেওয়া হত না। প্রতি সপ্তাহে দু'হাজার পত্রিকা চলত। ...কিন্তু গণবাজে তিন বছর চলার পর প্রকাশন বন্ধ করে। কারণ একটাই জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বের পরিবর্তন। গণরাজ প্রকাশিত হত জেলার কংগ্রেস কর্মীদেব মুখপাত্র হিসাবে"।

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়েব বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন আকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক সত্যরঞ্জন বক্‌সী। তাঁর উদ্যোগেই মুর্শিদাবাদের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র ছাপা হয়। নাম 'নতুনবাজার'। সম্পাদক ছিলেন সত্যরঞ্জন বক্‌সী ও ছবিরঞ্জন মজুমদার। দাম ছিল ১৫ পয়সা। মাসে গ্রাহক চাঁদা ছিল ৪ টাকা। ঠিক কতদিন এই পত্রিকা চলেছিল তা জানা যায় না। তবে বাংলা ১৩৮৫ অব্দে এটি প্রকাশিত হত।

প্রয়াত সত্যরঞ্জনবাবুর আরেক উদ্যোগ ছিল সাপ্তাহিক 'মুর্শিদাবাদ সন্দেশ'। পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়া বর্তমানে পাক্ষিক এই পত্রিকার সম্পাদক গৌবী বক্‌সী। আগামী ২০০৪ সালে মুর্শিদাবাদের নামকরণের ৩০০ বছর পূর্ণ হওয়ার কথা প্রথম ঘোষিত হয় এই পত্রিকারই পঁচিশ বছরে পদার্পণেব অনুষ্ঠানে।

বর্তমানে ২৩ বছরে পদার্পণ করল পাক্ষিক 'গণকণ্ঠ' পত্রিকা। সম্পাদক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী। মুর্শিদাবাদের হারিয়ে যাওয়া অথচ পুনর্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার কাজে 'গণকন্ঠ' পারদর্শী। মুর্শিদাবাদেব পাখি থেকে শুরু করে, রাস্তা ঘাট, বাড়ী ইত্যাদির ইতিহাস এবং মুর্শিদাবাদের প্রায় সমস্ত গ্রামের তথ্য সম্বলিত গত প্রায় ১৫ বছরের গণকণ্ঠ বিশেষ সংস্থা মুর্শিদাবাদ সম্পর্কিত আকব গ্রন্থ।

১৯৫৭ সালে বহরমপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক জনমত। প্রথম সম্পাদক শংকর ঘোষ, বর্তমানে রাধারঞ্জন গুপ্ত। আর ১৯৬০ সালে যাত্রা শুরু করে মুর্শিদাবাদে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'মুর্শিদাবাদ বার্তা'। প্রথম সম্পাদক ছিলেন গৌরীচরণ ভট্টাচার্য্য, পরে হন অপর্নাকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য। বর্তমানে এটি সুধীন সেনের সম্পাদনায় বহরমপুরের কুমকুম প্রেস থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

পাক্ষিক 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ' সম্পাদনা করে বহরমপুর থেকে প্রকাশ করেন অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্তী। সমীক্ষামূলক সংবাদ পরিবেশনা এর বৈশিষ্ট্য। আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ পত্রের মধ্যে বলা যায় 'ঝড়' পত্রিকার কথা। ১৯৬৮ সালে রঘুনাথগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত হতে শুরু করলেও বর্তমান প্রকাশ স্থল বহরমপুর। সম্পাদক অচিন্ত্য সিংহ। ১৯৯১ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে বেলডাঙ্গা সমাচার। মুর্শিদাবাদের উত্তরাংশ ফারাক্কা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে শিল্পনগরী।

১৯৯০ সালে প্রকাশিত একটি তালিকা থেকে জানা যায় মুর্শিদাবাদে পত্র পত্রিকার সংখ্যা ২৬৩টি। এর মধ্যে যেমন আছে সংবাদপত্র, তেমনি আছে সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক পত্রিকা। তবে সংবাদপত্রগুলির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। পুরনো যুগে রাজা-জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় চললেও এখন এগুলি চলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। মুনাফা ভিত্তিক নয়, এই ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলি অধিকাংশই 'আদর্শের জন্য' প্রকাশিত হয়। এগুলির প্রচার সংখ্যা দুই থেকে আড়াই হাজার। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছাপাখানার মালিক ও পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক একই ব্যক্তি। তবে দৈনিক পত্রিকায় স্থান না পাওয়া স্থানীয় অথচ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি পরিবেশনার ক্ষেত্রে মফঃস্বলের এই ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা অপরিসীম। স্থানীয় অভাব-অভিযোগ ও চাহিদা যথাযথভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এগুলির উপযুক্ত পরিবর্তন এখনো নেই বললেই চলে।

সূত্র নির্দেশ :

১। সাহিত্যসাধক চরিতমালা (দ্বিতীয় খণ্ড)-ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।
২। বাংলা দেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) : রমেশ চন্দ্র মজুমদার।
৩। বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ - ড: পার্থ চট্টোপাধ্যায়।
৪। গণকন্ঠ বিশেষ সংখ্যা - ১৯৮১, ১৯৮৬, ১৯৯০
৫। মুর্শিদাবাদ কথা - শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬। মুর্শিদাবাদ সন্দেশ - ২৫ বর্ষ ৪ সংখ্যা
৭। ওভারল্যান্ড পত্রিকা ১৬ মে, ১৯৯৩ - প্রবন্ধ - সাহিত্যভাবনা - মুর্শিদাবাদ : শ্যামল দাস
৮। মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার - বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত (১৯৭৯)

এ ছাড়াও মুর্শিদাবাদ সন্দেশ, কান্দী বান্ধব, জঙ্গীপুর সংবাদ পত্রিকার দপ্তর থেকে প্রাপ্ত পুরনো কয়েকটি সংখ্যা ও প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য।

বিংশ শতাব্দীতে গোবরডাঙার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা

সুখেন্দু দাশ

গোবরডাঙ্গার আঞ্চলিক ইতিহাস সম্বলিত প্রথম গ্রন্থ 'কুশদ্বীপ কাহিনী' প্রকাশিত হয় ইংরাজী ১৯০২ সালে। গ্রন্থখানির রচয়িতা বিপিনবিহারী চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার অন্তর্গত খাঁটুরা গ্রামের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ও বৈদ্য ভগবানচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম বাংলা ১২৫৯ সালে এবং বাংলা ১৩০৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ফলে 'কুশদ্বীপ কাহিনী' গ্রন্থটির মাত্র ৯ ফর্মা পর্যন্ত তিনি মুদ্রাঙ্কণ করে যেতে পেরেছিলেন, পরবর্তীকালে খাঁটুরা নিবাসী দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন।

বোঝা যাচ্ছে 'কুশদ্বীপ কাহিনী'র প্রকাশকাল ১৯০২ হলেও তার রচনাকাল ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষেব দিক। ঐ সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙালার ইতিহাস নাই' বলে খেদোক্তি করেছেন আবার 'কে লিখিবে ? ...যে বাঙালী তাহাকেই লিখিতে হইবে' বলে ইতিহাস রচনার প্রেরণা সঞ্চার করেছেন। তাছাড়া স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশও সে যুগে বাঙালীর মনন চর্চার ধারাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছিল। দেশপ্রেমিক বিপিনবিহারী সেকারণেই বোধ হয় লিখতে পেরেছিলেন "পাপিয়সী ! একদিকে চক্রদ্বীপ ও অপরদিকে সুদূর যশোহর, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে, যে বিশাল জনপদ কুশদ্বীপ নামে আখ্যাত হইত,....নবদ্বীপও যাহার কুক্ষিগত হইয়া আপনাকে শ্লাঘাবান মনে করিয়াছিল, মহারাজ প্রতাপাদিত্য...যাহার একজন সামান্য ভূস্বামীর নিকটেও লজ্জিত ও নতশির হইয়া...স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন, যাহার অন্তবর্তী...ব্রাহ্মণমন্ডলীর সুবিমল বিদ্যাজ্যোতিতে ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, এমনকী দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণও একদিন হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছিলেন-সেই মহাদ্বীপ কুশদ্বীপেও কি তোর দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর হস্তের পরিণাম লক্ষিত হইতেছে না ?"

গ্রন্থটি পাঠ করলে দেখা যায় বিপিনবিহারী চক্রবর্তী এবং দুর্গাচরণ রক্ষিত, উভয়েই তথ্য সংগ্রহে অত্যন্ত যত্নবান এবং স্বত:স্ফূর্ত ছিলেন। আলোচ্য এলাকাব মুখ্য ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণ তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন সাহিত্যেব ভাষায়। ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের আস্থা এবং স্বাভাবিক দুর্বলতা আধুনিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সমালোচিত হতে পারে, কিন্তু গ্রন্থটির কোথাও উদ্দেশ্য প্রণোদিত তথ্যবিকৃতির নজির পাওয়া যায় না। বিপিনবিহারীবাবু লিখেছেন, "যখন পূর্বতন হিন্দুগানের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুশদ্বীপ সমাজের কোনও প্রকৃত ইতিহাস আছে তাহা বলিতে পারিনা। তবে 'ক্ষিতিশ বংশাবলী চরিত' অন্যান্য 'সরকারী

কাগজ' এবং ইতিহাসেব মূল 'জনশ্রুতি'' অবলম্বন করিয়া আমরা এই কুশদ্বীপ সম্বন্ধে যাহা অবধারণ করিতে পাবিয়াছি, তাহাই প্রকটন করিতেছি। কিন্তু তাহা কতদূর প্রামানিক, তাহা নির্ণয় কবা নিতান্ত কঠিন।''---এই সীমাবদ্ধতা এবং অপূর্ণতা সত্ত্বেও 'কুশদ্বীপ কাহিনী' গ্রন্থখানি গোবরডাঙ্গাব আঞ্চলিক ইতিহাস বচনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং এখন পর্যন্ত সর্বপ্রধান গ্রন্থ।

গ্রন্থটি চারটি অধ্যাযে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে লেখক আবেগধর্মী ভাষায় কুশদ্বীপ সমাজের তথা বাঙালীর ধাবাবাহিক ইতিহাস না থাকার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতই আক্ষেপ কবেছেন এবং কুশদ্বীপাধিপতি কাশীনাথ বাযের সময় থেকে এই এলাকার সমাজ গড়ে ওঠার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুশদ্বীপ অঞ্চলের অবস্থান, সীমা সহ মূল্যবান ভৌগোলিক তথ্য পবিবেশিত হয়েছে। সেই সাথে কুশদ্বীপ তথা খাঁটুরা গোববডাঙ্গার আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলিকে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'কুশদ্বীপবাসী'। এই অধ্যায়ে খাঁটুবা গোববডাঙ্গা এবং পার্শ্ববর্তী ইছাপুর গ্রামের কয়েকটি বিখ্যাত বংশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এব মধ্যে আছে ইছাপুরের ভূস্বামী চৌধুরী পরিবার, গোবরডাঙ্গার জমিদার পবিবাব, খাঁটুরাব পন্ডিত সমাজ এবং তাম্বুলী বণিক গোষ্ঠীর খাঁটুরা-গোবর-ডাঙ্গায় বসতি স্থাপনের কাহিনী। পাশাপাশি অপরাপর সামাজিক জাতি সমূহের উল্লেখও করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গোবরডাঙ্গাব অর্থনৈতিক বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থিত তাম্বুলি বণিক সমাজের পারিবারিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে।

গ্রন্থটিতে সাল-তারিখ উল্লেখের স্বল্পতা সত্ত্বেও আলোচিত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় লেখক সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত গোবরডাঙ্গা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার ইতিহাসেব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি তুলে ধরেছেন। সহলেখক দুর্গাচরণ রক্ষিত যথার্থ মন্তব্যই করেছেন যে, ''বিপিনবাবু এই 'কুশদ্বীপ কাহিনী'র সূচনা করিয়া এক নতুন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সংগ্রহ সকল যথাযথ ও পূর্ণ না হইতে পাবে, কিন্তু তাঁহার এই উদ্যম যে ভবিষ্যৎ কাহিনী লেখকের পক্ষে অনেক সাহাযা করিবে তদ্বিষয়ে আব সংশয় নাই। কুশদ্বীপবাসী মাত্রেই একারণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ।'' —এই মন্তব্য যে কতখানি সঠিক তা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর-খুলনাব ইতিহাস' বা নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ইতিহাসের বনগ্রাম' গ্রন্থ রচনাকালে এই গ্রন্থটিব উপর অনেকখানি নির্ভর করেছেন। পরবর্তীকালে বিপিনবিহারী চক্রবর্তীব ভাগিনেয়া শিল্পী হাসিরাশি দেবী-'কুশদহের ইতিহাস' শিরোনামে ১৯৬৮ সালে এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন।

গোবরডাঙ্গার আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার অপর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত 'তাম্বুল বণিক- সম্বন্ধ নির্ণয।' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯০৪ সাল। এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'কুশদ্বীপ কাহিনী' গ্রন্থেব প্রথম পরিশিষ্ট হিসেবে। এতে তাম্বুলীজাতির উৎপত্তির শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাসহ বিভিন্নস্থানে তাদের বসতি স্থাপনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসেছে হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম, বেড়ালা- বৈঁচি প্রভৃতি স্থান থেকে আগত তাম্বুলি সম্প্রদায়ের কুশদ্বীপ এলাকায বসতি স্থাপনেব কাহিনীও। উল্লেখযোগ্য যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে গোবরডাঙ্গার

নগরায়ণে তাম্বুলি বণিক গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দুর্গাচরণ রক্ষিত 'কুশদ্বীপ কাহিনীর দ্বিতীয় পরিশিষ্ট হিসাবেব 'খাঁটুরা বাসির ভারত প্রদক্ষিণ' নামে অপর একখানি গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সেটি প্রকাশিত হয়েছিল কীনা জানা যায় না।

গোবরডাঙ্গার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার পরবর্তী উদ্যোগটি আমরা দেখতে পাই যোগীন্দ্রনাথ কুন্ডু সম্পাদিত 'কুশদহ' নামের মাসিক পত্রিকায়। পত্রিকাটি ১৯১০ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকায় 'কুশদহের ইতিহাস' শিরোনামে একটি ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক ছিলেন চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গোবরডাঙ্গায় ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের ইতিহাসও আলোচিত হয়েছে কয়েকটি সংখ্যায়। পত্রিকাটি আজ লুপ্ত কিন্তু গোবরডাঙ্গার আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে মূল্যবান দলিল হিসাবে এই পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাই বিবেচিত হতে পারে।

শতাব্দীর প্রথম দুটি দশকের পর থেকে সাত এর দশক পর্যন্ত গোবরডাঙ্গায় আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার তেমন উল্লেখযোগ্য নজির পাওয়া যায় না। সম্ভবত দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের মত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিষয়গুলি সামনে এসে পড়ায় আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা চাপা পড়ে যায়। তবে ওই সময়কালে 'The Statesman', 'The Amritabazar Patrika', বসুমতী, বঙ্গবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দৈনিক ও সাময়িকপত্রে গোবরডাঙ্গা সম্পর্কিত খবর প্রকাশিত হলে অনেকেই তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতেন। এগুলি পরবর্তীকালের ইতিহাস চর্চায় সহায়ক উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

১৯৭০ সালে স্থানীয় মাসিক পত্রিকা 'গোবরডাঙ্গা'-র প্রকাশ ও ১৯৭৩-এ গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনষ্টিটিউট-এর প্রতিষ্ঠার পর গোবরডাঙ্গায় আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা একটি বিশেষ মাত্রা পায়। 'গোবরডাঙ্গা' পত্রিকার সম্পাদক ও রেনেসাঁস ইনষ্টিটিউটের কর্ণধার মণি দাশগুপ্ত আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বস্তুত তাঁরই প্রেরণায় 'গোবরডাঙ্গা' পত্রিকায় আঞ্চলিক ইতিহাসাশ্রয়ী বেশ কিছু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকদের মধ্যে ছিলেন শচীন্দ্রকুমার ঘোষ (তারাবাবু), ড: গৌরীশঙ্কর দে, ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, দীপকুমার দাঁ, ড: সন্দীপ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৯৭৯ সালের এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্মেলন হয়েছিল গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজে। এই উপলক্ষ্যে গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় আঞ্চলিক ইতিহাসের উপর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। 'গোবরডাঙ্গা' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছিল। আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কিত বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এই সংখ্যায়।

বস্তুত আট-এর দশকে গোবরডাঙ্গা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একটি জোয়ার এসেছিল। হাবড়ায় গড়ে উঠেছিল, 'চব্বিশ পরগণা ইতিহাস অনুসন্ধান সমিতি' এবং 'চব্বিশ পরগণা ইতিহাস সংসদ।' এইব সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'পুরাতনী', 'পুরাবৃত্ত' নামের পত্রিকাগুলি। এছাড়া ১৯৮৯ সাল থেকে প্রকাশিত গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনষ্টিটিউটের মুখপত্র 'কুশদহ বার্তা' পত্রিকাখানিও এই ধারাকে অব্যাহত

রেখেছে। এই পর্যায়ে ইতিহাস লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দিলীপ দাস, কুমারেশ দাশ, মুরারীমোহন আশ, ড: নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, বাসুদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

গোবরডাঙ্গার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত 'ইতিহাসের আলোকে গোবরডাঙ্গা' গ্রন্থখানি। এটি প্রকাশ করেছেন সংকলন ও প্রকাশন সমির্তি; প্রাক্তন ছাত্র সংসদ, গোবরডাঙ্গা-খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয়। গ্রন্থটিতে আছে বৃহত্তর গোবরডাঙ্গাব ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত, বৃহত্তর গোবরডাঙ্গার আর্থসামাজিক জীবন, ইতিহাসের আলোকে গোবরডাঙ্গার শিক্ষার ইতিহাস, গোবরডাঙ্গার সংস্কৃতির ইতিহাস, ইতিহাসের আলোকে গোবরডাঙ্গার খেলাধূলা, গোবরডাঙ্গায় জনবিজ্ঞান চর্চা, গোবরডাঙ্গার রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত এবং গোবরডাঙ্গার পাঁচ কৃতী সন্তান। লেখক তালিকায় আছেন শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজনকান্তি নন্দী, পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়, সমীর নন্দী, দীপককুমার দাঁ, সুনীল বিশ্বাস, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুবোধকুমার দাস, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও দুলাল দাঁ। সমবেত উদ্যোগে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিতে উল্লিখিত বিষয়গুলিকে আলোচনা করা হয়েছে প্রচুর তথ্যের সাহায্যে।

এইসব সংগঠিত উদ্যোগেব পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগও উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে শ্রী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী কুমারেশ দাশ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই অঞ্চলের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছু নিবন্ধ পেশ করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় গোবরডাঙ্গা ও তার পার্শ্ববর্তী স্বল্পখ্যাত বা অখ্যাত অঞ্চলের ইতিহাস নিয়ে শতাধিক বর্ষ যাবৎ যে চর্চা বা গবেষণা চলছে তা উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় শুধু নয়, আমাদের রাজ্যের মধ্যেও একটি বিশিষ্ট স্থান দাবী করতে পারে।

সূত্র নির্দেশ

১। বিপিন বিহারী চক্রবর্তী ও দুর্গাচরণ রক্ষিত - কুশদ্বীপ কাহিনী কলিকাতা, ১৯০২
২। দুর্গাচরণ রক্ষিত - তাম্বুল বণিক - সম্বন্ধ নির্ণয়, ১৯০৪
৩। দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত 'কুশদাহ' মাসিক পত্রিকা
৪। মণি দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'গোবরডাঙ্গা' পত্রিকা
৫। সুখেন্দু দাশ ও দীপকুমার দাঁ সম্পাদিত 'কুশদহ বার্তা'
৬। প্রাক্তন ছাত্র সংসদ, গোবরডাঙ্গা - খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয় - ইতিহাসের আলোকে গোবরডাঙ্গা, গোবরডাঙ্গা, ১৯৯৪।

আসামের একটি ছোট জনজাতি "দেউরী" - কিছু প্রাথমিক অনুসন্ধান

জলি বাগচী

দেউরী জনজাতিটিকে আসামের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম জনসংখ্যা সম্পন্ন গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এরা তিব্বত থেকে বার্মা এবং পরে বার্মা থেকে ভারতে আসে।

বার্মা
চাংচকুল (প্রাগৈতিহাসিক পর্বে)
সোদিয়া
ডিবং নদী (Dibang River)
গোলাঘাট
মাজুলি (Majuli)
শ্রীরাম
উত্তর লক্ষিমপুর (North Lakhimpur)

এরা মূলত: তিব্বত-বার্মা (Tibeto-Burma) গোষ্ঠীর অন্তর্গত। শোনা যায় 'ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তর-পূর্ব সীমানা ব্যাপি মোঙ্গলয়েড - সংমিশ্রিত বিভিন্ন উপজাতি বাস করে'১ ...'মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের প্রবাহ সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে, বহ্ম হইতে আগত প্রবাহ আসাম ও বঙ্গ-আসাম সীমান্তের কয়েকটি অঞ্চলে দেখা যায়...২ সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, দেউরীরাও মঙ্গোলয়েড সংমিশ্রণের প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

বর্তমানে আসামের উত্তর লক্ষিমপুর হচ্ছে দেউরী নামক জনজাতি গোষ্ঠীর মুখ্য কেন্দ্রীভূত অঞ্চল। তবে এদের এই স্থায়ী অবস্থানে আসার গতিবিধি হচ্ছে-তিব্বত থেকে বার্মা, বার্মা থেকে চাংচকুল, সেখান থেকে সোদিয়া-বিশেষ করে পরশুরাম কুন্ডু (পরশুরাম কুন্ডু অবশ্য বর্তমানে অরুণাচলের অন্তর্গত)। সোদিয়া বর্তমানে ভাগাভাগি হয়ে অর্দ্ধেক অরুণাচল এবং অর্দ্ধেক আসামের সাথে যুক্ত হয়েছে। সোদিয়াতেই এরা প্রথম স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। সোদিয়াতে থাকাকালীন পর্বে দেউরীয়া অন্যান্য জনজাতিদের সাথে যুদ্ধ-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে এরা ডিবং নদী পেরিয়ে চলে আসে গোলাঘাটে। সেখান থেকে মাজুলী এবং পরে শ্রীরাম হয়ে পাকাপাকিভাবে উত্তর লক্ষিমপুরে (আসাম) স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। উত্তর-লক্ষিমপুরের ১৩/১৪ খানা গ্রামে এদের মূল জনসংখ্যা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। অবশ্য বর্তমানে শিক্ষা এবং চাকুরীর প্রয়োজনে এরা আসামের গৌহাটি, শিবসাগর এবং পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারেও ছড়িয়ে রয়েছে। উত্তর লক্ষিমপুরের স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার গতিপথের পরিক্রমায় যে যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেইসব অঞ্চলে এখনও কিছু না কিছু সংখ্যক দেউরী জনজাতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তার কারণ মনে হয়, অঞ্চল পরিবর্তনের সময় সকলেই হয়তো চলে আসেনি। আসামের লোকগণনায় দেউরীদের উল্লেখ থাকলেও এই পরিসংখ্যানের সত্যতা সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। তবে একটি

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যানে দেউরীদেব জনসংখ্যারা ১৯৯৫ সালে ২৪,৬০০ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদেব সম্পর্কে মনে করা হয যে, দেউরীরা 'চুটিয়া'-দেব চারটে বিভাগেব মধ্যে একটি বিভাগ। এরা পূর্বে পুরোহিত শ্রেণী ছিল।

সত্তর বছরের শ্রী বিপুল চন্দ্র দেউরীকে জিজ্ঞাসাবাদ কবে জানা গেছে যে উনি তার পিতামহকে প্রশ্ন করেছিলেন যে দেউরীদের ধর্ম কি ? পিতামহ উত্তর দিয়েছিলেন যে, তাদের ধর্ম-দেউরী ধর্ম। তারা মুসলমান নয, খৃষ্টান নয় এবং সঠিক অর্থে হিন্দুও নয। তবে হিন্দুদের খুব কাছাকাছি। এরা নিরাকার, দেবদেবীর কোন মূর্তি নেই। এদের মূল উপাস্য দেবদেবী হচ্ছে 'পুন্ডি-মামা' অর্থাৎ 'পুন্ডি' হচ্ছে পিতা আর 'মামা' হচ্ছে মাতা। পুন্ডি-মামাব যা বর্ণনা পাওয়া গেছে তাব সাথে হিন্দু দেবদেবী 'দুর্গা', 'লক্ষ্মী', 'সরস্বতী', 'কার্ত্তিক', 'গণেশ' ইত্যাদিব সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এদের পূজার মন্ত্র বয়েছে তবে সেই মন্ত্র একমাত্র মুখ্য পুরোহিতই পাঠ কবাব অধিকারী। সাধারণেব উচ্চাবণ কবা বা পাঠ কবা নিষিদ্ধ। হিন্দুদেব কোন সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ, পৈতে ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবাব আগে পূর্ব-পুরুষদেব পিন্ডদানের প্রথা চালু আছে তেমনি দেউরীদেব মধ্যেও পিন্ডদানেব প্রথা বয়েছে। এবা সর্বদা পিন্ডদান কবে তবে পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন কবে। পৌষ ও চৈত্র মাসে মকর সংক্রান্তিব দিন কোন পূজা পার্বণ কবে না এবং পিন্ডদান হয় না। মকরসংক্রান্তির পবেব দিন ১লা বৈশাখ-আসামের বিখ্যাত 'বহাগ বিহু', সেই দিন পিন্ডদান করে তবে পূজা শুরু হয। এবা সাবা বৈশাখ, শ্রাবণ ও মাঘ মাসে পূজা করে। তবে একটা নিযম বযেছে (যা লঙ্ঘন করা যায না) যে, পূজা-মাসের বুধবার হবে, যদি কোন অসুবিধে থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে ববিবার হবে। ১লা বৈশাখে পূজা, এবং তাব পরের দিনই দেউরীদেব সাংস্কৃতিক আনন্দ অনুষ্ঠানেব মুখ্য দিন। বৈশাখেব 'বহাগ বিহুতে' আসামের মতো দেউরীরাও নাচ, গান, আনন্দ-উৎসবে মাতোয়ারা হ'য়ে থাকে। এদের মধ্যে বলিপ্রথা প্রচলিত আছে যেমন হাঁস, মুবগী ইত্যাদি। শোনা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দেউরীদের মধ্যে নরবলি প্রথা চালু ছিল। পূজাব দিন গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবণিতারা পূজা-প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। দেউরীদের পূজার্চ্চনার জন্য কোন প্রতিষ্ঠিত মন্দির নেই। দেবতার অবস্থান হচ্ছে চালা ঘরে এবং দেবতার প্রতিকৃতি হচ্ছে মাটির হাঁড়ি বা কলসী। চালা ঘরেব পূজার থানের সামনে বলি দেবাব জন্য কাঠগড়া থাকে। পূজার দিন দেবতার সামনে কোন নাচ, গান, হৈচৈ করা, কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ। পূজা প্রাঙ্গণেব পরিবেশ থাকবে শান্ত, সমাহিত। সকলে থানেব সামনে উপস্থিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে বা হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা কবে এবং প্রার্থনার শেষে সবাই নিজ নিজ গাঁয়ের ঘবে ফিরে যায়। পূজার পরেব দিন সারা গাঁয়ে ২৪ ঘণ্টা (ভোর না হওয়া পর্যন্ত) চলে নাচ, গান, হৈচৈ, আনন্দ-উৎসব।

ভাষা গোষ্ঠীগতভাবে দেউরীয়া তিব্বত-বার্মা, গোষ্ঠীব অন্তর্গত। দেউরীদের মধ্যে দুটো ভাষা গোষ্ঠী বয়েছে আবার কারো কারো মতে তিনটে।

দেউরী

ডিবংগীয়া　　　　　টেবগীয়া

টেঙ্গাপানিয়া

দেউরীদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে কিন্তু কোন স্ক্রিপ্ট (Script) নেই। এদের স্ক্রিপ্ট হচ্ছে অসমীয়া। আদান-প্রদানের ভাষা অসমীয়া। টেঙ্গাপানিয়া ও ববগীয়া দেউরী ভাষায় কথা বলতে পারে না, এরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা অসমীয়া ভাষায় কথোপকথন চালায়। একমাত্র ডিবংগিয়ারাই দেউরী ভাষায় কথা বলতে পারে।

দেউরী ভাষার নমুনা ঃ

(১) আমি ডিবংগিয়া মানুষ।	আঁ ডিবংগিয়া মসি।
(২) আমি ডিবংগিয়া ভাষায় কথা বলতে পারি	আমাডিবংগিয়া ছুনানিঝি।

এদের মধ্যে ইংরেজী ভাষারও প্রচলন বয়েছে। ছোট্ট জনজাতি হলেও এদের মধ্যে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬৫%। শিক্ষিতরা অসমীয়া এবং ইংরেজী দুটো ভাষাই ব্যবহাব করে।

দেউরী সমাজ হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক। সম্পত্তির অধিকাব পুত্রদের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হয় কিন্তু কন্যারা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত। মূল পুরোহিত হচ্ছেন সমাজেব প্রধান। সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিচালিত হয় গ্রাম সভার মাধ্যমে। গ্রামসভার সদস্যদেব উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। গ্রামে চোর, ডাকাতের উপদ্রব নেই, অস্তিত্বও নেই। বাড়ীতে, ঘরে কোন প্রকার আগল দেবার, তালা দেবার দরকার পড়ে না। এরা খুবই সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ।

দেউরীরা একান্নবর্তী পরিবারের পৃষ্ঠপোষক। কোন কোন একান্নবর্তী পবিবারে ১০০ জনের মতো লোক রয়েছে। দেউরীরা মূলত: গ্রামাঞ্চলেই বসবাস করে। বাড়ীগুলো বাঁশেব ও খড়ের ছাউনী দিয়ে তৈরী। বাড়ীগুলো সাধারণতঃ গ্রামের নদীর দিকে মুখ করে তৈরী। গৃহপালিত পশুদের জন্য বাড়ীর সীমানার মধ্যেই পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। দেউরীরা যে সব অঞ্চলে বসবাস করে সেই সব অঞ্চলে বিশেষ কোন কলকারখানা গড়ে ওঠেনি। তার মূল কাবণ হচ্ছে-উত্তর-পূর্ব ভারতের এই বিশেষ অঞ্চলটি ভারতেব মূল ভূখন্ড থেকে বড়ই বিচ্ছিন্ন। যাতায়াতের তেমন কোন উন্নতি হয়নি। ছোট ছোট হাট বাজারের মধ্য দিয়েই গ্রামেব মানুষ তাদের চাহিদা মেটায়।

এদের মূল পেশা হচ্ছে কৃষিকাজ। এদের মধ্যে 'ঝুম' পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে। ধানই এদের মূল উৎপন্ন ফসল। এরা পাহাড়েব গায়ের বনজঙ্গলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তারপব সেই বন-জঙ্গল পোড়া ছাই-র ওপর বীজ ফেলে এবং তা থেকে ফসল উৎপন্ন করে। একই জমিতে একনাগাড়ে এক থেকে দু'বছর চাষ করবে এবং পরে নতুন জমির সন্ধানে বেরিয়ে পরে এবং একই পদ্ধতিতে চাষ করে। এই পদ্ধতিতে চাষের ফলে পাহাড়ের গায়ে সবুজ বনাঞ্চলের ক্ষতি হচ্ছে।

এদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা যথেষ্ট ভালো। তাই এরা এদেব পুরানো পেশা অর্থাৎ চাষবাস ইত্যাদি ছেড়ে স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতে ছড়িয়ে পড়ছে।

যারা গ্রামে বসবাস করে তারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যপূর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করে। তবে শহরে বসবাসকারীদের মধ্যে আধুনিকতার প্রভাব পড়ছে-প্যান্ট, সার্ট, পাঞ্জাবী, পায়জামা,

ধুতী, শাড়ী, মেঘলা ইত্যাদির প্রচলন দেখা যায়।

দেউরী জনজাতি বংশের দিকে থেকে মূল দুটো ভাগে বিভক্ত। ১টি ভাবে ৯টি (নয়) বংশ এবং আর একটি ভাগে ৩টি বংশ।

(ক) ৩টি বংশ
(১) আইড়িও
(২) কোমটায়ও
(৩) সুখরাঙ্গিও

(খ) ৯টি বংশ
(১) সুন্ডরীয়
(২) পাতিরীয়
(৩) ছাড়িয়
(৪) সিটি আইও
(৫) মুরাঙ্গীয়
(৬) লাগা সুইও
(৭) টোলিয়াযও
(৮) ডুপিয়ায়ও
(৯) কোলিয়া সুকিও

বিঃদ্রঃ আইড়িও বংশের মধ্যে আবার ৫/৬ টি বিভাজন রয়েছে (ক) টিটাবলিয়া (খ) মেহেডা (গ) পোপড়িয়া ইত্যাদি।

দেউরীদের একই বংশের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। দেউবীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা হচ্ছে-নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ প্রথা চালু রেখেছে। এরা মঙ্গোলয়েডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কারণ এরা নিজেদের অন্যান্য বোরো গোষ্ঠীর সাথে পরস্পর মিশ্রণ ও অন্তর্বিবাহ থেকে নিজেদের মুক্ত রেখেছে। দেউরী সমাজে বিধবা বিবাহ, পুনরায় বিবাহ প্রথা চালু আছে। সেই হিসাবে বাল্য বিবাহের প্রচলন পূর্বে তেমন ছিল না, ৩০ বছর পর্যন্ত মেয়েদের অবিবাহিত অবস্থায় থাকতে দেখা যেত। তবে আজকাল ২০/২২ বছব বয়সে বিবাহ হতে দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে তিন প্রকারের বিবাহ চালু রয়েছে যেমন-

(১) ৩ দিনের বিবাহ উৎসব (বড়বিয়া)
(২) ২ দিনের বিবাহ উৎসব
(৩) ১ দিনের বিবাহ উৎসব (১ দিনেই সমস্ত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়)

এছাড়াও আর এক ধরণের বিবাহ প্রথা চালু বয়েছে যা নাকি সমাজে স্বীকৃত। যেমন কোন ছেলেমেয়ে নিজেদের মধ্যে মন বিনিময় করে অভিভাবকদেব না জানিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করে। দেউরীদের মধ্যে অন্যান্য জনজাতিদের মতো উল্টোপণ প্রথা চালু আছে-অর্থাৎ ছেলের অভিভাবককে মেয়ের অভিভাবকদের পণ দিতে হয়। এই পণের পরিমাণ দুই পক্ষের আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে স্থিরীকৃত হয়। অবশ্য গরীব ছেলেদের ক্ষেত্রে যে পণের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে না তাকে মেয়ের বাড়ীতে বেগার শ্রম দিয়ে (কতদিন সেটা মেয়ের অভিভাবকদেব সাথে কথাবার্তার দ্বারা নির্ধারিত হয়) তা পুষিয়ে দিতে হয়। দেউরীরা নিজেদের স্বকীয়তা বর্জন করেনি বরং নিয়ে চলা পক্ষে।

দেউরী সমাজে নারীদের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে এরা স্বনির্ভর-

কারণ পশুপালন করে, ডিম ইত্যাদি বিক্রয় করে নিজেদের উপার্জনের উপায় করে নিয়েছে। প্রয়োজনে সাময়িকভাবে জমিতে চাষের কাজে হাত লাগায়।

এদের মধ্যে নাচ, গান, বাজনা ইত্যাদির যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে দীর্ঘ সময় ধরে এরা নাচ, গান, বাজনা পবিবেশন কবে এবং এ-সবই হচ্ছে সামাজিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ। বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে ঢোল, পেপা, সাপুড়ের বাঁশীব মতো এক ধরণের বাঁশীর ব্যবহার রয়েছে। এরা দাবী করে যে, 'পেপা' নামক যন্ত্রটি এদেরই সৃষ্টি এবং অসমীয়ারা এদের কাছ থেকে ধার করেছে।

এদের মূল খাদ্য হচ্ছে ভাত। উৎসব অনুষ্ঠানে শূকবেব মাংস এবং পানীয় অপরিহার্য।

অন্যান্য জনজাতিদেব সাথে এদের সম্পর্ক খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। তবে কোন কারণে দুই গোষ্ঠীব মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা দিলে, ন্যায়ের জন্য এরা সমগ্র গোষ্ঠী শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং যে কোন মূল্যে তা জয় করার চেষ্টা কবে। সাধারণভাবে এরা শান্তিপ্রিয়, স্বাধীনতাকামী, আবেগপ্রবণ, নির্বিরোধী, সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ।

'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে এবা অংশ নিয়েছিল তবে সংখ্যায় খুব কম। প্রত্যক্ষ অংশ কম নিলেও অপ্রত্যক্ষ সমর্থন পূর্ণমাত্রায় ছিলো।

দেউরীদের মধ্যে বর্তমান ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে এদের কোন আন্দোলন নেই তবে প্রশাসনের কাছে এদের জোরদার দাবী হচ্ছে—

"Deori Autonomous Council"

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ করে উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তের জনজাতিদের অবস্থান ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে হাজির হচ্ছে। এই সব জনজাতিদের অনেকেই ক্রমশঃ নিজেদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার স্বীকৃতির দাবীতে নিজেদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন গড়ে তুলছে। এদের চাহিদা, দাবীদাওয়া ভারতের মানচিত্রে বৈচিত্র্যের মধ্যে নতুন ধরণের ঐক্যকে পরিস্ফুট করে। সম অধিকারের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে অখন্ড ভারতের চিত্র বজায় রাখতে পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন ধরণের চিন্তাভাবনার সময় এসেছে। এটাই ইতিহাসের, সময়ের দাবী ।।

সূত্র নির্দেশ ঃ

(১) ননীমাধব চৌধুরী : ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় পৃ: ৬২

(২) প্রাগুক্ত: পৃ: ৬৩

(৩) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার : শ্রী বিপুলচন্দ্র দেউরী। গৌহাটী। উপদেষ্টা : অল আসাম ট্রাইবাল সংঘ।

(৪) Internet L http://www.belbany.com/profiles/p code 4/1333 html.

(৫) মানচিত্র : Eastern Bengal and Assam with Bhutan. (Imperial Gazetter of India).

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে চাকমা উপজাতি

অমরেন্দ্র নাথ বর্দ্ধন

চাকমাদের নিয়ে যে কোন আলোচনাই খুব স্পর্শকাতব বিষয় এবং চাকমারা কোথা থেকে এসেছে এবং এদের উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছে সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকেরা, নৃতত্ত্ববিদ্‌ ও পণ্ডিতেবা বহুধা বিভক্ত। চাকমাবা যে কোন এক সময়ে কয়েক শতাব্দী ব্রহ্মদেশে ছিলেন অনেক ঐতিহাসিক সে বিষয়ে একমত। কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষু ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশ ভ্রমণের সময় ''চেলুমিউ'' নামে যে জাতিব পবিচয় পান তাঁদের মতে তাঁরাই চাকমা বা বর্তমান চাকমাদের পূর্বপুরুষ। আরাকানিকের ভাষায় ''চাকলুমিউ'' এবং ''চাকমিউ'' এই দুই শব্দ আছে। ব্রহ্মভাষায় ''চাকমিউ'' বা ''চেলুমিউ'' শব্দেব অর্থ ''শাক্যবংশীয়''। আরাকানে এখনও বহু ''বোয়াংভ্য চাকমা'' এবং ''তঞ্চঙ্গ্যা চাকমা''রা বসবাস কবেন এবং তাঁবা বহু-ভূসম্পত্তিব মালিক এবং শিক্ষাদীক্ষায বিশেষ উন্নত। Bengal A.B. Journal (No. 145 of 1844,''চাকমা জাতি'', পৃষ্ঠা-আট) থেকে জানা যায ঐতিহাসিক কর্ণেল ফেয়ারীব মতে এক সময়ে বারনথির (বর্তমান ''বেনারস'') কৌসি সিং নামে এক যুবরাজ উত্তরাধিকাবী নিযুক্ত হন ব্রহ্ম, মালয়, শ্যাম প্রভৃতি দেশের। যুবরাজ কৌসি সিং আবাকানের প্রাচীন রাজধানী রামায়তী নগবে আসার সময় বহু পশ্চিম ভারতীয লোককে সঙ্গে এনেছিলেন যাঁরা স্থায়ীভাবে ব্রহ্মদেশ যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐসব পশ্চিম ভারতীযদের কৌসি সিং চাক, চেক প্রভৃতি নাম রাখেন এবং ৯৯৪/৯৫ খৃষ্টাব্দে বিশেষতঃ চাকদেব সাহায্যে ন্যা-মিং-থ্যা-মৈন নামে এক ব্যক্তি সিংহাসনে বসেন। ঐতিহাসিক কর্ণেল সাহেবের তথ্যে বিশ্বাসী ঐতিহাসিকদের কারও কারও মতে ঐ চাকবাই সম্ভবত: চাকমাদের পূর্বপুরুষ। কিন্তু ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র ঘোষ তাঁর ''চাকমা জাতি'' গ্রন্থেব নবম পৃষ্ঠায কর্ণেল সাহেবের বর্ণনাকে ''অতিরঞ্জিত'' বলেছেন। তাঁর মতে বিজয়গিরির পবে রাজা সিবওমা চাকের সময় থেকেই চাকমারা ঐ নামেই ব্রহ্মদেশে আখ্যায়িত হয়েছেন ৯৯৪ খৃষ্টাব্দে অনেক আগে থেকেই। তাই ''চাক'' রাই চাকমাদের পূর্বপুরুষ এরকম মনে করাব কোন কাবণ নেই। ''পাকিস্তানের উপজাতি'' গ্রন্থে ঐতিহাসিক আবদুস সাত্তার সাহেব আবার এক নতুন কথা শুনিয়েছেন। ঐ গ্রন্থের আটান্ন পৃষ্ঠায় তিনি জানিয়েছেন-''কেহ কেহ অনুমান করেন, তখন আরব, তুরস্ক, ইরান থেকে বহু মুসলমান সমুদ্র কুলবর্তী অঞ্চলে বাণিজ্যব্যপদেশে আগমন কবিত এবং তাদের অনেকেই দেশে ফিরিয়া না গিযা, সে অঞ্চলে বসতি স্থাপন কবিয়াছিল''। জনাব সাত্তার-এব মতে ঐ 'চাক' বা 'সেক' অথবা 'চেক' বা

'সেক' শব্দগুলি 'শায়েক' বা 'শেখ' শব্দের অপভ্রংশ। এ তথ্যকে খুব একটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না কারণ চাকমারা যে ন্যামিংকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন তা ব্রহ্মদেশীয় রাজমালা "ওয়াং" গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। রাজা পাই-ফু (Pai-Phyu)-র মৃত্যুর পর এক প্রভাবশালী আরাকানী সিংহাসন অধিকাব করলেও দক্ষিণ আরাকানের বাসিন্দা চাকমারা ঐ আরাকানীকে সিংহাসনচ্যুত করে 'ছত্র' বংশীয় ন্যা-মিংকে সিংহাসনে বসান। অনেক ঐতিহাসিকের বর্ণনায় উপরিউক্ত তথ্যেব সমর্থন আছে।

৯৫৩ খৃষ্টাব্দে আরাকানের রাজা সোলসিংহ চন্দ্র চট্টগ্রাম অধিকার করে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। ঐ স্তম্ভে তিনি খোদাই কবেন এই শব্দগুলি - Tsit-ta-gang (চিত্-তে-গং), to make war is improper (যুদ্ধ করা অন্যায়)। এই রাজা সিরওমা চাকের বংশধর। আজকে মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যে কযেক লক্ষ চাকমা আছেন তাঁদেব অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং যুদ্ধ বিগ্রহ বা হিংসা বিদ্বেষের প্রতি চাকমাদেব অনীহা যে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তার প্রমাণ ঐ স্মৃতি স্তম্ভ। ঐ রাজা সোলসিংহ ছিলেন সিবওমা চাকের বংশধর ছিলেন বলে অনেক ঐতিহাসিকের অনুমান। এখানে "অনুমান" শব্দটি ব্যবহার করাব কাবণ বিভিন্ন কারণে রাজা সিরওমা চাক বা চাকমার পববর্তী ব্রহ্মদেশীয় ইতিহাস আজব অন্ধকাবে। চীনা পর্যটক আইৎ সিং-এব ভ্রমণ কাহিনীকে ৬৮৫ খৃষ্টাব্দে যে দ্বাবপতি বাজ্যেব উল্লেখ আছে তা সম্ভবত: মান্দালযের পশ্চিম অংশে অবস্থিত ছিল এবং ব্রহ্ম সম্রাট তাবমুরাব (১৭৮৪ খৃ:) নিজ স্বাক্ষরিত যে পত্রটি এখনও বাংলাদেশেব চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে সঞ্চিত আছে তা থেকে একথা স্পষ্ট যে মাহদিনী বা মানাং বাজ্য সিরওমা চাকেব অধিন ছিল এবং দ্বাবপতি ছিল চাকমা সভ্যতা বিকাশের অন্যতম প্রধান রাজ্য। ব্রহ্ম দেশীয় পুবাবৃত্ত "চইজং-ক্যা-থাং" গ্রন্থ প্রমাণ কবে বিরাট ব্রহ্ম সাম্রাজ্য এককালে তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগের অধিপতি ছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মরাজ এবং অন্য দুই অংশ চাকমা ও মগ বাজাদেব অধীন ছিল। সিরওমা চাকের পববর্তী সময়ে ত্রিপুবা রাজা চাকমাদের পদানত কবাব চেষ্টা করলে ৯৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে ন্যা-মিংকে চাকমাবা সিংহাসনে বসিয়ে আবাব শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন এবং ১০৭৫ খৃষ্টাব্দে কুকী, মযংদের "শ্যাফল" নামক যুদ্ধে পরাস্ত করে চাকমাবা প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। এই যুদ্ধ ও ক্ষমতা অর্জনেব বর্ণনা পাওয়া যায় ব্রহ্ম ইতিহাসে "চাকমার বিজগা"-এ। আবাকানেব বাজা মং বিলুর (Meng Bilu) মৃত্যুর পব তাঁব পুত্র মংগিরি রাজ্যেব অর্ন্তবিপ্লবের কাবণে পেগু সম্রাট আলংছিচুব (Along-si-thu) আশ্রয় গ্রহণ কবেন। কিন্তু পেও সম্রাট তখন আরাকান জয়ের সাহস কবেনি নি। শেষে দুই বাজ্যেব মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়ে উঠলে একাদশ শতকে চাকমারা পেও সাম্রাজ্যেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরপব তিনবাব যুদ্ধেব পব ক্রিদেং পাহাড়ের যুদ্ধে চান্দাজা ও মুখ্যংজা এই দুই আরাকানী সেনাপতির কাছে মাতামুরী নদীর মোহনায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হন চাকমাবা। ঐসময় বিতাড়িত হযে চাকমারা উত্তর ব্রহ্মেব পার্বত্য প্রদেশে গোপন আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন।

৯৯৪ খৃষ্টাব্দে ন্যা-সিংকে চাকমাদেব রাজ্য প্রদানেব পর থেকে রাজা অরুনযুগেব সময়

১৩৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই তিন শতাব্দীর বেশী সময়ের ঘটনা সঠিকভাবে এবং একমত হয়ে অধিকাংশ ঐতিহাসিক তুলে ধরতে পারছেন না বলেই বর্তমান চাকমাদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে দ্বিধাহীনভাবে কিছু বলা অনেক সময় সম্ভব হচ্ছে না। তবে ব্রহ্মদেশে চাকমাদের অবস্থানের সময় রাজা সিরওমা চাক বা চাকমার গৌরবময় অধ্যায়ের কাহিনী এখনও যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে দেখেছি মিজোরাভের "স্বশাসিত চাকমা জিলা কাউন্সিলের" প্রধান দপ্তর কমলানগর শহরের বিভিন্ন স্তরের বহু চাকমাকে। শুধু ব্রহ্মদেশ নয় চাকমা জাতির সম্বন্ধে সঠিক ধারণার জন্য উত্তর আসামের ইতিহাস ও লোকগীতি, ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধেও জানা প্রয়োজন।

ব্রিটিশ শাসক কালে কিছু ঐতিহাসিক চাকমাদের গৌরবময় ইতিহাসকে অস্বীকার করে তাঁদের মগ বা রোয়াং জাতির সঙ্গে এক ও অভিন্ন করে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। H.J.S. Cotton এর Revenue History of Chittagong এতে এই প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। তবে চাকমা রাজাদের মধ্যে জান বক্সের নাম অনেক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের লেখায় পাওয়া যায়। জান বক্সের রাজধানী ছিল চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয়াস্থ "রাজা নগর"। বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস ধূর্ত কূটনীতি প্রয়োগ করে বৃটিশ কোম্পানীর বিরুদ্ধে জান বক্সের সকল কাজকে ও অপরাধকে ক্ষমা করে দেন চাকমা ও অন্যান্য উপজাতিদের ভালোবাসা আদায়ের জন্য। চাকমা রাজবংশের ক্রম বিস্তার এইভাবে অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন :-

গুনাই - ওয়াংঝা

কবা গুজা

বুড়া ওয়াংজা

তলাপাথর গাড়ুর ওয়াংঝা

বুন্দাব খা রুনু খা

চন্দন খাঁ রতন খাঁ

মল্লাল খাঁ বল্লাল খাঁ জল্লাল খাঁ

গোপীনাথ হরিনাথ

রাজা হরিশচন্দ্র চন্দ্রবালা শরৎচন্দ্র

শ্রীমতী স্বর্ণময়ী হিরন্ময়ী করুণাময়ী

রাজাভবন বায় দয়াময়ী রমাময়ী

। নলীনাথ রায় বিরুপাক্ষ রায়

অমিতা রায় ত্রিদিব রায় চিবঞ্জীব রায়

কথিত আছে নলীনাক্ষ রায়কে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল এবং এ ঘটনা অনেক চাকমা সত্য বলে মনে করেন।

সবশেষে বলা প্রয়োজন "চাকমা" শব্দটির উদ্ভব নিয়েও বিস্তর মত পার্থক্য। চাকমা সাহিত্যিক S.P. Talukdar এর মতে 'Chakma"-র অর্থ হল 'Tsak' অথবা 'Thek' গোষ্ঠীব বা গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত T.J. Lenin-এর "The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein" গ্রন্থেও মি: তালুকদারের সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। কারও কারও মতে 'চাকমা' কথাটির উৎপত্তি "চাং+মা" অর্থাৎ "হাতির মাথা" থেকে এবং তাঁদের বক্তব্য চাকমা রাজাদের হাতির মতো বলশালী বলে বর্ণনা কবা হতো বলেই "চাকমা" শব্দটির উদ্ভব।

উপরিক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে স্বচ্ছ মন নিয়ে চাকমাদের বিষয়ে আরও বেশী করে জানার জন্য এগিয়ে আসতে হবে ঐতিহাসিকদের, নৃতত্ত্ববিদ্‌দের এবং সমগ্র পণ্ডিত সমাজকে। তবেই হয়তো লেখা হতে পারে "চাকমা"দেব উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সঠিক, তথ্য সমৃদ্ধ, অভিন্ন ইতিহাস।

সামাজিক প্রেক্ষাপট ও অপরাধ প্রবণতা : বর্ধমান কারাগারের ওপর এক সমীক্ষা

মহুয়া পাত্র

বর্ধমান কারাগাবে বছব দশ- বাবো ধবে সাজা প্রাপ্ত মাদক দ্রব্য সেবনকাবীদেব সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই ধবণেব অপবাধী আগে প্রায় ছিলই না। সুতবাং বলা যেতে পারে এই বিশেষ অপরাধটি আমাদেব আর্থ-সামাজিক পবিবর্তনেব ফসল।

আমাদেব এই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনেব একটি সদর্থক দিক হল যে, ৫০-এব দশকের পর গ্রামে অথবা শহবে বড বড ডাকতিব পবিমাণ অনেক কমে গেছে। এই ডাকাতিগুলি করত তৎকালীন জমিদারদেব পোষা ডাকাতরা। ভূমিসংস্কাব ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদেব ফলে এই ধবণের ডাকাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে।

তবে ডাকাতি কমলেও বাহাজানির সংখ্যা উত্তবোত্তব বেড়ে চলেছে এব কাবণ হিসাবে দুধরণেব কারণ দেখা যেতে পাবে। একটি মানসিক। দীর্ঘদিনেব হতাশা বোধ মানুষকে আক্রমণাত্মক কবে তোলে। দ্বিতীযটি হল সম্পদেব তুলনায জনসংখ্যা বৃদ্ধি। তাই এক অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বেঁচে থাকার জন্য। এব মধ্যে গোদেব ওপর বিষফোঁড়াব মত প্রচুর বে-আইনী অস্ত্রেব যোগান হচ্ছে সাধাবণ মানুষেব হাতে, তার ফলে জনসাধারণেব সাহস বাড়ছে এই ধরণের অপরাধ করাব ক্ষেত্রে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে দেশেব আইন-শৃঙ্খলার অবনতি।

আবার দেখা যাচ্ছে, এখন পণেব জন্য অত্যাচাব করেছে এমন প্রচুর বিচারাধীন বন্দীরা কাবাগাবে থাকছে। এক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপাব হচ্ছে যে, এইসব বিচাবাধীন বন্দীবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ এই সমস্ত ব্যক্তি যাবা বিচারাধীন অবস্থায় জেলে থাকছেন তারা হয়ত সত্যিই অপরাধী নয়। কিন্তু আমাদের বর্তমান পণপ্রথা বিবোধী আইন অনুযায়ী কোন বধূ সামান্যতম অভিযোগ করলেই সঙ্গে সঙ্গে হাজতে নিযে নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ এই ব্যাপারে অপবাধ যত না বেড়েছে ঐ বিশেষ আইন দ্বারা সেটাকে অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে। যার জন্য মনে হচ্ছে এই ধরণেব অপবাধ অনেক হচ্ছে।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য অপবাধ হচ্ছে বিনা টিকিটে ট্রেনে যাত্রা। বর্ধমান কারাগাবে এই ধরণের অপবাধীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি। এক্ষেত্রে অপরাধীরা একদিকে যেমন দোষারোপ করছে রেলের মাযাদয়াহীন ভাড়া বৃদ্ধিকে আর একদিকে টিকিট পরীক্ষকদের অবহেলাকে। অর্থাৎ পরীক্ষকরা ঠিকমতো টিকিট পরীক্ষা করেন না। তাই তারা সাহস পায়। কালে ভদ্রে একেকদিন ধবা পড়ে যায়। অর্থাৎ এখানে অস্বাভাবিক ভাড়া বৃদ্ধি ও রেলের

আইন শৃঙ্খলার অবনতির প্রমাণ।

ছিঁচকে চুরির অপরাধ চিরকালই ছিল। কুঁড়ে লোকজন ছিঁচকে চুরিকেই অনেক সময় সহজ পেশা হিসাবে নিয়ে থাকে। আবার ক্রিপটো ম্যানিয়াকরা-তো মানসিক রুগী। তারা চুরি করে আনন্দ পাওয়ার জন্য। সমাজের জটিলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের সমন্বয়হীন ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশ: বাড়ছে।

আর অর্থনৈতিক ব্যাপার দেখতে গেলে এই প্রতিযোগিতামূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজের উচ্চস্তর ও নিম্নস্তরের মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্য অনেকটাই প্রকট তার ফলে অনেক সময় মানুষ মবীয়া হয়ে অপরাধ করছে। যেমন-সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাড়ছে। কিন্তু যাবা স্ব-নিযুক্ত তাদেব সে তুলনায় আয় বাড়ছে না। ফলে তাদের জীবনের মান অনেক সময় জীবন ধারণের উপযোগী ন্যূততম অবস্থা থেকেও কমে যাচ্ছে। তাই দেওয়ালে পিঠ ঠেকার সঙ্গে সঙ্গে তাবা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, ছিনিয়ে নিচ্ছে। এখানে অর্থনৈতিক বন্টনের সবকাবী নীতির ব্যর্থতাই প্রমাণ করে এই ধরণেব অপরাধেব বৃদ্ধি।

সমাজের পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপবাধী ও অপরাধের চবিত্র এবং সংখ্যাব পরিবর্তন হচ্ছে। জরুরী অবস্থাকালীন সময়ে অনুমোদিত সংখ্যাব চাইতে অনেক বেশী বন্দী জেলে ছিল। বর্ধমান জেলা কারাগারে ২৫৬ জন বন্দীব থাকার জায়গায় বন্দীব সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১৭০০ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৮৪ সাল থেকে আবাব বন্দীর সংখ্যা কমতে থাকে। আসলে ৭০-এর দশকে নকশালপন্থী বন্দী বলে চিহ্নিত বন্দীর সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। এমন এই ধরণেব বাজনৈতিক বন্দী নেই। বর্তমানে বর্ধমান কারাগারে বন্দীদের পবিসংখ্যান নিযে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৬ সালের জানুয়াবীতে বন্দীর সংখ্যা ছিল গড়ে ২০০ জন। এব মধ্যে ৫০-৬০ জন দণ্ডিত আসামি, বাকিরা বিচারাধীন, ১৯৯৮ সালের জুনে বন্দীদের সার্মাগ্রিক সংখ্যা দুশোর কম বেশি। জুন মাসে মহিলা বন্দীদের সংখ্যা যেখানে ছিল ২২ জন সেখানে ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ আগষ্ট তারিখে সংখ্যা দাঁড়ায় ৮-৯ জন। এর মধ্যে একজন সাজাপ্রাপ্ত, বাকিবা বিচারাধীন। পুরুষ বন্দীর সংখ্যা বর্তমানে ২১৯ জন, এর মধ্যে স্বল্প বয়সেব সাজাপ্রাপ্ত ৯৬ জন, যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত ৭ জন, বিচারাধীন ১১৬ জন।

পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখা যায় একটি দুঃখজনক চিত্র। এখানে বেশিরভাগ বন্দীই বিচারাধীন। খুব কম অপরাধীই সাজাপ্রাপ্ত হয়। আইনের ফাঁকেই সব বেরিয়ে যায়। যারা পয়সাওয়ালা তারা আইন ও প্রশাসনকে কিনে নিচ্ছে। বিনাটিকিটেব অপরাধী থেকে শুরু করে মাদক সেবনকারীদের মতো সাংঘাতিক অপরাধীদের মধ্যে শুধু গরীবদেরই সাজা হতে দেখা যায়। অথচ বেসরকারী বিশ্বস্ত সূত্র অনুযায়ী এই সমস্ত অপরাধ সমাজের উচ্চস্তরে যথেষ্ট বেশি। কিন্তু তারা ধরাই পড়ে না, বা ধরা পড়লেও বিচারাধীন বন্দী অবস্থায় কিছুদিন থেকে আইনকে কিনে নিয়ে আবার সমাজে মাথা উঁচু করে বসবাস করে। তাই মিশেল ফুকোর সামগ্রিক শৃঙ্খলা রক্ষাকারী যন্ত্র জেলে প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

আবার এমনি অপরাধের পসিরসংখ্যান দেখতে গেলে ছোটখাট অপরাধ লোক আদালত, পঞ্চায়েত ইত্যাদির মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা হচ্ছে। ক্ষতিপূরণ, দ্রুত জামিন প্রভৃতি পদ্ধতি ও

ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই এগুলি আর তথাকথিত বড় অপরাধী আচরণের মধ্যে পড়ছে না। সুতরাং অপরাধের সংজ্ঞা পরিবর্তনও সমাজের অপরাধ প্রবণতাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করছে।

অতএব বলা যায়, সমাজের ক্ষমতার কাঠামো, পরিবাবের কাঠামো, অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আইন এবং শিক্ষার হার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের চরিত্র ও অপরাধীব চরিত্র বদল হচ্ছে। বিশেষ কিছু অপরাধ বাড়ছে, বিশেষ কিছু অপবাধ কমছে। সুতরাং সমাজই তার পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান বা অব্যবহিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশকে নিযন্ত্রণ করছে অর্থাৎ তার অপরাধ প্রবণতাকেও নিয়ন্ত্রণ করছে।

বোলান গানে হিন্দু মুসলমান সমন্বয়

অসীম কুমার পাল

জাতি, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিরাট সংখ্যক গ্রামীণ মানুষের আনন্দের উৎস হল বোলান গান। লোকসাধারণ হল বোলান অনুষ্ঠানের শ্রোতা ও দর্শক। আব এতে যোগদান করেন বিভিন্ন ধর্মের গ্রামীণ শিল্পীরা। এই গানে থাকে লোকসাধারণের জীবন, তা হিন্দু বা মুসলিম যাই হোক না কেন। বস্তুত হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই গান থেকে প্রেরণা লাভ করে, এ থেকে তারা নুতন করে জীবনীশক্তি পায়। সম্প্রদায়গত বিভেদের উর্দ্ধে উঠতে সাহায্য করে বোলান গান।

এখানে স্বীকার্য যে, যেহেতু হিন্দুদেব পূজা উপলক্ষ্যে এই গান সেহেতু মুসলিমরা সবসময় সক্রিয়ভাবে দলে অংশগ্রহণ করেনা। যদিও অনেক অঞ্চলে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। কিন্তু আসল কথা হল নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম ইত্যাদি বোলানপ্রিয় গ্রামগুলিতে বসবাসকারী মুসলিমবা এই গানের উৎসাহী শ্রোতা। আব মুর্শিদাবাদের কথা স্বতন্ত্র, এখানে অনেক গ্রামে হিন্দু ও মুসলিম প্রায় পাশাপাশি বাসবাস কবে। এসব অঞ্চলের মুসলিমরা উৎসাহভরে শুধু গানই শোনে না, পৃথকভাবে বোলান দলও গঠন করে এবং অনেক জায়গায় হিন্দুদের সঙ্গে বোলান দলে যোগদানও করে।

পাঁচের দশকে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী মানিক নগর গ্রামে ছিল মুসলমানদের দ্বারা গঠিত বোলান দল, এর সংগঠক ছিলেন করিম শেখ। এই দল সেই সময় খুবই সমাদর পেয়েছিল। হয়তো মুসলমান সম্প্রদায়ের দল বলে বিশেষ করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[১]

শুধু বোলান দল গঠনই নয়, মুর্শিদাবাদেব অনেক মুসলিম বোলানের পালা রচনার সঙ্গেও যুক্ত আছেন। এই ক্ষেত্রে সেইদার রহমান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ইনি বেলডাঙ্গার কাঁদুবিয়া গ্রামের বাসিন্দা। মুসলিম হলেও রামায়ণ মহাভারতেও তার আগ্রহ অপরিসীম এবং দীর্ঘদিনধরে তিনি বোলানের পালা রচনা করে আসছেন।[২]

অন্যান্য লোকসঙ্গীত, যেমন কবি, জারী, ভাটিয়ালী, আলকাপ, লেটো প্রভৃতির ক্ষেত্রে, হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই শিল্পী ও শ্রোতা। বোলানও এর ব্যতিক্রম নয়। বোলানও অন্যান্য লোকসংস্কৃতির মত মিলনধর্মী লোকসমাজ থেকেই নিজের পুষ্টি সংগ্রহ করে চলেছে। তাই সব সম্প্রদায়ের লোক যে এতে আগ্রহী হয়ে উঠবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা দীর্ঘকাল একই দেশে পাশাপাশি বসবাস করার ফলেই

একে অন্যের সমাজ ও ধর্মজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বোলান গান এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

এই সাংস্কৃতিক মিলনের একটা ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ চারশো বৎসর ধরে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মূল কথা ছিল উচ্চজাতির বিরুদ্ধে নিম্নজাতির বিদ্রোহ আর জাতিতে জাতিতে মিলন, হিন্দু ও মুসলমানের মিলন। এই সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল বাংলাতে।[২] এখানে এবং অন্যত্র ধর্মপ্রচারকদের লেখা ও ভাষণকে কেন্দ্র করে ধর্মাশ্রয়ী এক ধরনের সাহিত্য গড়ে উঠেছিল।[৩] কবীর, নানক ও চৈতন্য ভক্তদের পদাবলীতে এক সর্বজনবোধ্য অসাম্প্রদায়িক জনপ্রিয় সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। পৌরাণিক কাহিনী, সমাজচিত্র প্রভৃতি নিয়ে সে যুগে যেসব পাঁচালী, যাত্রা প্রভৃতি রচনা হত সেগুলি ছিল হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বাংলার জনসাধারণের উপভোগের বস্তু।[৪] এইসব সাহিত্যের মুসলমান রচয়িতাও ছিলেন। এছাড়া হিন্দু মুসলিম সাংস্কৃতিক মিলানের চিত্র পাওয়া যায় করম আলি লিখিত, 'মুজাফরনামায়'। এখানে দেখা যায়, সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র বাংলার গভর্ণর আজিমুশশান (১৬৯৭-১৭১২) বাংলাদেশে থাকাকালীন গেরুয়া পরা এবং দোল বা হোলি উৎসবে অংশগ্রহণ করা শুরু করেছিলেন। আলিবর্দির জামাতা নওয়াজেস মুহম্মদ, সৈয়দ আহমদ এবং দৌহিত্র সিরাজ হোলি উৎসবে যোগ দিতেন।[৫]

তাছাড়া দেখা যায়, হিন্দুরা মুসলিম পীরদের পূজো ও শিরনি দিত ও মানত করত। মুসলমান ধর্ম জীবনে হিন্দু ধর্মের প্রভাব নানাভাবেই সে যুগে দেখা গিয়েছিল। মুসলমানদের সামাজিক কাজকর্ম, বিবাহ ইত্যাদিতে হিন্দুদের আচার আচরণও কিছু এসে যায়। গোঁড়া ও রক্ষণশীল মুসলমানরা ছাড়া মুসলমানদের একাংশ হিন্দুদের দেখাদেখি গান বাজনায় অংশ নিত।[৬] বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের এ সংস্কৃতি সমন্বয় অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য একটি দিক।

'আমীর হামাজা' ও ইউসুফ জোলেখার কবি ভারিবুল্লাহ আল্লার কাছে মিলিতভাবে হিন্দু মুসলমানের জন্য দোওয়া চেয়েছেনঃ "আসবে বসিয়া যত হিন্দু মুসলমান/সবাকার তরে আল্লা হও নেখাবান।" বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরুতে' এগারো জন মুসলিম কবির রচিত পদ আছে। বাংলার অজস্র পল্লীগীতিতে, গাথা ও ছড়ায় এই সমন্বয়ী মানসিকতার অসংখ্য প্রমাণ ছড়িয়ে আছে।[৭]

এছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের অনেকেই ছিল এদেশের বাসিন্দা, বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানদেব অধিকাংশ মূলত ছিল ইসলাম ধর্মগ্রহণকারী হিন্দু। অন্যদিকে উচ্চশ্রেনীর হিন্দুদের অনেকেই ছিল মুসলমান সুলতান ও বাদশাদের সাহায্যকারী। সমাজের নীচুতলায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিকক্ষেত্রে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মধ্যযুগে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের বিরোধ ছিল সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক। রাজনীতির বাইরে লোক সাধারণের মধ্যে হিন্দু মুসলমান একত্রে বসবাস করত এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে ভাবের সাযুজ্য ছিল।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী থেকে ঔপনিবেশিক শাসকের বিভেদ নীতি, পথিকৃৎ

জাতীয়তাবাদীদের হিন্দু আর্য জাতির কল্পনা এবং মুসলমানদের মধ্যে প্যান্ ইসলামিকের প্রভাব এই মিলনকামী ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহাওয়ার অবনয়ন ঘটিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকে। তবু কিন্তু গ্রামাঞ্চলের লোকজীবনে চট করে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারেনি। বরং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ধারা গ্রাম সমাজের অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা রূপে প্রবাহিত হয়েছে আর বাংলার লোকসংগীতে ও হিন্দু মুসলমান ঐক্যের সাধনার কথা প্রতিফলিত হয়েছে।

তাই গ্রামের নিরক্ষর পল্লীকবি গেয়েছেন—

"হেদু আর মোছলমান এক্কই পিন্ডর দড়ি
কেহ বলে আল্লা রসুল কেহ বলে হরি।
বিছমিল্লা আর গিরি বিষ্টু এক্কুই গেয়ান
দোফাক করি দিয়ে পরভু রাম রহমান।"[৮]

এছাড়া হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে কৃষিজীবী গ্রাম বাংলার ভিজে মাটিতে সজল হাওয়ার আবেগের ও একটি সর্বজনীন পরিমন্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। তাই আরবের কারবালার ফতেমার চোখের পানি আর বাংলার নিমাই সন্ন্যাসের শচীমাতার বেদনাশ্রু এক মোহনায় মিশে গেছে। আবার হাসানের বেটা কাসেমের বিবির যে বিলাপ - "যাইওনা যাইওনা নাথ আমারে ছাড়িয়া/ যুদ্ধে যাইতে ছিল সাধ কেনে করলা বিয়া", তার সাথে ঘরের বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াব যে আর্তনাদ "শচীমাতা গো আমি চার জন্মে হই জন্ম দুঃখিনী" এই দুয়ে মিলে একাকার হয়ে হিন্দু মুসলমান উভয়ের অনুভূতির তন্ত্রীতে আঘাত তোলে আজও।[৯] কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি কি এই ভাবাবেগকে ভুলিয়ে দিতে পারে ?

অনুরূপভাবে বোলানও হিন্দুমুসলমান ঐক্যের ধারাটিকে অব্যাহত রেখে অগ্রসর হয়েছে। মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে মুসলমানদের মত সাঁওতাল সমাজও বোলানের ব্যাপক আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারেনি। সাঁওতাল সংস্কৃতিকেও অনেকাংশে অঙ্গীভূত করে নিয়েছে বোলান অনুষ্ঠান। আসলে বোলান হল বিশুদ্ধ গ্রামীণ সংস্কৃতি, সেখানে ধর্ম চেতনা অপেক্ষা জাগতিক অভিজ্ঞতা ও মানবিক চিন্তাভাবনাই বেশী প্রাধান্য পায়। তাই মুসলমান সমাজ এর সঙ্গে একাত্মবোধ করেন।

এই প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত মানিকনগর গ্রামের কথা উল্লেখ করা যায়। একদা লোকেরা বেলডাঙ্গা ষ্টেশন থেকে কালীতলার পথে চাঁদপুর হয়ে মাঠের উঁচু নীচু রাস্তা ধরে গো-শকটে কদমতলার উৎসব ক্ষেত্রে পৌঁছাত। আদম গাদম (স্পষ্টতই ইসলামিক সংস্কৃতিজাত) হলেন এই গ্রামের গ্রাম দেবতা। প্রায় ৩০ ফুট লম্বা একটি প্রকান্ড শালের কান্ডকে আদমদেব ও অনুরূপ অপর একটি শালকান্ডকে গাদমদেব রূপ পূজা করা হয়। গ্রামের দুধবাটিদহের জলে এই দুই শালগাছ সারা বৎসর ডুবানো থাকে।

চড়ক উৎসবকালে নিষ্ঠবান ভক্ত সন্ন্যাসীরা জলে নেমে শালগাছ দুটিকে মন্দিরে নিয়ে আসেন। এরপর একটি শালকান্ডকে শিবজ্ঞানে পূজা করা হয় ও অন্যটিকে চড়ক গাছরূপে

ব্যবহার করা হয়। বাৎসরিক পূজা ও চড়ক উৎসব এই মন্দিরেই অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্রের শেষ সপ্তাহ ধরে আদমদেবের পূজা হয়। মাহিষ্য সম্প্রদায়ের লোক হয় পূজারী ব্রাহ্মণ।[১০]

এই পূজাস্থানেই মেলা বসে আর এই মেলার সেরা আকর্ষণ হল বোলান গান। একদা কবিম শেখের বোলান দল এই শিব গাজনের সময় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বোলান গান গাইত। আর পাঁচ জায়গার মত এখানেও বোলান দলের বৈশিষ্ট্য একই রকম। ছেলেরাই মেয়ে সাজে। চোখে লাগায় নীল চশমা, হাবমোনিয়াম সহযোগে দোহারীরা গায় আব নাচিযেরাও নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে কন্ঠ মিলায়। মুসলমান গাইয়ে আপন মনে গেয়ে যায়-

বিন্দাবনে সখি সনে বসিয়া বাধে
কি জানি মন কেমন করে ওঠে কেন্দে কেন্দে
না দেখিযা শ্যামচান্দে।
ও গো ইসারায় চইলে গেল শ্যাম চিকন কাল,
কিশোরী দেবী কইরো না
দেখবে যদি প্রাণ বন্ধুকে বইসে থেকো না।
যত সখি, সবে মিলি, যায় কুসুম তুলিতে।[১১]

প্রখ্যাত নৃত্যবিদ মনি বর্ধন তাব স্বচক্ষে দেখা এই অনুষ্ঠানের বিচিত্র বিবরণ দিয়েছেন "বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য" গ্রন্থে। প্রধানত মুসলমানদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই বোলান আসলে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বযী রূপের প্রকাশ। গ্রামীণ সংস্কৃতি এভাবেই বিবিধের মাঝে মিলন মহানের সাধনা করে চলেছে।

বর্তমানেও মুসলিম সংস্কৃতি থেকে বোলান অনেক কিছুই আত্তীকরণ করে নিচ্ছে। ঘোড়ানাচের ব্যবহার যা মুসলিম সমাজে মহরমের সময় হয়ে থাকে, কোন কোন অঞ্চলের বোলানে সেই ঘোড়া নাচের প্রচলন হয়েছে। আমরা আগে দেখেছি একইভাবে সাঁওতাল নাচ, রণ-পা নৃত্য প্রভৃতিকেও আত্তীকরণ করে নিয়েছে বোলান। এমনই হল বোলানের উদাবতা।

এই কারণে মুসলিম সমাজ বোলান অনুষ্ঠানে সমবেত হচ্ছে ও অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা দিচ্ছে। মুর্শিদাবাদের ভরতপুর অঞ্চলের মালীহাটি, কাঁদরা এবং শক্তিপুর থানার দুপুকুর, পাঁচকাটিয়া, সর্বাঙ্গপুর প্রভৃতি গ্রামের অনেক মুসলিম যুবক হিন্দুদের দলের সদস্য হন ও বিভিন্ন গ্রামের গানের আসরে বোলান গান করেন।[১২]

অতি সম্প্রতিকালে মুর্শিদাবাদেব ভরতপুর অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কিত বোলানের রং পাঁচালী অংশটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান এই দুজনের মধ্যে উত্তর প্রত্যুত্তরের ভঙ্গীতে গানটি গীত হয়। এখানে হিন্দু মুসলমান চরিত্র দুটি একে অপরেব ধর্মের বিরুদ্ধে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ কবেছে, কিন্তু গানের শেষ কলিতে বলতে চেয়েছে যে আল্লা ও হরি একই জিনিষ এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা বৃথা। গানটি হল :-

ধূয়া : হরি হরি বল মুখে, আল্লা কেহ বল না
হরিনামে মধুঝরে, আল্লা হল রাত কানা

আল্লা বলো মনে মনে, ওই নাম মুখে এনো না
হেঁদুর হরি করে চুরি, ঘরে নারী রাখে না।

হিন্দু : পাথরচাপড়ীর পীরের স্থানে কার বা বিবি কে বা টানে।
রোজা কবিস কি কারণে, ধর্ম কি হয় বল না।

মৌলবি : পানী নারায়ন শাস্ত্র মতে, তোদের মেয়ে জলে মোতে।
পূজো করিস কোন বিধিতে, শুনতে বড ভাল না।

হিন্দু : মানিস নারে ফুপু কান্না, নিকে করে মিটাস জ্বালা।
চাচা আপন চাচী পর, তাব মেয়েকে ছাড়ে না।

মৌলবী : বৃন্দাবনের কেষ্ট ছোঁড়া, মামীর সঙ্গে পড়ল ধরা
যুবতী যোলশো নারী, ইজ্জত সে তো রাখল না।

হিন্দু- তোদের বিবি মক্কা যায় যে, বোরখা দিযে ঢাকা দেয় রে।
আবার যুবক পুরুষ দেখলে পরে, নজর দিতে ছাড়ে না।

মৌলবী : নারায়ন কস্ তোরা যারে, শঙ্খচূড়ের যায় সে ঘরে
তুলসীর ইজ্জত হরে কি লাঞ্ছনা বল না।

হিন্দু- মামু যারে তালাক দেয়রে, ভাগনে তারে নিকে করে
তালাক কথা তিনবার বললে ঘরে রাখা যাবে না।

মৌলবী : গোপের নারী নামল জলে, বসন নিয়ে কদম ডালে
খোকা হয়ে কামড় দিল নরম জায়গায় বল না।

হিন্দু- কুরবানী দিস কোরান মতে গরু ভেড়া যাব বা জোটে
হোসেন হাসান নাহি কেটে, শোধন ছাড়া চলে না।

মৌলবী : কালী বলিস তোরা যারে, সদাই ল্যাংটা দেখি তারে
পদতলে পুরুষ পড়ে, একি আজব কারখানা।

হিন্দু : বাদদুয়ারে তালাই ছেঁড়া, বিবির মাথায় ধূলো ভরা
হিন্দুকে দেখে না তারা, আবার বাগে পেলে ছাড়ে না।

মৌলবী: বৃথা কেন ঝগড়া করি, যেই জন খোদা সেইজন হরি,
ভবপারের সেইজন কান্ডারী, তাকে ছাড়া চলবেনা,
আইন ধরে চলে যাব কারও নিন্দা করবনা।[১৫]

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অসংখ্য লোকসাধারণ হল এই গানের উপভোক্তা। এই গান শুনে তাদের মধ্যে কোন মতান্তর তো হয়ই না, বরং এই গান তারা বেশ তারিয়ে উপভোগ করে। এটা গর্বের কথা যে আজকের দিনেও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির প্রাধান্যকে অস্বীকার করে বোলান গান তার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে চলেছে।

১। মনি বর্ধন-"বাংলার লোকনৃত্য ও গীতি বৈচিত্র্য" পৃ: ৩৫-৩৬, দ্রঃ শ্রী শ্রী হর্ষ মল্লিক "বোলান কথা" পৃ: ১৪৪
২। সুশান্ত দাস-প্রবন্ধ: বোলান, গণকণ্ঠ শারদীয়া সংখ্যা (বহরমপুর) ১৯৮৫
৩। নরহরি কবিরাজ - স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা পৃ: ১৩-১৪
৪। ঐ গ্রন্থ পৃ: ১৩-১৪
৫। করম আলি "মুজাফর নামা" - বেঙ্গল নবাবস্ পৃ: ৪৯-৫০ থেকে সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় "প্রাক্ পলাশী বাংলা" পৃ: ১২৪তে উল্লিখিত।
৬। ঐ গ্রন্থ পৃ: ১২৪।
৭। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়-'প্রাক্ পলাশী বাংলা' পৃ: ১২৪-১২৫, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলি-১১, ১৯৮২
৮। হেমাঙ্গ বিশ্বাস - বাংলার লোকসঙ্গীতে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের সাধনা, লোকসঙ্গীত সমীক্ষা: বাংলা ও আসাম, পৃ: ১৭৩, মুখার্জ্জী এ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।
৯। হেমাঙ্গ বিশ্বাস - বাংলার লোকসঙ্গীতে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের সাধনা, লোকসঙ্গীত সমীক্ষা: বাংলা আসাম, পৃ: ১৭৪-১৭৫।
১০। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড (পৃ: ২৪-২৫) দ্রঃ শ্রী শ্রী হর্ষ মল্লিক "বোলান কথা" পৃ: ১২১-১২২
১১। মনি বর্ধন-বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য, পৃ: ২৮-৩২
১২। সাক্ষাৎকার, জহর দা (বোলান রচয়িতা) মালীহাটি, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ (১৩.৫.৯৭)।
১৩। গানটির রচয়িতা বিদ্যাসাগর ঘোষ একডালিয়া, ভরতপুর মুর্শিদাবাদ। (বোলান দলের দলপতি মধুসূদন দের সৌজন্যে প্রাপ্ত) ১৮/৫/৯৮।

হাওড়া জেলার মুসলিম বিবাহঃ সংস্কৃতিক সমন্বয়ের একটি দিক

শেখ মকবুল ইসলাম

বাংলার মুসলমানরা ধর্মে ইসলামপন্থী হলেও তারা এদেশের সংস্কৃতি ধারাকেই বহন করে চলেছে। মুসলিম সমাজে প্রচলিত লোকায়ত সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা নিয়ে তেমন গবেষণা কর্ম হয় নি বলে মুসলিমদের সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক যোগসূত্রও আমাদের অলক্ষ্যে থেকে গেছে। ফলে মুসলিম সমাজকে একটা বিচ্ছিন্ন সমাজ বলে ভ্রম হয়।

বাংলার লোকায়ত মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির জীবন ধারারা গভীরে বাংলার সংস্কৃতি ধারা স্পন্দিত হচ্ছে। বাংলার মুসলমান সমাজের ভিতর একটি শাস্ত্রীয় বা শরিয়তী দিক (তা পবিমাণে কম বেশী হতে পারে), যেমন আছে, তেমনি শরিয়ত বিবিক্ত সংস্কৃতির একটি দিকও আছে যার অনেক কিছুই, শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে অনৈস্লামিক। গোঁড়া মুসলিমদের কাছে এই সত্য হয়তো বা অস্বস্তি দায়ক হবে, কিন্তু সংস্কৃতি বিষয়ে উৎসাহী মানুষের কাছে ঘটনাটির গুরুত্ব আছে।

মূলতঃ হাওড়া জেলার মুসলিমদের বিবাহ কেন্দ্রিক লোকচার ও মৌখিক সাহিত্য বিশ্লেষণ করে, বর্তমান প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলাম আনীত ভাবধারার একটি সমন্বয় ঘটেছে। বিষয়টির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কতগুলি সাধারণ প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। "মুসলিম সমাজ" শব্দের মধ্যে 'ধর্ম' বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। অন্যদিকে "সাংস্কৃতিক সমন্বয়" শব্দ দুটির মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছে সংস্কৃতি। এরই সঙ্গে উল্লেখ্য, সমন্বয়-এর অবিচ্ছেদ্য ভাবনানুষঙ্গ হল 'আইডেনটিটি'র ধারণা। আইডেনটিটি এক নয়, বহু। স্থান সময় ও পরিস্থিতির দাবী অনুসারে আমরা প্রাসঙ্গিক আইডেনটিটি তুলে ধরি। পরিস্থিতির প্রয়োজনে একই লোক কখনও "ভারতীয়", কখনও 'মুসলমান', কখনও "বাঙালী" কখনও "শিক্ষক" ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে নিজেকে তুলে ধরে। ভারতীয়, মুসলমান, বাঙালী, শিক্ষক এই সবকটাই তার আইডেনটিটি। এই প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ড. অজিত কুমার দণ্ড একাধিক আইডেনটিটির কথা বলেছেন।[১] সমাজ-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বলে দেয়, বাংলার যে মুসলমানরা ধর্মে ইসলামপন্থী, সংস্কৃতিতে তারাই বাঙালী। তাদের ধর্ম আরব থেকে এলেও, তাদের সংস্কৃতি এই বাংলারই সম্পদ।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের বিবাহ-ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিবাহ ব্যবস্থা ও বিবাহ রীতির মধ্যে সংস্কৃতির একাধিক দিক জড়িত রয়েছে। বস্তুগত

সংস্কৃতি, স্ত্রী আচার, মৌখিক সাহিত্য (গান) ইত্যাদি নানা দিক মুসলিম সমাজে একমাত্র বিবাহের মধ্যেই দেখা যায়। অন্যদিকে মুসলিম বিবাহের ধরণ-ধারণ বাংলার সর্বত্র এক বকম নয়। যেহেতু মুসলিমদের সমাজ ভেদ ও অঞ্চলভেদ অনুসারে বিবাহ রীতির বৈভিন্ন্য লক্ষ্য করা যায়, সেহেতু উপযুক্ত ক্ষেত্রকর্ম ছাড়া সারা বাংলার মুসলিমদের বিবাহরীতি সম্পর্কে সাধাবণ সিদ্ধান্ত কবা খুবই অবৈজ্ঞানিক হবে। সেই কাবণে শুধু হাওড়া জেলাব সমীক্ষার ভিত্তিতে এই বিশ্লেষণ করা হল।

(১) ছেলে/মেয়ে দেখা ঃ পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সিয়াসুন্নি ভেদ আছে। মুসলিম হলেই যে, যে-কোন মুসলিমের সঙ্গে বিয়ে হবে এমন ধারণা ভ্রান্ত। শেখ সৈয়দ ইত্যাদি উচ্চ বংশীয়দের সঙ্গে মল্লিক, জোলা ইত্যাদি শ্রেণীর সামাজিক বিয়ে সাধারণতঃ হয় না। বাস্তবেবর সামাজিক বিবাহ, অনেকটাই অন্তঃসামাজিক বিবাহ। বলা যায় ধর্মীয় অন্তর্বিবাহ।

পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পবিত্র কোরাণে যে অভাবনীয় উদারতা আছে, বাস্তব সমাজে তা খুব একটা প্রতিফলিত নয়। পবিত্র কোরাণে বলা আছে—

"আজ তোমাদের জন্য সকল ভালোজিনিস বৈধ করা হ'ল, যাদের কিতাব দেওয়া হযেছে (ইহুদী ও খৃষ্টান) তাদের খাদ্য দ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ্য ও তোমাদের খাদ্য দ্রব্য তাদের জন্য বৈধ এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নাবী ও তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল। যদি তোমরা বিবাহের জন্য মোহব প্রদান কব। প্রকাশ্য ব্যাভিচার অথবা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নয়।"[২]

ধর্মগত দিক থেকে বহির্বিবাহের অনুমোদন, পবিত্র কোরাণে আছে। বিবাহ দর্শনের ক্ষেত্রে, প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা শাস্ত্রগত ভাবে নিবন্ধ। অন্য ধর্মের সচ্চরিত্রা নারীকে বিবাহ করা, কোরাণ বিরুদ্ধ কাজ নয, তবে অন্য ধর্ম বলতে কোরাণে খৃষ্টানও ইহুদীর উল্লেখ আছে। কোরাণে বলা হয়েছে:

"...সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চিরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য..."[৩]

ইসলামী শাস্ত্র অনুসারে, বিয়ের ক্ষেত্রে, ধর্মের চেয়ে সৎ চরিত্রের প্রাধান্য বেশী। উল্লেখ্য, মহাত্মা হজরত মহম্মদ প্রথম বিবাহ করেন এক সচ্চরিত্রা ইহুদী[৪] বিধবাকে। তিনি মহিয়সী খাদিজা। তবে মুসলিম নারীর অমুসলিম পুরুষ বিয়ে করায় বাধা আছে।[৫]

পাত্রী নির্বাচন প্রসঙ্গে আর একটি প্রসঙ্গ আছে। সাধারণ, ধারণা বোন কে বিয়ে করতে মুসলিমদের কোন বাধা নেই। অন্যান্যদের মত অনেক (সবাই নয়) মুসলমানও এই ধারণায় বিশ্বাস করে এবং মামাতো, মাসতুতো, পিসতুতো, খুড়তুতো-ইত্যাদি সম্পর্কিত বোনের সঙ্গে বিয়েও হয়। এমন বিবাহ, অল্প হলেও আজও চালু আছে। এ সম্পর্কে মুসলিম সমাজে একটি প্রবাদও চালু আছে: "চাচা আপন চাচী পর, চাচীর মেয়ে বিয়ে কর!"

বিষয়টার সম্পর্কে যেহেতু সমাজের ধারণা স্পষ্ট নয়, তাই বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

বোনকে বিয়ে করার ব্যাপাবে কোবাণের সুস্পষ্ট নির্দেশ হল — বোনকে বিয়ে করা

নিষিদ্ধ। পবিত্র কোরাণে বলা আছে :

"তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদের বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ কর না...তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগিনী, ফুফু(পিসী) খালা (মাসী), ভ্রাতুস্পুত্রী, ভগিনেয়ী, দুগ্ধ মাতা, দুগ্ধ ভগিনী...."[১] এই আয়াত থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, বোন পরিচয়ের কাউকেই বিবাহ করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন হ'ল, বোনকে বিয়ে করার ধারণা মুসলিম সমাজে এমন সহজে যে ঠাঁই করে নিয়েছে, তার কি কোন কারণ আছে ? মনে হয় আছে।

পবিত্র কোরাণের এক আয়াতে বলা আছে ঃ

"হে নবী, আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীগণকে বৈধ করেছি...এবং বিবাহের জন্য বৈধ্য করেছি তোমার চাচাতো (খুড়তুতো) ভগিনী, ফুফুতো (পিসতুতো) ভগিনী, (মামাতো ভগিনী, খালাতো (মাসতুতো) ভগিনী যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে... এ বিশেষ করে তোমারই জন্য অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়।"[৭]

আয়াতটি ঠিক করে পড়লে দেখা যাবে যে সম্পর্কিত বোনকে বিয়ে করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল একমাত্র হজরত মহম্মদকে। আর কাউকে নয়। হয়তো বা অপগণ্ড ইসলাম ভক্তরা হজরত মহম্মদের এই অধিকারকে সর্ব সাধারণের অধিকার বলেই প্রচার করে থাকবে। তাই, বোনকে বিবাহ করা ইসলামে সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় কাজ।[৮]

(২) পান চিনি ঃ পাত্রী পছন্দ হলে 'পান চিনি' হয়। পাত্রপক্ষ মেয়ের বাড়ীতে কাপড়, মাছ, মিষ্টি ইত্যাদি এনে মেয়েকে আশীর্বাদ করে যায়। বিয়ের তারিখও স্থির হয। রমজান মাস ও মহরমের সময় পানচিনি হয় না।

(৩) আইবুড়ো ভাত ঃ বাংলার সম্পূর্ণ নিজস্ব রীতিতে পাত্রপাত্রীর আইবুড়ো ভাত হয়। নিজের বাড়ীতে এবং আত্মীয়দের বাড়ীতে আইবুড়োভাত দেওয়া হয়ে থাকে।

(৪) গায়ে হলুদ ঃ সাধারণভাবে বিয়ের সাত থেকে তিনদিন আগে পর্যন্ত গায়ে হলুদ হয়।

গায়ে হলুদ হওয়ার আগে "ক্ষীর খিলানী" নামে একটা অনুষ্ঠান হয়। এটি গায়ে হলুদের অপরিহার্য অঙ্গ। সেদ্ধ চাল, নারকেল, তালগুড়, কিসমিস ও তেজপাতা দিয়ে রান্না করা এক রকম পায়েস জাতীয় খাবারকে ক্ষীর বলে। একটি রূপোর টাকা বা বড় এক টাকার মুদ্রায় যতটা ক্ষীর ধরে ততটা ক্ষীর বর বা কণেকে খাওয়ানো হয়। এই সময় মুসলিম মেয়েরা "ক্ষীর খিলানী" গান গায়। মুসলিম সমাজের মৌখিক সাহিত্য হিসেবে গানগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। ক্ষীর খাওয়া হয়ে গেলে গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। বর/কনেকে একটি জলচৌকীতে বসানো হয়। জলচৌকর চারটে পায়ার নীচে চারটি গোটা পান থাকে। পানের ওপর জলচৌকী বসানো হয়। পাঁচ বা সাত জন (তিন বাদে বিজোড় সংখ্যক) সধবা মহিলা হলুদ মাখাতে শুরু করে। ছেলের হলুদ ছেলের বাড়ীতে বাটা হয়। মেয়ের হলুদ ছেলের বাড়ী থেকে যায়। ছেলেকে মাখানো হলুদের কিছুটা অংশ অবশ্যই মেয়েক মাখাতে হয়। গায়ে হলুদের সঙ্গে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে আলতা সিঁদুর

অবশ্যই পাঠাতে হয়।

গায়ে হলুদ পর্বের কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। রমজানমাস, মহরম, পাত্রপাত্রীর জন্মবার, শনিবার, অমাবস্যা, বৃহস্পতিবার হলে বারবেলা-ইত্যাদি মানা হয়। এই সময় গায়ে হলুদ হয় না। কোন বিধবা মহিলা ও বন্ধ্যা নারী হলুদ মাখাতে পারে না।

মুসলিম সমাজে গায়ে হলুদের ও ক্ষীর খিলানীর গান রয়েছে প্রচুর।

প্রাসঙ্গিক দুটি উদাহরণ দেওয়া হোল :

গান সংগ্রহ-১

(বলি) হলদি তেলের সুরু-বুরু / কামিনী চালের খিরুনী

(বলি) মা-আ রেঁধেছে খিরুনী / খাও গো আনন্দ খিরুনী

(বলি) মায়ের দেহাজের থালা পাই / তবে আনন্দ খিরু খায়

(বলি) হলদি তেলের সুরু বুরু / .....

(বলি) ভাবী রেঁধেছে খিরুনী / খাও গো আনন্দ খিরুনী

(বলি) ভাবীর দেহাজের সিলাপচি পাই / তবে আনন্দ খিরু খায়

[সুরুবুরু = মাখামাখি; খিরুনী = ক্ষীর; দেহাজ = দেনমোহর; সিলাপচি = পিকদানি; দাতৃ : সোকর আরা খাতুন (৫২), গদী, বাগনান, হাওড়া।]

গান সংগ্রহ - ২

(বলি) দীপন্ত পুরের কুমোর গো তারা।/ বায়না চেয়েচে (২ বার)

(বলি) যত গো হাঁড়ি ততগো সরা / দিবে বলেচে (২ বার)

(বলি) 'অমুকেব' ভাবীর ছাতে গো তাবা / থাকবে বলেচে (২ বার)

(বলি) মাথায় সিঁদু পায়ে আলতা /পরতে বলেচে (২ বার)

(বলি) দীপান্ত পুবের কুমোর .....

[দাতৃ: সোকর আরা খাতুন (৫২) গদী, বাগনান, হাওড়া।]

(৫) **আইবুড়ো ডুবুক ঃ** বিয়ের ঠিক আগের দিন আইবুড়ো ডুবুক হয়। এইদিন মেয়ে ডুব দিয়ে পুকুরে স্নান করে। ডুব দেওয়া থেকে ডুবুক এসেছে।

এইদিন ছেলের বাড়ী থেকে আলতা, সিঁদুর, চন্দন, মাছ পান এবং মিষ্টি মেয়ের বাড়ীতে পাঠানো হয়। মাছের বিশেষত্ব আছে। একটি মাছের মুখে পান ও নাকে নথ থাকে এবং মাথায় সিঁদুর ফোঁটা। যেন মৎস্য দম্পতি। এর পিছনে সাদৃশ্যমূলক যাদুবোধ কাজ করে থাকবে। এই মাছ মঙ্গলের প্রতীক।

আইবুড়ো ডুবুকের দিন ছেলের বাড়ী থেকে দেওয়া শাড়ী পরে মেয়ে পুকুরঘাটে যায়। মেয়ের সঙ্গে সাতজন কুমারী বা সধবা (বিধবা/অপুত্রক হলে চলবে না) মহিলা যায়। এরা একটা বড় কুলোয় করে ধান, দূর্বা, তেল-সিঁদুর, রঙ-আলতা, সরষে, তামার পয়সা, প্রদীপ (বিকল্পে লম্ফ) নিয়ে, মেয়েকে সঙ্গে করে পুকুব ঘাটে যায়। সেখানে গিয়ে ধান-দূর্বা, তেল সিঁদুর দিয়ে পুকুর ঘাটের তথা জলের পীরদের (জল-দেবতা) উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। একে 'ঘাট মুগলানো' বলে। এটা মুসলিম বিয়ের লোকাচারের অপরিহার্য অঙ্গ।

জলদেবতাকে শ্রদ্ধা জানানোর পর সাতজন মেয়ে মিলে পাত্রীকে জলে নামায়। পাত্রীকে মাঝখানে রেখে সাতজন তাকে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ায়। সাত জনাই পাত্রীর মাথায় হাত রাখে। সেই অবস্থাতেই সকলে একসঙ্গে সাতবার জলে ডুব দেয়। এইভাবেই আইবুড়ো ডুবুক শেষ হয়। এর পর কোন অবস্থাতেই মেয়ে বাইরে বেরোতে পারে না।

আইবুড়ো ডুবুকের সময় গান গাওয়া হয়। মুসলিম মেয়েরাই তা রচনা করে। আইবুড়ো ডুবুকের সঙ্গে সম্পর্কিত সব গানই মুসলিম সমাজের মৌখিক সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। বর্তমান প্রসঙ্গের গুরুত্ব বিবেচনা করে "ঘাট মুগলানো" সম্পর্কিত একটি গান উদ্ধৃত করা হল ঃ

গান সংগ্রহ - ৩

(বলি) আল্লা মিঞার মজিতে / জুড়া কদম দুলতেছে (২ বার)

(বলি) ফুল সিন্নি দিয়ে আল্লা / জোড় হাত আরেজ করতেচে (২ বাব)

(বলি) রক্ষে কর রক্ষে কর / আমারই গরীব কে (২ বার)

[মজিতে - মসজিদে, জুড়া - জোড়া, সিন্নি - অর্ঘ্য, জোড়হাত আবেজ - করজোড়ে প্রার্থনা। দাতৃ : নেহদা খাতুন (৮৪) ভাটোরা, বাগনান, হাওড়া।]

(৬) উসো ঃ বিয়ের ঠিক আ.গের দিন দুপুর গড়িয়ে গেলে উসোর অনুষ্ঠান হয়। ঘরে আঙিনায় জলচৌকী পেতে, বর বা কনেকে বসিয়ে ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়। আশীর্বাদ হয়ে গেলে একটি বড় চাদর চাঁদোয়ার মত করে পাত্র/পাত্রীর মাথায় ধরা হয়। একটি কালো নোড়া মুঠো করে ছেলে/মেয়ের মাথার ওপর খাড়াখাড়িভাবে ধরা হয়। এবং সেই নোড়ার মাথায় এক পোয়া তেল এমনভাবে ঢালা হয় যেন তা গড়িয়ে পাত্র/পাত্রীর মাথায় পড়ে। সেই তেল সারা গায়েই মাখানো হয়।

তেলপর্ব চুকে গেলে শুরু হয় কড়ি খেলা। একটা বড় কাঁসার থালায় গোটা হলুদ, তামার পয়সা ও কড়ি রাখা হয়। হলুদ-গোলা জল দিয়ে কড়িগুলিকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এরপর চোখ বন্ধ করে পাত্র/পাত্রীকে এক চেষ্টায় কিছু একটা তুলতে বলা হয়। বিশ্বাস এই কড়ি উঠলে দম্পাতি সুখী হবে।

কড়ি খেলা হয়ে গেলে শুরু হয় রংখেলা। মনে হবে গোটা মুসলিম পরিবার যেন দোল-এর আনন্দে মেতে উঠেছে। বাটা হলুদ, জল রঙ, আবীর ইত্যাদি নিয়ে রং খেলা হয়। এটা একটা আনুষ্ঠানিক দোল হয়ে ওঠে। প্রায় সন্ধ্যার মুখ পর্যন্ত দোল খেলা চলে।

রং খেলার শেষে "ডুবুকের পানি" আনার পর্ব হয়। বিবাহর্থীর মামা বা ভগ্নীপতিকে এই কাজ করতে হয়। একটি পিতলে ঘড়ার (কলসা) মুখে গোটা আমপাতা দিয়ে, ঘড়াটি মাথায় নিয়ে জলে নামে একজন (মামা বা ভগ্নীপতি)। "বিসমিল্লাহি রহমানুর রহিম" বলে এক ডুবে ঘড়াটি ভর্তি করতে হয়। ঘড়া ভরার সময় আম পাতাটি সরে যাওয়া অমঙ্গলের সূচক বলেই বিশ্বাস।

(৭) বিয়ে ঃ উসোর পর দিন বিয়ে হয়। বিয়ের লগ্ন বিচার নেই। দিন বিচার আছে। মহরমের দিন, রমজান মাস, ক্ষেত্র বিশেষ অমবস্যাব দিন বিয়ে হয় না। জৈষ্ঠ্য মাসে জ্যেষ্ঠ

সন্তানের বিয়ে হয় না।

বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত সব কিছুর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মাথায় রেখে কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে বলা যাক।

বিয়ের দিন কনের জন্য যে সাজের সামগ্রী পাঠানো হয় তার মধ্যে শাঁখা সিঁদুর অবশ্যই থাকে। আর থাকে বস্ত্রাদি, প্রসাধনী এবং থাকে কাঠের কৌটো, কাঠের চিরুণী, আয়না, লালসুতো, তামার পয়সা ইত্যাদি। বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে একটি ওড়না। এই সাজ সামগ্রীকে একত্রে বলে 'প্যাটাচুপড়ী'।

প্রায় প্রত্যেক মুসলিম বিয়েতে বরযাত্রীদের সঙ্গে যায় "দুলার বিবি"। এরা মহিলা বরযাত্রী। বরের খুব নিকট আত্মীয় যেমন বোন, বৌদি, ভাগ্নী এমন পাঁচ, সাত, দশজন দুলার বিবি হিসেবে যায়। এদের বিশেষ খাতির করতে হয়। বিয়ের দিন বরের বাড়ী থেকে কণের বাড়ীতে "রুজাব সামানা" পাঠাতে হয়। এ হল রোজা বা সীমিত অর্থে উপবাস ভঙ্গের সামগ্রী। বিয়ের দিন মেয়ের মাকে রোজা রাখতে হয়। তার উপবাস ভঙ্গের জন্য (ইফ্‌তার) ভিজে ছোলা, খেজুর, খুরমা, মরশুমী ফল ইত্যাদি অবশ্যই পাঠাতে হয়। এই খাদ্য গ্রহণ করে মেয়ের মা উপবাস ভঙ্গ করে। মুসলিম বিয়েতে বরের জন্য ও সম্মানিত ও নির্বাচিত কয়েকজনের জন্য বিশেষ খাবার প্রস্তুত করা হয়। একে "থাল" বলে। এ এক ধরণের স্পেশাল ডিশ।

শাস্ত্র মাফিক মূল বিয়ের পর্ব খুবই অল্প। বর পক্ষের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজন গিয়ে মেয়েকে গিয়ে জিজ্ঞাস করবে-"অমুক গ্রামের নিবাসী জনাব অমুকের পুত্র অমুক এত টাকা দেনমোহরে আপনাকে শাদী করার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, আপনি রাজী আছেন কী ?" এই প্রশ্ন মেয়েকে তিনবার করা হয় এবং তিনবারই মেয়েকে স্পষ্ট কণ্ঠে সম্মতি জানাতে হয়। অনুরূপ ভাবে বরের কাছে এসে তিনবার জিজ্ঞাসা করা হয় ও বলা হয় "আপনি কি কবুল করছেন ?" বরকে বলতে হয় "ইনসাল্লাহ্ আমি কবুল করছি।" "কবুল" করলেই বিয়ে হয়ে যায়। বর এবং কনে যে বিয়েতে সম্মতি দিল তার সাক্ষী থাকতেই হবে। সাক্ষী ছাড়া বিবাহকে শাস্ত্রে "হারাম" (নিষিদ্ধ) ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাজাপত্য বিবাহের ক্ষেত্রে যেমন বর কণেকে কাছাকাছি থাকতেই হয়। মুসলিম বিয়েতে তেমন না হলেও চলে। পাত্র বা পাত্রী যদি দূরে থাকে, তাহলে প্রস্তাব বহনকারী ও প্রস্তাব গ্রহণ করার সাক্ষী মারফত বিয়ে হতে পারে। একে 'দূর বিবাহ' বলে। নারী ও বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে পারে। শ্রদ্ধেয়া খাদিজা, নাফিসা নামক এক সহচরী মারফৎ শ্রদ্ধেয় হজরত মহম্মদকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেন।[৯]

শাস্ত্রীয় মুসলিম বিয়েতে কাবিল নামা (কবুলিয়ৎ নামা) লেখা হয়। এতে ছেলে মেয়ের পরিচয়, দেন মোহরের পরিমার ও 'তালাক' দেওয়ার অধিকার উল্লিখিত থাকে। "দেন মোহর" কে "মোহরানা" ও বলে। মোহরানা সম্পর্কে ড: ওসমান গণী বলেছেন-"ইসলাম ধর্মের বিধিমত স্বামীকে তার বিবাহিত স্ত্রীকে কিছু টাকা দিতে হয়। এর নাম মোহরানা ... বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী এই মোহরানার টাকা দাবী করলে, স্বামী তার সাথে নির্জন বাসের পূর্বেই তা দিতে বাধ্য।"[১০]

বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কন্যা সম্প্রদানের রীতি আছে। মেয়ের বাবা (অবর্তমানে মামা/কাকা) এই সম্প্রদানের কাজ করে। একে 'সুঁপা' বলে। শব্দটির সঙ্গে 'সমর্পণ' শব্দের যোগ রয়েছে। বিয়ের দিনেই বর কণেকে বাড়ী নিয়ে আসে ও সেই দিনেই একত্রে বাত্রিযাপন কবে। সে দিনেই ফুলশয্যা হয়। বাসব জাগার কোন রীতি নেই।

খুব সংক্ষেপে মুসলিম বিয়েব প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক কযেকটি দিক তুলে ধরা হল।

এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, মুসলিম বিয়েতে ইসলামী শাস্ত্রীয় দিক কতটুকু আছে এবং বাংলার চিরাচবিত লোকাচারের ঐতিহ্য কতখানি রয়েছে। সাংস্কৃতিক সমন্বয় বিষয়টি অনুধাবনেব ক্ষেত্রে বিষযটি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমে মুসলিম বিয়ে ইসলাম সুলভ বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা হল:

(১) "ক্ষীর খিলানী" অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মুসলিম বিয়েতেই দেখা যায়।

(২) উসোব দিন "ডুবুকের পানি" আনাও মুসলিম বিয়ের উল্লেখযোগ্য দিক।

(৩) বিয়ের দিন ববযাত্রীব সঙ্গে "দুলার বিবি" ও "রুজার সামানা" (মেয়েব মার জন্য) যাওয়ার রীতি ও ববকে থালি দেওয়ার রীতি একান্তই মুসলিম সমাজের বিষয়।

(৪) "সাক্ষী" রেখে বিযে হওয়া ও "কাবিলনামা" লেখার দিকটি বিশুদ্ধ ইসলামীয় বীতি।

(৫) 'দেনমোহর' বা 'মোহরানা' ব প্রসঙ্গও ইসলামীয়।

(৬) বিয়েব আসরে বিভিন্ন সময়ে 'নিকাহ' (বিবাহ)-এর 'খোত্‌বা' (শাস্ত্রীয় শ্লোক) পাঠ হয় এবং "মোনাজাৎ" (প্রার্থনা) করা হয়। এটাও শাস্ত্রবিধি।

মোটামুটি ভাবে এই হল মুসলিম বিয়ের উল্লেখ্য ইসলামীয় রীতিব দিক। এদের সবগুলিকে ইসলামের শাস্ত্রীয় রীতি বল্লে ভুল হবে। এই বলা ভাল মুসলিম বিয়ের লোকাচারের বিশিষ্টতার দিক।

এবারে দেখা যাক মুসলিম বিয়ের লৌকিক আচারের মধ্যে এদেশের লোক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কতখানি রয়েছে। ঠিক ঠিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সম্পূর্ণ বাংলাব বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচারেব সঙ্গে ইসলামী শাস্ত্রসুলভ কয়েকটি দিক যুক্ত হয়ে ও এদেশেরই সংস্কৃতি ধারা, মুসলিম সমাজে কিছু বিশিষ্টতা লাভ করে, মুসলিম বিবাহের আচার ও রীতিকে রূপদান করেছে। অর্থাৎ বাংলার সংস্কৃতির ওপরে ইসলাম সুলভ বীতি সমাপতিত হয়েছে।

(১) আইবুড়োভাত, আইবুড়ো ডুবুক ঘাট মুগলানোর রীতি, বিভিন্ন স্ত্রী আচার ও লোকাচারের মধ্যে-এ দেশীয় রীতিরই অনুবর্তন বয়েছে।
এমন কি 'ক্ষীর খিলানী ও ডুবুকের পানী শব্দটি এদেশের সংস্কৃতিরই অঙ্গ, যা মুসলিম সমাজে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

(২) গায়ে হলুদের রীতি পুরোপুরি এ দেশীয়। বাংলা ছাড়াও ভারতেব বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তা প্রচলিত। বাংলার হিন্দু মুসলিম খ্রীষ্টান সব সমাজেই গায়ে হলুদের রীতি প্রচলিত আছে। বিবাহ কেন্দ্রিক মৌখিক সাহিত্যেও (দ্র: গান সংগ্রহ-১) গায়ে হলুদের বিষয়টি অভিপ্রায় (Motif) হয়ে উঠে এসেছে।

(৩) আইবুড়ো ডুবুকের সময় পিতলের (ধাতু নির্মিত) ঘড়ার মুখে আম পাতা (অম্রপল্লব) দেওয়ার রীতি সম্পূর্ণ বাংলার নিজস্ব।

(৪) 'ঘাট মুগলানোর' রীতি পুরোপুরিই বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতি ধারা। এ রীতি কোনভাবেই ইসলাম সম্ভূত নয়। ধান-দূর্বা-তেল-সিঁদুর দিয়ে জলের পীরদেব (জল দেবতা) শ্রদ্ধা জানানের রীতি হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফসল। গান সংগ্রহ-৩ ঘাট মুগলানোব সময় গীত হয়। এখানে "ফুল, সিন্নি" দিয়ে আল্লাকে ডাকার যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে তা হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলশ্রুতি।

(৫) বিয়ের লোকাচাবে ধান, দুর্বা, গোটা পান, হলুদ, বড় গোটা সুপারীর ব্যবহার, কড়ি খেলা, এসব জিনিস বাংলাব আঞ্চলিক সংস্কৃতিরই ঐতিহ্য।

(৬) কণেকে যে সব দান সামগ্রী (প্যাটাচুপড়ী) দেওয়া হয় তাতে, আলতা, চন্দন, শাঁখা-সিঁদুর, লালসুতো, কাঠের ছোট ছোট আয়না চিরুণী, তামার পয়সা ইত্যাদি থাকে। এ সবই বাংলার নিজস্ব ধারা। গান সংগ্রহ-২ তে "মাথার সিঁদুর" "পায়ে আলতা" পরার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। এ সবই বাংলার সংস্কৃতি।

(৭) মুসলিম বিবাহে কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার পালনের রীতি রয়েছে—যেমন কন্যা সমর্পণের সময় কেউ খুঁটি ধরে দাঁড়াবে না। জৈষ্ঠ মাসে বাড়ীর বড় ছেলে মেয়ের বিয়ে হবে না। বিধবা বা অপুত্রক গায়ে হলুদ দেবে না। গায়ে হলুদের পর বব/কনে হাতে একটি লোহার যাঁতি রাখবে। পুত্রের বিয়ের পর শনিবার দিন পুত্রবধূ ও শাশুড়ির প্রথম দেখা হবে না ইত্যাদি। এই সব বিশ্বাসগত দিক, বাঙালীর নিজস্ব লোকমনস্তাত্বিক পরিকাঠামোকেই সূচিত করে।

(৮) মুসলিম বিয়েতে গান গাইবার রীতিটি এই সমাজের বিবাহের বিশিষ্টতার দিকটিকে তুলে ধরে। মুসলিম বিবাহ সম্পর্কিত গানগুলি লোকায়ত মুসলিম সমাজের মেয়েরাই মুখে মুখে বেঁধে থাকে ও তা মুখে মুখেই এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে সঞ্চাবিত হয়। একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে: ইসলামে গান বাজনা নিষিদ্ধ। এ কথা সর্বৈব সত্য নয়। শ্রদ্ধেয় হজরত মহম্মদ স্বয়ং বিয়েতে গান বাজনা করার নির্দেশ দিতেন।[১১]

এদেশের মুসলিম মেয়েবা যে বিয়ের গান গায়, তা সম্পূর্ণ লোকায়ত গান। মুসলিম সমাজে একে 'গীত' বলা হয়। তবে, ইসলামের শাস্ত্রীয় নির্দেশেই মুসলিম মেয়েরা গান গেয়ে থাকে, এমন নয়। সংস্কৃতির নিয়মেই এই বিয়ের গান প্রচলিত। যেমন প্রচলিত মহরমের গান।

পরিসমাপ্তির কথা

বিবাহ রীতির ক্ষেত্রে হাওড়া জেলাব মুসলিমরা পুরোপুরি বঙ্গ সংস্কৃতির অংশীদার। মুসলিম বিয়েতে ইসলামী শাস্ত্রের যেটুক অনুশাসন আছে তা তুলনায় খুবই অল্প। সেটুকুও এসেছে ধর্মের সূত্র ধরে।

সংস্কৃতিকে ধর্মের সপক্ষে বিচার কবার প্রবণতা আমাদের অনেকের মধ্যে কাজ করে। এতে করে, বহু ক্ষেত্রে 'ধর্ম', অহেতুক প্রাধান্য পেয়ে বসে। সংস্কৃতির আলোচনাব ক্ষেত্রে

সংস্কৃতিই বড় কথা-এটাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ। ধর্মের হিন্দু-মুসলিম থাকতে পারে কিন্তু সংস্কৃতির হিন্দু-মুসলিম নেই। বরং একটি সংস্কৃতি ধারা হিন্দু মুসলিম উভয়ের মধ্যে ছড়িয়ে থেকে, সংস্কৃতির সূত্রেই উভয়কে এক সূত্রে বেঁধে রাখতে পারে। এখানেই সাংস্কৃতিক সংহতির দিকটি বাস্তবে ফুটে ওঠে। ধর্মে ইসলাম পন্থী হলেও সংস্কৃতিতে মুসলিমরা বাঙালী। বিয়ের অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করলে সে সত্য সহজেই ধরা পড়ে।

ধর্মের অনুশাসন কঠিন হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতি নমনীয়, তাই অনেক বেশী উদাব। তাই, ইসলাম ধর্মে স্বাভাবিক ভাবে যা স্বীকৃত নয়; মুসলিম বিয়ের অনুষ্ঠানে তারও স্থান রয়েছে। এটা ধর্ম বিরোধী কিছু নয় বরং সংস্কৃতির উদারতার দিক। ধর্মের কঠিন অনুশাসনকে এড়িয়ে এই ভাবেই বাংলার সংস্কৃতি আমাদের সকলকে নানা দিক থেকে সংহত করে রাখে। মুসলিম বিয়ের ক্ষেত্রে সেই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ই ঘটেছে।

সূত্র নির্দেশ

১. Ajit Kumar Danda, Research Methodology in Anthropology, ১৯৯২ পৃ: ১৩৩-১৩৪।

২. মওলানা মোবারক করীম জওহর, কোরআন শরীফ ১৯৭৪, সূরা মায়েদাহ (৫) আয়াত ৫ পৃ: ৭৭।

৩. মওলানা মোবারক করীম জওহর, কোরআন শবীফ ১৯৭৪, সূরা নূর (২৪), আয়াত ২৬, পৃ: ২২২।

৪. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ইসলাম ধর্মের রূপরেখা, (অনুবাদ: মলয় চট্টোপাধ্যায়), ১৯৯৭, পৃ: ৬।

৫. ""Mosleem Woman, however, are prohibited from marrying outside their caste."
- Ranjit Kumar Bhattacharya, Moslems of Rural bengal, ১৯৯২

৬. মওলানা মোবারক করীম জওহর, কোরআন, সূরা নিসা (৪) আয়াত ২২, ২৩, পৃ: ৬২।

৭. ঐ, সূরা আহযাব (৩৩) আয়াত ৫০পৃ: ২৬৫।

৮. "According to the rules, a man is prohibited from marrying his (1) mothers, (2) daughter (3) sister..."
- Ranjiot Kumar Bhatacharya, Moslemes of Rural Bengal, প্রাগুক্ত পৃ: ৭০।
এ প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য: S.H.M Rizul & Shibani Roy, Mosleems : Bio-Cultural perspective, ১৯৮৪, পৃ: ২১-২২ এবং Dr. Majda Asad, Indian Muslim Festivals and Customs (Translation : M. R. Sharma) ১৯৮৮, পৃ: ৬০।

৯. গোলাম মোস্তাফা, বিশ্বনবী, ১৯৬১, পৃ: ৬০-৬৫

১০. ওসমান গণী, চরিত্র ও সমাজগঠনে হজরত মহম্মদ (দঃ) ১৯৯৫, পৃ: ৪৫১।

১১. ঐ, পৃ: ৪৫০-৫১।

ব্রিটিশ বৈষম্যমূলক নীতি ও নরমপন্থীদের সক্রিয় প্রতিবাদ- প্রসঙ্গ তারকেশ্বর রেলপথ বিস্তার - ১৮৮৫

শুভ্রাংশু রায়

১৮৮৫ সাল আধুনিক ভাবতেব ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য বছর। কেননা ঐ বছবই অবসব প্রাপ্ত ব্রিটিশ সবকাবী কর্মচারী এ, ও, হিউমের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ছিল সর্বভাবতীয় স্তরে সুসংহত রূপে জাতীয়তাবাদের প্রথম পরিপূর্ণ প্রকাশ। কিন্তু এবই পাশাপাশি ঐ বছরেব শুরুতে একটি ছোট ঘটনা ঘটেছিল যা ঘটনা হিসাবে ছোট হলেও, তাৎপর্যেব দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঘটনাটি হল, ১৮৮৫ সালের জানুযারীতে তাবকেশ্বব শাখা বেললাইন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের বেলগাডী সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেশ চন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দেব দ্বাবা প্রায় দেড ঘণ্টা অবরোধ।

হিন্দুদেব অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র তাবকেশ্বরের সঙ্গে রেলপথের যোগযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা উনিশ শতকের সত্তরেব দশক থেকেই তৎকালীন প্রশাসনিক মহলে শুরু হয়। অবশেষে আশির দশকে 'Hore Miller and Company' নামে একটি সংস্থা তারকেশ্বরে রেল লাইন সম্প্রসারণেব জন্য 'Tarakeswar Railway Company' স্থাপন করে যার সদর কার্যালয় হয় ৪৮নং (Strand Road) স্ট্র্যাণ্ড বোড। কিন্তু বেলপথ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় ঐ কোম্পানী বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় শেয়ার বিক্রযেব জন্য বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপনে বাংলার মানুষ ভালোই সাড়া দেয় এবং তৎকালীন সময়ে প্রায় সতেরো লক্ষ টাকাব শেয়ার বাবদ কোম্পানী যোগাড় করতে সমর্থ হয়।

প্রথম অবস্থায় হাওড়া থেকে জনাইয়ের মধ্যে দিয়ে শিয়াখালা হয়ে রেললাইন তারকেশ্বর যাওয়ার কথা থাকলেও পরবর্তী সময়ে উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, বন্দীপুর (হরিপাল), শেওড়াফুলি, প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদাররা তদ্বির শুরু করেন যাতে রেল লাইন শেওড়াফুলি থেকে সরাসবি সিঙ্গুর হবিপাল হয়ে তারকেশ্বর অবধি যায়। ঐ সমস্ত জমিদারদের জমিদারি সিঙ্গুর হরিপাল, কৈকালা ইত্যাদি অঞ্চলের দিকেই ছিল। অন্যদিকে জনাইয়ের জমিদারদ্বয় চৌধুরী বাবু এবং সিংহ বাবু রেললাইন যাতে জনাইয়ের মধ্য দিয়েই যায় সেইজনা প্রচেষ্টা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত রাজা নীলকমল মিত্রের (যাব আদি বাড়ী ছিল হরিপালের বন্দীপুরে) প্রভাবে রেললাইন শেওড়াফুলি হয়ে সোজা তারকেশ্বর যাবে বলে কোম্পানী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে কোম্পানী শর্ত আবোপ কবে ঐসমস্ত অঞ্চলের জমিদারদের বেল লাইন বসানোর

জন্য জমিদান করতে হবে। শেওড়াফুলি, সিঙ্গুর, কৈকালা ইত্যাদি অঞ্চলের জমিদাররা রেলপথের জন্য প্রয়োজনীয় জমিদান করেন। নালিকুল স্টেশনের জমি স্বয়ং নীলকমল মিত্র দান করেন। তারকেশ্বরের মহন্ত মহারাজ তারকেশ্বর স্টেশন বানানোর জন্য বৃহৎ একখণ্ড জমিদান করেন। ১৮৮৪ সালের মধ্যেই রেল পথ স্থাপনের কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে যায়।

অবশেষে এল উদ্বোধনের পালা। সেই সময় ছিল ব্রিটিশ ভারতে রেলপথ বিস্তারের যুগ। স্বভাবতই তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডাফরীন স্বয়ং, এই নুতন রেল লাইন উদ্বোধন করবেন বলে স্থির হয়। ১৮৮৫ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে লর্ড ডাফরিন সহ তৎকালীন বাংলার লেফটেনেন্ট গভর্নর, উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীবৃন্দ এবং বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তারকেশ্বরে এসে উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানের আগের দিন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন লেফটানেন্ট গভর্নরকে সঙ্গে নিয়ে বারাকপুরের গভর্নর হাউসে রাত্রিবাস করেন। পরদিন সকালে স্টিমারে করে গঙ্গা পার হয়ে তাঁরা শেওড়াফুলি গঙ্গার ঘাটে হাজির হন। গঙ্গার ঘাট থেকে শেওড়াফুলি স্টেশন পর্যন্ত রাস্তায় লাল কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হয়। এবং রাস্তার দুধারে অসংখ্য মানুষ ভাইসরয়কে উষ্ণ অভিবাদন জানান। তার পর তারা ট্রেন সহযোগে তারকেশ্বরে এসে হাজির হন। বর্তমান তারকেশ্বর স্টেশনের পাশের মাঠে শামিয়ানা খাটিয়ে উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত হন তৎকালনী বাংলা তথা ভারতের কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তি, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ চন্দ্র চন্দ্র, প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়, রাজা নীলকমল মিত্র প্রমুখ। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ডাফরিন জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরকে বাবা তারকনাথের দর্শন করিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানান। যদিও বেলা ১২টা বেজে যাওয়ায় জ্যোতিরিন্দ্র নাথের পক্ষে সেই অনুরোধ কে সম্মান জানানো সম্ভব হয়নি।

এবার কলকাতা ফেরার পালা। ভাইসরয় ডাফরিন কলকাতা রওনা দেবার আগে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। অন্যদিকে অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ হাওড়ায় ফিরে যাবার জন্য ট্রেনে চেপে বসেন।

হঠাৎ হুগলীর তদানীন্তন পুলিশ সুপার মিস্টার বেকার ট্রেনে উঠে "ভাইসরয় এই ট্রেনে যাবেন" এই অজুহাতে সমস্ত ভারতীয়দের ট্রেন থেকে নেমে যেতে বলেন। অনেকে ট্রেন থেকে নেমে গেলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ চন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ কয়েক জন এই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে যেহেতু তারা আমন্ত্রিত সেইহেতু তারা গাড়ী থেকে নামবেন না।

ভারতীয়দের মুখে এই ধরণের স্পর্ধার কথা শুনে মিঃ বেকার অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন। এবং তাঁর কয়েক জন সহকারী পুলিশ অফিসারদের দিয়ে জোর করে সকলকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেন। এই ঘটনায় ঐসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন এবং ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে এর তীব্র প্রতিবাদ করতে থাকেন। প্রয়োজনে প্রতিকার না হলে লাইনের উপর অবস্থানের হুমকি দেন। ক্রমশ: স্থানীয় জনসাধারণ তাদের পাশে এসে দাঁড়ান এবং জনগণের মধ্যে থেকে এই বৈষম্যের প্রতিকারের দাবী ওঠে। তীব্র তর্কাতর্কি, তুমুল হট্টগোল

ইত্যাদি সবমিলিয়ে এক উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

লর্ড ডাফরিন ইতিমধ্যে তার প্রশাসনিকসভা শেষ করে স্টেশনে এসে পৌঁছলে চিৎকার, চেঁচামেচি তাঁব কানে পৌঁছায়। জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডেকে তিনি স্বয়ং কি হয়েছে তা জানতে চান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যুত্তরে কিভাবে পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে একদল পুলিশ তাদের ট্রেন থেকে অনাহূতের মতো নামিয়ে দিয়েছে তা জানান। এই অপমানের বিচার না হলে তারা ট্রেন ছাড়তে দেবেন না, একথাও তিনি সরাসরি ডাফরিনকে জানিয়ে দেন।

লর্ড ডাফরিন সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিষয়টি লেফটেনেন্ট গভর্নরকে তদন্ত করার নির্দেশ দেন। মি: বেকাব কে তলব কবা হয় এবং সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর সম্মানীয় ব্যক্তিদের কাছে মি: বেকার কে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি ক্ষমা চান, তারপর ভারতীয় সহযাত্রী সমেত ভাইসরয়ের গাড়ী কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয। তখন নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে দেড ঘন্টা বেশী সময় পাব হয়ে গিয়েছে।

সমগ্র ঘটনাটি নিঃসন্দেহে আমাদের আব একটি ঐতিহাসিক ঘটনাব কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেটি হল দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীকে বর্ণ বৈষম্যমূলক নীতি কার্যকর করার জন্য ট্রেনেব ফার্স্টক্লাস কামবা থেকে পুলিশ কর্তৃক নামিয়ে দেওয়া। ইতিহাসের পাতায় একদল ঐতিহাসিক যাদের নরম পন্থী হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন, সেই তথাকথিত নরম পন্থীদের সেদিনের সেই সক্রিয় সোচ্চাব প্রতিবাদ তথা ব্রিটিশ শাসক কুলের নতিস্বীকার তৎকালীন জাতীয় নেতৃত্বের চরিত্রের নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিল।

তাছাড়া স্মরণ রাখার বিষয় এই যে, ঐ বছরেরই ডিসেম্বরে হিউম কর্তৃক জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ষডযন্ত্র তত্ত্বের সমর্থক ঐতিহাসিকরা তাদের লেখনীতে এটা দেখানোর চেষ্টা করেন যে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউমের মাধ্যমে লর্ড ডাফরিন ভারত বাসীর বিশেযত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষোভ সম্বন্ধে অবগত হন। কিন্তু তারকেশ্ববের এই ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে ডাফরিন প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হয়তা বা পববর্তী সময়ে এই অভিজ্ঞতা থেকেই ডাফরিন হিউমকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিবাপত্তার জন্য সেফটি ভাল্ব হিসেবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করার (?) নির্দেশ দিয়ে ছিলেন।

এই প্রবন্ধটি লেখার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দ্য বেঙ্গলী পত্রিকার ২৪শে জানুযারীর সংখ্যা তথা বিভিন্ন সবকাবী দলিল দস্তাবেজের সাহায্য নেওযা হয়েছে।

স্বদেশী আন্দোলন : হুগলী জেলা

সুভাষ সেন

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির শোষণ ও সংস্কৃতিগত আধিপত্যের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বাংলাদেশে স্বদেশী যুগের আবির্ভাব ঘটে। সাধারণভাবে এই যুগের আর্বিভাবকাল বিংশ শতকের প্রথম দশক ধরলেও এর সূচনা ঘটেছিল ১৮৬০-এর দশক থেকে। এই সময় থেকে বিভিন্ন খাতে যে স্বদেশী ভাবনা, উদ্যোগ ও সংস্কৃতি প্রবাহিত হয়েছিল তা প্রচণ্ড ভাবাবেগে ফেটে পড়েছিল ১৯০৫ সালে কার্জনের বঙ্গ-বিভাজনের প্রতিবাদ হিসাবে। যদিও এই আন্দোলনের ঝটিকা কেন্দ্র ছিল কলকাতাসহ পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিং প্রভৃতি জেলাগুলি, এর ঢেউ গোটা বাংলাদেশে এমনকি বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় তিন দশক ধরে আলোচ্য বিষয় নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হলেও[১] শতবর্ষের দ্বার প্রান্তে এসে আঞ্চলিক স্তরে এই আন্দোলনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে হুগলী জেলায় এই আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ও তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

হুগলী জেলায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট :

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ম্যানেজিং এজেন্সীর মাধ্যমে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা পূর্ব ভারতে চা, পাট, কয়লা ও লৌহ শিল্পে একচেটিয়া কর্তৃত্ব অর্জন করে। ফলে রেল, সড়ক ও জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটলে হুগলী নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরে বিদেশী পুঁজির উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল কলকাতাকেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চল। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ক্রিয়াশীলতা যেমন সাবেকী শিল্পের অবনমন প্রক্রিয়াকে এই সময় চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনি কৃষি অর্থনীতিতে বন্ধ্যাবস্থা নিয়ে এসেছিল। আমি অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করেছি যে, কিভাবে এই সংকট হুগলীসহ সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলিকে গ্রাস করেছিল।[২] ১৯০৪-১৩ সালের হুগলী জেলার সার্ভে সেটেলমেন্ট রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে বন্যা, ম্যালেরিয়ায় ক্লিষ্ট জেলার গ্রামাঞ্চলের জমিদার ও বিভিন্ন স্বত্বভোগীরা লাভের আশা অনিশ্চিত থাকায় জমিতে মূলধন বিনিয়োগে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাদের মধ্যে অনেকে তখন শহরমুখী হয়ে তাদের সন্তান-সন্ততিদের উৎসাহ দিচ্ছে ইংরাজী-শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে স্বাধীন পেশা বা চাকুরীজীবী হতে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনে সে সুযোগও ছিল কম। এঁদের মধ্যে যারা ধনাঢ্য ছিল তারা অর্থনীতির এই সংকট এড়ানোর জন্য কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত পুঁজি বাণিজ্য ও শিল্পে বিনিয়োগের দিকে ঝোঁকে।

অর্থনীতির এই বাস্তব প্রয়োজন ছাড়াও এই সময় দেশীয় বুর্জোয়াদের দ্বারা প্রচারিত অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী চিন্তা বাংলাদেশের জমিদার ও মধ্যবিত্তদেব একাংশকে স্বদেশী উদ্যোগে পুঁজি বিনিয়োগে করতে উৎসাহিত করেছিল—বিদেশী শাসনের স্বরূপ উপলব্ধি করে এই শাসন সম্পর্কে তাদের মোহমুক্তি ঘটতে থাকে। ব্রিটিশ অর্থনীতির বিরুদ্ধে তাদের নিষ্ক্রিয় প্রতিবোধ আন্দোলনের ঢেউ ক্রমশ জাতীয় স্তর থেকে স্থানীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কলকাতাকেন্দ্রিক প্রধান পত্র পত্রিকাগুলি হুগলী জেলাব শহবগুলিতে নিয়মিত প্রচারিত হত। পাশাপাশি ১৮৯০-এর দশকের মধ্যে এই জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলিব মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এডুকেশন গেজেট, অক্ষয় কুমার সরকাবের সাধারণী ও দীননাথ মুখোপাধ্যায়ের চুঁচুড়া বার্তাবহ। এইসব পত্র পত্রিকাগুলি ছিল মফস্বলে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রকাশের মাধ্যম। এগুলি একদিকে যেমন ব্রিটিশ অর্থনীতির কঠোর সমালোচক ছিল, তেমনি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিল। স্বদেশী শিল্পের রূপরেখা নিয়ে জাতীয় স্তরে যে বিতর্ক উঠেছিল তারও প্রতিফলন এইসব পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে প্রকাশিত চিঠিপত্রে লক্ষ্য কবা যায়। এইসব জাতীয়তাবাদী চিন্তা কৃষি অর্থনীতির সংকটে আবর্তিত জমিদার ও স্বত্বভোগীদের শিল্প-বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এঁদেবই উদ্যোগে জেলায় গড়ে উঠেছিল ব্যাঙ্কিং, বীমা, জাহাজ, রেল, রাসায়নিক দ্রব্য, দেশলাই প্রভৃতি শিল্প।[৩]

জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক চিন্তার পাশাপাশি স্বদেশী শিক্ষা সংস্কৃতি প্রসারে আলোচ্য জেলার জমিদার মধ্যবিত্তদের চিন্তা ভাবনা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই সময় প্রকাশিত হতে থাকে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রতিকল্প হিসাবে তারা ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। স্বত্ত্বা সংকটে জর্জরিত জেলার জমিদার মধ্যবিত্তদের বুদ্ধিজীবী অংশ, অক্ষয় কুমার সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও দীননাথ মুখার্জীর সাথে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক যোগীন্দ্র নাথ বসুর ঘনিষ্ঠতা ছিল।[৪] তাদের দ্বারা সম্পাদিত পত্র পত্রিকাগুলির মাধ্যমে তারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সমর্থনে ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করতেন। দেশের দারিদ্র্য ও সংস্কৃতিগত অধঃপতনের জন্য তারা ইংবাজী শিক্ষাকে দায়ী করে। ব্যক্তি ও মনের বিকাশ এবং দেশের সামগ্রিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা একান্ত অনুকরণীয় বলে দীননাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চুঁচুড়া বার্তাবহ মন্তব্য করেছে।[৫] দেশীয় সংস্কৃতির অগ্রগতির জন্য আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, স্থাপত্য, শিল্প ও চিত্রকলা পুনরুত্থানের সপক্ষে মত প্রকাশও এই পত্রিকা করেছে।[৬] জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কবিরাজী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করতেও পরামর্শ দিয়েছিল।[৭]

জাতীয় রাজনীতির সাথে এই জেলার শিক্ষিত পেশাজীবী ও ভূমি নির্ভরশীল মধ্যবিত্তদেব প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে কলকাতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে। সাধারণী পত্রিকার সম্পাদক ও আইনজীবী অক্ষয় কুমার সবকার ছিলেন

এর প্রতিষ্ঠাকালীন সহসভাপতি। প্রজাস্বত্ব আইনের প্রয়োগকে কেন্দ্র করে জেলার রাযত শ্রেণীর মধ্যে যে জমিদার বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল তাকে কাজে লাগিয়ে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হুগলী জেলায় সাতটি শাখা গড়ে তোলে। শহর এলাকায় এদেরই উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল নাগরিক সমিতি, করদাতা সমিতি, ছাত্রসমিতি, ডিবেটিং ক্লাব ইত্যাদি। ভাবত সভার প্রভাব মুক্ত হয়ে যে প্রতিষ্ঠানটি জেলার রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত চেতনা প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল সেটি হল উত্তর পাড়ার হিতকরী সভা।[৮] এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে যে রাজনৈতিক শিক্ষা দান করেছিল সেই চেতনাবোধ থেকেই তারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে 'নিদ্রিত জাতির জাগরণের প্রতীক' বলে স্বাগত জানিয়েছিল।[৯] সাংবাদিক অক্ষয় কুমার সরকার ও পিতা গঙ্গাচরণ সরকারের নেতৃত্বে চুঁচুড়ায় কংগ্রেসের স্থানীয় শাখা খোলা হয়। সুবর্ণবণিক জমিদার রমেশচন্দ্র মণ্ডলের আর্থিক আনুকূল্যে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিনিধি পাঠানো হত এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও ঐ প্রতিষ্ঠানেব কার্যাবলী চুঁচুড়া বার্তাবহ পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।[১০] কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন নীতির সমালোচনা স্থানীয় পত্রিকাটিতে লক্ষ্য করা যায়। এইভাবে জেলার মধ্যবিত্তদের একাংশ ক্রমশ: কংগ্রেসের চরমপন্থী মতবাদের সমর্থক হয়ে পড়ে।[১১] উত্তরপাড়ার জমিদার রাজেন্দ্রলাল মুখার্জী ছিলেন বাংলার চরমপন্থীদের অর্থের জোগানদার।[১২] স্বদেশী শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি মাত্রাধিক আকর্ষণ থেকেই মফ:স্বল জমিদার মধ্যবিত্তদের মধ্যে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তা চেতনা জাগ্রত হয়। কলকাতা কেন্দ্রিক ধর্মমণ্ডলী ছিলেন পিয়ারীমোহন মুখার্জী, অক্ষয় চন্দ্র সবকার, রমেশচন্দ্র মণ্ডল, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরুত্থান ছিল উক্ত সভার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সময়ে গোরক্ষিনী সভার কার্যকলাপ এই অঞ্চলে বৃদ্ধি পায়।[১৩]

স্বদেশী আন্দোলন :

প্রায় তিন দশক ধরে যে স্বদেশী ভাবনা ও উদ্যোগ হুগলীসহ সমগ্র দেশে দেখা দিয়েছিল তা রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পেল ১৯০৩ সালে বঙ্গবিভাজন পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে। ১৯০৫ সালে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে সমগ্র বাংলাদেশে এই আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের স্থানীয় শাখাগুলির মাধ্যমে। সাংবাদিক অক্ষয় কুমাব সরকার, পিয়ারীমোহন মুখার্জী, নন্দলাল গোস্বামীর মতো ব্যক্তিরা যেহেতু কলকাতা কেন্দ্রিক বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন তাই আলোচ্য জেলায় দ্রুত এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।[১৪] হুগলী নদীর পশ্চিম তীরের শহরগুলি ও আরামবাগ ছিল এই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। সভা সমিতি, সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে এই আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচী স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষার কর্মসূচী ঐ সব অঞ্চলে প্রচারিত হতে থাকে।

স্বদেশী উদ্যোগ-ইতিমধ্যেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে কৃষি সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য জেলার জমিদারবর্গের একটা অংশ স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যে, অর্থ বিনিয়োগ করতে শুরু করেছিল। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বৃহৎ স্বদেশী উদ্যোগ ছিল বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল বেল কোম্পানী।[১৫] সূচনাকালে এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১,০০,০০০ টাকা।[১৬] সম্পূর্ণ স্বদেশী উদ্যোগে শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল (১৯০৬)।

মূলত জমিদারদের পুঁজিতেই এই উদ্যোগটি গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ টাকা।[১৭] পিয়ারীমোহন মুখার্জীর উদ্যোগে গড়ে ওঠে ওরিয়েন্টাল ম্যাচ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং (১৯০৬, জুলাই)। এই কোম্পানী অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ টাকা। কোন্নগরে প্রতিষ্ঠিত স্বদেশী সাবান শিল্প, উত্তরপাড়ার মুখার্জীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় জাহাজ শিল্প।[১৮] আরামবাগ মহকুমাতে পিতল কাঁসার বাসন, তাঁতবস্ত্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল স্বদেশী উদ্যোগে। তাছাড়া তাঁত শিল্পে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণের ঝোঁকও তাঁতীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।[১৯]

স্বদেশী উদ্যোগকে জনপ্রিয় করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিল স্থানীয় পত্রপত্রিকাগুলি। সদর শহর হুগলী-চুঁচড়া থেকে প্রকাশিত সাধারণী, এডুকেশন গেজেট, বার্তাবহ ও বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকাগুলি স্বদেশী শিল্পের প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন দিত ও বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন করতো। চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত পত্রিকা বঙ্গ দর্পণ স্বদেশী দ্রব্যের ধর্ম ও গুণগত মান প্রচারের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম পর্যন্ত ব্যবহার করেছিল বিজ্ঞাপনে।[২০] প্রাণনাথ ঘোষ লিখলেন 'ভাত ও তাঁত' নামে এক পুস্তিকা। তিনি স্বদেশী শিল্পে কাঁচামালের অভাব পূরণের জন্য দেশীয় কৃষিসম্পদকে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ব্যতীত দেশের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। এজন্য দেশীয় হস্তশিল্পের বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, চরকাই গ্রামীণ অর্থনীতিকে সবল করতে পারে।[২১]

স্বদেশী শিল্পের বিকাশের পথে প্রধান বাধা হল প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব। এই সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয়তাবাদীরা চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, জে. এন. ব্যানার্জীর মতো প্রথম সারির নেতারা হুগলীর চুঁচুড়া, বৈদ্যবাটী, ত্রিবেণী, ভাস্তারা অঞ্চলে আহূত সভায় যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছিলেন।[২২] মূলধন ও প্রযুক্তিগত সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য দেশীয় মেধাবী যুবকদের ইংল্যাণ্ড ছাড়া ইউরোপেব যে কোন শিল্পোন্নত দেশে গিয়ে হাতে কলমে শিক্ষাগ্রহণের পরামর্শ দেন। তাঁরা আরো বলেছেন, এজন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে তা তাদের এলাকা থেকেই সংগ্রহ করে দিতে হবে। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এগিয়ে এসেছিল ধনিয়াখালি থানার ভাণ্ডারহাটির ধনাঢ্য ব্যক্তিরা। এক সভা করে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থে এলাকার মেধাবী যুবকদের ইউরোপে পাঠানো হোক। অনুরূপভাবে মহেন্দ্রলাল মিত্র হুগলী-চুঁচুড়াতে আহূত এক সভায় স্থানীয় উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেন।[২৩]

দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টির জন্য জাতীয়তাবাদীরা স্বদেশী মেলা, স্বদেশী বাজার ও প্রদর্শনীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। উত্তরপাড়া ও শ্রীরামপুরে জমিদারদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্বদেশী মেলা, প্রদর্শনী। হুগলী চুঁচুড়াতে স্থানীয় জাতীয়তাবাদীরা ও জেলা প্রশাসন অবশ্য এই ধরণের মেলা ও প্রদর্শনী বঙ্গ বিভাজনের পূর্ব থেকেই জেলার সদর শহরে শুরু করেছিল। গ্রামীণ শিল্প ও কৃষিজাত পণ্যের প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সরকারের দেশীয় আমলাদের একটা ভূমিকা থাকতো। যেমন-জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বি. ডেব উদ্যোগে সদর শহরে ১৯০৮-

১৯০৯ ও ১৯১০ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জেলা শহর কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক স্থানীয় উকিল, ইঞ্জিনীয়ার প্রমুখ এই প্রদর্শনী চালাতে সক্রিয় সহযোগিতা দিত। চুঁচুড়া বার্তাবহ গর্বের সাথে ১৯০৮, ১৯০৯ ও ১৯১০ সালের প্রদর্শনীর কথা প্রকাশ করেছে। এইসব প্রদর্শনী দুটি দিক থেকে স্বদেশী চেতনা জাগ্রত করেছিল। প্রথমত, মফস্বল কৃষ্টির সাথে কলকাতা শহর কৃষ্টির মিলনের পথ প্রশস্ত হল। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধরণের কারিগরী শিল্প উৎপাদন এতে প্রেরণা লাভ করেছিল।[২৪]

বয়কট আন্দোলন

১৩ই জুলাই, ১৯০৫-এ সঞ্জীবনী পত্রিকা বয়কট আন্দোলনের ডাক দিলে স্বদেশী আন্দোলন এক নতুন মাত্রা পায়। ম্যাঞ্চেষ্টারের শিল্পপতিদের উপর চাপ সৃষ্টি করে বঙ্গ বিভাজন পরিকল্পনা অ-বাস্তবায়িত করা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য থাকলেও এটি অর্থনৈতিক চিন্তা বর্জিত ছিল না। স্বদেশী যুগের সূচনাপর্ব থেকেই বিদেশী পুঁজি ও সংস্কৃতির আধিপত্যের বিরুদ্ধে দেশীয় অর্থনীতি বিকাশের স্বার্থে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী নেতারা বিদেশী পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছিল। ১৮৯১ সালে Age of Consent Bill পাশ হওয়ার পর থেকে জাতীয়তাবাদী নেতাদের রক্ষণশীল অংশ বিদেশী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অনুরূপ নিষ্ক্রিয় প্রতিবোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। যাইহোক, বয়কট আন্দোলন আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হওয়ার পর থেকে এটিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য জাতীয়তাবাদীরা যে প্রচারের কর্মসূচী নিয়েছিল তা থেকে হুগলী জেলা বাদ যায়নি। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, জে. এন. চৌধুরী চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত এক সভায় বিদেশী দ্রব্য বর্জনের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।[২৫] এইভাবে তেলিনীপাড়া, ভান্ডারা, ত্রিবেণী, বৈদ্যবাটীতে স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সহযোগিতায় সভা ডেকে সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র বয়কট কর্মসূচী প্রচার করেছিলেন।[২৬] শহরাঞ্চলের শিক্ষিত বর্গের মধ্যে এই প্রচার সাড়া ফেলেছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের দিন (৬ই অক্টোবর, ১৯০৫) জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক ও আইনজীবী অক্ষয় চন্দ্র সরকার চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বরের মন্দিরে তাঁর অনুগামীদের শপথ বাক্য পাঠ করান এই বলে যে তারা বিদেশী দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। দেশাত্মবোধক সংগীত গেয়ে তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ঐ দিন চুঁচুড়া শহর পরিক্রমা করেন।[২৭] অবশ্য তাঁর চেতনায় বয়কট মানসিকতা গড়ে উঠেছিল 'Age of consent Bill' আইনে রূপান্তরিত হওয়ার পর থেকেই।

বয়কট আন্দোলন শহরের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না, আলোচ্য জেলার গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পিয়ারীমোহন ও তাঁর পুত্র রাজনারায়ণ মুখার্জী হুগলী ও হাওড়া জেলায় অবস্থিত তাঁদের জমিদারী এলাকায় প্রজাদের স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করার এবং বিদেশী দ্রব্য বিক্রয় না করার নির্দেশ দেন।[২৮] লিভারপুল থেকে আমদানীকৃত লবণ ও চিনির ব্যবহারের উপরেও তারা নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল। একইভাবে দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী তাঁর কাছারী বাড়ীতে প্রজাদের ডেকে এনে অনুরূপ নির্দেশ দেন।[২৯] ১৯০৭ সালে প্রকাশিত সরকারী প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে জেলার সর্বত্র স্বদেশী ও বয়কট কর্মসূচী অত্যন্ত আবেগের সাথে পরিচালিত

হয়েছিল। এই সময় শ্রীবামপুব, উত্তরপাডা ও আবামবাগে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। শেষোক্ত অঞ্চলেব জমিদাবেরা নির্দেশ জারী কবেছিল যে, প্রজাবা যদি কেউ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করে তা হলে তাদের কঠোব শাস্তি পেতে হবে এবং তাদের এই মর্মে মুচলেকা দিতে হবে যে তাবা বিদেশী দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করবে না।[৬০] আর যারা এই নির্দেশ অমান্য কবেছিল তাদের সামাজিকভাবে বযকট কার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। যেসব দোকানদার বিদেশী দ্রব্য বিক্রয় কবতো তাদের শাস্তি হিসাবে ঐসব দ্রব্যে অগ্নি সংযোগ কবা হযেছিল।[৬১]

বযকট আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলাব জন্য ধর্ম ও গুজবকে জাতীযতাবাদীবা প্রশ্রয় দিয়েছিল। আলোচ্য জেলাতেও এইসময এই ঝোঁকটি লক্ষ্য করা যায়। জমিদাবগণ প্রজাবর্গকে ধর্মেব নামে শপথ নিতে বাধ্য করতো এই বলে যে তারা বিদেশী দ্রব্য বর্জন করবে।[৬২] অক্ষয চন্দ্র সবকাবও এই প্রবণতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। স্থানীয় পণ্ডিত ও পুরোহিতদেব গুজব ছড়ানোব কাজে ব্যবহাব কবা হত। তাদের বাধ্য করা হত এই বিধান দিতে যে লিভাবপুল থেকে আমদানীকৃত লবণ ও চিনিতে গরুর হাড় ও শূকরেব চর্বি মেশানো থাকে, তাই পূজাতে এইগুলি বর্জনীয। হিন্দু বিধবাদেব মধ্যে এই গুজব বেশী কবে ছডানো হত।[৬৩] পবামর্শ দেওযা হত লবণ ও চিনিব পবিবর্তে করকচ ও গুড় ব্যবহার করতে।দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামীব মতো আলোকপ্রাপ্ত জমিদারও এই ধরণেব গুজব ছডানোব মানসিকতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। এইভাবে ধর্ম ও গুজবকে আশ্রয় করে জনমত সংগঠিত করাই ছিল তাদেব লক্ষ্য। শহব অঞ্চলে স্বদেশী ও বয়কট কর্মসূচী প্রচাবেব দাযিত্ব নিযেছিল সমিতিগুলি। সবকাবী বিপোর্ট থেকে জানা যায় যে আলোচ্য জেলায ২০টি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৬৪] মূলত এগুলি ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। বালি, উত্তবপাডা, খানাকুল, বিযড়া, শ্রীবামপুর, তেলিনীপাডা, চুঁচুড়াসহ বিভিন্ন স্থানে এই সমিতিগুলি গডে ওঠে।[৬৫] কলকাতা আত্মশক্তিব অধীনে হুগলীতে অনেকগুলি সমিতি গড়ে ওঠে।[৬৬] স্বদেশী ও বয়কটের সমর্থনে এই সমিতিগুলি মিছিল, মিটিং, পিকেটিং কবতো এবং প্রচার চালাতো। এই সমিতিগুলি পরে বিপ্লববাদী গুপ্ত সমিতিতে রূপান্তবিত হয়েছিল।[৬৭] এই সমিতিগুলি মূলত ছাত্র যুবগোষ্ঠীর দ্বারা পবিচালিত হত। হুগলী কলেজ ও কলোজিয়েট স্কুলের ছাত্রবা ছাত্রসমিতি গডে তুলেছিল। এদেব দ্বারা প্রচাবিত স্বদেশী ও বয়কট কর্মসূচী বিব্রত কবেছিল জেলাব প্রশাসনকে। এদের বিরুদ্ধে শিক্ষা নিকেতনের কর্তৃপক্ষ আইনগত ব্যবস্থা নিতে গেলে অভিযুক্তছাত্রবা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে জাতীয বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াব হুমকি দেখিয়ে ছিল এবং স্থানীয প্রশাসনকে বাধ্য করেছিল তাদেব বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার অভিযোগ তুলে নিতে।

বয়কট কর্মসূচীব পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন থেকেও এই জেলা বাদ যাযনি। ১৯০৫ সালে ১০ই ডিসেম্বর ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এ্যাসোসিয়েশনেব উদ্যোগে জাতীয শিক্ষার কর্মসূচী গৃহীত হয। ১৯০৮ সালেব মধ্যে আবামবাগে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি জাতীয বিদ্যালয় এবং পরে হুগলীতেও এরূপ একটি বিদ্যালয প্রতিষ্ঠিত হয।[৬৮] ১৯১১ সালের একটি সরকারী প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে ছাত্রাভাবে আরামবাগের বিদ্যালয়টি উঠে যায়। তবে হুগলীব বিদ্যালযটি দীর্ঘদিন টিকে ছিল জাতীযতাবাদীদের আশ্রয়স্থল হিসাবে। এই কর্মসূচীতে

জেলার জমিদারদেব বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় নি। ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে সমালোচনা শিক্ষিত শ্রেণীর ইংরাজীব প্রতি মোহে তখনও ফাটল ধবাতে পারেনি।

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া :

স্বদেশী উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কিছু সাফল্যেব নজীব থাকলেও সামগ্রিক বিচারে এই আন্দোলনেব ব্যর্থতার দিকটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯০৮ সালেব পব গোটা দেশেই এই আন্দোলনে ভাটা পডতে থাকে। হুগলী জেলাতেও কমতে থাকে মিছিল মিটিং-এর সংখ্যা। ১৯০৯ সালে হুগলীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে নবমপন্থীরা কর্তৃত্ব অর্জন করলে আলোচ্য জেলাব চবমপন্থী জাতীয়তাবাদীবা জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষেব নেতৃত্বে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপেব সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে।[৩৮] আঞ্চলিক স্তরে জাতীয় কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যম ইণ্ডিযান এ্যাসোসিয়েশনের। স্থানীয় শাখাগুলিতে ক্রমশ: দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ফলে উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তির অভাবে জাতীয় শিক্ষা বিস্তাবেব মতো কর্মসূচীও জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। চুঁচুডাব অনাথ ভাণ্ডারেব মতো স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম নিযেও সাধারণেব মনে প্রশ্ন উঠতে থাকে।[৩৯] যে স্বদেশী রেলশিল্পেব জন্য জাতীযতাবাদীরা গর্ববোধ করতো সেটিরও স্বদেশী চবিত্র হারিয়ে যেতে থাকে। জেলার আমদানী-বপ্তানী বাণিজ্যের তালিকা পবীক্ষা করলে দেখা যায় যে স্বদেশী দ্রব্যের পবিবর্তে বিদেশী দ্রব্যেব চাহিদা সাধারণ মানুষেব মধ্যে আবার বৃদ্ধি পাচ্ছিল।[৪০]

গ্রামাঞ্চলেও এই আন্দোলনের কোন ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য কবা যাযনি। একদিকে জেলাব জমিদাববর্গ সাধাবণ মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিল এই আন্দোলনেব সামিল হতে। অন্যদিকে একই সময়ে খাজনা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র কবে তারা কৃষকদেব সাথে আইনগত ও মাঠের লড়াই-এ নেমেছিল।[৪১] তাদের এই দ্বৈত চবিত্রেব জন্য দেশেব অন্যান্য অঞ্চলেব মতো আলোচ্য জেলাব কৃষক শ্রেণী স্বদেশী আন্দোলনে সাড়া দিতে পাবেনি। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে এবাই ছিল কাঁচামাল রপ্তানী ও শিল্প জাত দ্রব্যের আমদানীর মাধ্যম। বযকট আন্দোলন তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থে আঘাত করেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই এরা এই আন্দোলনেব বিরোধিতা কবেছিল। অন্যদিকে বয়কটেব ফলে দ্রব্যমূল্য যে হারে বৃদ্ধি পেযেছিল তা গ্রামেব সাধাবণ মানুষকে বিশেষ বিপাকে ফেলেছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে জেলার জমিদাববর্গেব মধ্যে কেউ কেউ নিজ নিজ জমিদারী এলাকায স্বদেশী ও বয়কট কর্মসূচীকে জোব কবে প্রয়োগ কবতে গিয়ে এক চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি কবেছিলেন। মুসলমান প্রজা অধ্যুষিত এলাকায অনেকক্ষেত্রে তা সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়েছিল। উদাহবণ হিসাবে হুগলী জেলাব ধনিযাখালি ও দাদপুর থানাব মুসলমান প্রজাদের জমিদারবিরোধী আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[৪২]

উপরোক্ত আলোচনাব ভিত্তিতে বলা যায় যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান ধারা গুলির- স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উত্তেজনা, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ-উৎপত্তি ঘটেছিল ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব থেকে। তবে অঞ্চল ও স্থানভেদে এস দ্বন্দ্বগুলির তাবতম্য হেতু আন্দোলন কোথাও সক্রিয, আবাব কোথাও নিষ্ক্রিয রূপ নিয়েছিল। তাই আলোচ্য জেলায় জমিদাব ও মধ্যবিত্তেব স্বার্থ বঙ্গবিভাজনেব ফলে ক্ষুণ্ণ হওযাব আশঙ্কা না

থাকা সত্ত্বেও এই আন্দোলন তাদের নেতৃত্বে সক্রিয় রূপ নিয়েছিল, তবে নেতৃত্বের দ্বৈত মানসিকতা এবং গ্রাম শহরের প্রবর বর্গের সাথে সাধারণ মানুষের দূরত্ব এই আন্দোলনকে গণমুখী হতে দেয়নি। অনেক ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে তাদের উপর আন্দোলন চাপাতে গিয়ে এর স্বাভাবিক গতি নষ্ট হয়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে তা কোথাও সাম্প্রদায়িকরূপ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। তবে শেষোক্ত ঘটনা সমূহের সাথে সর্বক্ষেত্রে আন্দোলনের মূল কর্মসূচীর যোগ যে ছিল না তা উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সূত্র নির্দেশিকা

(১) এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন-সুমিত সরকার, দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৯০৩-১৯০৮, দিল্লি ১৯৭৩; অমিত ভট্টাচার্য্য, স্বদেশী এন্টার প্রাইজ ইন বেঙ্গল, ১৯০০-১৯২০, কলকাতা, ১৯৮৬ গরডন জনসন; পার্টিসন, এ্যাজিটেসন এ্যাণ্ড কংগ্রেস বেঙ্গল ১৯০৪-১৯০৮, ইন মডার্ণ এশিয়ান স্টাডিজ ভলুম ৭ জুলাই ১৯৭৩।

(২) বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ, অপারেশন অব দি টেনানসি ল ইন এ বেঙ্গল ডিসস্ট্রিক্ট: হুগলী, সোসালিষ্ট পারস্পেক্টিভস, ১৯৯৫ মার্চ।

(৩) বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ, চুঁচুড়া বার্তাবহ: একটি মফস্বল পত্রিকা, ১৮৯৩-৯৫, ইতিহাস অনুসন্ধান ৮ম খণ্ড।

(৪) তদেব

(৫) তদেব

(৬) তদেব

(৭) চুঁচুড়া বার্তাবহ, ৬ জুলাই ১৮৯৩। এর পর উল্লেখ থাকবে বার্তাবহ।

(৮) বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন বর্তমান লেখকের অপ্রকাশিত গবেষণা পত্র, ল্যান্ডেড মিডিল ক্লাস এ্যাণ্ড পলিটিকস ইন হুগলী। (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয, ১৯৯৬) তৃতীয় অধ্যায়। এরপর উল্লেখ থাকবে ল্যান্ডেড মিডিল ক্লাস।

(৯) বার্তাবহ, আগষ্ট ৬, ১৮৯৩

(১০) তদেব।

(১১) তদেব।

(১২) হোম (পল) ফাইল নং ১৩/১৯০৯

(১৩) দেখুন ল্যাণ্ডেড মিডিল ক্লাস

(১৪) হোম (পল) ফাইল নং ৮৬ (জে) ১৯০৫

(১৫) বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেল কোম্পানী: এ স্বদেশী এন্টার প্রাইজ, জারনাল অব হিস্ট্রি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯২-৯৩।

(১৬) তদেব।

(১৭) অমিত ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত

(১৮) সুমিত সরকার, প্রাগুক্ত পৃ: ১২৯

(১৯) প্রসিডিংস নং ১-২, রেভেনিউ (ল্যাণ্ড) সেপ্টম্বর, ১৯০৮
(২০) বঙ্গ দর্পণ (চুঁচুড়া হতে প্রকাশিত) ১৯০৫
(২১) প্রাণনাথ ঘোষ, ভাত আর তাঁত, ১৩১৩ বাঁশবেড়িয়া।
(২২) হোম (পল) ফাইল নাং ৮৬ (জে) ১৯০৫
(২৩) তদেব।
(২৪) বরুণ দে, পপুলারাইজেসন অব পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসেস ইন বেঙ্গল ব্রজেন্দ্র নাথ দে, আই.সি.এস ইন হুগলী, ট্রেণ্ডস অব সোসাল ইকনমিক চেঞ্জ ইন ইন্ডিয়া, সিমলা ১৯৬৯
(২৫) হোম (পল) ফাইল নং ৮৬ (২)/১৯০৫
(২৬) তদেব।
(২৭) কালিদাস নাগ (সম্পাদিত) অক্ষয় সাহিত্য ভাণ্ডার, ১ম খণ্ড কলিকাতা ১৯৬১
(২৮) পলিটিকাল (পল) ফাইল নং ৪৩ (ডি) ১৯০৫
(২৯) হোম (পল) ফাইল নং ৮৬ (জ) ১৯০৫
(৩০) পলিটিকাল (পল) ফাইল নং ৪৩ (ডি) ১৯০৫।
(৩১) তদেব।
(৩২) অক্ষয় সাহিত্য ভাণ্ডার, ১ম খণ্ড
(৩৩) হোম (পল) পূর্বোক্ত
(৩৪) ফ্রিডাম মুভমেন্ট পেপারস নং ৬৩
(৩৫) তদেব।
(৩৬) সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত পৃ: ১২৯
(৩৭) ফ্রিডম মুভমেন্ট পেপারস পূর্বোক্ত
(৩৮) পলিটিক্যাল (পল) ফাইল নং ৮/১৯১২
(৩৯) শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রচনা সংগ্রহ, কলকাতা ১৯৮৪
(৪০) হোম (পল) ফাইল নং ১৩/১০৯
(৪১) বিশদভাবে দেখুন ল্যাণ্ডেড মিডিল ক্লাস
(৪২) হোম (পল) ফাইল নং ৭০ (৬-৩৪) ১৯১১।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী (১৯১৩-১৯১৭)

সতী দত্ত

উনবিংশ শতকে বাংলায় যে এক নতুন জাগরণেব সূত্রপাত ঘটে যা সাধারণত রেঁনেসা নামে খ্যাত- সেই পরিমণ্ডলে লালিত জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অবিভক্ত বঙ্গেব খুলনা জেলাব শ্রী ব্রজলাল চক্রবর্তী (যা বর্তমান বাঙ্গলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) ও অন্যান্য কতিপয় মহান ব্যক্তির অদম্য প্রচেষ্টায় ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যার নাম দৌলতপুব হিন্দু একাডেমী।[১] স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতাব বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত এই একাডেমীব বহু ছাত্র-শিক্ষকের নাম নিজ জেলাব ব্যাপক শিক্ষিত জনমণ্ডলীর নিকটও ছিল অজ্ঞাত। অপ্রকাশিত ও অব্যবহৃত বিভিন্ন নথিপত্রেব সহায়তায় ও পুলিশের গোপন বিবরণের, বিশেষত তদানীন্তন বাংলাব পুলিশ কমিশনার স্যাব চার্লস টেগার্টের বিভিন্ন গোপন নির্দেশের ভেতর থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে এই প্রতিষ্ঠানটিব ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ণয করা হযেছে এই নিবন্ধে।

ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায যে, অহিংস আন্দোলনেব 'বৈশিষ্ট্য প্রচাবে আমরা যতখানি আগ্রহী, সশস্ত্র প্রতিরোধের স্তর বিন্যাস ও তার গুরুত্ব নির্ণযে ততখানি তৎপব আমরা নই, বা হইনি। ১৯০৫-৪৩ পর্যন্ত যদি একটা সমান্তবাল বেখাব সন্ধান করা যায, তাহলে পাশাপাশি ইংরেজবিরোধী দুটি প্রবহমান স্রোত দৃষ্ট হয-আবেদন নিবেদনের কর্মসূচী এবং সহিংস সর্বাত্মক সংগ্রাম। দ্বিতীয় স্রোতটি সন্ত্রাসবাদী নামে পরিচিত এবং সরকারী নথীপত্রে ধিকৃত। গান্ধীজির অভ্যুদয়েব বহু পূর্বেই এরা ইংরেজবিবোধী বিভিন্ন বিদেশী শক্তিব দেশ থেকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে লিপ্ত ছিল ভারতেব অভ্যন্তরে একটি সার্মবিক অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে; যদিও সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয।[২] এই উদ্যোগেব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ছাত্র-শিক্ষকেব একটি অংশ।[৩]

১৯১৫ সালেব ৯ই সেপ্টেম্বব তারিখে বালেশ্বরের বুড়ীবালামের তীরে বিপ্লবী যতীন মুখার্জীব দলেব সঙ্গে পুলিশেব যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয[৪] (জার্মান অস্ত্রশস্ত্র জাহাজে এ স্থানে পৌঁছনোব কথা ছিল), তারই ফলশ্রুতিতে বাংলার বিপ্লবীদেব ওপব আসে চবম আঘাত। এই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডেব নায়ক ছিলেন যতীন মুখোপাধ্যায, যাঁর নেতৃত্বে বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনে যুক্ত হয় এক নতুন ধারা। ডা: ভূপেন্দ্রনাথ দত্তেব মতে বালেশ্বরের এই সশস্ত্র সংঘর্ষ ভারতেব দ্বিতীয স্বাধীনতা সংগ্রাম, যা দেশে বিদেশে পরিব্যাপ্ত হয়।[৫] উক্তপ্রচেষ্টা বিফল হলেও ইতিহাস পরিত্যক্ত নয। ববং সেই প্রচেষ্টা স্বাধীনতা অর্জনেব পথে একটি অগ্রবর্তী

পদক্ষেপ স্বরূপ।[৮] আন্তর্জাতিক এই বিপ্লব প্রচেষ্টার মূলে আঘাত হানতে বদ্ধপরিকব পুলিশের নিকট বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর আসে যে, খুলনা জেলাস্থ 'দৌলতপুব হিন্দু একাডেমী' ঐ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যতীন্দ্রনাথের অনুগামী 'অনুশীলন সমিতিব' বহু সদস্য শিক্ষকরূপে এই সময় যোগ দেন দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীতে। আবাসিক ছাত্র ও শিক্ষকগণ পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে অতি সহজেই এই প্রতিষ্ঠানটিকে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হন যদিও একাডেমীর সংবিধান অনুযায়ী এদের বাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। এই সময়কালীন ছাত্রদের মধ্যে সতীশ চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রকুমাব দত্ত, সবেন্দ্র কুমারি, কুন্তম চক্রবর্তী প্রভৃতি নামের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। কিন্তু পুলিশের গোপন বিবরণীতে যে দীর্ঘ নামেব তালিকা বর্তমান তার অনেক নামই বহুলোকেব কাছে অজানা।[৮] প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যে বৃহত্তর অংশ খুলনা ও যশোব জেলাব হলেও ফরিদপুর, বংপুর, বরিশাল ও ঢাকা থেকেও অনেক ছাত্র আনতো। কলেজেব প্রতিষ্ঠাতা ব্রজলাল চক্রবর্তী সমগ্র বঙ্গদেশের বেশ কিছু সংখ্যক খ্যাতনামা শিক্ষাবিদদের এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরূপে একত্রিত করেছিলেন। এই শিক্ষক সম্প্রদায়ও ছাত্র সম্প্রদাযের যোগসূত্রের মাধ্যমে হিন্দু একাডেমী বাংলাদেশের বহু জেলা ' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

১৯০৮ সালেব ১১ই ডিসেম্বর সরকার কর্তৃক সমস্ত সমিতি নিষিদ্ধ হওয়ায়[৯] কলকাতার সমিতির এই সদস্যরা দৌলতপুর একাডেমীতে এসেছিলেন শিক্ষকরূপে। অরুণ চন্দ্র গুহব মতে খুলনাব নাংলা ডাকাতিতে (১৯০৯-১০) পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯১৩ ১৪ সালে দৌলতপুর গোষ্ঠীর উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত জেলায় কোন বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠতে পারেনি।[১০] এই সময়ে কলেজের অধ্যাপকের তালিকায় 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর কয়েকজনের নাম ছিল। যেমন- ডা: অমূল্য চন্দ্র উকিল, মণীন্দ্রনাথ শেঠ, শশিভূষণ রায় চৌধুরী, শরৎ চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। হিন্দু একাডেমী যে এই সময় ক্রমে ক্রমে বাংলার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছিল। কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তরও সে বিষয়ে অবহিত ছিলন না। যখন তাবা জানতে পারে, তখন স্বয়ং টেগার্ট যে এ বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হলেন তার হদিস কলকাতা থেকে প্রেরিত ১৯১৬-র ১লা ও ২০শে সেপ্টেম্বরের তাঁর দুটি চিঠিতে পাওয়া যায়। "Daulatpur College is a disturbed area...It has been undoubtedly exploited by Satish Chakraborty & Sailen Ghosh. The absconding professor of Science College."[১১] ১৯১৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে খুলনার পুলিশ সুপারকে লিখিত টেগার্টের পত্রের কিয়দংশ "...Daulatpur College has now become a revolutionary centre. Revolutionaries carry on their work of recruiting in schools and Colleges openly."[১২]। টেগার্টের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে খুলনার পুলিশ কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে যে তথ্যাদি সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে একটি গোপন দীর্ঘ বিবৃতি কলকাতায় পাঠায়। সেই বিবৃতির পর্যালোচনা করে বলা সম্ভব যে, কবে ও কিভাবে দৌলতপুর একাডেমী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। এই বিবরণ অনুযায়ী একাডেমীর রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয় ১৯১০ সালে।[১৩] বিশেষত রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে শ্রীমুকুন্দলাল চক্রবর্তী যোগদান

করেন। খুলনা নিবাসী অধ্যাপক চক্রবর্তী ১৯০৮ সালে কলকাতার শোভারাম বসাক লেনের 'আত্মোন্নতি' মেসে যতীনদার আড্ডায় অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, ইন্দ্রনাথ নন্দী ও নরেন বোস প্রমুখর সঙ্গে কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন কলকাতার জাতীয় কলেজের গণিতের অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্তকে। এই কিশোরী মোহন ছিলেন যতীন্দ্রনাথের সহযোগী। এঁদের পরেই এসেছিলেন ১৯১১ সালে শশিভূষণ রায়চৌধুরীরা একাডেমীব ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়করূপে। একাডেমীতে পাড়াগাঁ থেকে অনেক গরীব ঘরের ছেলেরা পড়াশোনা করতে আসতো। অল্পবয়সে রাজনীতিতে তাদের হাতে খড়ি হয়েছে নানা শিক্ষার ভিতর দিয়ে। এই শশীভূষণের সাহচর্যে ও শিক্ষায় একাডেমীর ছাত্ররা শিখলেন—'নিজের জন্য কিছুই চাই না।' নাম না, যশ না, নেতৃত্ব নয়, যে যুগ ছিল অস্থি বিসর্জনের বা আত্মসমর্পণের যুগ। অধ্যাপক শশীভূষণের কাছে শেখা—"নিজেকে মুছে ফেলবার শিক্ষা।"[১৪] ১৯১৬ সালে পুলিশের দলিলের মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্রদের নামের দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। এদের শাস্তিদানের নির্দেশ দেওয়া হয় টেগার্ট সাহেবের পত্রের মাধ্যমে। এই তালিকাভুক্ত শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে শরৎ চন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্রনাথ শেঠ ও অমূল্যচরণ উকিল ছিলেন প্রধান। কলকাতার জাতীয় কলেজের অধ্যাপক শরৎচন্দ্র ঘোষ একাডেমীতে এসেছিলেন ১৯১৩ সালে, গণিতের অধ্যাপকরূপে। এঁর কর্মতৎপবতায় বিচলিত ছিলেন টেগার্ট সাহেব; তাই জানতে চেয়েছেন খুলনার পুলিশ সুপারের কাছে-"Do you know Sarat Babu ?"[১৫] শরৎবাবু যখন একাডেমীতে এসেছিলেন তখন যতীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র কবে একাডেমীর রাজনৈতিক তৎপরতা গোপনে এগিয়ে চলেছে। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর প্রাণের সম্পর্ক স্থাপিত হলে তিনি সেবাব্রতে উদ্বুদ্ধ করলেন ছাত্রদের। আশুতোষ রায়চৌধুরী (১৯১২-১৪ সালে দৌলতপুর একাডেমীর ছাত্র) ১৯১৬ সালে কলকাতায় ধরা পড়েন। তাঁর বিবৃতি অনুযায়ী শরৎচন্দ্র ঘোষের আকর্ষণে ছাত্ররা দলে দলে ব্রাহ্মণ বেড়িয়ার বন্যাত্রাণের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথের মত তাঁরও আহ্বান ছিল-"এস তরুণ, এস জননীর নির্ভীক সৈন্যদল, লগ্ন আসন্ন। স্থির লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।" টেগার্টের নেতৃত্বে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হযেছিল ১৯১৭ সালে। প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী ছিলেন তিনি।

গণিতের অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ শেঠ ১৯১৩ সালে একাডেমীতে যোগদান করেন। তিনি ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে যুগান্তর দলের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। এই মণীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভবতোষ দত্ত লিখেছেন-বড় দালানের হোষ্টেলে একটি ঘরে থাকতেন এক রহস্যময় ব্যক্তি যাকে সবাই ডাকতেন মণিদা বলে। নাম মণি শেঠ। ছিলেন গুপ্ত সমিতির একজন বড় কর্ণধার।[১৭] জন্ম তাঁর রংপুরে। মেধাবী ছাত্র মণি, পুলিশের গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে কর্মচ্যুত ও ধৃত হন ১৯১৭ সালে। জেলের দুর্বিষহ জীবন ও অপমান-অত্যাচারের ফলে অনেকেই পাগল হয়ে যান। তাঁদের অবস্থান ছিল প্রেসিডেন্সী জেলে। আদর্শ ছাত্র, অথবা শিক্ষকেব অকাল মৃত্যুতে তখন শোক প্রকাশের উপায় ছিল না আত্মীয়-স্বজন, অথবা ছাত্রদের। হিন্দু একাডেমীর নিবেদিত প্রাণ যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী অনেকেরই দিন শেষ হয়ে যায় অসময়ে। ডা: অমূল্যবরণ উকিল ১৯১৪ সালে প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপকরূপে একাডেমীতে যোগদান করেন। ছাত্র-শিক্ষকদের

চিকিৎসার দায়িত্বও তাঁকে নিতে হয়েছিল। বিপ্লব তখন আসন্ন, প্রস্তুতিপর্ব চলছে জোরকদমে, "যতীনদার" নির্দেশে তাঁর অনুগামীরা লাঠিখেলা, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোঁড়ার অভ্যাস করতেন। ডাক্তার উকিল ছাত্রদের প্যারেড করাতেন, ঘোড়া চড়া শেখাতেন-ঘোড়া 'যতীনদারই' দেওয়া।[১৮] ডাক্তারও ধরা পড়লেন আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে ডাকাতি মামলাব সূত্রে। গ্রেপ্তারের পর প্রচণ্ডভাবে নিগৃহীত হন এবং পরবর্তীকালে দেশ ছাডতেও বাধ্য হয়েছিলেন।[১৯]

যতীন্দ্রনাথ সমগ্র কলকাতাও মফঃস্বলে গড়ে তোলেন অজস্র ছোট বড় কেন্দ্র; বিভিন্নস্থানে ছিল তাঁর আড্ডা। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে সেসব জায়গায় তাঁর যাতায়াত ছিল নিয়মিত।[২০] এই রকমই একটি আড্ডাস্থল ছিল দৌলতপুর একাডেমী। সেখানে তাঁর বিশেষ আপনজন শশীভূষণ অপেক্ষা করছিলেন সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ যুবক গোষ্ঠীদের নিয়ে। যতীন্দ্রনাথ দৌলতপুরে শশীভূষণের বাসায় অবস্থান করতেন, তখন তাঁর বাণী ছিল-"এখন আর একে একে নয়, আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে যুদ্ধ করে মরে দেশকে জাগাবো।"[২১] তাঁর এই বাণী গোপনে গোপনে ছড়িয়ে দিয়েছেন একাডেমীর ছাত্র-শিক্ষকেরা। ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক হীরালাল ঘোষ, ছাত্র ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত জেলার বিভিন্ন স্থানের বিদ্যালয় ঘুরে ঘুরে দল গঠন করতেন। পরবর্তীকালে ভূপেন্দ্র কুমার লিখেছেন, "যতীনদার কথায় মন থাকতো ভরপুর। দেশের জন্য আত্ম বিসর্জনের প্রস্তুতি চলতো অজান্তে।"[২২] "আমরা মরবো, জাতি জাগবে"-যতীনদার এই নিঃস্বার্থ ত্যাগের আদর্শে ব্রতী হতে এগিয়ে এসেছিলেন একাডেমীর তরুণ ছাত্রেরা। ইংরেজ বিতাড়ন প্রয়াসে আত্মবলিদানের প্রস্তুতি একাডেমীতেই শুরু। ধৃত ছাত্রদের বিবৃতি থেকে জানা সতীশ চক্রবর্তীর সহযোগীরূপে বহরমপুরের বহু ছাত্র দৌলতপুর কলেজে এসেছিলেন, যাদের মধ্যে অন্যতম নরেন মিত্র। তিনি পাবনা ও উত্তরবঙ্গের ছাত্রদের সাথে যোগযোগ রক্ষা করে চলতেন। সিডিশন কমিটির বিবরণ অনুযায়ী 'মাউসার পিস্তল' অপহৃত হওয়ার পর বিভিন্ন দলের মধ্যে এগুলি বিতরিত হয়েছিল। সতীশ চক্রবর্তীর দল, মাদারিপুর। ময়মনসিং এবং উত্তরবঙ্গের দলও বেশ কিছু এই অস্ত্র নিজেদের তত্ত্বাবধানে রেখেছিল। বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐ অস্ত্র বিনিময়ও হতো।[২৩] সতীশ চক্রবর্তী এই পিস্তল দেওয়া নেওয়ার জন্য নরেন মিত্রকে বিভিন্নস্থানে প্রেরণ করতেন। অনেক সময় সহযোগী হতেন শরৎ চন্দ্র ঘোষ। ১৯১৩-১৫ পর্যন্ত সতীশ চক্রবর্তীর নিয়মিত দৌলতপুরে আসা যাওয়া ছিল। টেগার্টের মতে Daulatpur college is a favourite hunt of Satish Chakraborty, ..(letter of Tegart to S.P. Khulna, ১৯১৬). কিন্তু ১৯১৬ সালে টেগার্ট যখন সতীশ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ পাঠিয়েছেন তখন তিনি সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পলাতক জীবন যাপন করছেন।

ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ গ্রহণ কবতে চেয়েছিল জার্মানরা। তাই অস্ত্র দিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়।[২৪] বার্লিন থেকে নির্ধারণ করা হয়েছিল উড়িষ্যার উপকূলে বালেশ্বরে জার্মান জাহাজ এসে থামবে ও অস্ত্র সরবরাহ করবে। যতীন্দ্রনাথ উড়িষ্যার কাপতিপাদায় অপেক্ষমান। সেই সময় বিদেশী সরকারের সৈন্য ও প্রহরীদের যাতায়াত বন্ধ করার জন্য রেলপথগুলি উড়িয়ে দিতে হবে। বাংলা, মাদ্রাজ

রেলপথ অচল করবেন স্বয়ং যতীন্দ্রনাথেব পার্শ্বচবেবা, বি.এন.আব রেলপথেব দাযিত্বে রইলেন ভোলানাথ চাটুজ্যে, সতীশ চক্রবর্তী উড়িয়ে দেবেন অজয়পুল ও Eastern Indian Roadway."[২৫]

যতীন্দ্রনাথেব বিকেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসাবে প্রতিটি কেন্দ্র ও আড্ডাকুলি ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ।[২৬] আড্ডার নেতাদেব সঙ্গে যোগযোগ থাকতো যতীন্দ্রনাথেব। তাই বিপ্লবী কর্মীরা অনুমান করতে পাবতেন না যে তাদের পুবোধা স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ। টেগার্টেব নির্দেশ, চিঠি ও খুলনা পুলিশসুপারের গোপন বিপোর্ট ও ধৃত ছাত্রদের বিবৃতির মাধ্যমে যে চিত্র পরিস্ফুট তাব মধ্যে একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্র মতীশ চক্রবর্তীকে ফিরে ফিবে আসতে দেখা যায়। আসন্ন বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য দৌলতপুবকে কেন্দ্র করে তিনি সারা বাংলার সাথে যোগ স্থাপন করেছিলেন।[২৭] টেগার্ট সাহেব কোন অবস্থাতেই আব একাডেমীকে 'disturbed place' হতে দিতে চান না। তাই জানালেন- "Very careful enquiry is necessary, of you need...money, you will get."[২৮] তল্লাশীর নামে একাডেমীতে তাণ্ডব নৃত্য চলে পুলিশের। খাজুবা বাগান ছাত্রাবাস সহ অন্যান্য ছাত্রাবাসও তছনছ করা হয়। ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্রের বাড়ীও বেহাই পায নি। সেই পর্বে ছাত্রদের দীর্ঘ সময় ধবে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছিল, তাদেব বিবৃতি অনুযায়ী খাজুরা বাগান নামক ছাত্রাবাসটি 'Hub of the sedition' (আশুতোষ বায় চৌধুবীব বিবৃতি)।[২৯] ভূপেন্দ্র কুমাব দত্ত ও তাঁর সহযোগীরা (অর্থাৎ সুবেন কুসারী-আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে ডাকাতির সময় নিহত, মনোবঞ্জন রায় চৌধুরী, বিজয ঘোষ, মন্মথ ঘোয, বাক ঘোষ প্রভৃতিরা) এই ছাত্রাবাসে থাকতেন। এই পর্বে ভূপেন্দ্র কুমার ছিলেন ছাত্রনেতা; তৎকালীন ছাত্র ধীবেন্দ্রনাথ দত্ত (কলকাতায ধৃত) পুলিশকে জানিয়েছিলেন যে ছাত্র মহলে ভূপেন্দ্র কুমার দত্তের জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। তাঁরই নেতৃত্বে একাডেমীর ছাত্রেবা গড়ে তোলেন একাডেমীব যুগান্তর দলটি। ১৯১৩ সালে যতীন্দ্রনাথের প্রিয শিষ্য শৈলেন ঘোষ আমেরিকা যাত্রাব পূর্বে দৌলতপুরে ভুপেন্দ্র কুমারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ১৯১৭-৪৬ সাল পর্যন্ত বার্মা সহ ভারতের বিভিন্ন জেলে তাঁর দিন কেটেছে। তাঁর আদর্শ ও নিষ্ঠা একটি কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল।[৩০]

দৌলতপুরে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে একটা পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভূপেন্দ্র কুমাব লিখেছেন, দৌলতপুবের জীবনে নিজেদেব সংঘের ভিতবে তিনি একটি পারিবারিক জীবন খুঁজে পেয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সাধনার সাথে মানুষের প্রতি ও সহকর্মীদের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক রাখতে উৎসাহ দিতেন।[৩১] কেবলমাত্র রাজ নৈতিক আন্দোলন নয়, সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধেও তাঁরা সক্রিয় অভিযান করেছেন। জাতিভেদ প্রথা, স্পৃশ্যতা ও অস্পৃশ্যতা তখন রীতিমত কঠোরভাবে মানা হতো, এর বিরুদ্ধে একাডেমীতে তাঁরা সক্রিয় অভিযান শুরু করেন। তাঁদের এ কার্যে উৎসাহদাতা ছিলেন অধ্যাপক যুগল আঢ্য।[৩২] একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্র ভূপেন্দ্র কুমারের 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' গ্রন্থে দৌলতপুরের জীবনের কথা বহুবার বহুভাবে ধরা পড়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, পুলিশের গোপন রিপোর্টে একাডেমীর ছাত্র-শিক্ষকদের যে দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায় তাতে কোন মুসলমান অথবা নিম্নবর্ণের হিন্দুর নাম নেই।[৩৩] এ প্রশ্নের

উত্তর তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই নির্হিত। ১৯০৭ সালে একাডেমীর দ্বার সকল সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত হলেও ১৯০৯ সালে মাত্র দুজন মুসলমান ছাত্র ভর্তি হয়েছিলেন এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুষ্টিমেয় ছাত্র এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানে পাঠরত জেলাস্থ যোগী, কৈবর্ত, নমশূদ্র প্রভৃতি নিম্নবর্ণের ছাত্ররা একমাত্র ডিগ্রীলাভের উদ্দেশ্যেই নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতো-ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে তাঁরা নিজেদেরকে সামিল করে নি।[৩৪]

দৌলতপুর নামক একাডেমী মন্দিরে সেই যুগের বহু সৈনিকের প্রস্তুতি পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই সময়কার ছাত্র-শিক্ষকদের অবদান ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতি একাডেমীদেও নেই।[৩৫] প্রকৃতপক্ষে, এত সংগোপনে এদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো যে তৎকালে জেলার মানুষের নিকট এদের এই সুবিস্তৃত কর্মকাণ্ডের কোন হদিশও জানা ছিল না। বিপ্লবীদের আত্মসমর্পণের মন্ত্রগুপ্তি এরূপই ছিল যে, নিজ নিজ পিতামাতাও তাদের সন্তান সন্ততিদের ঐ সকল কর্মকাণ্ডের বিন্দুমাত্রও জানতে পাবতেন না।[৩৬] স্বভাবতই ঐ সকল দেশপ্রেমীদের আত্মত্যাগের কাহিনী বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিয়োজিত হয়ে গেছে।

সূত্রনির্দেশ

১। ভবতোষ দত্ত, আট দশক, কলকাতা ১৯৮১ পৃ: ১২-১৩ সতী দত্ত, 'নাথ পরিবর্তনের আবর্তে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী', ইতিহাস অনুসন্ধান (১১), কলকাতা ১৯৯৬ পৃ: ৬২১-৬২২

২। নিশীথ রঞ্জন রায়, 'সশস্ত্র প্রতিরোধের উৎসভূমি', পশ্চিমবঙ্গ নেতাজী সংখ্যা, কলকাতা ১৪০৩, পৃ: ৮৪-৮৫

৩। I.B. File No. 1929/16

৪। Sedition Committee Report 1918. Calcutta 1918 p.p. 70, 104.

৫। ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, কলকাতা ১৯৮৩, পৃ: ৭-৮

৬। ঐ পৃ. ৬, ৮, ৮১

৭। হিন্দু একাডেমীতে সংরক্ষিত ট্রাষ্ট ডিড

৮। I.B. File No. 1929/16

৯। Sedition Committee Report 1918, Calcutta 1918 p-40

১০। Arun Chandra Guha, First Spark of Revolution, Delhi 1971, p.p. 199-201

১১। I.B. File No. 1929/16 (Letter of Tegart to SP of Khulna)

১২। -Do-

১৩। -Do-

১৪। ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' কলকাতা ১৯৫৩, পৃ: ২৯৩

১৫। I.B. File No. 1929/16 (Letter of Tegart to S.P., Khulna)

১৬। -Do-

১৭। ভবতোষ দত্ত, 'আটদশক', কলকাতা ১৯৮৮ পৃ: ১৪
১৮। I.B. File No 1929/16
১৯। ভবতোষ দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪
২০। যাদু গোপাল মুখোপাধ্যায়ের * উদ্ধৃত ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৬
২১। ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০০
২২। ঐ
২৩। Sedition Committee Report 1918, Calcutta 1918 p-103
২৪। -Do- p-121
২৫। -Do- p-122
২৬। যাদু গোপাল মুখোপাধ্যায়েব * উদ্ধৃত ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, প্রাগুক্তপৃ: ১১৬
২১। ভূপেন্দ্র কুমাব দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০০
২২। ঐ
২৩। Sedition Committee Report 1918, Calcutta 1918 p-103
২৪। -Do- p-121
২৫। -Do- p-122
২৬। যাদু গোপাল মুখোপাধ্যায়ের *৯-৮ ১৯৪৮, উদ্ধৃত ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস, কলকাতা ১৩৯০ পৃ: ১১৬
২৭। I.B. File No 1929/16
২৮। -Do- (Letter of Tegart to S.P., Khulna)
২৯। I.B File No. 1929/16
৩০। একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্র সমর বসু মহাশয় পণ্ডিচেরী থেকে নিবন্ধ লেখিকাকে ২০-৫-১৯৯৫ তারিখে পত্রদ্বারা জানিয়েছেন)
৩১। ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯২
৩২। ঐ পৃ: ১৭৮-১৭৯
৩৩। I.B. File No. 1929/16
৩৪। -Do-
৩৫। উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নিবন্ধ (লেখিকাকে ১৭-৬-১৯৯৫ সালে করানো হয়েছে যে, ১৯০৫-৪৭ পর্যন্ত অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে উক্তপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের ভূমিকা সম্পর্কে কলেজের নথিপত্রে কোনও উল্লেখ নেই।
৩৬। বিপ্লবী সুধীরদের সহিত সাক্ষাৎকার, ১৯৬১ সালের ২২-২৪ শে জানুয়ারী, কলকাতা।

বাংলায় লবণ তৈরি ও স্বাধীনতা সংগ্রামে লবণ সত্যাগ্রহ

পুষ্পরঞ্জন সরকার

সাধারণতঃ সমস্ত পরাধীন অধিবাসীদের উপরে সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর অর্থনৈতিক শোষণ এবং একচেটিয়া ব্যবসায়িক প্রবৃত্তি বা বাণিজ্য রীতির প্রভাব দেখা যায়। দেশের উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদনের উপকরণগুলিকে এভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশের বণিক গোষ্ঠী কাজে লাগায়। বিদেশী ইংরেজ বণিকরা এজন্য ভারতে বস্ত্র শিল্পকে হাতিয়ার করে শোষণ শুরু করে। এর পরে তাদের লবণের ওপর দৃষ্টি পড়ে। ভারতে লবণ উৎপাদন সহজলভ্য। ভারতে তিন দিকে বিস্তৃত সমুদ্র সংলগ্ন উপকূল থাকায় লবণাক্ত জল থেকে সহজেই লবণ তৈরি হতে পারে। খাদ্য বস্তু তৈরি করতে লবণের প্রয়োজন সর্বাধিক। বেনিয়া বৃত্তি সম্পন্ন ইংরেজ বণিকরা সহজে প্রচুর লবণ উৎপাদনের সুযোগকে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে কাজে লাগাল।

এজেন্সি প্রথার মাধ্যমে ভারতের উপকূল অঞ্চলের লবণ উৎপাদনের সুযোগগুলিকে নিজেদের একচেটিয়া অধিকারে পরিণত করল। আইন করে অন্যদের লবণ উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করল। আবার এক সময় এই লাভের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য ভারতে লবণ উৎপাদন কমিয়ে নিজেদের দেশ থেকে পরিশোধিত লবণ আমদানী করা শুরু করল। উদাহরণ স্বরূপ লিভারপুল ব্রাণ্ড লবণের কথা বলা যেতে পারে। এই লবণ অবশ্যই ভারতবাসীকে চড়াদামে কিনতে হত। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।

তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে প্রাচীন যুগ বা মধ্যযুগেও ভারতে লবণ তৈরির একচেটিয়া অধিকার স্থানীয় শাসকরা নিজেদের হাতে রাখত। অনেক সময় তাঁরা প্রজা বিশেষকে নিষ্কর জমিদানের সঙ্গে তাকে লবণ তৈরির বিশেষ অধিকার দিতেন।

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে মলুঙ্গী নামে পরিচিত এক গোষ্ঠী বংশ পরম্পরায় লবণ তৈরি করত। বাংলার লবণ সমুদ্রজল শুকিয়ে তৈরি হত না। লবণ জল জ্বালানীর দ্বারা শুকিয়ে এই লবণ তৈরি হত। এই কাজ ছিল খবুই পরিশ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল। উপকূলতটের লবণ তৈরির কেন্দ্রগুলির নাম ছিল 'চার'। এই জমি চড়া দামে ভাড়া নেওয়া হত। লবণ তৈরির মরশুমে সংলগ্ন জঙ্গল-আগাছা পরিস্কারের জন্য মজুর ভাড়া নেওয়া হত। মজুর পাওয়া সহজলভ্য ছিল না। তাদের অগ্রিম অর্থ দেওয়া হত অনেকক্ষেত্রে। জোয়ারের হাত থেকে রক্ষার জন্য এ সকল জমির জন্য রক্ষণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। জ্বালানী যন্ত্রপাতি, নোনা জল জ্বাল দেওয়ার পাত্র রাখার ব্যবস্থা ছিল। তৈরি লবণ রাখা হত লবণ গোলায়। মজুরদের

জন্য অস্থায়ী বাসস্থান তৈরি করা হত।

সাধারণ মানুষেরা এভাবে লবণ তৈরি করতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারত না। মোটামুটি অর্থশালী ব্যবসায়ীরা পুঁজি বিনিয়োগ করতেন। মোগল আমল থেকেই লবণ ব্যবসায়ীরা 'দাদন' প্রথার মাধ্যমে মজুরদের দিয়ে এভাবে লবণ তৈরি করতেন। নির্দিষ্ট টাকার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পবিমাণ লবণ প্রস্তুত করে বিভিন্ন স্থানে পাঠান হত। মজুররাও এভাবে নির্দিষ্ট টাকার ভিত্তিতে লবণ তৈরি করতে বাধ্য থাকত। লবণ ব্যবসায়ী মুঙ্গলী ও অন্যান্যরা যথাক্রমে ২১/২% ও ৫% হাবে মোগল সরকারকে লবণ কর দিতেন।

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পরে লবণ ব্যবসায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কর্মচারী এভাবে লবণ উৎপাদন ও বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। সোসাইটি ব্যবসায়ীদের লবণ রপ্তানীব দায়িত্ব দিতেন। ব্যবসায়ীরা লবণ প্রস্তুতকারীদের দায়িত্বও বন্টন করে দিতেন। এভাবে বাংলার উপকূল অঞ্চল যথা মেদিনীপুরের তমলুক, ও হিজলী এবং চট্টগ্রামের এক বিস্তৃর্ণ অঞ্চল লবণ তৈরির এক আদর্শ স্থানে পরিণত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসই লবণ বাণিজ্যকে কোম্পানীর এক চেটিং। ব্যবসায়ে পরিণত করেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর কর্মচারীদের আওতায় কিছুটা অবিন্যস্তভাবেই লবণ বাণিজ্য চলত। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস এজেন্সি প্রথা চালু করেন। সরকার প্রত্যক্ষভাবে লবণ প্রস্তুতকারীদের 'দাদন' দিতেন।

মজুররা 'দাদন' পাওয়ার পরেই লবণ তৈরির কাজ শুরু করতেন। মোটামুটি ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু করে মে-জুন (বর্ষার শুরু) পর্যন্ত লবণ তৈরির কাজ চলত।

কতজন মজুর নিযুক্ত হবে তার ওপর নির্ভর করে 'দাদন' দেওয়ার পরিমাণ নির্ধারিত হত তমলুকে। অপরদিকে লবণ তৈরির পরিমাণ নির্ধারণ করে হিজলীর মজুরদের 'দাদন' দেওয়া হত। 'দাদন' দেওয়ার সময় ছিল-প্রথম দফা-নভেম্বর-ডিসেম্বর, দ্বিতীয় দফা-জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি; তৃতীয় দফা-এপ্রিল।

লবণ প্রস্তুতকারীদের লবণ তৈরি করতে অনেক অসুবিধায় পড়তে হত। এই বৃত্তিতে তাদের অনেক ঝুঁকি ছিল। প্রবল বৃষ্টি ও সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা লবণ তৈরি করতে বিরাট ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। সময়ের অপচয় হত; পরিশ্রম নষ্ট হত। এছাড়া কুয়াশা, মেঘাচ্ছন্ন ও দুর্যোগমুখর আবহাওয়া ছিল অন্যান্য বাধা। শ্রমিকেরা ভোর থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এক নাগাড়ে কাজ করত। অবশ্য এরপরে তাদের আর পাওয়া যেত না। মরসুমের শেষে তারা একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। উৎপাদনকালীন অবস্থায় মালিকরা অবশ্য-তাদের চারবেলা খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতেন। মরসুম শেষে যে সামান্য অর্থ নিয়ে তারা বাড়ী ফিরত, তাতে কয়েকদিনই গ্রাসাচ্ছাদন চলত।

লবণ তৈরির মালিক ও শ্রমিকরা সাধারণভাবে স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন না। চট্টগ্রামে তারা দূরবর্তী ভুলুয়া ও টিপেরা অঞ্চল থেকে আসত। প্রথম লবণ কন্ট্রোলার হেনরি ভিন্সিস্টার্চ বিবরণ দিয়েছেন, 'মলুঙ্গীদের বিভিন্ন জেলা থেকে আনা হত। নিজেদের পরিবার ও বাড়ীঘর থেকে বহুদূরে তাদের পাঠান হত। জঙ্গল ও ব্যাঘ্রসঙ্কুল এমন নির্জন জায়গায় তাদের পাঠান

হত যেখানে লবণ ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যেতন না।" কোম্পানীর খ্যাতনামা রাজস্ববিদ্ হোল্ট ম্যাকেঞ্জি লেখেন, "সুন্দরবনের লবণ প্রস্তুতকারীরা বন্য পশু ও জঙ্গলের কাঠুরিয়া ছাড়া অন্যকারো সাহচর্য পেত না।" জর্জ টাকার হাউস অব সিলেক্ট কমিটিতে জানান যে আবহাওয়া, ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক দিক থেকে মলুঙ্গীদের অবস্থা ছিল দুঃসহ।[১]

পরিশ্রম, ভয়াল অবস্থা ও প্রচন্ড নিসঙ্গতার তুলনায় তাদের বেতন ছিল নাম মাত্র, লবণ এজেন্সির সব লবণ তৈরির কেন্দ্রগুলিতে লবণ তৈরির খরচ সমান ছিল না। তমলুক ও মহিষাদল এজেন্সির আউরাঙ্গ-এ লবণ পরিস্কার করা ও লবণ তৈরির জমি পাওয়ার যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। জেলামুখা, ঔরঙ্গানগর, গুমঘর প্রভৃতি স্থানে এই অসুবিধা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। লবণ তৈরি বেশীর ভাগস্থান ছিল সমুদ্রের নিকটবর্তী খালগুলির ধারে। তমলুক ও হিজলির মজুররা সবচেয়ে কম মজুরীতে লবণ তৈরি করত। চট্টগ্রামের অবস্থা ছিল অন্য রকম। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া যেত না। ফলে লবণ শ্রমিকদের বেশী মজুরী দিতে হত।[২] এই অঞ্চলে মঙ্গলঘাট ছিল লবণ তৈরির আর একটি কেন্দ্র। স্থানটি সমুদ্র থেকে বহুদূরে অবস্থিত হওয়ায় লবণ তৈরির খরচ এখানে অনেক বেশী পড়ত। তমলুক এজেন্সির জ্বালানী কিনতে হত না। বালিয়াড়ীর জঙ্গলের কাঠ জ্বালানী হিসাবে পাওয়া যেত। চট্টগ্রামে লবণ তৈরির নিকটবর্তী স্থানে জঙ্গল না থাকায় তাদের জ্বালানী খরচ বেশী পড়ত।

লবণ শিল্প অনুসন্ধানের কমিশনার জিৎ প্লাউডেন ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে লবণ তৈরির মরশুমে লবণের কাজ বা 'চুলা'র খবচের হিসাব দেন :

	টাকা
একজন 'পাকী'র (লবণ কর্মীর) বেতন	১৮
দ্বিতীয় 'পাকী'র (লবণ কর্মীর) বেতন	১৮
৭ জল 'গাব্বু'র (সাধারণ কর্মীর) দৈনিক ১০টাকা হিসাবে বেতন	৭০
৭০০০ লবণ রাখার পাত্রের মূল্য	
(প্রতি হাজার ৪ টাকা হিসাবে)	২৮
৯ জনের খাই খরচ	৩৫
লবণ তৈরির থাকার কুঁড়েঘর ও জিনিষপত্র	৮
যাতায়াতের খরচ (বাড়ী থেকে লবণ তৈরির জায়গা)	৪
সারা মরসুমে জ্বালানীর খরচ	১২০
মোট খরচ	২৯৭৩
প্রতিদিন গড় পড়তা লবণ উৎপাদন	১০ মণ
সারা মরসুমে লবণ উৎপাদন	৯০০ মণ
মোট খরচ	২৯৭

প্রতিদিন গড়পড়তা লবণ উৎপাদন - ১০ মণ

সারা মরশুমে লবণ উৎপাদন - ৯০০ মণ

লবণ উৎপাদনকারীদের সাধারণভাবে প্রতি ১০০ মণ লবণে উৎপাদন ব্যয় পড়ত ৩৩ টাকা

প্রতি ১০০ মণ লবণে উৎপাদনকারীদের দেওয়া হত - ৪৩ টাকা ১২ আনা।

এই হিসাবের মধ্যে উচ্চ কর্মচারী, ওভারসিয়র, গোমস্তা, পিয়ন ও উৎকোচ দেওয়ার খরচ ধরা হয় নি। মোটের ওপর তাদের জন্য খরচ পড়ত প্রায় ২৫ টাকা।[৫]

বিনিয়োগকারীদের লবণের ওজনের সঙ্গে অতিরিক্ত ওজন বা 'শির্ফ' দেওয়া হত। এই 'শির্ফ' ওজন লবণের ৫০% ছিল। যেহেতু মজুররা খুব অল্প বেতন পেত, অনেক সময়েই তারা চোরাপথে লবণ পাচার করতেন। অবশ্য এজেন্সিগুলি কিছু রক্ষণাত্মক ব্যবস্থা নিতেন। 'চাব' থেকে 'পাশ' ('রাওনা') ছাড়া লবণ নেওয়া যেত না এবং এতে মালিকের 'স্বাক্ষর' থাকত।

নৌকায় জলপথে অথবা গরুর গাড়ীতে স্থলপথে লবণ পাঠান হত। টেকনাপ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম চিল্কা পর্যন্ত অঞ্চলগুলিতে চোরাই লবণ পাচার ও বেআইনী লবণ উৎপাদনের বিরুদ্ধে নজর রাখা হত।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী লাভের আগের এক হিসাবে দেখা যায়-

লবণ উৎপাদনকারীরা প্রতি ১০০ মণ লবণে পেত ৪০ টাকা আর হোলসেল বিক্রয় মূল্য ছিল প্রতি ১০০ মণ লবণে ১০০ টাকা।

সোসাইটি অব ট্রেডের একমাত্র এজেন্ট ডা: উইলিয়ম শ্যাম্পলসের হাউস অব কমন্স কমিটিতে (১৭৭৩) দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় :

লবণ বিক্রয়ের দর ছিল :

রাজবাড়ীতে

১৭৬৬ খ্রি: প্রতি ১০০ মণ	২৫০ টাকা
১৭৬৭ খ্রি: প্রতি ১০০ মণ	৩০০-৩২৫ টাকা

কলিকাতায়

১৭৬৬ খ্রি: প্রতি ১০০ মণ	২৩০-২৮০ টাকা
১৭৬৮ খ্রি: প্রতি ১০০ মণ	৩০৫ টাকা

বেঙ্গল সল্ট-এর পাইকারী দর ছিল :

১৭৯৩	প্রতি ১০০ মণ	২৯৭ টাকা
১৮০৩	প্রতি ১০০ মণ	৩৮১ টাকা
১৮১৩	প্রতি ১০০ মণ	৩২১ টাকা
১৮২৩	প্রতি ১০০ মণ	৩৮৫ টাকা
১৮৩৩	প্রতি ১০০ মণ	৩৭০ টাকা

অনেক সময়েই দেখা যায় যে কোম্পানীর কর্মচারীরা (যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে লবণ ব্যবসা করতেন) লবণ ব্যবসায়ে কোম্পানীর নিজস্ব আয় থেকেও অনেক বেশী লাভ করতেন।

বলপূর্বক লবণ উৎপাদনের খরচ কম রাখার জন্য উৎপাদনকারীরা নিজেদের সর্বনাশকেই ডেকে আনেন। কৃপারাম মুখার্জী নামে কন্ট্রোলিং অব রেভিনিউ কমিটির কোন একজন ফয়লারের এজেন্ট লবণ মজুরদের কম মজুরীতে লবণ উৎপাদন করতে বাধ্য করতেন। হুইলার কোম্পানীর লবণ মজুররা কলিকাতায় অভিযোগ করতে এলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাদের উৎপাদন স্থানে ফেরত পাঠান হয়েছিল। তাদেব থেকে অনেকে জঙ্গলে পালিযে যায় কয়েকজন বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারায়।

এজেন্সি প্রথায় সরকারের দায়বদ্ধতা ছিল। উৎপাদন ও লবণ মার্কেটিং-এর তারা বিশেষ নজর দিতেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশের রেগুলেশন আইন লবণ উৎপাদনকাবীদের কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিল। কিছু নিরাপত্তা দিয়েছিল। তবুও অনেক লবণ উৎপাদনকারীরা মনে করতেন যে, যেভাবে কম পারিশ্রমিকে (সরকারী নিয়মে) তারা লবণ তৈরি করতেন তা যেন কোম্পানীর সরকারকে আলাদা করে কব দেওয়ার শামিল।

ইংরেজদের একচেটিয়া বাণিজ্য নীতি, ভারতীয় ব্যবসায়ী ও লবণ উৎপাদনকারীদের পিছু সরে যাওয়া সর্বোপরি মলুঙ্গীদের করুণ দুরবস্থার মধ্যে কোম্পানির আমল থেকে বাংলার লবণ তৈরির চিত্র পাওয়া যায়। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে ইংবেজ বণিকরা লবণের একচেটিয়া বাণিজ্য করে অর্থশালী হয়ে ওঠেন।

২

তিরিশের দশকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে লবণ আইন ভঙ্গ করাই আইন অমান্য আন্দোলনেব মূল সূত্র হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাংলাতে মেদিনীপুরের তমলুক, কাঁথি বা চট্টগ্রাম অতিক্রম করে কয়েকটি বে-আইনী লবণ তৈরি করার উল্লেখযোগ্য অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। চব্বিশ পরগশরা মহিষবাথান, কালিকাপুব ও ডায়মণ্ডহারবারে নিকটবর্তী নীল* অঞ্চল ব্রিটিশের লবণ আইনের বিরোধিতা করে এসব অঞ্চল উত্তাল হয়ে ওঠে। এই অঞ্চলগুলিতে হ্রদ, খালের নোনা জল ইত্যাদি থাকায় লবণ তৈরি সুযোগ ছিল।

লবণ উপকরণকে কেন্দ্র করে এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীবা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। এই সমস্ত স্থানে পূর্বোক্ত লবণ তৈরির পরিচিতির সঙ্গে নতুন ভাবধারায় বেআইনী লবণ তৈরির পরিচিতিও পাওয়া যায়। এই বেআইনী লবণ তৈরিও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেব এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। তমলুক, কাঁথি, চট্টগ্রাম ভরে উঠেছিল স্বাদেশিকতায়, স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়ারে, গান্ধীজীর আহ্বানে। ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের নিষ্পেষণের প্রতিবাদে এই সমস্ত স্থানের লবণ সত্যাগ্রহ ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ বণিক স্বার্থের নগ্ন রূপগুলি তুলে ধরেছিল। লবণ সত্যাগ্রহ ছিল ব্রিটিশ আইন ভঙ্গের এক অস্ত্র। এই অঞ্চলগুলি ছিল আবার ব্যবসায়িক লবণ তৈরির কেন্দ্র। এই দ্বিবিধ কারণেই এই অঞ্চলগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই অঞ্চলগুলি যদি লবণ তৈরির কেন্দ্র হত, তবে তিরিশের দশকে বাংলায় লবণ সত্যাগ্রহ দানা বেঁধে উঠত না। কলিকাতা বা অন্যান্য শহরাঞ্চলের সত্যাগ্রহীরা দলে দলে মেদিনীপুরের তমলুক, কাঁথিতে আসতেন না। আসতেন না কলিকাতার নিকটবর্তী মহিষবাথান গ্রামে।[১] এই সময়ে এই অঞ্চলগুলির লবণ সত্যাগ্রহ সারা বাংলা তথা সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছিল। আশা করা যায়, এরই মাঝে লবণ উৎপাদনের আদি কেন্দ্র গুলির কথাও সকলের স্মরণে আসবে। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তারা লবণ উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত মলুঙ্গীদের দারিদ্রের তাড়িত শ্রমজীবনের সঙ্গে পরিচিত হবেন। স্বাধীনতা আন্দোলনকে হাতিয়ার করে মলুঙ্গীদের স্মরণ ও লবণ তৈরিব প্রক্রিয়া জানাই একটা যেন নতুন প্রাপ্তি।

সূত্র নির্দেশ

১। এইচ আর ঘোষাল, ইকনমিক ট্রানজিসন ইন দ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৭৯৩-১৮৩৩, পাটনা, ১৯৫০, পৃ: ১১৩।

২। এ.এম. সিরাজউদ্দীন "দ্য কণ্ডিসন অফ দ্য সল্ট ম্যানুফাকচারার্স অফ দ্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী।" জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ। এপ্রিল ১৯৭৩, খণ্ড ১৮, নং ১, পৃ: ৬০।

৩। ঐ পৃ: ৬১

৪। জালালের সল্ট চৌকীব সুপারিণটেনডেন্টের চিঠি কন্ট্রোলার অফ গর্ভমেন্ট সল্ট চৌকীকে লেখা, ২৭মে ১৮৫৪।

৫। সিরাজদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪

৬। দ্য ফরওয়ার্ড, ৯ই এপ্রিল ১৯৩০ (সম্বাদ পত্র)

৭। দ্য মুসলমান এপ্রিল ১৯৩০।

বালুরঘাট মহকুমায় আগষ্ট আন্দোলন

কমলেশ চন্দ্র দাস

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ওর্যাকিং কমিটি ইংরেজ বিরোধী ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর ভাবতেব বিভিন্ন প্রান্তের জনগণ ইংরেজ বিবোধী ঐ আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সামিল হয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐ আন্দোলন স্বত:স্ফূর্তভাবে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগষ্ট আন্দোলনের গতি প্রকৃতি এবং কর্মধারায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন অঞ্চলে আন্দোলনকারীরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে হিংসার পথ গ্রহণ করে এবং আন্দোলনেব ব্যাপকতা ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দেয়। বাংলাদেশে আগস্ট আন্দোলন বিভিন্ন জেলায় সংগঠিত হলেও কলকাতার বাইরে মেদিনীপুর এবং উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট শহর গণবিক্ষোভে পরিণত নেয়। এই আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বভাবতই পরবর্তীকালে মেদিনীপুর জেলায় এই আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে এবং চলছে। মেদিনীপুর ছাড়াও বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাব বালুরঘাট শহরে এই আন্দোলনের গুরুত্ব ও ব্যাপকতা ছিল উল্লেখ করার মত। কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে নিম্নবর্গের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখ করার মত। কিন্তু বালুরঘাট শহরের এই আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে। সুতরাং এই শহরের আগস্ট আন্দোলনেব কতগুলি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার প্রয়াস এই প্রবন্ধে করা হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্সে বালুরঘাটের আগস্ট আন্দোলনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে নিশীথ রঞ্জন দাস ও কল্পনা যোশী সম্পাদিত "এ সাগা অফ ইন্ডিয়াস্ স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম" (১৯৮৪) গ্রন্থে ধীরেন দে সরকার বালুরঘাটের আগস্ট আন্দোলনের উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখক স্বয়ং আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু স্বল্প পরিসর এই প্রবন্ধে আন্দোলনের বিভিন্ন দিক এবং আন্দোলনকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়নি। 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গ' এই শিরোনামে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ যে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছে তার একটি প্রবন্ধে ড: আনন্দগোপাল ঘোষ উত্তরবঙ্গের জেলা গুলিতে অনুষ্ঠিত এই আন্দোলন সম্পর্কে

একটি তুলানামূলক ও বিশ্লেষণ ধর্মী প্রবন্ধের মাধ্যমে গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গীকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির আন্দোলনের উপর নিবদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনাগুলি ছাড়াও আগস্ট আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বালুরঘাট শহর থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ঐ আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনা এবং অভিজ্ঞতায় বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। পীযূষকান্তি দেব সম্পাদিত 'বালুরঘাট বার্তা' এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রধানত আগস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার বা স্মৃতি চাবণা তার পত্রিকায় প্রাধান্য পেয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে আগস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনাকে জনসম্মুখে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আলোচনাই আন্দোলনের ঘটনাবলীকে গুরুত্ব দিয়েছে। আন্দোলনকারী মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে।

বালুরঘাটের আগস্ট আন্দোলন সাধারণভাবে শহরকেন্দ্রিক হলেও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী জনগণ অধিকাংশই সামিল হয়েছিলেন। পার্শ্ববর্তী থানাগুলি থেকে স্বাধীনতার পর এই জেলায় কিছু অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত হযেছিল। সামগ্রিকভাবে বালুরঘাট মহকুমা তপন, পত্নীতলা, পোড়শা, আগ্রাদ্বিগুণ, মহাদেবপুর প্রভৃতি অঞ্চলের জনগণের অংশগ্রহণই এই আন্দোলনে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। হিলি কুমারগঞ্জ সহ তৎকালীন বালুরঘাট মহকুমার জনসংখ্যা ছিল ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুসারে ৫ লক্ষ ৮৪৩ হাজার ৪৮৪ জন। এই জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ অনুন্নত জাতি, উপজাতি ও মুসলমান সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত এদের মধ্যে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, মাহাতো, রাজবংশী প্রভৃতি গোষ্ঠীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র জনসংখ্যাব নিরিখে এই সম্প্রদায়গুলি শতকরা প্রায় ৩০% মত ছিল। এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং জীবন ধারা সম্পর্কে ও. মলের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় সে এদের জীবন যাপন ছিল অত্যন্ত সহজ সরল এবং শান্তিপ্রিয়। এই সময়ে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রীস্টান ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। ওঁরাও, মুন্ডা বা মাহাতোদের মধ্যে প্রচলিত হিন্দু বিশ্বাস এবং রীতিনীতির আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর বিশ্লেষণে দেখা যায় ওঁরাও, মাহাতো, মুসলমানেরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই অনুপাতে সাঁওতালদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে কম। কারণ আর্থিক দিক থেকে তাদেব কিছুটা সচ্ছলতা এবং এই সম্প্রদাযের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব, যদিও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন আন্দোলনের ইতিহাসে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। এই প্রসঙ্গে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গঙ্গারামপুর থানার খাজনা বন্ধ আন্দোলনে কাশীশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এই সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করা যায়।

আগস্ট আন্দোলন বালুরঘাটে শুরু হয় ১৯৪২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন সরোজ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বিশ্বরঞ্জন সেন, শৈলেন দাস, পুলিন বিহারী দাসগুপ্ত, জব্বার মিঞা, ইয়াকুব কাজী, নিরঞ্জন বিশ্বাস, নিত্য পাল, প্রফুল্ল কুমার দেব, আজিত দত্ত, দিব্যেন্দু বাগ্চী, ধীরু বর্মন,

রাধামোহন মহন্ত, রামনরেশ তেওয়ারী, চন্দ্রিকা পান্ডে, ফুলচাঁদ মণ্ডল, পীতাম্বর মণ্ডল, চাদিয়া মণ্ডল, শালিয়া ওঁরাও. গান্দু ওরাও, বীরেন দে সরকার, অসীম মিত্র প্রমুখ। ১৪ই সেপ্টেম্বর বালুরঘাট শহরে দক্ষিণে ভাঙ্গির ঘাট থেকে আন্দোলনকারীদের অভিযান শুরু হয়। আন্দোলনকারীরা বালুরঘাট শহরে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন সরকারী অফিস থেকে ব্রিটিশদের পতাকা নামিয়ে দিয়ে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করে। শহরের আদালত, অফিস, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, ট্রেজারি তছনছ করা হয়। বালুরঘাটে পার্শ্ববর্তী ধামুরহাট, পত্নীতলা, পোড়শা ও তপনের মানুষদের এই আন্দোলন দখল করতে গোরা সৈন্য ও গোর্খা বাহিনী নামানো হয়। আন্দোলনকারীরা বালুরঘাট থেকে সরে গিয়ে আত্রেয়ী নদী অতিক্রম করে পশ্চিমের দিকে সরে যায়। ইংরেজ প্রশাসন আগস্ট আন্দোলনকে দমন করে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দানের ব্যবস্থা করে। ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২, পারিলা গ্রামেব গোরা সৈন্যের দমন নীতি প্রতিরোধ করতে গিয়ে বর্মন ও ওরাও সম্প্রদায়ের ৪ জন নিহত হয়। বিশেষ আদালত বসিয়ে বিচারের নামে প্রহসন শুরু হয়। ৫০০র অধিক ব্যক্তি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন। এদের অনেকেরই দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দন্ডিত হন। কারাদন্ডের মেয়াদ ছিল ২ বছর থেকে ২৯ বছর সশ্রম কারাদন্ড।

চরিত্রগতভাবে আগস্ট আন্দোলন বালুরঘাটে সংগঠিত হয়েছিল প্রধানত নিম্নবর্গীয়দের দ্বারা। যদিও আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন শহরের কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবি ও ছাত্রগণ, আঞ্চলিক ভিত্তিতে বালুরঘাট মহকুমার সমস্ত অঞ্চলের মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হননি। প্রধানত আন্দোলনকারীরা ছিলেন বালুরঘাট শহরের মধ্যস্থিত আত্রেয়ী নদীর পশ্চিম দিকের তপন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে তপশিলী ভুক্ত জাতি ও উপজাতিদের প্রাধান্য ছিল। আর্থিক দিক থেকে এদের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। পেশাগতভাবে তারা অধিকাংশ ছিল কৃষক ও মজুর শ্রেণীভুক্ত। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এইসব অঞ্চলের মানুষেরা জোতদার, জমিদার বা মহাজনদের দ্বারা বিভিন্নভাবে শোষিত হয়। স্বভাবতই বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে এই সমস্ত মানুষের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। মানুষের এই ক্ষোভকে সুচারুভাবে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে যিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন বালুরঘাট মহকুমার আগস্ট আন্দোলনের প্রাণপুরুষ সরোজ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তপন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় অনগ্রসর সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মানুষের ভাষা এবং কৃষ্টির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ফলে সাধারণ শ্রেণীর মানুষদের আন্দোলনে সামিল করানো তার পক্ষে অনেক সহজ হয়।

বালুরঘাট শহরে পূর্ব দিকে অবস্থিত বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষেরা আগস্ট আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেনি বললেই চলে। এই মহকুমার হিলি থানার জনগণ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তারা ছিলেন উদাসীন। আগস্ট আন্দোলন থেকে এই অঞ্চলের মানুষদের দূরে থাকার অন্যতম কারণ হল এলাকার জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, চালকলের আধিক্য এবং জমির উর্বরতা। সেই সঙ্গে হিলি থানার কংগ্রেসী নেতৃবর্গ প্রত্যাশাভাবে

বালুরঘাটের আগস্ট আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে। সার্বিক ভাবে বালুরঘাট মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে আর্থ সামাজিক অবস্থা অংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এবং অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয। আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি এবং ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কৃষি মজুরদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখ করার মত। এরা আত্রেয়ী নদী অতিক্রম কবে বালুরঘাট শহরে প্রবেশ করে এবং ট্রেজারী, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, সরকারী গুদাম প্রভৃতি জায়গায় লুঠপাটে লিপ্ত হয়। সরকারী বাহিনী এদের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর প্রস্তুতি নিলে সরোজ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সরকারী বাহিনীর সম্মুখীন হন এবং আন্দোলনকারীদের উপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদ করেন। তিনি খাদ্যের বিনিময়ে সরকারী ভবনগুলি থেকে আন্দোলনকারীদের আক্রমণে বিরত থাকার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। আন্দোলন চলাকালীন বিভিন্ন ঘটনাবলী একথাই প্রমাণ করে যে নিম্নবর্গীয়দেব আন্দোলনে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ অর্থনৈতিক। আন্দোলনকারীরা বালুরঘাট শহর থেকে প্রত্যাবর্তন কালে সরকারী কিছু গুদাম এবং জোতদারদের গোলা লুঠ করে। এইসব ঘটনা আন্দোলনকারীদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকেই প্রাধান্য দেয়।

বালুরঘাট শহরেব আগস্ট আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনে ও গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপে মহিলারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় আন্দোলনের অংশীদার হয়েছিল। পক্ষান্তরে আগস্ট আন্দোলনে শহরের মহিলাদের অংশগ্রহণ একেবারেই ছিল না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের যে ব্যাপক অংশ গ্রহণের চিত্র পাওয়া যায় বালুরঘাট ছিল তার ব্যতিক্রম। বালুরঘাট শহরের মহিলাদের আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করার অন্যতম কারণ ছিল স্থানীয় নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনা প্রসূত। তারা আন্দোলনের দিন ইস্তাহার বিলি করে শহরে অঘোষিত হরতাল ঘোষণা করে। শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি থেকে যে ব্যাপক নিম্নবর্গীয় জনসাধারণ জমায়েত হয়েছিল তারা সবাই ছিলেন পুরুষ। আন্দোলনকারীরা সরকারী সম্পত্তি আক্রমণ করবে এবং লুঠপাটে লিপ্ত হবে এই পরিকল্পনা থাকায় মহিলাদের সুকৌশলে আন্দোলন থেকে দূরে রাখা হয়। কারণ সরকারী সম্পত্তি রক্ষা করতে গোরা সৈন্য এগিয়ে আসবে এবং অত্যাচার চালাবে এটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। স্বাভাবিক কারণে আন্দোলনের নেতৃবর্গ পুলিশের অত্যাচারের হাত থেকে মহিলা এবং শিশুদের নিরাপদ দূরত্বে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের আন্দোলনে সামিল করে নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় আন্দোলনের অব্যবহিত পরে গোরা সৈন্য যখন পারিল না এবং তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির উপর অত্যাচার শুরু করে তখন কিন্তু নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ভুক্তস্ত্রী এবং পুরুষ সমবেতভাবে ইংরেজ সামরিক বাহিনীর বিরোধিতা করেছিলেন।

বালুরঘাট শহরের আন্দোলন ব্যাপক রূপ নিলেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং অধিকাংশ ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে নি। যদিও গুপ্ত সমিতিগুলির সঙ্গে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যোগাযোগ ছিল উল্লেখ করার মত। শহরের চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের এই আন্দোলন সম্পর্কে নির্লিপ্ততার অন্যতম কারণ আন্দোলনকারীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। মুষ্টিমেয় কিছু কংগ্রেসী

নেতৃত্ব এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বালুরঘাট মহকুমার বামপন্থী দলগুলির প্রভাব বিশেষভাবে পবিলক্ষিত হয়। এদের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন সংগঠিত হয়ে থাকে। বালুরঘাটে আগস্ট আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। অনেকে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু তৎকালীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় সে বালুরঘাট মহকুমার আগস্ট আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ এই অঞ্চলে তখনো কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত হতে পারেনি। অবশ্য আর.এস.পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসীদের সঙ্গে আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দের মধ্যে চন্দ্রিকা পান্ডে, শৈলেন দাস, বিশ্বরঞ্জন সেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলেব সংগঠন এই অঞ্চলে গড়ে ওঠে ধীরেন ব্যানার্জ্জী, নৃপতি চ্যাটার্জী, কালি কিষণ স্যান্যাল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের দ্বারা। এদের অনেকে আন্দোলনের সময় কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। কিন্তু ঐ দল সক্রিয়ভাবে আগস্ট আন্দোলনে অংশ গ্রহণ কবেছিল।

সার্মাগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৪ই আগস্ট ১৯৪২ সালেব আগস্ট আন্দোলন বালুরঘাট শহবে ইংরেজ প্রশাসনকে টলিয়ে দিয়েছিল। অন্যান্য অঞ্চলের মত ইংরেজ প্রশাসন কঠোরভাবে শহবের আন্দোলনকে দমন করে। আন্দোলনের নেতৃত্বে শহবের বুদ্ধিজীবিদের অল্প কিছু সংখ্যক ব্যক্তি জড়িত থাকলেও অংশ গ্রহণকারীবা ছিলেন নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায় ভুক্তএবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিবর্তে শ্রেণীগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছিল। স্টিফেন হেনিংহাম 'সাবঅলটার্ন স্টাডিস' গ্রন্থে তাব প্রবন্ধে দেখিয়েছেন বিহার এবং যুক্ত প্রদেশেব আন্দোলন ছিল মূলত জাতীয়তাবাদী। তিনি অর্থনৈতিক ভিত্তিকে স্বীকার করেননি। তিনি উল্লেখ করেছেন উচ্চবর্ণেব সম্ভ্রান্ত চাষীরা আন্দোলনেব নেতৃত্বে ছিলেন এবং পববর্তীকালে পরিস্থিতির চাপে নিম্নবর্গীয়রা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু বালুবঘাটের আগস্ট আন্দোলনে বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। জমিদারদের শোষণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মহাজনদের অত্যাচার নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের মানুষদেব ইংরেজ বিবোধী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার বাতাববণ সৃষ্টি কবে। সুতরাং আঞ্চলিক ব্যবধান, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা বালুরঘাট শহরের আগস্ট আন্দোলনেব গতিধারাকে মূলতঃ নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

সূত্র নির্দেশ

১। দ্য ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজিটিয়ারস্-ওয়েষ্ট দিনাজপুর, জে.সি. সেনগুপ্ত। ১৯৬৫।

২। সেন্সাস হ্যান্ড বুক - ১৯৫১, ওয়েষ্ট দিনাজপুর।

৩। ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গ - সংকলক ড: আনন্দ গোপাল ঘোষ, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।

৫। বালুর বার্তা, সম্পাদক পীযুষ কান্তি দেব। ১৩৯৯।

৬। সাব-অলটার্ন স্টাডিজ ,Vol-II, "ক্যুইট ইন্ডিয়া ইন বিহাব অ্যান্ড দ্য ইস্টার্ন ইউনাইটেড প্রভিন্সেস, দ্য ডুয়াল রিভোল্ট"। স্টিফেন-হ্যানিংহাম, ১৯৮৩। সাক্ষাৎকার - শ্রী নিত্যপাল, স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রফুল্ল কুমার দেব, স্বাধীনতা সংগ্রামী, রমেশ চন্দ্র দাস, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার অধ্যাপক অচিন্ত্য কৃষ্ণ গোস্বামী।

স্বাধীনতা সংগ্রামী রাণী শিরোমণি

তপতী পাত্র।

সূচনা ঃ- বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অনেক সংগ্রামীর ভিড় লক্ষ্য করি। এটা হোল ইতিহাসের আলোকিত দিক। অর্থাৎ যে ঘটনা বা চরিত্র আমাদের জানা তাই ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও আরো অজস্র ঘটনা ও চরিত্রের অস্তিত্ব থাকলেও সেগুলো কিন্তু ইতিহাসে স্থান পায়নি। ইতিহাসে স্থান না পাওয়ার নানা কারণ থাকতে পারে, এখানে সেটা আলোচ্য নয়। আলোচ্য হোল এমন কিছু ঘটনা বা চরিত্র, যা হয়তো দীর্ঘদিন যবনিকার অন্তরালে ছিল। অনেকসময় কিংবদন্তী, নানা লোক-গাথা থেকে ও বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সেরকমই একটি ঐতিহাসিক তথ্য হোল কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি কাহিনী।

অবস্থান ঃ- অধুনা মেদিনীপুর জেলার উত্তরদিকে অবস্থিত পাবাং নদীর তীরে কর্ণগড় অবস্থিত। কর্ণগড় রাজ্য নামে পরিচিত হলেও আসলে একটি বড় জমিদারী মেদিনীপুর জেলার জঙ্গল মহলে কর্ণগড় অবস্থিত। চারপাশে শাল, মহুয়া ও পিয়াল বনের ঘন জঙ্গল ছিল। বর্তমানে এই পরিমণ্ডল অনেকাংশে নষ্ট হয়ে গেছে। তার বদলে পটাশ, আকাশমণি, ঝাউ ইত্যাদি গাছের পরিকল্পিত বন দেখা যায়। এখানকার মাটি লাল কাঁকুরে মাটি। এখানকার অধিবাসীরা সাধারণতঃ ভূমিজ আদিবাসী সম্প্রদায়ের। মাঝি, বাগ্দী, চুয়াড়, ঘয়রা, সাঁওতাল ও কৃষক। এরা মূলত বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করেই জীবিকা অর্জন করতো। এখানকার অনুর্বর কাঁকুরে মাটিতে চাষ-আবাদ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এখানকার অধিবাসীরা সহজ, সরল এবং খুবই স্বাধীনতাপ্রিয়, যখনই ওদের অধিকারে শাসকবর্গ অযথা হস্তক্ষেপ করতো তখনই ওরা তার প্রতিবাদ করতো। প্রতিপক্ষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন তাতে তারা ভয় পেতো না। এইভাবে নানা সময়ে নানাভাবে এরা এদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। তার উল্লেখ আমরা ইতিহাসে পাই। কিন্তু যা আমরা ইতিহাসে পাইনা, তাহলো ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামেরও ষাট বছর পূর্বে এই বাংলার মাটিতে এক অসীম সাহসিনী নারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে চুয়াড়দের বিদ্রোহে নেতৃত্বদান করেছিলেন। চুয়াড় বিদ্রোহের দুইশত বৎসর পূর্তিতে আমরা সেই বীরঙ্গনা নারী রাণী শিরোমণিকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে তাঁর রহস্যাবৃত কাহিনী উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছি। রাণী শিরোমণি সম্পর্কে আমরা খুব বেশী জানি না। যেটুকু জানি তা একটা তথ্য হিসাবে জানি, সাধারণ পাঠ্য পুস্তকে এঁর তেমন উল্লেখ নেই।

পটভূমি ঃ- রাণী শিরোমণির ব্যক্তিগত-জীবন আলোচনা করার পূর্বে আমাদের আলোচনা

করতে হবে, কোন পটভূমিতে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন। এই পটভূমি জানতে হলে আমাদের তার কিছু পূর্বের বাংলার রাজনৈতিক অবস্থান জানতে হবে।

দিল্লীর অধীনে বাংলা থাকলেও তা নামমাত্র, সুবে বাংলার শাসকই সর্বেসর্বা ছিলেন। দিল্লীর মোঘল বাদশাকে নির্ধাবিত রাজস্ব দিয়ে এঁরা প্রায় স্বাধীন ভাবেই এখানকার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সেইসময় মাবাঠা বর্গীদেব অতর্কিত আক্রমণে বাংলার মানুষরা তখন আতঙ্কিত এবং শাসনব্যবস্থা বিপর্যস্ত। তৎকালীন বাংলার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ। সেখানে থেকে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিকে নিরাপত্তা দেওয়া খুবই মুশকিল ছিল। তাই বাংলার সুবেদার আলিবর্দী খাঁ এক ফর্মান জারী কবেন। তাতে তিনি বলেন যে, জমিদারবা তাদের জমিদাবী এবং প্রজাদেব ধনেপ্রাণে রক্ষা করাব জন্য নিজব্যয়ে পাইক বাখতে পারবেন। এই ফর্মানেব সুবাদে ইংবেজবা ফোট উইলিযম দুর্গকে সংস্কাব করে তাদের ক্ষমতা বাড়াতে থাকে। পরবর্তীকালে মীরকাশিম মেদিনীপুবসহ সমস্ত জঙ্গলমহল ইংবেজদের দিয়েছেন। ১৭৬০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বর্ধমান এবং চট্টগ্রামের পাশাপাশি মেদিনীপুরের ও পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে ইংরেজবা কিন্তু খুব সহজে এই অঞ্চলের দখল নিতে পারেনি। এরজন্য তাদেবকে দফায় দফায় নানা বিদ্রোহেব সম্মুখীন হতে হযেছে। যাইহোক ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে যে বিদ্রোহের সূত্রপাত তাব জের কিন্তু পববর্ত্তীকালে দেখা যায় নানাভাবে। ঘড়ুই, মাঝি, চোয়াড, পাইক প্রভৃতি উপজাতি মানুষবা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়। আমরা ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে জানতে পাবি এই শ্রেণীব মানুষরা প্রথম প্রথম জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবতো। জমিদারীগুলি ইংবেজদেব দখলে আসাব পর এরা তাদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বলবামপুরের কেদারকুন্ডে ঘড়ুই নামক উপজাতিরা জমিদাবের অত্যাচার ও ইংরেজদের হাতে তাদের সর্বস্ব খোয়ানোর আশঙ্কায় বিদ্রোহ করে। জমিদার শত্রঘ্ন চৌধুরী ও তাঁর পুত্র নরহরি নৃশংসভাবে এই বিদ্রোহ দমন করেন। কৃষ্ণাচর্তুদশী তিথিতে ঘুড়ইরা তাদের দলপতির বাড়িতে সারাবছরের কর দেওয়ার জন্য জমায়েত হলে জমিদারের বিশাল বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ কবে সাতশ ঘড়ুইকে হত্যা করে। নিহত সাতশো মানুষের মুন্ড একজায়গায় জড়ো কবে জাযগাটিব নাম হয় মুন্ডমারি। ১৭৭৩ সালে আবার এক গণহত্যায় চিরতরে শেষ হয়ে যায় ঘড়ুই বিদ্রোহ। এরপর মাথা তোলে খয়রা ও মাঝি বিদ্রোহ। এইভাবে প্রথমদিকে জমিদার ও ইংবেজদের বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন লড়াই হয়। এরপরই মেদিনীপুরে জঙ্গলমহলে বিদ্রোহের দাবানল ছড়িযে পড়ে। ক্রমে ক্রমে শুরু হয় চোয়াড় ও পাইক বিদ্রোহ। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের চেহারাও বদলাতে থাকে। জমিদারদের কেন্দ্র করে এই বিদ্রোহেব সূচনা হলেও ক্রমশ: ইংরেজদের সঙ্গেও এরা জড়িয়ে পড়ে। ১৭৬০ সালে ইংরেজরা মেদিনীপুরেব পূর্ণ অধিকার পায়। ১৭৬৬ সাল থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায় চোয়াড় বিদ্রোহ।

ইতিহাস থেকে আমবা জানতে পারি বিভিন্ন সময়ে যে উপজাতি বিদ্রোহগুলি সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে রাজনৈতিক কারণ যতটা দায়ী তার থেকে অর্থনৈতিক কাবণ অনেক বেশী দায়ী কাবণ এইসব আদিবাসী সম্প্রদাযের লোকেরা মূলত বনজ সম্পদ যেমন বনের পশু,

ফলমূল গাছপালা প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসনব্যবস্থায় আসার পর তারা তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ সুরক্ষার জন্য এইসব চিরাচরিত প্রথাকে দ্রুত বদলাতে শুরু করে। যারফলে এই আকস্মিক পরিবর্তন সেখানকার জনসাধারণ মেনে নিতে পারেনি, আবার যেসব লোকেরা বিভিন্ন জমিদারীতে পাইকের কাজ করতো জমিদারীগুলি ইংরেজদের অধীনে আসার পর তারা বেকার হয়ে যায়। তারা যেসব জমিতে চাষবাস করতো সেখান থেকেও তাদের উচ্ছেদ করা হয়, যার ফলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে।

শিরোমণির জীবনী ঃ- ১৮৫৭ খ্রী:র সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসাবে ধরা হয়। তারও ষাট বছর পূর্বে মেদিনীপুরেব জঙ্গলমহলে আঞ্চলিক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এক অসাধারণ রমণী শিরোমণি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যা জানা গেছে তা মোটামুটি এইরকম-মেদিনীপুবের উত্তরে অবস্থিত কর্ণগড় রাজ্যের রাজা অজিত সিংহের দ্বিতীয়া পত্নী রাণী শিরোমণি। রাজার প্রথমা স্ত্রী ভবানী ছিলেন নিঃসন্তান। তাই বংশ রক্ষার জন্য রাজা দ্বিতীয় বিবাহের কথা চিন্তাভাবনা কবেছিলেন এবং সেইসময় তাঁব নজরে পড়ে কর্ণগড় কেল্লার অদূরে জঙ্গলঘেরা এক গ্রামের কিশোরী শিরোমণির ওপর। শিরোমণির সঙ্গে রাজার শুধু বয়সের তফাৎই নয়, তফাৎ আভিজাত্যেরও। কারণ শিরোমণি ছিলেন সাধারণ কৃষক পরিবারের কন্যা, কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁকে রাণী হতে হয়। কিংবদন্তী আছে রাজাকে বিবাহের পূর্বে শিরোমণি সম্ভবত কোনো গ্রাম্যযুবকেব প্রেমে আকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু সেই প্রেম পরিণতি পাওয়ার পূর্বেই শিরোমণিকে কর্ণগড়ের ছোটরাণী হিসাবে চলে আসতে হয়। যাইহোক শিরোমণিরও কোনো সন্তান হয়নি। নিঃসন্তান অবস্থায় রাজা অজিত সিংয়ের মৃত্যু হয়। এরপর দুই রাণী কর্ণগড়ের শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। এইসময়ে গোবর্ধন দিক্‌পতির নেতৃত্বে চোয়াড় বিদ্রোহ তুঙ্গে। বিদ্রোহীদের আক্রমণে নাজেহাল হয়ে রাণীরা কিছুদিন অজিত সিংয়ের আত্মীয় নাড়া জোলের জমিদার বাড়িতে আশ্রয় নেন। চুক্তি হয় রাণীর মৃত্যুর পর কর্ণগড় নাড়াজোলের জমিদারী অন্তর্ভুক্ত হবে। পরে পবিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে রাণীরা কর্ণগড়ে ফিরে যান।

এসে গেল ১৭৬০ সাল। মেদিনীপুরে ইংরেজদের প্রভুত্ব কায়েম হতে থাকে। ততদিনে রাণী ভবানী মারা গেছেন। কর্ণগডের শাসনকার্যের দায়িত্বে একা রাণী শিরোমণি। সেইসময় রাণী চিরাচরিত প্রথা ভেঙে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেন। তাহল ইংরেজদের বিরুদ্ধে চোয়াড়দের বিদ্রোহকে প্রত্যক্ষ সমর্থন। ইংরেজদের আগ্রাসনে চোয়াড়, পাইক বিদ্রোহের আগুন ক্রমশ: বাড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে সেটাই চূড়ান্ত পর্যায়ে এলো ১৭৯৬-৯৯ সালে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় রাণী শিরোমণি তাঁর শ্বশুবকুলেব রীতি অনুযায়ী চোয়াড়দের বিরোধিতা করলেন না। বরং তাদের তিনি আন্তরিকভাবে সমর্থন করলেন। ইংরেজরা যখন জঙ্গলমহলে উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দফায় দফায় সেনা পাঠিয়েছে, রাণী তখন অভিনব কৌশলে তাদের নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা কবেছেন। রাণী সঠিক পদক্ষেপে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে পিছু হটতে হয়েছে কারণ এখানেও আছে এক বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস।

কর্নগড়ের গায়েব যুগলচরণ সিংহাসনের লোভে গোপনে রাণীর সমস্ত পরিকল্পনা ইংরেজদের কাছে ফাঁস করে দেয়। চোয়াড় বিদ্রোহ ক্রমে বিশাল আকার নিলে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে যায়। চোয়াড়রা ক্রমে পিছু হঠতে থাকে এবং রাণী শিরোমণি আত্মগোপনের জন্য মন্দিরের সুড়ঙ্গপথের দিকে যাওয়ার সময় ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন। সম্ভবত ভারতের প্রথম বিদ্রোহিনীর বিচার ইংরেজরা সাড়ম্বরে না করলে ও তাঁকে কর্নগড়ে নজরবন্দী করে রাখে এবং বন্দী অবস্থায় এই নিঃসন্তান বিধবা রমণীর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু নিয়েও মতভেদ আছে। কেউ বলেন খুন, কেউ বলেন আত্মহত্যা, আবার কেউ কেউ বলেন স্বাভাবিক মৃত্যু। ঠিক কি কারণে তাঁর মৃত্যু হয় তা আজও রহস্যাবৃত। সেখানে আলোকপাত করে সঠিক কারণটি জানা যায়নি।

কৃতিত্ব ঃ- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাণী শিরোমণির কৃতিত্ব বিস্ময়কর, কারণ যে সময়ে তিনি বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন সে সময় একজন নারীর পক্ষে এভাবে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া যুগোপযোগী ঘটনা ছিল না। যুগের থেকে অনেক বেশী অগ্রবর্তী ঘটনা ছিল। একজন নারী হিসাবে তিনি প্রথম শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অবশ্য এর কারণ হিসাবে অনেকে মনে করেন যে, জন্মসূত্রে তিনি অভিজাত বা জমিদার কন্যা ছিলেন না। তাই সাধারণ শ্রেণীর মানুষ হিসাবে সেই শ্রেণীর প্রতি তাঁর একটা টান ছিল। যাইহোক আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সিপাহী-বিদ্রোহের ষাট বছর পূর্বে একজন গ্রাম্য নারী তাঁর শ্রেণী, সমাজ, স্বার্থ, আভিজাত্য সবকিছুকে বিসর্জন দিয়েও সাম্রাজ্যলোভী, শোষক ইংরেজদেব বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি হয়তো নিজে যুদ্ধ কবেননি, কিন্তু পরামর্শ ও বসদ যুগিয়েছেন। শুধুমাত্র এইসব কারণের জন্য তাঁর কৃতিত্বকে খাটো করা যায় না। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের কৃতিত্বকে খাটো না করেও বলা যায় রাণী শিরোমণির প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ইতিহাস তাঁকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি। বীরাঙ্গনা রাণী শিরোমণি হারিয়ে গেছেন উপযুক্ত ঐতিহাসিক গবেষণার অভাবে। তাই তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে আমবা তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোনো প্রামান্য তথ্য পাই না। যা পাই তাহলো কিংবদন্তী ও লোকগাথা।

আজ স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরে এবং চোয়াড় বিদ্রোহের দুইশত বছরেও বাংলার সেই উপেক্ষিত অধ্যায়ে আমরা যথোপযুক্ত আলোকপাত করতে পারিনি। এই বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে রাণী শিরোমণির গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে দক্ষিণবঙ্গে এই বিদ্রোহ হয়। রাণী নিজে সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে এই অনগ্রসর শ্রেণীর বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মেদিনীপুরের এই জঙ্গলমহলে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা কিভাবে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতো, সেই লড়াই ক্রমশ: ইংরেজদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল সে ইতিহাসও উপেক্ষিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে একজন নিঃসন্তান বিধবা নারীর এই সংগ্রাম কতটা কালোত্তীর্ণ ছিল তা আজ আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে অনুমান করতে পারি। তখনকার ভারতবর্ষ এখনকার মতো অখণ্ড একটা রাষ্ট্র ছিল না। তা সত্ত্বেও রাণী শিরোমণি তাঁর জন্মভূমি ও সেখানকার মানুষেব স্বাধীনতা তথা অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর পাশে সেরকম সহযোগী এবং অনুকূল পরিবেশও

পাননি। সে সুযোগটা লক্ষ্মীবাঈ পেয়েছিলেন।

'চোয়াড়' শব্দটি অত্যন্ত কুৎসিত। আভিধানিক অর্থে দুর্বৃত্ত নীচ জাতি। যে বা যারা এই সম্প্রদায়ের চোয়াড় নামকরণ করেছিল তা যথেষ্ট তুচ্ছজ্ঞান থেকেই করেছিল। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে সমাজের কোনো অভিজাত ব্যক্তিত্ব এই বিদ্রোহের নেতৃত্বদানে আগ্রহী হবেন না। কিন্তু রাণী শিরোমণি এর ব্যতিক্রম। তিনি আন্তরিকভাবে এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানে এগিয়ে এসেছিলেন। তাই আজকের আলোকে কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণির মধ্যে যে অসীম সাহস ও স্বদেশীয়ানার পরিচয় আমরা পাই তা সত্যিই অতুলনীয়। জঙ্গলমহলের কয়েকদশকের সংগ্রাম, যুদ্ধ, মৃত্যু, অত্যাচারের মতোই রাণী শিরোমণির কাহিনীও উপেক্ষিত হয়ে আছে। শুধু স্বল্পতোয়া পরাং নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে কর্ণগড়ের ক্ষুধিত পাষাণ সেখানে গুমরে মরছে দুইশত বছরের পূর্বের ইতিহাসের এক সংগ্রামী অধ্যায়।

গানেওয়ালি থেকে গায়িকা ঃ পটভূমি ঔপনিবেশিক বাংলা

জাহানারা রায়চৌধুরী

অন্য অনেকের মতই বাঙালির জীবনচর্যায় সঙ্গীত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। তার দৈনন্দিন জীবনকে ঘিরে অসংখ্য গানের ভাণ্ডাব সে কথাই বলে। এসব গান গাইতেন যাঁবা, বাঙালি কন্যারা তাতে ছিলেন কি ? নীহাররঞ্জন রায, 'বাঙালির ইতিহাস' এ জানিয়েছেন, প্রাচীন বাংলার উঁচু তলার মেয়েরা লেখাপড়াব পাশাপাশি নানা কলাবিদ্যা-নৃত্য-গীতেরও তালিম নিতেন। 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থে নট গঙ্গোঁর পুত্রবধূ বিদ্যুতপ্রভাব নাম এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জানা যায় জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীও ছিলেন নৃত্যগীতে পারদর্শিনী[১]। এরপব দীর্ঘদিন ধবে বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতি নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোলেও অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরাজের বাংলার ক্ষমতা দখল বাঙালির জীবনকে যে ভাবে নাড়া দিয়েছিল তেমনটি আগে কখনো হয়নি। ইংরাজের প্রশাসনিক, আইন, বিচার-ব্যবস্থা সর্বোপরি অর্থনৈতিক নীতি চেপে বসল বাঙলার উপর যার অভিঘাত বাঙালি জীবনের সব স্তরেই কম বেশী অনুভূত হয়। শুরু হয় নতুন ধরণের নগরায়ন-কলকাতা যার মধ্যমণি। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নানা টানাপোড়েন। নতুন নাগরিক পরিবেশে পুরোনো অনেক রীতি-রেওয়াজ, রক্ষণশীলতা ভেঙে চূড়ে যায়। তেমনই যুক্ত হয় আরও নতুন ধরণেব রক্ষণশীলতার উপাদান ঔপনিবেশিক নীতি যাকে পরিপুষ্ট করে। গান গাইতেন যে মেয়েরা বা আবো স্পষ্ট কবে বললে, পেশা হিসাবে সঙ্গীতের সাথে যুক্ত ছিলেন যে মেয়েরা তাঁরাও এই অভিঘাতের বাইরে ছিলেন না। নতুন পরিবেশে 'বাবু' সংস্কৃতির বিলাসের উপকরণ হয়ে ওঠেন এঁদেব অনেকেই। তাঁদের সঙ্গীতে পারদর্শিতা নয়, 'বেশ্যা' হিসাবে তাঁদের পরিচয়। তবে ক্রমে ঐ প্রতিকূল আবহাওয়ার ভিতর দিয়েই নানা টানাপোড়েনের মধ্যে তাঁদের শিল্পী-সত্তার বিকাশের পর্বও এই সময়।

উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার 'অন্দর' আর 'বাহির' এর ব্যবধান-মেয়েদের জগত অন্দরেব খাস মহলে ঘরকন্নার কাজে, আর বাইরেব পৃথিবীটা শুধুই পুরুষেব। যদিও সাধারণ মানুষের জগতে এই ধরণের রক্ষণশীলতা অনেকটাই কম ছিল, বাঙালি মধ্যবিত্ত ও উপর মহলে এটাই ছিল স্বাভাবিক ছবি। সেখানে মেয়েদের সঙ্গীত চর্চার সুযোগ কতটা ? বাংলাভাষাব প্রথম আত্মজীবনী রচয়িত্রী রাসসুন্দরী দেবীর কথায়, "কলুর বলদের মত দুচক্ষু ঢাকা থাকিত"[২] যাঁদের, একহাত ঘোমটার আড়ালে নিঃশব্দে ঘরের

নানাবিধ কাজেই যে 'ঘরে মেয়েব' দিন যেত, গান গাওয়া বা চর্চা করা তাদের সীমার বাইরে বহু দূরের কথা। কেননা রক্ষণশীল সমাজের বিধান -মেয়েদেব কাজ ঘরের অন্দরে, সংসারের কাজে। সঙ্গীত তার মধ্যে পড়ে না। সুতরাং নাবীকণ্ঠে সঙ্গীত শোনা যেত বাঈপাড়াতে। হঠাৎ ধনী বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সময় বহু হরিমতী, মানদা, রাজমণি, নন্দবাণী, বেদানাবালা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের অনেকেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পারদর্শিনী। তাঁদেব কণ্ঠসঙ্গীত সমসাময়িক বহু মজলিশেব মুখ্য আকর্ষণ। এজন্য সমঝদার, ধনী বাঙালির পৃষ্ঠপোষকতা থেকেও বঞ্চিত ছিলেন না তাঁরা। তবে এঁদেব প্রতি সমাজের মনোভাব বিচার করলে দেখা যাবে, বাবু সংস্কৃতির এঁদের ধাবণ করলেও 'ঘবেব মেয়ে', গৃহস্থ মেয়ের মর্যাদা তাঁদের ছিল না। তাঁদের মূল পরিচয় 'তবায়েফ' তাঁবা। তাঁদেব নিয়ে রক্ষণশীল, 'ভদ্র' সমাজ সদা শঙ্কিত।

তবে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয সঙ্গীতেব প্রধান ধারক এই বাঈদের পাশাপাশি উনিশ শতকের কলকাতা-কেন্দ্রিক নগর সংস্কৃতিতে আবও কিছু গায়িকার কথাও বলতে হয়। মনে রাখা দবকাব, একদিকে শিক্ষিত বিদ্বজনসমাজ, অন্যদিকে 'বাবু' কালচার আর বাঈ নাচ-গানই উনিশ শতকেব বাংলাব নব্য নাগরিক সংস্কৃতিব একমাত্র ছবি নয। এই দুয়ের পাশাপাশি ছিল আর এক অন্য সংস্কৃতিও যাব ধারক এবং বাহক সাধারণ মানুষ[৪]। এদের কবিগান, পাঁচালি, যাত্রা, কীর্তন নগর কলকাতায় ও আশপাশে শুধু সাধাবণ মানুষই নয়, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের আঙিনাতেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই ক্ষেত্রগুলিতে মেয়েরাও যথেষ্ট পরিমাণে ছিলেন, বিশেষত ঝুমুর এবং ঢপ-কীর্তনওয়ালিদেব যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল।[৫] সামাজিক দিকে এই শ্রেণীর মহিলা ও রাজমণি, গহরজানেব মত বিখ্যাত বাঈজীদের প্রভেদ থাকলেও তথাকথিত 'ভদ্র' সমাজের দৃষ্টিতে এরা কেউই সম্মানেব আসন পাননি। যখন থিয়েটারে বাঈপাড়ার মেয়েদেব যুক্ত করল বেঙ্গল থিয়েটাব, তখন 'ভারত-সংস্কারক' পত্রিকায় সখেদ উক্তি—"এ পর্যন্ত আমবা যাত্রা, নাচ, কীর্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগেব সহিত প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্রসন্তানেরা, আপনাদিগেব মর্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।"[৬] আবার সাধারণ মানুষেব ছড়া, কৌতুক, সঙ্গে বাবু বিলাস আব 'বেশ্যা'দের নিয়ে তীর্যক মন্তব্য থাকলেও শিল্পী হিসাবে তাদের উৎকর্ষের কোন চিত্র সেখানেও অনুপস্থিত।

তবে কিছু সত্যিকারের রসিক সমঝদার মানুষও ছিলেন যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সহায়তা এঁদের 'তবায়েফ' পবিচয়েব উর্দ্ধে শিল্পী সত্তার বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। জনপ্রিয়তায় সে সময় প্রায কিংবদন্তীতে পবিণত হয়েছিলেন খাস সাহেব কন্যা ইলিন অ্যাঞ্জেলিয়া ওরফে গহরজান যাঁর একরাতের মুজবোর পরিমাণ ছিল সে যুগের পনেরোশো টাকা। ৭-৮টি ভাষায় গাইতেন তিনি। খেয়াল, ঠুংরী, দাদরা থেকে বাংলা আগমনী, শ্যামাসঙ্গীত পর্যন্ত অবাধ বিচরণ ছিল তাঁর। লিখতে পারতেন সায়েবিও। সমসাময়িক রসিকজনেব কাছে গহরজান ছিলেন অত্যন্ত সমাদৃত নাম। এছাড়াও ছিলেন বউবাজারের বাজমণি বাঈ যাঁর নামে বহু ওস্তাদও মাথা নত করতেন। এমন পবিচিত নাম ছিল আরও।

তবে গাইয়ে মেয়েদেব প্রসঙ্গে থিয়েটাবের কথা আসবেই। কেননা ১৮৭৩ এব ১৬ই

আগষ্ট বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়ে অভিনেত্রীর অন্তর্ভুক্তি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। যেহেতু গৃহস্থ পরিবারের কন্যাদের এখানে আসার কোন সুযোগ ছিল না, সেহেতু নৃত্য গীতে পারদর্শিনী হিসাবে বাঈপাড়ার মেয়েরাই পা রেখেছিলেন সেখানে। এই পদক্ষেপ ছিল তাঁদের শিল্পী সত্ত্বার বিকাশে একটি সন্ধিক্ষণ। এ প্রসঙ্গে যাদুমণির নাম উল্লেখযোগ্য। বাঙালি বাঈ শ্রেণীর মধ্যে এত সুপরিচিত নাম সে যুগে দ্বিতীয়টি ছিল না। রঙ্গমঞ্চই তাঁকে গায়িকা হিসাবে খ্যাতি দিয়েছিল। বেঙ্গল থিয়েটারের পর ন্যাশনাল থিয়েটার হল সেই দ্বিতীয় রঙ্গমঞ্চ যেখানে অভিনয়ে, গানে মাতিয়েছিলেন পাঁচ মহিলা, যাদুমণি যার অন্যতম।[৬] ১৮৭৫ খ্রীঃএ 'শরৎ সারোজিনী' নাটক সম্পর্কে যে আলোচনা প্রকাশিত হয় তাতে যাদুমণি তাঁর সুমধুর সঙ্গীতের জন্যই বিশেষভাবে উল্লেখিতা হন-"The following actors and actresses deserve special mention...The songstress Jadumani, deserves praise."[৭] তবে দুবছরের সংক্ষিপ্ত নটী জীবনের শেষে যাদুমণি ফিবে যান সঙ্গীতের জগতেই। তাঁর আসরের খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়েছিল বলে জানা যায় নাট্যচার্য অমৃতলাল বসুর স্মৃতিচারণায়।[৮] এরপর হঠাৎই একদিন গানের জগত থেকে হারিয়ে যান তিনি, বহু পরে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামক জনৈক উৎসাহীর প্রচেষ্টায় যাদুমণি বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উঠে আসেন-গড়ে ওঠে সঙ্গীত পরিষদ বিদ্যালয়' যেখানে শিক্ষয়িত্রীর নতুন ভূমিকায় নিযুক্ত হলেন গতযৌবনা যাদুমণি। জানা যায় একটি আসরে রবীন্দ্রনাথের তিনটি গানকে অন্যতালে গেয়ে দেখিয়েছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই আসরটি রবীন্দ্রনাথের একটি আলোচনা 'সঙ্গীতের মুক্তি'র প্রতিবাদে আয়োজিত হয়েছিল। ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৭র অমৃতবাজার পত্রিকায় এ ব্যাপারে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তা থেকে যাদুমণির বিশিষ্ট ভূমিকা স্পষ্ট। ততদিনে নোবেল-বিজেতা রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও যাদুমণি একজন শাস্ত্রীয় শিল্পীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের ধারণাকে যেভাবে উপস্থিত করেছিলেন তা লক্ষ্যণীয়।

ইতিমধ্যেই বাবু বিলাসের পাশাপাশি যে বিকল্প নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছিল তার পুরোধা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি, এক কথায় তাঁরা 'ভদ্রলোক'। ভিক্টোরিয়ান মূল্যবোধের প্রভাবে প্রভাবিত এই নব্য বাঙালির নতুন চাহিদা উপযুক্ত সহধর্মিণী। এই ভাবনার প্রতিফল নারী শিক্ষার উদ্যোগেও। নব্য পুরুষের উপযুক্ত নব্য নারী গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার বিষয়বস্তু তালিকাটি খতিয়ে দেখলে, দেখা যাবে সঙ্গীত সেখানে অনুপস্থিত। কারণ সাধারণ ভদ্রবাড়ীর মেয়ের নাচ-গান শেখা ছিল গর্হিত ব্যাপার। মেয়েরা তাদের মনের সাধ মেটাত বাড়ির অন্দবে বৈষ্ণবীদের গান শুনে। গ্রামাফোনের প্রচলনের পর অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ির অন্দরে পৌঁছালো আরও অনেক সঙ্গীতের ভাণ্ডার, যদিও সেটাও সবার পছন্দ ছিল না। যাকে বলে প্রথাগত তালিম নিয়ে গান শেখা। বাঙালির ঘরে সেটা ছিল অসম্ভব। ঠাকুরবাড়ীর মত নানা দিক থেকে আধুনিক পরিবারের প্রথমদিকে মেয়েদের তালিম নিয়ে গান শেখার রেওয়াজ ছিল না। পত্নী নীপমরীকে গান শেখানোর জন্য রবীন্দ্রভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথকে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতি আদায় করতে যথেষ্টই বেগ পেতে হয়েছিল।[৯] তবে ক্রমে এ বাড়ির মেয়েরা সঙ্গীতেও পারদর্শিতা দেখাতে শুরু করেন। কিন্তু এটা ছিল নিতান্তই ব্যতিক্রম। রক্ষণশীল বাড়িতে মেয়েদের অবস্থা

কেমন ছিল তার চিত্র পাওয়া যায় শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণায়-"সেই গ্রামাফোনটার প্রতি মায়ের আর কাকিমাদের কী অসীম কৌতূহল ছিল কি বলব। গান শোনার ঝোঁক প্রচণ্ড। এদিকে কর্তাদের কানে গেলে হেনস্তা। তাই যা কিছু শোনবার তড়িঘড়ি শুনে নিতে হত। তারমধ্যেই ঢলাঢলি, হাসাহাসি, কানাকানি। কর্তারা আপিস থেকে ফিরবার আগে যেমনকার জিনিষ তেমনি করে রেখে দিতে হবে। না হলে ....।"[১০]-এই অর্ধসমাপ্ত কথাটির ব্যঞ্জনা অনেক।

তবে মেয়েদের সঙ্গীত চর্চার প্রসঙ্গ একেবারে উঠতে শুরু করেনি এমন নয়। ১৮৬৩তে বামাবোধিনী সভার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল মেয়েদের জন্য পত্রিকা 'বামাবোধিনী'। সেখানেই একটি লেখায় প্রশ্ন তোলা হয়-"সঙ্গীত বিদ্যা সুকোমল বিদ্যা। ইহাতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু এই সঙ্গীত যখন বামাকন্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হইতে থাকে, তখন স্বর্গ হইতে সুধাধারা বর্ষিত হইয়া যেন জগতকে মোহিত করিয়া দেয়।...সঙ্গীত শক্তি নারীগণের স্বাভাবিক এবং একটি অসাধারণ গুণ। এই জন্য সকল দেশে ইহা তাহাদিগের একটি প্রধান অলঙ্কার বলিয়া গণ্য।....বঙ্গদেশে নারীগণ ঈশ্বর প্রদত্ত যে সকল শক্তি লাভ করিয়া তাহা পরিচালন করিতে পারেন না, তন্মধ্যে বাকাক্তি প্রধান। স্ত্রীলোকের মুখে বাক্স্ফূর্তি হওয়া যেখানে দোষেব, সেখানে তাহাদিগের কন্ঠ হইতে সঙ্গীত নিঃসরণ ভয়ানক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে তাহার সন্দেহ কি ?"[১১]

এ পর্যন্ত পড়লে মনে হবে যে শিল্পী সত্ত্বাকে সম্মান জানানো ও বিকশিত করার প্রয়াস শুরু হয়েছিল। আংশিকভাবে তা সত্য হলেও সেখানেও যে শ্রেণী বৈষম্য ও সীমাবদ্ধতা ছিল তা পরের কথাগুলি থেকে স্পষ্ট- "বঙ্গদেশীয়গণ আপনাদিগের নারীগণের মুখ বন্ধ রাখিয়াছেন, কিন্তু নারী মুখ নিঃসৃত সঙ্গীত শুনিতে তাহাদিগের আমোদ ও অনুরাগের ত্রুটি দেখা যায় না। কে না দেখিয়াছেন, যদি স্ত্রীলোকের যাত্রা, কীর্তন কি কবি হয়, তাহাতে কত অসংখ্য লোক সমাগত হইয়া থাকেন। এদেশের লোক পরিবার মধ্যে পবিত্র সুখভোগে অসমর্থ হইয়া নরকময় বেশ্যাগৃহের আশ্রয় গ্রহণ করে। সঙ্গীত বারাঙ্গনাগণের একটি প্রধান মোহিনী শক্তি। তাহার প্রলোভনে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হইয়া যারপরনাই ঘৃণিত পথে পদার্পণ করে।"[১২] বোঝা যায়, ভদ্রলোক সংস্কৃতি আর সঙ্গীত জগতের মেয়েদেব মধ্যে কতটা ব্যবধান সুস্পষ্টভাবে টেনে রাখা হয়েছিল। শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণী ঘবের মেয়েদের এ বিষয়ে 'বিশেষ রূপে চিন্তা' করতে বলছেন, কেননা "তাহাতে পরিবারের সমূহ কুশল লাভ হইবে।"[১৩] তাঁদের ক্ষোভ, এদেশের লোক-"দুশ্চবিত্রা নারীগণের কণ্ঠে অপবিত্র গান শ্রবণে উৎসুক হন।"[১৪] এই জন্য তাঁদের পবামর্শ-

"যদি আমবা আমাদিগেব বমণীগণের যথোচিত সম্মান বক্ষা করিয়া সদ্ভাবপূর্ণ ও পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত রসে তাঁহাদিগের কন্ঠকে অভিষিক্ত করিতে দিতাম, তাহা হইলে আমাদিগের সুখের সীমা থাকিত না...গৃহের মধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলে অনেক অবোধ পুরুষ কুস্থান নরকে পতিত হইতেন না। ধর্ম ও পবিত্রতার সুমধুর প্রভাবে পাপের আকর্ষণ এককালে পরাজিত হইত।

অত্যন্ত সুখের বিষয় বলিতে হইবে এদেশেব কুৎসিত সঙ্গীত প্রথা ক্রমশ সংশোধিত হইতেছে। কোন কোন ধার্ম্মিক পবিবার আপনাদিগের কুলাঙ্গনাগণকে পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত শিক্ষায় উৎসাহ দান কবিতে আবম্ভ করিয়াছেন....যে সঙ্গীত আলাপ করিয়া বামাগণের কন্ঠ সার্থক হয় এবং যাহা শ্রবণ পথে উত্থিত করা যায়, আমাদিগের একান্ত অনুরোধ কেহ তাহাতে অবহেলা করিবেন না। সকলে তাহা অন্তঃপুর মধ্যে প্রচলিত কবিয়া বঙ্গীয় সমাজে একটি অভূতপূর্ব বিশুদ্ধ সুবেব স্রোত উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।"[১৮] সুতরাং, সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে সম্মানের সীমানাও চমৎকার ভাবে টেনে দিয়েছে ভদ্রলোক সমাজ। শ্রীজান বাঈ, যাদুমণি, রাজমণি বা আশ্চর্যময়ী, বেদানাবালা দাসীদের সে সীমাবেখাব ভিতরে যেতে দেওয়া হয়নি।

একদিকে 'বেশ্যাগণ বর্ণিত' সঙ্গীতে ঘৃণা, অন্যদিকে নব্য নারীর কন্ঠে গৃহেব অভ্যন্তরেই 'পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত' এই দুযেব মাঝে তাৎপর্যপূর্ণ এক সংযোজন ঘটল যখন বিলাত ফেরত ববীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ঠাকুববাড়িব মেয়েরা 'বাল্মীকির প্রতিভা' গীতিনাট্যে অংশ নিলে (১৮৮১ খ্রীঃ)। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তা 'পরমার্থ বিষয়ক' ছিল না। সুতরাং ভদ্রলোক সমাজেও যথেষ্ট সমালোচনা কুড়োতে হয়েছিল তাদেব। তবে এটা ছিল নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রথমে জোড়াসাঁকোর তিনতলাব ছাদ, গৃহ প্রাঙ্গণ, বিবজিতলাব বাড়িতে মঞ্চ বেঁধে, তার সঙ্গীত সমাজ ভবনে মেয়েবা অংশ নিলেন অভিনয আব গানে। ১৯০২ এ শান্তিনিকেতন আশ্রম হওয়ার পব ক্রমে এই উদ্যোগ ঠাকুববাড়ির মেযেদেব থেকে আশ্রমিক কন্যাদেব মধ্যেও সঞ্চাবিত হল। সুতরাং ববীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র কবে এক নিঃশব্দ বিপ্লবেব সূচনা হল। বিংশ শতকেব গোড়া থেকে এই নতুন পর্বের সূচনা।

যদিও বিংশশতকে এসে চিত্র অনেকটাই বদলায় নানা পাবিপার্শ্বিক কাবণে। আবও অনেক বেশী সংখ্যায ঘরেব মেয়েরা প্রকাশ্যে সঙ্গীত চর্চা ও অনুষ্ঠানে অংশ নিতে শুরু করেন, তা সত্ত্বেও সে পথ মসৃণ ছিল না। দীর্ঘদিন পর্যন্ত নানা টানাপোড়েন, সমালোচনাব সম্মুখীন তাদের হতে হযেছে। তাছাডা লক্ষ্যণীয এই যে বিংশ শতকে এসে অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গীতেব দুই ধাবাব মধ্যে মাঝে মাঝে সংশ্লেষ ঘটলেও মূলত তা সমান্তবাল ধারাতেই চলতে থাকে। সে চলার কোথায় গিযে শেষ হল, শেষ পর্যন্ত সঙ্গীতেব জগতে মেযেদের অবস্থা কতটা প্রাঞ্জল হতে পাবল সে ইতিহাস দীর্ঘ।

তথ্যপঞ্জী

১। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীব ইতিহাস (আদিপর্ব), কলিকাতা, ২০ আশ্বিন।

২। রাসসুন্দরী দেবী, "আমাব জীবন", আত্মকথা (নীরক রায় সম্পাদিত), কলকাতা, ১৯৮১, প্রথম খণ্ড।

৩। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকেব কলকাতাব অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯৯; পৃষ্ঠা ৭।

৪। মহেন্দ্রলাল দত্ত, কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৭

৫। বিষ্ণু বসু, "নারী প্রগতি ও অভিনেত্রী", গ্রুপ থিয়েটার, দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (আগস্ট-অক্টোবর) ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৩০

৬। দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, আসরের গল্প, কলকাতা, ভাদ্র-১৩৭৮, পৃষ্ঠা-৫

৭। ইংলিশম্যান পত্রিকা, ১৭ই আগষ্ট, ১৮৭৫ খ্রীঃ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থে উদ্ধৃত, দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত গ্রন্থে, পৃষ্ঠা-৬

৮। দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্তগ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৭৮

৯। চিত্রা দেব, ঠাকুর বাড়ীর অন্দরমহল, কলকাতা, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৭, পৃষ্ঠা-৬১।

১০। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, জলসাঘর, বর্তমান পত্রিকা, একাদশ শারদ সংখ্যা ১৪০৪, পৃষ্ঠা-১৪৯।

১১। বামাবোধিনী পত্রিকা, জৈষ্ঠ্য, ১২৭৯, ভারতী রায় সম্পাদিত, সেকালের নারী শিক্ষাঃ বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ), ১৯৯৪ পৃষ্ঠা-২৮

১২। পূর্বোল্লিখিত

১৩। পূর্বোল্লিখিত

১৪। পূর্বোল্লিখিত

১৫। পূর্বোল্লিখিত

হারানো ছেলেবেলা ঃ উনিশ শতকের বঙ্গরমণীদের জীবনে

অরুন্ধতী রায়

উনিশ শতকে হিন্দু ভদ্রলোক পরিবারের মেয়েদের ছেলে-বেলা কেমন কাটত এটা অনুসন্ধান কবতে গিয়ে দেখা যায় যে তাদেব ছেলেবেলাটা যেন খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই শেষ পর্যন্ত এই প্রবন্ধেব শিরোনাম হয়ে দাঁড়ায় "হারানো ছেলেবেলা" বা ছেলেবেলাহীনতার ইতিহাস। ছেলেবেলার যে বিশেষ কোন প্রয়োজন বা দাবী থাকতে পারে, এটা সে যুগেব রমণীদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত ছিল না। তাদের ছোটমেয়ে হিসাবে না দেখে 'ক্ষুদ্রনারী' হিসাবেই দেখা হত। তাদের হাসি-খেলাব অধিকাব, পড়াশোনা ও দেখাশুনার মাধ্যমে পৃথিবীটাকে জানার অধিকার, যার যা প্রতিভা তা বিকশিত করার অধিকার, কিছুই স্বীকৃত ছিল না। তাদের ছেলেবেলা কেড়ে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নারী বানিয়ে তোলাই ছিল পরিবার ও সমাজের উদ্দেশ্য। বাল্যবিবাহ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গিরিবালা দেবীর উপন্যাস 'রায়বাড়ি'তে দেখি বাড়ির বড় বউ বিনু সবে বারো পেরিয়ে তেরোয় পড়লেও শ্বশুর বাড়ির ধারণায় তার বয়সের কোন গাছপাথর নেই।[১] আসলে তখন মেয়েদের শ্রেণী বিভাজন ছিল কুমারী, সধবা, বিধবা, ইত্যাদি। অর্থাৎ পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কেব সূত্রে এই বিভাজন হত। ছোট মেয়ে শ্রেণী বা পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে সমাজে প্রাসঙ্গিক ছিল না।

হয়ত 'ছেলেবেলা' কথাটার মধ্যেই মেয়েদের অস্বীকৃতি নির্হিত আছে। তাই সম্প্রতি তসলিমা নাসরিন তাঁর ছেলেবেলার কথা লিখেছেন 'আমার মেয়েবেলা' নাম দিয়ে।[২] এই বঞ্চনাময় ছেলেবেলার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই নিবন্ধে দেওয়ার চেষ্টা করব, প্রধানতঃ সেযুগের সাহিত্য ও বিশেষ করে মেয়েদের আত্মজীবনীর উপর নির্ভর করে।

উনিশ শতকে কন্যাসন্তান ছিল জন্মলগ্নে অবাঞ্ছিত, তারপর অবহেলিত ও অনাদৃত, গলগ্রহের মতো। কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবীর এক বছরের ছেলের মৃত্যুর পর কন্যাসন্তান জন্মালে শাশুড়ী ব্যাজার মুখে বলেছিলেন-"সোনা হারিয়ে কাঁচ পেলাম।"[৩] সে যুগেব বিখ্যাত মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও পৌত্রী জন্মাতে রীতিমত শোকার্ত হয়েছিলেন।[৪] (এই পৌত্রী পরবর্তীকালের বিখ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবী)। বাড়িতে পরপর মেয়ে জন্মালে কি পরিস্থিতি হত তা জানিয়ে শরৎকুমারী চৌধুরাণী লিখেছেন-"তা মেয়ে হয়েছে শুনে দাদা বলে কেষ্ট আজি আর উঠতে পারি না। আমার গায়ে আর বলশক্তি নেই, মায়ের কাছে ধাই বিদায় চাইলে মা বিছানা থেকে উঠল না, কথা কইলে না, বৌ-মেয়ে তুলবে না, কত বলা

কওয়ায় কোলে নিলে তা বলে যে গলা টিপে দেব।"[৬]

মেয়ে ছিল বাপের বাড়িতে সাময়িক অতিথির মতো। মেয়ে বড় করা মানে ছিল বিয়ের জন্য তাকে প্রস্তুত করা। লেখাপড়া যতই চালু হোক আসল শিক্ষা বলে গণ্য হল গৃহকর্ম শিক্ষা, তারমধ্যে আবার প্রধান কাজ ছিল রান্না। এমনকি বিংশ শতকের গোড়াতেও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়ার বইস্বদেশ রেণু'তে দেখি জাতীয়তাবাদী খোকার জন্য বিদেশে গিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন ইত্যাদির উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু খুকুর জাতীয়তাবোধ জন্মানোর চেষ্টা হচ্ছে এই বলে-"ছি, ছি, ছি রাণী রাঁধতে শেখেনি...পরমান্ন রেঁধে বলে ফেন গালব কি ?" অনেক মেয়ে সাত-আট বছর বয়সেই মায়ের ডানহাত হয়ে উঠত। আঁতুড়ে মায়ের সেবা, ছোট ভাইবোনদের দেখাশুনা, জল তোলা, ঘর মোছা-সবই করত। পূজোর জোগাড় শেখাও মেয়েদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বিয়ের আগে বাপের বাড়িতে ফুল তোলা, দূর্বা, বিল্বপত্র সাজানো শেখার কথা আত্মজীবনীতে বলেছেন।[৬]

সাধারণভাবে মেয়েদের জীবন অন্দরমহলেই আবর্তিত হওয়ায় তাদের খেলাও ছিল প্রধানতঃ গৃহাভ্যন্তরে-গোলকধাম, ঘুঁটি দিয়ে বাঘবন্দী, লাউকাটাকাটি ইত্যাদি, পুতুল খেলা, ঘটা করে পুতুলের বিয়ে ইত্যাদি। নিজের জীবনে বিয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার এটা ছিল একটা উপায়। গ্রামে অবশ্য অনেকসময় মেয়েরা সাঁতার কাটা, হাডুডু, চোর-চোরও খেলত-এমনকি কখনো কখনো ছেলেরাও হত খেলার সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পে মৃন্ময়ীর বাল্যসঙ্গী, রাখাল এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।[৭] তবে সাধারণতঃ পুরুষদের সঙ্গে একটা দুস্তর ব্যবধান, লজ্জা ও সঙ্কোচের সম্পর্ক ছেলেবেলাতেই তৈরী হত। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছোট্ট বয়সে তাঁর পাঠশালায় পড়ার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন - "আমি লজ্জায় ভয়ে জড়ো হয়ে মুখ হেঁট করে বসে রইলুম, মনে হল চারিদিকে অপরিচিত মস্ত মস্ত পুরুষমানুষ।"[৮]

মেয়েদের সৃজনশীলতা বিকাশ হত চুলবাঁধা, কাঁথা সেলাই, কার্পেট বোনা, সিকে তৈরী, পুতুল গড়ার মধ্যে দিয়ে। পুতুলের মধ্যে আবার শিবগড়া হত বেশী। এটা তাৎপর্য্যপূর্ণ। এভাবেই ছোট মেয়েদের মধ্যে জেগে উঠত শিবের মতো বর পাওয়ার বাসনা। গানের চর্চার ক্ষেত্রে ঠাকুর বাড়ির মতো কোন কোন বাড়ির মেয়েরা-ইন্দিরা, প্রতিভা-অল্প অল্প করে প্রগতির পথে এগোচ্ছিল। কিন্তু সমাজ-প্রতিবন্ধকতার জন্য অগ্রসর হওয়া খুব একটা সহজ হয়নি। মেয়েদের মধ্যে গানের রেকর্ড প্রথম করেন চিত্তরঞ্জন দাসের বোন অমলা। নাচ, নাটক, অঙ্কন, লেখালেখি ইত্যাদি ছিল আরও কঠিন। সরলাদেবী চৌধুরাণীর কথায় "সেকালে তাল রেখে রেখে স্টেজের উপর এক-পা চলাও গর্হিত কাজ ছিল।[৯] তিনি রবীন্দ্রনাথের 'আয় তবে সহচরী...' গানের সঙ্গে ছোট মেয়েদের নাচের ধাঁচ ঢুকিয়ে সাহসের পরিচয় দেন।

মেয়েরা সুখী বিবাহিত জীবন, ভাল স্বামী, সন্তান, সতীনহীন সংসার ইত্যাদির জন্য নানা ব্রত-যমপুকুর, নিত্যসুন্দরী, পুণ্যিপুকুর, সেঁজুতি ইত্যাদি-পালন করত। শিশু বয়স থেকে বিয়েকেই তাদের জীবনের ধ্যানজ্ঞান করে তোলা হত। "যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে" ইত্যাদি ছড়া শুনে, "এটা কোর না, ওটা কোর না, করলে বিয়ে হবে না" ইত্যাদি

নিষেধাজ্ঞা শুনে তাদের বড় হয়ে ওঠা। বাড়ির বয়স্ক মেয়ে মহলে বেড়ে ওঠায় নানা কুসংস্কার ছোটবেলা থেকেই তাদের মনে ঢুকে যেত। তারা অনেকেই হয়ে উঠত কলহপ্রিয় - সেটাও ছিল পরবর্তীকালে যৌথ পবিবারে সংসাব-জীবনযাপনের ও ক্ষমতাব লড়াইয়ে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি।

বলাবাহুল্য মেয়েদের দিন কাটত অন্তঃপুরের অবরোধে, গ্রামের দিকে যদিবা তারা মাঠে-ঘাটে ঘোরা, পুকুরে সাঁতার কেটে বেড়ানো ইত্যাদির সুযোগ পেত, শহরে তা ছিল প্রশ্নাতীত। ঠাকুরবাড়ির মতো প্রগতিশীল পরিবারেও মেয়েবা কেবলমাত্র বিজয়া দশমীর দিন ছাতে ওঠার অধিকার পেত, তাতেই আত্মীয়স্বজন আপত্তি জানান।[১০] বড়জোর জানলা দিয়ে মেথর, ভিস্তিওয়ালা, বা ফেরিওয়ালাব দর্শন মেয়েদেব কানে বর্হিজগতের কিছু আভাস নিয়ে আসত। সুধাংশুবালা সরকার তারই মধ্যে একটু প্রগতিশীল পবিবারের মেয়ে ছিলেন বলে ফেরীওয়ালা ডেকে পুতুল বা চুড়ি কিনতে পারতেন। ট্রাম চালু হলে ট্রামও দেখতে যান।[১১]

উনিশ শতকের এই বালিকাদের একটা বিরাট অংশ ছিল বালিকা বধূ, শৈশবেব ইতিহাস রচনায় এদের উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণভাবে দু-একমাস থেকে বড়জোর ১০-১২ বছর ছিল বিয়ের বয়স। বাড়িতে বয়স্ক অবিবাহিত মেয়ে উপস্থিত থাকলে পরিবারকে জাতিচ্যুত হতে হত। উনিশ শতকে ৩৮ বছরের পাত্রের সঙ্গে ১৩ মাসের পাত্রীর ধামায় বসিয়ে বিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।[১২] কনে বিয়ের বাতে দুধ খাওয়ার জন্য মায়ে কাছে পালিয়ে গেছে-এমন গল্পও শোনা যায়।[১৩] আর একটু বেশী বয়স যদি হয় ও কিঞ্চিৎ বোধশক্তি যদি জেগে থাকে তো সে আরও বীভৎস অভিজ্ঞতা। অচেনা, অজানা পরিবেশে যাওয়ার ভয় তাদের গ্রাস কবত। বিয়ে প্রসঙ্গে 'বলির পাঁঠা' বা 'জবাই'-এর উল্লেখ তাই বারে বারেই এসেছে সেযুগের রমণীদের জীবনস্মৃতিতে।

বিয়ের পর বাপেব বাড়ি হল পর-সেটা খুব রূঢ়ভাবে মেয়েদের বুঝিয়ে দেওয়া হত। ১১ বছরের সদ্য বিবাহিত আমোদিনী দেবী বাপেরবাড়িতে এসে মায়ের কাছে বারবার একট আম খেতে চাইলেও আমটি তাকে না দিয়ে তার ছোটভাইকে দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয যে বিয়ের পর সে বাপের বাড়িতে সব অধিকার হারিয়েছে।[১৪] বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় একমুঠো চাল পিছনদিকে ছুঁড়ে দিয়ে বাপ-মা এর ঋণশোধ করার প্রথাতো আজও অনেকক্ষেত্রে চলে। অন্যদিকে শ্বশুরবাড়িও কিন্তু সহজে আপন হত না। পিতৃগৃহে যেটুকু স্বাধীনতা ছিল তা হারিয়ে অন্তঃপুরে শ্বাশুড়ী ও ননদদের কড়া নজবে, অজস্র নিযমকানুন মেনে, অবগুন্ঠনবতী অবস্থায় জীবনযাপন করতে হত। তাদের জোরে হাঁটা বা কথা বলা বারণ, ছাতে ওঠা বা অন্দবমহলের বাইরে বেরনো বারণ, এমনকি দিনের বেলা স্বামীর সামনে বের হওয়া বা তার সঙ্গে কথা বলাও বারণ। শ্বশুরবাড়িতে যথেষ্ট আদর-যত্ন পেয়েছিলেন একথা স্বীকার করেও বাংলার প্রথম মহিলা আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী দেবী বলেন- "আমোদ করিয়া লোক পাখি পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখে, আমার এখন সেই দশা ঘটিয়াছে, জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নাই।"[১৫] তাছাড়া আদর-যত্ন অধিকাংশ বালিকাবধূর কপালেই জুটত না। ধনীগৃহেও বধূদের দাসীদের মতো পরিশ্রম করানো হত। কেশবচন্দ্র সেনের মা সারদাদেবীকে দশ বছরে বিবাহিত হয়ে

এসে বাড়ি-ঘর নিজের হাতে মুছতে হত। ঘরমোছার ন্যাতাটা এত বড় ছিল যে তার ছোট্ট হাতে তা কুলাতো না। এতটুকু অমনোযোগ বা ত্রুটি দেখলে শাশুড়ীর হাতে লাঞ্ছনার সীমা থাকত না।[১৬] বালিকা বধূদের একটি বড় সমস্যা ছিল বাবা বা তারও বেশী বয়সের পুরুষের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন। এগারো বছরের আমোদিনী দেবী তার স্বামীকে ভয়ই পেতেন কারণ ৪৩ বছর বয়স্ক স্বামী তার কাছ থেকে পরিণত স্ত্রীর মতো আচরণই আশা করতেন। হরিমোহন মাইতির বালিকাবধূ ফুলমণির ধর্ষণজনিত মৃত্যু সহবাস সম্মতির বিতর্কের সঙ্গে জড়িয়ে কুখ্যাত হয়ে আছে। তাছাড়া ১২-১৩ বছর বয়স থেকে সন্তান হওয়া স্বাস্থ্যের দিক থেকে ক্ষতিকারক তো ছিলই, মানসিক দিক থেকেও তার প্রস্তুতি থাকত না। শরৎকুমারী চৌধুরাণী এদের দেখেই বলেছিলেন, "যে নিজেই মানুষ হয় নাই, সে সন্তানকে মানুষ করিবে কি"[১৭]

বাল্যবিবাহ সমাজে বালবিধবা সমস্যাকে প্রকট করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অল্প বয়েসি কন্যার সঙ্গে বৃদ্ধের বিবাহ প্রচলিত থাকায় তাদের স্ত্রীদের প্রায়ই বাল্যকালে বা যৌবনের প্রারম্ভে বৈধব্য জীবনে প্রবেশ করতে হত। বিয়ের দিনই বিধবা হয়ে পড়া, স্বামীকে আর কোনদিন না দেখা, শ্বশুর ঘর না করা বালিকা বিধবাকেও সমাজ নানা নিয়মের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল। সে যুগের সাহিত্যে বালবিধবাদের বিশেষতঃ তাদের একাদশীর নির্জলা উপবাসের অমানুষিক যন্ত্রণার বিবরণ অনেক পাওয়া যায়। দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনে (১৮৬৬ খ্রীঃ) বালবিধবা গৌরমণি বালবিধবাদের যন্ত্রণার কথা বলেছে- "একাদশীর উপবাসে আমাদের অঙ্গ জ্বলে যায়, পেটের ভিতর পাঁজাব আগুন জ্বলতে থাকে। জ্বর বিকারে এমন পিপাসা হয় না। ...আমি যখন সধবা ছিলেম, তখন তিনবার ভাত খেতেম, এখন একবার বই খেতে নাই, রেতে খিদেয় মরি তবু আর খেতে পাব না।"[১৮] সাম্প্রতিককালে লিখিত 'সেইসময়' উপন্যাসেও তো দেখি উনিশ শতকের বালিকা বিধবা বিন্দুবাসিনী একাদশীর দিন চোখের জল খেয়ে ফেলে পাপের আশঙ্কায় কাপড় দিয়ে জিভ মুছে নেয়।[১৯]

সমাজের অপর এক কুপ্রথা ছিল কৌলীন্য প্রথা। পাত্র পাওয়া দুঃসাধ্য বলে কুলীন কন্যাদের প্রায়ই অর্ধাশনে রাখা হত, যাতে তাড়াতাড়ি বড় না হয়। কোনরকমে একটা পাত্র পেলে, তা সে মৃত্যুপথযাত্রী হলেও, বাড়ির সব কুমারী মেয়ের একসঙ্গে বিবাহ দেওয়া হত-বয়স হয়ত তাদের ৫ থেকে ৫০, সম্পর্কে হয়ত তারা পিসী, ভাইঝি। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪ খ্রীঃ) নাটকে দেখি বাড়ির সবথেকে ছোট মেয়েকে খেলা থেকে ডেকে এনে যখন তার মা জানায় যে আজ দিদিদের সঙ্গে তারও বিয়ে তখন সে ভেবে নেয় আজ বাড়ির সমস্ত মেয়েলোকেরই বিয়ে, তাই সে তার মাকে প্রশ্ন করে "তোরও বিয়ে মা ?"[২০]

এতক্ষণ উনিশ শতকের মেয়েদের ছেলেবেলার যে কালাকাহিনীর বর্ণনা করলাম তার রঙটাকে কোথাও কোথাও একটু মোলায়েম করে আঁকার সুযোগ হয়ত আছে, তাতে কিন্তু ছবিটা মোটের ওপর খুব একটা পাল্টায় না। যেমন-স্বীয় সমাজের আওতা থেকে শারীরিকভাবে দূরে অবস্থান করেছে অর্থাৎ প্রবাসে কাটিয়েছে যে সব মেয়ে তাদের বিকাশ হয়ত কিছুটা সহজ হত। * পূর্ণশশী, বুন্দেলখণ্ডের মনোরমা, লাহোর প্রবাসী শরৎকুমারী প্রমুখের দৃষ্টান্ত

দেওয়া যায় এই প্রসঙ্গে। নিরুপমা দেবী মধ্য প্রদেশে পিতৃগৃহে কাটিয়েছিলেন জীবনের প্রথম ১৬ বছর। মায়ের প্রেরণায় বাংলা শেখেন ও কবিতা লিখতে থাকেন খাতা ভর্তি করে-১৬ বছর বয়সে কুচবিহার রাজবাড়িতে বিয়ে হয়ে অবশ্য মেয়েদের জীবন কেমন হওয়া উচিত তার অভিজ্ঞতা তাঁর হয়। পরিণতি অশান্তি ও বিবাহবিচ্ছেদ।[২১]

এমনকি এই বাংলাতেও অনেক ছোটমেয়ে ব্যক্তিগতস্তরে বাবা-মা বা পরিবার পরিজনের কাছ থেকে নিশ্চয়ই স্নেহ, ভালবাসা পেয়েছে। কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনীতে দেখি যে কন্যা জন্মাতে তিনি হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন, পরে তাকেই ক্রমে ভালবেসেছিলেন এবং তার মৃত্যুতে নিদারুণ শোকসন্তপ্ত হয়েছিলেন।[২২] বিদ্যাসাগরও তার কন্যা প্রভাবতীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তার মৃত্যু তাঁকে গভীর শোক দিয়েছিল।[২৮] রাসসুন্দরী দেবী, কিশোরীচাঁদ মিত্র ও কৈলাসবাসিনীদেবীর মেয়ে কুমুদিনী খুব আদরের ছিলেন। তবু মাত্র ১১ বছর বয়সেই কুমুদিনীর বিবাহ দেওয়া হয়।[২৪] আসলে ব্যক্তির উপরে ছিল সমাজ। তাই ছোট ছোট মেয়েদের জন্য রবীন্দ্রনাথের পিতৃহৃদয়ের দরদ তাঁকে দিয়ে অসাধারণ সব ছোটগল্প লেখালেও নিজের মেয়েদের কিন্তু খুব ছোট বয়সেই বিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর সমাজনিষ্ঠার পরিচয় দেন।

এছাড়া অবশ্যই উল্লেখ্য যে উনিশ শতকের সমাজসংস্কারকদের নানা উদ্যোগের ফলে একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছিল মেয়েদের জীবন তথা ছেলেবেলা। বাল্যবিবাহের বিরোধিতার ফলে মেয়েদের বিয়ের বয়স একটু হলেও বাড়ে। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের ফলে কিছু বালবিধবা পুনর্বিবাহিত হয়। তাছাড়া সংস্কার হয় শিক্ষা ক্ষেত্রে। অন্তঃপুর শিক্ষার পাশাপাশি অনেকে বিদ্যালয়েও যেতে থাকে। কিন্তু এসব সংস্কার ভদ্রলোকরা সকলে খুব ভালমনে গ্রহণ করেনি। সুতরাং এগুলির ফল যে ব্যাপকভাবে হাতে নাতে পাওয়া গিয়েছিল তা বলা যায় না। কিছু প্রগতিশীল পরিবারের মেয়েরা পড়াশুনোর সুযোগ, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি খানিকটা পায়, কিন্তু সে খুব সীমিত অর্থে। তার কারণ সমাজে পুরুষতন্ত্রের মুষ্ঠি কিন্তু কিছুমাত্র আলগা হয়নি। সমাজ সংস্কারকরা যা করেছেন, পুরুষতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই করেছেন। আসলে তাঁদের মাথাব্যথা ছিল জাতিগঠন। পুরুষতন্ত্রের পুর্নবিন্যাস ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী প্রকল্প। মেয়েদের বঞ্চনা তাঁদের কাছে ততো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, মেয়েদের ছেলেবেলাও তাঁদের কাছে বিশেষ কোন মর্যাদা পায়নি। ছোট মেয়েদের তাঁরা ভাবী সুমাতা, সুগৃহিণী হিসাবেই দেখতেন। মেয়েরা যাতে এইসব ভূমিকা ঠিকমত পালন করতে পারে শুধু সেইজন্য কিছু সংস্কার তাঁরা করতে চেয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষদিকে যে পুরুষতন্ত্রের বজ্রমুষ্ঠি আরই কঠিন হয়ে আসে সে প্রমাণও পাওয়া যায়। সহবাস সম্মতি বিল এইজন্যই প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। বিয়ের বয়সও এই সময় আবার কমে আসে।[২৫]

বিভিন্ন পরিবারও যে উনিশ শতকে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে আগ্রহী হয় তা মেয়েদের নিজেদের বিকাশের জন্য ততোটা নয়, যতটা নব্য শিক্ষিত যুবকদের স্ত্রী হিসাবে তাদের গড়ে তোলার জন্য। তাই মা মেয়েকে এই বলে তাগাদা করতেন, "পড়তে বোস, তা নইলে বিয়ে হবে না।" যুবক স্বামী পিতৃগৃহবাসী বালিকাবধূকে পডানোর জন্য বর্ণপরিচয়, বোধোদয় ইত্যাদি

কিনে এনে দিত শ্যালকদের হাতে। পরস্পর বিরোধী শোনালেও একথা সত্যি যে এই একই চাহিদার আর একটি দিক ছিল সেইসময় পণ প্রথার ব্যাপক বৃদ্ধি। অর্থাৎ শিক্ষিত যুবকদের যেমন যথোপযুক্ত শিক্ষিত স্ত্রী চাই, তেমনি স্ত্রীর পিতার কাছে যথোচিত পণও চাই।

কিন্তু যতই সীমিত উদ্দেশ্য ও পরিসরে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হোক না কেন, এই শিক্ষাটুকুই অনেক ক্ষেত্রে জিয়নকাঠি হয়ে মেয়েদের ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে দেয়। তাদের গভীরতর মুক্তির সন্ধান দেয়। মেয়েদের অজস্র আত্মজীবনী মূলক রচনাই তার প্রমাণ। এই যে তারা আদৌ নিজেদের কথা লিখতে চেয়েছে ও পেরেছে, বাক্যগঠনে ও বানানে অনেক ভুল করেও শুধু অন্তরের তাগিদে লিখে গেছে-এটাই তার প্রমাণ, প্রধানতঃ এইসব অন্তরঙ্গ লেখা থেকেই আমরা সে যুগের মেয়েদের ছেলেবেলার ইতিহাস পুনর্গঠিত করতে পেরেছি। সমাজ-সংস্কারকরা যখন বাল্যবিবাহের নিন্দা করেছেন তখন এইসব যুক্তি দিয়েছেন যে বাল্যবিবাহ সংসারধর্মে ব্যাঘাত করে, অপুষ্ট সন্তানের জন্ম দেয়, ইত্যাদি। আজন্ম-পরিচিত পরিবার-পরিজন থেকে একটি কচি মেয়েকে শিকড় উপড়ে নিয়ে আসায় তার মনে যে নিদারুণ অনিশ্চয়তা ও যন্ত্রণা তা ধরা পড়েছে মেয়েদেরই কলমে। এই সমস্ত বাচ্চা মেয়েদের মানসিক কষ্ট সমাজ-সংস্কারকদের বিবেচ্য ছিল না। তাঁদের কাছে মেয়েরা ছিল একটি সামাজিক সমস্যা, জাতি গঠনের উপাদান; মেয়েদের নিজেদের কাছে স্বভাবতই কিছু বেশী। তাই শুধু বঞ্চনার কথা নয়, যখন যেটুকু ছেলেবেলা তারা চুরি করে নিতে পেরেছে একটু বেরোনো, কি পায়রা ধরা, কি ফেরীওয়ালা ডেকে পুতুল কেনা-সেই অনাপাত তুচ্ছ কথাটুকু তারা আত্মকথায় সাগ্রহে লিখে গেছে।

সূত্র নির্দেশ

১। দ্রষ্টব্য, গিরিবালা দেবী, রায়বাড়ি, দে'জ পাবলিশিং (প্রথম সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৯১
২। আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে কয়েকটি পর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধ।
৩। কৈলাসবাসিনী দেবী, 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী', এক্ষণ, শারদীয়, ১৩৮৮
৪। চিত্রা দেব, অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৪
৫। দ্রঃ শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৫৭
৬। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতি কথা', এক্ষণ, শারদীয়, ১৩৯৭
৭। দ্রঃ রবীন্দ্ররচনাবলীর 'গল্পগুচ্ছ' অংশ পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের সপ্তম খণ্ড।
৮। দ্রঃ 'স্মৃতিকথা', পূর্বোক্ত
৯। সরলাদেবী চৌধুরাণী, জীবনের ঝরাপাতা, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৮৭৯ শক।
১০। সৌদামিনি দেবী, 'পিতৃস্মৃতি', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮।
১১। সুধাংশুবালা সরকার, 'স্মৃতির মালিকা', এক্ষণ শারদীয়, ১৩৮৯
১২। গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, মে, ১৮৭৩।
১৩। দ্রঃ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, 'জীবনকথা', এক্ষণ শারদীয়, ১৩৯৭

১৪। আমোদিনী দেবী, 'আমার জীবন-কাহিনী', এক্ষণ, শারদীয়, ১৩৯৭

১৫। রাসসুন্দরী দেবী, 'আমার জীবন', আত্মকথা (প্রথম খণ্ড), অনন্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮১

১৬। সারদাসুন্দরী দেবীর 'আত্মকথা', আত্মকথা ১ম খণ্ডের অন্তর্গত।

১৭। দ্র: শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী, পূর্বোক্ত।

১৮। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', দ্র: দীনবন্ধু রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ (২য় মুদ্রণ), কলকাতা, ১৯৮১।

১৯। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সেই সময়, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা, ১৩৯৮।

২০। রামনারায়ণ তর্করত্ন, কুলীন কুলসর্বস্ব, ১৮৫৪

২১। নিরুপমা দেবী, 'আমার জীবন: সাহিত্য সাধনার স্মৃতি', এক্ষণ, শারদীয়, ১৪০১

২২। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, 'আত্মজীবনচরিত', আত্মকথা প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত।

২৩। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ', বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, ১৯৭২

২৪। দ্র: কৈলাসবাসিনী দেবী, 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী,' পূর্বোক্ত।

২৫। B:Golam Murshid, Reluctant Debutante: Response of Bengali Woman to Modernization, 1849-1905, Sahitya Samsad, Rajsahi University, 1983.

নারী শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিবেদিতা

সব্যসাচী ভট্টাচার্য

উনবিংশ শতকের একেবারে শেষলগ্নে ১৮৯৮ সালের বিদেশিনীর আবির্ভাবে ভারতবর্ষের নারীজাতি সামগ্রিক শিক্ষা লাভ করলো, জাতীয় আন্দোলন প্রাণ পেল এবং সমাজে বহুবিধ পরিবর্তন সাধিত হল, তিনি হলেন নিবেদিতা।

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ছিলেন নিবেদিতা। স্বামীজি ভারতের নারী শিক্ষা ও নারীদের মুক্তির জন্যেই নিবেদিতাকে প্রস্তুত করেছিলেন। স্বামীজি চাইতেন নিবেদিতা ধর্মকর্ম ও অন্যান্য কার্যে আবদ্ধ না থেকে দেশের কাজে মন দিন। স্বামীজি চেয়েছিলেন দেশের মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক, কারণ মেয়েরা লেখাপড়া না জানলে সমাজের অধিকাংশের যেমন উন্নতি হবে না, তেমনি ভারতের ভবিষ্যতের নাগরিকদেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কারণ মা-ই সন্তানকে গড়ে তুলতে পারে, শিক্ষিত করবার প্রধান দায়িত্ব মায়েরই।[১] নিবেদিতা তাঁর গুরুর এই মনোভাব জানতেন। তিনি লিখেছিলেন 'প্রথম সুযোগেই কলকাতায় একটা মেয়েদের বিদ্যালয় খোলা ছিল আমার ইচ্ছা।'[২] কারণ একমাত্র এই পথেই বিবেকানন্দের স্বপ্নকে সার্থক করবার সুযোগ তাঁর ছিল।

নিবেদিতার "শিক্ষাই চরম লক্ষ্য' - কারণ তিনি আত্মমুক্তির সহায়ক। নারীপুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষাই প্রয়োজন।" মনোভাবকে গ্রহণ করেই নারী শিক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়া হয়েছিল বলে শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন। তিনি বলেছেন যে ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর নিবেদিতা এই মনোভাবকে কেন্দ্র করেই প্রথম বিদ্যালয় খোলেন। নিবেদিতা এর নামকরণ করেছিলেন 'রামকৃষ্ণ স্কুল।' এই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ছিল আদর্শ ভারতীয় নারী গড়ে তোলা। তাই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ধর্মীয় বিষয় এই বিদ্যালয়ে যেমন শেখানো হত তেমনি শেখানো হত মাটির কাজ, বাটিক কাজ, মূর্তি গড়ার কাজ, সেলাই, ছবি আঁকা, ছোট খাটো শিল্প ইত্যাদি।[৩] এই বিদ্যালয়ের নারীদের বেদপাঠও শেখানো হত। মেয়েরা যাতে ভবিষ্যতে উপার্জন করতে পারে তার জন্যেই তাদের হাতের কাজ শেখানো হত। তাছাড়া নূতন শৈল্পিক ধারা, রুচি, ঐতিহ্য গড়ে তুলতে এবং নারী মনের নানা অংশের বিকাশ ঘটাবার জন্যেও নিবেদিতা হাতের কাজের উপরে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন বলে মনে হয়।[৪]

নিবেদিতা নূতন ধরণের শিক্ষা পদ্ধতির সন্ধান করে ছিলেন। পরম্পরাগত ধারণার সঙ্গে মিশিয়ে ছিলেন নিজস্ব চেতনা। নিবেদিতা এদেশে নারী শিক্ষার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে

যুক্ত করবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ চালাবার মত কিছু কিছু বাংলা ভাষাও শিখে নিয়েছিলেন। সরলাবালা সরকার বলেছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সব ক্ষেত্রেই নিবেদিতা স্বয়ং থাকতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মনের বিকাশ ঘটাতে তিনি তাদের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে নির্বাচিত গল্প শোনাতেন, তেমনি ভারতীয় নারীর নৈতিকতা, ত্যাগ, আদর্শ, সাহসিকতা এবং সর্বোপরি তাদের ধর্মপরায়ণতার কথাও বিশেষভাবে বলতেন।'Future Education of Indian Woman' প্রবন্ধে নিবেদিতা হিন্দু রমণীদের অতীত সম্পদের কথা স্মরণ করে মেয়েদের জেগে ওঠার জন্যেও জোরালো ভাষায় ডাক দিয়েছিলেন।

নিবেদিতার প্রথম জীবনীকার সরলাবালা সরকারের রচনা থেকে জানতে পারা যায় যে কোন বিদেশি রচনা বা চিত্রের অপেক্ষা কোন ছাত্রীর নিজস্ব রচনা, শিল্পসামগ্রী বা চিত্র তাঁর অধিকতর প্রিয় ছিল।[৫] বহু রক্ষণশীল পরিবারের পুরুষরা প্রথমে নারীদের শিক্ষার বিরোধী হলেও সে বাধা অতিক্রম করেছিলেন নিবেদিতা। পরবর্তীকালে রক্ষণশীল পরিবারের মহিলাদের শিক্ষার অঙ্গণে টেনে আনতেও তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৯০৩ সালের পরবর্তীকালে বয়স্কা ও বিধবাদের সেলাই, খাদ্যবস্তু তৈরী যেমন আচার, কাসুন্দি, চাটনি তৈরি করে উপার্জন করতে পারার দিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। মহিলারা এইসব জিনিস গুলি তৈরি করে অর্থনৈতিক ভাবে যাতে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে সেটাই ছিল লক্ষ্য। নিবেদিতা তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে ভারতীয় নারীদের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে তাদের মুক্তির উজ্জ্বল সূর্যকে দেখতে পেয়েছিলেন।

শুধু নারী শিক্ষাই নয়, সমাজের অ-শিক্ষা, কু-শিক্ষা ও দূর করতে নিবেদিতা এগিয়ে এসেছিলেন। একই সঙ্গে জঞ্জাল পরিষ্কার, প্লেগ ইত্যাদি রোগের দিনে নিবেদিতার যে অক্লান্ত সেবা সেকথাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে।[৬] আজ যে দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণ সেবার কথা মানুষ বলে, নিবেদিতাই তা যথার্থভাবে দেখাতে পেরেছিলেন। আজ সমাজ হিতৈষণা, সংস্কার উৎসবের আকার নিয়েছে, কিন্তু নিবেদিতা যে আদর্শ নিয়ে সমাজ সংস্কারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার তুলনা নেই।

স্বাধীনতা লাভ করবার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। যদি আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাটি বিশ্লেষণ করি তবে আমাদের চোখে ধরা দেবে সেই নিবেদিতা, যে শ্বেতাঙ্গিনী হয়েও নিজেরই স্বজাতি ইংরেজদেরও আঘাত হেনেছিলেন। নিবেদিতার জন্ম হয়েছিল আয়ারল্যাণ্ডে। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার বীজ ছিল তাঁর রক্তে। ঐ সময়ে ভারতে যে জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সেই জাতীয় আন্দোলন তাঁর কাছে শুধুমাত্র 'ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন', 'রাজনৈতিক আন্দোলন' ছিল না, এটা ছিল দেশাত্মবোধের সাধনা।

ওকাকুরার সাহায্য নিয়ে ভারতে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে নিবেদিতা স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আত্মবিশ্বাসী নিবেদিতা নিজের আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ভারতের নবপ্রজন্মকে জাগ্রত করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। নিবেদিতার 'Kali the Mother' পুস্তকটির মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তথা আন্দোলনের নেতারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর 'Kali The Mother' দ্বারা প্রভাবিত

হয়েছিলেন বলে জানতে পারা যায়।[৭]

নিবেদিতা খুব ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন। জাতীয়তাবাদের প্রসারের ক্ষেত্রে নিবেদিতার প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।[৮] ১৯০২-৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিবেদিতা যে সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যে সকল রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তার দ্বারা জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লবীচেতনারও প্রসার ঘটে। তবে সব আন্দোলনের ক্ষেত্রেই তিনি পিছন থেকে সাহস জুগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। জাতীয়তা শব্দটা তাঁর কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা দেখা যায় 'ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ ! মা, মা, মা !...তোমরা সকলে জপ করবে-ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ !' ভারতবর্ষ ছিল তাঁর প্রাণের থেকেও প্রিয়, তিনি সেই ভারতবর্ষের মুক্তি চেয়েছিলেন।[৯]

নিবেদিতা বিদেশ থেকে জাতীয়তা বিষয়ক পুস্তক এনে পড়তেন এবং এই পুস্তকগুলি তিনি বাংলার গুপ্তসমিতি, সন্ত্রাসবাদী সমিতিকে দান করেছিলেন বলে জানা যায়। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের রচনা থেকে জানতে পারা যায় নিবেদিতার সঙ্গে বাংলার গুপ্ত সমিতির ঘনিষ্ট যোগ ছিল। তাঁর পুস্তকগুলিই ছিল প্রেরণার উৎসস্থল। নিবেদিতা নিজেও খোলা মঞ্চ থেকে নির্ভীক বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন এবং স্বদেশ ও বয়কটনীতির প্রচার করেছিলেন। নিবেদিতা এই সব কারণে সবসময়েই গোয়েন্দা পুলিশের নজরে ছিলেন।

নিবেদিতা কখনোই চাইতেন না ইংরাজদের সঙ্গে কোনও ধরণের সমঝোতা করা হোক। তিনি নিজেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের জন্য ইংরেজদের সমর্থন ও সাহায্য গ্রহণ করেননি। ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয়ের জন্য সরকারি সাহায্য যাতে গ্রহণ করা না হয় নিবেদিতা সেটাই চেয়েছিলেন। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভারতের জন্য এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্যে আত্মনিবেদন করে দেবার মত এমন মানুষ এর পূর্বে বেশী দেখা যায়নি।

সূত্র নির্দেশ

১। শঙ্করের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 'দেশ' নিবেদিতা সংখ্যা (১৯৯৮)
২। বর্তমান সাপ্তাহিক-নিবেদিতা বিদ্যালয় শতবার্ষিক সংখ্যা (১৯৯৮)।
৩। 'দেশ' নিবেদিতা সংখ্যা (১৯৯৮)।
৪। শঙ্করী প্রসাদ বসু 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিক নিবন্ধ।
৫। সরলাবালা সরকার। রচনা সংগ্রহ (১৯৮৮)
৬। শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'নিবেদিতা লোকমাতা' (১৯৯৫)
৭। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 'অগ্নিযুগ' (প্রথম খণ্ড)
৮। 'দেশ' নিবেদিতা সংখ্যা (১৯৯৮)
৯। শঙ্করী প্রসাদ বসু 'নিবেদিতা লোকমাতা' (১৯৯৫)।

উনিশ শতকে পত্রপত্রিকা সম্পাদনায় বঙ্গনারী

মৃদুচ্ছন্দা পালিত

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইংরেজি সংবাদপত্রের অনুকরণে বাংলা তথা ভারতের সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র হল ১৭৮৯ সালের ২৯শে জানুয়ারী হিকি কর্তৃক প্রকাশিত 'বেঙ্গল গেজেট'। তারপর 'ইন্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'হরকরা' ইত্যাদি আরও কয়েকটি স্বল্পায়ু সংবাদপত্রের জন্ম হয়। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম পত্রিকার নাম ছিল 'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮)। এরপর সমাচার দর্পণ (১৮১৮), সম্বাদ কৌমুদী (১৮২২), সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২), সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের প্রথমে মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদের উন্মেষে সামাজিক কুসংস্কার দূরীভূত করে ধর্মসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল সারা শতক ধরে পত্রপত্রিকা প্রকাশ তার একট মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। সেই সময় এই পত্রিকাগুলিতে শুধু সংবাদ পরিবেশন নয়, সংস্কারবাদী ও তার বিরোধীচিন্তারও প্রতিফলন দেখা যায়। শতকের প্রথমার্ধে সতীদাহপ্রথা নিবারণ, বাল্যবিবাহ বিরোধিতা, বিধবাবিবাহ প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, মহিলাদের আইনের আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বঙ্গনারী বাংলা পত্রপত্রিকায় আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিলেন। ক্রমে কিছু উদারপন্থী মানুষ এবং বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজসংস্কারকেরা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্ত্রীলোকেদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোক বিস্তারের জন্য শুধু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নয়, পত্রপত্রিকাতেও তাঁদের লেখনী ধারণ করেছিলেন। কলকাতা থেকে মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪) বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৩) জ্যোতিরিঙ্গণ (১৮৬৯) অবলাবান্ধব (১৮৭৯) হেমলতা (১৮৭৩) বঙ্গমহিলা (১৮৭৫) দাসী (১৮৯২); ঢাকা থেকে নারী-শিক্ষা-পত্রিকা (১৮৭৯) বরিশাল থেকে বালারঞ্জিকা (১৮৭৩); মুরারীপুর গয়া থেকে সাবিত্রী (১৮৯৬) ইত্যাদি পত্রিকাগুলি দ্বিবিধ উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। ১। নীতিগতভাবে পুরুষ ও নারী সমান অতএব তাদের সকলকেই জ্ঞান ও শিক্ষা বিতরণ করা উচিত। ২। নারী গৃহকোণে থাকবে এবং সেই গৃহকে পরিপূর্ণতা ও শিক্ষিত স্বামীকে সাহচর্যদানের জন্য শিক্ষালাভ করবে- সে শিক্ষা মূলত নীতিশিক্ষা ও কিছু সাহিত্য পাঠ। পুরুষরা মনে করতেন নিম্নমানের বুদ্ধির অধিকারিণীদের সচেতন করার পবিত্র দায়িত্ব তাঁদেরই। সেই জন্যই নব্যবঙ্গীয় রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের মত দুজন ডিরোজিও শিষ্য প্রথম মহিলাদের জন্য কথ্য ভাষায় লিখিত 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) প্রকাশ করেন। সৌভাগ্যের বিষয় সেইজন্যই আমরা 'আলালের

ঘরে দুলাল' বইটি পেয়েছিলাম। মহিলাদের সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (১৮৬৩) ও 'হেমলতা' (১৮৭৩) পত্রিকার সম্পাদকরা। নারীর উন্নতিবিধানে ও শিক্ষাপ্রসারে ব্রতী হয়েছিল 'অবলাবান্ধব' (১৮৭৯), 'বঙ্গমহিলা' (১৮৭৫) এবং ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত 'যোগিনী', 'সহচরী' ও 'ললনাসুন্দরী' প্রভৃতি প্রত্রিকাগুলি। আদর্শ নারী হওয়ার শিক্ষাদানের জন্য আরও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন- 'সেবার ভাব জোগাইবার' জন্য 'দাসী' (১৮৯২), 'সৎশিক্ষা দানের' জন্য 'মহিলা' (১৮৯৫), 'সতী' হওয়ার জন্য 'সাবিত্রী' (১৮৯৬)। তাঁদের গৃহকর্মে শিক্ষিত করে তোলার জন্য 'বিবিধতত্ত্ব' (১৮৮৫), গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (১৮৮৬) ও 'গৃহীসখা' (১৮৮৫) প্রকাশিত হয়েছিল। অতএব উদারপন্থী পুরুষেরা যে নারীদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেছিলেন একথা স্বীকার্য তবে একথাও আমাদের বলতে হবে যে নারীর আলাদা অস্তিত্ব তাঁদের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি।

বঙ্গমহিলারা নিজেরাই নিজেদের কথা বলেছিলেন। কিন্তু কিভাবে, কতদূর কি করেছিলেন এবং কতটা সফল হয়েছিলেন সে কথাই এখানে আমাদের আলোচ্য। ১৮৭০ সালে প্রথম মহিলা সম্পাদিত পাক্ষিক 'বঙ্গমহিলা' পত্রিকাটি মহিলাদের শিক্ষিত করার প্রয়াসে অথবা তাদের সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রকাশিত হয়নি। সম্পাদিকা মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায় "স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব প্রভৃতি সমর্থন করা" পত্রিকাটির উদ্দেশ্য একথাই লিখেছিলেন। অর্থাৎ এই পত্রিকার মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর আইনের অধিকার সমান এই কথাটিই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছিল একথা আমরা বলতে পারি। যে সময় নারী পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্টজীব বলে সমাজে চিহ্নিত ছিল সেখানে নারীর নিজের এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ তাকে এবিষয়ে সচেতন করেনি, সে নিজেই সচেতন হয়েছিল।

কালানুক্রমিকভাবে বঙ্গমহিলা সম্পাদিত পরবর্তী পত্রিকাটি ছিল ১৮৭৫ সালে আজিমগঞ্জের ধুলিয়ান থেকে থাকমণি দেবীর সম্পাদনায় মাসিক 'অনাথিনী'। পত্রিকাটির বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা না গেলেও এটির গুরুত্ব আছে। প্রথমত এটি মহিলা সম্পাদিত প্রথম মাসিক পত্রিকা ও দ্বিতীয়ত পত্রিকাটি কলকাতা নয় ধুলিয়ান থেকে প্রকাশিত। শুধু শহর কলকাতায় নয় মফস্বলেও যে এক মহিলা সম্পাদনাকর্মে নিয়োজিত ছিলেন তারই নিদর্শন এই পত্রিকাটি। কিন্তু নামটি যে কেন 'অনাথিনী' তা জানা যায়নি।

স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর দুই কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকাটি বঙ্গমহিলা কর্তৃক পত্রিকা সম্পাদনার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১৮৭৭ সালে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে শুরু করলেও ১৮৮৪ থেকে দীর্ঘ ১৪ বছর মাতা ও তাঁর দুই কন্যা এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন। যদিও 'বামাবোধিনী পত্রিকার' একটি উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গমহিলাদের সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণকুমারী দেবীই প্রথম তাদের শক্তিকে সাহিত্যক্ষেত্রের সকল দিকে জাগ্রত করেছিলেন। সরলা দেবীও তাঁর মাতারই মত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও জ্ঞান একই সঙ্গে এই পত্রিকার মাধ্যমে পরিবেশন করে একটি পরিশীলিত পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। লেখকদের পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রথা এই বঙ্গরমণী প্রথম প্রবর্তন করে পত্রিকা সম্পাদনার

ইতিহাসে এক নতুন নজির সৃষ্টি করেন। 'ভারতী' পত্রিকা শুধু মেয়েদের জন্য প্রকাশিত হত না। সাধারণ পাঠকদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ নয় তাদের সমমর্যাদা দান করেছিলেন এই সম্পাদিকারা।

সমসাময়িককালে 'পরিচারিকা' নামে একটি স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকা ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। কয়েক বছর পরে ১৮৮৭ সালে কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধু মোহিনী দেবী তার সম্পাদিকা হন। মোহিনীদেবীর মৃত্যুর পর কেশবচন্দ্র সেনের দুই কন্যা সুচারুদেবী ও মণিকাদেবী পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন। 'পরিচারিকা'র গুরুত্ব হলো দশ বছরের বেশি সময় এটি মহিলাদের দ্বারা মহিলাদের জন্য পরিচালিত হয়েছিল। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল কুমারী কামিনী শীলের সম্পাদনায় 'খৃষ্টীয় মহিলা' নামে একটি মহিলা পত্রিকা। এই পত্রিকার বিশেষত্ব ছিল যে এখানে কেবলমাত্র মহিলাদের রচনাই স্থান পেত। কয়েক বছর পরে ১৮৮৪ সালে 'সোহাগিনী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে। এই পত্রিকাগুলি বিশদ বিবরণ অথবা কতদিন সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল জানতে না পারলেও একথা বলতে পরি যে বঙ্গমহিলারা ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছিলেন তাঁদের নিজস্বতা নিয়ে এগুলি তার প্রমাণ।

উনিশ শতকের শেষে 'ভাবতী'র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী, হিরন্ময়ী, সরলা ছাড়াও ঠাকুরবাড়িব অন্ত:পুরের আরও দুই মহিলারা নাম সম্পাদনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও এক পৌত্রী প্রজ্ঞাসুন্দবী দেবী। বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম একটি বাল্যপাঠ্য পত্রিকা ১৮৮৫ সালে জ্ঞানদানন্দিনী সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটির নাম ছিল 'বালক'। বালক বালিকারদের জন্য প্রকাশিত হলেও সেটি বয়স্ক পাঠকদেরও চিন্তার খোরাক যোগাতো ও সাহিত্যরস পরিবেশন করতো। এই পত্রিকার বিষয়ের বৈচিত্র্য ও বিন্যাস এবং চিন্তার বহুমুখিতা আমাদের বিস্মিত করে। তার জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য জ্ঞানদানন্দিনী নাম্নী বঙ্গরমনীটিব। হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরীদেবীর সম্পাদনায় ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'পূণ্য' পত্রিকাটি। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন। বর্তমানকালে শুধু নারীর জন্য ব্যয়বহুল অনেক পত্রিকা আমরা দেখতে পাই যারা একই সঙ্গে সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পচর্চা, রূপচর্চা এবং বিনোদনের বিভিন্ন পসরা পরিবেশন করার চেষ্টা করে। আজ থেকে একশ বছর বেশি আগে প্রজ্ঞাসুন্দরী প্রায় এই রকমভাবেই 'পুণ্য' পত্রিকার বিন্যাস রচনা করতেন। অবশ্য শুধু নারী নয় নরনারী উভয়ের জন্যই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তার উদ্দেশ্য এইভাবে ঘোষিত হয়েছিল-"এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে। ইহাতে গার্হস্থ্যধর্মের অনুকূল শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিও অভাব দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা হইবে।" প্রজ্ঞাসুন্দরীদেবী আসামের লক্ষ্মীকান্ত বেজবড়ুয়ার ঘরণী হয়েছিলেন। তাঁর অন্যান্য বোনেরাও কেউ কেউ বিবাহের পর বাংলার বাইরে যান এবং তাঁদের মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত রন্ধনপ্রণালী আবার ধর্মচিন্তার কথাও এই পত্রিকাটিতে পরিবেশিত হত। কোন বঙ্গদেশীয় পুরুষ নয় এক বঙ্গনারীর সম্পাদনায় এই রকম সামগ্রিক

দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল উনিশ শতকের শেষে যা আজও বঙ্গরমণীর পক্ষে শ্লাঘনীয়।

একই বছরে প্রকাশিত 'অন্তঃপুর' নামক মাসিক পত্রিকাটির মাধ্যমে বঙ্গমহিলাদেব চিন্তার স্বচ্ছতা পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হয়েছিল। কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত 'অন্তঃপুর' পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদিকা ছিলেন বনলতাদেবী। চার বছর পরে তাঁর মৃত্যু হলে পত্রিকাটি বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত হেমন্তকুমারীদেবী, কুমুদিনী মিত্র, লীলাবতী মিত্রেব দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। নারীদের শুধু নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্রাহ্মনেতা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বনলতাদেবী এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন না। মহিলাদের সমস্যা এবং তাদের উন্নতিবিধানের জন্য জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে এই পত্রিকায় আলোচনা প্রকাশিত হত। সাহিত্যও পরিবেশিত হত 'পরিচারিকা'তে। এই পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্গনারী নিজের 'স্বাজাত্য'কে উপলব্ধি করেছিল।

উনিশ শতকের বঙ্গনারী নিশ্চয়ই সামান্য সংখ্যক পুরুষের সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁদের আলোকপ্রাপ্ত জীবনলাভের জন্য। সমাজের উন্নতিবিধানে তথা নারীর উন্নতিবিধানে উদারপন্থী কিছু মানুষ এবং ব্রাহ্মনেতৃবর্গ ও যুববৃন্দ সচেষ্ট ছিলেন। তাই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেব জন্য বিদ্যালয় স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার মাধ্যমে তাদের আলোকিত করতে তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন। সে আলো আদর্শ গৃহিনী ও আদর্শ মা হওয়ার নীতিশিক্ষার আলো। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় অথবা জানকীনাথ ঘোষালের মত পুরুষ খুব কমই ছিলেন যাঁরা নারীকে সমমর্যাদা দান করতেন। শতকের প্রথমার্ধে যে বঙ্গনারী পত্রপত্রিকায় শুধু আলোচনার বস্তু ছিলেন ক্রমে দ্বিতীয়ার্ধে তাঁরাই লেখিকা ও সম্পাদিকারূপে নতুন নতুন পত্রিকা প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছিলেন। 'মাসিক পত্রিকা', 'অবলাবান্ধব', 'বামাবোধিনী পত্রিকা' ইত্যাদি পুরুষ সম্পাদিত পত্রিকাগুলি নারীর উন্নতিবিধানে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু বঙ্গনারী পুরুষের সমপর্যায়ে উপনীত হয়েছিল সাহিত্যচর্চায় ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্বেষণে তাঁদের সম্পাদিত বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে। প্রথম মহিলা সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা 'বঙ্গমহিলা' নারীর আইনের অধিকার নিয়ে কথা বলেছিল। 'খৃষ্টীয় মহিলা' পত্রিকা শুধু মেয়েদেরই লেখা প্রকাশ করত। 'ভারতী', 'পরিচারিকা', 'পুণ্য', 'অন্তঃপুর' পত্রিকাগুলিতে সম্পাদিকারা শুধু সাহিত্যচর্চা করেননি, নারীর সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তার গৃহকোণটুকুও সৌন্দর্যমন্ডিত করার চেষ্টা করেছেন। নারী সমাজে ও গৃহে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগ্রহণ করে সেকথা নারীদের সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হয়েছিল এবং নারী যে আপন মূল্য অনুধাবন করেছিল সে কথা আজ আমাদের স্মরণ করা উচিত। নারী নিজেই নিজেকে আবিষ্কার করেছিল-তাদের সম্পাদিত পত্রপত্রিকা ছিল তাদের চিন্তা ও কর্মের ধারক ও বাহক। পুরুষ-সম্পাদিত পত্রিকাগুলির সঙ্গে এখানেই তাদের পার্থক্য। এভাবেই বঙ্গনারী সম্পাদনার ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি তাব যাত্রা শুরু করেছিল।

উনিশ শতকে প্রকাশিত নারী-সম্পর্কিত পত্রপত্রিকার তালিকা

পুরুষ সম্পাদিত পত্রিকা :

১। মাসিক পত্রিকা (মাসিক) - প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৫৪

২। বামাবোধিনী পত্রিকা (মাসিক) - উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৬৩

৩। জ্যোতিরিঙ্গন (মাসিক) - অজানা, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৬৯

৪। অবলাবান্ধব (মাসিক) - দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৭৯

৫। নারী-শিক্ষা পত্রিকা - অজানা, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৭৩

৬। বালারঞ্জিকা (সাপ্তাহিক)-স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকা, অজানা, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৭৩

৭। হেমলতা (পাক্ষিক) - মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৭৩

৮। পরিচারিকা (মাসিক) - প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৭৮

৯। যোগিনী (মাসিক) - পরিচালক উমাশঙ্কব বাগচি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৩

১০। ললনা সুন্দরী (মাসিক) - পরিচালক মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৩

১১। সহচরী (মাসিক) - বীরেশ্বর পান্ডে সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৩

১২। বালিকা (মাসিক) - অক্ষয়কুমার গুপ্ত সম্পাদিত, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৩

১৩। প্রসূতিশিক্ষা নাটক - প্রমথনাথ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৫

১৪। বঙ্গবালা (মাসিক) - কালীচরণ বসু সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৫

১৫। বিবিধতত্ত্ব (মাসিক) - রামকুমার নাথ সরকার কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৫

১৬। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (মাসিক) - অমৃতলাল বসু সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৬

১৭। গৃহীসখা (মাসিক) - হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৮

১৮। দাসী (মাসিক) - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৯২

১৯। মহিলা (মাসিক) - ভাই গিরিশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, মুরারপুর, গয়া, প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫

২০। সাবিত্রী (মাসিক) - রামযাদব বাগচী সম্পাদিত, মুরারপুর, গয়া, প্রথম প্রকাশ ১৮৯৬

২১। বালাবোধিনী (মাসিক) - হিন্দী ভাষা, হরিশচন্দ্র সম্পাদিত, কাশী, প্রথম প্রকশ ১৮৭৪

মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা :

১। বঙ্গমহিলা (পাক্ষিক) - মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৭০

২। অনাথিনী (মাসিক) - থাকমণি দেবী সম্পাদিত, আজিমগঞ্জ, ধুলিয়া, প্রথম প্রকাশ ১৮৭৫

৩। ভারতী (মাসিক) - স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, ও সরলা দেবী সম্পাদিত, কলিকাতা, (১৮৮৪-১৮৯৮)

৪। হিন্দুললনা (পাক্ষিক) - জনৈকা বঙ্গমহিলা সম্পাদিত, ব্যারাকপুর, নবাবগঞ্জ প্রথম প্রকাশ ১৮৭৮

৫। পরিচারিকা (মাসিক) - মোহিনী দেবী, সুচারু দেবী, মণিকা দেবী সম্পাদিত, কলিকাতা (১৮৮৭-১৯৯৮)

৬। খৃষ্টীয় মহিলা (মাসিক) - কুমারী কামিনী শীল সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৮১

৭। বঙ্গবাসিনী (সাপ্তাহিক) - জনৈকা বঙ্গমহিলা - পরিচালিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৩

৮। সোহাগিনী (মাসিক) - কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৪

৯। বালক (মাসিক) - জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৫

১০। বিরহিনী (মাসিক) - শৈলবালা দেবী সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৮

১১। ভারত-ভগিনী (মাসিক) - হরদেবী সম্পাদিত, লাহোর, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৯

১২। পুণ্য (মাসিক) - প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৯৭

১৩। অন্তঃপুর (মাসিক) - বনলতা দেবী সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৯৮

১৪। মুকুল (মাসিক) - হেমলতা দেবী সম্পাদিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯০০

১৫। সুগৃহিনী (মাসিক) - হিন্দি ভাষা, হেমন্তকুমারী দেবী সম্পাদিত, শিলং, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র, ১২৭৫ (ইং ১৮৬৮)-১৩০৭ (ইং ১৯০০) (২য় খন্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ফাল্গুন ১৩৮৪ সুনীল দাস, ভারতী-ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৩৬৮ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার নারী-জাগরণ, সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা, চৈত্র ১৩৫২ অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত, সেকেলে কথা, নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৪০৪ (১৯৯৭)

Dr. Usha Chakraborty, Condition of Bengali Women, around the 2nd half of the 19th Century, Calcutta, July, 1963

আশালতা সিংহের উপন্যাসে নারী-ভাবনা

অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাঙলা সাহিত্যে বৈভব ও বৈচিত্র্যের যে ঢেউ এল, তাতে মহিলাদের অবদান কম কিছু ছিল না। বিশেষত: বাঙলা সাহিত্যের নবোদ্ভূত উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাদের অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হল। ঠিক তার পরের দশকেই প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবীর আত্মপ্রকাশ।[১] তার পর একের পর এক লেখিকার আবির্ভাব - অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষ জায়া, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, আশালতা সিংহ - বিশ শতকের এক দশক থেকে আরেক দশকে এই তালিকা দীর্ঘতর হতে থাকলো। এঁরা প্রত্যেকেই শক্তিমতী লেখিকা এবং পুরুষ সাহিত্যিকদের মতোই বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধ গঠনে এঁদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষত: উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক জাগরণের অংশ হিসেবে, বা কোনো কোনো ঐতিহাসিকের[২] মতে উদীয়মান জাতীয়তাবাদের অঙ্গ হিসেবে, সংসারে, সমাজে নারীর ভূমিকা এবং নারী-পুরুষের সম্পর্ক সম্পন্ধে যে পুনর্বিচার শুরু হয়েছিল, সেই মূল্যবোধ পুর্নগঠনের প্রক্রিয়ায় মেয়েদেব নিজস্ব অবদানকে চিহ্নিত করে তাদের উপন্যাসগুলি। এই অবদান দ্বন্দ্ব, সংশয় বা স্ববিবোধিতার উর্দ্ধে নয়। মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা পুনব্যর্ক্ত করেছে, তবু এদের অবদানের গুরুত্ব কম নয়। এতদিন পুরুষদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, সংসারে, সমাজে তাদের পারস্পরিক ভূমিকা সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণ করেছে পুরুষই। উনিশ শতকে এই নীতি পুনর্নির্ধারণের পালা শুরু হল। ওই শতকের শেষ দিক থেকে মেয়েরাও এই প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখলো না। তাদের লেখা উপন্যাসগুলিতে তাদের জীবনের নৈতিক ভিত্তিভূমি নিজেদের বিচার অনুযায়ী নির্মাণ করার অস্থির তাগিদ প্রতিবিম্বিত।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য এই মহিলা ঔপন্যাসিকদের একজন শ্রীমতী আশালতা সিংহ।[৩] তাঁর সাহিত্য-জীবন অত্যন্ত স্বল্পায়ু - ১৯২৬/২৭ থেকে ১৯৩৬/৩৭। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি লিখতে শুরু করেন। ছাব্বিশ বছর বয়সের পর দুই একটি ধর্মীয় বই ছাড়া আর বিশেষ কিছু লেখেননি।[৪] সৃজনশীল ওই বছবগুলোর ফসল কুড়ির বেশী বই। এর মধ্যে কয়েকটি গল্পের সঙ্কলন — অন্তর্যামী (১৯৩৫), লগন বয়ে যায়, মধুচন্দ্রিকা (১৯৪৭), অভিমান, একটি প্রবন্ধ (সমী ও দীপ্তি) এবং একটি নাটক (সুরেব উৎস)। বাকীগুলি উপন্যাস।

প্রাথমিকভাবে এগুলি প্রবাসী, বিচিত্রা বা ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পরে এগুলি বই আকারে ছেপে বেরিয়েছে। উপন্যাসগুলিকে ভিত্তি করে এই আলোচনা, সেগুলি হল অমিতার প্রেম[৫] (১৯৩৮), দুই নারী, পরিবর্তন, মুক্তি, কলেজের মেয়ে, বিয়ের পরে (১৯৩৬(), জীবনধারা (১৯৫১), নূতন অধ্যায়, একাকী, সহরের মোহ, স্বয়ম্বরা এবং ক্রন্দসী।[৬] এই উপন্যাসগুলি সব সমান মানের না হলেও, প্রত্যেকটিই সুখপাঠ্য। আকর্ষণ করে লেখিকার তীক্ষ্ণ মননশীলতা আর বৈদগ্ধ্য যা উপন্যাসগুলির নায়ক-নায়িকাদের ভাববিনিময়ে পরিস্ফুট।

এবার উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু লক্ষ্য করা যাক। অমিতার প্রেমে অমিতার অমিয়র প্রতি প্রেম বাস্তব জীবনের স্থূলতার আঘাতে (দাদা-বৌদির সন্দেহপ্রবণতা, বক্রোক্তি ইত্যাদি) সাময়িকভাবে ফিকে হলেও, মনের গভীরে তার শিকড় ছিল বলে নতুন সজীবতায় জেগে উঠেছিল। স্বয়ম্বরার নায়িকা মালতী তার হৃদয়হীন অভিভাবকদের পছন্দকে মেনে নেয়নি। নিজের পছন্দের মানুষকে পেতে, নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে তুলতে সে সব ছেড়েছিল। দুই নারীর বুদ্ধিজীবী নায়ক নীরেনের জীবনে দুই নারী এসেছিল। সুধীরা ছিল নীরেনের প্রেম, প্রেরণা, কিন্তু সুজাতাকে চেনার পর নীরেনের আবেগ দিক্ বদ্‌লালো। সুজাতার মধ্যেই সে তার কল্পমানসীকে খুঁজে পেলো। কিন্তু সুজাতাকে সে চিনলো এমন সময় যখন মেয়েটি তার দুশ্চরিত্র স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা এনেছে। ভালোবেসেই সে সরোজকে বিয়ে করেছিলো, কিন্তু অর্থের নেশা কয়েক বছরের মধ্যে সরোজকে পশুতে পরিণত করেছিল। ডির্ভোসের মামলা এনেও বিদ্রোহিনীর মন দ্বন্দ্বে দীর্ণ। এদিকে নীরেনের প্রতি তার মন দুর্বল হচ্ছে। কিন্তু সন্তান সম্ভাবনা তাকে স্বামীর কাছে ফিরতে বাধ্য করল। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু তার যন্ত্রণার অবসান ঘটালো।

বিবাহোত্তর জীবনের সমস্যা আশালতার বাকী প্রায় সব উপন্যাসেরই বিষয়বস্তু। বিয়ের পরে উপন্যাসের ধনী মেয়ে বিজয়া ভালোবেসে বিয়ে করলেও বিয়ের পর স্বামী স্মরজিতের দারিদ্র্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে না। একাকীর প্রতিভা স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যে ত্রুটিহীন কিন্তু ভালোবেসে নিজেকে বিলিয়ে দিতে কোথায় যেন আটকাচ্ছে। মুক্তির নায়িকা নির্ম্মলা বাবার ব্যক্তিত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন। বিয়ের পর তার সমস্যাও প্রায় সেই রকম। শ্বশুরবাড়ির আবহাওয়াও তার শ্বাসরোধী লাগে। 'নূতন অধ্যায়ে'র কমলা বিয়ের আগে একজনকে ভালোবেসেছিল, তাই বিয়ের পর স্বামীর প্রতি কোনো আবেগ সে অনুভব করে না। 'জীবনধারা'র এষা প্রেম ব্যাপারটাকে ঘৃণার চোখে দেখে, প্রশ্নহীন আত্মবিলোপের আদর্শেই তার বিশ্বাস। তাই তার একনিষ্ঠ প্রেমিক দেবেশকে প্রত্যাখ্যান করে মা, জেঠিমার পছন্দের পাত্র এক জমিদার পরিবারের ছেলেকে বিয়ে করল। কিন্তু বিয়ের পর স্বামীর স্থূলতা এবং বড়লোক শ্বশুরবাড়ির বিধিনিষেধ তার অসহনীয় মনে হচ্ছে। শহরের মোহতে প্রকাশ ও শান্তার সম্পর্কে চিড় ধরছে যখন সংসারের আর্থিক্ হাল ফেরাতে শিক্ষিতা শান্তা এগিয়ে আসছে। 'কলেজের মেয়ে'র সুমিত্রা, 'পরিবর্তনে'র শিশির এবং 'ক্রন্দসী'র নায়িকা ইভা এদের সমস্যা স্বামীদের নিয়ে নয়। সমস্যা এদের পাড়াগাঁয়ের কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্বশুরবাড়ি এবং সাধারণভাবে গ্রামীণ সমাজের ক্ষুদ্রতা।

শ্বশুরবাড়িতে এসে এরা প্রত্যেকেই সংস্কৃতির সংকটে আক্রান্ত।

দুই একজন বাদে আশালতার নায়িকারা প্রত্যেকেই তীক্ষ্ণধী, মননশীল, নানা কলায় পারদর্শী, সূক্ষ্মরুচিসম্পন্ন, যুক্তিবাদী। এরা কথায় কথায় শেলী, কীট্‌স অথবা রবীন্দ্রনাথের পূরবী বা মহুয়া থেকে আবৃত্তি করে, প্রেমিক বা স্বামীর সঙ্গে রাশেল, এইচ্‌. জি. ওয়েল্‌স অথবা অলডস হাক্সলীর সাম্প্রতিকতম বই নিয়ে তর্ক করে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই বিয়ের পরে সমস্যায় আক্রান্ত। বিভিন্ন চরিত্রের ভাববিনিময়ের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে এই বিবাহোত্তর সঙ্কটের মোটামুটি এই ধরণের বিশ্লেষণ। পুরুষদের সমান শিক্ষা প্রাপ্তি বা স্ত্রীজনোচিত শিক্ষার অভাব এই মেয়েদের আত্মবোধ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে জাগ্রত করে স্বামীকে আত্মসমর্পণ, সংসারে আত্মবিলোপের ক্ষমতাকে হরণ করেছে। একাকীর শূন্যতাবোধ আক্রান্ত নায়িকা প্রতিভার দাদা বিলেত থেকে তাকে চিঠিতে লিখছে, 'সেই যে ছোটবেলায় তুমি আর আমি একত্র একভাবে মানুষ হইয়া ছিলাম, তাহাতে হয়তো তোমার জীবনের ক্ষতি হইয়াছে। তোমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ শিশুকাল হইতে পুরুষের মত করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে করিয়া অধিকাংশ স্ত্রীলোকের মত নিজেকে লুপ্ত করিয়া দিয়া প্রেমের ভিতর দিয়া আপনাকে আপনি নিঃশেষ করিয়া দিতে তোমায় বাধিতেছে।...বিশ্ববিধানে স্ত্রীলোকের একাগ্র সর্বাঙ্গীন প্রেমের অত্যন্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই সাধনা তোমাদের। নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধি করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা তোমাদের পথ নয়।' 'কলেজের মেয়ে' সুমিত্রার দিদি উর্মিলা বোনকে বোঝাচ্ছে, 'লেখাপড়া শেখা দুটা দিক আছে। একটা হচ্ছে মানুষকে কেবলমাত্র মানুষ হবার সুযোগ দেওয়া, তাকে জ্ঞানে, চিন্তায়, উদারতায় বড় করা। এখানে মেয়ে-পুরুষের একইরকম ; কারণ তারা দুজনেই মানুষ। কিন্তু আর একটা ব্যবহারিক দিকও আছে শিক্ষার। সে শিক্ষার ফলে পুরুষকে ডাক্তার এনজিনিয়র, আইনবিদ্, ব্যবসায়ী করে, যাতে সে জীবিকার উপায় করতে পারে। ...ঠিক তেমনই বাস্তবশিক্ষা মেয়েদের একটা আছে, সেটা হচ্ছে বিয়ের পরে সে কেমন করে শান্তি এবং সহ্যগুণের ভিতর দিয়ে যথেষ্ট সুন্দর করে ঘর-সংসার চালাবে। ...তাকে অহর্নিশি ছোটটি থেকে শেখাতে হয়। বিয়ের পরে যে সংসারে যাবে সেখানে কত ভিন্ন রুচির কত রকম সংস্কারের মানুষ আছে, নিজের মতামত না খাটিয়ে পাঁচজন পাঁচমতের মানুষ নিয়েও কেমন করে সুন্দর সংসার চালান যায়।' উর্মিলার বক্তব্যে পরিষ্কার ইঙ্গিত, সুমিত্রা এই বাস্তব শিক্ষা পায়নি, তাই সে শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে নিতে পারছেনা।

'জীবনধারা' উপন্যাসে এষার জেঠিমার বক্তব্যও মোটামুটিভাবে তাই। এষা ছোট থেকে 'একটু অন্যরকম ভাবে স্বাধীন চিন্তার মাঝে' মানুষ হয়েছে. তাই সে শ্বশুরবাড়ির পাঁচরকম মানুষের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে না। শ্বশুরবাড়ি থেকে এষা ফিরে এলে পর তিনি তাকে বোঝাতে চাইলেন, 'মেয়েমানুষেব জীবনে এত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই বুঝি চলে ? সবাইকে সুখী করবি, সকলের সেবা করবি, প্রত্যেকের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিবি এতে যে কত শান্তি, কত তৃপ্তি তোকে বলে আর বোঝাব কি ? নিজেকে নিঃশেষে নত করেই আনন্দ পাবি, ফাঁপিয়ে তুলে নয়।'

নিজেকের নিঃশেষে নত করে সংসারে সঁপে দেওয়ার এই আদর্শে আশালতাব সংবেদনশীল

আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন নায়িকারা শেষ পর্যন্ত উন্নীত হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এই আদর্শ সব উপন্যাসে দ্বন্দ্বহীন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। জীবনধারার দৃষ্টান্ত দিয়েই শুরু করা যাক। এষা গুরুজনদের নির্বাচনে প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ, নির্বিচার পাতিব্রত্যের আদর্শে বিশ্বাস করে। সে তার মা, জেঠিমাকেই অনুসরণ করতে চায়। এষার নিজের কথায়, 'জীবনে তাঁরা নির্বাচন করে কিছুই নিতে চায়নি। যা কিছু পেয়েছেন বিধাতার দান বলেই স্থির অচঞ্চল চিত্তে তাকে গ্রহণ করেছেন। এষার ভালো লাগে না তার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের প্রেম নিয়ে মাতামাতি। তাই পরম অবজ্ঞায় সে দেবেশকে প্রত্যাখ্যান করল। এষার বাবা কিন্তু চেয়েছিলেন এষা দেবেশকে গ্রহণ করুক। নরেন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছিল, এষা সতীত্ব, পাতিব্রত্যের আদর্শে আচ্ছন্ন হয়ে নিজের ভিতরকার অনুভূতিকে চিনে নিতে পারছেন না। শরৎচন্দ্রের অন্নদাদিদি চরিত্র সম্বন্ধে এষা কি ধারণা করে তিনি জানতে চাইলে এষা কিন্তু স্পষ্ট কোনো জবাব দিতে পারলো না। নরেন্দ্রনাথ তখন বোঝাতে লাগলেন, 'অন্নদাদিদি সতী ছিলেন। সতী স্ত্রী বা স্বামীকে মানুষ হিসেবে ভালোবাসেন না - তাঁরা এটাকে ধর্মের অঙ্গ বলেই গ্রহণ করেন। সেখানে সুখ-দুঃখ পছন্দ অপছন্দের কোনো কথাই ওঠে না। জন্মজন্মান্তরের সংস্কারবশত আমাদেব হিন্দু মেয়েদের মধ্যে কমবেশী মজ্জাগত এই ভাবটা রয়েছে। আমার কিন্তু মনে হয়, এটা নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করাটা ভালো নয়। এতে হিন্দু মেয়েরা নিজেদেরও খানিকটা বঞ্চিত করে, তাদের স্বামীদের কম বঞ্চিত করে না। ব্যক্তিত্বহীন ভালোবাসায় আমাদেব মত ছোট মানুষের মন মরে ওঠে কই ? আমরা কেবল স্বামীপদবাচ্য বলেই একজনের শ্রদ্ধা বা অনুরাগের অধিকারী হব। তার জন্য আমাদের আর কিছু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে না। এ ভাবটা আমাদের পৌরুষকে ঘা দিয়ে ছোট করে দেয়। আমার ছোট্ট এষা যদি কাউকে ভালোবেসে অনেকের ভিড় থেকে একজনকে বেছে নিয়ে তাকে জয়মাল্য দেয়, তাতেই আমি খুশী হব।'

নরেন্দ্রনাথের উপদেশ কিন্তু এষার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারলো না, সে বহুজনের ভিড়ের মধ্যে থেকে কাউকে বেছে নিতে চাইলো না, ভালো-মন্দ বিচারের ঊর্দ্ধে এক আত্মনিবেদনের জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু বিয়ের পর স্বামী-শাশুড়ীর শাসন, সন্দেহপ্রবণতা, হাজারো নিষেধাজ্ঞার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। সে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোধকে বিলুপ্ত করবে ভেবেছিল তাই প্রখর ভাবে জেগে উঠল। ফুলশয্যার রাত্রে ক্ষুব্ধ এষা স্বামীকে প্রশ্ন করল, 'ঘরের বৌ ছাড়া আর কি আমার কোনো পরিচয় নেই ?' সে স্বীকার করল, সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে বিবাহিত-জীবনের এই আসল রূপ। কুৎসিৎ বাস্তবের মুখোমুখি এসে এষার আত্মসম্মানবোধ তার আত্মবিলোপের দর্শনকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এষা বেশী দিন সহ্য করতে পারলো না শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ। সে বাবা-মার কাছে ফিরে এসে পুরনো জীবনকে ফিরে পেতে চাইল। এষার স্বামী অবশ্য নিজেকে কিছুটা বদলানোর চেষ্টা করেছে এবং এষার মনে স্ফূর্তি আনার জন্য তাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু এষার তার প্রতি বিমুখতা বিশেষ হ্রাস পায়নি। শেষ পর্যন্ত এষার জেঠিমা যখন বোঝালেন যে নিজেদের ভুলে সংসারে নিবেদন করাতেই মেয়েদের জীবনের সার্থকতা, নরেন্দ্রনাথ যখন বোঝালেন যে এষার আর পুরনো জীবনে ফিরে আসার কোনো উপায় নেই কারণ সম্পর্কের গ্রন্থি থেকে

চাইলে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তখন এষার উপলব্ধি হল সে শ্বশুর বাড়ীতে সবার সঙ্গে মানিয়ে চলাই তার কর্তব্য। কিন্তু তার ঘা খাওয়া মনে আগেকার সেই ভাবপ্রবণতা আর নেই। আত্মবিলোপকে সে বুঝল প্রতিকূল সংসারে অস্তিত্ব বজায় রাখার একমাত্র উপায়। সংসার যে তাকে বেশী কিছু দিতে পারবে না সে বুঝে গেল। সান্ত্বনা খুঁজলো এই ভেবে, 'আমার কিছু ধন আছে সংসারে বাকী সব ধন স্বপনে, নিভৃত স্বপনে।'

প্রেমের পথকে অবজ্ঞা করে এষা ভুল করেছিল, জীবন ধারায় এই ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। কিন্তু স্বয়ম্বরা উপন্যাসে প্রেমের সমর্থন স্পষ্ট। নারীর নিজের ভবিষ্যত নিজে গড়ার অধিকার বলিষ্ঠ স্বরে ঘোষিত। পাশাপাশি প্রেমহীন সংসারে বিনা অভিযোগে নিজেকে সঁপে দেওয়া নীহার সম্বন্ধে এক গভীর বেদনাবোধ প্রকাশ পায়। নীহারের এই বিয়েতে তার দাদা বিনয়ের ঘোরতর আপত্তি ছিল কিন্তু অর্থাভাব তাকে এই বিয়েতে সম্মতি দিতে বাধ্য করেছে। বিয়ের আগে থেকেই সে এই পরিবারে নীহারের পরাধীন জীবনযাত্রা চোখের সামনে দেখতে পায়। 'আনন্দ নাই, আলো নাই, কেবল আছে-হীন দাস্যের মধ্য দিয়া মানবাত্মার চরম অপমান।' বিনয়ের একমাত্র সান্ত্বনা, হিন্দু মেয়ে হিসেবে নীহারের মজ্জাগত সতীত্বের সংস্কারই তাকে সংসারে টিকিয়ে রাখবে। 'নীহার বাঙালীর মেয়ে। তারা সহ্য করবার বল পায় তাদের চির যুগসঞ্চিত আদর্শবাদ আর সহিষ্ণুতার গুণ দিয়ে। স্বামী যেমনই হোক, হিন্দুর মেয়ে ব্যক্তিগতভাবে তার বিচার ত করে না। তাদের বাঁচায় তাদের বহু জন্মসঞ্চিত মনের আদর্শ পূজো। নীহার সেই বাঙালীর মেয়ে।' বিনয় তবু বোনের জন্য গভীর দুঃখবোধ এড়াতে পারে না। নিজের জীবনকে নষ্ট হতে দেওয়া পাপ, এটা তার বার বার মনে হয়। সে চায় না নীহারের বন্ধু মালতীও তার জীবন এইভাবে নষ্ট করুক। মালতী বিনয়কে মনে মনে ভালোবাসতে শুরু করেছিল, তাই বাবা এবং সৎমার দুরভিসন্ধিতে জল ঢেলে সে এক আত্মীয়ের সাহায্যে গ্রাম ছেড়ে কলকাতা এল বিনয়ের সঙ্গে মিলিত হতে। নিজের জীবনকে সে নষ্ট হতে দিল না।

দাম্পত্য সম্পর্কে মেয়েরো নির্বিচার পাতিব্রত্যের আদর্শ মেনে চলবে না কি আত্মসম্মান, ন্যায়বোধকে গুরুত্ব দেবে এই প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে গেছে আশালতার আরেক উপন্যাস ক্রন্দসীতে। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র ইভার দুই বন্ধু পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত ইন্দু আর শহুরে শিক্ষিতা রেবা দুই বিপরীত ধরণের জীবনদর্শনের প্রতিভূ। ইন্দু দুশ্চরিত্র স্বামী ও শাশুড়ীর অত্যাচারে জর্জরিত তবু স্বামী অসুস্থ হলে প্রাণপণ সেবা করে চোখের জল ফেলে। অপরদিকে রেবা দীর্ঘ কোর্টশিপের পর বিয়ে করলেও বিয়ের কিছুদিন পর থেকে স্বামীর সঙ্গে তার আদর্শের অমিল দেখা দেয়। রেবা পৃথক থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও কখনো ইভা ইন্দুর স্বামীর অসুস্থতায় কাতর হয়ে চোখের জল ফেলার মধ্যে দামী এক অনুভব খুঁজে পায়, এবং রেবার আচরণকে বাড়াবাড়ি মনে করে, তবু সে অনেক সময়েই দ্বন্দ্বে ভোগে। রেবাকে ভালো বলবে না ইন্দুর এই অসাধারণ ক্ষমাকে ভালো বলবে সে তা সব সবয় বুঝতে পারে না। ইন্দুকে এক সময় মহিমাময়ী মনে হয়, আবার পরের মুহূর্তে মনে হয় 'একটা অন্ধভয়ে যেন সে অন্যায়ের পদতলে নিজেকে সমর্পণ করিতেছে।'

রেবার মতো আরেক বিদ্রোহীনীকে পাই 'দুই নারী' উপন্যাসে। সুজাতা তার অধঃপাতে

যাওয়া স্বামীর বিরুদ্ধে ডির্ভোসের মামলা এনেছে গোটা সমাজে ঝড় তুলে। কিন্তু দ্বন্দ্বে জীর্ণ হচ্ছে বিদ্রোহিণীর মন। লোকজনের সমালোচনায় বিচলিত হয়ে কখনো সে মনকে বোঝাচ্ছে, 'করুক লোক আমায় নিয়ে হাসাহাসি। আমার নিজের কাছে তা আমি খাঁটি রয়েছি। অন্যায়ের পদতলে আত্মবিসর্জন দিইনি এই মাত্র আমার অপরাধ।' কিন্তু নিজেব কাছেও এ কৈফিয়ৎ সবসময়, যথেষ্ট হচ্ছে না। আইন হয়ত তাকে ছাড়া দিলে। কিন্তু এ মুক্তি সে খাটাবে কী করে ? তেমন মূলধন তার কোথায় ? ওর কাছে জীবনে প্রথম ঘর বাঁধাই সে একমাত্র সত্য। সরোজের ইচ্ছেতেই ওরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছিল, কারণ সরোজ চেয়েছিল ওদের সম্পর্ক যদি কোনোদিন বিষাক্ত হয়ে পড়ে সেদিন যেন মুক্তির পথ খোলা থাকে। বিচ্ছেদের মামলা করার পর সুজাতা ভাবে, যদি ওর হিন্দুমতে বিয়ে হত, যদি ওর এ জীবন থেকে ছাড়া পাবার আর কোনো উপায়ই না থাকত, তাহলে হয়ত ও ঠাকুর ঘরে দোর দিয়ে স্বামীর সুমতির জন্য মানত করত। কিন্তু এখনও কি সে তাই করছে না ? আপাতবিচারে সে স্বাধীন কিন্তু তার মন এই স্বাধীনতার গুরুভার বহন করতে সে পারছে না। সে ভাবে, 'এইত আমি নিজের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে, সমস্ত অন্যায় অত্যাচার থেকে বেরিয়ে এলুম, আমি স্বাধীন ! আমি স্বাধীন ! কিন্তু এই কথাটা কতরকম করে মনের মধ্যে আবৃত্তি করেও লেশমাত্র আরাম পাচ্ছিনে যে।' সুজাতা ভাবে, সে যদি ওর পিতামহীদের মত অদৃষ্টবাদিনী হত, বিবাহিত জীবনটাকে আগাগোড়া 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা: সুখেষু বিগতস্পৃহ:'-গীতার এই শ্লোক অনুযায়ী চালনা করত , তাহলে সব ছেড়ে আসবার কথা মনেই আসত না তার। কিন্তু অদ্ভুত কথা, যখন সুজাতা জানতে পারল সে গর্ভবতী, সন্তানকে পিতার পরিচয় ও আশ্রয় দিতে তার ঘরে ফেরা ছাড়া উপায় নেই, তখন তার দুর্বল হয়ে যাওয়া মন আবার নতুন তেজে বিদ্রোহ করে উঠল। পরাজয়ের গ্লানিতে সে পুড়তে লাগল। তবু বুঝল, তার সামনে দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। তার মনে জন্ম নেওয়া প্রেমের নতুন অঙ্কুর এখন অবান্তর। মৃত্যু অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই তার গোটা অস্তিত্বটাকেই অবান্তর করে দিল।

আশালতার উপন্যাসগুলিতে দ্বন্দ্ব, সংশয়, টানাপোড়েনের এই যে ছবি আমরা পাচ্ছি, তা ওই সময়ের প্রায় সমস্ত মহিলা ঔপন্যাসিকদের লেখার বৈশিষ্ট্য। এই অস্থিরতার উৎস সেই যুগের মধ্যবিত্ত সমাজের ভাব জগতের পরিবর্তনশীল অবস্থা এবং বাস্তবের সঙ্গে ধারণার ফারাক। সতীত্ব, পাতিব্রত্য, আত্মনিবেদন-হিন্দুধর্ম সমর্থিত এই সব সুপ্রাচীন আদর্শের করাল গ্রাস তখনো জোরদার, তবে এই আদর্শগুলোকে নতুন মোড়ক দেওয়ার প্রয়াস শুরু হল উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে 'নতুন নারী'র মূর্তিগঠনে। নতুন নারীকে পাতিব্রত্যর সঙ্গে মেলাতে হবে বুদ্ধিদীপ্ত সাহচর্য্য, তাকে শিক্ষিত হতে হবে সংসার সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার জন্য। সন্তানকে বিচক্ষণতার সঙ্গে মানুষ করার জন্য। তবে তার জন্য পুরুষের সমান শিক্ষা নাই, তার চাই অর্থনৈতিক মূল্যবিহীন স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা, হাজারো প্রবন্ধে নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে এই পরিবর্তিত প্রত্যাশা উচ্চারিত হতে লাগলো। এদিকে স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধীরাও দলে বেশ ভারী। বাস্তব জীবনে মেয়েদের বৌদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ দেওয়া পরিবারের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। এদিকে যে সব মেয়েরা শিক্ষিত হচ্ছে, তাদের

বৌদ্ধিক, আত্মিক স্ফূরণ ঘটছে যা সমাজ সংসারের কাছে একেবারেই কাঙ্খিত নয়। এই মেয়েরা ঘরের বাইরে বৃহত্তর জীবনে নিজেদের বিস্তার করতে চাইছে। তাদের ব্যক্তিত্ব, আত্মবোধ সক্রিয়তর হচ্ছে, যুক্তিবোধ, সংবেদন শাণিত হচ্ছে। কিন্তু মেয়েদের ব্যক্তিত্ব, আত্মসম্মানকে স্বীকৃতি দিতে সমাজ প্রস্তুত নয়।

ইতিমধ্যে সাহিত্যে প্রেমের ধারণা আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছে। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে শুধু যে মেলামেশাব সুযোগ কম তাই নয়। অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের স্বাধীন নির্বাচন মেনে নিতে মোটেই প্রস্তুত নয়। এদিকে প্রেমই বিয়ে-দাম্পত্যের একমাত্র ভিত্তি হওয়া উচিত এই ধারণা কোনো কোনো গল্প উপন্যাসে চরম জায়গায় পৌঁছচ্ছে। প্রেমহীন পারস্পরিকতাহীন দাম্পত্যের কোনো বৈধতা নেই একে টেনে নিয়ে যাওয়া অন্যায়। এই সব ধারণা সতীত্ব, পাতিব্রত্যের আদর্শের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ।

ভাবজগতে এই যে আলোড়ন, বাস্তবের সঙ্গে সংঘাত, তা পুরুষদের থেকে মেয়েদের অনেক বেশী অস্থির করে তুলল। কারণ ভাবনার জগতে এই টানাপোড়েন তো নারীকে কেন্দ্র করেই। এই অস্থিরতা থেকে জন্ম নিল বিচিত্র সব দ্বন্দ্বের। জন্ম হলর হাজারো প্রশ্নের। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল ? কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত ? নিজেদের বোধ, বিবেচনা অনুযায়ী তারা সব কিছু বিচার করতে উদ্যোগী হল। নিজেরা নির্বাচন করে বিয়ে করা উচিত নাকি অভিভাবকদের পছন্দই তাদেব ভাগ্য নির্ধারণ করবে ? স্বামী খারাপ হলেও, ভালো না বাসলেও কি তার প্রতি অনুগত থাকতে হবে ? দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে তারা কি যুক্তিবোধ, ন্যায়বোধ অনুযায়ী চলবে না কি অন্যদের ইচ্ছে অনিচ্ছেকেই অগ্রাধিকার দেবে ? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অনেক মেয়েই কলম তুলে নিল। প্রবন্ধ তাদের আত্মপ্রকাশের একটি মাধ্যম উপন্যাস আরেকটি। আশালতা এবং আরো অনেকজন মহিলাদের কাছে উপন্যাস লেখা যেন তাদের প্রশ্নতাড়িত মনের ক্যাথারসিস। তাদেব উপন্যাসগুলি থেকে বেরিয়ে আসা বক্তব্য প্রায়শই দ্বন্দ্ব বা স্ববিরোধিতায় দীর্ণ। পিতৃতান্ত্রিক ধাবণা থেকে কখনো তা অভিন্ন। তা সত্ত্বেও এই উপন্যাসগুলির মূল্য অপরীসীম। কারণ এগুলি তাদেব জীবনের নৈতিক ভিত্তি নিজেদের মত করে গড়ে তোলার তাগিদকে চিহ্নিত কবে।

সূত্র নির্দেশ

১। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস দীপনির্ব্বাণ। ১৮৭০ এর দশকের শেষ দিকে তিনি নাম গোপন বেখে এটি প্রকাশ করেছিলেন।

২। ক) পার্থ চট্টোপাধ্যায় - The Nation and Its Fragments, Colonial and Post colonial Histories, Princeton, 1993

খ) তণিকা সরকার - "Hindu conjugality and Nationalism in Late Nineteenth Century Bengal In Indian Women.' Myth and Reality, ed. Jashodhara Bagchi, Calcutta, 1995.

গ) দীপেশ চক্রবর্ত্তী - 'The Difference Deferral of (A) Colonial Modernity : Public Debates on Deomesticity in British Bengal', History Workshop Journal, 1993.

৩। তিনি, তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাসগুলি 'আশালতা দেবী' নামে প্রকাশ করেছিলেন। আশালতা দেবী নামে আরেকজন লেখিকা থাকায় (অলির প্রেম, অন্তঃপুর, পথ ও প্রসাদ, ইত্যাদি উপন্যাসের লেখিকা) নাম বিভ্রাট এড়াবার জন্য তিনি পরবর্তী সময়ে তাঁর বিবাহোত্তর পদবী সিংহ ব্যবহার করতে শুরু করেন।

৪। আশালতার কলম থেমে যাওয়ার পেছনে তাঁর গোঁড়া শ্বশুরবাড়ির এক বড় ভূমিকা ছিল। আশালতার বিয়ে হয়েছিল ১৩ বছর বয়সে ড: দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহের, সঙ্গে, বিয়ের পর অনেকগুলো বছর তিনি ভাগলপুরে পিতৃগৃহেই থেকেছেন। ২৫/২৬ বছর বয়স থেকে তিনি শ্বশুরবাড়ি বাতিকারে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সাহিত্যজীবনে ছেদ পড়ে। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী অরুণা হালদার বিহার বাংলা আকাদেমী দ্বারা প্রকাশিত আশালতা সিংহ রচনাবলীর ভূমিকায় লিখেছেন, 'তাঁর সমগ্র সাহিত্যে রচনা সম্ভারের কাল হল তাঁর ১৬ বৎসর থেকে ২৬ বৎসব কাল অবধি। এই মাত্র দশ বৎসরের সাহিত্যকর্ম্মই তাঁর মনের ফসল। এর পর তাঁর শ্বশুরালয়ে গমন বাতিকারে। সে পরিবেশ তাঁর পক্ষে একেবারে নূতন ও বিপরীত। নানা বিধিনিষেধের গন্ডী দিয়ে গড়া সেই শ্বশুরালয়ের বাধা একলা হাতে ঠেলে চলা সেকালের সেই বধূ-জীবনে সম্ভব হয়নি।

৫। এটি তাঁর ষোল বছর বয়সে লেখা প্রথম বই। ১৯৬২ তে ৺শ্রী সুধীর রঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই এ কথা বলেছেন। এই সাক্ষাৎকার 'পূর্ব্বপত্র সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত। (পূর্ব্বপত্র সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম.সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রা: লি:, জুলাই, ১৯৬৩)

৬। আশালতা সিংহ রচনাবলীতে ওঁর উপন্যাসের সে সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে এগুলি ছাড়া আর যেসব উপন্যাসের উল্লেখ আছে সেগুলি হল মানসী (১৩৪২), সমর্পণ, আবির্ভাব, বাস্তব ও কল্পনা, ভুলের ফসল এবং অষ্টমী (১৯৩৫)।

বিংশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকের বাঙালীর নারী ঃ শরৎচন্দ্রের লেখায়

গার্গী নাগ

১৯৬০ এর দশকেব শেষের দিকে প্রচলিত ইতিহাস চর্চার ধারায় 'মহিলা প্রসঙ্গ' বিষয়ক আলোচনা এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা মূলতঃ এই সময় থেকেই আলাদা করে গুরুত্ব লাভ করেছিল। স্বাধীনতালাভের অর্ধশতাব্দী পরেও সমাজে মহিলাদের অবস্থানের বিশেষ কোনও মৌলিক প্রগতি আজও ঘটেনি। মূলতঃ এই উপলব্ধিই 'মহিলা প্রসঙ্গ' আলোচনাকারীদের উদ্বুদ্ধ কবেছিল সমাজে লিঙ্গ-বৈষম্যের মূলসূত্রগুলি সম্পর্কে গবেষণায়।

বস্তুতপক্ষে, ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমাজ সংস্কারমূলক বহু আইন প্রবর্তিত হয়েছে নারীদের জন্যে। জাতীয়তাবাদীবাও নারীর প্রগতির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছব পর, আজও তাদেব সামাজিক অবস্থানের বিশেষ কোনও হেবফের ঘটেনি। তাব থেকে একথা বোঝা যায় যে, তাহলে মহিলাদের জীবনের জটিলতা নিশ্চয় বিশেষ কোনও ক্ষেত্রে নিহিত ছিল। সেটাকে বোঝার চেষ্টা সাম্প্রতিক 'মহিলা প্রসঙ্গ' ও লিঙ্গ সংক্রান্ত গবেষণায় বার বার করা হয়েছে ও হচ্ছে।

এই গবেষণার ভিত্তিতে 'মহিলা প্রসঙ্গ' সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আমরা পেয়েছি। এর থেকে দেখা যায় যে, সমগ্র ঔপনিবেশিক যুগব্যাপী শাসক ও শাসিতেব মধ্যে মহিলারা প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হযেছেন। এভাবে প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় তৎকালীন মহিলাদের জীবনে নানা অবাঞ্ছিত জটিলতা ও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কাবণ বেশিরভাগ সময়েই তাঁরা কোনও না কোনও আদর্শের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছিলেন। এর ফলে এই সকল আদর্শ প্রতীকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিযে অনেক সময় তাঁদের জীবনযাপন করতে হয়েছে। এর ফলে সমকালীন মহিলাদের উপরে সমাজের এক বিশাল দাবী এসে গিয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েব রচনায় তৎকালীন মহিলারা যেভাবে চিত্রিত হয়েছেন, সে সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। আলোচ্য বর্তমান প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় বিংশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকের বাঙালী নাবীরা কি ধরণেব প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছেন।

বাঙালী তথা ভারতীয় নারীব এভাবে প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হওয়ার পশ্চাতের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই 'মহিলা প্রসঙ্গে'র মত 'লিঙ্গ প্রসঙ্গে

আলোচনাও ১৯৮০র দশক থেকে প্রচলিত ইতিহাসচর্চার ধারায় আর এক নবতম সংযোজনরূপে গণ্য হয়েছে। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাকে এই নতুন আলোচনার আলোকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টারই অংশ হিসাবে দেখা যায় যে, সমকালীন ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনকে বৈধ হিসাবে প্রতিপন্ন করার স্বার্থে ব্রিটেনের উপর কৌশলে একধরণেব পুরুষত্ব আরোপ করার ও অন্যদিকে ভারতবর্ষকে দুর্বল, ভীরুরূপে প্রতিপন্ন করার জন্য ভারতের উপর একধরণের নারীত্ব আরোপ করার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু ১৮৫৭ সালের পর ক্রমশ: হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে হিন্দু ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের প্রতিবিধানই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়েছিল। এভাবে কৌশলে ভারতীয় নারীত্বের ধারণা নির্মাণের নিয়ন্ত্রণভার ভারতীয় পুরুষদের উপরই অর্পিত হয়েছিল, এবং এর পর থেকে ভারতীয় নারীর সম্পর্কে যেরকম ধারণা গড়ে তোলা হয়েছিল, এই ধারণা অনুযায়ী তার স্থান ছিল গৃহের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ। পুরুষেব গতিবিধি ছিল অবাধ।

দেখা যায় যে, হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতীকরূপে ভারতীয় মহিলারা চিহ্নিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা এবং এই সূত্রে তাদের অনগ্রসরতার দোহাই দিয়ে ও তুলনামূলকভাবে ব্রিটেনের অগ্রসরতার উল্লেখ করে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ভারতের উপর ব্রিটেনের আধিপত্যকে বৈধ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। গবেষিকা রোজালিন ও হ্যানলন তাঁর গবেষণাপত্র "Issues of Widowhood : Gender Discourse & Resistance, in Colonial Western India - তে দেখিয়েছেন যে, এই ধাবার সূত্রপাত হয়েছিল হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতীকরূপে ভারতীয় নারীকে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে।

পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদীবাও এই ধারাকে অনুসরণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ভারতবর্ষ ও নারী বহুক্ষেত্রেই একাত্ম হয়ে গিয়েছে এবং তিনি তার উপব মাতৃত্বও আরোপ করেছিলেন। এভাবেই গড়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক সৃষ্ট নাবীত্বের ধাবণা।

চরমপন্থীরাও এক্ষেত্রে কার্যত প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রকেই অনুসরণ করেছেন। সুতরাং তাঁরা যেভাবে ভারতীয় নারীকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন, সেখানেও সে দেশের প্রতীক, মাতৃরূপিণী। চন্ডী, কালী প্রভৃতি হিন্দু দেবীর ন্যায় অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী।

গবেষিকা যোয়ানা লিডল ও রামা যোশী তাঁদের গবেষণামূলক গ্রন্থ "Daughters of Independence'তে দেখিয়েছেন গান্ধীজী ঔপনিবেশিক শক্তির পৌরুষের মোকাবিলা করতে গিয়ে ভারতীয় নারীর শক্তিকে তাঁর নিজের মত করে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় নারীর নিঃস্বার্থ ত্যাগের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা আসার কথা বলেছেন তিনি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর বিভিন্ন রচনায় বিংশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকের বাঙালী নারীকে এক বিশেষ আদর্শের প্রতীকরূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধে সেই বিষয়টির উপরই গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত: শরৎ সাহিত্যকেই কেন এক্ষেত্রে নির্বাচন করা হয়েছে তার কারণগুলি নিম্নলিখিতভাবে দর্শানো যায়।

১। সাহিত্য সমগ্র সমাজজীবন ও সেই অর্থে ব্যক্তিজীবন ও গোষ্ঠী জীবন উভয়েরই

দর্পণস্বরূপ। সেই জন্যেই এগুলিকে প্রাথমিক উপাদানরূপে নির্বাচন করা হয়েছে।

২। আলোচ্য সময়ের প্রথমসারির বাঙালী লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর লেখায় আবেদনের মাত্রা অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত এটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য।

৩। তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলিতে নারীচরিত্রের সংখ্যাও বেশি এবং বিভিন্ন ধরণের ভূমিকায় তারা অবতীর্ণ হয়েছে।

৪। শরৎচন্দ্র নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাই সমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে মানসিক সম্পর্কের টানাপোড়েন-যা তখনকার সমাজে খুবই প্রবল ছিল সে সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন।

৫। আর্থসামাজিক অবস্থানের বিচারে তিনি ছিলেন সাধারণ আমজনতার অনেক বেশি কাছের মানুষ, অন্যদের তুলনায়। বিলাসিতার অবকাশও যেমন তাঁর জীবনে ছিলনা, তেমনি নির্মম দারিদ্র্যের অবিরাম আঘাত ও তাঁকে অন্য অনেকের মত অনাবশ্যক রূঢ় করে তোলেনি।

৬। পেশাগত বৈচিত্র্যের কারণে বহুস্থানে ভ্রমণ করায় বহু বিচিত্র নর-নারীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি। নারী চরিত্রকে অন্যদের থেকে অনেক বেশি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ যে করেছেন, তা স্পষ্ট তাঁর আত্মজীবনী মূলক রচনা 'ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত থেকে। এছাড়া এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কারণে ও বেশ খানিকটা সহজাত মানসিক স্বাতন্ত্র্যের কারণে তিনি নারীদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। দরদী মানসিক স্বাতন্ত্র্যের কারণে তিনি নারীদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। দরদী কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর একটি সর্বজনস্বীকৃত জনপ্রিয়তা রয়েছে।

৭। তাঁব লেখার ভাষা ও ভঙ্গী অত্যন্ত প্রাঞ্জল।

৮। আলোচ্য সময়ের মধ্যে তাঁর লেখা গল্প, উপন্যাসের সংখ্যা প্রচুর। শুধু বাংলায় নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও তিনি জনপ্রিয় লেখক তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় তাঁর বহু উপন্যাস ইতিমধ্যেই হিন্দীসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

তবে তিনি যেভাবে তাঁর সাহিত্যে সমকালীন নারীচরিত্রকে বিভিন্ন সামাজিক, পারিবারিক ইত্যাদি সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা ভূমিকায় উপস্থাপিত করেছিলেন অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, তা ছিল আসলে এক দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিনি শুধুমাত্র তৎকালীন সমাজে বাঙালী নারীর সামাজিক, অবস্থান, মর্যাদা ইত্যাদি কিরূপ ছিল তাও যেমন যথাসাধ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন-তেমনি অন্যদিকে তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাঙালী নারীর মধ্যে তাঁর নিজের মতো করে একটি উচিত অনুচিত বোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। একথা অস্বীকার করা যায় না কোনওমতেই। সেজন্য শরৎচন্দ্রের রচনায় সমকালীন বাঙালী নারী ও তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিতে তাঁদের সামাজিক অবস্থান কি ছিল - এই পরস্পরে পরিপূরক দুধরণেরই দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনাও তাই এ প্রসঙ্গে জরুরী হয়ে ওঠে।

সূত্র নির্দেশ :

১। **Yashodhara Bagchi** : Positivism & Nationalism: womenhood in crisis in nationalist fiction : Bankim Chandra's Anandamath. (Published in 26 Oct. 1985 Economic & Political Weekly)

২। **Sujata Patel** : The Construction and Reconstruction of Women by Gandhi (Published in 20th Feb. 1988 Economic Political Journal).

৩। **Rosalind O Hanlon** : "Issues of Widowhood : Gender : Discourse & Resistance in Colonial Western India (Paper presented at the Institute of Commonwealth studies, London, 1988)

৪। **Joana Liddle & Rama Joshi** : Daughters of Independence

৫। **Malavika Karlekar** : Voices From Within- Early Personal Narratives of Bengali Women.'

প্রসঙ্গ ঃ বাঙালির দর্শন চর্চার ইতিহাস

এন.এইচ.এম. আবু বকর

দর্শন চর্চার ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় মূলত দার্শনিকতত্ত্বের উৎপত্তি ও বিকাশ। এতে বিভিন্ন দার্শনিকতত্ত্বের প্রবক্তাদের মতপার্থক্য, তাঁদের মতবাদের সীমাবদ্ধতা, ইতিবাচক দিক এবং বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যেকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি দিকও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। ফলে ইতিহাসের ধারাবাহিক বর্ণনা লক্ষ্য হলেও এধরনের রচনায় অনেক ক্ষেত্রে বিতর্ক স্থান পায়। কখনো বা দার্শনিকতত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা প্রস্তুতিমূলকও হয়ে থাকে। অনেক সময় সত্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে এবং দার্শনিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দার্শনিকতত্ত্বের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্ব পায়। অন্যদিকে, অতীত দার্শনিকতত্ত্ব দেশ-কাল ও সমকালিক আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটেও আলোচিত হয়ে থাকে।[১] এভাবে তা' সমাজের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানতত্ত্বের বিকাশের আবশ্যকতার প্রতিফলন হিসেবে দার্শনিক ধারণা ও পদ্ধতিসমূহ মূল্যায়ন করে। শুধু তাই নয়, দর্শন চর্চার ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনা জাতীয়, মহাদেশীয়, আঞ্চলিক, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি প্রেক্ষাপটেও হতে পারে।[২]

দর্শন চর্চার ইতিহাস সম্পর্কিত এই ধারণার আলোকে আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাক্ আধুনিক যুগ পর্যন্ত স্থানিক প্রেক্ষাপটে মূলত বাংলাদেশের দর্শন চর্চার বিকাশ অনুসন্ধানই আমাদের লক্ষ্য। উল্লেখ্য যে, প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে নানা দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও তাদের মতবাদের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু এসব কোন নতুন বা স্বাধীন দার্শনিক মতবাদ নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শনই এখানে বরাবর শিকড় গেড়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলাদেশে মূলত প্রাচীন ভারতীয় প্রধান প্রধান ধর্মাশ্রয়ী দার্শনিক সম্প্রদায় ও তাদের মতবাদসমূহ নিয়েই দর্শনের চর্চা অব্যাহত থাকে। জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত ও বৈশেষিক সম্প্রদায় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।[৩] আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য থেকে অনুমিত এক একটি মূল গ্রন্থ বা সূত্র সংকলনকে উৎস হিসাবে নিয়ে এসব সম্প্রদায়ে দর্শন চিন্তার বিকাশ ঘটে। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে প্রতিটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের মূলগ্রন্থে সংকলিত সূত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং প্রায়ই পূর্ণাঙ্গ বাক্যও নয়। প্রধানত সূত্রগুলির ভাষ্য এবং সেই ভাষ্যের উপর টীকাটিপ্পনী রচনার মাধ্যমে পরবর্তীকালের দার্শনিক সাহিত্য রচিত হয়েছে। পদ্যে লেখা কারিকা ও বার্তিক এবং গদ্যে লেখা নানা গ্রন্থ তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।[৪] কিন্তু এসব

দার্শনিক সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্নস্থানে খ্রিস্টপূর্ব কালে প্রায় একই সময়ে পাশাপাশি বিকশিত হলেও বাংলাদেশে তাদের দর্শনের প্রসার ও চর্চা শুরু হয় অনেক বিলম্বে। অনুমান করা হয় যে, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে বাঙালি পন্ডিত সমাজ সংস্কৃত ভাষা বা সাহিত্যের মূলধারার সঙ্গে ভালভাবে যুক্ত হতে না পারাই এর অন্যতম কারণ।[৫] তবে বাংলাদেশে কোন কোন সমকালীন গবেষক বস্তুবাদী বৈশিষ্ট্যের প্রাচীন লোকায়ত দর্শনকে[৬] খ্রিস্টপূর্ব কালের অনার্য বাঙালিদের দর্শন হিসেবে দাবি করেন।[৭] কিন্তু এই দাবির সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক তথ্য-- যেমন খ্রিস্টপূর্ব কালের কোন লিপি, ভাষা বা সাহিত্যের সন্ধান - পাওয়া যায় না। এমন কি আর্য সভ্যতার বিস্তৃতির পূর্বে বা তার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের ধর্মজীবন কীরূপ ছিল তাও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।[৮] তবে আর্য সভ্যতার বিস্তৃতির পর প্রাকগুপ্ত যুগে বাংলাদেশে ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রসারের নির্ভরযোগ্য প্রামণ পাওয়া যায়।[৯] কিন্তু এই সময়ে আর্য-বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও দর্শনের প্রসারের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রায় কিছুই নেই। তবে গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও দর্শনের প্রসার যে এই ে শে যথেষ্ট হয়েছিল, অসংখ্য লেখমালায় ও মূর্তিতে তার প্রমাণ রয়েছে। পাশাপাশি পৌরাণিক, বৈষ্ণব ও শৈব দর্শনের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে রচিত *দেবী-পুরাণে* রাঢ়ে ও বরেন্দ্র বামাচারী শাক্ত-সম্প্রদায়ের উল্লেখ থেকে মনে হয়, ঐ যুগে বাংলায় শক্তি সাধনাও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।[১০] কিন্তু কোন বাঙালি উপরোক্ত সম্প্রদায়সমূহের উপর কোন টীকা, ভাষ্য বা গ্রন্থ রচনা করেছেন--এমন প্রমাণ নেই। তবে বৌদ্ধ ধর্মানুসারী পাল রাজাদের আমলেই বাংলাদেশে বৌদ্ধ দর্শনের প্রসার ও চর্চার প্রমাণ মেলে। বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিত ও আচার্যরা এই সময় বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে মহাযানী ন্যায়শাস্ত্র, মাধ্যমিক বা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবাদী দর্শন ও তন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেন। সেই খ্যাতি ভারতের সীমা অতিক্রম করে সুদুর তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।[১১] সেসময় বৌদ্ধ দর্শনের চর্চার ক্ষেত্রে যে সব খ্যাতিমান পণ্ডিত-দার্শনিক মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন শান্তরক্ষিত, কমলশীল, শান্তিদেব, কুমারবজ্র, দিবাকর চন্দ্র, জেতারী, অতীশ দীপঙ্কর, জ্ঞানশ্রীমিত্র, রত্নাকর শান্তি, অভয়াকর গুপ্ত, বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, প্রজ্ঞাবর্মা, হরিভদ্র, রত্নভদ্র, বুদ্ধশ্রীজ্ঞান ও জীনমিত্র।[১২] মহাযানী ও মাধ্যমিক দর্শনের উপর অনেক টীকাভাষ্য, মৌলিক গ্রন্থ ইত্যাদি রচনা ছাড়াও এঁদের কেউ কেউ নাগার্জ্জুন প্রবর্তিত মাধ্যমিক ও মৈত্রেয়নাথের যোগাচার দর্শনের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন।[১৩] দর্শন চর্চা ও ধর্ম সাধনার এই দেশব্যাপী আলোড়নের মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া দর্শনও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এই দর্শনের অনুসারী সিদ্ধাচার্যগণের রচিত বাংলাভাষার প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদসমূহ।[১৪] চর্যাপদে বর্ণিত সহজিয়া মতবাদ অনুসারে সহজাত মনুষ্য স্বভাবকে অতিক্রম করবার চেষ্টা না করে স্বভাবের অনুকূল পথ অবলম্বন

করে আত্মোপলব্ধি করাই সহজ পথ। মন্ত্রতন্ত্র ধারণা হচ্ছে বৃথা, মহাসুখ স্বরূপ সহজের উপলব্ধিই পরম নির্বাণ। যাঁর সহজ পথে যান, তাঁদের আর জন্মমৃত্যুর আবর্তর মধ্যে ফিরে আসতে হয় না।[১৫] সিদ্ধাচার্যগণের মধ্যে লুইপাদ, সরহপাদ, কাহ্নপা, জালন্ধরীপা (বা হাড়িপা), শবরীপা, ভসুক ও তন্ত্রীপাদ সমধিক প্রসিদ্ধ।[১৬] তবে এই যুগেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও দর্শন বাংলাদেশে বিলুপ্ত হয় নি বা রাজাগণের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয় নি। পাল রাজাগণের আমলে ভবদেব ভট্ট, গৌড়পাদ, শ্রীধর ভট্ট, জগদীশ তর্কালঙ্কার, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও পঞ্চানন তর্করত্ন প্রমুখ দার্শনিক-পণ্ডিতগণ বেদান্ত, মীমাংসা ও বৈশেষিক দর্শনে টীকাভাষ্যসহ কিছু মৌলিকগ্রন্থ রচনায় পারদর্শিতা দেখান।[১৭]

পলোত্তর যুগে শৈব বা বৈষ্ণব সেন রাজাগণের আমলেও ব্রাহ্মণ্য দর্শন বিষয়ে কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। হলায়ুধ সেই আমলের একজন বিখ্যাত মীমাংসক।[১৮] সেন রাজাগণের উচ্ছেদের পর বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ষড়দর্শনের প্রভাব সাময়িক ভাবে স্তিমিত হয়। কালক্রমে বাংলায় মুসলমান রাজত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলাম ধর্মে প্রতিফলিত দর্শন ও সংস্কৃতির প্রসার যেমন ঘটতে থাকে, পাশাপাশি সাময়িক স্তিমিত ব্রাহ্মণ্য ও ষড়দর্শনের চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনোযোগী হন। ফলে ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দি পর্যন্ত সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, ন্যায়-নব্যন্যায় ও মীমাংসা দর্শন বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। এ সব গ্রন্থকারদের মধ্যে মীমাংসা দর্শনে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, চন্দ্রশেখর বাচস্পতি, রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার;[১৯] যোগ ও সাংখ্য দর্শনে স্বপ্নেশ্বর আচার্য, তর্কবাগীশ, অনিরুদ্ধ, বিজ্ঞান ভিক্ষু, পঞ্চানন তর্করত্ন, গঙ্গাধর কবিরাজ;[২০] বেদান্ত অনুপ নারায়ণ শিরোমণি, বিজ্ঞান ভিক্ষু, মধুসূদন সরস্বতী, বাসুদেব সার্বভৌম;[২১] নব্যন্যায়ে বাসুদেব সার্বভৌম, মহাপাত্র ভট্টাচার্য, কাশীনাথ বিদ্যানিবাস, রঘুনাথ শিরোমণি[২২] প্রমুখের নাম-উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থকারদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ব্রাহ্মণ্য ষড়দর্শন ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ। এ সময় বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদেরও বিশেষ প্রসার ঘটে। বিশেষ করে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে হুসেন শাহী সুলতানদের আমলে চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাবে সনাতন ব্রাহ্মন্য দর্শনের নব রূপায়ণ ঘটে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, শ্রীচৈতন্য সুফিধারার ইসলাম, সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম ও যোগদর্শন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন এবং তাঁর চিন্তাধারায় এর সমন্বয় ঘটান। ফলে তিনি ব্রাক্ষণ্য দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন না। একমাএ প্রেম বা ভক্তির দ্বারা জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন মানুষ হরি বা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল 'আচণ্ডালে প্রেম কর দান'।[২৩]

এভাবে ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাংলাদেশেও যুগে যুগে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে একের পর এক দার্শনিক পন্ডিতদের উদ্ভব হয়েছে। এই দার্শনিকেরা

মূলসূত্র বা মতবাদগুলোকে টীকা, ভাষ্য বা স্বতন্ত্র গ্রন্থ ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে ক্রমশ সুসংবদ্ধ ও সুউন্নত করেছেন। ফলে নতুন যুগের চিন্তাবিদদের কাছে প্রাচীন যুগের চিন্তাই এক অলঙ্ঘনীয়তা বহন করে এনেছে। নতুন ব্যাখ্যাকারেরা পূর্বগামী আচার্যদের ব্যাখ্যায় নিজেদের আবদ্ধ রেখেছেন এবং কখনোই তার বিরোধিতা করেন নি। সবসময় নিজেকে একজন ভাষ্যকারের বাইরে নতুন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও দাবি করেন নি। সমগ্র মধ্যযুগের বাংলায় ভাষ্য রচনার ঐতিহ্য এত প্রবল ও উন্নত ছিল যে তাদের মধ্যে কয়েকজন পুরোমাত্রায় এ রকম দাবি করতে পারতেন। মধুসূদন সরস্বতী, গঙ্গেশ, বাসুদেব সার্বভৌম ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁরা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ভাষ্যকাররূপেই নিজেদের পরিচিত করেছেন। তাই বাংলাদেশে দার্শনিক চিন্তার মূল কাঠামো বরাবর একই থেকে গেছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে দার্শনিক বিকাশের এ'ধরনের বৈশিষ্ট্যকে মতাদর্শগত এক সুস্পষ্ট নিশ্চলতার পরিচায়ক হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে সুদীর্ঘকাল ধরে এই ধ্যান-ধারণার কোন পরিবর্তন ঘটেনি এমন নয়। ভাষ্যগত তারতম্যের কারণে কোন কোন সম্প্রদায়ে একাধিক উপসম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তনও বৃহত্তর অপরিবর্তনীয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[২৫]

অবশ্য সাম্প্রতিক কালে কেউ কেউ বাংলাদেশের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক জীবনের মূল অপরিবর্তনীয়তার মধ্যে এর মূলসূত্র অন্বেষণ করেছেন। মফিজউদ্দীন আহমদ ও হাসান আজিজুল হক তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কারণ আপাত দৃষ্টিতে রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের অতীত পরিবর্তনশীল মনে হলেও প্রাচীন কাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত এর সমাজ কাঠামো, সামাজিক স্তর বিন্যাস ও সামাজিক অবস্থা প্রায়ই অপরিবর্তিত থেকেছে। সংকট ও ষড়যন্ত্রে রাজবংশের উত্থান পতন, বৈদেশিক আক্রমণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে শাসকের বদল ইত্যাদির মাধ্যমে সংঘটিত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সমাজের অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে বা হাজার হাজার বছরের উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে পারে নি। এসব পরিবর্তনের ধাক্কা সমাজের মর্মমূলে আঘাত করতে না পারায় সমাজ মানসে এবং চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে কোন ব্যাপক রদবদল ঘটে নি। যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজা ও সামন্ত ভূস্বামীদের শোষণ, ভারতের সুদুর কেন্দ্রের শাসন-শোষণ ইত্যাদি কখনও কখনও চরম নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, তবুও বাংলাদেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা একেবারে ভেঙ্গে পড়েনি। সুদীর্ঘকাল ধরে দেশে জীবন ধারণের অবস্থা একই থেকেছে, অপরিবর্তিত থেকেছে সমাজ পরিবেশ ও মানুষের ভাগ্য। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের দর্শন চর্চা অভিনব তত্ত্বে উপনীত হবার পরিবর্তে মোটের উপর প্রাচীন তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ ইহলোকের বন্ধন, বস্তুজগৎ ও দেহবন্ধন থেকে মুক্তি বা মোক্ষের সমস্যা, কর্মফলবাদ, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি ধ্যান ধারণায় আবর্তিত হতে

থাকে। পরবর্তীকালের দার্শনিকদের কাছে সেই প্রাচীন তত্ত্বগুলিই অভ্রান্ত হিসেবে গৃহীত হয়।[২৫] মফিজউদ্দীন আহমদ ও হাসান আজিজুল হকের এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে যায়।[২৬] জীবনের সংঘাত মুখর কর্মক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে দর্শন এভাবেই ধর্মের আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়।[২৭] ফলে ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে প্রকৃত তত্ত্বদর্শন বড় একটা দেখা যায় নি, দেখা গেছে ধর্মদর্শন, আর এই কারণেই দর্শনের যে মূল বৈশিষ্ট্য, কোন কিছুকে স্বীকার করে না নিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবন ও জগতের প্রতিটি দিকের উপরে যুক্তির আলো ফেলা-- এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বাঙালির দর্শনে কমই দেখা গেছে।[২৮]

বখতিয়ার খিলজীর আগমনের পর মধ্যযুগের বাংলাদেশে জীবনবাদী ইসলামী দর্শনের চর্চা শুরু হলেও বৈশিষ্ট্যগত কারণে ক্রমান্বয়ে তা বাঙালি পরলোকধর্মী মোক্ষকামী ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে যায়। মফিজউদ্দীনের ভাষায়, "বাঙালী সুফীবাদ বা বাউল দর্শন নিয়ে যতই সূক্ষ্ম তর্কজাল বিস্তর করা হোক না কেন--একথা স্বীকার্য যে মরমীয়াবাদ বা ভক্তিবাদের সাথে এদের মূলপার্থক্য অতি ক্ষীণ এবং এদের সকলের মিলের প্রধান জায়গা হচ্ছে পরলোকমুখিতা। বাংলাদেশে ইসলাম ছড়ায় ধর্মান্তরণের মাধ্যমে, সাধারণ হিন্দু ও বৌদ্ধ নরনারী পার্থিব কারণেই বিজয়ীর ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে ধর্মান্তর ঘটে ঠিকই কিন্তু ঐতিহ্যের বদল ঘটেনা।"[২৯] পূর্ব জীবনের ধর্ম দর্শনের প্রভাব ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে যায় নি।[৩০] এ জন্যে সুলতানি আমলে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইতি পূর্বে বিকাশিত রক্ষণশীল ইসলামি দর্শন[৩১] অধীত হওয়ার পাশাপাশি পরমতসহিষ্ণু একটি আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী ধারাও বিকাশিত হতে থাকে। সুফিদর্শন, ভক্তিদর্শন ও যোগদর্শন প্রভাবিত এই ধারার অনুসারীর ইসলাম ধর্মের বাহিক্য আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাসের পরিবর্তে ধর্মের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে মানব প্রেম, পরম সত্যের প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধান, আত্মনিযন্ত্রণ ও অন্তরের জ্যোতি ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করতেন। ষষ্ঠদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে সৈয়দ সুলতান, শেখচাঁদ, হাজী মোনম্মদ শাহ, আলী রেজা, ফয়জুল্লাহ, মোড়সেন আলী, শেখ জেবুর, রমজান আলী, রহিমউল্লাহ ও সিরাজুল্লাহ প্রমুখের রচনায় এই ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের সূফিতত্ত্ব বিষয়ক কাব্যসমূহ সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আচার আচরণের চেয়ে সমাজ বিবিক্ত আত্মসাধনা বর্ণনাই অধিক প্রাধান্য লাভ করেছে।[৩২] আঠারো শতকের মাঝামাঝি বা প্রাক আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশেণ দর্শন-মানুস মোটামুটি এইরকম।

এদেশের চিন্তাবিদেরা পাশচাত্য দর্শনের সংস্পর্শে আসে ইংরেজদের আগমনের পর। ঔপনিবেশিক শাসনে ইংরেজরা যখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষার দ্বারা উন্মুক্ত করে দেয়, তখন থেকে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক দার্শনিক চিন্তাধারা বাঙালি শিক্ষিত সমাজে

অধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হতে থাকে। এই সময় থেকেই সমকালীন প্রত্যক্ষবাদ, উপযোগবাদ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদসহ সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য দর্শন ও তার ইতিহাসের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটে এবং শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে অধ্যাত্ম সচেতন, জীবন বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গির বদলে একটা প্রত্যক্ষবাদী, জাগতিক গুরুত্ব আরোপকারী জীবনভাবনা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ফলে বাঙালি শিক্ষিত সমাজের প্রধান অংশ অন্তত বাইরের নিকট থেকে তার পুরানো দার্শনিক ঐতিহ্য, থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।[৩৩] কিন্তু প্রাচীন দার্শনিক ঐতিহ্য, কুসংস্কার ও অন্ধ লোক বিশ্বাসের প্রতি অনুগত্যের করণে এই জীবন ভাবনা আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে না।[৩৪] তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে) এই জীবন ভাবনাসহ পাশ্চত্য দর্শনের চর্চা একটা প্রধন জায়গা দখল করে নেয়। বিভাগ পূর্বকাল থেকে ভারতীয় ও মুসলিম দর্শনের পাশাপাশি পাশ্চাত্য দর্শন এইভাবেই পরবর্তি সময়ে বাঙালির চেতনায় প্রাধান্য বিস্তার করে।

কিন্তু বাঙালির দর্শন চর্চার এই ধারাবাহিক ইতিহাস অদ্যাবধি রচিত হয়নি। দুই বাংলায় এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুর হলেও এর গতি-প্রকৃতি নিয়ে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। তা সত্ত্বেও এবিষয়ে যুগ-বিভাজনপূর্বক ধারাবাহিক, গবেষণামূলক ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচিত হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে স্বজাতির চিন্তা চেতনার এই দিকটি তুলে ধরার স্বার্থে যৌথ বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে দুই বাংলার গবেষক, ইতিহাসবিদ ও দর্শনবিদেরা এগিয়ে এলে এ ব্যাপারে ফলপ্রসূ অগ্রগতি সাধিত হবে—এই আমাদের বিশ্বাস।

তথ্য নির্দেশ

১ জন পাসমোর, "হিস্টরিও গ্রাফি অফ ফিলজফি।" এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফিলজফি পল এডওয়ার্ড (সম্পা:)। নিউইয়র্ক। ১৯৬৭। খন্ড ৬। পৃ: ২২৬।

২ ফিওডোর এইজারমান। প্রবলেমস অফ দ্য ইষ্টি অফ ফিলজফি। মস্কো। ১৯৭৩, পৃ: ৫।

৩ দ্র. সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালির দান,* কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ১৫৪-১৮৭, ৩০৩-৩১৬, সুরেশচন্দ্র বন্দেপাধ্যায় ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, *সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা.* দ্বিতীয় ভাগ, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃ. ৩০৮-৩০৯, নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব), দ্বিতীয় খন্ড, কলিকাতা, ৩য় সং, ১৯৮০, পৃ. ৬০৫-৭১৮, ক্ষিতি মোহন সেন, *চিন্ময় বঙ্গ,* কলিকাতা, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৬১, পৃ. ৯-৩৯, ৮১-৯৬, ১২৫-১৩৫।

৪ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন,* (*আদিপর্ব*), কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮০, ডি.ব্রোদস্ত, *আধুনিক ভারতীয় দর্শন,* সুনীল মিত্র অনূদিত, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৬১-৬২।

৫ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২২-৭২৩।

৬ আধুনিক যুগের বস্তুবাদের সঙ্গে এই সুপ্রাচীন (প্রাক-বৌদ্ধ যুগের) বস্তুবাদ অভিন্ন না হলেও এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা আত্মা অস্বীকার করে জড়দেহকেই চূড়ান্ত মনে করতেন। তাঁদের মতে ঈশ্বর ও পরলোক বিষয়ক ধারণা ছিল কল্পনা মাত্র। বেদ বা শ্রুতির কোন প্রামাণ্য আছে বলে তাঁরা স্বীকার করতেন না। তাই বৈদিক যাগযজ্ঞ তাঁদের কাছে অর্থহীন ও প্রবঞ্চনামূলক ছিল। (দ্র. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন, আদি পর্ব,* পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৮০, *লোকায়ত দর্শন,* ২য় সং, কলিকাতা, ১৯৬৯, ভি, ব্রোদভ, *আধুনিক ভারতীয় দর্শন,* সুনীল মিত্র অনূদিত, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৬২-৬৮।

৭ মো. গোলায়মান আলী সরকার, "বাংলাদেশ দর্শনের বৈশিষ্ট", দর্শন, ৪র্থ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৪।

৮ সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, পৃ. ১৪।

৯ ঐ।

১০ ঐ।

১১ ঐ, পৃ. ১৪-১৫।

১২ ঐ, পৃ. ৩০২-৩১১, নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৪৯-৭২৯।

১৩ নীহার রঞ্জন রায়, ঐ, পৃ. ৭২৪-৮২৫।

১৪ ঐ, পৃ. ৭৩১-৭৩৪, সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

১৫ অতুল সুর, *বাঙালীর বিবর্তন,* কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১০৭, শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার, *হর প্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম,* ঢাকা ১৯৯২ পৃ. ২৯৩-২৯৪।

১৬ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২০-৭২৪।

১৭ সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্য বাঙালীর দান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-১৬৮।

১৮ ঐ, পৃ. ১৫৫।

১৯ ঐ, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

২০ ঐ, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

২১ ঐ, পৃ. ১৫৮-১৬৬।

২২ ঐ, পৃ. ১৬৮-১৭৫।

২৩ সুকুমার সেন, *চৈতন্যাবদান,* কলিকাতা, ১৩৯২, পৃ. ২১-২২; সালাউদ্দীন আহমদ, *বাঙালীর সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধ,* ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২৯; মুহম্মদ এনামুল হক, এ হিস্ট্রি অফ সুফিজম ইন বেঙ্গল, ঢাকা, ১৯৭৫ পৃ. ২৬৮-২৮৭।

২৪ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১, ৪।

২৫ মফিজউদ্দীন আহমদ, "বাঙালীর দার্শনিক ঐতিহ্য ও সমকাল", শরীফ হারুন (সম্পাদিত), *বাংলদেশ দর্শন* পৃ. ৪০-৪২; হাসান আজিজুল হক, "বাংলাদেশ দর্শন", কার্যবিবরণী, দ্বিতীয় সাধারন সম্মেলন, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ১৯৭৫, পৃ. ৪৩-৫০।

২৬ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১, ৪।

২৭ মফিজউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪২। যেমন: বেদান্ত দর্শনে জগতকে বলা হয়েছে মায়া বা অধ্যাস - ব্রহ্মই সেখানে এমমাত্র সৎ, বাকি সবই অসৎ। বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনে ব্রহ্ম নেই; কিন্তু নির্বাণই ব্রহ্মের স্থান দখল করেছে। ফলত প্রায় একই অবস্থা। জগৎ মিথ্যা, জাগতিক জীবন কর্মবন্ধন মাত্র, জরা-মৃত্যু-শোক-অকাঙ্খার বন্ধন মাত্র। নির্বাণের অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ন কর্মহীন অবস্থা। জন্ম চক্রের অবসান ঘটলেই জীবন পিপাসার অবসান, সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি। সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের দুঃখ ও বন্ধন, এই সংযোগের অবসানেই পুরুষের মুক্তি। জগতের প্রতি নিস্পৃহভাব ও ভোগ-লালসার প্রতি বিতৃষ্ণা যখন জীবের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করে তখনই তার মধ্যে বিবেক জ্ঞান জন্মে এবং তখনই সে পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে যে পুরুষ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। যোগ দর্শনেও আত্মোপলব্ধিকেই মোক্ষরূপে অভিহিত করা হয়েছে এবং সমাধি বা যোগের সাহায্যেই এই মোক্ষলাভ সম্ভব হয়। মীমাংসকদের মতে বৈদিক কার্যসম্পদন করেই মানুষ তার পুরুষার্থ অর্থাৎ স্বর্গকে প্রাপ্ত হয়। তারা আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান ও বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের উপায় বলে গণ্য করেন। ন্যায় দর্শনেও বলা হয়েছে যে, আত্মার স্বরূপ অবস্থানই মোক্ষ বা অপবর্গ এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যানাসনই এই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। এজাতীয় দর্শনের ফল হচ্ছে জগৎ ও জীবনের প্রতি অনাগ্রহ। গীতায় অবশ্য কর্মের কথা আছে, কিন্তু গীতার কর্ম ও কর্মফল, প্রাক্তন ধরা নির্দিষ্ট।

২৮ ঐ, পৃ. ৪২।

২৯ ঐ, পৃ. ৪৪।

৩০ মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬-৩৫৭।

৩১ মুহম্মদ শাহাজাহান, সসএ স্টাডি অফ মুসলিম ফিলজফি ইন বাংলাদেশ; এ্যন ইনট্রোডাকসন", দ্য জার্নাল অফ দ্য ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ ষ্টাডিস, খন্ড ১৫, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১০৫-১০৯।

৩২ খন্দকার মুজম্মিল হক, *মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা,* ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২৪।

৩৩ মফিজউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬।

৩৪ ঐ, পৃ. ৪৬।

ডেভিড ড্রামন্ডের শিক্ষাদর্শ ও চিন্তাধার ঃ ডিরোজিওর উপর প্রভাব

ভবতোষ কুন্ডু

ডেভিড ড্রামন্ড (১৭৮৭-১৮৮৩)[১] ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী মিঃ ওয়ালেশ ও মিঃ মেজরস পরিচালিত ধর্ম্মতলা একাডোমিতে শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর বেতন ছিল বাৎসরিক দেড়শ পাউণ্ড (তাঁর হিসেব অনুযায়ী) খাওয়া, থাকা সমেত[২]। কিছুদিনের মধ্যেই ওয়ালেশ স্কুলের পরিচালনা থেকে সরে গেলে ড্রামন্ড মেজরসের সাথে ধর্ম্মতলা একাডোমির মালিক হিসাবে যুক্ত হন। মালিক হওয়ার পরে তিনি শিক্ষাপ্রদানে যুক্ত ছিলেন না — সি. জে. মন্টেগুর এই মন্তব্য[৩] সঠিক নয়। মন্টেগুর রচনা থেকেই জানা যায় যে তিনি একাডোমির শিক্ষা ও শিক্ষনে বিশেষভভাবে যুক্ত ছিলেন এবং এর শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিতে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।

তিনি ছিলেন ইংরেজী সাহিত্য (ক্লাথিক্স) ও অঙ্কে পণ্ডিত।[৪] বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় তাঁর যে বিশেষ আগ্রহ ছিল তার প্রমান মেলে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মেকানিক ইনস্টিটিউটের[৫] বার্ষিক আধিবেশনে তাঁর উপস্থিতি থেকে।[৬] এহেন ড্রামন্ড ধর্ম্মতলা একাডোমির শিক্ষার Tone বদলে দিযেছিলেন। ওয়ালেশ ও মেজরস প্রতিষ্ঠিত একাডোমির পরিচয়পত্র - এ বলা হয়েছিল যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল 'নোভগেশন' ও 'কম্যুটিং হাউস' প্রয়োজনীয় যোগ্যতার জন্য ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হবে।[৭] ড্রমন্ড এই শিক্ষার পরিধিকে সম্প্রসারিত করে ইংরেজী সাহিত্য, জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহন করেছিলেন, যথা - ১) ইংরেজী বাধ্য তালিকাভুক্ত করা, ২) রোমান ক্লাসিকস পাঠের সূচনা, ৩) ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণের রীতিমত পঠন পাঠন, ৮) ভূগোল পড়াবার জন্য গ্লোবের ব্যবহার এবং ৫) বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহন।[৮] ১৮২৬ সালের ১২ই জানুয়ারী গভর্নমেন্ট গেজেট প্রকাশিত একাডোমির পরীক্ষার বিষয়সূচী থেকে পাঠক্রম সম্পর্কে আমরা অনেক তথ্য পাই। ভাষা শিক্ষার মধ্যে ছিল ইংরেজী, ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক, এবং বাংলা। গণিত, বুককীপিং, ভূগোল, জ্যোতিবিজ্ঞান, জ্যামিতি, ত্রিকোনমিতি, বীজগনিত এবং অঙ্কনবিদ্যা পাঠ্যসূচীর মধ্যে ছিল।[৯]

একাডোমিতে বাংলা ও ফরাসি ভাষার ন্যায় প্রাচ্য ভাষা শিক্ষা প্রদান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ড্রামন্ডের ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি একটা ঝোঁক ছিল। ব্যয়বিলাসী এবং ভোজনবিলাসী ড্রামন্ড এন্টালিতে একটা বাগানবাড়ী কিনেছিলেন। সেখানে অবসর সময়ে

দর্শন ও সাহিত্য চর্চার সাথে নৈশভোজ ও বলনাচের ব্যবস্থা থাকত।[১০] একাডেমিতে তিনি ইংরাজী ধাঁচের নাচ প্রবর্তন করেছিলেন (যা ইংল্যান্ড থেকে আমদানি এবং এদেশে নূতন)।[১১]

তাঁর জীবন লেখক সি. জে. মন্টেড লিখেছেন যে ঐ নাচশিক্ষা ছিল একাডেমির ছেলে-মেয়েদের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাদের আগ্রহ লেখাপড়ার চেয়ে অন্য ব্যাপারে বেশী লক্ষ্য করা যায়।[১২] তবে ছেলে-মেয়েদের একসাথে শিক্ষা ড্রামন্ডের একাডেমিতে ১৮৩০ সালে চালু হয়েছিল।[১৩]

একাডেমির ক্লাসঘরে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ছাত্ররা পাশাপাশি পড়াশোনা করত। সে যুগে এদৃশ্য সত্যই বিরল ছিল।[১৪]

ড্রামন্ড ছাত্রদের পড়াশোনার অগ্রগতির বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতিটি ক্লাসের ছাত্রদের অগ্রগতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করার পর তাদের পরিশ্রম ও প্রয়াসের বিষয়ে মন্তব্য করা হত। বুককীপিং পরীক্ষায় ছাত্ররা ড্রামন্ডর দেওয়া দুরুহ ব্যবসায়িক হিসাবনিকাশ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য শ্লেট হাতে অপেক্ষা করত এবং সঠিক উত্তরের সন্ধান মিললে সারা ক্লাস ঘর হাততালিতে ফেটে পড়ত।[১৫]

ছাত্রারা যাতে সুযোগ সুবিধা লাভ করে তার জন্য তাঁর কোন কার্পন্য ছিল না। তিনি ছিলেন দয়ালু এবং ভদ্র এবং তাঁর ছাত্ররা তাঁকে ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত।[১৬]

তিনি চাইতেন যে ছাত্ররা তাদের অবসর সময়ে শুধু শারীবিক সুখ নয় মানসিক উন্নতিসাধনে নিয়োজিত করুক। বুককীপিং এর হিসাব নিকাশ করা ছেলেদের খেলার একটা অঙ্গ ছিল।[১৭]

তিনি ছাত্রদের সাথে ক্লাসের বাইরে মেলামেশা করতেন। তিনি তিন হাজার টাকা খরচ করে ছাত্রদের জন্য একটি ছোট থিয়েটার হল তৈরী করেছিলেন।[১৮]

ড্রামন্ড সংশয়বাদী ছিলেন কিনা - এ বিষয়ে কোন কোন লেখক প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর সি. জে. মেন্টেডর রচনায় উদ্ধত ড্রামন্ডের একটি উক্তি তুলে ধরেন। ড্রামন্ড বলেছিলেন - 'তিনি এ পর্যন্ত ছাত্রদের অবহেলিত ধর্ম্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়ে যত্নশীল হবেন। তিনি প্রতি রবিবার ছাত্রদের গির্জায় নিয়ে যাবেন। ....এর দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করা হবে।[১৯] কিন্তু মন্টেড একাডেমির পতন বিশ্লেষন প্রসঙ্গে লিখেছেন যে **"Man pereceived the necessity of attending to the moral and religious education of the children."**[২০] মন্টেডর এই মন্তব্যে প্রতিফলিত হয় যে একাডেমিতে নৈতিক এবং ধর্ম্মনৈতিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। উমান এডওয়ার্ডস লিখেছেন যে একাডেমির ধর্ম্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা ঐ প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তার অভাবের অন্যতম কারণ। এডওয়ার্ডস আরো লিখেছেন যে কলকাতার লোকে মনে করতেন যে

ড্রামন্ড হিউসের প্রত্যক্ষ শিষ্য না হলেও একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি যাঁর সংস্পর্শে ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও যুক্তিবোধের উদ্রেক হবে এবং তাদের পুরানো বদ্ধমূল বিশ্বাসে ফাটল ধরবে।[২১] এডওয়াডস মন্তব্য করেছেন— "Tradition and antiquity were to him no authority and he built up his system of faith and the universe on a basis not much broader than the cogito ecgo sum of Descartes. but he had neither health nor leisure to chink if out and fomulate if. Had both been granted him, the name of David Drummond world in all likelihood have been inaked with that of his countryman, david Hume, is the role of philosophical sceptics."[২২]

ড্রামন্ড একজন মেটাফিজিসিয়ান (Metafhysician) ছিলেন। যুক্তিবাদী মন নিয়ে তিনি প্রতিটি বিষয় বিচার করতেন — "With an enguiring mind, he analysed every question, until he denuded if of all adventitions circumstances and held if upto view, naked and alone."[২৩] মেটাফিজিকসে তাঁর তীক্ষ্ণ জ্ঞান প্রতিফলিত হয়েছিল "objections to phunology" (১৮২৯) নামক গ্রন্থে। মানুষের মনের প্রতিটি organ স্বাধীন ও সার্বভৌম এবং পৃথকভাবে কাজ করে — ফ্রেনোলজির এই মত তিনি সঠিক মনে করতেন না।[২৪] তিনি মন্তব্য করেছিলেন - "The very essence of Phrenology involves the abandonment - both of reason and memory."[২৫]

তিনি প্রতিভাকে অলৌকিক শক্তি বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে মানুষের মধ্যে Capacity ও talents এর পার্থক্যের কারণ বাস্তব অবস্থার তারতম্য।২৬

তর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর একাডোমির বা অন্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের তর্কসভায় তিনি অনেক সময় যোগ দিতেন। কিন্তু তিনি অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তিনি মনে করতেন যে তিনি "Anthority" এবং "Infallible" এবং তাঁর মত হচ্ছে "Oracle."[২৭]

তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্র ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১) সাথে মালিক ও সম্পাদক হিসাবে ১৮২৮ সালের ২৮শে জানুয়ারী ক্যালিডোস্কোপ (The Kaleidoscope) নামক প্রত্রিকা প্রকাশ করার সরকারী অনুমতি পান।[২৮] ১৮২৯-৩০ সালের পত্রিকার রচনাগুলি থেকে পরিস্কার ঐগুলি ছিল ব্রিটিশ শাসনের উপর স্তুতি। তবে ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে এদেশবাসীর স্বার্থে কিছু কিছু সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। রচনাগুলি ড্রামন্ড বা ডিরোজিওর লেখা নয় - প্রকাশক ও সম্পাদক হিসাবে রচনাগুলি প্রকাশনের দায়িত্ব তাঁদের ছিল।[২৯] তবে ড্রামন্ড ব্রিটিশ শাসন কাঠামোর মধ্যে জনকল্যানকর ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। মেটকাফ ১৮৩৫ সালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান করলে ড্রামন্ড একটা কবিতা লিখে তাঁকে স্বাগত

জানিয়েছিলেন।[৩০] তাঁর প্রত্রিকায় "The Weekly Examiner and Literacy Register" (মার্চ, ১৮৪০-জুলাই, ১৮৪১) তিনি ভারতের পক্ষে কল্যানকর ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন।[৩১]

তিনি ছিলেন একজন কবি। তাঁর লেখা কবিতার মধ্যে ছিল 'Elegy", "Lines to the Memory of Robut Burns" এবং "Address of Death",[৩২] উল্লেখ্য তিনি উদারপন্থীও মানবতাবাদী প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

২

ডিরোজিও তাঁর শিক্ষাগুরু ড্রামন্ডের ন্যায় ক্লাসিক্স অঙ্কে আগ্রহি ছিলেন না। তিনি আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে, বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের কবি, দার্শনিক ও নাটকলেখকদের প্রতি আগ্রহী ছিলেন।[৩৩] তিনি একাডোমির থিয়েটার হলে ডগলাম নামক বিয়োগান্ত নাটকের একটি সুন্দর মুখবন্ধ রচনা করে সুন্দরভাবে পাঠ করেছিলেন।[৩৪] ড্রামন্ডের ন্যায় তিনি ছিলেন ব্যয়বিলাসী এবং ইংরেজ সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী।[৩৫] তবে তাঁর রচিত "The Ode from the Persian of Hafiz" (১৮২৭) কবিতা থেকে প্রমান মেলে যে তিনি পারসীক ভাষা সম্পর্কে সম্ভবতঃ কিছুটা জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'দি ফকীর অফ জুঙ্গিরা' কবিতায় 'The chorns of Brahmins', The Hymn to the Sun' এবং 'The Legend of the Sushan' পাঠে মনে হতে পারে যে এদেশের পুরানো প্রবাদের এর প্রতি তাঁর রোমান্টিক আর্কষন ছিল।[৩৬]

তিনি হিন্দু কলেজের ইংরেজী এবং ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন।[৩৭] তিনি ড্রামন্ডের ন্যায় ছাত্রদের সাথে ক্লাসের বাইরে মিশতেন এবং তাঁদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ছিলেন।[৩৮] তাঁর শিষ্যদের সাধারনত ইয়ংবেঙ্গল বলা হয়। ইয়ংবেঙ্গলের একটা তালিকা প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর "A Biographical Sketch of David Hare" (১৮৭৭) নামক গ্রন্থে দিয়েছেন। এই তালিকা মূলতঃ অনুসরণ করে সুশোভন সরকার এবং পরে সুমিত সরকার[৩৯] ইয়ংবেঙ্গলের সদস্যদের একটা তালিকা দিয়েছেন। হিন্দু কলেজের পরিদর্শক এইচ. এইচ. উইলসনের রিপোর্ট (১৮২৬-১৮৩১) থেকে জানা যায় যে ডিরোজিওর শিষ্যরা ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানে কিছুটা অগ্রগতি করেছিলেন। তাঁদের অনেকেই আবার হিন্দু কলেজের প্রাচ্য বিভাগের ছাত্র ছিলেন যখন কলেজের ছাত্রদের অনেকে প্রাচ্য শিক্ষার প্রতি অবহেলা প্রকাশ করেছিল।[৪০] ইয়ংবেঙ্গলের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ বেমারসের উপর কবিতা লিখেছিলেন। অমৃতলাল মিত্র রাধাকান্ত দেব সম্পাদিত *শব্দকল্পদ্রুম* রচনায় সাহায্য করেছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকা (১৮৩১) বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকার Prospectus - এর উপরে ছিল মনুর শ্লোক। তাঁরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মনুর বাংলা অনুবাদ

করেছিলেন এবং একটা বাংলা এবং ইংরেজী অভিধান রচনা করেছিলেন। আবার কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জির ভারতের ভূগোলের বঙ্গানুবাদের জন্য শিক্ষা কমিটির সেক্রেটারির নিকট প্রস্তাব বা শিবচন্দ্র দেবের "Arabian Nights' Entertainment" - এর বঙ্গানুবাদ উল্লেখযোগ্য।[৪১] সুতরাং ড্রামন্ডের একাডেমিতে শিক্ষিত ডিরোজিওর যেমন প্রাচ্য শিক্ষার বিরুদ্ধে পক্ষপাত ছিলেন তেমন ইয়ংবেঙ্গলের অনুরূপ পক্ষপাত ছিল না।

ডিরোজিও ড্রামন্ডের স্বাধীন ও যুক্তিবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয় এ হিউমের সংশয়বাদের সাথে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।[৪২] তিনি ড্রামন্ডের কাছ থেকে মেটাফিজিকসের প্রতি ভালবাসা লাভ করেছিলেন। ১৮৩০ সালে এক সপ্তাহব্যাপী প্রতি সন্ধ্যায় তিনি পটলডাঙ্গা স্কুলে (পরবর্ত্তীকালে হেয়ার স্কুলে) মেটাফিজিকসের উপর বক্তৃতা করেছিলেন। প্রায় ১৫০ জন যুবক ঐ বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে শুনত।[৪৩] ড্রামন্ডের ন্যায় ডিরোজিওর তর্কে আগ্রহ ছিল। তিনি ছাত্রদের নিয়ে একাডেমিতে এ্যাশোসিয়েশন নামে এক তর্কসভা ১৮২৮ সালে স্থাপন করেছিলেন। তবে তিনি ড্রামন্ডের ন্যায় অন্যের উপর তাঁর মত চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ছাত্রদের অবাধ মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন।[৪৪] অবশ্য তিনি শুধু যুক্তিবাদই নয় ইংরেজ রোমান্টিক কবির ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে Passionatic Protest এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ Neo-Romantic Trend তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল।

ধর্ম্ম বিষয়ে এক সভায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পদে ইয়ং বেঙ্গঁল এক বিতর্ক করত। কিন্তু ইয়ং বেঙ্গঁলের মধ্যে তাঁরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্র শেখর দেব ছিলেন ব্রাহ্ম।[৪৫] শিবচন্দ্র দেব প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্ম না হলেও একেশ্বরবাদী।[৪৬] রসিক কৃষ্ণ মল্লিক প্রকাশ্যে ঘোষনা করেছিলেন যে তিনি চিরাচরিত প্রথানুযায়ী গঙ্গাঁজল স্পর্শ করে কোর্টে শপথ নেওয়ার বিরোধী হলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন।[৪৭] কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ ও মাধব চন্দ্র মল্লিক হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেছিলেন বলে কোন কোন লেখকরা মিশনারী পত্রিকা প্রচার করেন। কিন্তু তাঁরা নাস্তিক ছিলেন বা হিন্দু প্রথা ও ঐতিহ্য থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিলেন — এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। মহেশ চন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর বলেছিলেন যে তিনি নাস্তিক ছিলেন।[৪৮] ডিরোজিওর কোন কোন শিষ্যের ধর্ম্মমত কি তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। যাই হোক সংশয়বাদ বা নাস্তিকতার ব্যপ্তি ইয়ং বেঙ্গঁলের মধ্যে ঘটেছিল বলা যায় না।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী রামমোহনের ন্যায় মনে করতেন যে প্রাচীন মুনি-ঋষিদের বিশেষ করে মনুর রচনার সাথে হিন্দুদের পরিচয় ঘটলে তাদের মধ্যে অনেক অনেক কুসংস্কার দূর হবে।[৪৯] যুক্তিবাদের প্রভাবে কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জির এনকোয়ার পত্রিকায় অনেক কুসংস্কারের, রামগোপাল ঘোষের মুর্ত্তি পূজার[৫১] এবং রাধনাথ শিকদারের বাল্যবিবাহের

বিরুদ্ধে (নিজে পারিবারিক নির্দেশ সত্ত্বেও এক নাবালিকাকে বিয়ে করেন নি)[৫২] প্রতিবাদ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁরা সকলেই কি হিন্দু রক্ষনশীলতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত ছিলেন? উদাহরণ স্বরুপ, কৃষ্ণমোহন বিন্দুবাসিনী নামে এক নাবালিকাকে বিয়ে করেছিলেন।[৫৩] ১৮২৯ সালে তিনি, রাধানাথ শিকদার ও মাধব চন্দ্র মল্লিক উত্তর ভারতের ইংরেজী স্কুলে শিক্ষকতার জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। ঐ সময় কৃষ্ণমোহন কতৃপক্ষাকে এক পাত্রে যা লিখেছিলেন তার সমার্থ হচ্ছে যে সামনে ভাদ্রমাস, শ্রাবন মাসে তাঁরা নিয়োগ পত্র পেলে ভাদ্রমাসের আগে গৃহত্যাগ করতে পারে।[৫৪] কৃষ্ণমোহন এনকোয়ার পত্রিকায় লিখেছিলেন যে পরিবারের কর্ত্তাদের বিরোধিতা হেতু তাঁরা স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে বাস্তবে পদক্ষেপ গ্রহনে অক্ষম।[৫৫] সুতরাং তাঁদের কথায় ও কাজে ফারাক ঘটেছিল। যদিও তাঁরা রামমোহন এবং তাঁর শিষ্যদেরকে এই ফারাকের জন্য সমালোচনা করেছিলেন।[৫৬] তাঁদের মধ্যে কেহ্ কেহ্ গোঁড়া হিন্দুদেরকে অযথা আক্রমন করে বা গোমাংস ভক্ষন এবং মদ্যপানের প্রতি আসক্তি দেখিয়ে যে প্রগতিশীলতার বড়াই করেছিলেন তার মধ্যে ছিল যৌবনসুলভ উচ্ছলতা ও বাড়াবাড়ি। তাঁদের এই বাড়াবাড়ি হরচন্দ্র ঘোষের ন্যায় ডিরোজিওর শিষ্য সমর্থন করতেন না। তিনি এবং অমৃতলাল মিত্র বাস্তবে হিন্দু রীতি মেনে চলতেন। আপাতত দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন গোঁড়া।[৫৭] সুতরাং ড্রামন্ডের যুক্তিবাদী প্রভাব ডিরোজিওর মনে রেখাপাত করেছিল, কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল বলা যায় না।

যাই হোক ডিরোজিও ড্রামন্ডের কবি প্রতিভার সংস্পর্শে এসে স্কুল জীবনে কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিলেন।[৫৮] ডিরোজিও তাঁর 'The fakeer of Jungheera' কবিতা রচনায় ড্রামন্ডের সাহায্যে গ্রহন করেছিলেন— তা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।[৫৯] তবে তিনি ড্রামন্ডের প্রভাবে রবার্ট বার্ণসের প্রতি অনুরাগী হয়েছিলেন। ডিরোজিও তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ড্রামন্ডের একাডেমির মুক্তবুদ্ধি আবহাওয়া এর প্রশংসা করে বার্ণসের বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপর বিখ্যাত লাইন দুটি উদ্ধৃত করেছিলেন।[৬০] ধারনার দ্বারা ডিরোজিওর শিষ্য কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জ্জি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং হিন্দু জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন।[৬১]

ডিরোজিওর কোন কোন কবিতায় বিশেষ করে 'The Hamp of India' এবং 'To India - My Native hand' কবিতায় রোমান্টিক দেশাত্মবোধ প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি ভারতের অতীতের শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।[৬২] কিন্তু তাঁর রোমান্টিক দেশাত্মবোধ ছিল পুরোপুরি কল্পনাভিত্তিক। বাস্তবে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন না। ১৮৩১ সালের ইংরেজদের সংস্কার বিলকে আরো সংস্কারের সূচনা হিসাবে তাঁর স্বাগত জানানো[৬৩] বা তাঁর নির্দেশে হিন্দু কলেজের সিনিয়র ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত দি পার্থেনন পত্রিকার (১৮৩০) স্বস্তায় বিচারের জন্য আবেদন[৬৪] বা ইষ্ট ইন্ডিয়ানদের সাংবিধানিক

আন্দোলনের সাথে তাঁর যোগ[৬৫] — এসব থেকে বলা যায় যের তিনি ড্রামন্ডের ন্যায় ইংরেজ শাসন কাঠামোর মধ্যে সংস্কার চেয়েছিলেন। তবে তিনিই প্রথম রোমান্টিক দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছিলেন বা 'Freedom to the slave' (১৮২৭) কবিতায় দাম প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন। ডিরোজিওর উল্লেখযোগ্য কোন শিষ্য রোমান্টিক দেশাত্ববোধক কবিতা লিখেছিলেন - একথা বলা যায় না। কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৮৩০ সালে দেশাত্ববোধক কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি ডিরোজিওর শিষ্য ছিলেন না। এ্যাকাডেমির এ্যাসোশিয়েসনের ভিতরে বা বাইরে ইয়ং বেঙ্গলের রাজনৈতিক আলোচনা বা তর্ক কখনই ব্রিটিশ বা কোম্পানী বিরোধী হয়ে ওঠেনি। পক্ষান্তারে বেন্টিঙ্ককে লেখা কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জ্জির - ১৮৩১ সালের চিঠি[৬৬] বা এনকোয়ারার পত্রিকার প্রথম সংখ্যা[৬৭] পাঠ করলে পরিষ্কার হবে যে তাঁরা ব্রিটিশ শাসন কাঠামোর মধ্যে সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন — এই প্রবনতা ১৮৩২ সালের বা পরের এনকোয়ারার ও জ্ঞানান্বেষনের রচনায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা শিক্ষান্তে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে উচ্চ পদমর্যাদাপূণ চাকুরীর আকাঙ্খী ছিলেন।[৬৮] এহেন মর্য্যাদাগ্রাহী যে ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে সংস্কারের পক্ষপাতি হবেন তা ছিল স্বাভাবিক। সুতরাং ইয়ং বেঙ্গল ডিরোজিও বা তাঁর গুরু ড্রামন্ডের সংস্কারমুখী মানসিকতার অংশীদার ছিলেন।

সূত্র নির্দেশ

১. মেজ, ইলিয়ট ওয়ালটার, *হেনরি ডিরোজিও, দি ইউরেশিয়ান পোয়েট এ্যান্ড রিফর্মার,* সুবীর রায়চৌধুরি সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৯৮২, ২ : ৩।

২. মন্টেগু, সি. জে. "এ ব্রিক মেময়ের অফ দি লেট মি: ডেভিড ড্রামন্ড," দি *ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন,* খন্ড ১, নং ৬, জুন, ১৮৪৩ পৃ: ১৯৯।

৩. মন্টেগু, সি. জে. পূর্ব্বোক্ত, পৃ: ২০৭।

৪. এডওয়ার্ডস, টমাস, *হেনরি ডিরোজিও, দি ইউরেশিয়ান পোয়েট, টীচার এ্যান্ড জার্নালিষ্ট,* কলিকাতা, কোং, ১৮৮৪, পৃ: ৪।

৫. চট্টোপাধ্যায়, গৌতম সম্পাদিত, *এ্যাওয়েকেনিং ইন বেঙ্গল আরলি নাইনটিন্থ সেনচুরি,* খন্ড ১, কলিকাতা, ১৯৬৫, ভূমিকা, ৪১।

৬. মন্টেগু সি. জে. পূর্ব্বোক্ত, পৃ: ২১৫।

৭. ঐ, পৃ: ২০৫।

৮. ঐ, পৃ: ২০২।

৯. *দি গভর্নমেন্ট গেজেট,* জানুয়ারী ১২, ১৮২৬, রাচৌধুরী, সুবীর, *হেনরি ডিরোজিও ও তাঁর জীবন ও সময়।* পৃ: ১৮, ৩০-৩১।

১০. মন্টেগু সি. জে., পূর্ব্বোক্ত, পৃঃ ২০৪, রায়চৌধুরী, সুবীর, পূর্ব্বোক্ত, পৃঃ ২২।
১১. মন্টেগু সি. জে., পূর্ব্বোক্ত, পৃঃ ২০৪।
১২. ঐ
১৩. রায়চৌধুরী, সুবীর, পূর্ব্বোক্ত, পৃঃ ২২।
১৪. *দি ইষ্ট ইন্ডিয়ান*, ডিসেম্বর, ১৭, ১৮৩১, উদ্ধৃত। *দি ইন্ডিয়া গেজেট*, ডিসেম্বর ২১, ১৮৩১।
১৫. মন্টেগু সি. জে., পূর্ব্বোক্ত, পৃঃ ২০৩।
১৬. ঐ, পৃঃ ২০৭।
১৭. ঐ
১৮. ঐ
১৯. ঐ, পৃঃ ২০১।
২০. ঐ, পৃঃ ২০৪।
২১. এডওয়ার্ডস, টমাস, পূর্ব্বোক্ত, পৃঃ ৫ ও ১৫।
২২. ঐ, পৃঃ ১৯-২০।
২৩. মন্টেগু সি. জে. পূর্ব্বোক্ত, পৃঃ ২০৮ ও ২১২।
২৪. ঐ, পৃঃ ২১২।
২৫. এডওয়ার্ডস, টমাস, পূর্ব্বোক্ত, পৃঃ ১৪।
২৬. মন্টেড সি. জে. পূর্ব্বোক্ত, পৃঃ ২১২।
২৭. ঐ, পৃঃ ২১২-২১৩।
২৮. হোম পাবলিক ডিপার্টমেন্ট, চিঠিগুলির নং ৮৫-৮৬, জানুয়ারী ২৮, ১৮২৮, পৃঃ ৪৬০-৪৬২।
২৯. *ক্যালিডোস্কোপ* পত্রিকার ১৮২৯-৩০ সালের রচনার জন্য চট্টোপাধ্যায়, গৌতম সম্পাদিত, *বেঙ্গল: আর্লি নাইনটিন্থ সেনচুরি* (সিলেক্টড ডকুমেন্টস), কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ১৭-৭৬, ১০০-১১০, ১১৫ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। রচনাগুলি ই. ই. এস. জে, এফ. এম. টি. জে. সি. "A Wandeer" ইত্যাদি দখনামে প্রকাশিত হয়েছিল। ডিরোজিও "Juvenis", "East Indian", "Loperello", "Khusroo" এবং "D" দখনামে লিখতেন। আর ডেভিড ড্রামন্ড সাধারনতঃ ডি. ডি. দখনামে লিখতেন। সুতরাং রচনাগুলি ডিরোজিও বা ড্রামন্ডের লেখা নয়।
৩০. মন্টেগু সি. জি., পূর্ব্বোক্ত, পৃঃ ২১৪, রায়চৌধুরী, সুবীর, পূর্ব্বোক্ত পৃঃ ২৭।
৩১. চন্দ্র, মৃনালকান্তি, হিস্ট্রি অফ ইংলিস প্রেস ইন বেঙ্গল, ১৭৮০-১৮৫৭, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ১১৪।

৩২. মন্টেগু সি. জে. পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৬-২২৪।

৩৩. এডওয়ার্ডস, টমাস, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬-৭, মন্টেগুঙ্গ সি. জে. "এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও", *দি অরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন,* খন্ড ১, নং ১০ঙ্গ অক্টোবর, ১৮৪৩, পৃ: ৩৭৫।

৩৪. ঘোষ, বিনয়, *বিদ্রোহী ডিরোজিও* কলিকাতা, ১৯৮০ খ্রী: পৃ: ১২৯-১৩১, মৈত্র, সুরেশ চন্দ্র, "হিন্দুকলেজ: ডিরোজিও: আধুনিকতা", দে, রামপ্রসাদ সম্পাদিত, *ডিরোজিও* কলিকাতা ১৯৮৩, পৃ: ৮৬; মিত্র অমল, "লিটল এ্যাক্টরস অফ নাইনটিন্থ সেনচুরী বেঙ্গল", দি *স্টেটসম্যান,* এপ্রিল ১০, ১৯৫৫, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫।

৩৫. মন্টেগু সি. জে., পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১৮।

৩৬. ডিরোজিও, এইচ. এল. ভি., দি ফকীর অফ জঙ্গিরা, প্রথম ক্যান্টো ৮, ৯, দ্বিতীয় ক্যান্টো ৬, ব্রাডলে বার্ট, এফ. বি. সম্পাদিত *পোয়েমস অফ হেনার লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও,* লন্ডন, ১৯২৩, পৃ: ১৪৬, ১৫৭-১৫৮, ১৮০-১৮১।

৩৭. তিনি ১৮২৬ সালের মে মাসে হিন্দু কলেচের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীতে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (১৮১৮-১৮৩০) খন্ড ১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৬ সাল পৃ: ১৮, বাগল, যোগেশ চন্দ্র, "হেনরি ডিরোজিও: দি টিচার এ্যান্ড পেট্রিয়ট" দি *মর্ডাণ রিভিউ,* খন্ড ৫৫, ১৯৩৪, পৃ: ৬৪৪, জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্টাকসন-এর পর থেকে জি. সি. পি. আই (কপি বুক অফ লেটারস) খন্ড ৯, ১৮৩১, পৃ: ৩০-৩১।

৩৮. এডওয়ার্ডস, টমাস, পূর্বোক্ত. পৃ: ৩০, ৫৭, ৬৫, ১৭৮; মিত্র প্যারীচাঁদ, *এ বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ অফ ডেভিড হেয়ার,* কলিকাতা, ১৮৭৭, পৃ: ১৫।

৩৯. মিত্র, প্যারীচাঁদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৭-২৮; সরকার, সুশোভন, "ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গল" গুপ্ত, এ. সি. সম্পাদিত, *স্টাডিস ইন দি বেঙ্গল রেনেশাঁ,* যাদবপুর, ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, ওয়েস্টবেঙ্গল, ১৯৫৮, পৃ: ২৯, সরকার, সুশোভন, অন দি বেঙ্গল রেনশাঁ কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃ: ১০৯, সরকার, সুমিত, "দি কমপ্লেস্কিটিস অফ ইয়ংবেঙ্গল", *নাইনটিন্থ সেনচুরী স্টাডিস* নং ৪, অক্টোবর, ১৯৭৩, পৃ: ৫০৭।

৪০. জি. সি. পি. আই. (কপি বুক অফ লেটারস) খন্ড ৪, ১৮২৭, পৃ: ২৪৭-২৫১, ২৯১-২৯২, খন্ড ৫, পার্ট ২, ১৮২৮, পৃ: ৪৯৫-৫০১, ৫৩৯-৫৪০, খন্ড ৭, ১৮২৯, পৃ: ২৯-৩৩, ৮৫, খন্ড ৮, ১৮৩০, পৃ: ৮-৯, ৪৮-৪৯, ভালউম ৯, ১৮৩১, পৃ: ২৯-৩২, খন্ড ১০, পার্ট ১, ১৮৩২, পৃ: ৪৮; খন্ড ১২ ১৮৩৩, পৃ: ১৯১।

৪১. দি *গভর্নমেন্ট গেজেট,* জানুয়ারী, ১৭, ১৮২৮; দি *হিন্দু পেট্রিয়ট,* ডিসেম্বর ৮, ১৮৭৯, পৃ: ৫৭৩, চক্রবর্ত্তী, তারাচাঁদ, এ *ডিকশানারি ইন বেঙ্গলি এ্যান্ড ইংলিশ,* কলিকাতা, ১৮২৭, প্রিফেস ৫; দি *ইন্ডিয়া গেজেট,* জানুয়ারী ৩১, ফেব্রুয়ারী ১০ ও মার্চ ৩, ১৮৩২, মৈত্র, সুরেশ চন্দ্র, *সিলেকশনস ফ্রম জ্ঞানন্বেষণ,* কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃ: ৩২, বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *বাংলা সাময়িক পত্র* (১৮১৮-১৮৬৭), কলিকাতা, ১৩৪৬ সাল, পৃ: ৫৬; জি. সি. পি. আই (কপি বুক অফ লেটারস), খন্ড ১২, পার্ট ২, ১৮৩৩, পৃ: ৭৮৯-৭৯০, ঘোষ, অবিনাশ চন্দ্র, *নরদেব শিবচন্দ্র দেব ও তৎসহধার্ম্মিনির আদর্শ জীবনা লেখ্য* (বাংলা) কলিকাতা ১৯১৮, পৃ: ২৩৮।

৪২. উইলসনকে লেখা ডিরোজিওর চিঠি, এপ্রিল ২৬, ১৮৩১, এডওয়ার্ডস, টমাস, পূর্ব্বোক্ত, পৃ: ৮২-৮৪, এই প্রসঙ্গে সুমিত সরকারের মন্তব্য, সরকার, সুমিত, পূর্ব্বোক্ত, পৃ: ৫০৮।

৪৩. সালাউদ্দিন আহমেদ, এ. এফ., *সোসাল আইডিয়াস এ্যান্ড সোসাল চেঞ্জ ইন বেঙ্গল,* লীডেন, ১৯৬৫, পৃ: ৪১-৪২।

৪৪. ঘোষ, বিনয়, পূর্ব্বোক্ত, পৃ: ৫৮-৫৯।

৪৫. বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, "রামমোহন রায়" *সাহিত্য সাধক চরিতমালা,* নং ২৬, (খন্ড ১, বাংলা), ৪র্থ সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৩ সাল, পৃ: ৫৫; লেথব্রীজ, স্যার রোম্বার, *রামতনু লাহিড়ী, ব্রাহমন এ্যান্ড রিফর্মার,* লন্ডন, ১৯০৭, পৃ: ৭৭-৭৮; লিওনার্দ জি. এস., *এ হিস্ট্রি অফ দি ব্রাহ্ম সমাজ,* কলিকাতা, ১৮৭১, পৃ: ৫২।

৪৬. ঘোষ, অবিনাশ চন্দ্র, পূর্ব্বোক্ত, পৃ: ১৭৮, ২৪৩; মিত্র, প্যারীচাঁদ, *অন দি সোল, ইটস নেচার এ্যান্ড ইমপরট্যান্স,* কলিকাতা, ১৮৮১, প্রিফেস ১; ঘোষ শরৎচন্দ্র, *রামতনু লাহিড়ী* (বাংলা), কলিকাতা, ১৩২৮ সাল, পৃ: ১৭।

৪৭. বসু, স্বপন, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস,* কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ: ৯৩।

৪৮. স্মিথ, জর্জ, *দি লাইফ অফ আলেকজান্ডার ডাফ,* লন্ডন, ১৮৭৯, পৃ: ৯৭-৯৮।

৪৯. হোম পাবলিক ডিপার্টমেন্ট, আগষ্ট, ১৮৩১, পৃ: ২৩২, জি. সি. পি. আই (কপি বুক অফ লেটারস) খন্ড ১০, পার্ট ১, ১৮৩২, পৃ: ২০৮-২০৯।

৫০. দি *এনকোয়ারার,* জুন ৯, ১৮৩১; দি *এনকোয়ারার* উদ্ধৃত দি ইন্ডিয়া গেজেট, সেপ্টেম্বর ১৭, অক্টোবর ২২ ও ২৯, ১৮৩১।

৫১. মিত্র, কিশোরীচাঁদ, "রামগোপাল ঘোষ" দি *ক্যালকাটা রিভিউ,* খন্ড ১৮, ১৮৬৮, পৃ: ৫২০।

৫২. গুপ্ত, এ. সি., পূর্ব্বোক্ত, পৃ: ৩১; সরকার সুশোভন, *অন দি বেঙ্গল রেনেশাঁ* পৃ: ১১১।

৫৩. দাস, হরিহর, "দি রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জ্জি, ব্রাহ্মন, ক্রিশ্চিয়ান, স্কলার" দি *বেঙ্গল পাষ্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট,* খন্ড ৩৭, সিরিয়্যাল নং ৭৪, এপ্রিল-জুন ১৯২৯, পৃ: ১৩৫।

৫৪. জি. সি. পি. আই. (কপি বুক অফ লেটারস) খন্ড ৭, ১৮২৯, পৃ: ৮৮৬-৮৮৭।

৫৫. দি *এনকোয়ারার,* জুন ৯, ১৮৩১।

৫৬. খালাছুদ্দিন আহমেদ, পূর্ব্বোক্ত, পৃ: ৪৩।

৫৭. এডওয়ার্ডস, টমাস, পূর্ব্বোক্ত, পৃ: ১২৯-১৩০; মিত্র, প্যারীচাঁদ, পূর্ব্বোক্ত, পৃ: ৩১, দি *হিন্দু পেট্রিয়ট,* ডিসেম্বর ৭, ১৮৬৮, পৃ: ৩৮০।

৫৮. রায়চৌধুরী, সুবীর, পূর্ব্বোক্ত, পৃ: ২৭।

৫৯. সি. জি. মন্টেগু লিখেছেন - "The Fakeer of Jungheera received inundations and additions from the Muse of Drummond" — দি *ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন,* খন্ড ১, নং ৬, জুন ১৮৪৩, পৃ: ২১৬। কিন্তু ডিরোজিওর অন্যতম জীবনলেখক টমাস এডওয়ার্ডস বা ই. ডবলিউ. সেজ এ বিষয়ে নীরব।

৬০. দি *ইষ্ট ইন্ডিয়ান,* ১৭, ১৮৩১, উদ্ধৃত, দি *ইন্ডিয়া গেজেট,* ডিসেম্বর, ২১, ১৮৩১।

৬১. স্মিথ, জর্জ, পূর্ব্বোক্ত, পৃ: ৯২, প্যাটন, *আলেকজান্ডার ডাফ,* লন্ডন, স্টুডেন্ট ক্রীশ্চিয়ান মুভমেন্ট, ১৯২৩, পৃ: ৮১-৮২।

৬২. উদ্ধৃত ডি. বেরী, উইলিয়াম থিওডোর, *সোরসের অফ ইন্ডিয়ান ট্রাডিশন,* নিউইয়ক, ১৯৫৮, পৃ: ৭২৭-৭২৮।

৬৩. এডওয়ার্ডস, টমাস, পূর্ব্বোক্ত, পৃ: ১৪৬।

৬৪. দি *বেঙ্গল স্পেকটেটর,* সেপ্টেম্বর ১, ১৮৪২।

৬৫. এডওয়ার্ডস, টমাস, পূর্ব্বোক্ত, পৃ: ১১২, ১১৫-১২০, ১৪২, ১৪৭-১৫২; দি *ইন্ডিয়া গেজেট,* আগষ্ট ৩, ১৮৩১।

৬৬. বেন্টিঙ্ককে লেখা কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জ্জির চিঠি নভেম্বর ২৩, ১৮৩১, বেন্টিঙ্ক পেপারস (ফিল্ম নং ২) পি. ডবলু. এফ. জে. ৩৯।

৬৭. দি এনকোয়ারার, জুন ৯, ১৮৩১।

৬৮. দি এনকোয়ারার, সেপ্টেম্বর ৬, ১৮৩১।

লিয়েবেদেফের পূর্বে বাংলা নাটক ও নাট্য

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা নাটক ও নাট্যকলা সম্পর্কে একটা সাধারন ধারনা আছে, যে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকালে, বিশেষত, অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনবিংশ শতকের প্রথমে এর উদ্ভব ও বিস্তার হয়েছিল। এমন কি কোন কোন নাট্য ইতিহাস গ্রন্থেও এ ধারনা ব্যক্ত হতে দেখা যায়। ঐতিহ্যবিমুখ ঔপনিবেশক মানসিকতা প্রসূত ধ্যান ধারনার ফল হিসাবে এমন ধারনার জন্ম হয়েছে বলা যেতে পারে।

বাংলা নাটক ও নাট্যকলার ইতিহাস রচনা করতে হলে হাজার বছরের ঐতিহ্য অনুসন্ধান অবশ্যক। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর লিয়েবেদেফের প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল থিয়েটার' 'কাল্পনিক সংবদল' নাট্যঅভিনয় দিয়ে যে বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের শুরু হল কলকাতায়,তাতে বাংলা নাট্যকলার আঙ্গিক ও উপস্থাপনরীতি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল মাত্র। কিন্তু এর পূর্বে প্রায় হাজার বছর ধরে এদেশে বিভিন্ন ধারার নাট্যকলার প্রচলন ছিল। তাই গুটিকতক সাপুরে অভিজাতের হাতে বা ঔপনির্বেশিক শাসনের ফল হিসেবেই উনিশ শতকে বাংলায় নাট্যকলার উদ্ভব ঘটেছে একথা ভ্রান্ত প্রমানিত হবে যদি আমরা দেখি পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মত বাংলায়ও বৃটিশ শাসনের বহুশত বছর আগে স্থানীয় জনসাধারনের দ্বারাই নাট্যকলার গোড়াপত্তন হয়োছ। বিবর্তনের এই জটিল ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটি, যা উপনিবেশিক এবং উপনিবেশ পরবর্তী নাট্যকলা আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের অবশ্যই অভ্যন্তরে দৃষ্টিনিবেশ করতে হবে।

ঠিক কবে থেকে বাংলা ও বাঙালীর নাট্যচর্চা শুরু তা আমরা সুনির্দিষ্ট করতে পারি না। সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, নৃত্যের মত নাট্যকলার বয়সও পৃথিবীর কোন দেশেই মেপে নিতে পারে নি। কারন এ সবের জন্ম মানুষের আদিম রসচেতনার রহস্যময় অতীত। দুশ বছর আগে অর্থাৎ লিয়েবেদেফের আগে আমরা যদি লিখিত নাটক না পাই, তার অর্থ কি এই যে দুশ বছর আগে পর্যন্ত বাঙালী নাট্যরস কী বস্তু জানত না, নাট্যভিনয়ের কোনরকম প্রক্রিয়াতেই আগে যুক্ত ছিলেন না, নাট্যচর্চা বলে কিছু ছিল না? নাট্যচর্চার ইতিহাস অবশ্যই আছে। আসলে তা নিয়ে অনুসন্ধান বা গবেষণা কম হয়েছে।

প্রাচীন মিশরীয় নাট্যসাহিত্য তৈরী হয়েছে ওসিরিসের করুণ গাথা অবলম্বন করে। প্রাচীন গ্রীসে দেবতা দিওনিসুসের স্তব করা হত তারই জীবন কাহিনী বর্ণনা করে। এই

স্তোত্রগুলিকে ডিথিবাম্ব নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই গ্রীক নাটকের উদ্ভবের পিছনে ধর্মীয় 'কৃত্য' ক্রিয়াশীল এবং এই ধর্মীয় 'কৃত্য' সমষ্ঠিগত বিশ্বাস থেকে জাত। অনুরূপভাবে সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস ও ধর্মীয় কৃত্যসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। ধর্মীয় যাগযজ্ঞ স্তোত্র পাঠ, লোকজ বিশ্বাস কিংবা প্রাত্যহিক জীবনাচরনের অনুষঙ্গে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব ঘটেছে। গ্রীক নাটক যেমন ধর্মোৎসবের অংশ হিসাবে পরিবর্ধিত হয়েছিল তেমনি সংস্কৃত নাটকও যাগযজ্ঞের অঙ্গ অনুষ্ঠানরূপে বিবর্তিত হয়েছিল। বৈদিক যুগে যে নাট্যিক ক্রিয়ার উৎপত্তি লক্ষ্য করা যায় তা আসলে লৌকিক আনন্দানুষ্ঠানের প্রাকাশ। আর এই লৌকিক আনন্দানুষ্ঠানের লোকজ জীবনের উপর লোকমানসের প্রত্যক্ষ দৈব বিশ্বাসের ফল মাত্র।

অনার্যরীতি বলে ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' যে রীতিটাকে উপেক্ষা করেছিলেন সেই উপেক্ষিত রীতিটিই ক্রমবিকশিত হয়েছিল নিজস্ব ধারায়। বাংলা নাটকের প্রধান বৈশিষ্ঠ হলো তার অন্তর্নিহিত সঙ্গীত ধর্মীতা, বর্ণনাত্মক সংলাপ এবং নৃত্যভঙ্গিমা। কালের বিবর্তনে রাজনৈতিক, সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারায় উপকথা, ইতিহাস, কিংবদন্তী, সমকালের সামাজিক -রাজনৈতিক-লৌকিক কাহিনী প্রভৃতি বাংলা নাটকে স্থান করে নিয়েছে।

প্রথমেই 'নাট্য' (থিয়েটার) ও 'নাটক' (ড্রামা) এর পার্থক্য সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া দরকার। যে কোন ত্রিমাত্রিক আয়তন (Space) এ এক বা একাধিক মানুষ যখন অপর এক বা একাধিক মানুষের সম্মুখে যে কোন ক্রিয়া উপস্থাপন করে তাকেই 'নাট্য' বলা হয়। এই উপস্থাপনটি হতে পারে সম্পূর্নভাবে পুর্বনির্দিষ্ট একটি লিখিত পাঠের মাধ্যমে অথবা হতে পারে তাৎক্ষনিক উপায়ে মৌখিকভাবে সৃষ্ট। এমন কি এই দুয়ের মাঝে থাকতে পারে অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ রীতি প্রকরন। আর যে কোন 'নাট্যের' লিখিত পাঠই হল 'নাট্যলিপি'। এই 'নাট্যলিপি'র এক বিশেষ প্রকরনকে 'নাটক' বলা হয়ে থাকে।

লিয়েবেদেফের পুর্বে বাংলার নিজস্ব স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য সুপ্রাচীনকাল থেকে কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত রীতি পদ্ধতি কাঠামোর মধ্য দিয়ে বিকাশিত হয়েছে। গবেষক পন্ডিতগণ সেগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন — (১) সংস্কৃত নাট্য প্রভাবজাত রীতি (২) কথানাট্য (৩) নাট্যগীত (৪) লৌকিক হাস্যরসাত্মক নাট্য (৫) মিত্রনাট্য (৬) পুতুলনাচ।

গবেষকরা বিভিন্ন তথ্য বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে প্রচীন বাংলা নাট্য কখনো আর্য সংস্কৃত নাট্যকলার মূলধারা অনুসরণ করে চলে নি। ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র' নামক গ্রন্থে এই মতের সমর্থন মেলে। ভরতমুনি তার গ্রন্থে (২০০ খ্রীঃ পূঃ রচিত) উল্লেক করেছেন যে, পূর্বে-ভারতে 'ওড্র-মাগধী' প্রবৃত্তি প্রচলিত ছিল এবং এর বৈশিষ্ঠ্য ছিল উত্তেজনাপূর্ন আবেগদীপ্ত অভিনয়। পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্য ও নাট্যভাষ্যকরনে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে বর্নিত প্রধান দশটি নাট্যধারার অতিরিক্ত 'উপরূপক'

নামক এক ধরনের গৌণ নাট্যরীতির কথা উল্লেখ করেছেন। এই গৌণ নাট্যরীতি তথা 'উপরূপক' ধ্রুপদী ঐতিহ্যের মুলধারা বহির্ভূত হলেও জনগনের মাঝে এর ব্যাপক চাহিদা ও জনপ্রিয়তার জন্য পরবর্তীকালে পন্ডিতগনের স্বীকৃতিলাভে সমর্থ হয়। বাংলার পাল বংশের শাসনকালে (৭৫০-১১৬২ খৃ:) বৌদ্ধ পন্ডিত সাগর নন্দী রচিত সংস্কৃত নাট্যতত্বের উপর সমালোচনামূলক একটি গ্রন্থের (গ্রন্থটি - 'নাটক লক্ষন রত্নকোষ') উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি দশম শতকের শেষদিকে কিংবা একাদশ শতকের প্রথমদিকে কোন এক সময়ে রচিত বলে অনুমান করা হয়। যা থেকে এটা প্রমান করা যায় যে দশম-একাদশ শতকে প্রাচীন বাংলায় পাল বংশের পৃষ্ঠপোষকতার অবশ্যই নাট্য রচিত হয়েছে।

জয়দেব রচিত 'গীত গোবিন্দ' এখনও পর্যন্ত প্রাচীনতম সংস্কৃত নাট্যলিপি। জয়দেব দ্বাদশ শতকের শেষদিকে বাংলার রাজা লক্ষন সেনের সভাকবি ছিলেন বলে মনে করা হয়। জয়দেব 'জনপদ' (Popular) ও 'অভিজাত' (Elite) এই দুইয়ের মাঝে এক ধরনের সংশ্লেষ ঘটিয়ে থাকবেন বলে গবেষকরা অনুমান করেন। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় তুর্কী বিজয় অভিযানের ফলে রাজসভাকেন্দ্রিক অভিজাত সংস্কৃত নাট্যচর্চা একবিরাট ধাক্কা খায় এবং এর বিকাশ গুরুতর বাধা পায়। অধিকাংশ ব্রাহ্মন সাহিত্য বিশারদগন পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজা শাসিত মিথিলা ও নেপালে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয়লাভ করেন এবং চতুর্দ্দশ শতকের শেষে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক বাংলায় একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম সুলতানি রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার রাজসভায় শিল্পচর্চা বিশেষ স্থান লাভ করতে পারে নি। ফলে বাংলায় সংস্কৃত চর্চার ধারা দিন দিন ক্ষয়িষ্ণুতার পথে ধাবিত হয়। নেপালী রাজসভার কবিগণ কিন্তু দ্বাদশ শতক থেকেই সংস্কৃত ভাষায় নাট্য রচনা করে আসছিলেন।

ষষ্ঠদশ শতকে বাংলাদেশে শ্রীচৈতান্য (১৪৮৬-১৫৩৪ খৃ.) প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন দ্বারা প্লাবিত হয়। এই আন্দোলন বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। এই আন্দোলন ছিল সংকীর্ন ব্রাহ্মন্যবাদ, পীড়নমূলক হিন্দু বর্নপ্রথা, বহিরাগত তুর্কী আধিপত্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদসরূপ। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণববাদের ভিত্তি ছিল এই বিশ্বাস যে প্রেমই ঈশ্বর এবং এই মতবাদ জনসাধারন ও অভিজাত শ্রেণী উভয় অংশেরই বিপুল সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। শ্রীচৈতান্যের শিষ্যগন সাফল্যজনকভাবে স্থানীয় নাট্যরীতির উন্নয়নের পর অভিজাত শ্রেনীর ঐতিহ্য অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় ব্যাপকহারে নাট্যলিপি রচনা শুরু করেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল তাঁরা জনপদ নাট্যকলার ঐতিহ্য এবং গীতগোবিন্দের প্রভাব থেকে সম্পূর্ন মুক্ত হতে পারেন নি। এই সময়ে 'যাত্রা' নাট্যরীতির ক্রমবিকাশের ফলে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ন ভূমিকা

পালন করে রূপ গোস্বামীর নাটকগুলি। এসব রূপও চৈতন্যদেবের বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থ এবং আগে অগনিত কৃষ্ণবিষয়ক কবিতা ও গান জনসাধারনের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। সতেরো শতকে এসবেরই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় 'কৃষ্ণযাত্রা' বাংলার নাট্যধারাসমূহের নেতৃস্থানীয় ধারা হিসেবে অবিভূত হয়।

সপ্তদশ শতক থেকে নেপালী রাজদরবারে রচিত বেশ কিছু নাট্যলিপির পান্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। যেগুলি সংস্কৃত এবং মৈথিলি-ব্রজবুলি বাংলার মিশ্র উপভাষায় রচিত। এ সময়ে তুর্কী শাসকবর্গের অনুকূল্য ছাড়া ধ্রুপদী দরবারি নাট্যকলা যে কেবল ব্রাহ্মন পন্ডিতগনের মধ্যেতেই অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল এবং এক্ষেত্রে তাঁরা বাংলার হিন্দু সামন্ত ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন, তা গবেষকরা প্রমান করেছেন।

বৈষ্ণব পন্ডিতগন অষ্টাদশ শতকে বেশ কিছু সংখ্যক সংস্কৃত নাট্যলিপি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদ কর্ম ছাড়া এসময়ে মৌলিক নাটক রচনার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। এই শতকের মধ্যবর্ত্তী কোন এক সময়ে ভরতচন্দ্র রচনা করেন 'চন্ডীনাটক'। এই নাট্যলিপিটি অসম্পূর্ন এবং এতে বাংলা, সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি ও ফার্সী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। সংস্কৃত নাট্যলিপি অনুবাদের ঝোঁক উনবিংশ শতকেও অব্যহত থাকে এবং তা ছিল প্রথাগত সাংস্কৃত নাট্যকলার প্রধান অনুসরণকারী। এইভাবে সংস্কৃত নাটক অনুবাদের ধারা বাংলায় আরো কিছুকাল ধরে চললেও সমকালীন নাট্যচর্চার বিকাশে এর ভূমিকা ছিল গুরুত্বহীন। ক্রমবর্ধমান সামাজিক সচেতনতা এবং বঙ্গীয় রেনেশাঁর প্রভাব সমাজে যতই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ট হচ্ছিল, সংস্কৃত নাট্যকলার আদর্শ উনবিংশ শতকের বাঙালী সমাজের বৈশিষ্ট তুলে ধরতে ততখানি সফল হয়েছিল। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রকারান্তরে সংস্কৃত নাট্যতত্বের প্রভাব বাংলা নাট্যকলা থেকে ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে থাকে।

বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্যে 'কথানাট্য-রীতি' প্রভূত পরিমানে বিকশিত হয়েছিল। প্রথাগত সংস্কৃত নাট্যকলায় মতো সমাজের অভিজাত শ্রেণীর মাঝে এটি সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং জনগনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই এর অগ্রযাত্রা সূচিত হয় এবং কখনো জনগনই হয়ে দাঁড়াতো এর স্রষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক।

'কথানাট্য' এমন এক ধরনের নাট্যরীতি যেখানে একজন মাত্র কুশীলব (গায়েন অথবা কথক) গদ্যে, পদ্যেছন্দে তথবা গীতের মাধ্যমে কোন কাহিনী পরিবেশন করেন। কখনো তাঁর হাতে থাকে একটি চামর এবং পায়ে ঘুঙুর। প্রায় হাজার বছর আগে থেকেই যে বাংলায় 'কথানাট্য' রীতির নাট্যানুবধান প্রচলিত তা বিশিষ্ট গবেষক কপিলা বাৎসায়ন উল্লেখ করোছন। তিনি বলেছেন যে খ্রীষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বাংলা অঞ্চলে জনপ্রিয় 'চর্যা' নামক এক ধরনের গানের অস্তিত্ব ছিল। সাধারনভাবে এটি 'চর্যাপদ' নামে পরিচিত। একটি 'চর্যাপদে' 'বুদ্ধ নাটকের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

'কথানাট্য' মূলত বর্ণনাত্মক অভিনয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এর লিখিতপাঠের জন্য অভিনেতাগন বরাবর নির্ভর করেন এক প্রকার বর্ণনাধর্মী কাব্যের উপর। সম্ভবত এসব কাব্য প্রথমাবস্থায় মুখে মুখে রচিত ও প্রাচারিত হত এবং ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকেই তা লিপিবদ্ধ হতে শুরু করে। বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী এগুলি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। রামায়ন ও মহাভারতে বর্ণিত আর্যদেবতা ও অবতারগনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কাহিনী 'বৈধকী' রীতিতে পরিবেশিত হত। এর থেকেই উদ্ভব হয় রাময়ণ গান, কুশানগান, লক্ষীর গান, বিভিন্ন কৃষ্ণকাহিনী, বিভিন্ন ধরনের কীর্তন যেমন - নামকীর্তন, লীলাকীর্তন, পদাবলী কীর্তন, যপ কীর্তন ইত্যাদি। বিভিন্ন অনার্য দেবী ও দেবতা যেমন - মনসা, চন্ডী, শীতলা, ধর্ম, সূর্য, শিব প্রমুখকে কেন্দ্র করে যে কথানাট্য রচিত হত তা প্রধানত 'মঙ্গলকাব্য' এবং 'নাথগীতিকা' সমূহের ভিত্তিতে পরিবেশিত হত। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ বছর ধরে এ ধরনের বর্ণনামূলক রচনা অব্যাহত থাকে। উন্নতমানের সাহিত্যকর্ম ছাড়াও মঙ্গলকাব্য ছিল এমন এক ধরনের নাটলিপি যা নিরক্ষর জনগনের মধ্যে ভাববিনিময়ে সক্ষম ও সর্বাধিক উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছে। মঙ্গলকাব্যভিত্তিক 'কথানাট্য' কে আখ্যায়িত করা যেতে পারে মধ্যযুগে বাংলার জাতীয় নাট্যকলা হিসাবে। মঙ্গলকাব্যের অভ্যন্তরে নাটকীয়ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে আর্য-অনার্য বিরোধ। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য যেমন - মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মঙ্গলকাব্যভিত্তিক 'কথানাট্য' যেমন - পদ্মপুরান, মঙ্গল চন্ডীর গান, বিষহরার গান, রয়ানী প্রভৃতি এবং অষ্টাদশ শতকে কিছু কিছু মঙ্গলকাব্য ভিত্তিক 'কথানাট্য' 'যাত্রা' রীতির প্রভাবে রূপান্তরিত হয় যেমন - চন্ডীযাত্রা, ভাসান যাত্রা প্রভৃতি - এসবই একাধারে জনপ্রিয় ও অর্থপূর্ন এবং তা শুধু জনগনের আশা-আকাঙ্খাকেই প্রতিফলিত করে নি, বরং মধ্যযুগীয় বাংলার সামাজিক বৈশিষ্টসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী অনুষ্ঠান হিসাবেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। 'নাথগীতিকা' মূলত নাথ ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে রচিত হলেও ক্রমে তা সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'কথানাট্যে'-র আরেকটি ধারা হল মুসলিম বীর, আধ্যাত্মিক সাধক, মহানবী ও তাঁর পরিবারবর্গের জীবনকাহিনী অবলম্বনে বর্ণনামূলক রচনা, যা সাধারনভাবে 'পুঁথি' নামে পরিচিত। এর থেকে উদ্ভব হয়েছে - গাজীর গান, মাদার পীরের গান, মানিক পীরের গান, জারী গান প্রভৃতি। 'কথানাট্যে'- র আরেকটি উজ্জ্বল ধারা হল প্রধানত রাজানুকুল্যে প্রাপ্ত মুসলমান কবিদের দ্বারা পারস্যদেশীয় রচনাসমূহ সরাসরি বাংলা ভাষায় অনুবাদ অথবা সেসবের ছায়া অবলম্বনে কাহিনীকাব্য রচনা। যেমন - ইউসুফ জুলেখা, লাইলি মজনু, আলিফ-লায়লা প্রভৃতি। সপ্তদশ শতকে প্রধানত বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলে স্থানীয় লোককাহিনী অবলম্বনে ধর্মভাবমুক্ত এক ধরনের বর্ণণামূলক সাহিত্য রচিত হতে থাকে, যা এখন আমাদের কাছে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' নামে সুপরিচিত।

মধ্যযুগের অভিনয়কলাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' সাঙ্গীতিক আদর্শটি এবং এর কাঠামো থেকেই বিকাশ লাভ করে 'নাট্যগীত' রীতি, যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'। এছাড়া অত্যধিক জনপ্রিয় 'কৃষ্ণযাত্রা', চৈতন্য যাত্রা, শক্তি যাত্রা, নাথযাত্রা, পালযাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা, গুনাইযাত্রা প্রভৃতি। যদিও 'যাত্রা' হচ্ছে 'নাট্যগীত' রীতির প্রধান শাখা, তথাপি এই রীতিকাঠামো থেকে উদ্ভুত অন্যান্য উপশাখা গুলির উত্থানও এসময়ে লক্ষ্য করা যায়, যেমন - ঘাটু, কোকরানাচ, অষ্টক প্রভৃতি।

বহু প্রাচীনকাল থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে জনগনের মধ্যে লৌকিক হাস্যরসাত্মক নাট্যরীতির ঐতিহ্য অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে সক্রিয় ছিল এবং বাংলার জনগোষ্ঠীর মধ্যেও যে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল তা বোঝা যায় এখানে প্রচলিত অসংখ্য হাস্যরসভিত্তিক গানের অস্বিত্ব দেখে। উনবিংশ ও বিংশ শতকে লিখিত অগুন্তি নাটক ছাড়াও মধ্যযুগের সাহিত্যে এবং প্রমোদানুষ্ঠানে যে হাস্যরসচর্চা হত তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে। এছাড়া সঙ, লেটো, কুশানযাত্রা, গম্ভীরা, অলকাপ প্রভৃতি উল্লেখ। এই সকল কৌতুক-রঙ্গরীতি অধিকাংশ সময় সমাজের অভিজাত শ্রেনী কর্তৃক হয়েছে অবহেলিত, কোনঠাসা এবং অশ্লীলতার অভিযোগে পরিত্যক্ত। শাসনক্ষমতার মূলকাঠামোকে সমালোচনা ও চ্যালেঞ্জ করতে এসব জনপদ সংস্কৃতিভুক্ত নাট্যরীতি যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

বাংলার স্থানীয় জনগোষ্ঠী অন্যান্য অনুষ্ঠানরীতি উদ্ভাবন করে, যেগুলির মধ্যে বর্ণনামূলক অথবা চরিত্রাভিনয় দ্বারা কোন কাহিনী বা ঘটনা উপস্থাপিত না হলেও নাট্যের অপর সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এ জন্যেই এ সকল অনুষ্ঠান রীতিকে 'মিশ্র নাট্য' আখ্যায়িত করা হয়েছে, যেমন - কবিগান, পটুয়াগান। 'কবিগান' হল দ্বন্দ্বমূলক এমন এক 'মিশ্র নাট্য' রীতি যেখানে দুটি গায়ক-বাদক 'কবিগন' এর বিভিন্ন ধারা হল - খেউড়, তর্জা, দাড়াকবি প্রভৃতি। 'পটুয়াগান' হল - এক ভ্রাম্যমান বাদকদল গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বর্ণনামূলক গান ও পটে আঁক বিভিন্ন ধরনের কবি সহযোগে অনুষ্ঠান প্রদান করে থাকে।

'পুতুলনাচে'র উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন পন্ডিত বিভিন্ন মত পোষন করেছেন। কারোর মতে আজকের আধুনিক অভিনয়শিল্প মূলত পুতুলনাচ থেকেই অস্তিত্ব লাভ করে থাকবে। কেউ বলছেন প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে দেবদেবীর কৃতিত্বপূর্ন কাহিনী ভক্তবৃন্দের সামনে প্রচারের উদ্দেশ্যে নিস্পন্দ প্রতিমায় গতিসঞ্চারের প্রচেষ্টার মাধ্যমে পুতুল নাচের জন্ম। কারোর মতে ভারতীয় ধ্রুপদী সংস্কৃত নাট্যকলা অন্তত আংশিকভাবে হলেও পুতুলনৃত্যকলা থেকে উদ্ভব লাভ করেছে। পুতুলনাচের কয়েকটি রূপ হল - সূত্রপুতুল, দন্ডপুতুল, দস্তানাপুতুল, কায়াপুতুল।

সুতরাং একথা বলা যায় যে লিয়েবেদেফের বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সূচনার আগে থেকেই বাঙালীর নাট্যচর্চার একটা সুদীর্ঘ ও ঐতিহ্যপূর্ন ইতিহাস ছিল। লিখিত নাটক সেভাবে না পেলেও (ভরতচন্দের 'চন্ডী' নামে একটি নাটকের চারটি পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে, যেটি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত বলে অনুমান) বাঙালীর নাট্যচর্চা অব্যহত ছিল। পাশাপাশি চলছিল লোকনাট্যের ধারা। মধ্যযুগের এই বাংলা নাট্যধারা কাব্য, সঙ্গীত ও নৃত্যের মিশ্রণে অসাধারণ উপস্থাপনা এবং তা নিঃসন্দেহে নাট্যমূলক।

তাই বাংলা নাটক ও নাট্যের সঠিক ও পূণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ধারাবাহিকতা অনুসন্ধান অপরিহার্য। নাটকের মত একটি জননন্দিত শিল্প মাধ্যম শুধু উনবিংশ শতকের আকস্মিক উদ্ভাবনা নয়। নানা রূপে ও রীতিতে, আমাদের এই জনপদে সহস্র বছর ধরে যে ধারা বহমান ছিল তার সন্ধানই আমাদের লক্ষ্য। সুদীর্ঘ পথ ধরে বাঙালী তার নিজস্ব ধারার নাট্যকে খুঁজে চলেছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তি আসার ফলে সেই সন্ধান ব্যহত হয়। আমাদের সংস্কৃতিবান নাগরিকরা সেই সময় এই ধারাকে উন্নত ও উজ্জীবীত করার কোন আগ্রহ না দেখিয়ে, হাতের কাছে পাওয়া তথাকথিত উন্নত বিদেশী থিয়েটারকেই আপন করে নিতে চাইলেন। ফলে আমরা হারালাম আমাদের নিজস্ব 'নাট্য'। যেটুকুও বা ছিল তাও বিকৃতরূপ হয়ে উঠল।

সূত্র-নির্দেশ

১. অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৭০।

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৯।

৩. অশোক কুমার মিশ্র, বাংলা প্রহসনের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮৮।

৪. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৯৯৩।

৫. ওয়াকিল আহমেদ, বাংলার লোক সংস্কৃতি, ঢাকা, ১৯৭৪।

৬. গৌরী শঙ্কর ভট্টাচার্য, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২।

৭. প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা, কলিকাতা, ১৯৮২।

৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যকলার ইতিহাস; ১৭৯৫-১৮৭৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪৬।

৯. বৈদ্যনাথ শীল, বাংলা সাহিত্যের লোক নাট্যের ধারা, কলিকাতা, ১৩৭৮।

১০. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৯১; নট নাট্য নাটক, কলিকাতা, ১৩৭২।

১১. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারত নাট্যশাস্ত্র (সু. ব. সম্পাদিত) কলিকাতা, ১৯৮০।

১২. সৈয়দ জামিল আহমদ, হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫।

১৩. সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাঙালা নাট্য, বাংলা আকাডেমী, ১৯৯৬; বাঙালা নাট্যকোষ , শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, (ঢাকা), ১৯৯৮।

১৪. জন. বি আলফানসো-কারকলা, এ্যান এ্যান্থালজি অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার। পেনগুইণ, ১৯৭১।

১৫. রুস্তম ভারুচা, রিহার্সালস অফ রেভলিউসন : দ্য পলিটিকাল থিয়েটার অফ বেঙ্গল। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫।

১৬. ফকিয়ন বাওয়ার্স, থিয়েটার ইন দ্য ইষ্ট : এ সার্ভে অফ এশিয়ান ডান্স এ্যান্ড ড্রামা, নিউইয়র্ক, ১৯৫৬।

১৭. সেলিম অল দান। ফোক থিয়েটার, ট্রাডিসনস অফ বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১।

১৮. পি. গুহঠাকুরতা, দ্য বেঙ্গলী ড্রামা : ইটস অরিজিন এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, লন্ডন, ১৯৩০।

১৯. সুশীল কুমার মুখার্জী, দ্য ষ্টোরী অফ ক্যালকাটা থিয়েটারস, ১৯৫৩-১৯৮০। কলিকাতা, ১৯৮২।

২০. ডিক্টর টার্নার, ফ্রম রিচুয়াল টু থিয়েটার : দ্য হিউমান সিরিয়াসনেস অফ প্লে, নিউইয়র্ক, ১৯৮২।

২১. কপিলা বাৎসায়ন, ট্রাডিসনাল ইন্ডিয়ান থিয়েটার মালটিপল্ ষ্ট্রিমস্, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮০।

মীর মশাররফ হোসেনের রচনাবলীতে সমকালীন সামাজিক ইতিহাসের উপাদান

মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া

মীর মশাররফ হোসেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে খ্যাতিমান সাহিত্য সাধক। তাঁর জীবন ও সাহিত্য সমকালীন বাঙালী মুসলমানদের জীবন-ভাবনা, মনন-মানস ও চিন্তা চেতনার সঙ্গে সংহতিরসূত্রে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর রচনার্থ সমাজ-চিন্তা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও অকপট স্পস্টবাদিতা তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। তিনি ছোট বড় প্রায় বিয়াল্লিশ গ্রন্থের রচয়িতা। নাটক, উপন্যাস , কবিতা, প্রহসন, আত্মজীবনী ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা অবলম্বনে রচিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করলে সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার একটি চিত্র ভেসে উঠে। তাঁর অধিকাংশ রচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম-সাংস্কৃতিক অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী স্থান লাভ করেছে।

সাহিত্যকর্মসহ সংক্ষিপ্ত জীবনী আলেখ্য ঃ

মীর মশাররফ হোসেন ১৮৪৭ খ্রিস্টাদের ১৩ই নভেম্বর মোতাবেক ২৮শে কার্তিক ১২৫৪ সালে কুষ্টিয়া জেলার (তৎকালীন নদীয়া) কুমারখালীর নিকটস্থ লাহিড়ীপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। এটি ছিল তাঁর মাতুলালয়। তাঁর পিতৃকূল ফরিদপুরের পদমদীর জমিদার সৈয়দ বংশের। তাঁর পিতার নাম মীর মোয়াজ্জম হোসেন আর মাতার নাম সৈয়দ দৌলতন্নেসা। মীর মশাররফ মাতুলগৃহে মুনশীর কাছে আরবী ফারসী এবং বাংলা শেখেন। জগমোহন নন্দীর সে পাঠশালার পর কুমারীখালীর ইংরেজী-বাংলা মিশনারী স্কুল, কিছুদিন পদমদীর নবাব স্কুল অতঃপর কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে তিনি লেখাপড়া করেন। সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে তিনি ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত পড়েছিলেন।[১] মোটকথা তাঁর আনুষ্ঠানিক অধ্যয়ন যৎসমান্যই বলা চলে।

মীর মশাররফ হোসেন ছাত্র জীবন থেকেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। কুমারখালীর 'গ্রামবার্তা' সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙ্গাল হরিনাথ, ঈশ্বরগুপ্ত মহোদয়ের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রামচন্দ্রগুপ্ত আর ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমূখ ছিলেন তাঁর সাহিত্যগুরু। উপরোক্ত পত্রিকাদুটোতে লিখেই মীর মশাররফ হোসেন হাত পাকান।[২] এছাড়া অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান লেখকেরা এক ধরনের

মিশ্র ভাষায় ইসলামের ইতিহাস, মুসলিম জীবন এবং নানারকম কিংবদন্তী অবলম্বনে কাব্যকাহিনী রচনা করতেন। সেসব পাঠ করে তিনি মুসলিম ইতিহাস ও পুঁথি সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় এসে কালীঘাট স্কুলে ভর্তি হওয়ার নাম করে পিতৃবন্ধু নাদের হোসনের গৃহে অবস্থানকালে পিতার অজ্ঞাতসারেই নাদের সাহেবের দ্বিতীয়কন্যা আজিজুন্নেসার সাথে তার বিয়ে হয় (১৮৬৫)। তাঁর এ বিবাহ মোটেই সুখের হয়নি। নাদের হোসেনের পারিবারিক ষড়যন্ত্র, লাতিফুননেসার অনিচ্ছা সত্ত্বেও হোসেন আলী মিয়ার মত বৃদ্ধের কাছে স্বপত্নীগৃহের তাঁর বিবাহ, বিবাহের আটদিন পর শোকে লতিফুনের করুণ মৃত্যু, বিবাহ মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর পিতার অর্থ-সংক্রান্ত মনোভাব ইত্যাদি পারিবারিক ও সামাজিক ট্রাজেডী মশাররফ হোসেনের জীবনে বেশ রেখাপাত করেছিল। পরবর্তীকালে তাঁর রচনাবলীতে এ সবের প্রতিফলন দেখা যায়।

মীর মশাররফের প্রথম গ্রন্থ 'রত্নাবলী' (১৮৬৯)। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের পর পর 'গোরাইব্রীজ' বা 'গৌরীসেতু' কাব্যগ্রন্থ এবং 'বসন্তকুমারী' ও জমিদার দর্পন নাটকদ্বয় প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সাঁত্তার কুলসুম ওরফে কালীকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহন করেন। এ বিবাহের মাত্র একমাস পর তিনি প্রথমা স্ত্রীর নামানুসারে 'আজিজুননেহার' নামে একটি পত্রিকা বের করেন।[৩]

জ্যেষ্ঠাপত্নী, কনিষ্ঠা অর্থাৎ কুলসুমকে তিনি ধরাধাম থেকে সরাবারও ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তা ফাঁস হয়ে পড়ে। সমাজে সপত্নীবাদের এ তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্য জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'এর উপায় কি?' প্রহসনটি প্রণয়ন করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার পদে যোগদান করেন। দ্বিতীয়া পত্নী বিবি কুলসুমকে তিনি সেখানে নিয়ে যান। এখানেই তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'বিষাদসিন্ধু' (তিনি খন্ড ১৮৮৫-১৮৯১) রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে 'সঙ্গীত লহরী' (১৮৮৭), 'বেহুলা গীতাভিনয়' (১৮৮৯), 'পঞ্চনারী পদ্য', 'গো-জীবন' (১৮৮৮), 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০), 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৯৯)। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় বেশ উন্নতমানের। কাজী আবদুল মান্নান 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কে মীর সাহেবের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি বলে মনে করেন।[৪] আপরদিকে মুহম্মদ আবদুল হাই বলেন, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'ই মীরের শ্রেষ্ঠ রচনা[৫], জীবনের শেষদিকে তিনি 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০১), 'মুসলমানদের বাঙ্গালা শিক্ষা' ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ (১৯০৩ ও ১৯০৭), 'এসলামের জয়' (১৯০৮), 'মদীনার গৌরব' (১৯০৬) হযরত 'ওমরের ধর্মজীবন লাভ' (১৯০৫), 'হযরত বেলালের জীবনী' (১৯০৫), 'মোসলেম বীরত্ব' (১৯০৭), 'বাজীমাৎ' (১৯০৮) ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তবে সমলোচকগণের মতে এসব গ্রন্থে পূর্ববত সাহিত্য ও শৈল্পিক প্রতিভা

লক্ষ্য করা যায় না। জীবনের শেষভাগে তিনি দুটি আত্মজীবনীমুলক গ্রন্থ রচনা করেন। একটি 'আমার জীবনী' (১৯০৮-১০) এবং অপরটি 'বিবি কুলসুম' (১৯১০)। কুলসুমের মৃত্যু হয় ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে। এর মাত্র দু'বছর পর ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর মীর মশাররফ হোসেন পদমদীতে ইহলোক ত্যাগ করেন।[৬]

মীর মশাররফ হোসেনের জীবনকাল ও সাহিত্য সাধনা এমন একদেশ ও কালে হয়েছিল যখন বৃটিশ শাসনের ফলে ভারতে বড় একটি পরিবর্তন আসছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজদের সর্বগ্রাসী লুটপাট ও শোষণের পটভূমিতে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সামন্তপ্রথার পতনের প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদী শিল্পের বীজ বপিত হয়। নতুন ভূমি ব্যবস্থার ফলে পরিবর্তিত হয় সমাজ কাঠামো। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলা ভারতের জনগন সেই সূচনালগ্ন থেকেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৭-১৮০০), ফারাজী আন্দোলন (১৮৩৮-৪৮), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৮), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬১) ইত্যাদির মাধ্যমে দেশকে পরাধীনতার করালগ্রাস থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংসস্তুপের উপর ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা উন্মুক্ত হয়। এক্ষেত্রে নানা কারণে হিন্দু সম্প্রদায় মুসলিম সম্প্রদায়ের চাইতে অনেক এগিয়ে যায়। দিশেহারা মুসলমানেরা এক অন্ধকূপের গহীন থেকে বের হয়ে আসার কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিলনা। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অবস্থায়ও এক নিদারুন অবক্ষয়ের চিত্র পাওয়া যায়। তবে উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে সংস্কার আন্দোলন একেবারে থেমে থাকেনি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্ব দূর করার নিমিত্ত নানমূখী সংস্কার আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। এমনি এক পরিবেশে মুসলিম বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেনের মত প্রতিভার আবির্ভাব সত্যিই এক যুগান্তকারী ঘটনা।

মশাররফ রচনায় ইতিহাস প্রসঙ্গ ঃ-

মীর মশাররফ হোসেনের সাহিতে সামাজিক ইতিহাসের যেসব উপাদান রয়েছে সেগুলোকে কয়েকটি শ্রেনীতে বিন্যস্ত করা য়াষ। যেমন ঃ (১) সমাজ, (২) রাজনীতি, (৩) অর্থনীতি, (৪) শিক্ষা, (৫) সাহিত্য-সংস্কৃতি (৬) ধর্ম ইত্যাদি।

(১) সমাজ

তৎকালীন বাংলার সমাজজীবন ছিল অন্ধ বিশ্বাস কুসংস্কারদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'জমীদার দর্পন' নাটক জিতুমোল্লার অন্যতম কাজ ছিল মানিক পীরের সিন্নি ফয়তা প্রদান।[৭] (ক) উদাসীন পথিকের মনের কথায় "গোলাম বিপদভঞ্জনের জন্য মনে মনে কত পীর, কত ফকীর দরবেশদিগের দরগায় নজর, সত্যপীরের সিন্নি, মানিকপীরের খাজা, বড়পীরের মল্লিদা, মুস্কিল আসানের রোজা, কত কি মানত করিলেন"।[৮] 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে সোনা বিবিকে বৈরীপুত্র জয়ঢাককে ফিরে পাবার জন্য গুরুজী ও বেদেনীর অলৌকিক বা

শক্তির উপর ভরসা করতে দেখা যায়।[৯]

(খ) সমাজে নারীর দুঃখ বেদনা অবমাননা মশাররফ প্রত্যেক্ষ করেছেন এবং তা তাঁকে প্রভাবিত করেছে। অশিক্ষা, বাল্য-বিবাহ ও বিবাহজনিত সপত্নী জ্বালায় নারীর জীবন ছিল দুর্বিসহ। মশাররফের পিতার পরনারীতে আসক্তি, অবহেলিতা জননীর অকালমৃত্যু, নিজের জীবনে সপত্নীগৃহের তিক্ত অভিজ্ঞাতা, এমনকি বিবাহের ক্ষেত্রেও নারীর মতামতের তোয়াক্কা না করা ইত্যাদি তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। 'উদাসীন পথিকের মনের কথায় মিসেস কেনীর গভীর পর্যবেক্ষনে এ দেশের নারী সমাজের আটপৌরে জীবন যাপন পদ্ধতি ও দুরবস্থার চিত্র ধরা পড়েছে। "তাহারা যে বন্দিনী, চিরবন্দিনী। ঘাটে মাঠে বাহির হয়না। স্বামীসহ সর্বদা একত্রে উঠাবসা করিতে মাথা কাটিয়া ফেলিলেও স্বীকার হয়না। পুরুষেরাই সর্বেসর্বা, পুরুষেরাই তাদের হর্ত্তাকর্তা, বিধাতা। স্বামী মুখে কত কথা শুনিতেছে। নালিশ নাই, ফরিয়াদ নাই, পুরুষে সকলই পারে, স্ত্রীলোকেরা কেবলই সহ্য করে।"[১০]

সপত্নী গৃহে বিবাহ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি অতিদুঃখে মুসলমানের বিবাহ পদ্ধতির দোষ ত্রুটি নির্দেশ করে "আমার জীবনী" গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

"....আমাদের সমাজের গতি চমৎকার। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। ....পিতামাতা, ভ্রাতাই সম্বন্ধ গড়াইয়া থাকেন। তাহারাই সম্বন্ধ ভাঙ্গাইয়া, যার বিবাহ তার অভিমতের দিকে কেহই লক্ষ্য করেন না।" 'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে বলেন ঃ মুসলমান রমনী মধ্যে বিদ্যাচর্চা ও শিখিবার সুপ্রশস্ত পথ নাই, জ্ঞান লাভের কোন উপায় নাই, ভাল-মন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি নাই।"[১১]

(গ) বাঙালি সমাজে হিন্দু-মুসলিম মিলন বিরোধ ধারা তাঁর রচনায় উপস্থিত। তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় লালিত মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন লেখক ও বুদ্ধিজীবি। হিন্দু মুসলমান মিলনের মধ্যকার বৈরীভাব দূর করার লক্ষে তিনি 'গো-জীবন' রচনা করেন। এতে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ঐক্য সম্পর্কে বলা হয়েছে।

> "এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক সংসারকার্য্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারিনা, আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে সম্বন্ধে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই।"

উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধ নির্মূল করবার উপায়স্বরূপ তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, মুসলমানদের উচিত গোমাংসভক্ষণ ত্যাগ করা। এর কিছুকাল আগে সংঘটিত দয়ানন্দ স্বরস্বতীর গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলন (১৮৮২ খ্রিঃ) সম্ভবতঃ তাঁকে সচেতন করে তোলে।

তাঁর 'বসন্তকুমারী নাটকে' প্রস্তাবনা অংশে নট-নটীর সংলাপে তিনি হিন্দু-মুসলিম বিরোধের মারাত্মক পরিনাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।[১২] যেমন নট বলছেন ঃ

"কিছুদিন হলো শুনেছি 'বসন্তকুমারী' নামে একখানি নাটক প্রকাশ করা হয়েছে, অদ্য তারই অভিনয় করা যাক।

নটী ঃ বসন্তকুমারী!! কার রচিত?

নট ঃ কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশাররফ হোসেন রচিত।

নটী ঃ ছি ছি!! এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কোল্লেন?

নট ঃ কেন? মুসলমানের বলে কি একেবারে অপদস্ত হলো?

নটী ঃ তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয়? হাজার হোক মুসলমান।"

(ঘ) মীর মশাররফ হোসেনের সময়কালে নীলচাষ ও সে সম্পর্কিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নীলচাষ, নীলবিদ্রোহ ও নীলকর প্রসঙ্গে তিনি মিশ্র ধারনা পোষন করতেন। তাঁর পিতা ছিলেন নীলকর মিঃ টি. আই. কেনী সাহেবের বন্ধু ও উপদেষ্টা, পক্ষান্তরে নীলবিদ্রোহের অন্যতম সংগঠক সা গোলাম ছিলেন তাঁদের পারিবারিব শত্রু। এ-সব কারনে নীলকরের প্রতি তাঁর মানসে কিছুটা অনুরাগ জন্মেছিল। কিন্তু নির্যাতীত নীলচাষীরাও তাঁর সহানুভূতি লাভ করেছেল।

'উদাসীন পথিকের মনের কথায় তিনি কুষ্টিয়া অঞ্চলের নীলচাষ ও নীলবিদ্রোহের কাহিনী সংযোজন করেছেন। এ সংক্রান্ত ঘটনাবলী নিয়ে একটি প্রমান্য ইতিহাস নানা কারনে সম্পন্ন করতে পারেন নি। সতীর্থ জলধর সেনকে তিনি নীলবিদ্রোহের ইতিহাস রচনার জন্য একটি নোট প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন।[১৩] মশাররফ তাঁর রচনায় উল্লেখ করেন : "বুনানী ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীলবুনানী করিবে' বহুতর লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছে"। প্রজাদের এ নালিশের জবাব সুন্দরপুরের জমিদার প্যারীসুন্দরীর উক্তি, "কি লজ্জার কথা! কি ঘৃনার কথা! কোথায় বিলাত, আর কোথায় এ দেশ। একটিমাত্র ইংরেজ (কেনী) আসিয়া এদেশ উচ্ছিন্ন করিল। একেবারে ছাড়খার করিয়া ফেলিল। কৃষিপ্রজার জমাজমি কাড়িয়া লইয়া নীলবুনানী করিল। কত তালুকদারের তালুক, কত জোতদারের জোত জবরানে লিখিয়া লইল। কাহারও যথাসর্বস্ব লুটিয়া একেবারে পথের কাঙ্গাল করিয়া ছাড়িয়া দিল"।[১৪] নীলকরের বিরুদ্ধে মহিলা জমিদার প্যারীসুন্দরীর সংগ্রামের কাহিনী মীর মশররফ আন্তরিকতার সহিত পরিবেশন করেছেন।

> "ধন্য বাঙ্গালীর মেয়ে। সাহেব এতদিন যেরূপ জ্বালাতন
> করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ বুঝি প্যারীসুন্দরীর হাতে হয়।"[১৫]

তবে মশাররফ হোসেন নীলদর্পন রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে যেরূপ মন্তব্য করেছেন তাতে নীলকর প্রসঙ্গে তাঁর দ্বিধাদ্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ঃ

"দীনবন্দু মিত্র 'নীলদর্পণে' নীলকরের দৌরত্ম্য অংশই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। ....ইংরেজের ক্রুটি, ইংরেজের দোষই গাহিয়া গিয়াছেন। ইংরেজের মধ্যে যে দেবভাব আছে, প্রজার প্রতি মায়া মমতা ও স্নেহ এবং ভালবাসার ভাব আছে, তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই।"[১৬] অবশ্য তিনি অন্যত্র নীল দর্পণকে মহামূল্য দর্পণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১৭] নীলদর্পণের প্রভাব মশাররফের 'জমিদার দর্পণ' নাটকে বেশ স্পষ্ট।

(ঙ) এ সময়ে বাংলার অর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে জমিদার ও অভিজাতশ্রেনীর প্রভাব ও গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জমিদারদেরই বিশাল ভূমিকা ছিল। একদিকে তাঁরা প্রজাপীড়ক ও ভোগলিপ্সু, অপরদিকে তাঁরা ছিলেন জনকল্যানব্রতী ঔ শিক্ষা সাংস্কৃতির পৃষ্টপোষক। সরকারের অনুগ্রহজীবি এ অনুগত সামন্তশ্রেনীর ইংরেজ শাসনের প্রতি অপরিসীম আস্থা। তবে কিঞ্চিত ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' হচ্ছে ইন্দ্রিয়পরায়ন ও ভোগলিপ্সু জমিদারের জীবনযাপনের একটি চিত্র। তিনি গাজী মিয়াঁর বস্তানীতেও অভিজাত জমিদারশ্রেনীর অন্তপুরের চালচিত্র তুলে ধরেন। 'উদাসীন পথিকের মনের কথায়ও জমিদার প্রসঙ্গ এসেছে। মশাররফ নিজেও ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের সন্তান, জীবিকাসূত্রে তিনি ছিলেন দেলদুষার জমিদারী এস্টেটের কর্মাধ্যক্ষ কিন্তু জমিদারী প্রথার সাথে তিনি কোনরূপ অন্যায় পক্ষপাত করেননী। বরং তিনি জমিদারশ্রেনীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে সাধারন জনগনের অনুকূলে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি লেখেন।[১৮]

> অলস অকর্মন্য এসব জমিদারের পরিচয় মশাররফ হোসেনের অনেক রচনায় পাওয়া যায়। জমীদার দর্পনে এদেরকে 'জানওয়ার' বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে ঃ
> "এ জানওয়ারদের চারখান পাও নাই, ল্যাজও নেই। এরা খাসা পোষাক পরে, দিব্বি সরু চালের ভাত খায়। সাড়ে তিন হাত পুরু গদীতে বসে, খোসামোদে কুকুররাও গদীর আশেপাশে ল্যাজ গুটিয়ে ঘিরে বসে থাকে।[১৯]

জমিদাররা নাম প্রচারের জন্য দান করতেন। "জমিদারগুলিও এমন যে আক্কেল ধর্মের জন্য দান করেনা, কেবল নাম কিনিবার দান।"[২০]

তবে জমিদারদের হালচালের প্রতি তাঁর বিরূপভাবে থাকলেও জমিদারী প্রথার প্রতি তাঁর একটি প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। জমিদারী প্রথার তিনি বিলোপ চাননি; চেয়েছিলেন শুধু সংস্কার।

(২) রাজনীতি

মীর মশাররফ হোসেনের রচনাবলীতে রাজনীতি বিষয়ক চেতনায় তাঁর রাজানুগত্য,স্বদেশ চেতনা ও জাতীয়তাবোধ, ইত্যাদি বিধৃত হয়েছে। তাঁর পিতা নীলবিদ্রোহেরকালে স্পষ্টই ঘোষনা করেছিলেন, "নীলকাজ বন্ধ হইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ চিরকালই এ দেশে থাকিবে।[২১] তাঁর স্ত্রী বিবি কুলসুম স্বদেশী আন্দোলন পছন্দ করেন নি। বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুগত্যের কারনে মশাররফ কোন সভা সমিতিতে যোগ দেন নি।[২২] 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে তিনি রাজপ্রশস্তির কথা বলেছেন : 'ইংরেজ আমাদের ভক্তির ভাজন, ...ইংরেজ আমাদের মাথার মনি,.....আমাদের হর্তা-কর্তা বিধাতা। তাই ইংরেজ দেবতা, অসীম ক্ষমতা"।[২৩]

স্বদেশ, স্বাধীনতা ও স্বরাজের পক্ষেও বক্তব্য তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। যেমন ঃ "জন্মভূমি কাহার না আদরের? জন্মভূমির জন্য কে না লালায়িত?"[২৪]

পরাধীনতার গ্লানির বেদনার কথা মশাররফের বক্তব্যে পাওয়া যায়।

> "স্বরাজই যদি পররাজ হইল, তবে গোলামী করিয়া জীবন ধারন করা অপেক্ষা জীবনপাত করাই শ্রেয়ঃ। ....নিজ জীবন রক্ষা করিতে স্বদেশের স্বাধীনতা রত্ন যাহারা পরহস্তে তুলিয়া দেয়, তাহাদের ন্যায় কুলাঙ্গার দেশবৈরী আর কে আছে? ...স্বাধীন জীবনে পরাধীনতা শৃঙ্খলে পড়িবে গলায় রজ্জুদিয়া বাঁদর নাচন নাচাইয়া লইয়া বেড়াইবে ইহা কোন প্রানে সহ্য হইবে।"[২৫]

মশাররফ বৃটিশ শাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতি পত্যক্ষ করেন। ভারতবর্ষে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থা যে বৈষম্যমূলক ছিলো তার পরিচয় 'জমীদার দর্পণে' ব্যক্ত করেছেন। বিচারকার্যে নিরপেক্ষতার অভাব, মিথ্যা-সাক্ষ্য, অর্থের প্রভাব ছিল প্রায় সার্বজনীন। ইংরেজ বিচারক, ইংরেজ ডাক্তার ও ইংরেজ ব্যারিস্টারের যোগসাজসে পরো বিচার অনুষ্ঠানটিই এক নির্মম হাস্যকর প্রহসনে পরিণত হয় 'জমিদার দর্পণে'। জর্জ সাহেবের 'উচ্চহাস্য', 'ইংরেজী গান', 'শিষ দিয়া তুড়ি', 'ভঙ্গি করিয়া নৃত্য' এর মাধ্যমে বিচারলয়কে প্রমোদকক্ষে পরিনত করা হয়েছে।[২৬] জমীদার দর্পণ নাটক সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শনে' প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন : "আমরা প্রজা-জমীদারদের কথা বলিতে চাহিনা। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, যেসব আদালতের চিত্রটি অতি পরিপাটি হইয়াছে"। তবে নাটকের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমাজে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে তাতে 'বঙ্গদর্শন' উল্লেখ করে, "আমরা পাবনা জিলার প্রজাদিগের আচরন শুনিয়া বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয় আমরা পরামর্শদেই যে, গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরন বন্ধ রাখা কর্তব্য।"[২৭] বিচার ব্যবস্থার মত সাধারন প্রশাসনও পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। নীলকরের কুঠিতে ম্যাজিস্ট্রেটের রাত্রি যাপন ও নীলকর পত্নীর উদার খাতির-যত্ন ও আপ্যায়নের কথা 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় দেখা যায়।[২৮] গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তেও হাকি আমলা প্রমুখ প্রশাসনিক কর্মকর্তার দুর্নীতি পক্ষপাতিত্ব ও নৈতিক পতনের বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়।

৩। অর্থনীতি

অর্থনীতির কথা মশাররফ রচনায় তেমন প্রধ্যান্য না পেলেও অর্থই যে মানুষের সব ক্রিয়াকান্ডকে নিয়ন্ত্রন করে তার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি টাকাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

> ''রে টাকা। তোর জন্যই কেনীর বিলাতে পরিত্যাগ। তোর জন্যই নীলের ব্যবসা। জমিদারের পত্তন। তোর জন্যই নিরীহ বঙ্গের প্রজার প্রতি অত্যাচার।''[২৯]

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় নীলচাষের ফলে কৃষি ব্যবস্থা ধবংসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ''গো-জীবন'' প্রবন্ধে অর্থনৈতিক চিন্তাও কাজ করেছিল। তিনি বলেন ঃ

> ''....এ দেশে গোজাতির সাহায্য ব্যতীত বলুনত কোনরূপ খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে? কখনি না। এ দেশে অন্যকোন পশুদ্বারা ভূমি কর্ষনের প্রথা প্রচলিত নাই। কাজেই বলদের দরকার। এমন গোরত্নকে মারিয়া কাটিয়া গলায় ছুরি বসাইয়া উদরসাৎ করিলে অন্য খাদ্যের আশা আর থাকে কোথা?''[৩০]

৪। শিক্ষা

মীর মশাররফ হোসাইন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তেমন অগ্রসর হননি। নামকরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করলেও তিনি ব্যর্থ হন। ব্যর্থ শিক্ষা-জীবনের কথা স্মরণ করে পরিণত বয়সে তাঁর গভীর অনুশোচনা জাগে। তিনি মনে করতেন মুসলমানদের অবনতি ও অনগ্ররেতার জন্য মূলত: অশিক্ষাই দায়ী, তাই নিজ উদ্যোগে স্বগ্রামে একটি 'বাঙ্গালা পাঠশালা' স্থাপন করেছিলেন।[৩১] শিক্ষার প্রতি অনীহার জন্য তিনি জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের কঠোর সমালোচনা করেন।[৩২]

৫। সাহিত্য সংস্কৃতি

মীর মশাররফ হোসেন অসাম্প্রদায়িক চেতনা, ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারনা নিয়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন। শেষেরদিকে তাঁর চেতনার পরিবর্তন ঘটে এবং শেষপর্যন্ত ধর্মাশ্রিত রক্ষনশীল ভাবধারা অবলম্বন করেন। মাদ্রাসা শিক্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত :

"A thorough religious education is indispensible for youths receiving education in Schools and Colleges."[৩৩]

মশাররফ লৌকিক সংস্কৃতির সাথে অতি নিবিড় সম্পর্ক পোষণ করতেন। কৈশোরেই হেঁয়ালি রচনা ও 'বায়ত বাহাসে' তিনি দক্ষ হয়ে ওঠেন। সঙ্গীত থিয়েটার ভক্ত মোশাররফ সামাজিক রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বলেন ঃ

''আমাদের সমাজে গানের নামেই চটা, গানের নামেই ছি ছি।। শত শত ঘৃণা। উচ্চ

দরের মুসলমান সমাজে সংগীত ঘৃণাই, কাটমোল্লার দলেই বেশই নিন্দনীয়। ....এই গান আরবদেশে হইতেছে, মক্কা শরীফে হইতেছে, যিনি জগতের মুসলমানের ধর্মগুরু, তুরস্ক সুলতান, তাঁহার রাজ্যেও গানবাজনার আদর আছে।[৩৪]

সঙ্গীত ও থিয়েটার মশাররফ হোসেনের প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁর পিতা একজন বিশিষ্ট বাজনাদার ছিলেন। 'সঙ্গীত লহরী' নামে মীরের একটি গানের সংকলন প্রকাশিত হওয়ার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

(৬) ধর্ম

মীর মশাররফ হোসেন প্রথম জীবনে ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ঠ উদার থাকলেও মধ্যজীবনে এসে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠে। ইসলাম সম্পর্কে অনাগ্রহই সামাজিক অবনতির মূল কারন বলে তাঁর ধারনা হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন : "বঙ্গে মুসলমান সমাজের দুর্দশার কারনই, ধর্মশাস্ত্র পাঠে অনিচ্ছা।"[৩৫] জীবনের শেষপ্রান্তে এসে মীর মশাররফ হোসেন ধর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠেন। এ সময়ে তিনি ধর্মাশ্রিত গ্রন্থরচনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত, ধর্মীয় সভা-মাহফিলে অংশগ্রহন, মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহন প্রভৃতি কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। শেষ জীবনে এভাবে তাঁর চেতনা ধর্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠার কারন পরিস্কার নয়।

তিনি ছিলেন পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও পরম সহিষ্ণু। বৈষ্ণব ধর্মগুরু শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে তিনি যে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার প্রমান মেলে তাঁর উক্তির দ্বারা।[৩৬]

অতএব মীর মশাররফ হোসেন তাঁর যুগের পরিবেশকে, রসানুভূতি দিয়ে প্রত্যেক্ষ করেছিলেন। স্বদেশপ্রেমী, জাতীয়তাবোধসম্পন্ন, সমাজহিতৈষী হিসেবে তাঁর রচনাবলী শুধু নিরেট সাহিত্যই নয়, বরং সমকালীন সমাজ দর্পণ হিসেবে সামাজিক ইতিহাস অনুরাগীকে যথার্থভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। একজন সমাজমনস্ক, চিন্তাশীল, জীবনবাদী, বৈচিত্রপ্রয়াসী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস মানস সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

সূচী-নির্দেশ

১. কাজী আবদুল মান্নান : মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৮৫, জীবন বৃত্তান্ত পৃ: ৫৮-৫৯।
২. মহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, আধুনিক যুগ, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮, পৃ: ৭১।
৩. ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িকপত্র, ২য় খন্ড (কলকাতা, ১৩৫৯) পৃ: ১৪।
৪. বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ঢাকা ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৫, পৃ: ৫৯।
৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৫৬, পৃ: ৮৩।
৬. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ: ২২৩।

৭. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান : মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৬ পৃঃ ২৩৯।
৮. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ৪৩১।
৯. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্য রচনা, ঢাকা, ১৩৮২, পৃঃ ১৪৪।
১০. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ৪৮৭-৮৮।
১১. মশাররফ রচনা সম্ভার, প্রাগুক্ত, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৩০।
১২. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৯।
১৩. জলধর সেন, কাঙ্গাল হরিনাথ, কলিকাতা, ১৩২০, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯।
১৪. উদাসীন পথিকের মনের কথা, ৩য় তরঙ্গ, পৃঃ ১২-১৩।
১৫. উদাসীন পথিকের মনের কথা, একাদশ তরঙ্গ, পৃঃ ৪৭।
১৬. আমার জীবনী, পৃঃ ৯১।
১৭. উদাসীন পথিকের মনের কথা, দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ, পৃঃ ১২-১৩।
১৮. আমার জীবনী, পৃঃ ৯৪।
১৯. গাজী মিয়াঁর বস্তানী, পঞ্চদশ নথি, পৃঃ ২৬০।
২০. গাজী মিয়াঁর বস্তানী, পঞ্চদশ নথি, পৃঃ ২৬০।
২১. আমার জীবনী, পৃঃ ৯২।
২২. বিবি কুলসুম, পৃঃ ১২৩।
২৩. গাজী মিয়াঁর বস্তানী, অষ্টম নথি, পৃঃ ৮৫।
২৪. গাজী মিয়াঁর বস্তানী, অষ্টম নথি, পৃঃ ৮৫।
২৫. এসলামের দর্পণ, প্রথম শাখা, অষ্টম মুকুল, পৃঃ ৭১।
২৬. জমীদার দর্পণ, তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।
২৭. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম : রত্নাবতী থেকে অগ্নিবীনা, সমকালের দর্পণে, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ১৩৯-৪০।
২৮. উদাসীন পথিকের মনের কথা, অষ্টম তরঙ্গ, পৃঃ ১২-১৩।
২৯. রচনা সম্ভার ১ম খন্ড, ১৯৭৬, পৃঃ ৪৪৮।
৩০. প্রাগুক্ত, ঐ পৃঃ ৩১৮।
৩১. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ৩২৭।
৩২. হিতকরী (পাক্ষিক), ১৫ই কার্তিক, ১২৯৭, পৃঃ ১০১।
৩৩. ওয়াকিল আহমেদ : উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ২৭৩।
৩৪. আমার জীবনী, পৃঃ ২২৩।
৩৫. আমার জীবনী, পৃঃ ৭১।
৩৬. আমার জীবনী, পৃঃ ২০০-২০১।

দেলোয়ার হোসেনের দার্শনিক চিন্তাভাবনা: প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ

এম শফিকুল আলম

দেলোয়ার হোসেন আহমদ মির্জা (১৮৪০-১৯১৩)[১] ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম বাঙালি মুসলিম গ্র্যাজুয়েট। ডিগ্রি লাভের পর তিনি সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন। পেশাগত দায়িত্বের বাইরে তিনি তাঁর সমাজের নানাবিধ সমস্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। তৎকালীন মুসলিম সমাজে উপযোগবাদী চিন্তাধারার প্রায়োগিক সংস্কার সাধনকল্পে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। যেসব বিষয়ে দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজন সেসব বিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি উপযোগবাদী চিন্তা চেতনার সুদুরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটিয়েছেন। দেলোয়ার হোসেনের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর সমসাময়িক বিশেষ করে নওয়াব আবদুল লতিফ খান বাহাদুরের (১৮২৮-১৮৯৩) দৃষ্টিভঙ্গীর একটি তুলনামূলক সমীক্ষা এই প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হবে। প্রসঙ্গতঃ সে সময়ের আরো তিনজন প্রথিতযশা সমাজ সংস্কারক ও বিশিষ্ট মুসলিম চিন্তাবিদ সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) ও সৈয়দ আমির হোসেন সম্পর্কেও একটি তুলনামূলক আলোচনা এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

চিন্তাধারার ক্ষেত্রে দেলোয়ার হোসেন আহমদ ও আবদুল লতিফ নিঃসন্দেহে প্রগতিবাদী ছিলেন।[২] কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন সর্বাধুনিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর ঐতিহ্যের অনুসারী। সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজের কল্যাণ, উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনই ছিল তাঁদের স্বপ্ন। এ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের যেসব দুর্বলতা ছিল তা বিশদভাবে আলোচনাকল্পে উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের বিভিন্ন দিকও এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতার মুলে কি কি কারণ দায়ী ছিল তা চিহ্নিত করে তার আশু সুরাহার পথ নির্দেশনাই ছিল দেলোয়ার হোসেন আহমদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বিদ্যমান যে সকল সমস্যার[৩] প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন এবং সমাধানের চিন্তাভাবনা করেছেন সেগুলোও এ নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

লক্ষ্যণীয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে রক্ষণশীল হিন্দুরাই সমাজকে প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। এ সময়ে সমাজে সংস্কারমূলক আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-

১৮৩৩) মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৪] বলা বাহুল্য, তাঁর উদারনৈতিক ব্রাহ্ম আন্দোলন নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়কে খ্রিষ্টান ধর্মে রূপান্তরিত হওয়া থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। কারণ তখনকার হিন্দু সমাজ এই বর্ণবৈষম্য, সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ ও বাল্য বিবাহ ইত্যাদি প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে কতিপয় খ্যাতনামা হিন্দু সমাজ সংস্কারক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৫] এক্ষেত্রে অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ও কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তদানীন্তন সমাজ সংস্কারকদের লক্ষ্য ছিল কিভাবে সতীদাহ প্রথার নির্মম ধর্মীয় গোঁড়ামির নাগপাশ হতে হিন্দু নারী সমাজকে রক্ষা করা যায়।[৬] রাজা রামমোহন রায় ছিলেন সব রকমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অপরপক্ষে অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর উপযোগবাদী দর্শনকে "শ্রম=ফসল+এবাদত=ফসল, সুতরাং এবাদত=শূন্য" বিশ্বখ্যাত দার্শনিক জে এস মিলের যুক্তিবাদের সাথে সমন্বয় সাধন করেছিলেন।[৭] এখানে দেখা যায় যে, তিনি ব্রিটিশ উপযোগবাদী দার্শনিক জেরেমি বেস্থামের (১৭৪৮-১৮৩২) দর্শনকে এরিষ্টটলের ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এরিষ্টটলের ভাবধারা হলো মানুষের সার্বিক উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে সমাজের প্রকৃতির উপর যা আসলে একটা গৌণ ব্যাপার।[৮] তৎকালীন হিন্দু সমাজের বিধবা বিবাহের বিষয়ে ১৮৬০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বয়স নির্ধারণের বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি পুনর্বিবাহ প্রথা সমাজে প্রচলিত রাখার জন্য অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়েছিলেন।[৯] বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ অনুসারী। হিন্দু সমাজে বিধবা রমনীদের পুনর্বিবাহের ব্যাপারে বঙ্কিমের মতামত ছিল এই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট বিধবা রমণীই মনস্থির করবেন তিনি পুনর্বিবাহে সম্মত হবেন কি হবেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কোন রমণী বিধবা থাকবেন - এই ধরনের আইনগত কঠোরতা মানুষের সাধারণ কর্মজ্ঞানের পরিপন্থী। এ যুক্তিতেই বঙ্কিম বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।[১০] নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ব্রাহ্ম সমাজ নেতাদের মধ্যে কেশব সেন ছিলেন প্রথম সারিতে।[১১] তিনি তদানীন্তন পূর্ব বাংলার ব্রাহ্ম সমাজকে সুসংহত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৮৫৭ সালে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদানের অব্যবহিত পরে তিনি ব্রাহ্ম সমাজ পুনঃগঠনে মনোনিবেশ করেন।[১২]

এভাবে উল্লেখিত সমাজ সংস্কারদের অবদানের দ্বারা ভারতবর্ষের তদানীন্তন বিশেষতঃ বাঙালি হিন্দু নারী সমাজে উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কারের পথ উন্মোচিত হয়। যার ফলে

বিধবা বিবাহসহ নারীদের মধ্যে আধুনিক ও পাশ্চাত্যের ভাবধারায় যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর যে সময়ে হিন্দু সম্প্রদায় সামাজিক নানা রকম কুসংস্কার এড়িয়ে পাশ্চাত্যের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আধুনিকতার দিকে অগ্রসরমান ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা যায় মুসলিম সমাজ পক্ষান্তরে পশ্চাদপদতার দিকে ধাবিত হচ্ছিল। তথাকথিত মুসলিম আলেম সমাজ সর্বপ্রথমেই আধুনিক শিক্ষার ঘোর বিরোধিতা করে আসছিল। তাঁরা অনেকেই ফতোয়া দিচ্ছিল যে যেহেতু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা অমুসলিমদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং নাস্তিক্যতায় পরিপূর্ণ সেহেতু ইসলাম ধর্মে এর কোন অনুমোদন নেই। এরূপ একটি বিরূপ ধারণার ফলে মুসলিম সমাজের অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এ সময় শিক্ষাটাই ছিল মুসলমানদের জন্য প্রধানতম সমস্যা। দেলোয়ার হোসেন এ সমস্যা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণসমূহ অনুসন্ধান করতে থাকেন এবং সমাজের সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। এ সম্পর্কে এ আর মল্লিক লিখেছেন যে 'হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কাজেই তাঁরা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল এবং সুবিধাগুলো সহজে গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের একাংশ তাঁদের আর্থ সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার থেকে বেরিয়ে এসেছিল। দেলোয়ার হোসেন ছিল এদেরও একজন।[১৩] তিনি অন্ধ সংস্কারের অনুশাসন থেকে নিজেকে এবং সমাজকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে দেলোয়ার হোসেন আহমেদ ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ডিগ্রিধারী মুসলিম চিন্তাবিদ। তিনি ১৮৬১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৪] তৎকালীন ভারতবর্ষে কোন মুসলমানের পক্ষে এরকম উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া খুবই কঠিন বিষয় ছিল। তিনি সরকারী চাকুরিজীবী হলেও সামাজিক সমস্যাদির ব্যাপারে লেখালেখি নিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মুসলমান সমাজের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেছিলেন। কলিকাতা হতে প্রকাশিত '*দি মুসলিম ক্রোনিকল*, '*দি মুসলমান*' ইত্যাদি সাপ্তাহিক সাময়িকীতে তাঁর লেখালেখির প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৫] দেলোয়ার হোসেন চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ উপযোগবাদী দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল ও অন্যান্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন যে জন স্টুয়ার্ট মিলের লিবার্টি ও ইকোনমিক্যাল সাইন্স এর উপর লিখা অভিসন্দর্ভ, ব্যাকালের *আউটলাইন অব দি হিষ্ট্রি অব সিভিলাইজেশন* এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের উপর লেখা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

এইসব বইগুলো অধ্যায়ন করেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কেন কোন জাতির বা সম্রাটের পতন ঘটে। তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে মুসলমানদের অধঃপতনের মূলে রয়েছে সামাজিক অবক্ষয়। আর এ অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে অন্ধ ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিবিধান। তিনি প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়মনীতির পরিবর্তন চেয়েছিলেন।[১৬]

নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ইংরেজ শাসন ও ইংরাজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের একটি বিরূপ ধারণা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রকট হয়ে উঠেছিল। এরূপ বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফতোয়াগুলোই মুখ্যতঃ দায়ী বলে অনেকে চিহ্নিত করেছেন। তবে মুসলমানদের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় ছিল এই যে এরূপ একটি সংকটের মুহূর্তে বেশ ক'জন মুসলিম মনীষী ও সমাজ সংস্কারক তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। এক্ষেত্রে সৈয়দ আহমদ খান, আবদুল লতিফ, দেলোয়ার হোসেন, আমীর আলী, আমির হোসেন ও কেরামত আলীর (১৮০০-১৮৭৩) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সকলের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে শাসক ও মুসলিম প্রজাকুলের মধ্যে বৈরিতার দূরত্ব অনেকখানি কমে এসেছিল। ফলে মুসলমানগণ পাশ্চাত্যের শিক্ষার আলোর দিকে কিছুটা ধাবিত হয়েছিল। যদিও এতে বেশ কালক্ষেপণ হয়েছিল বলে অনেকেই মনে করেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার ক্ষেত্রে সৈয়দ আহমদ খান অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।[১৭] তিনি ছিলেন প্রাচ্যভাষায় একজন স্বনামধন্য পণ্ডিত। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনে তিনি অনেকখানি সফল হয়েছিলেন। ভারতীয় মুসলমানদের উপর তাঁর ধ্যান ধারণার যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[১৮] তিনি মুসলমানদের মধ্যে একটি নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন। বিখ্যাত আলীগড় আন্দোলনের তিনিই পথিকৃৎ।

দেলোয়ার হোসেন মনে করতেন যে মুসলমান সমাজে প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ ইসলাম ধর্মের অনুভূতি ও বিশ্বাসের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। অথচ মুসলমানগণ সেইসব সামাজিক প্রথাসমূহ মেনে চলছে বলেই তাদের অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বের কোন কিছুই প্রাকৃতিক নিয়মের উর্ধ্বে নয়। অতএব মুসলমানদের অবস্থাও একসময়ে পরিবর্তন হবে। তবে এ পরিবর্তন আনয়ন ও অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে মুসলমানদের একাগ্রচিত্তে কাজ করে যেতে হবে।[১৯] তিনি মনে করতেন যে মুসলমানদের বিশেষ করে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন অবশ্যই ঘটাবে হবে। দেলোয়ার হোসেনের মতে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ কিংবা শিক্ষা অর্জন কোনটাতেই মনোযোগী হননি যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে না পেরেছিল। কাজেই বাংলার মুসলমানদের আর্থিকভাবে সমৃদ্ধিশীল হতে হবে যদি তাঁরা জাগতিক উন্নতি লাভ করতে চান। মুসলমানদের

উন্নতির লক্ষ্যে এটাই ছিল দেলোয়ার হোসেন আহমদের দৃঢ় প্রত্যয়। এ ক্ষেত্রে দেলোয়ার হোসেনের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ডারউইনের থিউরি অব ইভলুয়েশন তথা বিবর্তনবাদের সূত্রটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। তবে তিনি যে এই মতবাদের সাথে পরিচিত ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো তিনি তাঁর সমাজের বিদ্যমান সমস্যাগুলো যথাযথ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। একজন প্রগতিবাদীর ন্যায় তিনি সমাজের চলমান পরিবর্তন তথা বিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম সমাজ পরিবর্তিত অবস্থাকে কিছুতেই মানতে রাজী ছিলনা। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে ১৮৬০ সাল নাগাদ বঙ্গের মুসলমানরা ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল। আবার এটাও সঠিক যে, 'ফরাজী' ও 'ওহাবী' আন্দোলন এবং সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীও মুসলমানদের প্রতি প্রবল সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। এ রকম অবস্থার অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে মুসলিম সমাজ সংস্কারকগণ বিভিন্নভাবে এগিয়ে এসেছিলেন।

সৈয়দ আমীর আলীও মুসলমান সমাজের জন্য কাজ করেন। তিনি মুসলমানদেরকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের অংশীদারিত্বের দাবীও উত্থাপন করেন। সাংবিধানিকভাবে মুসলমানদের দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে তিনি কলিকাতায় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামে সমিতি স্থাপন করেন। তিনি 'এ ক্রাই ফ্রম দি ইন্ডিয়ান মোহামেডানস' (১৮৪২) প্রবন্ধে মুলসমানদের দুরবস্থার বিশদ বর্ণনা দেন। তবে আমীর আলীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয়না বলে অনেকেই অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। এমনকি তাঁর এসোসিয়েশনও মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কল্যাণে কাজ করেছে, সর্বসাধারণের জন্য নিবেদিত ছিলনা বলে সমালোচনা পাওয়া যায়।[২০] সৈয়দ আমীর হোসেন (আমীর আলীর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী) ইংরেজী শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের অগ্রগতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে মুসলমানদেরকে সরকারি চাকুরিতে ব্যাপকহারে সুযোগ প্রদান করা উচিত।[২১] তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অনেকটা নমনীয়। বিশেষতঃ সরকার ও মুসলিম প্রজাকুলের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ কথাটি প্রযোজ্য। কিন্তু আধুনিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর মনোভাব ছিল কঠিন। ইংরেজী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি হুগলী মাদ্রাসা বন্ধ করার পরামর্শ দেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যয় কমাতে বলেন। অধিকিন্তু কলিকাতা মাদ্রাসাতেই বি. এ. কলেজ সংযুক্ত করার পরামর্শ দেন। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত *হিন্দু প্যেট্রিয়ট, দি ইন্ডিয়ান মিরর, দি বেঙ্গলি* ও অন্যান্য পত্রিকাসমূহ তাঁর এই পরামর্শকে স্বাগত জানিয়েছিল। আমির হোসেনের এই প্রস্তাব কিছুটা গৃহীত হয়েছিল এবং কলিকাতা মাদ্রাসাতেই মুসলমান ছাত্রদেরকে কম বেতন[২২] ভর্তির সুযোগ প্রদান করা হয়েছিল।

যাই হোক, আবদুল লতিফ ব্রিটিশ রাজ প্রশাসন ও বাঙালি মুসলমান প্রজাদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য অনেকের চেয়েও বেশী কাজ করেছিলেন বলে অনেকেই মনে করেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে মুসলমানরা খানিকটা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি অবশ্য ধর্মীয় অনুভূতিকে রক্ষা করেই ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। দেলোয়ার হোসেনের ভূমিকা ছিল এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো কলেজ খোলার পক্ষপাতী ছিলেন। চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তিনি হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১)[২৩] ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে অনেক মনে করেন। দেলোয়ার হোসেনের লেখালেখির মধ্যে এই দিকটি প্রচ্ছন্নভাবে লক্ষ্যণীয়।[২৪] একই সময়ে ডিরোজিওর প্রভাব ইয়ং বেঙ্গলদের উপরও পড়েছিল। অবশ্য এ আন্দোলন সম্পর্কে মতবিরোধ আছে।[২৫] ডিরোজিওর চিন্তাভাবনার মধ্যে অগতানুগতিকতার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।[২৬] দেলোয়ার হোসেন আহমেদ মুসলমান সমাজে প্রচলিত অন্ধ ধর্মীয় বিধিবিধান ও অনুশাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে সময়ের পরিবর্তনের ফলে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সংস্কার অতীব প্রয়োজনীয়। দেলোয়ার হোসেন মনে করতেন যে মুসলমানদের জন্য ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ যেমনি জরুরী তেমনি বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জনও জরুরী যেহেতু সমাজের অধিকাংশ মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা। সুতরাং পাঠ্যশিক্ষা কার্যক্রমে বাংলা ভাষায় পাঠদান অর্ন্তভুক্ত করার পক্ষে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।[২৭] তিনি বলেন যে, বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা মুসলমানদের জন্য দূরদর্শিতার অভাব ছাড়া কিছু নহে। অথচ শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা ভাষা অর্ন্তভুক্ত করার বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে এখনও কোন জাগরণ দেখা দেয় নাই। মুসলমান সমাজের পরিবর্তনের জন্য তাঁর পূর্বে এমন জোরালো ও শক্তিশালী বক্তব্য অন্য কেউ প্রদান করেননি। দেলোয়ার হোসেন যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে মুসলমানদের জাগতিক উন্নতি সাধন করতে হলে প্রথমেই ধর্মীয় গোঁড়ামী মুক্ত হতে হবে। তাঁর মতে, কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি কিংবা রক্ষনশীল রাজনীতি ও ধর্মীয় কোন জাগরণ মুসলমানদের সমস্যার সমাধান নয়। দেলোয়ার হোসেনের চিন্তাভাবনার সাথে আবদুল লতিফের চিন্তাচেতনার এখানেই গরমিল। দেলোয়ার হোসেন ইংরেজী ও বাংলা শিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করতে বলেছেন। পক্ষান্তরে আবদুল লতিফ ইংরেজী ও ফার্সী তথা আরবী শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি ও বিশ্বাসকে অটুট রেখে। কাজেই দেলোয়ার হোসেনকে প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও বাংলা ভাষায় শিক্ষার প্রথম পুরোধা হিসাবে আখ্যায়িত করা চলে।[২৮]

কিন্তু লক্ষনীয় বিষয় হলো এই যে আবদুল লতিফ মুসলমানদের জন্য জাগতিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে ইংরেজী শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে তাদের মাতৃভাষাকে মারাত্মকভাবে অবহেলার চোখে দেখেছেন বলে মনে হয়। অপরপক্ষে দেলোয়ার হোসেন বাংলা ভাষার উপর গুরুত্বারোপ করলেও তিনি নিজে লেখালেখি করেছেন সম্পূর্ন ইংরেজীতে এবং বাংলা ভাষায় তার কোন লেখা পাওয়া যায়নি। তাছাড়া দেলোয়ার হোসেন তাঁর আধুনিক চিন্তাধারার কোন সমর্থক বা কোন উত্তরাধিকার সৃষ্টি করতে পারেননি। তাঁর চিন্তাভাবনার তেমন কোন প্রভাব তৎকালীন মুসলমান সমাজেও পরিলক্ষিত হয়না। তুলনামূলকভাবে মুসলিম সমাজের উপর আবদুল লতিফের প্রভাব অনেক বেশী পড়েছিল।

মূলতঃ দেলোয়ার হোসেন ও আবদুল লতিফের চিন্তধারার মধ্যে বেশ পার্থক্য ছিল। প্রথমতঃ আবদুল লতিফ পৌর অভিজাত শ্রেণী ও গ্রাম্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভাজন করেন এবং তাদের জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থার পরামর্শ দেন।[২৯] কিন্তু দেলোয়ার হোসেন উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। দ্বিতীয়তঃ আবদুল লতিফ যেখানে ইংরেজী শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন সেই ক্ষেত্রে দেলোয়ার হোসেন মাদ্রাসা শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন।[৩০] তৃতীয়তঃ আবদুল লতিফের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা, তবে ধর্মীয় অনুশীলন ঠিক রেখে।[৩১] কিন্তু দেলোয়ার হোসেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় অনুশীলনকে যুগোপযোগী করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে, মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনবোধে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও আচার অনুষ্ঠানসমূহে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন আনতে হবে। চতুর্থতঃ আবদুল লতিফের চিন্তাভাবনা গোঁড়া মুসলমানদের জন্য খুবই গ্রহণীয় ছিল। পক্ষান্তরে দেলোয়ার হোসেনের চিন্তাভাবনা তাঁদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছিল। পঞ্চমতঃ আবদুল লতিফের চিন্তাভাবনাকে খানিকটা গোঁড়া ধর্মীয় বলা চলে। পক্ষান্তরে দেলোয়ারের চিন্তাভাবনাকে বিপ্লবী বলা চলে।[৩২]

লক্ষ্যণীয় যে দেলোয়ার হোসেন চিন্তাচেতনার দিক থেকে আবদুল লতিফের চেয়েও অনেক বেশী প্রগতিবাদী, বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী ছিলেন। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লিখিত 'দি ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন্স অব দি মুসলিমস' নিবন্ধে।[৩৩] এই নিবন্ধে দেলোয়ার হোসেন সমাজের সার্বিক পরিবর্তনের উপর অত্যাধিক জোর দিয়েছেন[৩৪] এবং যুক্তি-নির্ভর আলোচনাই এখানে স্থান লাভ করেছে।

সমালোচনার দৃষ্টিতে বলা চলে যে দেলোয়ার হোসেন এর উপর পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও আদর্শের বেশ প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়। তিনি যখন মুসলিম সমাজে প্রচলিত উত্তরাধিকারী আইন, বিবাহ এবং বিচ্ছেদ, নারীর পর্দা ও বোরখা প্রথা, দাসপ্রথা ও রক্ষিতাপ্রথা, মিতব্যয়িতা, অবাস্তব ব্যবসা বানিজ্য নিয়ম এবং কোরানিক নিয়ম কানুনের পরিবর্তনীয়তা

ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন[৩৫] তখন স্বভাবতই তাঁর সম্পর্কে মহামহিম সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি ভাল থাকাটাই ছিল হয়ত অতি স্বাভাবিক। ফলতঃ তিনি ব্রিটিশ রাজ প্রশাসন কর্তৃক দ্রুত পদোন্নতি ও নিয়োগ লাভ করেছিলেন বলে অনেকের ধারণা।[৩৬] এখানে এটা ভাববার অবকাশ আছে যে যেহেতু ব্রিটিশেরা অমুসলিম ছিলেন সেহেতু মুসলমানদের চিরাচরিত নিয়মকানুন ও স্বাধীনচেতা রাজনীতির বিরুদ্ধে যে কোন রচনা তাদের নিকট সহজেই গ্রহণযোগ্য ছিল। দেলোয়ার হোসেনের শান্তিপূর্ণ চাকুরী জীবনই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তবে এটাও সঠিক যে মুসলমানদের সমস্যাদি নিয়ে দেলোয়ার হোসেন গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। সরকারি চাকরির সীমাবদ্ধতার কারণে সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দিতে না পারলেও তিনি ছদ্মনামে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। সরকারি চাকরি থেকে অব্যাহতি (১৮৯৪) নেয়ার পর তিনি স্বনামে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সমাজ সংস্কারমুলক লেখালেখি করেছেন। এ সময়ে তিনি নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে হয়ত কোন সমস্যা মনে করেননি। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, জাগতিক আইনসমূহকে অবশ্যই ধর্মীয় আইন কানুন থেকে পৃথক করতে হবে যদি আমরা মুসলমান সমাজের আদৌ উন্নতি চাই।[৩৭]

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গে মুসলমানদের অবস্থান বিচার করলে দেখা যাবে যে অন্যান্য সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা বহুলাংশে পশ্চাদপদ ছিল। এ প্রসঙ্গে শীলা সেনের একটি উদ্ধৃতি বিবেচিত হতে পারে। তিনি লিখেছেনঃ "উনিশ শতকে বাংলার মুসলমানরা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত, সাংস্কৃতিক দিক থেকে নিষ্পেষিত এবং রাজনৈতিভাবে হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক অবদলিত"।[৩৮]

দেলোয়ার হোসেনের একটি উদ্ধৃতি থেকেই উপরোক্ত অবস্থা সম্পর্কে আরো পরিস্কার ধারনা পাওয়া যাবে। তিনি তাঁর 'এসেইজ অব মোহামেডান সোসাল রিফরমস' পুস্তকে লিখেন যে, 'মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে খ্রিষ্টান ধর্মের অনুশাসনভুক্ত দেশসমূহ যেখানে জ্ঞান অর্জনের দিক থেকে প্রতি বছরই অনগ্রসরতার দিকে এগুচ্ছে সেখানে মুসলিম দেশসমূহ সম্ভবতঃ জ্ঞানের জগতে অনেক বেশী পশ্চাদপদ হয়ে পড়ছে। এই অবস্থা খলিফা মামুন বা খলিফা হারুন অর রশিদের সময়ের চাইতেও করুণ'।[৩৯] রাজনীতির ক্ষেত্রে দেলোয়ার হোসেনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা চলে। যে মুহূর্তে মুসলিম লীগ হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল সে মুহূর্তে তিনি কিন্তু যুক্তিযুক্ত কারণেই তার বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর মতে মুসলমানেরা ছিল বিশৃংখল এবং শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে ছিল মারাত্মক সমস্যায়। তদুপরি মুসলমানদের অর্থ-সম্পদ, শিক্ষা ও শক্তি অর্জন করা প্রয়োজন। অথচ মুসলমানদের

তুলনায় হিন্দুরা সব দিকে এগিয়ে আছেন। কাজেই ঐক্য কি করে হতে পারে? রাজনীতির ক্ষেত্রে দেলোয়ার হোসেন আহমদের মূল বক্তব্য ছিল এটাই। যদিও এরকম বক্তব্য তখনকার সমাজে একেবারেই গ্রহনযোগ্য ছিল না।

মুসলমানদের তৎকালীন সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে দেলোয়ার হোসেন আরো লিখেছেন, "আমরা আমাদের সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা এখন সাধারণ ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণে অপরাগ, কেননা সমাজে এখন আমাদের তেমন কোন স্থান নেই। আমরা আমাদের অর্থনৈতিক অধিকারও হারাতে বসেছি। এমনকি উচ্চশিক্ষা গ্রহণেও যথেষ্ট সামাজিক বাধা বিরাজমান।"[৪০] তাঁর মতে, মুসলমানরা পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল জগতের নানান বিষয় সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন এমনকি কোনরূপ পরিবর্তনের উপর মুসলমানরা আস্থাশীল হতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে দেলোয়ার হোসেন লিখেছেন, "এটা ভাবা অবান্তর যে ইসলামের বিধিবিধান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবর্তনযোগ্য নহে।[৪১] অতএব, যেখানে প্রয়োজন সেখানেই পরিবর্তন আনতে হবে। দেলোয়ার হোসেন শুধু এ সব বক্তব্য দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। তিনি লিখেছেন, "বর্ণ ও ধর্মের উর্দ্ধে উঠতে না পারলে আমাদের অগ্রগতি অসম্ভব। সংস্কারের ক্ষেত্রে আমরা মুক্ত হতে না পারলে আমাদের অগ্রগতি কখনো হবেনা।"[৪২] লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলিম সমাজ নানারূপ ধর্মীয় অনাচারে নিমর্জিত ছিল। দেলোয়ার হোসেন এ সব অনাচার থেকে মুসলমানদের মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি উত্তরাধিকার আইন, বিবাহ ও তালাক, মহিলাদের পর্দা প্রথা, অমিতব্যয়িতা, অবাস্তব ব্যবসার নিয়মকানুন, কোরানিক নিয়মকানুনের অপরিবর্তনীয়তা ইত্যাদির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সময়ের বিবর্তনের ফলে এইসব নিয়মকানুনও পরিবর্তনযোগ্য। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে আধুনিকতার সাথে খাপ খাওয়াতে না পারলে মুসলমানদের অগ্রগতি অসম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে, দেলোয়ার হোসেন ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার বিমূর্ত প্রতীক। তাঁর মতে ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে মুসলমানেরা সমাজে পশ্চাদপদ হয়ে পড়েছে। সমাজ সম্পর্কে দেলোয়ার হোসেনের ব্যাখ্যা হার্বার্ট স্পেনসারের (১৮২০-১৯০৩) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। স্পেনসারের মতে সমাজ স্থিতিশীল নহে, ইহা বিবর্তনমূলক। সমাজের সকল নিয়মনীতি, মূল্যবোধ, প্রথা ইত্যাদি পরিবর্তনশীল। একইভাবে দেলোয়ার হোসেন বিশ্বাস করতেন যে, ইসলামের অনুশীলিত সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিবিধান পরিবর্তনযোগ্য। তাঁর মতে সামাজিক অবক্ষয় মুসলমানদের অধঃগতির জন্য মুখ্যত দায়ী এবং মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য প্রাচীন ও অবাস্তব রীতিনীতির পরিবর্তন অপরিহার্য।[৪৩]

বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় দেলোয়ার হোসেন আহমদের সাথে একমত হতে পারেনি।

বরং তিনি প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা আক্রান্ত হন। এর পরিণতিতে তিনি এ উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট ও বাংলার পুনঃজাগরণের অগ্রদূত হয়েও মুসলমানদের নিকট বিস্মৃত হন। এমনকি আজকাল অনেকেই তার নামও জানেননা। এ বিপ্লবী মহান মুসলিম চিন্তাবিদ সম্পর্কে আমরা যেন অজ্ঞই রয়ে গেছি। সুলতান জাহান সালেক তাঁর 'মুসলিম মর্ডানিজম ইন বেঙ্গল' পুস্তকে আক্ষেপ করে লিখেছেন[৪৪] যে, দেলোয়ার হোসেন আহমদ তৎকালীন সমাজ কর্তৃক নানাভাবে অবহেলিত হয়েছেন। বস্তুতঃ এই যুক্তিবাদী সমাজ সংস্কারকের দার্শনিক চিন্তাভাবনার কি কোন মূল্য ছিলনা? তিনি কি মুসলমান সমাজের জন্য হিতকর কিছু ভাবেননি? বর্তমানেও কি তাঁর চিন্তাভাবনা প্রচলিত সমাজের জন্য উপযোগী? যে পরিবর্ত্তনের কথা তিনি বলেছেন তা কি আদৌ হয়েছে? এই সকল প্রশ্নের আলোকেই দেলোয়ার হোসেন আহমদের সমাজকর্মকে মূল্যায়ন করতে হবে।

আমরা যদি দেলোয়ার হোসেনের কার্যাবলী সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করি তাহলে সামাজিক সমস্যাসমূহের উপর তাঁর নিরপেক্ষ ধ্যান ধারণার জন্য তিনি আমাদের নিকট নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধা ও প্রশংসাভাজন হবেন। তাঁর মতে বহু বিবাহ প্রথা এমন একটি সামাজিক রীতি যা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই প্রচলিত রয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের সমাজ কাঠামোতে এ প্রথা বিদ্যমান। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসনাবলীর মধ্যে যেসব দুর্বলতা রয়েছে তার প্রতিও আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, 'বাংলার হিন্দু ও মুসলমানরা যদিও বহু প্রজন্ম ধরে প্রতিবেশী হিসাবে পাশাপাশি একত্রে বসবাস করছে, তাদের রয়েছে পৃথক পৃথক সামাজিক সত্বা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ভিন্নতা। মুসলমান মহিলাদের জন্য সহজে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন বা পুনর্বিবাহ করা যেন একটা মনগড়া নিয়ম ছিল। তবে অনেকে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ঘরকন্না করে সুখে সংসারে জীবন যাপনের লক্ষ্যে বিবাহবন্ধ ছিন্ন জীবনকে পুনঃবিবাহ দ্বারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতো'।[৪৫]

বিরাজিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়মকানুনের প্রতি দেলোয়ার হোসেনের কোন সমর্থন ছিলনা। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমাজের যাবতীয় নিয়মকানুন পরিবর্তিত অবস্থার কালক্রমে পরিবর্তনযোগ্য। ত্রুটিপূর্ণ উত্তরাধিকার আইন, একাধিক স্ত্রী গ্রহন ও বহুবিবাহ প্রথা ইত্যাদি মুসলমান সমাজের পতনের মূল কারণ। জমির মালিকের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভূমির স্বত্ব বন্টনের জন্য সংশ্লিষ্ট ভূমির মহাল বা তালুকের বাধ্যতামূলকভাবে বাটোয়ারা পদ্ধতি ভূমির উন্নয়নে সহায়ক ছিলনা।[৪৬]

বস্তুতঃ দেলোয়ার হোসেন স্বনির্ভরতার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য এককভাবে সরকারের উপর নির্ভর না করে মুসলমানদেরকে নিজস্ব উদ্যোগে ভাগ্যোন্নয়ন

করতে বলেন। তিনি বলেন যে, 'সমাজে কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় কখনো সমাজের উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেনা যদি নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে নিজেরা চেষ্টা না করে। তাদের এটুকু উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক যে প্রচলিত আইন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের রীতিনীতি তাদের সামাজিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তন সাধন করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে সচেতন হতে হবে। তা না হলে তাদের পক্ষে নিজেদের প্রগতির ভাবনা শুধু মায়া মরীচিকাই থেকে যাবে।[৪৭]

উপসংহারে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মূলতঃ দেলোয়ার হোসেন আহমেদ উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় মুসলমানদের সামাজিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আমূল পরিবর্তনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখে গেছেন। তাঁর মতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান থেকে আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পর্ণ মুক্ত রাখতে হবে। তাতেই মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাগ্যোন্নয়ন ও উন্নতি সম্ভব। দেলোয়ার হোসেনের ভাষায় আমরা শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থ-সম্পদে ও প্রাচুর্যে যতই উন্নতি সাধন করিনা কেন তাতে আমাদের প্রকৃত উন্নতি হবেনা। যথার্থ উন্নতি অখনই হবে যখন আমরা সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করতে পারবো। অর্থাৎ ন্যায় ভিত্তিক আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে পারবো যেখানে কোন অন্ধ সংস্কার থাকবেনা। অবাধ ও মুক্ত জ্ঞানের চর্চা করতে পারবো, কোনরূপ অসামঞ্জস্য বিধিবিধান ও প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির অন্তরায় হবেনা।

সূত্র-নির্দেশ

১. তিনি হুগলী জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৮৪০ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি আরশা পরগনার দাদপুর থানার বাবনাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দেলোয়ার হোসেন আহমদ ১৮৬১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর পারিবারিক পদবী 'মির্জা' থেকে বোঝা যায় যে তিনি ও তাঁর পূর্বপুরুষগণ মোগল বংশীয় ছিলেন। তাঁর পিতার নাম গোলাম কাদির। তিনি বি এ পাশ করার পর একই বছর ২৭শে ফেব্রুয়ারিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। তিনি ১৮৯৪ সন পর্যন্ত এই চাকুরিতে বহাল ছিলেন। সরাকরি চাকুরি থেকে অবসর নেয়ার পরে তিনি 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন' পদে এক্সটেনশন পেয়েছিলেন। এই পদে তিনি ১৮৯৮ পর্যন্ত কাজ করেন। তাঁর এই বাড়িতে পদমর্যাদা তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর বহন করে। ১৮৯৪ সালে দেলোয়ার হোসেন 'খান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি 'ইজমাও আহমদ' 'মুতাজিলা' এবং 'সৈয়দ' ইত্যাদি ছদ্মনামে লেখালেখি করতেন। মুলসমানদের সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। কোলকাতা

হতে ১৮৮৯ সনে দুই খণ্ডে প্রকাশিত *'এসেজ অন মোহামেডান সোস্যাল রিফরমস* তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেলোয়ার হোসেন বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেও জড়িত ছিলেন। ১৯১১ সালে তিনি সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। দেখুন, *সুলতান জাহান সালিক* (সম্মা), *মুসলিম মর্ডানিজম ইন বেঙ্গল : এ ষ্টাডি অব দেলোয়ার হোসেন আহমদ মীর্জা*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০, পৃ: ৩।

২. হুমায়ুন আবদুল হাই, *মুসলিম সংস্কারক ও সাধক* (ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬), পৃ: ১৬৫।

৩. দেলোয়ার হোসেন আহমদ, *এসেজ অব মহামেডান সোস্যাল রিফমর্স*, কলিকাতা, ১৮৮৯, দুই খণ্ড।

৪. উনিশ শতকের ভারতবর্ষের একজন বিদগ্ধ ও খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি অতি সুপরিচিত। তিনি সমসাময়িককালের কুসংস্কারসমূহের কুপমণ্ডুকতার নাগপাশ হতে তাঁর ধ্যান ধারণাকে অনেক উর্দ্ধে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ভারতবর্ষের পথিকৃ বলা হয়ে থাকে।

৫. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, *ব্রাহ্মরিফর্ম মুভমেন্ট*, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ: ১২।

৬. সুমিত সরকার, এ ক্রিটিক অফ কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ: ১৭।

৭. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা, ১৩৮৭ বাংলা), পৃ: ১৭।

৮. জন প্লামেন্টাজ, ইংল্যাণ্ড ইউটেলিটারিয়ানস, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮।

৯. বিমান বসু সম্পাদিত, *প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর* (কলিকাত: বঙ্গীয় স্বাক্ষরতা প্রসার সমিতি ১৯৯১), পৃ: ৩১১-২০।

১০. ভোরা নভিকভো, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নিশিতেশ ব্যানার্জি অনুদিত, কলিকতা, ২য় সংস্করণ ১৯৮২, পৃ: ১০৩।

১১. ডি. এস. নারাভানে, *মর্ডান ইন্ডিয়ান থট*, এশিয়া, ১৯৬৭।

১২. অমলেন্দ দে, *রুটস অফ সেপারাটিজম ইন নাইন্টিনথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল*, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ: ১৩৩।

১৩. প্রদীপ কুমার লাহিড়ী, *বেঙ্গল মুসলিম থট*, ১৮১৮-১৯৪৭, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃ: ১৬৫।

১৪. হিস্ট্রি অফ সারভিসেস অফ অফিসারস হোল্ডিং গেজেটেড এ্যাপয়ান্টমেন্টস আন্ডার দ্য গর্ভনমেন্ট অফ বেঙ্গল, ১৮৮৯, পৃ: ৫৪৭।

১৫. শহিদুল ইসলাম, "আধুনিক বিশ্ব ও ইসলাম" *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা এপিরল, ১, ১৯৮৪, পৃ: ৬।

১৬. মুসলিম মডার্নিজম, প্রাগুক্ত, পৃ: ১।

১৭. পার্সিভাল স্পিয়ার, *দ্য অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ মর্ডান ইন্ডিয়া, ১৭৪০-১৯৪৭*, অক্সফোর্ড, ১৯৩৫, পৃ: ২৮৮।

১৮. স্পিয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৫৯।

১৯. ইসলাম, "আধুনিক বিশ্ব ও ইসলাম", প্রাগুক্ত পৃ: ৬।

২০. *বেঙ্গলি মুসলিম থট*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১-৫২।

২১. সৈয়দ আমির হোসেন, এ প্যাম্পলেট অব মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৮৮০, পৃ: ২০-২৪।

২২. অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৩।

২৩. কলিকাতার যুবসমাজের মধ্যে তিনি সচেতনতাবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন-যা পরবর্তীতে ইয়ং বেঙ্গল ম্যুভমেন্ট এ রূপ লাভ করেছিল। তাঁর একজন অনুসারীর (রাধা কৃষ্ণ মল্লিক) মতে, "তিনিই(দেলোয়ার হোসেন আহমদ) প্রথম ব্যক্তি যিনি মানুষের মধ্যে জ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন...........নিজেদের সম্পর্কে ভাবতে শিখিয়েছিলেন।" দেখুন, এ. এফ. সালাউদ্দীন আহমদ, *সোস্যাল আইডিয়াস এ্যান্ড সোস্যাল চেঞ্জ ইন বেঙ্গল*, ১৮৩৬, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ: ৪৮।

২৪. *মুসলিম মডানিজম*. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩।

২৫. নিমাইসাধন বোস, *দ্য ইন্ডিয়ান এয়কেনিং ইন বেঙ্গল*, কলিকতা, ১৯৬০, পৃ: ৪৮।

২৬. ড: জ্যোতির্ময় ঘোষ, বিগত ১১.১২.১৯৯৮ তারিখ চট্রগ্রাম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রে 'নজরুলের মুল্যায়ন' শীর্ষক বক্তৃতার সময় এ মন্তব্য করেন।

২৭. মুসলিম মর্ডানিজম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭-৮।

২৮. পূর্বোক্ত।

২৯. এনামুল হক, নবাব আবদুল লতিফ, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ: ৬৮।

৩০. মুসলিম মর্ডানিজম, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১০।

৩১. মোহর আলি (সম্পা), নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর, চট্রগ্রাম, ১৯৬৮, পৃ: ১।

৩২. শফিকুল আলম, "দেলোয়ার হোসেন আহমদ মীর্জা এ্যান্ড হিস ইউটিলিটারিয়ান রিফমর্স", জার্নাল অফ *দ্য ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিস*। রাজসাহি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫, খণ্ড ১৮, পৃ: ১৩৮।

৩৩. *মুসলিম মর্ডানিজম*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭।

৩৪. *বেঙ্গল মুসলিম থট*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩।

৩৫. *এসেজ অন মহামেডান সোস্যাল রির্ফমস*, প্রাগুক্ত।

৩৬. দ্বিতীয় শ্রেনীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে ১৮৬১ সনে নিযুক্ত হন এবং পরে প্রথম শ্রেনীতে উন্নীত হন (সূত্রঃ নং ২ ডি-১১ঃ১-৪৭)। পরবর্তীকালে তিনি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন (জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বিচ্ছেদ ইত্যাদি সংক্রান্ত পদে অধিষ্ঠিত হন (সূত্র আই আর-২ঃ১-৩ এবং ৬ সি-১৬ঃ ১-৬)। এছাড়াও তিনি ১৮৭২-১৮৯৯ পর্যন্ত বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৩৭. সালাহউদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ: *জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা গনতন্ত্র* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ: ৫৪।

৩৮. শীলা সেন, *মুসলিম পলিটিকস ইন বেঙ্গল,* ১৯৩৭-১৯৪৭, নিউ দিল্লী, পৃ: ১।

৩৯. তাঁরা দুজনে যথাক্রমে ৭৮৬-৮০৯ এবং ৮১৩-৮৩৩ পর্যন্ত বাগদাদ (ইরাক) শাসন করেন। বাগদাদের ইতিহাসে এই দুই শাসনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *মুসলিম মর্ডানিজম,* প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১। আরো দেখুন, ইসলাম, "আধুনিক বিশ্ব ও ইসলাম", প্রাগুক্ত, পৃ: ৬।

৪০. ইসলাম, "*আধুনিক বিশ্ব ও ইসলাম*' এ উদ্বৃত, পূর্বোক্ত।

৪১. ইসলাম, "*আধুনিক বিশ্ব ও ইসলাম*', পূর্বোক্ত।

৪২. এসেজ অন মহামেডান সোস্যাল রিফমর্স, প্রাগুক্ত।

৪৩. ঐ।

৪৪. *মুসলিম মর্ডানিজম,* প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

৪৫. *এসেজ অন মহামেডান সোস্যাল রিফমর্স,* প্রাগুক্ত।

৪৬. আহমদ, ট্রেডাস ইন.....নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি, পাগুক্ত, পৃ: ১২২।

৪৭. পুর্বোক্ত, পৃ: ১২২-২৩।

৪৮. *এসেজ অন মহামেডান সোস্যাল রিফমর্স,* প্রাগুক্ত।

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তামানসে ঔপনিষদিক প্রভাব

তপতী দাশগুপ্ত

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে বাংলার নবজাগরণ বা রেনেশাঁর অধ্যায় শুরু হয়। এই রেনেশাঁ আন্দোলনের যাঁরা কর্ণধার ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই সময় বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে এক নূতন শিক্ষার জোয়ার এসেছিল এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন এই বুদ্ধিজীবী মহলে নূতন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটিয়েছিল।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির মূল উৎস ছিল বেদ ও উপনিষদ। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে এবং সামাজিক অবক্ষয়ের গ্লানিতে ভারত তার এই মহান ঐতিহ্যকে প্রায় বিস্মৃত হয়েছিল। এই বিলুপ্ত ঐতিহ্যকে নূতন করে সাহিত্যের মধ্যে প্রতিভাত করার প্রয়াস করেন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীরা। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে বেদ উপনিষদের মর্মকে মূর্ত্ত করে তুলেছেন অন্যদের তুলনায় বেশী। তবে, রবীন্দ্রনাথের পূর্বসুরী রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা রাজা রামমোহন রায় ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রগতিশীল চিন্তানায়ক। পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায়, বিশেষ করে খ্রীষ্টধর্মের প্রেরণায় উজ্জীবিত রামমোহন কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মের প্রধান অলংকার, বেদ-উপনিষদকে কোনদিন অগ্রাহ্য করেননি। খ্রীষ্টধর্মকে তিনি যথেষ্ট মর্য্যাদা দিলেও, হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক তত্ত্বকে তিনি বিশ্বের সব ধর্মের চেয়ে বেশী মূল্যবান বলে মনে করেছেন।

ফ্রান্সের বিশপ এ্যাবে গ্রেগয়ার রামমোহন সম্পর্কে বলেছেন যে "He asserts likewise that he has found nothing in European looks equal to the scholastic philosophy of the Hindus."[১] রামমোহন বেদ এবং উপনিষদ পঠনের মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব সাহিত্যের মধ্যে এগুলির ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁর লেখনীর উপর বেদ-উপনিষদের প্রত্যক্ষ প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদ ভিত্তিক রামমোহনের সাহিত্যকর্মগুলি এইভাবে চিহ্নিত করা যায়।

ক)	বেদান্ত-গ্রন্থ	কলিকাতা	১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ
খ)	বেদান্ত সার	”	১৮১৫ অথবা ১৮১৬
গ)	তলাবকার উপনিষদ বা কেনোপনিষদ	”	১৮১৬

ঘ)	ঈশপনিষদ	কলিকাতা	১৮১৬
ঙ)	কঠোপনিষদ	”	১৮১৭
চ)	মান্ডুক্যপনিষদ	”	১৮১৭
ছ)	মুন্ডক্যপনিষদ	”	১৮১৯
জ)	শঙ্করাচার্য্যের আত্মনাত্মবিবেক	”	১৮১৯[২]

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রেনেশাঁ চিন্তাধারার এক প্রধান গ্রাহক। দেবেন্দ্রনাথের প্রথম উপনিষদ পাঠের অধ্যয়নকাল ছিল ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৩ সাল। এই পর্য্যায়ে তিনি প্রধান সহায়তা পেয়েছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের থেকে, যিনি প্রথম ঈশপনিষদের প্রধান শ্লোকটি ওঁকে ব্যাখ্যা করে শোনান।

"ঈশ বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চিৎ জগৎতম
জগৎতেন ত্যক্তেন ভুক্ততীথা:।"[৩]

এগারোটি উপনিষদের মূল বক্তব্যবিষয়টিও তিনি দেবেন্দ্রনাথের কাছে প্রাঞ্জল করে তোলেন। ১৮৪৪-৪৮ সালে শুরু হয় তাঁর উপনিষদ পঠনের দ্বিতীয় অধ্যায় এবং এই সময়কালে রচিত 'আত্মজীবনীর' দশম, দ্বাদশ ও চর্তুদশ অধ্যায়ে পাওয়া যায় উপনিষদের মূল্যবান প্রভাব। দ্বাদশ অধ্যায়ের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন যে শংকরাচার্য্যের মতে ১১টি উপনিষদ বর্তমান, কিন্তু তাঁর নিজস্ব অনুসন্ধানে তিনি ১৪৭টি উপনিষদের স্বরূপ খুঁজে পেয়েছেন। এই পর্য্যায়ে তিনি উপনিষদ সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন এবং 'ব্রহ্মউপাসনার' উপপাদ্য বিষয়টি তিনি উপনিষদের সাহায্যে লিখতে সক্ষম হন। ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত সময়কালে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের নূতন ব্যাখ্যা শুরু করেন এবং এটির প্রয়োজন হয়েছিল খ্রীষ্টধর্মের সাথে কিছ প্রভেদ ও ব্যঞ্জনা খুঁজবার প্রয়াসে। বেদ পঠনের এক ঐকান্তিক আগ্রহ তিনি অনুভব করেন এবং তাঁর শিষ্য আনন্দচন্দ্র, বানেশ্বর, তারকনাথ এবং রামনাথকে তিনি কাশীতে পাঠান। তিনি নিজেও পরে কাশীতে গিয়ে বেদ অধ্যয়ন করেন এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে আসেন যে উপনিষদই ব্রাহ্মধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ রূপে চিহ্নিত হতে পারে না। ১৮৪৮ সালে তিনি 'ব্রাহ্মগ্রন্থ' রচনা করেন এবং তাঁর নিজস্ব রীতিতে এটি পরে 'ব্রহ্মোপনিষদ' রূপে খ্যাত হয়। তিনি গায়ত্রী মন্ত্রকে 'ব্রহ্মোপসনার' প্রথম মূলমন্ত্র রূপে রেখে উপনিষদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।[৪]

রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনে উপনিষদের প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—"Nothing has influenced him more, both consciously and as an undercurrent of thought, than the Upanishads...I maintain that Rabindranath's career is only an evolution and development of his Upanishadic education."[৫] শ্রী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য্য যে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের প্রকৃত মূল্যায়ণ করতে পেরেছিলেন এবং উপনিষদের দর্শনকে তাঁর মানবিক ও আধ্যাত্মিক মননের মাঝখানে গ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর সফল চিন্তাশীল সমসাময়িকদের অগ্রণী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, "Like all truths

realised through life, the truths of the Upanishads are concrete. Many tendencies of thought have been reconciled in them, because life itself is a great reconciler." বহু ইউরোপীয় তত্ত্ববিদ্ উপনিষদের দর্শনের মধ্যে শুধু জীবনের নেতিবাচক দিককে দেখেছেন, যেমন- মোহ, দু:খ এবং অসত্য। কিন্তু উপনিষদের মধ্যে যে একটি অভিনব দিক আছে, তাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথই প্রথম যিনি উপনিষদের বাণীর মধ্যে পেয়েছিলেন 'আনন্দম্' বা আনন্দ বাণীকে।

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের মতে রবীন্দ্রনাথের কিছু গানে এবং কবিতায় উপনিষদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—"His genius is beyond all compare and needs no plagiarism to bolster it. I mean no more than there is a vital connection between his literature and that of ancient India—a continuity of life as inevitable as in the world of biology."[৬] রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত গ্রন্থ 'সাধনার' প্রতি ছত্রে বেদ-উপনিষদের গভীর দর্শন-তত্ত্বকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। শুধুমাত্র প্রাচ্য নয়, পাশ্চাত্যের অনুরাগীবৃন্দও রবীন্দ্রনাথের 'সাধনার' ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তার সমৃদ্ধ দর্শনতত্ত্বের জন্য। ২৭.২.১৯১৪ তারিখে 'West London Post' রবীন্দ্রনাথের 'সাধনার' সুষ্ঠু সমালোচনা করে শেষ মন্তব্যটি করে এইভাবে— "The writer was brought up in the midst of a family where texts of the Upanishads were used in daily worship and in 'Sadhana', it is the wish of the author that his Western reader shall come into touch with the spirit of ancient India and the reader of the book has no difficulty in gratifying the author's wish."[৭]

রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে উপনিষদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হয়। ১৯০১ সালে রচিত 'নৈবেদ্য'র ৫৭, ৫৮ এবং ৬০ সংখ্যক কবিতাগুলির মধ্যে 'শ্বেতাশতর' উপনিষদের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ৫৭ সংখ্যক কবিতাটির, যেটির শুরু হচ্ছে "হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর" সঙ্গে 'শ্বেতাশতর' উপনিষদের ৬ সংখ্যক মন্ত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায় - "তমিস্মরণং পরমং মহেশ্বর তাং চ দৈবতাম্।" (যর্জুবেদ-কৃষ্ণ)।[৮]

ঈশপনিষদের প্রায় প্রত্যেকটি মন্ত্রই গাঁথা হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্যর' মর্মমূলে। কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে—এই মন্ত্রগুলির প্রত্যেকটির বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় শ্রী অরবিন্দের অনুবাদে এবং 'নৈবেদ্যর বিভিন্ন কবিতার পংক্তিতে। ঈশপনিষদের ৫,৬,৯,১১,১৫,১৮ সংখ্যক মন্ত্রের ভাবধারা সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে[৯] নৈবেদ্যর ভাবনায়। যেমন ঈশপনিষদের ১৮ সংখ্যক মন্ত্রের সঙ্গে 'নৈবেদ্যর ৫৮ সংখ্যক কবিতার মিল পাওয়া যায়-

"তাঁহারে দেখিয়াছেন বিশ্বচরাচর
ঝরিছে আনন্দ হতে আনন্দ নির্ঝর
...অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে...।"

১৮ সংখ্যক মন্ত্রের মূল সুরটি হল-"অগ্নেনয় শুপথারায় অস্মিন..." যার সঙ্গে উপরে উল্লেখিত কবিতাটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ৯ ঈশপনিষদের ১১ সংখ্যক মন্ত্রের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় 'নৈবেদ্যর' ৫৬ সংখ্যক কবিতার—"বিদ্যাম্ চ অবিদ্যাম্ চ...." এবং "ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্যনিরবধি...।"[১০]

'গীতাঞ্জলির' কিছু গানও উপনিষদের আলোয় আলোকিত হয়েছে, যেমন ঈশপনিষদের ৯ সংখ্যক মন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে 'গীতাঞ্জলির' এই গানে "অন্ধম্ তব প্রবিশন্তি" এবং "অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ।"[১১]

আরও কিছু গানে, কবিতায়, উপনিষদের ধারার প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'খেয়ার' 'বিকাশ' কবিতায় ঊষার যে সৌন্দর্য্যময়ী রূপ পাওয়া যায়, সেই রূপই ধরা পড়েছিল কয়েক হাজার বছর আগে বিশ্বামিত্রের ঊমা বন্দনায়।[১২] ঋক্‌বেদের এই ছত্রে এর প্রতিধ্বনি মেলে- "আবা শূন্যমেদ ছিন্নতি মধ্যানুশ।"[১৩] ঋক্ বেদ সংহিতার অন্য একটি মন্ত্র, যেমন "মধু বার্তা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব" (মন্ডল-১)[১৪]-র সাথে মিল আছে রবীন্দ্রনাথের 'আরোগ্য'র এই কবিতার-

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় এ পৃথিবীর ধূলি"[১৫]

ঋক্‌বেদ সংহিতার অপর একটি মন্ত্র- "সংগচ্ছদ্ধম্ সংবদদ্ধম্" এর সাথে[১৬] অপূর্ব মিল পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের এই গানটির:-

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন...।"[১৭]

ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন শ্লোকের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সত্য লুকিয়েছিল, তাই রূপ নিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে, বাংলার নবজাগরণের যুগে কিছু মনীষীর চিন্তাজগতে। দুঃখের মধ্যেও যে অবিমিশ্র আনন্দ সুপ্ত আছে, প্রকৃতির মধ্যে যে বিশ্বপ্রেমের বীণা অণুরণিত হয়, সৃষ্টির মধ্যে যে শ্বাশত শান্তির আভাস পাওয়া যায়, তারই আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হয়েছে বেদ ও উপনিষদে। তাই বুঝি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেদনাবিধূর জীবনপথে কখনও হার মানেননি, শক্তি যুগিয়েছিল বোধকরি সেই উপনিষদের অমৃতবাণী।

"মরিতে চাহিনা আমি এ সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"[১৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন জাতির জীবনে মহা সংকট আসন্ন, সেই সময়, বাংলার সমাজ দর্পণে তিন ধরণের সমাজ চেতনা প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। ক) ওরিয়েন্টালিষ্ট বা প্রাচ্যবাদী খ) এ্যাংলিসিষ্ট বা পাশ্চাত্যবাদী, গ) মর্ডানিষ্ট বা প্রগতিবাদী। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এই তৃতীয় ধারার চিন্তাজগতের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাঁবা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য দুই এর সাথেই পরিচিত ছিলেন এবং উভয় সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট বিষয়গুলিকে নিয়ে তাঁরা গড়তে চেয়েছিলেন এক মিলন সেতু। সে যুগের ভাঙনধরা, ক্ষয়িষ্ণু সমাজে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রেখেছিলেন এই ত্রয়ী মনীষী। তখন কিছু মানুষ রক্ষণশীল প্রাচীন গোঁড়ামীর মধ্যে ভারতের ত্রাণের উপায় দেখেছিলেন, কেউ বা চেয়েছিলেন অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণ।

কিন্তু এই প্রগতিবাদীরা ছিলেন যুক্তিবাদী। তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যময় যুগ থেকে আহরণ করেছিলেন বেদ উপনিষদের মূল্যবান রত্ন, অন্যদিকে সঞ্চয় করেছিলেন ইউরোপীয় সংস্কৃতির ও প্রগতির সমৃদ্ধময় সামগ্রী। এরই মধ্যে উপনিষদের বাণী, যা একদিন বৈদিক ভারতে উচ্চারিত হয়েছিল ঋষিদের মাধ্যমে, তা ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পথকে সুগম করেছিল, সৃষ্টির অপার মহিমাকে জাগরূক করেছিল, গ্লানির মধ্যে আনন্দের স্বাদ এনেছিল এবং কন্টক-বিদীর্ণ সমাজে এনেছিল যুক্তি, শান্তি ও প্রগতির আশ্বাস। রেনেশাঁ যুগের এই মহানায়কদের বিপুল সাহিত্য কর্মের মধ্যে ঔপনিষদিক প্রভাব তাঁদের চিন্তাজগৎকেই শুধু অলংকৃত করেনি, শিক্ষাকামী সমগ্র ভারতবর্ষীয় আন্দোলনটিকেই এক নব রূপ দান করেছিল।

সূত্র নির্দেশ

১। সোফিয়া ডবসন কলেট, 'দ্যা লাইফ এ্যাণ্ড লেটারস্ অব রাজা রামমোহন রয়' —দিলীপ কুমার বিশ্বাস ও প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলী সম্পাদিত (১৯৬২), পৃ:-'৯৭

২। বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্রভবন আর্কইভস্' থেকে সংগৃহীত

৩। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী' (১৯৬২), পৃ: ২৯৫

৪। 'তৎসাধতুর বরেণ্যং...' ঋক্‌বেদ, ৩/৬২-১০ নং মন্ত্র

৫। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী এবং রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক', প্রথম খণ্ড (১৩০৪ বঙ্গাব্দ), পৃ: ৩২

৬। ক্ষিতিমোহন সেন, 'দ্যা জিনিয়াস অব রবীন্দ্রনাথ-ইটস্ ক্যারেকটার অ্যান্ড লাইনেজ'-'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি'-হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত, ট্যাগোর সেন্টিনারী নাম্বার (১৯৬১), ভলিউম - ২৬,৩ এবং ৪ সংখ্যা, পৃ: ২৩-২৫

৭। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন থেকে নিউজপেপার ক্লিপিংস

৮। শ্বেতাশতর উপনিষদ, ষষ্ঠ মার্গ, (যর্জুবেদ-কৃষ্ণ)

৯। 'অগ্নেনয় স্তপথারায় অস্মিন্....'-ঈশপনিষদ-১৮

১০। 'বিদ্যাম্ চ অবিদ্যাম্ চ....'-ঈশপনিষদ-১১

১১। 'অন্ধম তব প্রবিশন্তি....'-ঈশপনিষদ-৯

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'খেয়া'-'বিকাশ', রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খন্ড,(১৯৭১), পৃ: ১৪৪

১৩। ঋক্ বেদ-তৃতীয় মার্গ-৬১, ৪

১৪। ঋক্ বেদ-মণ্ডল-১

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঞ্চয়িতা'-'আরোগ্য'-'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' পৃ-৮৩৩

১৬। ঋক্ বেদ-মণ্ডল ১০

১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গীতবিতান'-'জাতীয় সঙ্গীত'-পৃ: ৮১৮-১৯

১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কড়িও কোমল-পৃ: ৪২

বাংলার নবজাগরণে বিদ্যাসাগরের অবদান (সংক্ষিপ্তসার)

অশ্রুরঞ্জন পান্ডা

আলোচ্য নিবন্ধে 'বাংলার নবজাগরণ' বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ হিসাবেই গ্রহণ করা হয়েছে যেহেতু বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) পুরোপুরি ঊনবিংশ শতাব্দীর ফসল। এই নবজাগরণে বিদ্যাসাগরের ভূমিকাটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সময়ে তা কতটা প্রাসঙ্গিক তা বিশ্লেষণ করব যেহেতু বর্তমানেও সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, কু-সংস্কার বাংলা তথা ভারতবর্ষের সমাজকে কলুষিত করে রয়েছে।

সাধারণ মানুষের রোগে সেবা করা বিদ্যাসাগরের জীবনের অঙ্গ। নিজে হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে তাঁদের পাশে থেকে চিকিৎসা করেছেন 'বড়লোক', 'ধনীলোক'-দের এলাকা ছেড়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গলাভে তিনি বরাবরই ছিলেন তৎপর। করমাটাড়ে সাঁওতালদের সহজ সরল জীবনের সঙ্গে তিনি নিজেকে একাত্মভাবে জড়িয়ে দিলেন। তিনি জীবন দিয়ে বুঝেছিলেন 'বড়লোক' ও 'ধনীলোক' নকল, শিক্ষিত মধ্যবিত্তও সর্বদা মানবিক গুণকে প্রাধান্য দেয় না।

শ্রদ্ধা, বিনয়, ভক্তি বিদ্যাসাগরের জীবনে আর একটি দিক। তাঁর মাতৃভক্তি এবং তাঁর অগণিত আত্মীয়স্বজনকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য যথার্থই তাঁকে 'করুণাসাগরে' ভূষিত করেছে। তাঁর দলিলে তিনি সুনিপুণভাবে তাঁর মৃত্যুর পর কাকে কীভাবে সাহায্য দেওয়া হবে তার বিশদ ব্যবস্থা করে যান।

নবজাগরণ শুধু সংস্কৃতি, সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, জীবনের সামগ্রিক উন্নতিতেই তাঁর সম্যক প্রকাশ ঘটে। বিদ্যাসাগর সম্ভবতঃ তাঁর সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন যা রবীন্দ্রনাথ তাঁর একধিক লেখায় উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পিত ত্রিভাষা নীতি বর্তমানে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। মাতৃভাষা, সংস্কৃত, ইংরাজীকে যুক্তিসংগতভাবে গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভাষা মাতৃ-দুগ্ধসম। প্রত্যেককেই মাতৃভাষায় সর্বোচ্চ শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। সংস্কৃত আগে মাধ্যমিকে বাধ্যতামূলক ছিল। এর ফলে ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য জানার সুযোগ ছিল, তাছাড়া সংস্কৃত ভারতীয় সমস্ত ভাষার জননী। পঞ্চমশ্রেণী থেকে সহজ সরলভাবে দশমশ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃতকে গ্রহণ করা দরকার। আর বিদ্যাসাগর ইংরাজী ভাষার সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। ইংরাজী চর্চার মাধ্যমেই বিশ্বের জ্ঞানের সম্পদ আমরা আহরণ করতে পারব, নিজ নিজ

মাতৃভাষাকেও সমৃদ্ধ করতে পারব।

বিদ্যাসাগর শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা তাঁর সময়ে ভাবতে পারেন নি। স্বাধীনতার ৫২ বছর পরেও আমরা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে পারিনি, নবজাগরণের অন্যতম মাপকাঠি হল সুশিক্ষা, শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলে স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক আগ্রহ বাস্তবে ফলপ্রসূ হবে।

সমসাময়িকেরা বিদ্যাসাগরের একক চলার উল্লেখ করেছেন, হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক চ্যুতি, 'ভারত সভা'-র সভাপতির পদ গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, সারস্বত সমাজে যোগ দিতে অনীহা প্রভৃতি ঘটনার মাধ্যমে বিদ্যাসাগর কিছুটা আত্মাভিমানী ছিলেন বলে বলা হয়। 'শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে ?' শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এই উক্তির কিছুটা যাথার্থ্য থাকলেও উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

আলোচ্য নিবন্ধে নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচকেরা বিদ্যাসাগরকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে কাজ করার উল্লেখ করেছেন। অশোক সেন বিদ্যাসাগরকে ঔপনিবেশিক শাসনের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই দেখেছেন, পক্ষান্তরে অমলেশ ত্রিপাঠী বিদ্যাসাগরকে 'traditional modernizer' বলেছেন।

এই সব সীমাবদ্ধতার মধ্যে কিছুটা সত্য থাকলেও বিদ্যাসাগরের অবদান যুগোত্তীর্ণ, তাঁকে তাঁর সমসাময়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে বহমান গঙ্গার সঙ্গে তুলনা করেছেন। গঙ্গার গতি পরিবর্তনের মধ্যে যে চিরন্তন প্রবহমানতা রয়েছে বিদ্যাসাগরের জীবনে সেই প্রবহমানতা অনস্বীকার্য। ছিদ্রন্বেশীদের সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করে বিদ্যাসাগরকে নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে অবশ্যই গণ্য করা উচিত এবং রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের যোগ সূত্র হিসাবে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অত্যুজ্জ্বল।

সূত্র নির্দেশ

১। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)—বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, কলকাতা, ১৯৭২।

২। বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ (১ম, ২য়), ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭৩

৩। Arabindo Poddar — Renaissance in Bengal-Quests & Confrontations (1800-1860), Indian Institute of Advanced Study, Simla, 1970

৪। দিলীপ বিশ্বাস—রামমোহন সমীক্ষা, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮৩

৫। অলোক রায়—উনিশ শতক, পুস্তকবিপনি, কলকাতা, ১৯৯৫।

৬। ইন্দ্র মিত্র—করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ১৯৭১।

৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, ষ্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, কলকাতা -১৩৯৭ বাং।

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিদ্যাসাগর চরিত-চারিত্র পূজা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৩ অগ্রহায়ণ।

৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৩৮ বাং।

১০। বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, এইচ. পি. চ্যাটার্জী, কলকাতা ১৩২৯ বাং।

১১। D. Kopf—British Orientation & Bengal Renaissance, Firma K.L.M., Calcutta, 1969.

১২। নরহরি কবিরাজ—উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক, কে. পি. বাগচী এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৩।

ঔপনিবেশিক বাংলায় লোকায়ত চিকিৎসা ও জনমানসে তার প্রভাব

ভূমিকা

সুব্রত পাহাড়া

এফ. এল. ভান ও ডি.সি. জারভিস প্রমুখ লেখকেরা এদেশে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলির শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথিকে কসমোপলিটান মেডিসিন, আয়ুর্বেদ, যোগ ও ইউনানীকে রিজিওনাল মেডিসিন এবং লোকায়ত চিকিৎসা বা লোকচিকিৎসাকে লোকাল এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১] উপরোক্ত শ্রেণী বিভাগ আয়ুর্বেদ, ইউনানী ও যোগের ক্ষেত্রে যথাযথ বসে মনে না হলেও লোক চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ লোক চিকিৎসার মূলতত্ত্ব (অতিপ্রাকৃতিক চিকিৎসা ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা) সর্বত্র এক হলেও স্থানভেদে কিংবা অঞ্চলভেদে এর চিকিৎসার উপাদান, মন্ত্রতন্ত্র ও আদব কায়দার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

ভারতবর্ষে প্রচলিত সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলির (আয়ুর্বেদ, ইউনানী, সিদ্ধা, যোগ, লোক ও তান্ত্রিক) মধ্যে লোক চিকিৎসার ঐতিহ্য হল সবচেয়ে প্রাচীন। যুগ যুগ ধরে ভারতীয়রা বিভিন্ন ধরণের রোগব্যাধি নিরাময়ে ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে প্রচলিত লোকায়ত চিকিৎসার সাহায্য নিয়ে আসছে। বিশেষ করে দরিদ্র, অনগ্রসর ও অশিক্ষিত ভারতবাসী লোকায়ত চিকিৎসার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই অনগ্রসর দেশবাসীরা মূলত: লোকায়ত চিকিৎসার অনুসারী। লোকায়ত চিকিৎসা বিষয়ে কোন কিছু আলোচনা করার আগেই প্রথমে এর একটি যুক্তিগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপণ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ আজ পর্যন্ত এর কোন সর্ব্ববাদীসম্মত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। একটি বহুপ্রচলিত অভিধান অনুসারে লোকায়ত চিকিৎসা হল,

Non professional practice of medicine using procedures and remedies, the latter often of plant origin, based largely on empiricism and tradition.[২]

এছাড়া C.C. Hughes প্রদত্ত সংজ্ঞা হল,

a body of belief about the nature of diseases, its causation and cure and its relation with other aspects of group life. There also exists therapeautic and preventive practice, many of are empirically efficacious by standard of modernisation...but one common character is its close integration with other institutions of society, religion, medicine and mortality.

একইভাবে F. Kennett, G. Khanna, B.G. Banerjee, R.S. Khare ও R. Jalota প্রমুখ লেখক ও লেখিকা প্রদত্ত সংজ্ঞা এবং বর্তমানে প্রচলিত লোকায়ত চিকিৎসার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য থেকে বলা যেতে পারে যে---

> লোকায়ত চিকিৎসা হল একধবণের আদিম, বদ্ধ ও অলিখিত চিকিৎসার ব্যবস্থা। যাব মূলতত্ত্ব একই সঙ্গে লৌকিক ও অলৌকিক চিন্তাধারা ও প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। এধারাব চিকিৎসা ব্যবস্থাব সঙ্গে অনুসরণকারী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসেব যোগ খুব নিবিড়। এই চিকিৎসা ব্যবস্থায় বহিরাগত উপাদান খুব কম এবং প্রয়োজনীয ভেষজ উপাদান স্থানীয়ভাবেই সংগ্রহ করা হয়। এই চিকিৎসা ব্যবস্থা চর্চাব জন্য কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান নেই, তাই লোকায়ত চিকিৎসা বংশ পরম্পরায় কিংবা গুরুশিষ্য পবম্পরায় মৌখিকভাবে প্রচলিত।

লোকাযত চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরণের রোগব্যাধির কারণ ও প্রতিকারকে মূলত দু-ভাগে ভাগ করা হয়, অতিপ্রাকৃতিক কারণ ও প্রাকৃতিক কারণ। এগুলিকে আবার যথাক্রমে ছয ভাগে বিভক্ত কবা যায, যেমন-রুষ্ট দেবদেবীর রোষ, অশুভ আত্মা ও অপদেবতার প্রভাব, জাদুবিদ্যা, ডাইনীবিদ্যা, নিষেধ অমান্য জনিত কারণ, ও নজর লাগা, প্রভৃতি। অন্যদিকে প্রাকৃতিক কারণকেও পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- জলবায়ু, বীজাণু সংক্রমণ, বিষাক্ত খাদ্যগ্রহণ, অমিতাচার ও দুর্ঘটনা।[৮] সেকারণে ওঝা, বৈদ্য, জানগুরু, বেদে, নাপিত, পুরোহিত, বোজা, ফকিব, ডান, সিকোত্রী, দেবাংশী ও মুসকিল আসান এবং পরিবাবের বয়স্ক ও বয়স্কা সদস্যের অধিকাংশই এ ধাবাব চিকিৎসক। আব বিভিন্ন ধরণের ভেষজ, জান্তব ও খনিজ উপাদানের সাথে সাথে নানা ধরণের ঝাড় ফুঁক, দান ধ্যান, তুকতাক ও আটাসী পাটাসী এবং বিভিন্ন ধরবের মাদুলী, কবচ ও তাবিজ ধারণ হল এ ধারার চিকিৎসা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সে কাবণে লোকেদের বাডীগুলির সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মন্দির, মসজিদ, দেবদেবীর থান, মাজার ও দরগাগুলি এক একটি লোকায়ত চিকিৎসালয় (folk hospital) রূপে পরিগণিত।

তবে যে জন্যে বর্তমান নিবন্ধের অবতারনা তা হল, আধুনিক কালের অধিকাংশ পশ্চিমীপন্থী গবেষক ও ঐতিহাসিকদের অভিমত যে এদেশে প্রচলিত সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলি বিশেষ করে লোকায়ত চিকিৎসা একেবারে অসার, অবৈজ্ঞানিক এবং নিছক ভেল্কিবাজী ছাড়া অন্য কিছুই নয। সেজন্য পশ্চিমী চিকিৎসাব প্রবর্তনের ফলে এগুলি মানুষের বিশ্বাস হারিযে একেবারে বিলুপ্ত হযে গেছে। যে সব অঞ্চলে এগুলির কিছুটা প্রচলন আছে, সে সব অঞ্চলে পশ্চিমী চিকিৎসাব সুযোগ পৌঁছায়নি। শুধুমাত্র পাশ্চমীপন্থী গবেষকরাই নয়, আধুনিক কালে কিছু কিছু তথাকথিত শিক্ষিতেরও এই একই ধাবণা। এখন উপবোক্ত অভিমতগুলি কতটা যুক্তি নির্ভব তা যাচাই করে দেখাই হল বর্তমান নিবন্ধেব মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সেজন্য আজ পর্যন্ত যে সব ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাদান আমাদেব হাতে এসেছে সেগুলির সাহায্যে এবং কিছু কিছু ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বিষযটি পর্যালোচনার চেষ্টা কর হল।

উপনিবেশিক বাংলাব বহু লোকজন ও পত্র পত্রিকা এবং আধুনিককালের বিভিন্ন

গবেষকদের রচনায় লোকায়ত চিকিৎসার কঠোর সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে যে লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্তৃক নিয়োজিত গ্রান্ট কমিটির অন্যতম সদস্য মি. এডাম প্রচলিত সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেছিলেন—

> They have not the least semblance of medical knowledge and they in general limit their prescriptions to the simplest vegetables preparations either preceeded or followed by pronouncing of incantations by striking or blow upon the body.[৫]

এছাড়া পশ্চিমী চিকিৎসার জনপ্রিয়তার স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'সমাচার দর্পণ' মন্তব্য করেছিল, "তাহারা অবশ্যই জানিতে পারিয়াছে যে অনেক রোগী এ দেশের চিকিৎসকের হস্তগত হইলে প্রাণে রক্ষা পায় না ...ইংলণ্ডীয় চিকিৎসকের হস্তগত হইলে তাহার পরিশ্রমে ও বিবেচনায় রক্ষা পায়। আবার 'পল্লীজীবন' কয়েক ধাপ এগিয়ে মন্তব্য করে যে 'এইসব দুরাত্মাদিগকে (লোক চিকিৎসকদের) দণ্ডিত করিতে পেনাল কোর্টে একটি নতুন ধারা যোগ হওয়া উচিত। দুটি কারণে এই দুষ্টদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, প্রথম গ্রাম্য লোকের মূর্খতা ও কুসংস্কার, দ্বিতীয় গ্রামে চিকিৎসার উপায়াভাব। তবে আধুনিককালের প্রখ্যাত গবেষক ডেভিড আর্নল্ডের (David Arnold) রচনায় দেখান হয়েছে যে ইউরোপীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রথমে ইংরেজী জানা লোকজন, পরে বিত্তবান ভারতীয় ও সবেশেষে সমস্ত ভারতীয় লোকজন ও প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থার উপর নিজস্ব প্রাধান্য বিস্তার করে (authority over Indian medicine and Indian bodies)।[৬] একইভাবে পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে W.J. Buchanan মন্তব্য করেছিলেন 'পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি এদেশের লোকজন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়ায় প্রচলিত সনাতনী চিকিৎসায় বিশ্বাস কমে আসছে এবং যেভাবে দ্রুত হাসপাতাল, ডিসপেনসারী ও অন্যান্য চিকিৎসাকেন্দ্র বেড়ে উঠছে তা হল Best proof that western science has taken root firmly in India and will increase। সর্বোপরি গভর্ণর জেনারেল মিন্টোও ১৮১১ সালে এরকমই মন্তব্য করেছিলেন।[৭] সুতরাং ঔপনিবেশিক ভারতে (বাংলায়) এলোপ্যাথি চালু হলে সত্যিই কি এদেশের প্রচলিত চিকিৎসাগুলি বিশেষ করে লোকায়ত চিকিৎসা কি সত্যিই দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল। তার উত্তর পেতে হলে আমাদের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী ঐতিহাসিক উপাদানগুলির সাহায্য নিতে হবে।

আজ পর্যন্ত যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাদান আমাদের হাতে এসেছে, তা দিয়ে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে প্রাচীন যুগে ও মধ্যযুগের বাংলায় লোকায়ত চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন ধরণের রোগ ব্যাধির চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম জনপ্রিয় ও সহজলভ্য পন্থা, আয়ুর্বেদ ও যোগের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বাঙালীরা লোকায়ত চিকিৎসা অনুসরণ করত। কারণ প্রাক বৈদিক যুগের অধিবাসীরা নিমপাতা, শিলাজিৎ, হরিণ-গণ্ডারের শিং ও বিভিন্ন ধরণের সামুদ্রিক মাছকে ভেষজ হিসেবে ব্যবহার করত।[৮] তাছাড়া অতিপ্রাকৃতিক চিকিৎসাও (ঝাড়ফুঁক, জাদুবিদ্যা ও তাবিজ ধারণ) তাদের অজানা ছিল না। বৈদিক যুগের অন্য চিকিৎসা বিষয়ক সাহিত্য 'অথর্ববেদে' এর স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র

মানুষের চিকিৎসাই নয়, পশুপক্ষী, জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ ও গাছপালার চিকিৎসা এই ধারায় সম্পন্ন হত। কারণ বহু ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত 'পালকাপ্য' বা 'হস্ত্যায়ুর্বেদ'কে বাংলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন লোকচিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ বলে মনে করে থাকেন।[৯] এরপর এযুগেরই শেষের দিকে আমরা দেখি গৌড়রাজ শশাঙ্ক গ্রহ শান্তি ও কুষ্ঠ ব্যাধি থেকে নিরাময় লাভের উদ্দেশ্যে সরযূ নদীর পার থেকে শকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের আনিয়ে স্থায়ীভাবে গৌড়ে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।[১০]

মধ্যযুগের চর্যাপদগুলিতে, অলবেরুণী ও মার্কোপোলোর রচনায়, মঙ্গলসাহিত্যে ও অন্যান্য জীবনীমূলক রচনায় বাঙালীদের লোকায়ত চিকিৎসার প্রতি প্রবল আস্থা ও বিশ্বাসের কথা জানা যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে বলে নেওয়া ভাল যে মধ্যযুগের তান্ত্রিকেরা লোকায়ত চিকিৎসার অনেক কিছুই আত্মসাৎ করে নিয়েছিল, ফলে লোকায়ত চিকিৎসা ও তান্ত্রিক চিকিৎসার সমন্বয়ে সৃষ্ট চিকিৎসা অনেকটা ফলপ্রসূ চিকিৎসা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে যে নবাব হুসেন শাহের অসুখের সফল চিকিৎসা করে জনৈক নানক পন্থী সন্ন্যাসী মখসুদাবাদ অঞ্চলটি নেখোরাজ জমি হিসেবে পেয়েছিলেন।[১১] এছাড়া বাংলার ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় যে নবাব মীরজাফরের কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের জন্য তাঁকে কিরীটেশ্বরী মন্দিরের চরণামৃত পান করান হয়েছিল।[১২] আর বাংলার অধিকাংশ মঠ, মন্দির, তীর্থস্থান, দরগা ও মাজার গুলিতে (তারাপীঠ, তারকেশ্বর, বক্রেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর, মসনদীআলা (হিজলী) ঘুঁটিয়ারীশরিফ, বাঁকুড়া ও বীরভূমের মন্দিরগুলি) রোগ ও জরাগ্রস্ত মানুষের নিত্য আনাগোনা করে শুরু হয়েছিল, তা আজও লেগেই আছে। তাছাড়া লোকায়ত চিকিৎসা আজও যে গ্রাম বাংলার অধিকাংশ লোকজন ও শহরের অনেকাংশের চিকিৎসার অন্যতম উপায় তা Rev. P.O. Booding, McAlpin, E.P.Dalton, শরৎচন্দ্র মিত্র, Drug Inquiry Commission এর রিপোর্ট ও অন্যান্য অনেক সরকারী ও বেসরকারী তথ্য থেকে জানা যায়। অর্থাৎ পশ্চিমীপন্থী গবেষক ও পণ্ডিতদের ধারণা অনুযায়ী ইউনানী, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও আকুপাংচার প্রভৃতি বিদেশী চিকিৎসার আমদানী সত্ত্বেও যে এদেশে (ঔপনিবেশিক বাংলায়) লোকায়ত চিকিৎসার চর্চা ও জনপ্রিয়তায় বিশেষ কিছু হেরফের হয়নি। এখন যদি লোকায়ত চিকিৎসার নিরবচ্ছিন্ন জনপ্রিয়তার কারণ বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে মূলত: চারটি কারণে এর জনপ্রিয়তাও চর্চা অটুট আছে—

১। নানা কারণে এসব বিদেশী চিকিৎসার সুযোগ বাংলার সর্বত্র পৌঁছায়নি,

২। যে সমস্ত অঞ্চলে এগুলি পৌঁছেছিল, সে সমস্ত এলাকার লোকজনও দীর্ঘদিনের লোকায়ত চিকিৎসা অনুসরণ করত, কোন কারণে সেগুলি ব্যর্থ হলে অন্যান্য চিকিৎসার সাহায্য নিত।

৩। এক ধরণের পরিবার ছিল যারা নিজ নিজ চিকিৎসা ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন বিদেশী চিকিৎসার সাহায্য নিত না, তবে এদের সংখ্যা খুব একটা বেশী নয়।

৪। যারা বিদেশী চিকিৎসার সাহায্য নিয়ে ব্যর্থ হত, তারাও শেষ অবলম্বন হিসেবে লোকায়ত চিকিৎসার আশ্রয় নিত।

৫। এমন এক শ্রেণীর লোকজন আছে, যারা একই সঙ্গে লোকায়ত চিকিৎসা ও অন্যান্য চিকিৎসার সাহায্য নিয়ে দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে চাইত।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে সদর্থক কিংবা নঞর্থক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই লোকায়ত চিকিৎসা ব্যবস্থার ধারা এদেশে অপরিবর্তিত আছে। এখন যদি আমরা উপরোক্ত কারণগুলি ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহলে সমসাময়িক তথ্য ও উপাদানগুলি প্রথমেই আমাদের জানিয়ে দেবে যে ঔপনিবেশিক বাংলায় পশ্চিমী চিকিৎসার সুযোগ সর্বত্র পৌঁছায়নি।

ক) পশ্চিমী চিকিৎসার সুযোগের অভাবঃ

আগেই বলা হয়েছে যে এদেশে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ ব্যাধি মহামারী প্রতিরোধে কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি ছিল না, এটি ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কিংবা আঞ্চলিক বিষয়। তাছাড়া কোম্পানীর জাহাজে করে যে কজন ডাক্তার কিংবা স্বাস্থ্যকর্মী এদেশে আসত তারা ছিল সংখ্যায় খুব কম। সেজন্য কোম্পানী কর্তৃপক্ষ তার কর্মচারীদের এদেশের কবিরাজ, বৈদ্য, হেকিম ও ওঝাদের পরামর্শ নিয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছিল। তাছাড়া সে সময় এলোপ্যাথিও অতটা আধুনিক হয়ে ওঠেনি এবং এলোপ্যাথি ওষুধের দাম ও উৎপাদন এদেশে আমদানীর পক্ষে অনুকূল ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ডাক্তার, হাসপাতাল ও ওষুধের অভাব। ১৮৩৫ সালে কলকাতায় একটি মেডিক্যাল কলেজ হলেও তা থেকে প্রতিবছর যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন পাশ কবত, তারা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। এ বিষয়ে C. Campbell Brown প্রদত্ত একটি পরিসংখ্যান আমাদের ভীষণভাবে সাহায্য করতে পারে। সেখানে দেখান হয়েছে যে বাংলার চিকিৎসার প্রয়োজনে প্রতিবছর যেখানে ৯০০ জন ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল সেখানে পাশ করত মাত্র ২০ থেকে ৩০ জন।[১৩] গ্রাম বাংলায় চিকিৎসকের অভাব সেকালের একটি বিখ্যাত সাময়িকী মন্তব্যে বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে—সেখানে বলা হয়েছে।

> পল্লীগ্রামে রোগের নিদানের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব আছে। গ্রামে না আছে ডাক্তার না আছে কবিরাজ। ২-১ জন আউলিয়া ফকিরও কালীর চেলা সাধারণ চিকিৎসাভার লইয়া গ্রামে অবতীর্ণ হন, ইহারা আপন আপন উপাস্য দেবতার নিকট ওষুধ লাভ করিয়া তাহারই প্রভাবে রোগীর গায়ে একমুষ্ঠি ধূলি নিক্ষেপ করিয়া জলপড়া, আদাপড়া খাওইয়া অঙ্গ ঝাড়িয়া আরোগ্য করিয়া ওঠায়।[১৪]

একইভাবে উল্লিখিত হয়েছে হাসপাতাল বা ডিসপেনসারীর অভাবের কথা। কারণ গ্রাম বাংলায় হাসপাতাল বা ডিসপেনসারী কোনটারই অস্তিত্ব ছিল না। কারণ সে সময় সরকার শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ ও নেটিব সৈন্য অধ্যুষিত অঞ্চলে ইউরোপীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিল। অন্যান্য ভারতীয় প্রজাদের জন্য তার মাথা ব্যাথা ছিল না। যেকটি ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যেটুকু চিকিৎসার সুযোগ গ্রামে সৃষ্টি হয়েছিল তা শুধু মিশনারীদের অনুগ্রহে। কারণ মিশনারীরা এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দুর্বলতার রাস্তা ধরে সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করতে চেয়েছিল। সেক্ষেত্রে উনিশ শতকের প্রথমদিকে তাদের কিছুটা সুযোগ দিলেও ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর তারা এদেশের মানুষের বিশ্বাসে কোন রকম আঘাত দিতে সাহস পায় নি। সুতরাং এই অভাব ১৮৩৫-এর একশ বছর পরেও

সমানভাবে অনুভূত হয়েছে। কাবণ ১৯৬৬-৬৭র এক রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে,

There is no dispensary nor even a private doctor in the village nor had any mobile dispensary even visited village.[১৪]

এরকারণ উক্ত একশ বছরে অবিভক্ত বাংলায় মাত্র ৫০টি ডিসপেনসারী ও গুটিকয়েক হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলির অধিকাংশই কেবলমাত্র ইউরোপীয়দের জন্যে। এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো তা হল, গ্রামবাংলায় যে গুটিকতক ডিসপেনসারী স্থাপিত হয়েছিল সেগুলি ওষুধের সরবরাহ নিয়মিত ছিল না। প্রথমদিকে সরকার ও স্থানীয় বিত্তবানেরা এর খরচ যোগালেও পবে সরকার তার সাহায্যের হাত সম্পূর্ণভাবে গুটিয়ে নেওয়ায় এই গুরুদায়িত্ব স্থানীয় জমিদারদের উপর সম্পূর্ণভাবে বর্তায়। কিন্তু জমিদারেরা ধীরে ধীরে তাদের সম্পত্তি হারাতে শুরু করলে স্থানীয় পৌরসভাগুলি ষ্ট্যাম্প পেপার বিক্রি করে এই খরচ আদায়ের চেষ্টা করে।[১৫] বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক থেকে আমরা সহজেই এ বিষয়টির তীব্রতা অনুভব করতে পারি কারণ গ্রামের ডাক্তার নিয়মিত ওষুধ পত্রের যোগানের অভাবের দরুন অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিল এই 'স্যাম সো' বরং বন্ধ করে দিলে ভাল হয়।[১৬] তাছাড়া যে উদ্দেশ্যে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাও সফল হয়নি, কারণ সম্ভ্রান্ত বাড়ীর ছেলেরা কখনো শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে চাইত না, যেমন এখনও যেতে চায় না। অবশ্য এদের সম্পূর্ণ দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ও সুযোগ সুবিধা কোন সরকার ঠিকভাবে যোগাতে পারনি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ওষুধের দাম ও ডাক্তারেব ভিজিট, যা ছিল সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে। একটি করে দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি আবো পরিষ্কার হবে, যেমন উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ এক আউন্স কুইনাইনের দাম ছিল ১ টাকা এবং এক পাইন্ট সরসপেরিলার দাম ছিল ১ টাকা। অন্যদিকে একজন শ্রমিকের মাসিক বেতন ছিল ২ টাকা, তাহলে একজন রায়ত যদি ২ আউন্স কুইনাইন কিনতে চায়; তাহলে তাকে পুরো মাসের উপার্জনটাই খরচ করে দিতে হবে, অন্য কিছু কেনা হবে না।[১৮] এতো গেল ওষুধের অগ্নিমূল্যের কথা, কেউ যদি তখন পাশ করা দেশী ডাক্তারকে ডাকতে চায়, তাহলে তাকে ৪ টাকা ভিজিট দিতে হত, আর সাহেব ডাক্তারের প্রতিবারের ভিজিট ছিল ১৬ টাকা। সেজন্য একেবারে বিত্তবান ছাড়া কার সাধ্য পাশ করা ডাক্তার ডাকে। তাই 'দি ক্যালকাটা রিভ্যুউ' একথা সমর্থন করে অনেক কথা লিখেছে।[১৯]

তাই সে দেশের শতকরা ৭০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে, তাদের পক্ষে কিছুতেই এলোপ্যাথির চিকিৎসার সুযোগ নেবার সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। এজন্য ১৯৪৮-এর 'ইন্ডিজেনাস সিষ্টেম অব মেডিসিনের' রিপোর্টে এমন কি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমিটির রিপোর্টেও জানান হয়েছে যে এ দেশের মাত্র ১৫% লোকের কাছে এলোপ্যাথিব সুযোগ পৌঁচেছে বাকী ৭৫% আজও এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

খ) এ দেশের প্রাথমিক চিকিৎসাই ছিল লোকায়ত চিকিৎসাঃ

উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে এলোপ্যাথি চিকিৎসার সুযোগ এদেশের সর্বত্র সমানভাবে পৌঁছায়নি। যে যে অঞ্চলে এই সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছিল, সেখানকার

লোকেরাও নানা কারণে তাদের চিরাচরিত লোকায়ত চিকিৎসাকে বাদ দিতে পারেনি। তার একটি প্রধান কারণ ছিল। হঠাৎ পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে গ্রামবাসীরা ডাক্তার কবিরাজের কাছে না গিয়ে নিজেরাই কিংবা ওঝা বা বৈদ্য ডেকে অসুখটি সারাতে চাইত। এ ব্যাপারে সাধারণ পল্লীবাসীর মধ্যে ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলেও বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত পরিবারেও এর সমর্থনে দৃষ্টান্তের অভাব হবে না। যেমন উনিশ শতকের বাংলার এক অগ্রগণ্য পরিবারের সন্তান আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন যে তাঁর পরিবারের কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে উঠলে গুরুজনেরা প্রথমে ঝাড়ফুঁক দিয়ে অসুখটি সারাতে চেষ্টা করতেন এবং সফলও হতেন। তিনি লিখেছেন,

আর একটি কথা আমার স্মৃতিতে আছে আমি জ্বরে পড়িলে কিংবা অন্য কোন প্রকার পীড়ায় আক্রান্ত হইলে আমার মা সন্ধ্যাকালে আমাকে লইয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসাইয়া দিতেন তৎপরে প্রপিতামহ আমার দেহে হাত বুলাইয়া বাড়িতে আরম্ভ করিতেন এবং সমগ্র দেহে ফুৎকার দিতেন ও মুখে মুখে ইষ্ট দেবতার স্তব আবৃত্তি করিতেন আমার বোধ হয় আশ্চর্যের বিষয় এইরূপ বাড়িয়া দেওয়াতে অনেক সময় আমার জ্বর সারিয়া যাইত।[২১]

এছাড়া উনিশ শতকের বিভিন্ন মেডিক্যাল পত্রিকা থেকে জানা যায় যে বাড়ীর কেউ হঠাৎ পুড়ে গেলে পোড়াঘায়ে থেঁতো আলুর লেই, পাথরকুচি পাতার রস, ডিমের সাদা অংশ, উচ্চ রক্তচাপে সজনে পাতা সেদ্ধর জল, ম্যালেরিয়ায় কচড়া তেল, নাটা গিলের রস, চর্মরোগে নিমতেল, কাটাঘায়ে চুন হলুদ বাটা ও চিনির লেই, প্রভৃতি প্রাথমিক মুষ্টিযোগ হিসেবে প্রযোগ করা হত। এগুলিতে কাজ না হলেই অন্যান্য উপায়ের সাহায্য নেওয়া হত। সীতা দেবীর 'বন্যা' উপন্যাসেও এর সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। সেখানে সুপর্ণা সুদর্শনকে অবাক হয়ে বলেছিল, "ছেলেবেলা পাড়াগাঁয়ে এইভাবে জলপড়া দিয়ে রোগ সারাতে দেখতুম; এখন বুঝতে পারি না কি করে সারত, সত্যই সারত কিন্তু।[২২] এধরণের একটি জল পড়ার মন্ত্র হল,

পানি পানি কাহাঁপানি, এ পানি সুন্দর পানি
এ পানি মন্ত্রা খেলে বিষ মরে নির্বিষ মরে।[২৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ঔপনিবেশিক বাংলার অধিকাংশ লোকজনই ছিল লোকায়ত চিকিৎসার সঙ্গে পরিচিত। মূলত ঐতিহ্যগত কারণে এটি সকলের কাছেই ছিল কম বেশী পরিচিত, তাই তাদের কাছে এটিই ছিল প্রাথমিক অবলম্বন।

গ) লোকায়ত চিকিৎসায় মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাস ঃ-

আবার এক শ্রেণীর লোক ছিল যারা বিভিন্ন রকম রোগ ব্যাধিকে পূর্বজন্মের পাপ কিংবা দুষ্কৃতি, রুষ্ট দেবদেবীর রোষ ও অপদেবতার কুপ্রভাব বলে মনে করত। বিশেষ করে কুষ্ঠ, ক্ষয়কাস, যৌনব্যাধি, কলেরা বসন্ত ও পঙ্গুত্ব এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেজন্য রোগব্যাধিতে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেও তারা অন্য কোন চিকিৎসার কথা ভাবতে পারত না। সেগুলি কাজ না করলে জ্বরের জন্য জ্বরাসুর কিংবা নারায়ণপূজা, ওলাওঠায় ওলাবিবি, বসন্তে শীতলা, সর্পদংশনে মনসাপূজা করার রেওয়াজ ছিল এবং বর্তমানেও আছে। র‍্যালফ নিকোলাস, এ এন মোবার্লে তাঁদের রচনায় দেখিয়েছেন যে কিভাবে গ্রামাঞ্চলে কলেরা বা বসন্ত দেখা দিলে

ওলাবিবি বা শীতলা পূজা শুরু হয়ে যেত।[২৪] যেমন উনিশ শতকের একটি পুঁথিতে দেখা যায়— মহাশয় আমার পৌত্ত শ্রীগুরু প্রসাদ সিং বাবাজী সারিরাক্রমে জ্যোষ্টীমাহার ২ রোজ কাহিল আছেন আজি নাং আরাম ইনপি নাঞ্জী আপুনী দেবানুগ্রহ মনুষ্য আপুনী দেবস্থলে দেবাশ্চনা করিলে আরাম হইতে পারেন আপুনী অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীশ্রী গোপাল স্থলে তুলসী চড়াত্র....ব্রহ্মপুরাণ ও মন্ত্রপাঠ করিয়া নারায়ণ শিলার সচন্দন তুলসী প্রদান করিবেন,[২৫] এছাড়া একটি ব্যবস্থাপত্র হল—

মহাকাল ভৈরবপূজা করিয়া একুশটি মরিচা গঙ্গাজল দিয়া বাটিয়া সেবন করিবেন, সাতদিবস হবিস্বি এবং ঔষধ ধারণ করিবেন আর তেল মাখিবেন না মিষ্টাদি খাইবেন না, আর নেশা মাত্রেক করিবেন না, প্রতি অমাবস্যায় পূজা করিবেন আর খাবার দ্রব্যাদি গরম করিয়া খাইবেন...দধি খাইবেন না।[২৬]

দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র তাঁর "আত্মচরিতে" একথা উল্লেখ করে গেছেন।[২৭] তবে আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রদত্ত তথ্যটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি জানিয়েছেন যে বীরভূমের একটি গ্রামে জনৈক দেবাংশী একটি মন্দিরে দৈবওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করত। দিনের পর দিন তার চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রসার দেখে ঐ মন্দিরেরই পুরোহিতও চিকিৎসা করতে শুরু করে। ফলে দেবাংশী বাধা দেয়। সেজন্যে পুরোহিত বনাম দেবাংশী বিবাদ চরমে ওঠে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি হাইকোর্টে যায় এবং আদালতের রায়ে দুজনই চিকিৎসা করার অধিকার পায়।[২৮] এজন্য এম এম ভট্টাচার্য ও এস. কে. সেনগুপ্ত তাদের গবেষণাপত্রে স্বীকার করেছেন; "Even then there are certain areas....They mainly rely on the ojhas, gunins and their local medicine men."[২৯]

ঘ) লোকায়ত চিকিৎসা হল শেষ অবলম্বন :-

আবার এরকম বহু বহু দৃষ্টান্ত আছে যে লোকে প্রথমে বিভিন্ন রকম উপায়ে রোগ সারাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে চিবাচরিত লোকায়ত চিকিৎসার সাহায্য নিত। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হত। ফলে যে কোন ভাবেই হোক লোকায়ত চিকিৎসার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ আছে। কারণ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের জীবনীতে লিখেছেন ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় একবার মারাত্মক রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হন। কলকাতায় বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা করিয়ে ব্যর্থ হলে তিনি দেশে চলে যান। শেষ পর্যন্ত "একজন ব্রাহ্মণ সেদ্ধ ওল ঘোলের সহিত মিশাইয়া কয়েকদিন খাওয়াইয়া সেই কঠিন পীড়া হইতে মুক্ত করেন।"[৩০] একইভাবে "যোগবল" নামক একটি পত্রিকা থেকে জানা যায় যে জনৈক গদাইমালী একটি গাছের তলায় পড়ে থাকা আম খেয়ে ভীষণভাবে অসুস্থ (সংজ্ঞাহীন) হয়ে পড়ে। ডাক্তার ও কবিরাজ সকলে ব্যর্থ হলে বিশেষ জনৈক বিষবৈদ্য তাকে তুলসী পাতার রস খাইয়ে এবং সারাশরীরে ক্রমাগত মাখিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলে।[৩১] এ ব্যাপারে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কারণ উনিশ শতক থেকে বিভিন্ন পঞ্জিকা ও সাময়িক পত্রগুলিতে গ্রহরত্ন ধাতু ও ভেষজ আংটী ও কবচ হিসেবে ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন উপায়ে ব্যর্থ হবাব পরই জ্যোতিষী চিকিৎসার সাহায্য নিত। এছাড়া গ্রহশান্তির জন্য গ্রহ স্নান, গ্রহার্চনা, দান ধ্যান ও দক্ষিণার রেওয়াজ আজও আছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে বনফুলের একটি গল্পের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যেখানে দেখান হয়েছে যে কিভাবে পল্টুকে সারিয়ে তোলার জন্য প্রথমে কবিরাজ পরে এলোপ্যাথ এবং জ্যোতিষ এবং সবশেষে তারকেশ্বর গিয়ে বাবার চরণামৃত খাইয়ে সুস্থ করতে চাওয়া হয়েছে।[৩২] এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, কোন রকম অন্ধ বিশ্বাস বা সংস্কারের বশবর্তী না হয়েই মানুষ হাতের কাছে যা পেয়েছে, তা দিয়ে রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে কিন্তু তাতে সফল না হলে অদৃশ্য শক্তির কাছে আত্মসমর্পন করেছে। আর যেহেতু লোকায়ত চিকিৎসা তাদের অলৌকিক উপায়ে দ্রুত সেরে ওঠার বাসনার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, সেজন্য লোকায়ত চিকিৎসা হল তাদের শেষ অবলম্বন। এ প্রবণতা অশিক্ষিতদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকটিত হলেও শিক্ষিতরা এখনো কোনভাবেই এ দুর্বলতার উর্দ্ধে উঠতে পারেনি।

ঙ) লোকায়ত চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিঃ-

এবার যদি লোকায়ত চিকিৎসার ওষধি গুণ বিচার করে দেখা যায় অর্থাৎ পশ্চিমীপন্থীদের দাবী অনুযায়ী এটি নিছক অসার ভেল্কিবাজী না এর কোন সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে ? এই প্রশ্নের উপর আলোকপাত করা যায়, তবে প্রথমেই বলতে হয় পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই আঞ্চলিক সভ্যতা, সংস্কৃতি ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এক এক ধরণের লোকায়ত চিকিৎসা গড়ে উঠেছে। যা তাদের একান্ত নিজস্ব। ১৯৬৪-র Drug Inquiry commission তার রিপোর্টে জানিয়েছে; "Even in European countries and in the United States of America medicine mean practise magic cure and fabulous sums are earned by them"[৩৩]

ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায় Paul এর মন্তব্যে। সেখানে বলা হয়েছে যে আধুনিক শিল্পবিপ্লব (industrialised world) কিংবা জনস্বাস্থ্য চেতনা (concept of disease and hygiene) লোকায়ত চিকিৎসার মূলতত্ত্বে বিশেষ কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। তার কারণও আছে, লোক চিকিৎসার অলৌকিক পন্থাটি মানুষের অতিপ্রাকৃতিক উপায়ে দ্রুত সেরে ওঠার বাসনার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এর জড়িবুটী যেমন মানুষের শরীরে গিয়ে বিক্রিয়া ঘটায়, তেমনি মন্ত্রতন্ত্র তাবিজ ও কবচ রোগীর মনের জোর বাড়িয়ে দিয়ে রোগযন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা সঞ্চার করে। এজন্য অনেক সময় এগুলিকে অদৃশ্য ঔষধ (invisible drug) বলে। যা এখনকার দিনের মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা করে থাকেন।

এতো গেল অতিপ্রাকৃতিক উপায়ের উপযোগিতার প্রসঙ্গ। এখন ওঝা কিংবা বৈদ্য প্রদত্ত ওষুধপত্রগুলি কিংবা মাদুলী ও কবচ মানুষের শরীরে, রোগ বীজাণুর সঙ্গে সত্যি সত্যিই লড়াই করতে পারে কিনা সে বিষয়ে আজ আর কোন সংশয় নেই। কারণ বর্তমানের ওষুধ বিদ্যার ও নৃতাত্ত্বিক গবেষকরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে জড়িবুটীর মধ্যে যথেষ্ট রোগ নিবারক গুণ আছে, যার প্রভাবে লোকে সুস্থ হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে সরকার কিংবা গবেষকেরা এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী ছিল না বলে এগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত না। অতি সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক S. K. Chand মন্তব্য করেছেন যে, It is established that the tribal medicine men had fairly good understanding of the main characteristics of particular disease including T.B. and Cancer[৩৪] আর এই সমস্ত ওষুধ (ভেষজ,

জান্তব ও খনিজ) যে যথেষ্ট ওষধিগুণ সম্পন্ন তা এগুলির ব্যবহারকারীরা বিশেষভাবেই জানে। সে কারণেই যুগযুগ ধরে এদেশের আদিবাসী সমাজ তাদের নিজস্ব চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল। তাই গেডেম হাঁসদা নামে জনৈক সাঁওতাল চিকিৎসক বলেছিলেন, 'জঙ্গলে বোডা ঠাকুর যে কত ওষুধ ছড়িয়ে রেখেছে তা কে বলতে পারবেক।[৩৫] আর লোকায়ত চিকিৎসার ওষুধপত্রগুলি যে আদা, রসুন, পিপুল, নিমপাতা, সজনেপাতা, তুলসীপাতা, ধুতরা মোথা, সর্পগন্ধা, মধু ও গোলমরিচ যে সেই প্রাচীনকাল থেকে নানাবিধ রোগ নিবারণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তা আজ কারোরই অজানা নেই। বিশেষ করে ১৮৭২ সালে The Calcuta Review-র নিম্নলিখিত মন্তব্যে বিষয়টি বিশেষভাবে সমর্থন করা হয়েছে, The low people know indigenous herbs and plants are efficacious in many of the diseases to which they are heir to[৩৬]

আর বিভিন্ন ধরণের রোগব্যাধির প্রতিরোধ ও প্রতিকারে মাদুলী কবচ কিংবা আংটী ধারণ একেবারে অবৈজ্ঞানিক নয়, সেকথা বাংলার কারিগরী বিদ্যার অন্যতম পার্থক্য সীতানাথ ঘোষ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে এগুলি কেবলমাত্র মানুষের শরীরে শ্রীবৃদ্ধি করে না এগুলির ব্যবহারে মানুষের শরীরে যে তড়িৎ চৌম্বকীয় আবেগ সৃষ্টি হয়, তা মানুষের বিভিন্ন ধরণের ব্যাধি বিশেষ করে স্নায়বিক ব্যাধি উপশমে সাহায্য করে তা তিনি নিজের তৈরী ম্যাগনেটিক হিলারের মাধ্যামে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এজন্য তা তিনি জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন।

এ দেশের সকলেই অবগত আছেন যে রোগ আরোগ্য করিবার নিমিত্ত যে সকল মাদুলী কবচ ব্যবহৃত হয় তাহা প্রায় স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল বা কাংসা দ্বারা নির্মিত হয় আবার শরীরে যে যে স্থানে রোগ যেখানেই পরিহিত হয়.....শরীর ও ধাতু সে পারস্পরিক যোগ বিয়োগ করে তা সে মাদুলী কিংবা ধাতু ক্ষয়িত বা কলঙ্কিত হইয়া থাকে তাহাই ইহার এক স্পষ্ট প্রমাণ।[৩৭]

সেজন্য এখনো এমন বহু মানুষ দেখা যায়। যারা মুখে এগুলির উপযোগিতা স্বীকার না করলেও ব্যক্তিগত জীবনে এগুলি মেনে চলে কিংবা ধারণ করে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এও লক্ষ্য করা গেছে এলোপ্যাথি ডাক্তর কবিরাজ কিংবা হেকিম রোগীদের ওষুধ দিলেও রোগীরা তাদেব ওযুধেব সাথে সাথে ঝাড়ফুঁক করে দেবার অনুরোধ জানিয়েছে। যেখানে ডাক্তার কিংবা কবিরাজ নিতান্ত অসহায় বোধ করে। আসলে ব্যাপারটি লোক চিকিৎসারই বিশেষ জনপ্রিয়তার প্রমাণ বহন করে।[৩৮]

সবশেষে অবশ্যই বলতে হয় যে যে লোকায়ত চিকিৎসা এদেশেরই বিজ্ঞান, এ দেশেরই গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফসল। একই সঙ্গে সুস্থ করে তোলার উপায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করে বলেই মানুষের চেতন ও অবচেতন মনে এর প্রভাব সমানভাবে লক্ষ্যণীয়। পশ্চিমীপন্থী গবেষকেরা যদি শহর ছেড়ে গ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে যে বিষয়টি পরিষ্কার হবে তাহল পশ্চিমী চিকিৎসা আজও তাদের অধরা রয়েই গেছে সুতরাং গ্রাম বাংলায় লোকায়ত চিকিৎসার ধারাবাহিকতা কোনভাবেই বিঘ্নিত হয়নি। আবার নগর কিংবা শহরে যেখানে এগুলি পৌঁছেছে সেখানেও যে চিত্র লক্ষ্য করা যায় তাহল বিভিন্ন উপায়ে ব্যর্থ হলে

তারা বৈদ্য কিংবা ওঝার শরণাপন্ন হয়। এভাবে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ উভয় কারণেই আজও লোকায়ত চিকিৎসা সমানভাবে জনপ্রিয়। কোনভাবেই এর বিশ্বাসের ভিত্তিটি টলে যায়নি। আর বর্তমানের পণ্ডিতেরা যতই এ বিষয়ে আগ্রহী হচ্ছেন ততই লোকায়ত চিকিৎসা সাধারণ ও বিশেষ উভয়েরই সমীহ আদায় করে চলেছে।

সূত্র নির্দেশ

১। D.C. Jarvis : Folk Medicine, London, 1960, p-11, F.L. Dunn in Asian Medical Systems edited by C. Lestic, London, 1977

২। Medical Dictionary (3rd edition), New York, 1960, p-305

৩। C.C. Hughes : International Encyclopedia of Social Science, Vol-10, U.S.a., 1968, pp 87-88

৪। O.P. Jaggi : Folk Medicine, Vol-3, Delhi, 1973, pp 37, 38

৫। Report on the state of education in Bengal, 1835-38, Calcutta University edition 1941, edited by Anandanath Basu, pp 197-98.

৬। David Arnold : Colonizing the Body, Delhi, 1993, pp 11-12.

৭। ঊনবিংশ শতাব্দীর সভাসমিতি ও বাংলা সাহিত্য সম্পাদক অরুণ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ-১৫১,ঘ.গ. Buchanan Calcutta Review, No. ২৭৫-৭৮, ১৯১৪

৮। Vedic Age, Bharatiya Bidyabhawan Series, Bombay, ১৯৮৮, -১৮১.

৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: প্রাচীন বাংলার গৌরব, কলকাতা, ১৩৫৩, পৃ-৪, ৮

১০। বসন্ত কুমার সেনগুপ্ত: বৈদ্য জাতির ইতিহাস, কলকাতা, ১৩২০, পৃ-৫৩; রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৮৯, পৃ-১৩৯-৪০

১১। প্রতিভারঞ্জন মৈত্র: মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৯, পৃ-২-৩

১২। অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ-২১১-১২

১৩। J. B. Campbell Brown, Report on the charitable dispensaries under the Government of Bengal for the year 1870, Calcutta 1871 Vide Appex.

১৪। 'ঊনিশশতকে বাংলাদেশে সাময়িকপত্র' সম্পাদক মুনতাসীরমামুন, বাংলা একাদেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ-২১১-১২

১৫। Report of the commission for scheduled caste and scheduled tribes, 1966-67 vol.-I & 11, bind in one, p-49.

১৬। Proceedings (Municipal) Decemer, 1904, No. ৪২

১৭। বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন' (নাটক), কলকাতা, ১৯৪৪, পৃ-১০৪

১৮। The Friend of India, 7th September, 1854

১৯। Calcutta Review, March 1858, p-30

২০। Report of the Committee on Indigenous System of Medicine, Vol.-2, 1948, p-7; Second Five Year Plan, 1956, p-25.

২১। শিবনাথ শাস্ত্রী; আত্মচরিত, পৃ-৪৮

২২। সীতাদেবী, বন্যা, কলকাতা, পৃ-৯৮

২৩। S. Sengupta, Folk lore and Folk life in India, Calcutta, 1975, p-155

২৪। Ralph Nicholas : The Goddess Sitala and Epidemic Smallpox in Bengal, in Journal of Asian Studies, Vol.-XLI, No.-I, November, 1981, pp-21-44, A.N. Moberleya

২৫। 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' সম্পাদক শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল, ১৩৫৯, শান্তিনিকেতন, দ্রষ্টব্য ব্যাধিত উৎপাত, পৃ-৭৭, ১৬৮, ৬৯

২৬। তদেব

২৭। আত্মচরিত, দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র, পৃ-১৭-১৯

২৮। Census of Bengal, Calcutta, 1951, 1953 see Dharma Worship in West Bengal by Ashutosh Bhattacharyya, p-353

২৯। M.M. Bhattacharyya S. K. Sengaupta, The Concept of diseases and its treatment in 'Tribal Health' edited by Buddhadeb Chowdhury, New Delhi, 1986, p-201

৩০। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর' আখ্যানপত্রহীন, পৃ-৫১

৩১। যোগবল, ২য় বর্ষ, ১-৮ সংখ্যা, ১৩২৩-২৪, পৃ-১৩৮-৩৯

৩২। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়: বনফুলের গল্প সংগ্রহ, কলকাতা, ১৮৮৪, পৃ-৮৫-৮৬

৩৩। Report of the Drug inquiry commission, Government of West Bengal, Calcutta, 1964, p-20.

৩৪। S.K. Chand, Present Status and Future prospect of traidtional Health Care System of tribal people, lecture delivered in XII-International Seminar, B.I.T.M., Calcutta, 1993.

৩৫। ওভারল্যাণ্ড, দ্র: লোকায়ত চিকিৎসা ও আদিবাসী সমাজ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ-৯

৩৬। The Calcutta Review, Vo.-2o1 (VIII), No.-1-3, Jan-March, p-73x

৩৭। তত্ত্ববোধিনী, ২ ভাগ, ৮ম গল্প, ১৯৯৪ শক, সংখ্যা ৩৫১, পৃ:-১৬৬, দ্র: আর্যঋষিদের তড়িৎ বিষয়ক জ্ঞান ও বিবিধ কার্যে তার প্রয়োগ।

৩৮। সাক্ষাৎকার: দেবপ্রসাদ ঘোষাল, সন্দেশখালি, ২৪ পরগণা (উ:) ১৮, ৫, ১৯৯৩।

ঔপনিবেশিক যুগের বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রভাবঃ দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩০-৪৭)

সুস্নাত দাশ

একশো পঞ্চাশ বছর পূর্বে ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত একটি মাত্র তেইশ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্রাকার পুস্তিকা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা মানবসভ্যতা ও সমাজকে নতুন পথে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল—পুস্তিকাটি 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' বা সংক্ষেপে 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো'। দুই তরুণ বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস্ রচিত এই 'ঘোষণাপত্র' ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি। 'ম্যানিফেষ্টোর' প্রকাশ তাই মার্কসবাদী দর্শনের প্রত্যক্ষ আর্বিভাবের সমতুল্য ঘটনা রূপেই বিবেচিত হওয়া উচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই বাঙালি অগ্রসরমান বুদ্ধিজীবী ও বিদ্বৎসমাজের চিন্তা-চেতনায় 'সাম্যবাদের' উদার ও মুক্ত বাতাস ধীর গতিতে প্রবাহিত হতে থাকে। জানা যায় ১৮৭০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের পলিটিক্যাল ইকনমি বিষয়ের সাম্মানিক পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয়ঃ "হোয়াট ইজ দি এইম্ অব কমিউনিজম ? ডেসক্রাইব দি স্কীমস্ প্রোফাউন্ডেড বাই ফ্যুরিয়ার এ্যান্ড সেন্ট সাইমন রেস্পেকটিভ্‌লি ?"[১] সন্দেহ নেই এখানে যে 'কমিউনিজম্' বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল তা মার্কসীয় মতবাদ থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু এটা লক্ষ্য করবার মতো যে বিশেষ একটি পরীক্ষার পাঠ্যসূচীর মধ্য দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাব্রতী ছাত্রদের মননে পাশ্চাত্য সাম্যচিন্তার উন্মেষ ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বাঙালি বিদ্বৎসমাজের মধ্যে সমভোগী সমাজ ব্যবস্থা বা একধরণের ইউটোপীয় সাম্যবাদের প্রাথমিক পরিচয় ঘটেছিল মার্কসবাদের মধ্য দিয়ে নয়-জাঁ জ্যাক রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্ব, বেন্থাম-মিলের হিতবাদী তত্ত্বর, বেকন-লক-হিউম-পেইনের যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ; অগাস্ট কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদ বা পজিটিভিজম্ এবং লুই ব্লাঙ্ক, সাঁ সিমো, রবার্ট ওয়েন ও চার্লস ফ্যুরিয়ের-এর ইউটোপীয় বা কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক ধারণার মধ্য দিয়ে। 'শ্রেণী সংগ্রাম্', 'প্রোলেতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র'; 'ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' প্রভৃতি মার্কসবাদী মৌলিক মতাদর্শ তখনও বাঙালি বুদ্ধিজীবী মানসে অনুপ্রবিষ্ট হয়নি।

ইতিমধ্যে অন্যত্র[২] আমি 'বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রভাবঃ প্রথম পর্যায়' নামক গবেষণা নিবন্ধে দেখিয়েছি কিভাবে ১৮৭০ এর দশক থেকে শুরু করে ১৯৩০-এর দশকের সূচনা পর্যন্ত বাঙালী মনীষায় সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যচিন্তা ও মার্কসবাদী চেতনা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৮৭৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র একটি সংখ্যায় পূর্ববঙ্গের পাগলপন্থী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা টিপুর সাম্যাদর্শী মতবাদ প্রচারের উল্লেখ করে দেখা যায় তাকে ফরাসী সমাজতান্ত্রিক নেতা লুই ব্লাঙ্কের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে।[৩]

যদিও বাঙলা তথা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কার্ল মার্কসের জীবনী প্রকাশিত হয় 'মর্ডান রিভিউ'-তে বিপ্লবী হরদয়াল লিখিত 'কার্ল মার্কসঃ একজন আধুনিক ঋষি' ইংরাজী নামে -মার্চ, ১৯১২ সালে। কিন্তু তার বহু পূর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাঙলার চিন্তা জগতের সবটাই যে মার্কসবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাবের বাইরে ছিল এমন মনে হয় না। লন্ডনে ১৮৫০ সালের ৯ নভেম্বর হার্নে সম্পাদিত চার্টিস্ট আন্দোলনের মুখপত্র 'রেড রিপাবলিকান'-এ শ্রীমতি হেলেন ম্যাকফারলেনের ইংরাজি অনুবাদে 'ম্যানিফেষ্টো' পুর্নমুদ্রিত হলে তা ধীরে ধীরে ব্রিটিশ কলোনিগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রসঙ্গতঃ এখানেই সর্ব-প্রথম লেখক রূপে মার্কস-এঙ্গেলস্-এব নাম মুদ্রিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় ঐতিহাসিক কারণেই মার্কসের মতবাদ ও ১৮৬৪-তে প্রতিষ্ঠিত 'শ্রমিক আর্ন্তজাতিক' সম্পর্কিত সংবাদ পৌঁছাতে শুরু করে। এই 'শ্রমিক আর্ন্তজাতিকের' সদস্য হবার জন্য সে সময় কলকাতা থেকেও একটি আবেদনপত্র এই আর্ন্তজাতিকের সদর দপ্তরে পৌঁছায়। কারা এটা পাঠিয়েছিল সঠিকভাবে জানা না গেলেও অনুমান করা হয় এতে তৎকালীন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও 'শ্রমজীবী সমিতি' (১৮৭০)-র প্রতিষ্ঠাতা শশীপদ ব্যানার্জীর উদ্যোগ এতে ছিল। ১৮৭২ সালে শশীপদবাবু 'ভারত শ্রমজীবী' নামে এক পয়সা মূল্যের একটি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এতে শ্রমজীবী শ্রেণীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কবিতা-নিবন্ধাদি প্রকাশিত হত। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখরা এতে লিখতেন।[৪]

ঔপনিবেশিক যুগের বাংলা সাহিত্যে মার্কসীয় ও সমাজবাদী চিন্তার সূত্রপাত তখন থেকেই। এরপর বঙ্কিমচন্দ্রর 'সাম্য' (১৮৭৯) নিবন্ধ বা 'বঙ্গদেশের কৃষক' থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' (১৯২৪) 'কালের যাত্রা' (১৯২২) নাটক এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'পথের দাবি' (১৯২২-১৯২৬) উপন্যাসে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মূল ধারায় ধীরে ধীরে মার্কসীয় মতাদর্শের প্রভাব স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। এই পর্বেই কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্প-কবিতা উপন্যাস গান ও সংবাদ প্রতিবেদন সহ অন্যান্য রচনায় মার্কসবাদের প্রভাব ও অনুপ্রেরণা ছিল প্রশ্নাতীত। এক্ষেত্রে নজরুলের উপর ভারতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ মুজফ্ফর আহমদের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। এইভাবে বিংশশতাব্দীর বিশের দশকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ে মার্কসীয় চেতনার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘটেছিল এবং ঘটেই চলেছিল।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলের সময়কাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদের যে ক্ষীণ প্রভাব সবেমাত্র দেখা দিতে শুরু করেছিল পরবর্তীকালে বিশের দশকের শেষ ও ত্রিশের দশকের সূচনা থেকে এই ধারা ক্রমশ: বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই নতুন যুগের সাহিত্য স্রষ্টাদেরই অন্যতম। ১৯২৩ সালে 'সংহতি' পত্রিকায় তাঁর 'বাঙ্গালী ভাইবোন' উপন্যাসের

(পরে যা 'মাটির ঘর' নামে গ্রন্থকারে প্রকাশিত) প্রথম পঙ্‌ক্তিই ছিলঃ 'লোহার কারখানার বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউস হইতে প্রথম সিটি বাজিতে শুরু হইল।' সাম্যবাদে বিশ্বাসী রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসের ('মাদার' উপন্যাসটি ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে 'লাঙ্গল' পত্রিকায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা শুরু করেন) প্রথম পঙ্‌ক্তিটির আশ্চর্য মিল একেবারেই কাকতালীয় ছিল না।[৫] বাংলা সাহিত্যে শ্রমিক শ্রেণীর আবাহনে শৈলজানন্দের ভূমিকা এই কারণেই স্মরণীয়। তাঁর অবিস্মরণীয় 'কয়লা কুঠির' গল্পগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শৈলজানন্দর 'দিনমজুর' গল্প সংকলনের 'জননী' এবং 'অতসী' গল্পসংকলনের 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' নিঃসন্দেহে গোর্কির রচনা মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া উল্লেখযোগ্য প্রেমেন্দ্রে মিত্র-ব রচনাবলী। বিশের দশকে প্রকাশিত তাঁর 'পাঁক' উপন্যাস এবং 'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকারী। আর ছিলেন নারাণ ভট্টাচার্য (সংহতি পত্রিকায় তাঁর 'দিনমজুর' গল্প স্মরণীয়); সর্বহারা ভিখারিদের নিয়ে 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে মনীশ ঘটকের গল্পগুলি (কল্লোল পত্রিকায় 'মন্থশেষ', 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী') স্মরণীয়। বস্তুত 'মজুর-সাহিত্য' সৃষ্টিতে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত পরিচালিত 'কল্লোল' পত্রিকায় ভূমিকা কম ছিল না। কারণ সমকালীন সমাজে বাস্তবতাবাদী লেখকরা তখন স্কুলে ওই সাময়িকপত্র ঘিরেই (যেমন-নজরুল, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, শৈলজানন্দ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মণীশ ঘটক প্রমুখ) জড়ো হয়েছিলেন। 'কল্লোলই' সেদিন বাংলা সাহিত্য জগতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আধুনিক লেখকবৃন্দকে যেমন- রল্যাঁ, হামসুন, বোয়ার, রেমন্ট, নোগুচি, ইবানেজ, পিরান দেল্লো প্রমুখকে আহবান জানিয়েছিলেন। রুশ মার্কসবাদী লেখক গোর্কির আবাহনও ঘটেছিল কিছুদিনেব মধ্যেই। ফলে মনীন্দ্রলাল বসু রচিত 'কিরণের কথা' গল্পের নায়কের এই উক্তি সেদিন বিসদৃশ ঠেকে না "শিল্প কি শুধু রঙ নিয়ে খেলা, সুন্দরীর মুখ আঁকা ? কুলীদের বস্তির কদর্যতা, চাষীমজুরের কর্মজীবন, পতিতার বেদনাকে আমি মূর্ত করতে চাই।" সেসময় 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় শিবরাম চক্রবর্তীর 'আজ ও আগামীকাল'-এর প্রবন্ধগুলি (শিবরামের সেই সময় রচিত 'যখন তারা কথা বলবে' একাঙ্ক নাটক সে যুগে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল); জগদীশ গুপ্ত ও হেমন্তকুমার সরকারের গল্প সমূহ (মাছমারা, ভিখারী, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি) এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কল্লোলে প্রকাশিত 'বেদে' উপন্যাস ও তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে মার্কসীয় সমাজ বাস্তবতার (Socialist realism) ছোঁয়াচ লেগেছিল।

তবে ছোঁয়াচটুকুই লেগেছিল তার বেশি কিছু নয়। পরবর্তীকালের মার্কসবাদী সাহিত্য-সমালোচকদের মতে, "রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে 'কল্লোল' এবং 'শনিবারের চিঠি' র যে তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠী সাহিত্যের হাটে এ-সময় প্রচন্ড হট্টগোল শুরু করেন তাঁরাও কিন্তু মার্কসীয় চিন্তা-চৈতন্যের অনুগামী ছিলেন না।"[৬] 'কল্লোল যুগ'-এর অন্যতম নায়ক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর ভাষায় তাঁরা ছিলেন, "উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত কবার আলোড়ন"-এর অংশীদার এবং 'ভাবনৈতিক সন্ত্রাসবাদী'।" প্রগতি সাহিত্যও সংস্কৃতি

আন্দোলনের পুরোধা গোপাল হালদার লিখেছিলেন, "কল্লোল-যুগ অচিন্ত্যবাবুর রম্য রচনার রটনা-ইতিহাসের ঘটনা নয়।"[৭] তা সত্ত্বেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এই 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'সংহতি'; 'লাঙ্গল'; 'গণবাণী'; 'বিজলী'; 'আত্মশক্তি'; 'নবশক্তি'; 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাগুলির সঙ্গে যুক্ত বাঙালী সাহিত্যিকরা সেসময় রুশ বিপ্লব ও গোর্কির সাহিত্যকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন এবং সব থেকে বড় বিষয় সমাজের অবহেলিত বঞ্চিত নীচু তলার মানুষের জীবনযন্ত্রণা বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে এগিয়ে এসেছেন।

উনিশশো ত্রিশের দশকের সূচনাতে বাংলা সাহিত্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য সংযোজন ছিল রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশ (১৯৩০)। ইতিমধ্যে ১৯২৮ সালে 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'রুশিয়ার রক্তবিপ্লব' প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাঙালী পাঠক সমাজ এই প্রথম তাদের প্রিয়তম সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের রচনায় রুশিয়ায় মার্কসবাদী দর্শনের ফলিত প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে অবহিত হলেন। ১৯৩১ সাল থেকে প্রকাশিত হতে থাকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম মার্কসীয় বিশ্বদীক্ষায় বিশ্বাসী কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর সাহিত্য-সৃজন ও সমালোচনার সূত্রপাত ঘটে প্রথাগত ধারায়। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ নিজে মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাছাড়া পরিচয়ের লেখক মন্ডলী সকলেই যে চিন্তার জগতে একই দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন তা নয়-বরঞ্চ বৈপরীত্য ছিল যথেষ্টই তথাপি এঁদের মধ্যে যেমন-নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুশোভন সরকার, হিরণকুমার সান্যাল, গিরিশপতি ভট্টাচার্য, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা সেই তিরিশের দশকেই 'পরিচয় গোষ্ঠী' রূপে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচার বিশ্লেষণে যথেষ্ট সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

এরপর ১৯৩৬ সালের ১৮ জুন সোভিয়েত রাশিয়ায় ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যুর স্মরণানুষ্ঠানে কলকাতার অ্যালবার্ট হলের কমিটিরুমে সদ্যগঠিত বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘর (প্রতিষ্ঠা-১৯৩৫) উদ্যোগে আহবায়কদের মধ্যে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, সত্যেন্দ্রনাথ মুজমদার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং খগেন্দ্রনাথ সেনদের মতো মার্কসবাদে আস্থাশীল সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ।[৮] ১৬ আগস্ট সংঘর উদ্যোগেই বৃহৎ আকার আশুতোষ কলেজ হলে গোর্কির স্মরণ সভায় যোগদান করেন বাঙলার বহু শিল্পী সাহিত্যিক লেখকগণ। রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের শোকবাণী পাঠ করা হয়। এছাড়া নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘর সম্পাদক সাজ্জাদ জহীরের উদ্যোগে সারা ভারত ব্যাপী 'গোর্কি দিবস' উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা হয়। প্রকাশিত হয় নানা পত্র-পত্রিকার গোর্কি সংস্থা। সোভিয়েত রাশিয়ার একজন প্রয়াত মার্কসবাদী লেখকের বাঙলা তথা ভারতবর্ষের লেখকদের এই ধরণের সচেতনতা ও আগ্রহ প্রমাণ করেছিল বাঙলা সাহিত্যে মার্কসবাদের রক্তাভা ক্রমশই লাগতে শুরু করেছে।

১৯৩৩ এ গুপ্ত ফ্রেন্ডস্ প্রকাশনী প্রকাশ করলো নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত বাংলাভাষায় প্রকাশিত গোর্কির প্রথম উপন্যাস-মা- যা ইতোমধ্যে 'লাঙ্গল' ও 'আত্মশক্তি'তে

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (যিনি এবং ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বাঙলায় প্রধান পথিকৃৎ) লিখেছিলেন উপন্যাস 'অন্তঃশীল' এবং 'আবর্ত'। ১৯৩৭-৩৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত হল মনোরঞ্জন হাজরার কৃষক সংগ্রামকে ভিত্তি করে রচিত 'নোঙরহীন নৌকা।' বাংলা সাহিত্যে কমিউনিষ্ট চরিত্রের সাক্ষাৎ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ধূর্জটিবাবুর উপন্যাসেই।

ইতিমধ্যেই আর্ন্তজাতিক ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে (১৯৩৬-এ স্পেনের রণক্ষেত্রে) শহীদ হয়েছেন ও হচ্ছেন বিখ্যাত-তরুণ লেখক ও কবিরা। ক্রীস্টোফার বাডওয়েল, জন কনফোর্থ, র‍্যালফ ফ্রাক্স, ফেদোরিকো গ্যার্সিয়া লোরকার মত বুদ্ধিজীবীদের নতুনকালের সাহিত্যে রচনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে পুরোদমে।

এই সময়কালের প্রেক্ষাপটে শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীর মানস-সংস্কৃতির ফসল ধারণ করে আছে প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত দুটি সংকলন গ্রন্থ। ইংরাজিটির নাম 'Towards progressive Literature' এবং বাংলাটির নাম ছিল 'প্রগতি'। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের এই দুটি প্রথম প্রচেষ্টায় যোগদান করে ছিলেন বাংলা সাহিত্যে ও সাংবাদিকতা জগতের প্রধান পুরুষরা। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী সম্পাদিত 'প্রগতি' সংকলনটির ভূমিকা লেখেন ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। যাঁদের রচনায় তা সমৃদ্ধ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ কুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সমর সেন প্রভৃতি।[৯] যোগাযোগ করা যায়নি বলে তারাশংকর ও শৈলজানন্দর রচনা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিতে বাদ পড়েছিল।

এঁরা সকলেই মার্কসবাদী ছিলেন না মার্কসবাদ সম্মতভাবে সাহিত্য রচনার ছাপ এদের লেখায় ছিল সুস্পষ্ট। আবার সে সময় বাংলা সাহিত্যে এই মার্কসবাদী প্রগতি লেখকদের বিরোধিতা করার মতো বিপরীত প্রতিভার কিছু অভাব হয়নি। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক-কবি ও তৎকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার ১৯৩৮ সালে 'বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক' প্রবন্ধে অস্ত্রধারণ করলেন নতুন চিন্তাকে নাকচ করার জন্যে। বললেন, "সকলকে বাতিল করিয়া দিয়া 'প্রগতি' নামে একটি অনার্য শব্দকে বিশাল বংশদন্ডে বাঁধিয়া, ভদ্রবেশী বর্বরগণের অগ্রণী হইয়া আধুনিক নগর-চত্বরের পণ্যবীথি প্রকম্পিত করিতে হইবে।...আজ যুগধর্মের সুযোগ-মানবসভ্যতার এই অতিশয় সংকটময় দুর্দিনে-ইহারা, এই রস-অধিকার-বঞ্চিত হরিজনেরা, জাতে উঠিবার জন্য বিষম কোলাহল শুরু করিয়াছে।"[১০] কিন্তু এজাতীয় বিদ্রুপবাণ সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যকে মার্কসবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা বা রক্ষা করার অন্য কোন মন্ত্র বা উপায় রক্ষণশীলদের জানা ছিল না।

এর একটি সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা রয়েছে। নানা কারণে সে সময় বাঙলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডল ক্রমশই বাম-অভিমুখী হতে শুরু করেছিল। ১৯৩০-এর দশকের প্রারম্ভে বাঙলায় 'সন্ত্রাসবাদী' আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং গান্ধী-আরউইন বৈঠকে

জাতীয় কংগ্রেসের আপোষকামী নীতি দেখার পর বিভিন্ন রাজ্যের কারাগারে, বন্দী শিবিরে আর আন্দামানে নির্বাসিত তরুণ বিপ্লববাদীদের এক বড় অংশ মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তিরিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে থাকেন। গোপাল হালদার, রেবতী বর্মন, সরোজ আচার্য, ভবানী সেন-দের মতো বুদ্ধিজীবী-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতাদের এইভাবেই কমিউনিষ্ট পার্টিতে আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রের নানা রাজনৈতিক ঘটনাবলীও ত্রিশের দশকে বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রগতি-শিবিরে যোগদানে প্রায় বাধ্য করেছিল। ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে নাৎসীদল ও ফ্যাসিস্ত হিটলারের ক্ষমতা দখল এবং ১০ মে বার্লিনের রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে নাৎসীদের দ্বারা বিশ্ববিখ্যাত প্রায় সকল লেখকের গ্রন্থের বহ্নুৎসব প্রমাণ করল-তারা মানব সংস্কৃতির কত বড়ো শত্রু। তারপর হিটলার আর মুসোলিনির উগ্র সাম্রাজ্য লালসা যুদ্ধ প্রস্তুতির ফলে সমগ্র ইউরোপ যখন ভীত-সন্ত্রস্ত তখন ফ্যাসিজমের দানবিক ঔদ্ধত্য ও সভ্যতা বিরোধী প্রস্তুতিকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য রোলাঁ, গোর্কি ও অ্যাঁরি বারব্যুস সারা বিশ্বের বিবেকবান, মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীকে আহ্বান জানালেন প্রতিরোধ-আন্দোলনে সামিল হতে। ১৯৩৫-এর ২১ জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত হলো শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রথম আর্ন্তজার্তিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে আদ্রেঁজিদ, ঈ-এম-ফর্স্টার, আঁদ্রে মালরো; অলডাস হ্যাক্সলি; জুলিয়া বাঁদা, ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক, মাইকেল গোল্ড, জন স্ট্র্যাচি প্রমুখ বরেণ্য সাহিত্যিক ও মনীষীরা যোগ দিলেন, আহবান জানালেন ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে সকল মানবপ্রেমিক শিল্পী-সাহিত্যিককে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অগ্রসর হতে। এই বিশ্ব সম্মেলনে ইয়োরোপ-প্রবাসী ভারতীয় লেখকদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক মুলকরাজ আনন্দ। এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ। প্রখ্যাত হিন্দী লেখক মুন্সী প্রেমচাঁদ হয়েছিলেন সভাপতি, সম্পাদক হন সাজ্জাদ জহীর। এর সামগ্রিক ফল রূপে দেখা গেল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিংবা সদ্যশিক্ষাজীবন শেষ করেছেন এমন একদল প্রতিভাবান তরুণ লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মী প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে এইভাবেই কমিউনিষ্ট পার্টির সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল, সুবোধ চৌধুরী, বিনয় ঘোষ, সমর সেন, গোপাল হালদার প্রমুখ আরও অনেক তরুণ লেখক ও বুদ্ধিজীবী।[১১] এই পরিস্থিতিতে, ১৯৩৮ এর ডিসেম্বরে কলকাতায় আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হলো নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ-র দ্বিতীয় সম্মেলন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সম্মেলনকে উদ্দেশ্য করে অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেন। বাঙলার প্রায় সকল বিশিষ্ট লেখকই এতে যোগ দেন। বাঙলার প্রগতি-সাহিত্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাশ, বনফুলের মতো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকরা নানা সময়ে নানা বিরূপ মন্তব্য করেছেন। এমনকি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতার পূর্বে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের একজন শরিক ও প্রবক্তা হলেও পরে তাঁর মত বদলান। মলতঃ মার্কসবাদী দর্শনে অনাস্থা ও

বীতরাগই ছিল এর প্রধান কারণ। এই বিরোধী পক্ষের তাত্ত্বিক বক্তব্য ছিল-"দল বাঁধিয়া সাহিত্য হয় না।' এইসমস্ত বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে নৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী লিখেছিলেন-"আমরা এমন সাহিত্যে চাই যা আমাদের হাতুড়ি পিটিয়ে মানুষ করতে পারে।"

এই প্রেক্ষাপটেই ত্রিশের দশকের শেষপর্বে মার্কসীয় প্রভাবে সাহিত্য সৃজনের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। ১৯৩৭-৩৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত হল মনোরঞ্জন হাজরার কৃষক সংগ্রামকে ভিত্তি করো রচিত 'নোঙরহীন নৌকা', আর ১৯৩৯ সালে আমরা পেলাম সদ্য-কারামুক্ত গোপাল হালদার-এর সন্ত্রাসবাদ থেকে মার্কসবাদে উত্তরণের কাহিনী ভিত্তিক উপন্যাস 'একদা'।

প্রগতি লেখক সংঘর কলকাতা অধিবেশনের অব্যবহিত পরে ১৯৩৯ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় 'অগ্রণী' মাসিক পত্রিকা। বিশিষ্ট মার্কসবাদী সাহিত্য-গবেষক ধনঞ্জয় দাশ-এর মতে, বাংলা ভাষায় কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত প্রথম সাংস্কৃতিক পত্রিকা হচ্ছে এই 'অগ্রণী'। প্রফুল্ল রায় ছিলেন এর সম্পাদক। ১৯৩৯-এর জানুয়ারি তেকে ১৯৪০-এর জুন-এই ক্ষণস্থায়ী দেড় বছরের জীবনে 'অগ্রণী' বাংলা প্রগতি সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সংগঠিতভাবে মার্কসীয় দৃষ্টি ভঙ্গীতে সাহিত্য-সমালোচনার ধারাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। 'অগ্রণী' স্পষ্টতই অনুধাবন করেছিল, "সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরোধিতার সঙ্গে ফ্যাসিষ্ট বিরোধিতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।" জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ভাবজগতে প্রবাহিত তৎকালীন প্রগতিমুখী সমস্ত ধারার প্রতিফলন ঘটেচিল 'অগ্রণী'র প্রতিটি সংখ্যার প্রায় প্রতিটি রচনায়। রচনাশৈলীর মান আজকের বিচারে হয়তো উন্নত ছিল না কিন্তু বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে এগুলি ছিল নতুন চিন্তা-চেতনার বাহন। 'অগ্রণী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিশ্ব বিশ্বাসের উপন্যাস 'মজদুর' আঙ্গিক-নৈপুণ্যে অসাধারণ না হলেও 'কল্লোল-যুগে'র 'মজুর-বিলাস' থেকে নিঃসন্দেহে তা ছিল স্বতন্ত্র। সুবোধ ঘোষ-এর 'ফসিল'-এর মতো অনবদ্য গল্প প্রকাশের কৃতিত্ব অগ্রণীরই প্রাপ্য। রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা কাব্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিগণ-যেমন অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সরোজ দত্ত, দিনেশ দাস, সমর সেন, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর কবি প্রতিভা প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ করে দিয়েছিলেন 'অগ্রণী'।

বাংলা প্রগতি-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে কর্মচ্যুত সাংবাদিক বিশিষ্ট সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-এর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'অরণি'-র আত্মপ্রকাশ। 'অগ্রণী' বন্ধ হয়ে যাবার পর তার অভাব দূর করতেই যেন ১৯৪১ সালের শারদীয় সংখ্যা দিয়ে 'অরণি'-র প্রথম যাত্রা শুরু। এরপর ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকা বাঙলার মার্কসীয়-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-এর সঙ্গে 'অরণি' পত্রিকার সম্পাদনার কাজে প্রথম থেকেই যুক্ত হয়েছিলেন তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদে দীক্ষিত কয়েকজন প্রতিভাবান লেখক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল। চিন্মোহন সেহানবীশ ও সুধীপ্রধানের মতো সংগঠকও যুক্ত ছিলেন এঁদের সঙ্গে। এছাড়া ছিলেন প্রভাত গোস্বামী, সুশীল জানা এবং নিখিল সেন। বস্তুত 'জনযুদ্ধ' সাপ্তাহিকের পাশাপাশি

'অরণি' অনেকক্ষেত্রেই অঘোষিতভাবে কমিউনিষ্ট পার্টির বাঙলা শাখার মুখপত্র রূপে কাজ করতো। ফ্যাসিবাদ বিরোধী নানাবিধ সাহিত্যিক রচনায় পরিপূর্ণ থাকতো 'অরণি'র পৃষ্ঠা।[১২] তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য-র মতো লেখকদের প্রতিভার বিকাশে 'অরণি' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে গেছে। এই প্রসঙ্গে প্রগতি-সাহিত্য আন্দোলনেব বিশিষ্ট গবেষক ধনঞ্জয় দাশ-এর বক্তব্য প্রণিধান যোগ্যঃ

"চল্লিশের দশকেব প্রারম্ভে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা ব্যক্তিগত ভালোলাগা-মন্দ লাগার উর্দ্ধে উঠে সাধাবণভাবে সকলেই মার্কসবাদের অনুশীলন ও তার প্রয়োগে সামাজিক অর্থে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিলেন। ব্যক্তি প্রতিভা ও ব্যক্তিমানসিকতার তাবতম্য ও ঝোঁক অবশ্যই ছিল। যেমন, চিন্তা-ভাবনার দিক দিযে স্বর্ণ কমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, বিনয় ঘোষ, সবোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল এবং কিছুটা পরিমাণে চিন্মোহন সেহানবীশ অনেক বেশি পরস্পরেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং নিজেদের ভিতর মতামতও বিনিময় করতেন। আবার, সাধারণভাবে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সমব সেন প্রমুখ চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে ছিলেন পরস্পরের অনেক বেশী কাছাকাছি।

"প্রথম পক্ষ মনে করতেন, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের প্রতি বিমুখতা, কৃত্রিম ভাষা ও একান্ত ব্যক্তিগত চিত্রকল্প ব্যবহার, উৎকৃষ্ট ইয়োবোপ-মনস্কতা, উদ্ভট আঙ্গিক বিলাস এবং মনে মনে পশ্চিমী অবক্ষয়বাদী সাহিত্যধারার প্রতি সহানুভূতি শোষণের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষ এক ভ্রান্ত, অমার্কসীয় পথ অনুসরণ করছেন। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় পক্ষ ভাবতেন, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যববণেব নামে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকা, ভাষা ও আঙ্গিক সম্পর্কে গোঁড়া ও সংকীর্ণ মনোভাব পোষণ, বিষয়-মাহাত্ম্যের নামে নতুন আঙ্গিক গ্রহণে অনিচ্ছা এবং সজনীকান্ত-গোষ্ঠীর প্রতি প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতের মধ্য দিয়ে প্রথম পক্ষ বাঙলার প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন।"[১৩]

এতদ্‌সত্ত্বেও এঁরাই ছিলেন এদেশের সাহিত্য তথা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসবাদী ধ্যান ধারণা প্রসারে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। সমগ্র চল্লিশেব দশক জুড়ে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা যৌথভাবে প্রায় এক অসাধ্য সাধন করেছিলেন। 'অরণি' পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় গোলাম কুদ্দুস, নবেন্দু রায়, বিষ্ণু দে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুকান্ত ভট্টাচার্যর অক্টোবর বিপ্লব ও লেনিন বিষয় কবিতা, 'লেনিনের দৃষ্টিতে-আর্ট ও জনমানব' কিংবা সুধী প্রধান-এর 'বাংলা সাহিত্য ও মার্কসবাদ' প্রভৃতি রচনাবলী এরঁই কয়েকটির মাত্র দৃষ্টান্ত।

আলোচ্য সময়কালে কয়েকজন বিশিষ্ট অকমিউনিষ্ট কথাসাহিত্যিকও সমকালীন যুগ-ধর্ম রূপে মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত (অন্তত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ'-র নামে মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন পর্যন্ত) কমিউনিষ্টদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন; কেউ পাকাপাকিভাবে কমিউনিষ্ট পার্টিতে নাম লেখান; কেউ বা অল্প দিন পরেই কমিউনিষ্ট বিরোধী শিবিরে যোগ দেন। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম ধরণের; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় ধরণের; সুবোধ ঘোষ বা বুদ্ধদেব বসু

ছিলেন তৃতীয় ধরণের। তারাশংকর তাঁর উপন্যাসে সপ্রশংস দৃষ্টি ভঙ্গিতে কমিউনিষ্ট চরিত্র এঁকেছিলেন (মন্বন্তর), বিপরীতে সুবোধ ঘোষ (তিলাঞ্জলি) এবং বুদ্ধদেব বসু (তিথিডোর) উপন্যাসে কমিউনিষ্ট চরিত্রকে করেছেন কলাঙ্কিত-যদিও এরা উভয়েই একদা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের শরিক ছিলেন। এছাড়া বনফুল ও ছিলেন কমিউনিষ্ট বিরোধিতার আবাহনে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরে আরো কয়েকজন শক্তিমান কথাসাহিত্যিক যেমন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু এঁরা কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন এমনকি পার্টি সদস্য পদও গ্রহণ করেন। এর মধ্যে নিঃসন্দেহে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন আপাদমস্তক মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী কমিউনিষ্ট কথাসাহিত্যিক। তারাশংকরের সমকালীন লেখক বয়োঃকনিষ্ঠ মানিকের (প্রথম উপন্যাস 'জননী' প্রকাশ ১৯৩৫ সালে) চেতনার বিবর্তনটি ১৯৪০ এর দশকে পৌঁছে মার্কসবাদ অভিমুখী হয়েছিলেন সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও মার্কসবাদে বিশ্বাসী হলেও তিনি কিন্তু বহুবিধ গুণেব অধিকারী হলেও সমাজবাদ বিষয়ে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী (যেমন- 'লালমাটি'; 'শিলালিপি' উপন্যাস) তাঁর রচনাকে মানিকের পর্যায়ে (যেমন 'পদ্মানদীর মাঝি' ১৯৩৬) উন্নীত করতে পারেনি-যদিও মানিক বাবু নিজেও প্রথমদিকে রোমান্টিক ও ফ্রয়েডীয় চিন্তাধাবায় আচ্ছন্ন ছিলেন। সাম্যবাদ-সমাজবাদ বিষয়ে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তারাশংকরও সাহিত্য রচনা করেছেন। গান্ধীবাদ ও মার্কসবাদকে (যেমন 'মন্বন্তর'-এ) তিনি অনেক স্থানেই মেলাতে চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন।

তৎসত্ত্বেও, তারাশংকর-বনফুল-মনোজ বসু প্রমুখের রচনা গোপাল হালদারের মত 'কমিটেড' কমিউনিষ্টের রচনা (যেমন- 'একদা' ও 'ঊনপঞ্চাশী', 'পঞ্চাশের পথে', 'তেরশ পঞ্চাশ') না হওয়া সত্ত্বেও তারাশংকর 'বনদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' অথবা বনফুলের 'অগ্নি' (১৯৪৬) কিম্বা মনোজ বসুর 'ভুলি নাই' (১৯১৩) প্রভৃতি উপন্যাসে কমিউনিষ্ট বিরোধিতা ও তাদের অভাব অভিযোগ ও রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ায় তা মার্কসীয় দর্শন অনুসারী সামাজিক বাস্তবতারই সাহিত্য হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক নাজমা জেসমিন চৌধুরীর বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন (দ্র. বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি):

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি বক্তৃতায়' বনফুল বাস্তবতার অজুহাতে যাঁরা সাহিত্যকে কলুষিত করেছেন তাঁদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, "সমাজের কুৎসিৎ চিত্র অনেক আছে, তাহারা সাহিত্যের বিষয়ও হইতে পারে, কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া কেহ যদি সেইগুলিকে কাব্যে স্থান দিয়ে উগ্র বর্ণে কেবল সেইগুলিকে চিত্রিত করিতে থাকেন, তখন সন্দেহ হয়, লেখকের শিল্প-প্রচেষ্টার পিছনে অন্য মতলব আছে।" হাস্যরসিক লেখক এখানে আত্মবিস্মৃত হয়েছেন। খেয়াল করেননি 'অগ্নি'তে তিনি ঠিক ঐ কাজটিই করেছেন। তাঁর নির্দেশিত কারণেই 'অগ্নি' প্রচারধর্মী এবং 'মতলব'-এর শিল্প প্রচেষ্টা রূপে গৃহীত হয়।"'[১৮]

প্রকৃতপক্ষে নাজমা জেসমিন চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায়ে একটি সরল সত্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' হোক কিম্বা বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর'-হতে পারে এগুলির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিষ্ট-বিরোধিতা-কিন্তু এই 'বুর্জোয়া

সাহিত্যিকরাও যে সাহিত্য রচনার বিষয়বস্তু (content) ও কাঠামো (form) রচনায় মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব এড়াতে পারেননি তা সুস্পষ্ট। এমনকি আপাতভাবে প্রকৃতির চিত্রকর রূপে পরিচিত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালীন গল্প-উপন্যাসে জন-জীবন ও সমাজজীবনের সংকটের বাস্তব চিত্র সুনিপুণ দক্ষতায় তুলে ধরা হয়েছিল-'আরণ্যক' কিম্বা 'অশনি সংকেত'ই তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ। বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদের দুর্নিবার প্রভাব এইভাবেই ১৯৩০ ও '৪০-এর দশকে বাংলা কথা সাহিত্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'রকম প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করেছিল।

বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও এই সময় কয়েকজন প্রথম সারির কমিউনিষ্ট সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালে ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক শিল্পীদের আন্দোলন ১৯৪৫-৪৬ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণঅভ্যুত্থান (আজাদ হিন্দের বন্দী সেনানীদের বিচার, নৌ-বিদ্রোহে প্রভৃতি বিষয়ে); ১৯৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ১৯৪৬-৪৭ এর তেভাগা কৃষক আন্দোলন ও অন্যান্য গণআন্দোলনকে কেন্দ্র করে কিছু উপন্যাসের পাশাপাশি যে অসংখ্য ছোটগল্প রচিত হয়েছিল তা আজও বাংলা সাহিত্যের গৌরব।

গল্প-উপন্যাস অর্থাৎ কথা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাঙালি লেখকদের অনেক বেশি নাড়া দিয়েছিল ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ (যা পঞ্চাশ সনের মন্বন্তর নামে পরিচিত) এবং তার দ্বারা লক্ষ লক্ষ মানুষের অসহায় জীবনহানি। পঞ্চাশের মন্বন্তরে কুকুর-বেড়ালের মতো মানুষ মরছে-আর এ দৃশ্য দেখে সব সাহিত্যিকই মনের দরজা, কলমের খাপ বন্ধ করে বসে আছেন-এমনটা মনে করাই অমূলক। সুতরাং ফ্যাসিবাদের অনুষঙ্গে যুদ্ধ; যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় মন্বন্তর এবং মন্বন্তরের পরিণতি বাঙলার ১৫ লক্ষ নরনারীর নিঃসহায় মৃত্যু এবং তার চিত্র বাঙালি লেখকদের কলমে চিত্রিত হওয়া-ফ্যাসিস্ত বিরোধী সৃজনশীল কথা সাহিত্য সৃষ্টির বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে ছিল এরকমই। ফ্যাসিবাদ ও তার পরিণতিতে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের বিভীষিকা ও মর্মান্তিক পরিণতি বাঙালি দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তের জীবনধারাকে কীভাবে বিপর্যস্ত করেছিল; কীভাবে ঘর-বাহির এক হয়ে গিয়ে বাঙালীর জীবনযাপন পদ্ধতির গতিমুখ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল তার নিপুণ ছবি ফুটে ওঠে সোমনাথ লাহিড়ি, সোমেন চন্দ, ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়, সুশীলজানা, সরোজ দত্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, শান্তিলাল ব্যানার্জী, শওকত ওসমান, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, গোলাম কুদ্দুস, সুলেখা সান্যাল, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সাবিত্রী রায় প্রমুখ আরো অনেক লেখকের রচনায়। ননী ভৌমিকের 'ধানকানা' ও 'ধূলোমাটি' এবং সাবিত্রী রায়ের 'পাকা ধানের গান' এবং 'ঘাসফুল' উপন্যাসে এক্ষেত্রে স্মরণীয়। সাহিত্যিক রূপে পরিচিত না হলেও কমিউনিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ি কিছু অসাধারণ ছোট গল্প এই প্রেক্ষাপটে রচনা করেন যা তাঁর একমাত্র গল্প-সংকলন 'কলিযুগের গল্পে' সংকলিত। এছাড়া সোমেন চন্দ-র 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' নবেন্দু ঘোষ-এর গল্প সংকলন 'এই সীমান্তে', সঞ্জয় ভট্টাচার্যর 'ফসল ও অন্যান্য গল্প', (এই দুটি সংকলনেরই প্রকাশকাল ১৯৪২), পরিমল গোস্বামী সংকলিত 'মহামন্বন্তর (১৯৪৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের জীবন-সংগ্রাম নিয়ে রচিত হয়েছিল আরও বেশ কিছু

উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাস। এর পাশাপাশি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী বেশ কয়েকটি সাময়িক পত্র-পত্রিকা এ সময়ে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এগুলি হল-('পরিচয়' ও 'অরণি' ছাড়াও) 'প্রতিরোধ' (ঢাকা), 'অভিবাদন' প্রভৃতি। বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'আগুন', 'জবানবন্দী' ও সুবিখ্যাত 'নবান্ন' নাটকগুলি ছিল ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের প্রধানতম সাহিত্য সৃজন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যর 'হোমিওপ্যাথী' ও বিনয় ঘোষ-এর 'ল্যাবরেটরি' নাটক দুটিও।

যুদ্ধোত্তর পর্বে অর্থাৎ বাঙলায় উত্তাল চল্লিশের দ্বিতীয়ার্ধে ১৯৪৫-৪৬ এর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ আন্দোলনকে (আজাদ-হিন্দের বিচার; রসিদআলি দিবস; নৌবিদ্রোহ প্রভৃতি কেন্দ্রিক) পটভূমিকা করে রচিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' ও তারাশংকরের 'ঝড় ও ঝরাপাতা'। ১৯৪৬-৪৭ এর দাঙ্গা-দেশবিভাগ ও তেভাগা কৃষক সংগ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত হয় অজস্র ছোটগল্প ও উপন্যাস। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে এরকমই তিনটি অবিস্মরণীয় ছোট গল্প ছিল রমেশ চন্দ্র সেন-এর 'সাদা ঘোড়া', বুলবুল চৌধুরীর 'রক্তের ডাক' এবং সমরেশ বসুর 'আদাব'। আর তেভাগা আন্দোলন নিয়ে রচিত গল্পকারদের মধ্যে নবীন ও প্রতিশ্রুতিবান ছিলেন সৌরি ঘটক, মিহির সেন, মিহির আচার্য, আবু ইস্‌হাক, পূর্ণেন্দু পত্রী, বিভূতি গুহ প্রমুখ।[১৫]

উপন্যাস-ছোটোগল্প-নাটক ও সমালোচনা সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা কাব্যজগতেও মার্ক্সীয় চিন্তা-চৈতন্যর প্রভাব ছিল ত্রিশের ও চল্লিশের দশকের অন্যতম যুগ-বৈশিষ্ট্য।

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় উনিশশো বিশের দশকেই সাম্যবাদ ও মার্কসীয় চৈতন্যের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। উনিশশো ত্রিশের দশকে প্রেমেন্দ্র মিত্র তারই উত্তরাধিকার বহন করে লিখেছিলেনঃ 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের/মুটে মজুরের/ -আমি কবি যত ইতরের।' [কবি, প্রথমা; ১৯৩২।] ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে বিশ্বজোড়া ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে থেকে উত্থিত হয়েছিল নতুন চেতনায় উদ্ভাসিত কবিতাবলী। এই চেতনা মার্কসবাদ সঞ্জাত উপলব্ধি। স্বয়ং কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে ও (যেমন 'বলাকা') এই নতুন চেতনার আবাহন ছিল সুস্পষ্ট। পরিচয়, অগ্রণী, অরণি; সাহিত্যপত্র; প্রতিরোধ প্রভৃতি সাময়িকপত্রে বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সমর সেন, সরোজ দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অমিয় চক্রবর্তী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মনীন্দ্র রায়, কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত, গোলাম কুদ্দুস, রাম বসু, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী-র মতো কবিরা বাংলা কাব্য সাহিত্যকে অজস্র এমন কবিতায় সমৃদ্ধ করেছিলেন যাতে মার্কসীয় চৈতন্যের উপস্থিতি ছিল ষোলো আনা।[১৬] এমনকি রাজনীতি নিরপেক্ষ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা জীবনানন্দ দাস ও যে সাম্যবাদী চেতনার প্রভাব একেবারে এড়াতে পারেননি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং ঘোষিত্ কমিউনিষ্ট বিরোধী বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত ১৯৪২-তে ঢাকায় ফ্যাসিস্ট পন্থীদের হাতে কমিউনিষ্ট সাহিত্যিক তরুণ সোমেনচন্দ-র হত্যাকান্ডর পর লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, "পশুত্বের প্রতিবাদে নিখাদে রেখাবে আজ হোক উদ্দীপিতা/আমার কবিতা" প্রাচীর। ১৯৩৯-

এ 'অগ্রণী'র পৃষ্ঠায় কবি অরুনা মিত্র দ্বিধাহীন চিত্তে লিখেছিলেন, "লাল অক্ষরে লটকানো আছে দ্যাখো/নতুন ইস্তাহার।" ঔপনিবেশিক যুগের (শেষ পর্বে) বাংলা কাব্যসাহিত্যের এটাই ছিল মূল স্পিরিট।

এইভাবেই ঔপনিবেশিক যুগের শেষ দুই দশকে বাংলা সাহিত্যে সকল ধারায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ, সাম্যবাদী চেতনা, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি মমত্ববোধ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার উপাদানগুলির কম-বেশি পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং ক্রমশই তা বাংলা সাহিত্যের একটি মূল ধারায় পরিণত হয়। ১৯৩৭ সালে 'প্রজাতি' সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত যা বলেছিলেন-"সার্থক সাহিত্য প্রগতিশীল হতে বাধ্য। প্রগতি ছাড়া সাহিত্যই হয় না।"-তা যেমন শতকরা একশোভাগ সত্য ছিল; তেমনি দশবছর পরে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যখন বলেন-"আসলে জীবননিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যই প্রগতিশীল হতে পারে-যদি তার দৃঢ় দৃষ্টি সাম্যবাদের আদর্শে নিবদ্ধ থাকে।"[১১]-এটাও সমান সত্য। এই দুই উপলব্ধির মেলবন্ধনই বিংশশতাব্দীর ত্রিশের ও চল্লিশের দশকের বাংলা প্রগতি-সাহিত্যের প্রধান চালিকা শক্তিছিল এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সূত্র নির্দেশ

১। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ক্যালেন্ডার; ১৮৭০-৭১; দ্র. উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে সাম্য চিন্তা; রমেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত; পুস্তক বিপণি, ১৯৮২।

২। সমাজ-সমীক্ষা; ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সেসে-এর মুখপাত্র; ১০ম বর্ষ ১-২ সংখ্যা, ১৯৯৯

৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৯৫ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, পুস্তক সমালোচনা বিভাগ।

৪। চটকল শ্রমিক আন্দোলন; গোপাল ঘোষ; লোক ইতিহাস প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭০ এবং এক্ষণ শারদীয়, ১৩৮২তে প্রকাশিত 'ভারত শ্রমজীবী' প্রসঙ্গে কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনা।

৫। বাংলা সাহিত্যে গোর্কির প্রভাব; সত্যপ্রিয় ঘোষ; ক্রান্তি এপ্রিল-জুন, ১৯৬৮, কলকাতা।

৬-৭। মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, ধনঞ্জয় দাশ (সং); ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য। কলকাতা, ১৯৭৫।

৮। ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ; নেপাল মুজমদার; চতুর্থখন্ড, কলকাতা।

৯। 'প্রগতি' সংকলন গ্রন্থটি সম্প্রতি হীরেন মুখার্জির ভূমিকা সহ পুর্নমুদ্রণ করেছেন উশ্বক প্রকাশনী, কলকাতা-৬০।

১০। মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক; পূর্বোক্ত; প্রথম খণ্ড।

১১। দ্র. ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা; সুস্নাত দাশ; প্রাইমা; কলকাতা, ১৯৮৯।

১২। দ্র. অরণিঃ একটি আন্দোলন, একটি পত্রিকা; কার্তিক লাহিড়ি; এক্ষণ, শারদীয়, ১৩৮৮।

১৩। মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক; পূর্বোক্ত, প্রথমখণ্ড; পৃঃ একত্রিশ

১৪। বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি; নাজমা জেসমিন চৌধুরী; চিরায়ত; কলকাতা, ১৯৮৩।

১৫। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের গণশক্তি, ৬ জুন, ১৯৯৯তে প্রকাশিত

নিবন্ধ-'বাংলা কথা সাহিত্যে চল্লিশের গণআন্দোলনঃ প্রভাব ও প্রতিফলন'।

১৬। দ্র. সুমিতা চক্রবর্তীর নিবন্ধ, 'মার্কসীয় চেতনা ও বাংলা কবিতার প্রগতিশীল ধারা,' 'বাংলার সংস্কৃতিতে মাকর্সবাদী চেতনার ধারা, 'ধনঞ্জয় দাশ (সং) অনুষ্টুপ, ১৯৯২।

১৭। বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ 'মাকর্সবাদী বুদ্ধিজীবীদের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ' দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত (১৬) অনুষ্টুপ প্রকাশিত গ্রন্থ।

উনিশ শতকের শহরের বাংলা গান ও তার পরিবর্তন

সুপর্ণা ভট্টাচার্য

উনিশ শতকে গানই ছিল বাঙ্গালীর অভিব্যক্তি। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যায় তরজাগান, কবিগান, পদাবলী কীর্তন, পদ ইত্যাদি। এই গানের দুটি ধারা ছিল। রাজপ্রাসাদে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল দরবারী সঙ্গীত, যার ভিত্তি ছিল শাস্ত্রীয় সংগীতে। অন্যদিকে ছিল সাধারণের কন্ঠে গীত নানা ধরণের গান, যা পরবর্তীকালে লোকসঙ্গীত নামে পরিচিত হয়।

গানের বিবর্তনের ইতিহাস যতটা লেখা হয়েছে সেই অনুপাতে গানকে অনুসরণ করে বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনা করা হয়নি। বাংলা গানের ইতিহাসে আমরা দেখছি শাস্ত্রীয় সংগীতে দরবারী ঐতিহ্য ও লোকগান, যেমন ভক্তিগীতি, পদাবলী কীর্তন এবং প্রাত্যহিক জীবনকে কেন্দ্র করে গান, যেমন ভাটিয়ালী, সারিগান জারিগান দুই-ই প্রচলিত ছিল। কিন্তু গানের চর্চার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণী কাঠামো পাওয়া যায় না। বাংলার মানুষ বিভিন্ন ধরণের গান একই সময়ে চর্চা করেছে, তার ইতিহাস পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতকে নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গানের সুর ও কথার ক্ষেত্রে নতুন বৈশিষ্ট্যের অভিনিবেশ ঘটে ছিল। শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্ষেত্রে নতুন ঘরানা যেমন বিষ্ণুপুর ঘরানা ও নানা রাগ রাগিনীর উদ্ভব সত্ত্বেও পশ্চিমের প্রভাবকে সেইভাবে অনুভব করা যায় না। অথচ সাধারণ লোকের যে লোকগান তাতে প্রতিমুহূর্তেই শহর কলকাতা ও উপনিবেশের আগমনের অনুভব করা যায়। নিম্নলিখিত গানটিকে আমরা কলকাতার লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই।

> "বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা, গুলির কোন্নগরে,
> বাট্টালে মদের আড্ডা, চন্দুর বৌবাজারে।
> এই সব মহাতীর্থ যে না চোখে হেরে,
> তার মত মহাপাপী নাই ত্রিসংসারে।"

তৎকালীন বাবুসমাজ ভোগ বিলাস, আড্ডা, নেশায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। তাদের আড্ডা ও নেশার স্থান গুলিকে ব্যঙ্গ করে লোক সংগীতের গান রচিত হয়েছিল।

সামগ্রিকভাবে গীত ও অনামী লোকগান শহর কলকাতায় বিশিষ্ট কবিদের কবিগানে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কবি কেষ্টা মুচি, রঘুনাথ দাস, ভোলা ময়রা, হরু ঠাকুর, রাম বসু, গোঁজলা গুঁইন ইত্যাদিদের গান এই সময়ে লোকের মুখে মুখে ফিরত। এদের পদবি দেখে বোঝা যায় যে এরা বেশির ভাগই সমাজের নিম্নশ্রেণী ও জাতি ভুক্তছিল। স্বাভাবিকভাবেই

এদের গানে সমাজের জাতি ভেদাভেদের বিরুদ্ধে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিল।

সুর তাল ও দেব দেবীর প্রার্থনা মূলক সঙ্গীত যেমন-শ্যামা সঙ্গীত, রাধা-কৃষ্ণের লীলাকে কেন্দ্র করে রচিত গান পূর্বেকার মতই শহর কলকাতায় রচিত ও গীত হয়েছে। অথচ এই বিষয়ের মধ্যে নতুন শহরের নানা মূল্যবোধ, বাবু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, মুদ্রা অর্থনীতির ব্যাপক প্রভাবে পরিবর্তিত একটা সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ রামনিধি গুপ্ত, যিনি 'নিধুবাবু' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন, তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গান-

"গোপনে যতেক সুখ,
প্রকাশে তত অসুখ।
ননদী দেখলে পরে,
প্রণয় কি রয়॥"

এখানে প্রচ্ছন্নভাবে বাবুর দুশ্চরিত্রতা, পতিতাগমন ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তৎকালীন বাবু সমাজের জীবনের দ্রুত স্পন্দন ছিল না। তাঁরা ভোগবিলাসের মাধ্যমে বিলম্বিত লয়ে দিন অতিবাহিত করত। সেই জীবনধারণের উপকরণ ছিল পতিতালয়, নেশা, আড্ডা চিত্ত মনোরঞ্জনের জন্য প্রচুর অর্থব্যয়। বাবু সমাজের জীবন ধারণের এই দিকটিকে কেন্দ্র করে টপ্পা গান রচনা করলেন নিধুবাবু যাঁকে আমরা বাংলা টপ্পা গানের স্রস্টা বলে অভিহিত করে থাকি।

দ্বিতীয়তঃ এই গান গুলোর মাধ্যমে ভদ্রলোক সমাজের বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদী সুর পাওয়া যায়। মূলতঃ ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপাত্মক গানগুলি তার প্রমাণ। যেমন-

"ব্রান্ডি, রেন্ডি, গাঁজা-গুলি
ইয়ার জুটে কতকগুলি
মুখেতে সর্বদা বুলি
হুট বলে দেয় গাঁজায় টান,
পড়ে থাকে পরের বাড়ি
হয়ে তাদের আজ্ঞাকারী
হলে তাদের মনটি ভারি
হুঁকোটি, কলকেটি, পানটি জোগান॥"

এই গান গুলির মধ্যে দিয়ে নবজাগরণের প্রথম সমালোচনার সুর পাওয়া যায়, নবজাগরণের নেতৃবৃন্দের দ্বৈত নীতিবাদের চিত্রটিও পাওয়া যায়। বিশেষ করে এটা দেখা যাচ্ছে জাতিগত বিভিন্নতার মধ্যেও। এই কবিদের নিজেদের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব বোধ ছিল না। বরঞ্চ এদের মধ্যে সাম্যবোধই ছিল। কিন্তু যখনই এরা বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসছে তখনই ওরা উচ্চশ্রেণীর বিভিন্ন দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করছে এবং নিজস্ব জাতির সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, ইতিহাস পাওয়া যায় যে হরু ঠাকুরের অভূতপূর্ব অভিব্যক্তির জন্য শোভাবাজারের রাজবাড়ীর নবকৃষ্ণ দেব তাঁকে একটা দাবী শাল উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু হরু ঠাকুর সেই শালটি গ্রহণ না করে তাঁর বাজনদারকে এই অজুহাতে দিয়েছিলেন যে উনি একজন ব্রাহ্মণ হয়ে কি করে একজন নিম্নজাতির উপহার গ্রহণ করবেন। আবার আমরা দেখি

যে এই হরু ঠাকুরই তাঁর গুরু রঘুনাথ দাস যিনি নিম্ন জাতি ভুক্ত ছিলেন তাঁকেই বার বার নিজের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।

ভদ্র লোকদের মধ্যে যে লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যায় সেটাও এই কবিদের ততটা প্রভাবিত করেনি। সমাজে নারীর স্থান নীচে ছিল। পুরুষেরা সর্ববিষয়ে নারীকে দমিয়ে রাখতো। সমাজে নারীদের অধিকার পুরুষের সমান ছিল না। কিন্তু কবিদের মধ্যে চিত্রটা ভিন্ন ছিল। পেশাগত ভাবে তারা নারীর অধিকার কে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যেমন নারী কবিয়াল যোগেশ্বরী খুব প্রসিদ্ধা ছিলেন। সেই সময় আরও অনেক নারী কবিয়াল্গের উল্লেখ পাওয়া যায় - স্বর্ণমণি, পরশমণি অঘোরমণি ও বিধুকামিনী। কিন্তু এ থেকে তাদের উচ্চ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ আমরা দেখতে পাই এই নারী কবিয়ালরা কোন উচ্চ ভদ্রপরিবারের নারী নয়। তারা সমাজের পতিতালয় থেকেই এসেছেন। অর্থাৎ যারা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত তাদেরই সমাজে স্বাধীনতা ছিল। জনসমাজে নারীদের সমান অধিকার দেওয়া হয়নি। বরঞ্চ তারা যেন গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকে সেই দিকেই সকলের লক্ষ্য ছিল। তৎকালীন যুগসচেতনার ফলে ভদ্র সমাজের নারীরা ইংরাজী শিক্ষার লাভের জন্য গৃহের বাইরে পা বাড়ালেই সমাজে হৈ হৈ পড়ে যেত এবং সঙ্গে সঙ্গে রচিত হত ব্যঙ্গাত্মক গান, চুড়া ইত্যাদি।

এরা শুধু যে নবজাগরণের নেতিবাচক দিকগুলির সমালোচনা করেছে, তা নয়। বরং এ কথাও ঠিক যে নবজাগরণের পরোক্ষ প্রভাব তাদের উপর পড়লেও তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারেই ডুবে ছিল। কারণ জ্ঞানদীপ্তির দ্বারা প্রাপ্ত নবজাগরণের পশ্চিমী ধারাটিকে এরা অনুভব করতে পারেনি। তাই একই সঙ্গে সেই সমাজের সমাজ সংস্কার ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনকেও প্রায়শই এরা নেতিবাচক দিক থেকে আলোচনা করেছে। বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা, বিধবা বিবাহ, ইত্যাদিকে এরা সমালোচনা করেছে।

যেমন-

"সখের এ আয়নাখানি
মুখ দেখে যাও রিফরমার
ঘরে ঘরে থুবড়ো কনে
বে দিতে চাও বিধবার
ব্যাটার বাপ হিন্দুর দলপতি
খুব দরে বিকুবে ছেলে
ফুলিয়ে চলো ছাতি
যুবতি বউ আনাব ঘরে
জ্বলবে কুলে বাতি
সভা করে পইতে পরে
হবে সমাজ সংস্কার।"

আধুনিক ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থাকেও এরা সমালোচনা করেছে। মেয়েদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা দিলে কি হবে তার একটা চিত্র পাওয়া যায় এই গানে।

"আর্য্য জাতি, সুনীতি, বোঝে না হায়,
পাশ্চাত্য শিক্ষার, দীক্ষার দোষে
অবিদ্যা শিখায়।
আর্য্যকুল করিতে নির্ম্মুল,
বেথুন করেছেন ইস্কুল,
শিক্ষার দোষে বালিকার কুল,
সমূলে নির্ম্মুল প্রায়।।
পাশ করা মেয়ে এনে পরে,
গৃহলক্ষ্মী পালায় ত্বরে,
অলক্ষ্মী মেমের শিক্ষায়।"

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকে কেন্দ্র করে দু ধরণের কবিদের উদ্ভব হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের রচিত গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের বক্তব্য বিষয়। একদল চেয়েছিলেন সমাজের কুসংস্কার দূর করে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের দ্বারা সমাজের মধ্যে আধুনিকতা চেতনার বিকাশ ঘটাতে। অন্যদিকে আর একদল সমাজের মধ্যে আধুনিকতার অনুপ্রবেশকে রোধ করতে চেয়েছিলেন, এবং চেয়েছিলেন প্রচিনত্বকে আঁকড়ে ধরে রাখতে। ফলে যখনই দেখেছেন সমাজে আধুনিকতা উঁকি মারছে তখনই তাঁরা ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চিন্তাব মত পার্থক্য থাকলেও উচ্চ-নীচ শ্রেণী বৈষম্য ছিল না।

নীল বিদ্রোহ-কৃষক আন্দোলন যখন বাংলার গ্রামে ও গ্রামীণ সমাজকে আলোড়িত করেছিল তখন কলকাতার এই লোক সংগীত গায়ক সমাজ এ বিষয় গান রচনায় তত উৎসাহী ছিলেন না। তাই কৃষক বিদ্রোহের উপর রচিত গান বেশী মাত্রায় কলকাতা শহরে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের মূল স্রোত গ্রামীণ হলেও গ্রামীণ জীবনের চর্চা এই শহরের গানে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে তৎকালীন কলকাতার সমাজই ছিল তাঁদের গানের উৎস। লোকসংগীত যদিও চিরকালই গ্রামীণ সংস্কৃতিকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে, কিন্তু উনিশ শতকের কলকাতার লোক সংগীত ছিল নগর কেন্দ্রিক। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, শহর কলকাতার গানে সুর মূর্ছনা অপেক্ষা বিষয় বৈচিত্র্যের প্রাধান্য দেখা যায়।

কলকাতার লোক সংগীত গায়কেরা কলকাতার সমাজকে কেন্দ্র করে গান রচনা করলেও সিপাহী বিদ্রোহ, রাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতের শাসনভার গ্রহণ, ইংরেজ শাসকের অত্যাচার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির তাদের গানে স্থান পায়নি। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কিংবা বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতবাসীর হৃদয়ে স্বাধীনতা লাভের চেতনা যখন জাগ্রত হচ্ছিল তখন ভারত সংগীত শিরোনামে তিন প্রকারের গান রচনা করেছিল কলকাতার লোক সংগীত গায়কেরা। প্রথমত: পরাধীন ভারতমাতার দুঃখ, দারিদ্র, লাঞ্ছনাকে কেন্দ্র করে গান দ্বিতীয়ত: ইংরেজ শাসনব্যবস্থার ত্রুটিগুলিকে খোলাখুলিভাবে সমালোচনা করে গান এবং তৃতীয়ত: ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তি সূচক গান রচিত হয়েছিল। আবার দেখা যায়

রাণী ভিক্টোরিয়াকে ব্যঙ্গ করেও গান রচনা করতেও তারা পিছপা হয়নি।

"কোথা মা ভিক্টোরিয়া ?
পেট ভরে পাই না খেতে, কাজ কি পথে ?
কলের জলে কাজ কি ঘটে ?
...
চাই না মা তারের খবর
দুদিনের পরে
কার খবর কে করবে দেশে ?"

প্রচলিত ইতিহাসে যতটুকু তাদের সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে সেকানে দেখানো হয়েছে যে ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও গানের উন্মেষের ফলে এইসব গানগুলি নগণ্য ও অশ্লীল বলে চিহ্নিত হয় এবং জনপ্রিয়তা হারায়। জনপ্রিয়তা হারালেও এই গানের প্রভাব বাঙ্গালী মননে গভীর ছাপ রেখে যায়।

বর্তমান গবেষণায় সেই দৃষ্টি ভঙ্গীর ভিন্ন রূপ প্রচেষ্টা করার চেষ্টা রয়েছে। কারণ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রধানত নাটকীয় গানে এদের স্থূল ও প্রাচীন বঙ্গ রসিকতার সুর পাওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই এই প্রাচীন গানের কাছে তাঁদের ঋণ স্বীকার করেছেন। তারও পরে পরবর্তীকালে চল্লিশের দশকে মার্কস্‌বাদী সাহিত্য আন্দোলনের সময় এই লোকগানের উপর ভিত্তি করেই গণসংগীতের উদ্ভব হয়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সলিল চৌধুরী, শচীনদেব বর্মন এঁরা তাদের গানে এই লোকসংগীতকে ধরার চেষ্টা করেন।

সূত্র নির্দেশঃ-

১। সুমন্ত্র ব্যানার্জী, দ্য পারলার এণ্ড দ্য স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯৮০
২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৫
৩। ঈশ্বর গুপ্ত - প্রাচীন কলিকাতার গান পুনর্মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৯৫৩
৪। সুধী প্রধান - মার্ক্সিষ্ট কালচারাল মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, কলিকাতা।

ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিকতা ও স্ববিরোধ ঃ
প্রসঙ্গ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, ব্যারাকপুর

দীপাঞ্জন দত্ত

উনবিংশ শতকের শেষ দশকে স্বামী বিবেকানন্দ আর্তের সেবার আদর্শ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'রামকৃষ্ণ মিশন'। পরবর্তী একশত বছরেরও বেশী সময় নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান বিস্তৃতি লাভ করে। এই মিশনে বিভিন্ন শাখা নানা প্রান্তে রয়েছে। মোট শাখার সংখ্যা ১৩৫টি।[১]

রামকৃষ্ণের সাহচর্য ও শিষ্যত্ব গ্রহণের পর বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের আদর্শ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'রামকৃষ্ণ মিশন', ইতিপূর্বে তিনি তাঁর ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষের আপামর জনগণের দুঃখ মোচনের জন্য ভারতব্যাপী একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। এটি রূপায়ণের জন্য পরবর্তীকালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এই 'রামকৃষ্ণ মিশন'। এই মিশনের কার্যপ্রণালী স্বাধীনতার পূর্বে দুটি ধারায় বিকশিত হচ্ছিল। প্রথমটি ছিল দক্ষিণেশ্বরকে ঘিরে যার মাধ্যমে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচার হচ্ছিল। অপরটি ছিল গঙ্গার অপর পারে বেলুড়কে ঘিরে উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি যা রামকৃষ্ণ মিশনকে এক বিশেষ মাত্রা পাইয়ে দিয়েছিল। এই সময় অর্থাৎ স্বাধীনতার পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশন মূলত: এই দুটি ধারার মাধ্যমে তার প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তার ঘটিয়ে ছিল সারা ভারতব্যাপী। স্বাধীনতার বেশ কিছু পরবর্তীকালে মিশনের মধ্যে অর্ন্তবিরোধ দেখা যায় তার সেবার পদ্ধতি নিয়েই। বলা যেতে পারে যে 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের প্রতিষ্ঠা এরই ফল। স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের উন্নতির জন্য নারী শিক্ষা ও বিকাশ অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেই সূত্র ধরেই সৃষ্টি হয় 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন।'[২] প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজ। ইনি পূর্বে রহড়ার রামকৃষ্ণ মিশনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের একজন ছিলেন। 'রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম-রহড়ার' প্রধান শিক্ষক পরবর্তীকালে তিনি প্রিন্সিপাল ও সচিব হয়েছিলেন। তবে তাঁর এই উত্থানে ছেদ পড়ে—সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ সালে স্বামী নিত্যানন্দর রামকৃষ্ণ মিশন ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনার অল্প কয়েকদিন পর ২৫শে অক্টোবর ১৯৭৬ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সম্পূর্ণ পৃথক ও নতুন এক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান-'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন।'

এই প্রতিষ্ঠান সাধারণ সভা, পরিষদীয় সভা ও পরিচালক সভা ও কিছু উচ্চ-সভার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা হয়। পরিচালনগত সুবিধার জন্য কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় পরিষদীয় সভা, প্রতিষ্ঠানের সাংবিধানিক পথেই। ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে প্রতিষ্ঠানের আয় প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।[৩] সেবার কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ধারায়। এর শাখা আছে

১৭টি।[৪] সেবার কাজের মাধ্যমেই ১৯৮৪ সালে শিশু সেবার ক্ষেত্রে ও ১৯৯২ সালে মহিলাও শিশুর উন্নতির এর ক্ষেত্রে জাতীয় পুরস্কার পায়।[৫]

যে প্রতিষ্ঠানের বয়স মাত্র ২৩ বছর তার পক্ষে এই কাজ গুলি অবশ্যই গৌরবের। এই অল্প সময়েই যে পরিমাণ সম্পত্তি প্রতিষ্ঠানের হয়েছে ও বাৎসরিক আয় যেভাবে বেড়েছে তা যে কোন প্রতিষ্ঠানকেই এক বিশেষ মাত্রা পাইয়ে দেয়। এর থেকে বোঝা যায় এটি কত সূদূর প্রসারী।

এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। আছে স্বাস্থ্য কেন্দ্রও। এছাড়া অভিভাবকহীন শিশু, বোবা ও কানা শিশু, বিপদাপন্ন মহিলা, অন্ধ মহিলা ইত্যাদিদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এদের বিভিন্ন ভাবে এটি একটি দাতব্য সংস্থা[৬]। যার কাজই লোক হিতৈষণা—সমাজের উন্নতির দিকে যার অবশ্যই চেষ্টা আছে। তবে বর্তমানে বিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী তাদের বেতন কাঠামো নিয়ে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ।

সন্ন্যাসী হবার জন্য যারা আসেন তাদের নির্দিষ্ট কোন বয়স বা জাতের বা সম্প্রদায়ের মানুষ হতে হয় না। শিক্ষাগত যোগ্যতার ও বাধ্যবাধকতা নেই-তবে মাধ্যমিক পাশ হলে সুবিধা হয়।[৭] যাদের জন্য এই প্রতিষ্ঠান তাদেরও কোন নির্দিষ্ট জাত বা সম্প্রদায় ভুক্তহতে হয় না। সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসপর্ব সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে প্রায় দশ বছর।

স্বাধীনতার পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশন এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল তৎকালীন সমাজের উপর। পরবর্তী যুগে সেবার কার্য পদ্ধতি নিয়ে শুরু হয় বিরোধ যা শেষ পর্যন্ত পৃথক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করে। তবে এটিই প্রথম নয়-এর পূর্বে অনেকে রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগ করেন-স্বামী অভয়ানন্দ ও অনেক বয়োজ্যোষ্ঠ সন্ন্যাসী এছাড়া ভগিনী-নিবেদিতাও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।[৮]

১৯৭৬ এর সেপ্টেম্বর মাসে এক প্রতিষ্ঠান ছেড়ে এসে ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৬ এ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান স্থাপন এক অসম্ভব ব্যাপার। একটি বড় প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে গেলে যে সময় বা প্রস্তুতির দরকার তা হয়ত পূর্ব প্রতিষ্ঠানে জড়িত থাকার সময়ই সম্পন্ন হয়েছিল।

উদ্দেশ্য এবং মতাদর্শ মূলগতভাবে এক, কিন্তু তবুও বিরোধ বাধে—এটি কি প্রতিষ্ঠানিকতার লড়াই ও প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ হয়ে ওঠার সমস্যা, নাকি শুধু আদর্শগত বিরোধ ? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যায় এই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের মধ্যেই। আদর্শের বিরোধ গ্রাহ্য না হলে সাংগঠনিক বিচ্যুতি হত না। শুধুমাত্র নারী শিক্ষা ও প্রগতির বিষয়কে ভিত্তি করে মানব সেবার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ছিল কি ? ঔপনিবেশিক যুগে ধর্ম ও প্রতিষ্ঠানিকতার সংকট ছিল কিন্তু পরবর্তী যুগ প্রমাণ করে যে প্রাতিষ্ঠানিকতা কিভাবে ধর্মীয় ঐক্যকে খন্ডন করতে পারে।

সূত্র নির্দেশ

১। বার্ষিক প্রতিবেদন, আর. কে. এম. বয়েজ হোম, রহড়া, ১৯৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা-২।
২। স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজের সাক্ষাৎকার।
৩। বার্ষিক প্রতিবেদন, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৩১।
৪। তদেব
৫। পত্রিকা, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন।
৬। তদেব।
৭। স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজের সাক্ষাৎকার।
৮। স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজের সাক্ষাৎকার।

ভগৎ সিং-এর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা

প্রগতি মাইতি

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে একদিকে যেমন কংগ্রেস ছিল, আবার তেমনি কমিউনিস্টরা বা সোসালিস্টরাও ছিল। ভগৎ সিং সেই অর্থে ঐ রকম কোন সংগঠনের সাথে যুক্তনা থেকেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। আপোষহীন বিপ্লবী ধারায় বিশ্বাসীদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র তৎকালীন সময়ে এবং আজও যতটা আলোচিত, তার এক ভগ্নাবশেষও ভগৎ সিং আলোচিত নন। স্বল্প পরিসরের রাজনৈতিক জীবনে ভগৎ সিং যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন তা ইতিহাসে আজও ব্রাত্য। ১৯২৩ থেকে ১৯৩১, মাত্র আট বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক যুবক সমাজতন্ত্রের মত বিষয়ে যে সুচিন্তিত মতামত রেখেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। মৃত্যুর দিনটিতে এই বয়স ছিল ২৩ বছর ৫ মাস ২৫ দিন (ফাঁসি হয় ১৯৩১ সালের ২৩ শে মার্চ)। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে স্বাধীনতা আন্দোলনের মঞ্চ থেকে সে কমিউনিস্টরাই হোক বা সোসালিষ্ট-ভগৎ সিং-এর মত এত স্পষ্ট ভাষায়, উচ্চ কণ্ঠে কেউই সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন বলে মনে হয় না।

১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল সংসদ ভবনে বোমা ছোঁড়ায় ভগৎ সিং কে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভগৎ সিং ব্যাপক পড়াশোনা করছেন। কারাগারে এত অল্প দিনে এত বেশি বই কেউ পড়েছেন বলে জানা যায় না। তাঁর আত্মীয়দের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ছিল তাঁর পছন্দ মত বই-এর সরবরাহ চালিয়ে যাওয়া। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৪৩ তম (১৯৮২) সম্মেলন উপলক্ষে নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ও লাইব্রেরী এস. আর. বক্সীর লেখা 'গান্ধী ও ভগৎ সিং' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে ভগৎ সিং লাহোর সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালীন প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, সক্রেটিস, হব্স, মার্কস, মিল, এঙ্গেলস, লেনিন, মার্কটোয়েন, রবীন্দ্রনাথ, রুশো ও অন্যান্যদের বই লিখে পড়তেন। তাঁর এই লেখা গুলি থেকেও তাঁর সমাজতন্ত্রের প্রতি ঝোঁক ধরা পড়ে। তাঁর লেখা গুলির অন্যতম হল- সভ্যতার উন্নতি, রাষ্ট্র ও ধর্মের উৎপত্তি, শ্রমিকের অধিকার, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা, নৈতিকতা, ক্ষুধা, স্বাধীনতা, ভিক্ষা, স্বাধীন চিন্তা, শোষণ, নিপীড়ন, জেল শ্রমিকের মৃত্যু, ধনতন্ত্র, শ্রেণী ও বিপ্লব, গণতন্ত্র, নেতৃত্বের ধারণা, রাজনৈতিক বন্দী, শিশুদল, মার্কসবাদ বনাম সমাজতন্ত্র, আইনের প্রকারভেদ, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য, সাম্যবাদের ধারণা, রাজনৈতিক অপরাধ ও শাস্তি,

উৎপাদন ও বিতরণ, রাজার ঐশ্বরিক শক্তির তত্ত্ব, ফরাসী বিপ্লব, ভারত ও চীন, নগর ও গ্রামের সমস্যা ইত্যাদি।[১]

মূলত অনুশীলন সমিতির কয়েকজন সদস্য তাঁদের কর্মপদ্ধতিকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিতে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন ১৯২৪ সালে। শুরুতে যাঁরা যুক্তছিলেন তাঁরা হলেন - শচীন সান্যাল, প্রতুল গাঙ্গুলী, নরেন্দ্রমোহন সেন, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। পরে যুক্ত হয়েছিলেন-যোগেশ চ্যাটার্জী, রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা, রাজেন লাহিড়ী, বনওয়ারীলাল, বিষ্ণুচরণ দুবলিশ, চন্দ্রশেখর আজ্জাদ, মন্মথ গুপ্ত, গোবিন্দচরণ কর প্রমুখ। যোগেশ চ্যাটার্জী ও শচীন সান্যালের উদ্যোগে ভগৎ সিং এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ভগৎ সিং এই সংগঠনের অন্যতম নেতৃত্বের পর্যায়ে ছিলেন, ১৯২৮ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর, ভগৎ সিং-এর ইচ্ছায় 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন'-এর নাম পরিবর্তন করে 'হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন' রাখা হয়েছিল।[২] এখান থেকেও ভগৎ সিং এর সমাজতন্ত্রের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ মেলে।

লেনিন বলেছিলেন-আজকের যুগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত না হলে তা সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটানোর আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। উৎপাদনের মধ্যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের মার্কসীয় ব্যাখ্যাও ভগৎ সিং সমর্থন করতেন। ভগৎ সিং-এর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি এবং শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কে তাঁর বোধ লক্ষ্য করা যায় ১৯২৯ সালের ৬ই জুন দিল্লী সেসন জজের আদালতে তাঁর দেওয়া বিবৃতি থেকে। ঐ বিবৃতির নির্বাচিত অংশ হলো-'উৎপাদন যারা করেন অর্থাৎ শ্রমিক মানব সমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অথচ শোষক শ্রেণী তাদের শ্রমের ন্যায্য মূল্য এবং মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

...অন্যদিকে পুঁজিপতি, শোষক, সমাজে যারা ঘুন পোকার অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে আছে, তারা নিজেদের লিপ্সা চরিতার্থ করতে কোটি কোটি টাকা জলের মত খরচ করছে। এই ভয়ংকর বৈষম্য এবং আত্ম বিকাশের অধিকারের ক্ষেত্রে মিথ্যা সমানাধিকারের বাণী সমাজকে এক মাৎস্যন্যায়ের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতি কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। ...যদি সময় থাকতে মানব সভ্যতার কাঠামাকে রক্ষা করা না যায়, তবে তা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এই জন্যেই বিপ্লব অত্যাবশ্যক। যারা এই প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেন তাঁদের কর্তব্য হল মানব সমাজকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করা। যতদিন না তা করা যাবে, যতদিন মানুষের শোষণ, এক রাষ্ট্রের দ্বারা অপর রাষ্ট্র শোষণ-যাকে আমরা সাম্রাজ্যবাদ বলি, তা বজায় থাকবে, ততদিন এর থেকে উদ্ভুত যন্ত্রণা এবং অপমান থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা যাবে না। ...বিপ্লব আমরা চাই অন্তত: এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যেখানে এরকম প্রাণঘাতী বিপদের সম্মুখীন হতে হবে না, এবং যেখানে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এরফলে বিশ্বমানব সমাজকে পুঁজিবাদের শৃঙ্খল এবং যুদ্ধের সর্বনাশা সংকট থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।'[৩] সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এত স্পষ্ট ধারণা ঐ সময়ে আর

কোনও বিপ্লবীর কন্ঠে শোনা গিয়েছিল কি ?

বিপ্লবী কর্মী ও সংগঠন গড়ে তোলা প্রসঙ্গে তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি তার আহ্বান থেকে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থা (এবং সরাসরি তা মার্ক্সবাদী পথেই) লক্ষ্য করার মতো। তিনি বলেছিলেন-'বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজপদ্ধতি এবং শাসন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ....বাস্তবতঃ রাষ্ট্র এবং সরকারী প্রশাসন শাসক শ্রেণীর একটি হাতিয়ার, যা দিয়ে সে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে, নিজের স্বার্থকে রক্ষা করে। আমরা এই ক্ষমতা ছিনিয়ে এনে সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মার্কসবাদের চিন্তা অনুযায়ী নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চাই।'[৪] তাহলে দেখা যাচ্ছে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শাসন ব্যবস্থা ও সমাজ পদ্ধতির পরিবর্তন করার সাথে সাথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'মার্কসবাদী চিন্তা'-র আশ্রয় নেওয়ার কথা ভগৎ সিং জোর গলায় প্রচার করেছেন।

রাষ্ট্র সম্পর্কে ভগৎ সিং-এর ব্যাখ্যা, সংসদ সম্পর্কে লেনিনের ব্যাখ্যার সাথে একমত হওয়া-এসব কিছুই তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পরিপূরক মতামত। রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর মতামত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। রাষ্ট্রর উৎপত্তির ইতিহাসের লেনিনীয় ব্যাখ্যাই তিনি তুলে ধরেছেন। সংসদকে 'শূয়োরের খোঁয়াড়'-এর লেনিনীয় মন্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় ভগৎ সিং-এর কন্ঠে। তিনি বলেছিলেন-'....সংসদ শোষকশ্রেণীর মদতদার অসহায় শ্রমিকদের পরাধীনতার এক বীভৎস স্মারকমাত্র।'[৫]

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক (বিশেষত বামপন্থী) মহলে সাম্রাজ্যবাদ একটি অন্যতম 'ইস্যু'। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র, তার বিপদ-কেও বুঝতে হবে। আজ থেকে ৭০ বছর আগে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ভগৎ সিং-এর ব্যাখ্যা এবং আর বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারী আজও শিক্ষণীয়। তাঁর কথায়-'যতদিন মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ, এক রাষ্ট্রের দ্বারা অপর রাষ্ট্রের শোষণ-যাকে আমরা সাম্রাজ্যবাদ বলি, তা বজায় থাকবে, ততদিন এর থেকে উদ্ভূত যন্ত্রণা এবং অপমান থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা যাবে না।' এছাড়াও তিনি বলেছিলেন-'সাম্রাজ্যবাদ হল লুটের উদ্দেশ্যে সংগঠিত এক বিরাট ষড়যন্ত্র। মানুষ কর্তৃক মানুষের এক জাতির দ্বারা অপর জাতির সুচতুর শোষণের যে প্রক্রিয়া, সাম্রাজ্যবাদ হল তার সর্বোচ্চ ও শেষ পর্যায়।'[৬] যে সময়ে ভগৎ সিং এই মন্তব্য করেছিলেন তখন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ছিল-'ভূমি ক্ষুধা' কিংবা 'অপর রাষ্ট্র দখল।' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন থেকে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সুদূর প্রসারী ব্যাখ্যা যা আজও কার্যত আধুনিক ব্যাখ্যা। 'ষড়যন্ত্র', 'প্রক্রিয়া'-এই দুটি শব্দ প্রয়োগের দ্বারা ভগৎ সিং তাঁর দূরদৃষ্টি চিন্তায় এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। ফলত: এখন আর সাম্রাজ্যবাদের অপর রাষ্ট্র সরাসরি দখল করার প্রয়োজন হয় না। উদার অর্থনীতি বা বাজার অর্থনীতির প্রভাবে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব এখন রান্নাঘর পর্যন্ত বিস্তৃত। সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি তার সুচতুর 'ষড়যন্ত্র'-এর বিষময় প্রভাব সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে বিপথে পরিচালিত করতে অনেকাংশেই সফল। এক্ষেত্রেও ভগৎ সিং-এর সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত ধারণার স্বচ্ছতা এক আধুনিকতা লক্ষ্য করা গেল।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে কংগ্রেস নেতৃত্ব এদেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার কথা

বলেছিলেন। কংগ্রেসের সমাজবাদ (আসলে সমাজতন্ত্র) অর্থনীতির ধীরে ধীরে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ঘটানো শ্রেণী সংগ্রাম-এর অস্তিত্বকে কংগ্রেস তৎকালীন সময়ে কিংবা আজও স্বীকার করেন না। শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করানোর বিপক্ষে কংগ্রেস। এ প্রসঙ্গে গান্ধীজীর বক্তব্য ছিল-'শ্রমিকদের আমরা কাজে লাগাতে পারি না। কারখানার সর্বহারা শ্রেণীকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।'[৭] গান্ধীজী যেখানে 'অত্যন্ত বিপজ্জনক' মনে করেন সেখানে ভগৎ সিং বলেছিলেন-'কলকারখানার মজুর আর ক্ষেত খামারের কৃষকরাই বিপ্লবী সংগ্রামের প্রকৃত সৈনিক। কিন্তু আমাদের বুর্জোয়া নেতারা শ্রমিক কৃষকদের সংগ্রাম যুক্ত করতে চান না অথবা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাবে বলে ভয় পান। তাঁরা ভয় পান, তাঁরা ভাবেন, সুপ্ত সিংহ-কে যদি তারা একবার জাগিয়ে তোলেন তাহলে তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে।'[৮] ভগৎ সিং-এর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। এই ধারণা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শের অনুকূলে। তাই বিপ্লব সম্পর্কে ভগৎ সিং-এর চিন্তা-ভাবনা, আর সমাজতন্ত্রের ধারণা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন সময়ে বিপ্লব সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্যগুলি অত্যন্ত প্রামাণিকভাবে তুলে ধরা আবশ্যক। '...অন্যায়ের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করার জন্যই বিপ্লব আমাদের চাই। ...বিপ্লব আমরা চাই অন্তত: এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যেখানে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এরফলে বিশ্বমানবসমাজকে পুঁজিবাদের শৃঙ্খল এবং যুদ্ধের সর্বনাশা সংকট থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। ...আমরা যে বিপ্লবের কথা বলি তার অর্থ হল পুঁজিবাদী শোষণের যন্ত্রণার অবসান ঘটানো। ...বিপ্লব মানবজাতির জন্মগত অধিকার যা কোন অবস্থাতেই অপহৃত হতে দেওয়া যায় না। ...বিপ্লবের মধ্য দিয়েই দেশে দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসবে।...বিপ্লব শব্দটির তাৎপর্য সুমহান। এ শব্দটিকে যেমন তেমন করে ব্যবহার করতে বা অপব্যবহার করতে দিতে আমরা পারি না।'[৯]

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের চরিত্র দেখে ভগৎ সিং যথাযথই বুঝতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র বৃটিশ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের স্বার্থে গান্ধীজীকে সামনে রেখে ক্ষমতা দখল করবে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানাকে স্থায়ী ও নিশ্চিত করবে। কার্যত হয়েছেও তাই। এ প্রসঙ্গে ভগৎ সিং বলেছিলেন-'আমরা চাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ..রাজনৈতিক বিপ্লব মানে শুধুমাত্র ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে রাষ্ট্র (অর্থাৎ ক্ষমতা) হস্তান্তর করা বোঝায় না। ...জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে বিপ্লবী দলের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আসা চাই। তারপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে গোটা সমাজকে পুনগঠিত করার পথে সংগঠিতভাবে আমাদের এগোতে হবে।'[১০] লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার পর ভগৎ সিং আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অস্বীকার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মামলার প্রথম দিন ট্রাইবুনালের সামনে যে বিবৃতি দেওয়া হয় তা ভগৎ সিং-এর লেখা। প্রসঙ্গত ট্রাইবুনাল ঐ বিবৃতিকে রাজদ্রোহমূলক ও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে এবং এটি নথিভুক্তকরেন নি। ঐ বিবৃতিতে ভগৎ সিং উচ্চ কণ্ঠে স্বাধীনতা আসলে যে কি তা যেমন বোঝাতে চেয়েছিলেন, আবার তেমনি সমাজতন্ত্রের কথাও প্রাসঙ্গিক ক্রমে বলতে ভুল

করেননি। তাঁর বক্তব্যেব নির্বাচিত অংশ এরকম-'আমরা পরিবর্তন চাই। সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রে বর্তমান যে ব্যবস্থা চলছে তাকে আমূল বদলে ফেলে এমন এক নবীন সমাজ আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই যেখানে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের সম্ভাবনা থাকবে না এবং সর্বক্ষেত্রে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যাবে। আমরা মনে করি, গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে বদলে ফেলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যদি না যায় তবে মানবসভ্যতার পরিণতি বড় ভয়ানক।'[১১] ভগৎ সিং-এর মতে মানুষের 'পূর্ণ স্বাধীনতা' সমাজতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। শুধুমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারা মানুষের সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জিত হয় না, তার জন্য বিপ্লবী পথে সমাজতন্ত্র প্রাতিষ্ঠা করতে হয়। আবার এই বিপ্লব তাঁর কথায় 'সর্বহারার স্বার্থে সর্বহারাদের নিজস্ব বিপ্লব।'

তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য আগেও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে। তৎকালীন সময়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে আন্দোলন চলছিল এবং আজও স্বাধীনোত্তর ভারতের আন্দোলন যেভাবে চলছে তাতে তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে ভগৎ সিং-এর বক্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক। তাঁর কথায়-'বর্তমান আন্দোলন মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী শ্রেণী আর মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।'[১২] তাই তিনি বার বার শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপর জোর দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতা গড়ে তোলার উপরও তিনি গুরুত্ব দিতে ভুলে যাননি। তাঁর নির্দেশিকার ঐ পথ এখনও এদেশের কমিউনিষ্ট দলগুলির কর্মসূচীর মধ্যে দেখা যায়। তরুণ কর্মীদের তিনি উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন-'...কেবল জাতীয় রাজনীতি সম্বন্ধেই নয়, শ্রেণী সচেতন রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার জন্য ব্যাপকভাবে পত্রপত্রিকা প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে...(এখানে কিছু শব্দ পাওয়া যায়নি-অনুবাদক) সমাজান্ত্রিক তত্ত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় পত্র-পত্রিকা ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।'[১৩]

বিপ্লবী কর্মকান্ডের সাথে যারা যুক্ত থাকেন এবং যাদের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাদের কাছে ধর্ম কিংবা ঈশ্বর বিশ্বাস-কোনটাই চলে না। 'ধর্ম' যে জনগণের কাছে 'আফিম' স্বরূপ-এই তত্ত্বের সাথে ভগৎ সিং পুরোপুরি একমত ছিলেন। তিনি নিজেকে 'নাস্তিক' বলে মনে করতেন। 'আমি নিজেকে একজন বাস্তববাদী, যুক্তিবিজ্ঞানই আমার একমাত্র হাতিয়ার, তাই দিয়েই আমার ভিতরকার প্রবৃত্তি জয় করতে চাই।'[১৪] -এভাবেই তিনি তাঁর ঈশ্বর চিন্তার বিপরীত যুক্তি খাড়া করেছেন। ধর্ম এবং ঈশ্বর সম্পর্কে বলতে গিয়েও তিনি রসিকতা করে ঈশ্বরকে কিংবা ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের সমালোচনা করার সাথে সাথে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সমাজতন্ত্রের কথাও উল্লেখ করেন। ১৯৩০-৩১ সালে জেলে থাকাকালীন তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে লেখা তাঁর "আমি নিরিশ্বরবাদী কেন ?" বইটি অনেকেরই জানা। ঐ বইতে তিনি উল্লেখ করেছেন-'কেন তিনি (ঈশ্বর) পুঁজিপতিদের মনে পরোপকারের প্রেরণা সৃষ্টি করেন না, যাতে তারা উৎপাদন যন্ত্রের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ভোগ করার মানসিকতা পরিত্যাগ করে সমগ্র শ্রমজীবী মানুষ সহ গোটা মানব সমাজকে পুঁজিব শাসন থেকে মুক্ত করে দেয় ? সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের বাস্তব উপযোগিতা নিয়ে আপনারা তো যুক্তিতর্ক করেন। এর ভার আমি সর্বশক্তিমানের

হাতে ছেড়ে দিলাম। জনসাধারণের কল্যাণের প্রশ্নে মানুষ সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন। কিন্তু প্রয়োগের প্রশ্নে এ তত্ত্ব খুব বাস্তবসম্মত নয়-এই অজুহাতে তাঁরা অনেকে এর বিরোধিতা করেন। তাই সর্বশক্তিমানের কাছে আবেদন করুন, এই দুরূহ কাজটা সমাধানের দায়িত্ব তিনি নিজে নিন। কিন্তু উল্টোপাল্টা যুক্তি তুলবেন না, তুললেও একথা আর চলবে না।'[১৫]

স্বল্প পরিসরের আলোচনায় মোটামুটি দেখা গেল ভগৎ সিং এমন এক ব্যাতিক্রমী চরিত্র এবং একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি জোরের সাথে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। পরিশেষে একথাও উল্লেখ করা আবশ্যক ভগৎ সিং লেনিনের পথকে অনুসরণ করার কথা বলেছেন। এমনকি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল, তাঁর নিজেরই ভাষায়-'আমি মহামতি লেনিনের আত্মজীবনী গ্রন্থখানি চাই, আর মৃত্যুর আগে ওটা শেষ করে যেতে চাই। এটা আমার শেষ ইচ্ছা।'[১৬] এছাড়াও তিনি বলেছিলেন-'..আমি দুনিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস ও তার আদর্শবাদ চর্চা করেছি। ...সাম্যবাদের জনক মার্কস চর্চা করেছি, লেনিনকে জানার চেষ্টা করেছি, টলস্টয় এবং অন্যান্য যাঁরা সফলতার সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেনে, তাদের জানার চেষ্টা করেছি।"[১৭] লেনিনের কথা এবং বলশেভিকদের কথা তিনি তাঁর রাজনৈতিক যুবক কর্মীদের শুনিয়ে তাঁদের উদ্বুদ্ধ ও করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি খোলাখুলি বলেও ফেললেন-'বিপ্লবের রণনীতি এবং রণকৌশল উপলব্ধি করতে হলে লেনিনের জীবন সংগ্রামকে ভালোভাবে জানতে হবে। আপসের প্রয়োজনীয়তা ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে লেনিনের সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারা তাঁর লেফট উইং কমিউনিজম বইটিতে পাওয়া যাবে।'[১৮]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে বলিষ্ঠ স্ফুলিঙ্গ ভগৎ সিং-এর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা আজকের দিনের বিপ্লবী কর্মীদের অনুপ্রেরণা ও পথনির্দেশ হিসেবে ব্যবহৃত হলে তবেই ভগৎ সিং-এর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে।

সূত্র নির্দেশ

১। প্রসিডিংস অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস ৪৩ তম অধিবেশন (১৯৮২)।
২। ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়ঃ শৈলেশ দে
৩। রৈবতক, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৯১
৪। ঐ
৫। সূত্রঃ শহিদ ভগৎ সিং : প্রগতি মাইতি (এই প্রবন্ধের লেখক)।
৬। ঐ
৭। দ্য টাইমস্, মে, ১৯২১
৮। ভগৎ সিং রচনা সংগ্রহ : সম্পাদনা - মানিক মুখোপাধ্যায়
৯। ঐ
১০। ঐ
১১। ঐ
১২। ঐ
১৩। ঐ
১৪। কেন আমি নাস্তিকঃ ভগৎ সিং (অনুবাদ: অশোক রায়)
১৫। ঐ
১৬। ঐ
১৭। ঐ
১৮। ঐ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারতের জাগ্রত বিবেক :
মডার্ন রিভিউ এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

চৈতালী চৌধুরী

"Civilisation has not yet enabled men to settle international disputes or keep the wickedly ambitious under restraint except by bloody warfare involvng the death of million and untold sufferings for more."- Ramananda Chatterjee.[1]

১৯১৪ সালে সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সূত্রপাত ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। সুদীর্ঘ চারবছর ধরে চলা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ছিলো বিশ্বের ৬৫ কোটি মানুষ। ১৫৬৫ দিনের এই ক্লান্ত রণাঙ্গণে অংশগ্রহণকারী প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন প্রাণ দিয়েছিলো। এই যুদ্ধ তার প্রভাব বিস্তার করে সমগ্র বিশ্বজুড়ে। ভারতবর্ষকেও মিত্র পক্ষের অর্ন্তগত একটি যুদ্ধরত দেশ হিসাবে ঘোষণা করা হয় কারণ সেই সময়ে ভারত ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ।

ভারতে এই যুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা আলোকপাত করেছেন, এক্ষেত্রে সেই আলোচনার পুনরাবৃত্তি না করে নুতন একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করছি : তা হোল প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের এবং সাময়িকপত্রের ভূমিকা। এক্ষেত্রে আলোচ্য অংশটি হল বাংলা সাংবাদিকতা এবং মূল বিষয়টি হল মডার্ণ রিভিউ এবং তার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

জন্মলগ্ন থেকে বাংলার সাময়িকপত্র আধুনিক সাহিত্যের ধারক ও বাহকের কাজ করেছে সাংবাদিকতার ইতিহাসকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সূচনা থেকেই ভারতীয়রা ইতিবাচক অগ্রগতির জন্যই সংবাদপত্রকে ব্যবহার করেছে। এই সাময়িকপত্র সম্পাদনার পরিমণ্ডলে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখনীর আবেদন ছিল সর্বভারতীয়। কংগ্রেস যখন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসএর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেবলমাত্র স্বায়ত্বশাসনের দাবী করেই নিশ্চেষ্ট ছিল, তখন তিনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য যে পূর্ণ স্বাধীনতা তা তাঁর লেখনীতে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ব্যক্ত করতে থাকেন। তাঁর প্রতিভার শতমুখী বিচ্ছুরণ আমরা তৎকালীন এবং পরবর্তীকালের বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে জানতে পারি। যোগেশ চন্দ্র বাগল বলেছেন যে তাঁর (রামানন্দ) মত নির্ভীক সদাজাগ্রত সাংবাদিক বিরল। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "...বঙ্গদর্শন, ভারতী প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের লব্ধ প্রতিষ্ঠ পত্রিকার পরে রামানন্দ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ-র যুগই চলিয়া আসিয়াছে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়....।"[2]

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারতবর্ষও যুদ্ধরত দেশ হিসাবে ঘোষিত হলেও ভারতীয়দের এই অংশগ্রহণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল না। সেই অর্থে জার্মানীর বিরুদ্ধে ভারতীয়দের কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট অভিযোগও ছিল না,-"There is so little social intercourse between the British officials and the Indian people that the suggestion of strong loyalty to the cause of the Empite did not arise."[৩] উল্লেখ্য তৎকালীন ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ইংলন্ডের বিজয় কামনা করে মিত্রপক্ষের সমর্থনে এগিয়ে আসে। মহাত্মাগান্ধীর মত নেতাও ইংলন্ডের জন্য সৈন্য ও রসদ সংগ্রহ করতে প্রকাশ্যে আহ্বান জানান। তিলক যিনি দীর্ঘ ছয় বছর ব্রিটিশ কারাগারে বন্দী ছিলেন, তিনিও বলেন, "at such a cirsis (war) it is the duty of every Indian....to support and assist the Majesty's Govt. to the best of his ability" (১৬ই জুন ১৯১৪)।

এই সময়েই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসের মূল স্রোতের পাশাপাশি অন্য একটি ধারায় আমরা পাই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে। এই আন্দোলনকারীরা, চেয়েছিলেন রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে। কিন্তু এই "revolutionary terrorism"-এর যুগের স্থায়িত্ব ছিলনা বললেই চলে। ১৯০৮-১৮ এর মধ্যে প্রায় ১৮৬ জন সন্ত্রাসবাদী মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু বিদ্রোহের জনভিত্তি সুদৃঢ় না থাকায় তারা অভিষ্ট সাফল্য লাভ করতে পারেনি। কিন্তু "they gave us back the pride of our manhood."[৪] কিন্তু ভারতের বিপ্লববাদ স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশাল ক্যানভাসে আশ্চর্য রঙয়ের ছোঁয়া রেখে গেছে।

ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা ভেবেছিলেন ইংলন্ডকে নিঃশর্তভাবে সহায়তা করার বিনিময়ে তারা আত্মশাসন বা স্বায়ত্বশাসন অর্জন করতে পারবে এবং যুদ্ধ শেষ হলে ব্রিটিশ গর্ভনমেন্ট ভারতের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে কিছু "concession" দেবে।

ভারতীয় নেতারা ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন বলে বর্তমানকে তারা প্রথমে বুঝতে পারেননি। যুদ্ধ শুরু হলে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভয়াবহ চরিত্র নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯১৪-১৮ সালের মধ্যে ভারতবাসী ব্রিটিশ সামরিক ও ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ ও লুন্ঠনের শিকার হয়।

সাধারণ মানুষের কাছে 'যুদ্ধ' এই ঘটনাটি কিরূপ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, তার কিছুটা প্রতিফলন আমরা সমসাময়িক পত্রপত্রিকাগুলির মাধ্যমে পেতে পারি। যদিও সেই সময়ে বিভিন্ন প্রেস আইনের মাধ্যমে দেশীয় সংবাদ পত্রপত্রিকার কন্ঠরোধ করা হয়েছিল, তবুও তারই মধ্যে কিছু কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন মানুষ কলম নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। একথা অনেকেই জানেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলার সাহিত্য ও সাময়িকপত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। যুদ্ধ পরবর্তীকালের পত্রপত্রিকায় রণক্লান্ত ইউরোপের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নতুন ভাবনার স্রোত বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। আসলে "এ এমন এক যুদ্ধ যা উপনিবেশের স্বার্থে লড়া হচ্ছে না, উপনিবেশ লড়ছে না কিন্তু উপনিবেশের স্বার্থের বিনিময়ে লড়া হচ্ছে। এই যুদ্ধ প্রথম উপনিবেশের ও নির্যাতিত দেশের মানুষগুলিকে আর্ন্তজাতিক

ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে টেনে আনছে (লেনিন)।" এই যুদ্ধ আমাদের চিন্তাভাবনার জগৎটারে রাজনৈতিক সচেতনাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তোলে। সাংবাদিকতার উপর এর প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল।

সেই যুগের, বিশেষত: প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের মধ্যে দুটি সাময়িকপত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুটি পত্রিকা হল মর্ডাণ রিভিউ এবং প্রবাসী। প্রসঙ্গত এ দুটিরই সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যিনি যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তী ভারতীয় সাংবাদিকতায় মৌলিকতার পরিচয় রেখেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে ১৯১৪-১৮ এই বছরগুলি ছিল ইতিহাসের এক পট পরিবর্তনের কাল যার প্রবহমান প্রতিচ্ছবি, সমকালীন ঘটনাচক্র ও আগামী দিনের ইঙ্গিত এসবরেই স্বরূপ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছিলো মডার্ন রিভিউ। সাংগঠনিক রাজীতির পরিচয় দিয়েছিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসী। মডার্ন রিভিউ-এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল 'NOTES'-যা স্বয়ং রামানন্দ লিখতেন এবং এই শিরোনামে তৎকালীন ঘটনাবলী ও তাদের বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাত সে যুগের ইতিহাস রচনার উল্লেখযোগ্য দলিল। পত্রিকাটিকে ঘিরে আধুনিক চিন্তাধারার বিকাশ, তার মূল্যায়ন ও তার নানা অভিঘাত আমাদের পূর্ণমূল্যায়নে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য করে।

ব্রাহ্ম সমাজের ছাত্র হিসাবে "Indian Messenger"-এর সহযোগী সম্পাদক রূপে রামানন্দের সম্পাদক জীবনের সূত্রপাত। ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয় প্রবাসী এবং ১৯০৭-এর জানুয়ারী মাসে আত্মপ্রকাশ করে মডার্ন রিভিউ। এই দুটি পত্রিকা আন্তর্জাতিকতা সচেতন স্বদেশপ্রেমিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানবতাবাদী রামানন্দের বহু কর্মকান্ডের মধ্যেও চিরোজ্জ্বল দুটি স্থায়ী কীর্তি হিসাবে দেখা হয়।

মহাযুদ্ধকালীন ভারতবর্ষে, ইংরাজ বিরোধী কোন রচনার প্রকাশ কখনোই সম্ভবপর ছিল না। সাধারণভাবে যুদ্ধবিরোধী যা পরোক্ষভাবে ইংরাজবিরোধী এমন লেখা আমরা তৎকালীন সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্র গুলিতে প্রায় দেখতেই পাই না। মর্ডান রিভিউ-এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেখকেরা এবং স্বয়ং রামানন্দ চেষ্টা করেছিলেন সেই সময়কার পরিস্থিতির এর মধ্য থেকেই। যুদ্ধ যে সাম্রাজ্যবাদেরই ফলাফল এই মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় এই মডার্ন রিভিউ-এ। রামানন্দ ছিলেন একজন বিশ্লেষক যিনি যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফলাফল, এর প্রভাব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এই যুদ্ধ যে ভারতের সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দিয়েছিল তা বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রামানন্দ বিশ্বাস করতেন, একজন সাংবাদিকের এই সমাজকে কিছু দেওয়ার, জনসাধারণকে সঠিক পথ নির্দেশ করে দেওয়ার দায়িত্ব আছে ("...Journalism plays a very useful part in society": Ramananda, Modern Review, Sept. 1925)[৫]। তিনি মনে করতেন, রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে সাংবাদিকরা কিছু বলতে পারেন না। সেই কারণে যখন ভবিষ্যতে কবে স্বায়ত্বশাসন পাওয়া যাবে এবং আদৌ তা অর্জন করা যাবে কিনা এই ভেবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিঃস্বার্থভাবে ব্রিটেনের পক্ষে রসদ ও সৈন্য সংগ্রহে নিয়োজিত ছিলেন। মডার্ন রিভিউ সেই সময়ে চোখে

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে যুদ্ধ কিভাবে ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে অবক্ষয়ের সূচনা করছে। বাস্তবাদী রামানন্দ বলেন যে অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি যেখানে এই অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে নিজ নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজেদের দাবীগুলি ব্রিটিশ গর্ভনমেন্টের কাছে রাখছে, তখন ভারতেরও উচিত সেই পথ অবলম্বন করা।

রামানন্দ সেই অর্থে কোন সক্রিয় রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে যুদ্ধের নেতিবাচক দিকটিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এই কাজে তিনি সহায়তা পান রবীন্দ্রনাথের। তাঁর যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধাবলী যেগুলি আমেরিকান ও ইউরোপীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি তিনি তাঁর পত্রিকায় reprint করেছেন। এই পত্রিকাই টলষ্টয় ও রোমাঁ রোলাঁকে ভারতীয়দের কাছে পরিচিত করে তোলে। কার্ল লেবনেষ্ট সম্ভবত সর্বপ্রথম এই পত্রিকার মাধ্যমেই এদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।[৮]

মডার্ন রিভিউ-এর মাধ্যমে পাঠকেরা ইউরোপ ও আমেরিকাতে যুদ্ধবাদী দল এবং শান্তিকামী দলের মধ্যে প্রচলিত তর্কবিতর্ক সম্পর্কে অবহিত হতেন। আসলেন মডার্ন রিভিউ-এর মধ্যে একটি আদর্শ সাময়িকপত্র হয়ে ওঠার সব গুণগুলিই ছিল। পরিবেশনার পারিপাট্যে সাম্প্রতিকতম খবরের দ্বারা সজ্জিত নবতম আঙ্গিকের সমাহারে প্রকাশিত হত এই পত্রিকা। এই কারণেই যদুনাথ সরকারের উক্তিটি খুবই প্রাসঙ্গিক-"He (Ramananda) was heard with attention in every country where reason and humanity were honoured by its thinkers." রামানন্দ ছিলেন সেইসব সাংবাদিকদের একজন যাঁরা সেই ঘটনার আবর্তে থেকেও নিজেদের লেখনীর মাধ্যমে ভারতের আপামর জনসাধারণকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন যাতে তারা নিজের অধিকার সম্পর্কে ও দেশের স্বাধীনতা অর্জনের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

অবশ্য সাম্প্রতিককালের সাংবাদিকতা বাণিজ্যিক মানদণ্ডে নির্ধারিত ব্যবসায়িক মাধ্যম হয়ে ওঠায় এটি এখন মানুষকে শিক্ষিত করার পরিবর্তে তার সামগ্রিক মনোরঞ্জন করতেই সদাপ্রবৃত্ত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বারা আমরা এমনভাবে আক্রান্ত হয়েছিলাম যে সেই সময়কার প্রায় সমস্ত পত্রপত্রিকার সমগ্র পাতাজুড়েই অবস্থান করছিল এই যুদ্ধ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী। দেশীয় অর্থনীতি, সমাজনীতি, জনস্বাস্থ্য সবই চাপা পড়ে গিয়েছিল যুদ্ধের তলায়। মডার্ন রিভিউ অথবা প্রবাসী-এ দুটির কোনটাই এর ব্যতিক্রম ছিল না, কিন্তু কখনোই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলিকে বাদ দিয়ে আলোচনা হয় নি। যুদ্ধ—সমাজ, অর্থনীতি, এমনকি সাহিত্যকেও কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, তার এক পরিচ্ছন্ন প্রতিচ্ছবি প্রায় প্রতিটি সংখ্যাতেই আমরা খুঁজে পাই।

Notes :

1. Indian Trade and War : P. 608, MR-14 "As an inevitable happning the trade of India both import and export has been materially affected by the war."
2. War and Literature : p. 498, MR-1914

"The war has made its demoniac influence felt everywhere. Not even is the ethemal atmosphere of literature immune from its demoralising effect."

3. Indian Industries and war : V-I, 1916
"In a poor country like india...It is expected of statesman and politicians that they would devote at least as much energy to the ..administration."

4. Bengal Weavers and their industry : V-2. P-37, MR-1918
".....The surviving industry (handloom) is now seriously threatened by the existing war condition."

১৯১৪-১৮ এই চারটি বছর আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যুদ্ধ-এমন এক যুদ্ধ যা সর্বপ্রথম ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বজুড়ে। যুদ্ধে শুধুমাত্র কত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে অথবা আহত বা নিহত সৈন্যের সংখ্যা কত তার পরিসংখ্যানই নয় যুদ্ধের যে সর্বগ্রাসী প্রভাব-তাও তাঁর নজর এড়ায়নি। এটা যে কোন mature journalist -এরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

একজন আদর্শ সাংবাদিক তখনই হতে পারে যখন সে প্রত্যেকটি তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনাকেও অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারে, পারে তার মূল্যায়ন করতে। সাধারণ মানুষ খোলাচোখে যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, সাংবাদিকদের কাজ হলো অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে তাকে দেখা। এই দূরদর্শন গভীরভাবে বিশ্লেষণকারী মন আমরা তাঁর মধ্যে খুঁজে পাই। রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসাবে রামানন্দের যে মান, আজও যে কোন সাংবাদিকের কাছে তা দিশারী হতে পারে।

মর্ডাণ রিভিউ এই নামটির মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে এই গভীর অর্থ। 'Modern' এবং 'Review' এই শব্দ দুটি কেবল শব্দই নয় এর প্রত্যেকটি বহন করছে নিজস্ব অর্থ। "Modern" অর্থাৎ আধুনিক-যে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আধুনিক মনস্কতা আমরা আবিষ্কার করি এর প্রতিটি রচনার প্রতিটি ছত্রে। আর "review" কথাটি শুধু একটি শব্দই নয় এর মাধ্যমে আমরা ঔপনিবেশিক ভারতের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবিকে প্রতিফলিত করে তুলতে ঘটনাকে বৃহৎ পরিসরে বিচার করতে দেখি। ঘটনাকে কোন বিচ্ছিন্নভাবে নয়, আধুনিক অগ্রগামী মানসিকতার মাধ্যমে সেই ঘটনাকে সামগ্রিকতায় ধরা, তাকে বিচার পুর্নবিচার করাই হল সাংবাদিকের কাজ, যা 'মডার্ণ রিভিউ'-এর বিভিন্ন সাংবাদিকের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই। বৌদ্ধিকতার মাধ্যমে সাংবাদিকতাকে সমৃদ্ধ করার যে প্রচেষ্টা রামানন্দ এবং তাঁর সহ-সাংবাদিকেরা করেছিলেন তা আমাদের কাছে দিক্‌নির্দেশিকা হয়ে থাকবে।

এই ভূমিকাই 'মডার্ণ রিভিউ' কে তৎকালীন সমাজের জাগ্রত বিবেকে পরিণত করেছিল। বৌদ্ধিক চর্চার মাধ্যমে সাংবাদিকতা কি ধরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এ প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহে মডার্ণ রিভিউ কে 'Role Model' বললেও নিশ্চয়ই অত্যুক্তিকরা হয় না। এখানেই মডার্ণ রিভিউ সার্থক এবং কালোত্তীর্ণ। আর অবশ্যই এই সার্থকতার দিশারীর নাম রামানন্দ চ্যাটার্জী।

সূত্র নির্দেশঃ

১। মডার্ণ রিভিউ, ১৯১৮, খণ্ড - ২
২। মঞ্জুশ্রী দাস সামন্ত, 'প্রবাসী ও রবীন্দ্রনাথ', কলকাতা পৃ:-২৬
৩। মর্ডাণ রিভিউ, ১৯১৫, ফেব্রুয়ারী।
৪। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম
৫। রামানন্দ চ্যাটার্জ্জী, সিলেক্টিভ রাইটিংস এ্যাণ্ড ট্রিবিউট্স - (বার্থ সেন্টেনারী ভল্যুম)
৬। ক) এ্যাবভ দ্য ব্যাটলফিল্ড : রোঁমা রোঁলা মর্ডাণ রিভিউ, ১৯১৫, পৃ: ২১৯
খ) ব্রেভেস্ট ম্যান ইন ইউরোপ (কার্ল লেবেনেস্ট) - মর্ডাণ রিভিউ ১৯১৫, পৃ: ৫৪১, নোটস্
৭। রামানন্দ চ্যাটার্জ্জী; পূর্বোল্লিখিত।

চিত্তরঞ্জনের রাষ্টদর্শন ও সমাজচিন্তা

মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়

জীবন সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার ও ব্যাপক। ১৯১৭ সালে ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, 'সমগ্র জীবনটাকে টুকরো টুকরো করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনের স্বভাব বিরুদ্ধ। আমরা ইউরোপ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি এবং এই ধার-করা জিনিস ভাল করিয়া বুঝি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। ...কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পারে আমাদের জাতীয় জীবনের কোন অংশটা সমাজনীতির প্রাণ, আর কোন অংশটা ধর্মসাধনার বস্তু?'[১] ২৪পরগণা জেলা সম্মিলনীর বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি একই কথা বলেছিলেন, 'ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।'[২] চিত্তরঞ্জনের মতে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনকে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে এবং তবেই সত্যের সন্ধান সম্ভব। চিত্তরঞ্জন মানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের কল্যাণই মানব সেবার মর্মকথা এবং এই আদর্শকে সার্থক রূপ দেবার জন্য প্রয়োজন জাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ। চিত্তরঞ্জনের জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রদর্শনে এই ভাবনার প্রতিফলন ছিল।

গয়া কংগ্রেসে (১৯২২) সভাপতির ভাষণে চিত্তরঞ্জনের রাষ্ট্রচিন্তার মূল তত্ত্ব পাওয়া যায়। সেখানে তিনি বলেছিলেন, জনগণের জন্য জনগণের যে সরকার নয় তা স্বরাজের কোন ভিত্তি হতে পারে না। তাঁর দৃঢ় অভিমত ছিল যে সংসদীয় সরকার জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য সরকার নয় ('A parliamentary government is not a government by the people and for the people'.)। চিত্তরঞ্জন পশ্চিমী ধাঁচের রাষ্ট্রগঠনের বিরোধী ছিলেন। তিনি পশ্চিমের আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও শ্রেণীভিত্তিক গণতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি দেখান যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইউরোপের দেশগুলিতে মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণী স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করে সকল ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে। তাঁর মতে পশ্চিমী সংসদীয় গণতন্ত্র, যাকে তিনি বলেছেন "democracy of the ballot box", ব্যর্থ হয়েছে এবং সত্যকার গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে স্বশাসিত ক্ষুদ্র কেন্দ্রগুলিতে ("small centres") এবং তাদের ক্রমিক সমন্বয়ে গঠিত হবে একটি মানবিক রাষ্ট্র, যা কোন যান্ত্রিক পরিকাঠামো নয়।[৩] চিত্তরঞ্জনের নিকট প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রীয় দায়িত্বভারের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল পল্লী সংগঠন

এবং ক্ষুদ্র আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির স্বশাসন ক্ষমতা অর্থাৎ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। দেশবন্ধু বলেছিলেন আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব তাঁর স্বরাজের ধারণার সঙ্গে সুসমঞ্জস্য নয়। শ্বেতকায় আমলাতন্ত্রের পরিবর্তে যদি ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আমলাতন্ত্র আসে তাতে জাতীয় কল্যাণ সাধিত হবে না। কোন একটি শ্রেণীর আধিপত্যে নয়, সমগ্র জনগণের অংশ গ্রহণেই দেশের সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সার্থক হয়ে ওঠে।[৫]

গয়াতে চিত্তরঞ্জনের রাষ্ট্রচিন্তার যে রূপরেখা দেখা যায় স্বরাজ্য দল ক্ষমতায় আসার পর চিত্তরঞ্জন স্বরাজ পরিকল্পনার (Swaraj Scheme) যে খসড়া প্রস্তুত করেন তাতে সেই চিন্তা ভাবনা পূর্ণ ও বিস্তারিত রূপ পরিগ্রহ করেছিল।[৬] তিনি প্রাচীন ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েতের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি ছিল বিকেন্দ্রিক সরকার ও সুসংগঠিত পল্লীসমাজ। ভবানীপুর সম্মেলনের ভাষণে তাঁর পল্লীভাবনার বিকাশ দেখা যায়। যেখানে তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেক জেলায় জনসংখ্যা ও কাজের সুবিধা অনুসারে কতকগুলি গ্রাম নিয়ে এক একটি পল্লীসমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারা সকলে মিলে পাঁচজন পঞ্চায়েত নির্বাচন করবে, যাদের উপর গ্রামগুলির শুভাশুভের ভার অর্পিত হবে। গ্রামের পথ ঘাটের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষা, চাষাকে কৃষিকার্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান, পুকুর কাটা, শয্যাগার স্থাপন (যেখানে প্রত্যেক চাষীর ক্ষেতের ফসলের কিছু ধান মজুত থাকবে) অজন্মা, দুর্ভিক্ষের সময় ধার দেওয়া যায়, বিচার ব্যবস্থা, এ সকল কাজের ভার পল্লীসমাজের উপর থাকবে। এইভাবে প্রত্যেক জেলায় জনসংখ্যা অনুসারে ২০/২৫টি পল্লীসমাজ থাকবে, যারা পাঁচজন পঞ্চায়েত ছাড়া ৫ থেকে ২৫টি সভ্য নির্বাচন করবে। পল্লীসমাজের নির্বাচিত সভ্যদের নিয়ে জেলা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, যার উপর গ্রামের কৃষিকার্য, কুটীর শিল্প, জনস্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা(যে ব্যাঙ্ক থেকে চাষীদের কম সুদের হারে ঋণদান করা যায়), রাজস্ব সংগ্রহ কর আরোপ, পুলিশের কাজ প্রভৃতি সকল কাজের দায়িত্ব থাকবে।[৭]

১৯২৩ সালে দেশবন্ধু যখন স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি এই পল্লী ও রাষ্ট্রভাবনাকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেন। তিনি স্বরাজ্য দলের যে নীতিগুলি ঘোষণা করেন তা ভারতবর্ষের সনাতন নীতি। তাঁর স্বরাজ স্কীম এর মর্মকথা প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রতি স্তরে পঞ্চায়েতের অধীনে গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলির প্রতিষ্ঠা। গ্রামগুলির দ্বারা গঠিত স্থানীয় গ্রামীণ সংস্থাগুলি এবং শহরগুলির দ্বারা গঠিত আঞ্চলিক শহুরে কেন্দ্রগুলি মিলিত হয়ে জেলা কেন্দ্রগুলি গঠন করবে এবং সেই জেলাকেন্দ্রগুলি সমন্বিত হয়ে প্রদেশে পরিণত হবে। এই প্রদেশগুলি মিলে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করবে। কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে প্রধানত: পরামর্শদাতা রূপে। যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তার হাতে থাকবে তা স্থানীয় কেন্দ্রগুলির কার্যকর স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হবে না। দেশবন্ধু রাজনীতির ক্ষেত্রে মূল্যবোধের উপর জোর দেন যাতে স্থানীয় ও উচ্চতর কেন্দ্রে নির্বাচিত সাংসদরা জনকল্যাণে ব্রতী হন। তাঁর মতে পশ্চিমী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংঘাত ও বৈষম্যের কারণ এই মূল্যবোধের অভাব। স্বরাজ্য দলের অন্যান্য নীতি ছিল অহিংসা, ক্ষমতার পৃথকীকরণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।[৮]

গয়া কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, কোন সরকার সফল হবে না যদি না তা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল হয়। আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাধারা এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে ব্যক্তির বিবর্তন থেকে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র একটি ধারাবাহিক স্বাভাবিক বিকাশের ধারা। ব্যক্তি থেকে আসে সুসংহত প্রতিবেশীসুলভ চেতনা যা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি এবং যার থেকে উৎসারিত হয় বিশ্ব রাষ্ট্রের সত্যকার আদর্শ। এই প্রতিবেশী জীবনচেতনা থেকে উদ্ভূত শক্তিসমগ্র নাগরিক ও জাতীয় জীবনের অংশ হয়ে তাকে রূপায়িত করে, যা 'যৌথ চেতনা' ("collective will')-র বহিঃপ্রকাশ এবং সেইখানেই প্রকৃত গণতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ। চিত্তরঞ্জনের মতে বর্তমান গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যের দ্বারা বিভিন্ন চেতনার সংঘাতের নিষ্পত্তি করে, কিন্তু নব্য গণতন্ত্রের প্রকৃতি হল সংহতির মাধ্যমে বিভিন্ন চেতনার এক সাধারণ ঐক্য চেতনায় বিকাশলাভ এবং সমগ্র জাতির সুসম্বদ্ধ যৌথ চেতনায় তার পরিণতি। এই সংহতি বিধানের পদ্ধতির মাধ্যমেই বিভিন্ন জাতির সঙ্ঘ গড়ে উঠবে এবং বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হবে। দেশবন্ধু কল্পিত এই "Federation of Humanity"-র উল্লেখ তাঁর ভবানীপুর ও বরিশাল (১৯১৭) ভাষণে রয়েছে।[৯]

চিত্তরঞ্জনের বহু-আকাঙ্খিত আদর্শ ছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দ্বারা এক সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন। তাঁর মতে এই ঐক্যের বাণী শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, তা বাস্তবায়িত করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, 'উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত পরিকল্পনা ছাড়া কোন কার্যপ্রণালী গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ...হিন্দু-মুসলমানের মিলন ভিন্ন স্বরাজের স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই হবে আমাদের কাছে।[১০] জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ শিক্ষা ও অর্থনীতিতে অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনের জন্য তাঁদের অধিকারের স্বীকৃতি এবং কিছু অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি বেঙ্গল প্যাক্ট রচনা করেছিলেন।[১১] কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের অনুদারতা ও ব্রিটিশ ভেদনীতির জন্য তাঁর এই সৎ ও সাহসী প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র রূপেও দেশবন্ধু প্যান-ইন্ডিয়ান জাতি গঠনের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন।[১২] তিনি মনে করতেন যে দেশে সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলি শৈশবস্থায় রয়েছে এবং আইনসভা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত নয়, সেখানে স্থানীয় সংস্থাগুলিই জনমত প্রকাশের মুখপাত্র। এই সকল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, যেমন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, পৌরসভা, জনকল্যাণমুখী কাজের ক্ষেত্র এবং জাতীয়তাবাদের মঞ্চ। এগুলি অধিকারের অর্থই প্রশাসনকে তৃণমূলে গ্রথিত করা। স্বরাজ্য দলের নেতৃত্বে কলকাতা পৌরসভা ও অন্যান্য আঞ্চলিক লোকাল বোর্ডগুলি (বাংলা, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ-এ) আমলাতন্ত্রকে প্রতিরোধ করে জাতিগঠনের জন্য মূল্যবান জনহিতকর ক্রিয়াকলাপের পরিচয় রেখেছিল।[১৩] চিত্তরঞ্জন মনে করতেন অসহযোগ, আইনঅমান্য আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের হাতিয়ার। কিন্তু প্রকৃত জাতিগঠনের কাজ রয়েছে দেশের আপামর মানুষের মধ্যে। তিনি শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'আপনারা দয়া করে আমাকে এই পলিটিক্সের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে দিন, আমি ওদের মধ্যে গিয়ে থাকিগে।' শরৎচন্দ্র লিখেছেন নিম্নশ্রেণীর মানুষদের লাঞ্ছনা দেশবন্ধুর বুকে শেলের মত বিঁধত।[১৪] তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে নমঃশূদ্র, মালো, নট, বাগ্দি, রাজবংশী, পোদ এরা সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। এদের প্রতি দীর্ঘকালীন

নিষ্ঠুর সামাজিক অবিচারের প্রতিবিধান ও এদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে সুস্থ স্বাধীন সমাজজীবনের বিকাশ সম্ভব হবে না। চিত্তরঞ্জন চিরদিন এই সামাজিক সাম্যের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বিবেকানন্দের 'দরিদ্র নারায়ণের' সেবার আদর্শের অনুগামী ছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বলেছেন চিত্তরঞ্জনের সকল কাজ বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে সুসমঞ্জস ছিল।[১৫] এটি সাধারণভাবে ঠিক। কিন্তু জহরলালের মন্তব্য যে দেশবন্ধু রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন, এটি বিশেষভাবে সঠিক। গান্ধীর মধ্যে ধর্ম ও রাজনীতির যে বিচিত্র মিশ্রণ ছিল, দেশবন্ধুর মধ্যে তা ছিল না। তিনি ধর্ম চেতনাকে তাঁর রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করতে দেননি। তাঁর ধর্মপ্রাণতা ও রাজনীতিবোধ দু'টি সমান্তরাল রেখায় চলেছে, যদিও সুভাষচন্দ্রের মতে 'বৈষ্ণব ধর্মের সাহায্যে তিনি বাস্তবজীবন ও আদর্শের মধ্যে একটা মধুর সামঞ্জস্য স্থাপন করেছিলেন।' আবার একথাও বলা চলে যে তাঁর জাতীয়তাবাদের পিছনে আধ্যাত্মিক চেতনা ছিল। এখানে ম্যাৎসিনির সঙ্গে তাঁর মিল। জগৎ সংসারকে তিনি ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র মনে করতেন এবং ব্যক্তি, সমাজ জাতি সকলই সেই লীলার বিচিত্র প্রকাশ। এখানে বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ্যণীয়। চিত্তরঞ্জনের জাতীয়তাবাদে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের প্রভাব ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'বঙ্কিম সর্বপ্রথমে বাংলার মূর্তি গড়িলেন। বঙ্গ জননীকে দর্শন করিলেন।'[১৬] দেশবন্ধুর মতে জাতীয়তার অর্থ হল জাতির আত্মোপলব্ধি এবং পূর্ণ আত্মবিকাশ বিশ্বজনীন মানবতার অংশরূপে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। এখানেও তিনি ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য তুলে ধরেন। ইউরোপে ফ্রান্স ও জার্মানীর জাতীয়তাবোধ পারস্পরিক বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইউরোপের এই স্বার্থান্বেষী, বেনিয়া বুদ্ধি সম্পন্ন জঙ্গী জাতীয়তার তিনি বিরোধী ছিলেন।

চিত্তরঞ্জনকে কেউ কেউ সমাজতন্ত্রী আখ্যা দিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মিলন এবং জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সমন্বয়। তাই তিনি এশিয়ার পরাধীন জাতিদের নিয়ে এশিয়াটিক ফেডারেশান এবং সকল জাতির সমন্বয়ে বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আদর্শ তুলে ধরেন। দেশবন্ধু ছিলেন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক গণনেতা। তিনি বুর্জোয়া বা কমিউনিস্ট কোনটাই ছিলেন না। বুর্জোয়া নেতা হলে ১৯২১ সালে বাংলায় কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে যে ব্যাপক গণআন্দোলন এনেছিলেন তা আনতে পারতেন না। অন্যদিকে মার্ক্সীয় শ্রেণী সংগ্রাম ও হিংস্র পদ্ধতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। গান্ধীর মত অহিংসায় ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস। তাঁর মতে রুশ বিপ্লব আরোপিত ও হিংসা ব্যর্থ হবে। চিত্তরঞ্জনের মতে ভারতীয় সভ্যতা সমন্বয়ধর্মী, সংঘাত নয়, সমন্বয় ও মিলনই তার ঐতিহ্য। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন দেশবন্ধু 'বিশ্বাস করতেন যে ভারতের জাতীয়তা শিক্ষা ও জাতির প্রয়োজন হইতে আমাদের সমাজ-তত্ত্ব, রাজনীতি ও দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ হইবে।' কলকাতায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে (১৯২৪) তিনি বলেছিলেন, শ্রেণীগণ ও জনগণের সংঘাত ইউরোপীয় বিষয়বস্তু এবং ভারতীয় সংস্কৃতি মিলনধর্মী যা সকল অংশ ও সম্প্রদায়কে একত্রিত করবে।' তিনি বলেছিলেন 'আমি স্বরাজ চাই সর্বজনের জন্য, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য নয়।'[১৭] শ্রেণীগণ ও জনগণের একাত্মতা ছিল তাঁর অভিপ্রেত বস্তু।

অর্থনৈতিক সাম্যের দিকেও চিত্তরঞ্জনের দৃষ্টি ছিল। পশ্চিমী শিল্পবাদ কিভাবে 'চোরের মত প্রবেশ করে' দেশীয় কুটীর শিল্প ও জাতীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছে সেকথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন।[১৮] যদিও গান্ধীর মতো তিনিও মনে করতেন নিছক শিল্পায়ন তাঁর মনঃপুত ছিল না, তবু তিনি স্বদেশী শিল্প, ব্যবসা, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতির বিকাশে উৎসাহী ছিলেন দেশবাসীর আর্থিক দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য ও দেশকে অর্থনীতিতে স্বয়ংনির্ভর করার জন্য। তিনি ইন্ডিয়ান নেভিগেসান কোম্পানীকে প্রচুর অর্থ দান করেন।[১৯] তাঁর সময়ে পল্লীউন্নয়নের জন্য গ্রামীণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, যদিও অর্থাভাবে ও ব্রিটিশ আমলাদের বিরোধিতার জন্য কাজ খুব এগোয়নি।[২০] অন্যদিকে শ্রমিক সংগঠনেও তিনি নেতৃত্ব দেন এবং তাঁর উৎসাহে অনেক লেবার ইউনিয়ান গড়ে উঠেছিল।[২১] কৃষক ও শ্রমজীবীরা ছিল জাতিগঠনের বৈপ্লবিক উপাদান। তাই তাদের উন্নয়নের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাদের একত্রিত করে ১৯২১ সালে দেশবন্ধু বাংলায় জোরদার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণআন্দোলন এনেছিলেন জাতীয় স্বাধীনতার জন্য। দেশবন্ধুর সৃজনশীল আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীর মধ্যে ছিল জাতীয় স্কুল কলেজ ও আর্বিট্রেসন আদালতের প্রতিষ্ঠা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, খদ্দর উৎপাদন, কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবন, জাতীয় অর্থের নির্গমন রোধ, দেশীয় শিল্পের স্বার্থে রক্ষণাত্মক শুল্কের প্রবর্তন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাতীয় কারখানার প্রতিষ্ঠা।[২২] চিত্তরঞ্জনের আদর্শ ছিল প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান।

দেশবন্ধু মনে করতেন স্বাধীনতার চেয়ে 'স্বরাজ' শব্দটি ব্যাপকতর ও গূঢ় অর্থবাহী। 'স্বরাজ জাতীয় মনের স্বাভাবিক প্রকাশ', যেখানে স্বাধীনতার অর্থ বৈদেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি। আমেদাবাদ কংগ্রেসে (১৯২১) তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার চিত্র তুলে ধরেছিলেন এবং বলেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ থেকে ভারতের জাতীয় বিকাশ সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু সেখানেও তিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলেননি।[২৩] তিনি বরাবরই বলেছেন ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বা না রাখার বিষয়টি আমাদের জাতীয় স্বার্থের দ্বারা চালিত হবে এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতির শর্তেই তিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতায় সম্মত হবেন। ফরিদপুর, প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯২৫) তিনি ডোমিনিয়ন স্টেটাস ও সাম্রাজ্যের মতে স্বরাজ চান, যার জন্য বির্তকে জড়িয়ে পড়েন, যার বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। এম. এন. রায় এর সমালোচনা করে বলেছিলেন 'লজ্জাজনক অবরোহন।'[২৪] দাশ চেয়েছিলেন বিশ্বরাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতকে সমান অংশীদার রূপে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে "potential and great federation of human race' বলে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না এবং 'সাম্রাজ্য' শব্দটি 'ব্রিটিশ'-এর যুক্ত হয়ে জাতীয় চেতনায় ঘৃণিত প্রতিপন্ন হত। তাই চিত্তরঞ্জন সঙ্গতভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। অনেকে, বিশেষত তরুণ সম্প্রদায় চেয়েছিল সাম্রাজ্যের বাইরে স্বাধীনতা। কিন্তু এছাড়া দেশবন্ধু ফরিদপুরে স্বরাজ্য দলের কোন নীতি বিসর্জন দেননি, দ্বৈত শাসনের বিরুদ্ধে আগের মতই সর্বাত্মক প্রতিরোধের কথা বলেছেন এবং সংগ্রামের পথও পরিহার করেন নি কারণ সেখানে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনকে মুক্তিকামী জাতির শেষ অস্ত্ররূপে উল্লেখ করেছেন।[২৫] ফরিদপুরে মৃত্যুমুখী চিত্তরঞ্জন স্বরাজের

প্রকৃত ভিত্তি স্থাপনের জন্য এক সম্মানজনক মীমাংসার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন, যদিও বার্কেনহেডের অনমনীয় মনোভাবের জন্য তা শেষ পর্যন্ত একতরফা রয়ে গিয়েছিল।

চিত্তরঞ্জনের সময়কালে তাঁর অনেক আদর্শ বাস্তবায়িত হয় নি। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালে তাঁব অনেক আদর্শ জাতীয় সরকার কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে, যা তাঁ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে, যেমন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, নিম্নশ্রেণীর অধিকাব রক্ষা, মিশ্র অর্থনীতি, ভারতের বিশ্বসঙ্ঘে যোগদান। দেশবন্ধু এ সকলের পথ-প্রদর্শক। রাজনীতিজ্ঞ চিত্তরঞ্জনেব মধ্যে আইনজ্ঞের বিশ্লেষণী নৈপুণ্য ও কবিহৃদয়ের সংবেদনশীলতা মিলিত হয়েছিল। এর সঙ্গে এসে মিশেছিল বৈষ্ণবের ত্যাগের ঔদার্য। এ সকলের ফলে ভারতের স্বরাজ আন্দোলনে এক বুদ্ধিবিভাসিত অথচ আবেগময় 'রোমান্টিক অধিনায়কের' ভাবমূর্তি বিকশিত হয়েছিল।

সূত্র নির্দেশঃ

১। দেশবন্ধু রচনা সমগ্র, মণীন্দ্র দত্ত ও হারাধন দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৮৫, তৃয় খণ্ড, পৃ: ১৩
২। সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ: ৩০৭
৩। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (ইংরাজী), দিল্লী, ১৯৬০, পৃ: ১৮২
৪। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮৪
৫। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮২-৮৩
৬। ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিষ্টার, সম্পাদক এন, এম, মিত্র, ১৯২৩, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪৫-৫০
৭। দেশবন্ধু রচনা সমগ্র, পৃ: ৫৩-৫৬
৮। ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার, পূর্বোক্ত
৯। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮৪-৮৬
১০। উদ্ধৃত, হেনা চৌধুরী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-বেদ, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ: ১৭৪; বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিংস, ১৯২৪, ১৪ নং খণ্ড, পৃ: ৮৫
১১। রিপোর্ট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ বেঙ্গল, ১৯২৩-২৪, পৃ: ১; দ্য মুসলমান, ১১ জানুয়ারি, ১৯২৪
১২। মিনিটস অফ দ্য প্রসিডিংস অফ দ্য ক্যালকাটা করপোরেশন ১৯২৪-২৫, পৃ: ৫
১৩। মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সি. আর. দাস এ্যাণ্ড দ্য স্বরাজ্য পার্টি (ইংরাজী) অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি, থিসিস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪
১৪। শরৎচন্দ্র বসু, সমগ্র রচনাবলী, সম্পাদক শিশিরকুমার বসু, কলিকাতা, ১৯৮০ পৃ: ৩০৭
১৫। সুভাষচন্দ্র বসু, সমগ্র রচনাবলী, সম্পাদক শিশিরকুমার বসু, কলিকাতা, ১৯৮০ পৃ: ৩০৭
১৬। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, দেশবন্ধুস্মৃতি, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃ: ১৪৯
১৭। ফরওয়ার্ড, ১ এপ্রিল, ১৯২৪; রামহরি চট্টোপাধ্যায়, ওয়ার্কিং ক্লাস এ্যান্ড দ্য ন্যাশালিস্ট

মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লী, ১৯৮৪, পৃ: ১৬৪; অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৮ মার্চ, ১৯২৩

১৮। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫১

১৯। পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯০-৯২

২০। হোম (ডিপার্টমেন্ট) পোলিটিক্যাল, ফাইল ১১২/১৯২৫, ফোর্টনাইটলি রিপোর্ট, বেঙ্গল, এপ্রিল ও মে

২১। রাখহরি চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৫-৪৬; ফরওয়ার্ড, ৩০ জুলাই, ১৯২৫

২২। ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিষ্টার, ১৯২৪, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪০

২৩। হেমেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, পৃ: ১৫০

২৪। মানবেন্দ্রনাথ রায়, দ্য ফিউচার অফ ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, লন্ডন, ১৯২৬, পৃ:-৭২

২৫। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ: ২২৭, ২০৯-১১; হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, দেশবন্ধু স্মৃতি, পৃ: ৩০১-৯

যুক্তির পথে যাত্রা: প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

পনেরো-ষোল শতকে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানচর্চায় উদ্দীপনা আসে, সপ্তদশ শতকে ঘটে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব, আঠারো শতকে জ্ঞানদীপ্তির বিকাশ ঘটে। দেখা যায় ধর্মীয় অলৌকিকতা, তথাকথিত অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। যুক্তির দ্বারা সব কিছুকে বোঝবার, যাচাই করবার মানসিকতা গড়ে উঠছে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-দীপ্তির অন্যতম ধারা যুক্তিবাদ যা কিনা বুর্জোয়া প্রগতিশীলতার সূচক। আঠারো শতক শিল্পবিপ্লবেরও সূচনাপর্ব। আর এই শিল্পায়নের ভাবধারার ভিত্তিভূমি হল কার্য-কারণ সূত্র অনুসন্ধান যা যুক্তিবাদের গোড়ার কথা।

ভারতে এই যুক্তিবাদের প্রবেশ উনিশ শতকে। তবে প্রাচীন যুগে[১] (চার্বাক দর্শন) এবং মধ্যযুগেও (আকবরের ধর্ম দর্শনে যুক্তি বা 'আকল'-এর ওপর জোর) ভারতে যুক্তিবাদের অস্তিত্ব ছিল। তবে এই নিবন্ধে যে অর্থে যুক্তিবাদকে ব্যবহার করা হচ্ছে তা হ'ল যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রতিটি ঘটনাকে যাচাই করা; পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছান।

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তির পথে চলা শুরু ঔপনিবেশিক কাঠামোতেই, তবে তা ব্যক্তিগত স্তরে। যে কোন পরিবেশে ব্যক্তিগত মতামত গড়ে ওঠার পেছনে দু'টো শক্তি কাজ করে। একদিকে দীর্ঘস্থায়ী এবং কতকটা অনমনীয় সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো এবং অন্যদিকে অবিন্যস্ত পরিবর্তনশীল পরিবেশের প্রভাব। ঔপনিবেশিক কাঠামো সব বুদ্ধিজীবীদের জীবনেই প্রায় একই রকমের প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন পদগুলি থেকে বঞ্চিত থাকা, সীমাবদ্ধ সুযোগে আইনব্যবস্থার অঙ্গীভূত জাতিবৈষম্য এবং ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী অর্থনীতি-এগুলি তাঁদের সবারই অভিজ্ঞতার অঙ্গ।[২] ফলে তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখতেন পাশ্চাত্য দর্শন যে যুক্তিবাদ-মানবতাবাদের কথা বলে ব্রিটিশ শাসন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং বৈষম্যমূলক। অর্থাৎ লক্ষ্য করা যায়, ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় অধীত বিদ্যা আর তার প্রয়োগে ভারসাম্য থাকছে না। ফলে গোড়া থেকেই দ্বন্দ্ব!

এদিকে পরিবেশটা আধা-সামন্ততান্ত্রিক। ইউরোপে যে আধুনিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটেছে, তাকে সম্ভব করেছে সেখানে সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে ধনতন্ত্রের বিকাশ। আমাদের দেশে এই ঘটনা ঘটতে পারেনি। ঔপনিবেশিক দেশে শিল্পায়ন ঘটেছে ধীর গতিতে। ফলে বুর্জোয়া মূল্যবোধও গড়ে ওঠেনি। পুরোন মূল্যবোধ, যথা ভবিতব্যের কাছে আত্মসমর্পণ

করা, কর্মফলকে মেনে নেওয়া, যুক্তির ব্যবহারে দুর্বলতা এবং আপ্তবাক্যে আস্থার প্রবণতার মূলকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল কথা হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব সত্যই নিহিত আছে বেদের মধ্যে। বেদের ব্যাখ্যা সম্ভব, কিন্তু নতুনকোন চিন্তা সম্ভব নয়। ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্মে দর্শন চর্চা প্রায়শই রূপ নিয়েছে টীকা ভাষ্যের।[৩] সামগ্রিকভাবে জ্ঞান চর্চারও একই দশা। জ্ঞান চর্চার এই বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতে প্রয়োজন ছিল যুক্তিপ্রয়োগের।

ঠিক এই কারণেই উনিশ শতকের বিশিষ্ট শিক্ষক এবং চিন্তক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) বলেছিলেন, তাঁর উপাস্য দু'টি: যুক্তি আর মুক্তি। নব্যবঙ্গদের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল গুরুবচন, শাস্ত্রবচন, দৈববচন না মানার, সব কিছু পরীক্ষা করে যাচাই করার।[৪] কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, নব্যবঙ্গরা কি নিজেরাও এই গুরুবাদের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন?[৫] দল বা গোষ্ঠী হিসেবে, যুক্তিবাদের প্রসারে নব্যবঙ্গদের ভূমিকা কি খুব তাৎপর্যপূর্ণ? বরং অনেক ব্যক্তির ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৬৬)[৬], রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) প্রমুখ।

বিশ শতকে স্বাধীনতার পরে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ প্রয়াস নেওয়া হয় সরকারি-বেসরকারি স্তরে। নানান পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। বিজ্ঞান বিষয় স্কুল পাঠ্য হয়। বিভিন্ন সায়েন্স ক্লাব গড়ে উঠতে থাকে। পাশাপাশি চলতে থাকে সংস্কারের পরম্পরা। আধুনিকতা আর সংস্কারের সহাবস্থান। শেখার জগত আর বিশ্বাসের জগতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।

বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ এবং বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনকে প্রথাগত যান্ত্রিক শিক্ষার বাইরে বৈজ্ঞানিক মনন-চর্চার প্রক্রিয়ার একেবারে অত্যন্ত প্রাথমিক ধাপ বলা চলে।[৭] কিন্তু যুক্তিবিচার পদ্ধতি আর দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তখনও সেভাবে হাজির করা হয়নি সাধারণ মানুষের কাছে। ১৯৬১ সালে মানবমন পত্রিকা প্রকাশ করে ডা. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সে চেষ্টা একটু করেছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোজগৎ-জীবজগৎ-সমাজ জীবনের সম্পর্ক বুঝিয়ে দিতে, বুঝে নিতে।[৮] ষাটের দশকের শেষদিকে, সত্তর দশকে পশ্চিমবঙ্গে দিন বদলের স্বপ্ন দেখা নকশাল আন্দোলন, লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারার পর কর্মীরা অনুভব করলেন মানুষের চেতনা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানমনস্কতার আন্দোলনের।[৯] রাজনৈতিক আন্দোলন সফল করার জন্য প্রয়োজন তার পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের। আর এর অনুপস্থিতিই তাদেরকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। এই তাগিদ থেকেই ১৯৮০ সালে বের হয় 'উৎসমানুষ' পত্রিকা (প্রথমে নাম ছিল 'মানুষ'), পরে গড়ে ওঠে সমমানসিকতার আরো বেশ কিছু ছোট ছোট গণবিজ্ঞান ও গণসংস্কৃতি সংগঠন। উৎস মানুষ এবং তার সাথীদের উদ্যোগে পত্রিকার পাতায় তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য তদন্তমূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রশ্ন ওঠে, বিশ্বাস ও আচরণে যুক্তিহীন অন্ধ সংস্কার নিয়ে। বেশ কয়েকজন তথাকথিত পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করতে অস্বীকার করে।

১৯৮২ সালে গড়ে ওঠে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ। বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করা বিজ্ঞান সংগঠনগুলো জড়ো হয় একটা সমন্বয়কারী সংগঠনের ছাতার তলায়। এর মধ্যে শুধু

যুক্তিবাদকে বিষয় করে কোন সংগঠন ছিল না। যুক্তিবাদী সমিতি নামক সংগঠন গড়ে ওঠে আরো পরে, ১৯৮৫ সালে।

১৯৮৫-র ১ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের যুক্তিবাদী সমিতি।[১০] ১৯৮৭-র ১ মার্চ এই নাম একটু বদলে হয় ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। তবে এর বেশি পরিচিতি যুক্তিবাদী সমিতি হিসাবেই।[১১] এদের মতে: "যুক্তিবাদ শুধু বিচার-বিশ্লেষণের কিছু পদ্ধতিগত কায়দা-কানুন নয়, যুক্তিবাদ একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন, একটি বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি, একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী।"[১২]

কোন্ পটভূমিতে তৈরি হল যুক্তিবাদী সমিতি? সমিতির বিশিষ্ট কর্মী রাজেশ দত্তর কথায়[১৩]: এর পেছনে সময়ের ভূমিকা রয়েছে। শ্রীলঙ্কার বিশিষ্ট যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্ব আব্রাহাম কোভুর-এর Beyond Godmen কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের পটভূমি গড়ে তোলে। কোভুরের বইয়ের অনুবাদ বের হয়। বাংলাতে বের হয় ভবানীপ্রসাদ সাহর লেখা বই-ভূত ভগবান শয়তান বনাম ডা. কোভুর। অলৌকিকতা বিরোধী প্রচারে এগুলো হয়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞানকর্মীদের হাতিয়ার। যুক্তিবাদী সমিতি নামকরণেও রয়েছে কোভুরের প্রভাব; কোভুরের সংগঠনের নামও ছিল র‍্যাশনালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন। তবে কোভুরের আন্দোলনে কুসংস্কার বিরোধিতাই প্রধান গুরুত্ব পেত। কিন্তু এরা উপলব্ধি করেন শুধু স্থূল কুসংস্কার নয়; ভাববাদ, নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্য প্রয়োজন মানুষের মধ্যে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জাগরণ ঘটানো। চাই এমন ধারার আন্দোলন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রতিষ্ঠা।

তবে যুক্তিবাদী সমিতি প্রতিষ্ঠার যে ইতিবৃত্ত সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে-"...১৯৮৫-র ১ মার্চ। এই দিনটিতে কিছু সমাজ-সচেতন, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল্যায়নে সক্ষম, নিপীড়িত মানুষের মুক্তিকামী, বে-পরোয়া, নিষ্ঠ, কিছু দামাল ছেলে দমদমের একটি ছোট ফ্ল্যাটে (৭২/৮ দেবীনিবাস রোড) ঘরোয়া আলোচনা শেষে গড়ে তুলল একটি সংগঠন-ভারতের যুক্তিবাদী সমিতি।"[১৪] স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, 'সে সময়ে কর্মরত ব্যক্তি বা সংগঠনের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় নয়, এ ছিল কিছু দামাল ছেলের আন্দোলনের ফল'?[১৫] আসলে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রবীর ঘোষের লেখনী থেকে আক্রমণাত্মক লেখার যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাতে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংগঠনকে নস্যাৎ করার প্রবণতাই বেশি লক্ষ্যণীয়, প্রকৃত তথ্য অনেক সময় মেলে না। সেজন্যই ডা. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যে ছিলেন এর প্রথম সভাপতি; অমিত চক্রবর্তী, অপরাজিত বসু, যুগলকান্তি রায়, শংকর চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানকামী যে জন্মলগ্নে সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা অনেকের কাছেই নতুন তথ্য।

১৯৮৫-তেই যুক্তির পথে হাঁটার আন্দোলনে বাড়তি গতি সঞ্চার করেছিল আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে যন্ত্রচালিত একটি বেতার অনুষ্ঠান।[১৬] '৮৫র ১৮ জুলাই কলকাতা ক থেকে রাত ৮টায় প্রচারিত অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'জ্যোতিষ নিয়ে দু'চার কথা'। এই অনুষ্ঠানে চারজন তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার জ্যোতিষী বিড়ম্বনার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রভাবিত অনেক মানুষ, যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন, সমর্থন জানান,

কেউ কেউ সরাসরি যুক্তও হন। আকাশবাণীতে বহু শ্রোতার চিঠি আসে। পত্রপত্রিকাতেও লেখালেখি হয়। সোনারপুর কৃষ্টি সাংসদ এর প্রেক্ষিতে মঞ্চস্থ করেন নাটক: ভাগো ভূত ভগবান, নাট্যকার - সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত। আন্দোলনে উদ্দীপনা আসে।

১৯৮৫ থেকেই যুক্তিবাদী সমিতি গ্রাম-মফস্বলে গিয়ে অলৌকিকতা বিরোধী প্রচার অনুষ্ঠান 'অলৌকিক নয় লৌকিক' পরিবেশন করতে শুরু করে। গোড়ার দিকে, বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর পেছনে তথাকথিত বাবাজী-মাতাজীদের ম্যাজিক-হাত সাফাইয়ের কলাকৌশল তুলে ধরা হয়। পরে চেষ্টা করা হয় মানুষের মনোজগতে ভাববাদী চিন্ত-চেতনার পরিমণ্ডলে আঘাত হানার। যেমন-ভূতে ভবা, ধর্মান্ধতা, অদৃষ্টবাদ, জন্মান্তর, কর্মফল ইত্যাদি। এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। সমিতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় এমন ব্যক্তি/সংগঠনও এই শিরোনামে অনুষ্ঠান করতে থাকেন। গোড়ার দিকে এই অনুষ্ঠান সফল করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ডা. বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, ড. অমিত চক্রবর্তী (যিনি আকাশবাণী কলকাতার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রূপে 'জ্যোতিষ নিয়ে দু'চার কথা' অনুষ্ঠান করার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন) প্রমুখ।

১৯৮৬র জানুয়ারীতে প্রকাশিত হল যুক্তিবাদী সমিতির প্রথম সংকলন।[১৭] এর নামও হল অনুষ্ঠানের সঙ্গে নাম মিলিয়ে-'অলৌকিক নয় লৌকিক'। বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনে আরো গতি এল। বইয়ের সাহায্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল বাংলা ভাষাভাষী অন্য রাজ্যে-ত্রিপুরা, আসামে। এমনকি তা দেশের সীমানার বেড়াও ভাঙল। এই আন্দোলনের প্রতি একাত্ম হয়ে ১৯৮৭-৮৮তে বাংলাদেশে গড়ে উঠল 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'। মূলত: ঢাকাকেন্দ্রিক এই আন্দোলন হলেও প্রভাব পড়ল বরিশাল, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, পাবনা প্রভৃতি স্থানে। ঐ সমস্ত জায়গা থেকে ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতিতে আসা চিঠি পত্র এই প্রভাবেরই ইঙ্গিতবাহী।[১৮]

১৯৮৬-র জানুয়ারীতে পাভলভ ইনস্টিটিউট এবং উৎস মানুষের পক্ষ থেকে যুক্তিবাদী সমিতিকে নিয়ে একটি বৃহত্তর মঞ্চ গঠনের চেষ্টা করা হয়। সমিতিকে প্রস্তাব দেওয়া হয় কোভুর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবাদী সমিতির ভারতীয় শাখার সঙ্গে মিলিত হওয়ার বা উৎস মানুষ অথবা পাভলভ ইনষ্টিটিউটের শাখা হিসেবে কাজ করার। কিন্তু সমিতি সব প্রস্তাবই নাকচ করে, কারণ সমিতি মনে করে, এদের কাজকর্মের ধারা বিক্ষিপ্ত, খণ্ডিত আর তাদের নেতৃত্বে আন্দোলন একটি ব্যাপক গণ সাংস্কৃতিক আন্দোলন।[১৯]

১৯৮৬-র মাঝামাঝি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতা জেমস্ র‍্যান্ডি যুক্তিবাদী সমিতিকে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে আমেরিকার যুক্তিবাদী সংস্থা 'কমিটি ফর সাইন্টিফিক ইনভেস্টিগেশন অব ক্লেমস্ অব দ্য প্যারানরমল' কে সহযোগিতা করার জন্য যুক্তিবাদী সমিতিকে আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু এই সংস্থা 'শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য অনুসন্ধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ' এই অভিযোগে সমিতি এর সঙ্গে যুক্ত হয়নি।[২০] কারণ সমিতির কাছে, যুক্তিবাদী আন্দোলন ও অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য উদঘাটন সমার্থক শব্দ নয়।[২১]

তবে, কি এদের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য? সমিতির 'মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন'[২২] - এ বলা হয়েছে, ভারতের শোষিত জনগণের মুক্তির জন্য এতাবৎকাল যে সকল সংগ্রাম হয়েছে

তার ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ না করা। চাই চাই সাংস্কৃতিক আন্দোলন যার লক্ষ্য হবে সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিপ্লব আর তাই সমিতি সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে, মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে থাকা বিভিন্ন ভ্রান্ত ও অস্বচ্ছ চিন্তাকে দূর করতে। সমিতি মনে করে, শোষিত মানুষদের হাতিয়ার যুক্তিবাদী চিন্তার প্রধানতম শত্রু তথাকথিত ধর্ম, অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদী দর্শন, বিশ্বাসবাদ ইত্যাদি। তথাকথিত ধর্মের এই যুক্তিবিরোধী স্বরূপকে সঠিকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে না পারলে কুসংস্কার মুক্তির, চেতনা মুক্তির, শোষক-শোষিত সম্পর্ক অবসানের কল্পনা শুধুমাত্র কল্পনাই থেকে যাবে।

অর্থাৎ, যুক্তিবাদী সমিতির কাছে এই আন্দোলন হল শোষিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে, যুক্তিবাদী মতাদর্শের বিস্তারের লক্ষ্যে পরিচালিত। শেষ অবধি যা রূপ পাবে সার্বিক বিপ্লবে। যার লক্ষ্য সমাজ পরিবর্তন, ব্যবস্থা বদল, রাষ্ট্রের অবসান। এখানেই প্রশ্ন ওঠে, অসাম্যের সমাজকাঠামোয় ভাববাদী পরিমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটিয়ে কি সমাজ বদল সম্ভব ? সমিতির মতে, ব্যবস্থার infrastructure অর্থাৎ মূল কাঠামো ধরে রাখার জন্য শাষকশ্রেণী তাদের অনুকূল super-structure সংস্কৃতি তৈরি করে নেয়। কাজেই ব্যবস্থা ভাঙতে গেলে দু'টোকেই আঘাত হানতে হবে যেহেতু এদের সম্পর্ক দ্বিমুখী।

এই ভাবনা থেকেই কাজ করে চলেছে যুক্তিবাদী সমিতি। এখন এদের কাজকর্মের ধারা ৭৫টি শাখা নিয়ে আটটি অঞ্চল (উত্তরবঙ্গ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, উত্তর চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া-১ এবং নদীয়া-২) জুড়ে ব্যাপ্ত।[২৩] তবে এই সংগঠনের কাঠামো চিরাচরিত পিরামিডীয় নয়। বরং সমান্তরাল ধরণের অর্থাৎ কেন্দ্রের পরেই শাখার স্থান এবং সবকটি শাখা সম মর্যাদা সম্পন্ন। কেন্দ্র নিজেও একটি শাখা। এদের মতে, 'সমান্তরাল কাঠামো অনেক গণতান্ত্রিক। সংগঠন পরিচালনার ব্যাপারে এবং বিভিন্ন কর্মসূচী নেবার ব্যাপারে শাখাদের কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না।'[২৪]

কি কি কাজ করেছে যুক্তিবাদী সমিতি ? রাজেশ দত্তর মতে, ১৯৮৯ অবধি অন্ততঃ, সমিতির প্রধান কাজ ছিল অলৌকিকত্বর মুখোশ খোলা। সার্বিক গণ-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কথা বলা হলেও জোর ছিল বাবাজী-মাতাজীদের বুজরুকি ভণ্ডামি তুলে ধরার ওপর। যাদের তথাকথিত অলৌকিকত্বর স্বরূপ উদঘাটন করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখ্য : ঈপ্সিতা রায় চক্রবর্তী (জুন ১৯৮৮) হুজুর সাইদাবাদি (ফেব্রুয়ারি ১৯৯১) মরিস মেরুলো (১৫ অক্টোবর ১৯৯২) প্রমুখ। আবার কোন স্থানের অলৌকিক মাহাত্ম্যকীর্তনও এদের আক্রমণের বিষয় হয়েছে, যেমন-বরানগরের হানাবাড়ি (অক্টোবর '৯৩), আগরপাড়ার আগুন (এপ্রিল '৯৩), লবণহ্রদের ভূত (অক্টোবর '৯৪) প্রভৃতি।[২৫] এর বাইরে কাজকর্ম যা হয়েছে সবই সাম্প্রতিক কালে।

যুক্তিবাদী সমিতি রেজিস্ট্রেশন পায় ১৯৮৯ সালে। গোড়ার দিকে অলৌকিকতার বিরুদ্ধে আক্রমণ, জ্যোতিষী ও অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের প্রতি পঞ্চাশ হাজার টাকার চ্যালেঞ্জ ছোঁড়া প্রভৃতিই ছিল মুখ্য। নব্বই দশকে মাঝে বৈচিত্র্য আসে। যেমন ১৯৯১ সালের অক্টোবরে

সমিতির মুখপত্র 'যুক্তিবাদী' বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। '৯২-র বই মেলায় তা প্রথম প্রকাশিত হয়।[২৬] এই পত্রিকায় বিষয় হিসেবে আসে-আগের বিজ্ঞানমনস্ক লেখার চয়ন, ধর্মনিরপেক্ষতা, জনসেবা, সাম্প্রদায়িকতা, বিশিষ্ট মনীষির মূল্যায়ন, জনস্বাস্থ্য আন্দোলন প্রভৃতি। ১৯৯২-৯৩তে রাজ্যে কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটে। সরকারিভাবে একে আন্ত্রিক আখ্যা দেওয়া হলেও যুক্তিবাদী সমিতি, ডা. বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বেলেঘাটা আই.ডি. হাসপাতালে সমীক্ষা করার পর সিদ্ধান্তে আসেন, আন্ত্রিক নয়, রোগটা কলেরা। সঙ্গে তথ্য-প্রমাণ, পরিসংখ্যান পেশ করা হয়।[২৭]

ঐ বছর স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত ধর্ম সম্মেলনে রাজনৈতিক নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো এবং তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় যুক্তিবাদী সমিতি। ধর্ম সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি যোগ দিতে এলে সমিতির সদস্যরা তাঁকে কালো পতাকা দেখান। ১৯৯৩-এ এদের আন্দোলনের আর এক ধারা ছিল ধর্ম কলামে 'মানবতা' লেখার অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ফর্মে 'ধর্ম' কলামের অবলুপ্তি ইত্যাদি, এর লক্ষ্য ছিল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিপরীতে মানবতাবাদের আদর্শকে তুলে ধরা। ১০ ডিসেম্বর '৯৩ তে এদের ৫৭ জন কলকাতা হাইকোর্টে এফিডেফিট করে ধর্ম হিসেবে মানবতাবাদকে ঘোষণা করেন। সহযোগী হিসেবে গড়ে ওঠে 'ভারতের মানবতাবাদী সমিতি'।

মে ১৯৯৩-তে বালক ব্রহ্মচারীর নির্বিকল্প সমাধি কাণ্ডর[২৮] (অর্থাৎ মৃত্যুর পর মৃত্যুকে স্বীকার না করে শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক বালক ব্রহ্মচারীর মৃতদেহ, জীবিত বলে রেখে দেওয়া) সময়ে উজ্জ্বল প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করে খবরের শিরোনামে চলে আসে সমিতি। সব দৈনিক কাগজেই এদের কথা প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে কলকাতার 'আজকাল' পত্রিকা। ১৯৯৬তে বি.বি.সি.-র একটি তথ্যচিত্রর সুবাদে যুক্তিবাদী সমিতির পরিচালনায় যুক্তিবাদী আন্দোলনের খবর আন্তর্জাতিক মহলেও পৌঁছে যায়।

এই সময়ে সমিতির কাজকর্মের ধারার সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হল সমকালীন অন্য বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে না পারা। ১৯৯২-তে যুক্তিবাদী পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত পত্রিকার পাতা উল্টোলে বিভিন্ন বিজ্ঞানকর্মী ব্যক্তি ও সংগঠনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের পরিচয় মেলে।[২৯] এটা যে সামগ্রিকভাবে রাজ্যের বিজ্ঞান আন্দোলনের বিকাশের পক্ষে শুভ হয়নি সেই উপলব্ধি এদের হয়েছে। তারই পরিচয় মেলে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে পোখরানে বিস্ফোরণ '৯৮-র পর পরমাণু অস্ত্র বিরোধী প্রচার অভিযানে এদের সামিল হওয়া, পরবর্তীকালে বন্যা প্রতিরোধ সমন্বয় মঞ্চে অংশ নেওয়ার মধ্যে।

ইতিমধ্যে ১৯৯৬-র আগষ্ট মাসে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রবীর ঘোষকে দুর্নীতি, প্রতারণা এবং দ্বিচারিতার অভিযোগে সমিতি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়।[৩০] এ বিষয়ে একাধিক মামলা করা হয়। এই মামলাপর্বে দাবি-পাল্টা দাবির ফলে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় যুক্তিবাদী আন্দোলন। এখন দু'পক্ষই নিজেদের সংগঠনকে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' রূপে চিহ্নিত করে কাজ করে চলেছেন তবে পত্রিকার পুরোন ফাইল ঘেঁটে যে সব সক্রিয় কর্মীদের

সন্ধান পাওয়া যায় তারা প্রায় কেউই প্রবীর ঘোষের সঙ্গে নেই। কাজকর্মের যে কাঠামো ছিল তা প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে দেবাশিস ভট্টাচার্যর সম্পাদনায় কর্মরত যুক্তিবাদী সমিতিতে। অন্যদিকে প্রবীর ঘোষ পক্ষ তাঁদের বহুবিক্রিত বইয়ের মাধ্যমে যুক্তিবাদী প্রচার করে চলেছেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যুক্তির পথে যাত্রা কোন ব্যক্তিবা গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্ত নয়। যে উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা যে অনেক দূর এগিয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। সাথী ব্যক্তি ও সংগঠনের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও বিষোদ্গার করার মাধ্যমে আন্দোলনের পরিধিকে সঙ্কুচিত করা নয় বরং এক বৃহৎ গণসাংস্কৃতিক আন্দোলনের লক্ষ্যে সম্মতাবলম্বী নানান ব্যক্তি ও সংগঠনকে নিয়ে পথ হাঁটছে আজকের যুক্তিবাদী আন্দোলন। এরাজ্যের যুক্তিবাদী আন্দোলন তাই আজ আর শুধুমাত্র অলৌকিতার রহস্য উদ্‌ঘাটনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বরং অংশীদর হয়েছে রাজ্যের সামগ্রিক বিজ্ঞান আন্দোলনের।

সূত্র নির্দেশ

১। দ্রষ্টব্য নরেন ভট্টাচার্য্য, এ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান এ্যাথেইস্টিক মুভমেন্ট, কলিকাতা, ১৯৬২।
২। তপন রায়চৌধুরী, ইউরোপ পুনর্দর্শন, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা - ২১।
৩। অশোক রুদ্র সত্তর দশক ও বাঙালী মধ্যবিত্ত - অনিল আচার্য সম্পাদিত 'সত্তর দশক', কলকাতা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-১১৫
৪। বিনয় ঘোষ, মেট্রোপলিটন মন, মধ্যবিত্ত, বিদ্রোহ, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৯৮
৫। সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় - "পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান চেতনার ইতিহাস" ইতিহাস অনুসন্ধান - ১২', কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা - ৫৯৩
৬। অন্নপূর্ণা বিশ্বাস, অক্ষয় কুমার দত্ত : সমাজ, বিজ্ঞান ও ধর্মচিন্তা, কলিকাতা, ১৯৯৮
৭। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় "গণবিজ্ঞান আন্দোলন ও ডা. গাঙ্গুলী" - 'মানবমন' বর্ষ ৩৮, সংখ্যা- ১, কলিকাতা, জানুয়ারী '৯৯, পৃষ্ঠা - ১৫-১৯
৮। পূর্বোল্লেখিত
৯। সবুজ মুখোপাধ্যায় - 'গণ বিজ্ঞানের পথে পশ্চিমবঙ্গ-একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা' মুখপত্র গণদর্পণ, বর্ষ-৮, সংখ্যা -৬, পৃষ্ঠা - ১৯
১০। প্রবীর ঘোষ - সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা - ৬৭।
১১। পূর্বোল্লেখিত, পৃষ্ঠা - ৮০।
১২। পূর্বোল্লেখিত, পৃষ্ঠা - ১২২।
১৩। রাজেশ দত্তর সঙ্গে সাক্ষাৎকার - জানুয়ারি '৯৯, কলিকাতা
১৪। প্রবীর ঘোষ - পূর্বোল্লেখিত, পৃষ্ঠা - ৬৭।
১৫। অনিরুদ্ধ দত্ত - "প্রসঙ্গ গণবিজ্ঞান আন্দোলন" - মানবমন, বর্ষ - ৩৫, সংখ্যা - ৪, কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ৩০০
১৬। প্রবীর ঘোষ - পূর্বোল্লেখিত, পৃষ্ঠা - ৭৩

১৭। প্রবীর ঘোষ - অলৌকিক নয় লৌকিক কলিকাতা প্রথম খণ্ড, কলিকাতা

১৮। রাজেশ দত্তর সঙ্গে পূর্বোল্লেখিত সাক্ষাৎকার।

১৯। প্রবীর ঘোষ সংস্কৃতি পূর্বোল্লেখিত। পৃষ্ঠা - ৭৩।

২০। পূর্বোল্লেখিত, পৃষ্ঠা - ৭৪।

২১। পূর্বোল্লেখিত, পৃষ্ঠা - ৭২।

২২। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন - (তারিখ নাই)। পৃষ্ঠা - ১ -৭।

২৩। রাজেশ দত্তর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

২৪। মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন, 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' অংশ (পৃষ্ঠা সংখ্যা নাই)।

২৫। পাশাপাশি সমিতি দাবি করেছে "ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস্ (অবজেকশন্যাবল্ অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪" কঠোরভাবে প্রয়োগ করার। এই আইনের পূর্ণ ইংরেজী বয়ান এবং তার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন যুক্তিবাদী। 'বিশেষ আইনি সংখ্যা। ১ মার্চ ১৯৯৪ যুক্তিবাদী দিবস। বর্ষ - ৩, সংখ্যা - ৩। রাজেশ দত্ত (সম্পাদিত), যুক্তিবাদী তদন্ত সংকলন, কলকাতা, ১৯৯৮।

২৬। সম্পাদক দপ্তর : প্রবীর ঘোষ ও আ.রা পাঁচজন, কলিকাতা।

২৭। বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় "আন্ত্রিক নয় কলেরা, বিশ্বব্যাপী মহামারীর আশঙ্কা" যুক্তিবাদী, বর্ষ - ২, সংখ্যা - ৪, কলকাতা, ১৯৯৩।

২৮। প্রদীপ চক্রবর্তী - "বালকবাবার কিস্সা", যুক্তিবাদী, বর্ষ-২, সংখ্যা - ৪, কলকাতা, ১৯৯৩।

২৯। প্রবীর ঘোষের বিভিন্ন লেখার সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা পরে বেরিয়েছে 'অলৌকিক নয় লৌকিক'-এর বিভিন্ন খণ্ডে ও "সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ' গ্রন্থে। এছাড়া এপ্রসঙ্গে দেবাশিস ভট্টাচার্যর যুক্তিবাদী পত্রিকাতে প্রকাশিত ধারাবাহিক রচনা 'প্রসঙ্গ যুক্তিবাদ' বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

৩০। প্রদীপ ঘোষের 'বহিষ্কার', যুক্তিবাদী, বিশেষ বইমেলা বুলেটিন - কলকাতা বইমেলা, ১৯৯৭ ও সমিতি প্রকাশিত অনান্য প্রচার পত্র।

৩১। অলৌকিক নয় লৌকিক (এযাবৎ চারটি খণ্ড প্রকাশিত), পিংকি ও অলৌকিক বাবা, অলৌকিক রহস্য সন্ধানে পিংকি, অলৌকিক রহস্য জালে পিংকি প্রভৃতি।

নব্যপ্রস্তরযুগের বিপ্লব — একটু ভেবে দেখা

বিমান সমাদ্দার

পুরাপ্রস্তর যুগের শেষ পর্বে 'তৃতীয় শিম্পাঞ্জী'রা অস্ত্র শস্ত্র নির্মাণে আপাত দক্ষতার পরিচয় দিলেও শিকার কেন্দ্রীকতা থেকে তারা মুক্ত ছিলনা। এ সময় আকস্মিকভাবে অসাবধানতা বশত শস্য ফলানোর কৌশল আবিষ্কার তাকে খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকে পরিণত করে। সকল ইতিহাসবোদ্ধার ন্যায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গর্ডন চাইল্ড তার *Man Makes Himself* গ্রন্থে ও জে.ডি. বার্নাল তার *Science in History* গ্রন্থে, উভয়েই, মানুষের বস্তুগত ও সামাজিক অস্তিত্বের ছাঁদ বদলে দেওয়া এই ঘটনাকে 'নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব' বলেছেন। বর্তমানে বহুবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে এ যুগের সীমারেখা ১০,০০০ থেকে ৬,০০০ খৃস্টপূর্বাব্দ বলে চিহ্নিত হয়েছে।

চাইল্ড ও বার্নাল দুজনেই 'বিপ্লব' হিসাবে মেনে নিলেও দুজনের কাছে বিপ্লবের সূত্রধর পৃথক। বার্নাল কৃষির আবিষ্কারকেই এ বিপ্লবের সূত্রধর বলেছেন। অন্যদিকে চাইল্ডের মতে নতুন যুগের নতুন প্রযুক্তিবিদ্যাই এ বিপ্লবের সূত্রধর, কৃষি নয়। এ মতপার্থক্যের উৎস কী ? কেন এই যুগকে 'বিপ্লব' আখ্যা দেওয়া হল ?

কেম্ব্রিজ এনসাইক্লোপিডিয়ার মতে পুরাপ্রস্তর নব্যপ্রস্তর যুগ বিভাজন ষোড়শ শতকে জনৈক মার্কেটি চালু করেন। তাকে বহাল রাখেন উনবিংশ শতকে জনৈক টমসন।

নব্যপ্রস্তরযুগ হল পুরাতন পাথরের যন্ত্রপাতি থেকে নতুন ধরনের যন্ত্রে উত্তরণের যুগ। এযুগে হারপুন, ধনুক, বর্শা, সুঁচ ইত্যাদি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। পুরাপ্রস্তর যুগে একটি যন্ত্রে অনেক কাজের সমাধান হতো, এখানে তার বদলে এক একটি কাজের এক একটি যন্ত্র হল। তবে উত্তরণ কেবল যন্ত্রের ক্ষেত্রেই ঘটেনি। একদিকে ছিল উৎপাদনের ছাঁদ বদলে দেওয়া। কৃষি পশুপালন, মৃৎপাত্র নির্মাণ, বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্মাণ ও সর্বোপরি নিওলিথিক যুগের ধাতু ও কাচ আবিষ্কার ছিল মানব জীবন পথের একেকটি সিঁড়ির ধাপ। আর এসেছিল মানসিকতার পরিবর্তন— কিছু আত্মবিশ্বাস অর্জন — সমাজ গঠন ইত্যাদি। আরও এলো জীবনের ক্ষেত্রে হিসাব নিকাশ।

তাহলে সামাজিক আলোচনাকে তিনটি অংশে ভাগ করা চলে — ১. বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ। ২. মনোজগতে সে আবিষ্কার সমূহের অভিঘাত। ৩. উভয়ের মেলবন্ধন কি বিপ্লবের জন্ম দেয় ?

নব্য প্রস্তর যুগের সবচেয়ে বিতর্কিত ও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল কৃষি। ফলে নতুন

প্রযুক্তির আবিষ্কার হয়। নিওলিথিক কৃষির উৎপত্তি হয়েছিল 'ফার্টাইল ক্রেসেন্ট' অঞ্চলে অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকা, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য ও ভারতবর্ষ জুড়ে গঠিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি এলাকায়। বিশেষত ওয়াদি এল নাটুফ থেকে পাওয়া গেছে কয়েকটি কাস্তে ও ছুরি, যাদের গয়ে শস্য কাটবার জন্য ঘর্ষণজনিত মসৃণতা বিদ্যমান। এছাড়াও শস্য ভাঙা পেষাই করবার জন্য খল ও অন্যান্য যন্ত্রও দেখা গেছে। টেল হাসুনা ও টেপ শিয়ালক নামক স্থান থেকেও উপরিউক্ত বস্তুগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এ বিষয়ে সব থেকে বেশি দ্রব্য মিলেছে মিশরের ফায়ুম হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চলে।

কৃষির আবিষ্কার হয়েছিল নদী তীরে, মেয়েদের হাতে। পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে আসে ব্যাপক কৃষিকার্য। ফলে প্রয়োজন হয় উচ্চমানের বীজ, জলসেচ ও সারের। সংকর বীজ উৎপাদিত হলেও তারা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করতে জানত না। এজন্য প্রথমে স্থায়ী বসতি গড়তে পারেনি।

কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এবং আনুসঙ্গিক অন্য এক প্রস্থ প্রকৌশলের উদ্ভব হলো। শস্য কাটবার যন্ত্র, শস্য সংরক্ষণের পাত্র এবং পশুপালন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হল।

কৃষিজীবীরা তাদের উদ্বৃত্ত বা বাতিল শস্য দিয়ে গবাদি পশুকে আকর্ষণ করে ও পোষ মানায়। ফলে সম্পূর্ণ সুরাহা হয় তাদের খাদ্য সমস্যার। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সে আনুসঙ্গিক উন্নতিতে মন দেয়।

শস্যের সংরক্ষণের জন্য চাই পাত্র। প্রথমে ঝুড়ির উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে নির্মিত হলেও সম্পূর্ণ মাটির তৈরি আগুনে পোড়ানো পাত্রও দ্রুত আবিষ্কৃত হয়। পোড়া মৃৎপাত্র আবিষ্কার হয়। পোড়া মৃৎপাত্র আবিষ্কার ছিলো প্রাচীন মানুষের প্রথম রাসায়নিক পরিবর্তন সম্বলিত এক জটিল আবিষ্কার। হাইড্রেটেড অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট থেকে ৬০০০ উষ্ণতায় জলের অনু বেরিয়ে গিয়ে তা শক্ত রূপ নেয়। কিন্তু এর জন্য পরিবেশ, পরিস্থিতি ও উপাদান বাছাই খুবই কঠিন কাজ। আবার উন্মুক্ত চুল্লীতে মৃৎপাত্র পোড়ালে লাল ফোরিক অক্সাইড (FeO) তৈরি হয়। ফলে পাত্র হয় লাল রং- এর। কাঠকয়লা চাপ দিয়ে বদ্ধ চুল্লীতে পোড়ালে কালো ফেরোসোফিরিক অক্সাইড (Fe_2O_3) উৎপন্ন হয় বলে মৃৎপাত্র হয় কালো রঙের। তারা এ রসায়ন না জানলেও অভিজ্ঞতা ও সক্রমিক আবিষ্কার থেকে এগুলি তৈরি হয়েছিল।

খাদ্যের যোগান ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে মানুষ মন দিল একটু ভোগবিলাসের দিকে। প্রথম চাহিদা হলো পোষাক। প্রাথমিক ভাবে চামড়ার পোষাক ব্যবহৃত হলেও এ সময় পশম, তুলো, তিসি ও লিনেনের পোষাক ব্যবহৃত হতে থাকে। কিন্তু এ সমস্ত উৎপাদন পদ্ধতি ছিল জটিল ও কঠিন।

এদিকে চাষবাস ও পশুপালন চলতে থাকলে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ স্থায়ী আবাসের প্রয়োজন বোঝে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (খণ্ড ২৬) বলে, মধ্য ইউরোপের প্রাচীনতম গৃহ ছিল ১৩৫ ফুট লম্বা যার মধ্যে একটি গোষ্ঠী তার সমস্ত উপকরণ সহ ঢুকে যেত। এখান থেকে উৎপত্তি হতে থাকে পৃথক পৃথক গৃহের । এছাড়াও সুইজারল্যাণ্ডে একটি হ্রদের উপর সম্পূর্ণ একটি গ্রামকে খুঁটি পুঁতে গড়ে তোলা হয়েছিলো।

নিওলিথিক যুগে পাথরের অস্ত্র ব্যবহারে একটি বিশেষত্ব দেখা যায়, তা হলো ফ্লিন্ট

(চকমকি) পাথরের ব্যবহার। এ পাথর কম ক্ষয় হয়, ফলে অস্ত্র বহুদিন সচল থাকে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি কাজের জন্য পৃথক পৃথক অস্ত্র নির্মান গুরুত্ব পায়। পুরাপ্রস্তর যুগে একটি অস্ত্র দিয়েই অনেক কাজ চালানো হত। নব্য প্রস্তর যুগে বিভিন্ন অস্ত্র বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তৈরি হতে থাকে। বিশেষতর কুঠার তৈরি হয়, তার ফলায় গর্ত করে হাতলও লাগানো হয়, হরিণের পেশিতন্তু দিয়ে দুটিকে বাঁধা হয়। এ কুঠারগুলি কেবল যুদ্ধে ব্যবহৃত হত না, দৈনন্দিন জীবনেও কাজে লাগতো। গ্রেগ লুইড, উত্তর ওয়েলসের তৈরি করা কুঠার উইল্টশায়ার প্রভৃতি অঞ্চলে রপ্তানী করা হত।

আর. জি. ব্রেইনউড বলেছেন, অস্ত্রের রপ্তানী হতনা। নিওলিথিক সমাজ খাদ্য ও দৈনিক প্রয়োজনের জিনিসে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। বিলাসদ্রব্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দূর পথে বাণিজ্য করা হত। বিশেষতর ঝিনুক ও শাঁখের কাজে বল্কান অঞ্চল ও আম্বায়ের কাজে পূর্ব প্রাশিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে ছিল। পরবর্তীকালে ধাতুদ্রব্য আবিষ্কৃত হলে তার বাণিজ্য হতে থাকে।

আবার নিওলিথিক শিকারচিত্র বাদে তাদের বেশিরভাগ আর্টই ছিল জ্যামিতিক। বিশেষতঃ সে যুগের মৃৎপাত্রে তারা যোগফল রেখাচিত্র আঁকত তার থেকেই জ্যামিতিক চিন্তাভাবনার সূচনা বলে জে. ডি. বার্নাল মনে করেন।

নিওলিথিক মানুষ কিন্তু খনিবিদ্যাও জানত, জানত খনি থেকে ধাতু বার করে আনতে; আর. জি. ব্রেনউড তাঁর গ্রন্থে নিওলিথিক খনিবিদ্যার বর্ণনা দিয়েছেন। সে খনি অবশ্য ২০ ফুটের বেশি গভীর হতনা। তবে ছাদকে ধরে রাখার জন্য এখনকার মতো পিলার রাখা হত।

সোনা ছিল প্রাচীনতম অবিষ্কৃত ধাতু । পরবর্তী কালে তারা আবিষ্কার করে তামা। ব্রোঞ্জ, পিতল প্রভৃতি সংকরধাতু নির্মাণ কৌশল তারা শেখে। আর প্রাথমিক লোহা নিস্কাশন শুরু হয়। চুল্লীর ব্যবহারও শুরু হয়। তবে ততদিনে নিওলিথিক যুগ গত হয়েছে।

নব্য প্রস্তরযুগেই ধাতুযুগ এসে গেছে। তাহলে নব্যপ্রস্তর যুগ আর ধাতুযুগকে আলাদা করি কি করে ? আর যদি তাদের পৃথকীকরণ অসম্ভব হয়, তাহলে নব্যপ্রস্তর যুগের আবিষ্কার কে 'বিপ্লব' বলি কি করে ?

ধাতুর চেয়ে অনেক পুরানো ছিলো কাচের আবিষ্কার। ১২,০০০ খ্রী: পূ: তে মিশরে কাচ আবিষ্কৃত হয়েছিল। কাচ তৈরি ছিল বিশেষ কঠিন ও জটিল প্রক্রিয়া। সুতরাং একথা খুবই স্পষ্ট যে নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ যে হাতে প্রস্তরের অস্ত্র ধরতো, সে হাতেই অতি ভঙ্গুর কাচকেও তৈরি করতে সক্ষম ছিল।

উপরিউক্ত আলোচনায় কেবল আবিষ্কারের কথা আলোচিত হলো। কিন্তু মনোজগতে এ আবিষ্কারের অভিঘাত পড়েছিল বিরাট। তবে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেবার বদলে পরিবর্তনগুলিকে তুলে ধরাই বাঞ্ছনীয়।

প্রথমত : কৃষির জন্য বেশ কয়েকটি বীজকে বিসর্জন দিতে হয়। মানুষ তখনই তা করবে, যখন সে জানবে যে বিসর্জনের পরে অনেক বেশি শস্য সে ফিরে পাবে। সুতরাং এ পদ্ধতিও তাকে অনুধাবন করা দীর্ঘ কয়েক বছরের বিষয়।

দ্বিতয়ত: মৃৎপাত্র গড়বার একটা মানসিক অভিঘাত আছে। একতাল জড় পদার্থ মাটি মানুষের হাতের স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠে ইচ্ছা মতন আকার নেয়। এই ঘটনার ফলে মানুষ

নিজেকে স্রষ্টার আসনে আসীন দেখতে চায়। ফলে তার আত্মবিশ্বাস ও পরীক্ষা নিরীক্ষাব উদ্যম বহুগুন বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত: সুতো বোনা ছিলো একটা জটিল বিষয়। তুলো পেঁজা, সুতো নির্মাণ, তকলি ঘোরানো, প্রভৃতি থেকে জ্যামিতি ও পাটিগণিতের জ্ঞান আহরণ অসম্ভব নয়।

একই কথা প্রযোজ্য কাচ ও ধাতু সম্বন্ধেও। কাচের ন্যায় সৌন্দর্যময় ঝলমলে ও শক্তিশালী বস্তুকে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করে মানুষ নিজেকে জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তিধর ভাবতে পারে।

বিজ্ঞান ও সমাজের যুগপৎ অগ্রগতির ফলে যে সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয় সেখানে উর্বরতার জন্য বলিদান, আচার অনুষ্ঠান এককথায় কুসংস্কার জন্ম নেয়। উদাহরণ স্বরূপ ব্রিটেনের স্টোনহেঞ্জের কথা বলা চলে। এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা স্টোনহেঞ্জকে আচার অনুষ্ঠান পালনের স্থান বললেও দূরদর্শনের ডিসকভারি চ্যানেলের এক অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ পরমনোবিজ্ঞানীরা (para psychologist) বলেন, ওখানে এমন এক পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল, যার স্পর্শে শরীরে এক বৈদ্যুতিক তরঙ্গ খেলে যায়। ফলে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হয়।

একই সময়ে চাষ প্রথা এনে দেয় ঋতুচক্রের বোধ। তেমনি আবিষ্কৃত হয় নারীর ঋতুচক্র। উভয়ের আবর্তন দেখে মানুষ নারীকে প্রকৃতির আসনে বসায়। বিশেষত জমি যেমন বছরে একবার ফলন দেয়, নারীও তেমনি বছরে একবার গর্ভবতী হয় এসকল তথ্যকে একত্রে আবিষ্কার করে তারা পুলকিত হয়ে ওঠে।

সর্বোপরি তখনকার যুগে চাষ করে তার ফল পাবার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হতো। ফলে কাজ করে তার ফল পাবার বোধ জন্ম নেয়। যীশু *New Testament*-এ বলেছিলেন "As you now, so you reap" মানুষ কাজ করে তার ফল লাভের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। একই সঙ্গে গড়ে ওঠে পাপ পুন্যের বোধ।

নব্যপ্রস্তর ও তৎপরবর্তী যুগে প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার বিষয়টিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নারী কর্তৃক কৃষির আবিষ্কার হলেও শুরুটাই কৃষিযন্ত্রের নিয়ন্ত্রক। এখানে আশ্চর্যজনকভাবে শ্রমবিভাজন হয়ে গেছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রক পুরুষ। যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার করে কোন গোষ্ঠী শক্তি অর্জন করে বাকিদের দাসে পরিণত করে। সুতরাং যার কাছে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা সেই শক্তিমান। এ কারণেই সামাজিক হায়ারার্কিতেও শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে একত্রে প্রযুক্তিবিদ্যা ও যাদুবিদ্যা ব্যবহৃত হতে থাকে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ কেবল প্রযুক্তির আবিষ্কার নয় তার ব্যবহারের প্রকৃতিও। এ দুয়ের সমাহারই প্রগতির সূচক।

আমার আলোচনায় শেষ অংশ হলো এই বিশাল পরিবর্তন 'বিপ্লব' পদবাচ্য কিনা, তা নির্ণয় করা। বিপ্লব শব্দের অর্থ হলো আগের অবস্থার মূলোচ্ছেদ করে সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন। নব্য প্রস্তর যুগের বিপ্লবও এ কাজটাই ঘটিয়ে ছিলো। কিন্তু নব্যপ্রস্তর যুগের কোন আবিষ্কারই একদিনে ঘটেনি। এ যুগের ব্যপ্তি ছিলো প্রায় দীর্ঘ ১০,০০০ বছর। কোন বিপ্লব কি এত বড় সময় ধরে চলতে পারে ? তাহলে কি 'বিবর্তন' শব্দটিই যথার্থ নয় ?

নব্য প্রস্তর যুগে বিজ্ঞানের স্পর্শে পরিবর্তিত হয়েছে সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, নারী

পুরুষ সম্পর্ক। উদ্ভব হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির, জন্ম নিয়েছে বিচারব্যবস্থা, শুরু হয়েছে যৌথ প্রয়াসের, উর্বরতার জন্য বলিদান ও শুরু হয়েছে, জনগণ বেড়েছে, চাষবাস বেড়েছে, উদ্বৃত্ত উৎপাদন বেড়েছে, প্রাথমিক ভাবে কিছু কুসংস্কারের জন্ম হলেও বিজ্ঞানও নিঃসন্দেহে উন্নতিপ্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ এককথায় প্রগতি হয়েছে।

এ উন্নতি কি প্রকৃতই উন্নতি ? এতে বিজ্ঞানের ভূমিকা কতটা, বিশেষত সামগ্রিক পরিবর্তনগুলি কতটা বিপ্লবাত্মক ? মূল সমস্যাটা এখানেই। যদি বলি মানুষ খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হলো, তাহলে মনে হবে বিষয়টি 'বিপ্লব'। যদি বলি মানুষ ধাতু আবিষ্কার করলো, মনে হবে তা বিপ্লব। তেমনি বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্মাণ, অস্ত্র নির্মাণ, সবই বিপ্লবাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তাহলে একটি বিপ্লব অর্থাৎ নব্য প্রস্তর যুগের বিপ্লব কয়েকটি বিপ্লবের সমাহার।

পুরা প্রস্তর যুগ থেকে নব্য প্রস্তর যুগের রূপান্তরের বিষয়টি কি 'বিপ্লবাত্মক' ? কারণ ১০,০০০ বছর ধরে যে রূপান্তর তাকে 'বিপ্লব' আখ্যা দেওয়াটা একটু বেশি বেশিই।

বার্নাল ও চাইল্ডের দৃষ্টিভঙ্গি ভুল নয়। তারা বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে নব্য প্রস্তর যুগের সামগ্রিক পরিবর্তনকে একসঙ্গে দেখে তাকে 'বিপ্লব' বলেছেন, আর আমরা নব্যপ্রস্তব যুগের পরিবর্তনগুলিকে, নব্য প্রস্তর যুগের বিবর্তন বলার চেষ্টা করেছি। প্রকৃতপক্ষে নব্যপ্রস্তর যুগের প্রথমদিকে বিবর্তনবাদী তত্ত্ব খাপ খেয়ে গেলে আবিষ্কারের গতি বৃদ্ধি পায়। মানব মস্তিস্কের সফল প্রয়োগ দ্রুত নিজ পরিপার্শ্বিককে সুবিধাজনক করতে সচেষ্ট হয়। ফলে অস্ত্র ও যন্ত্র নির্মাণে নতুনত্ব বৃদ্ধি পায়। এই পর্যায়কে অবশ্য 'বিপ্লব' বলা যায়।

মিনোয়ান লিপি ও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব

দোয়েল দে

গ্রীস দেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভূমধ্য সাগরের মাঝে ছোট্ট অথচ সমৃদ্ধশালী এক দ্বীপ হল ক্রীট। এই দ্বীপ মূলতঃ নয়টি ছোট ছোট শহরের সমন্বয়ে গঠিত, যাদের ভাষা পরস্পর স্বতন্ত্র, যদিও কিছু সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই ক্রীট দ্বীপকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল মিনোয়ান সভ্যতা, যার অন্যতম একটি কেন্দ্র হল নোসাস।

ক্রীট লিপি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যে বিষয়টি আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে সেটি হল প্রাচীন ক্রীট দ্বীপ এবং এশিয়া মাইনরের মধ্যে একটি সমন্বয় আবিষ্কার যা মূলতঃ Bedrich Horzny-র ক্রীট লিপি (inscription) সংক্রান্ত ব্যাখ্যার ফলশ্রুতি। এই ব্যাখ্যা তাঁকে অপঠনীয় ক্রীট লিপির পাঠোদ্ধারে উদ্বুদ্ধ করল। যদিও তার অধিকাংশ প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, কিন্তু তাঁর গবেষণা হাইরোগ্লিফিক বা Hittite লিপির পাঠোদ্ধারে বহুলাংশে সহায়তা করে; ফলস্বরূপ মুখ্য ক্রীট লিপি — তথাকথিত লিপি পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়। উল্লেখ্য এই যে ক্রীট লিপির এই পাঠোদ্ধার আমাদের সামনে ক্রীট জনগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রচুর তথ্য উপস্থাপন করে এবং ক্রীট ও ঈজিয়ান অঞ্চলের মানবজাতি তত্ত্বের রূপরেখাকে নিশ্চিত করে।

ক্রীট লিপি, যা Ludwig Curtins-এর মতে "The greatest enigma of history" প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের অধীরতার কারণ হয়েছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল প্রাক্ হেলেনীয় জনগোষ্ঠী কিংবা তথাকথিত Pelasgians অথবা মাইকেনিয়ান সংস্কৃতি সংক্রান্ত নানা জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা তার সমাধান সূত্রের কাছাকাছি পৌঁছেছিল বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে যখন Sir Arthur Evans নোসাস দ্বীপে খনন কার্য চালিয়ে এক হাজার ছয়শোরও বেশি ক্রীট লিপি উৎকীর্ণ মাটির কলস আবিষ্কার করেন। এই ধরনের ফলক গ্রীসের মূল ভূখণ্ড, থিব্স, নেস্টর এবং পেলোপনেসাসেও পাওয়া গিয়েছে।

ক্রীট লিপির পাঠোদ্ধারের পর তার ক্রম উন্নয়নকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা তিনটি লিপি, যার ব্যাপ্তিকাল ২১০০ — ১৫৮০ খ্রী: পূ:, Linear Script A, সময়সীমা ১৬৫০-১৪০০ খ্রী: পূ:; Linear Script B যার কালসীমা ১৪৫০-১২০০ খ্রী: পূ:।

ক্রীট দ্বীপের হাইরোগ্লিফিক লিপি হল তথাকথিত চিত্রলিপি' যা সাধারণ বিষয়বস্তু যেমন : মাছ, তারা, হাত, পা ইত্যাদিকে উপস্থাপিত করে। এই লিপি মিশরীয় হাইরোগ্লিফিক লিপির সাথে সাদৃশ্য যুক্ত।

পরবর্তী পর্যায়ের Linear লিপির দুটি ভাগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, যাদের উদ্ভব হাইরোগ্লিফিক লিপির সরলীকরণের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে Linear লিপির মাধ্যমে হাইরোগ্লিফিকের চিত্রলিপিকে অনেক সংক্ষেপে ও দ্রুতগতিতে লেখা সম্ভব হয়েছিল। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাবে প্রাচীন লিপিটি Linear A নামে পরিচিত; যা নোসাস, Ayia, Triadae ও Zakro থেকে প্রাপ্ত মৃৎফলকে উৎকীর্ণ। কিন্তু একথাও উল্লেখ্য যে, Linear A লিপির অধিকাংশই কালি দিয়ে প্যাপিরাসের এর উপর লিখিত, ক্রীট দেশের জলবায়ুতে যার দীর্ঘদিন টিকে থাকা অসম্ভব।

এই লিপির পাঠোদ্ধারের ফলে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রথমতঃ চিহ্নগুলি এক-একটি পদাংশকে নির্দেশ করে এবং দ্বিতীয়তঃ এই ভাষা গ্রীক ভাষা নয়।

এই লিপির হাইক্সাস যুগের একটি স্তর আবিস্কৃত হয়েছে, যা রাজা Khyam এর সমসাময়িক। এমন কি এর প্রাথমিক স্তরটিও হাইক্সাস যুগের বলে প্রমাণিত, তাই এর সময়কাল নির্ধারণ করাও দুরূহ কাজ নয়। এর মতে এর সময়কাল ১৬৫০ খ্রী: পূ:।

ক্রীটের Phaistos ও অন্য স্থান থেকে পাওয়া এই লিপিগুলি প্রমাণ করে যে এগুলি দীর্ঘস্থায়ী। Phaistos-এর নিকটবর্তী রাজপ্রাসাদের খনন কার্যের ফলে প্রচুর এই ধরনের লিপি পাওয়া গিয়েছে, যার পরিমান নোসাস্-এর রাজপ্রাসাদে প্রাপ্ত লিপির তুলনায় অনেক বেশি। খ্রীট সভ্যতার এই পর্যায় প্রকৃত মিনোয়ান পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছে এবং এর ব্যাপ্তিকাল ১৫৮০ থেকে ১৪৫০ খ্রী: পূ:।

Linear A লিপিতে ১৫২টি চিহ্ন দেখা যায়, যার মধ্যে ৬৯টি Linear B-র সাথে সাদৃশ্য যুক্ত। লিপি তুলনামূলক ভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই লিপি পদ্ধতি ইভান্সের মতে ৭০টি স্বরধ্বনি সম্বলিত এক অত্যাবশ্যক পদ্ধতি, যা পুরাতন Linear A লিপির তথ্য ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত কিন্তু উন্নতভাবে পুনর্গঠন করা। এই লিপিব সাথে যুক্ত হয়েছে দশটি স্বরধ্বনি, ছয় থেকে সাতটি চিত্রলিপি যা এই শ্রেণীভুক্ত বিরল পদাংশের জন্য আপরিহার্য এবং অন্যান্য চিত্রলিপি, যা স্বরধ্বনি ব্যতীত এই শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য চিহ্নকে নির্দেশ করে।

নোসাসের এ এক আশ্চর্য লিপি, যার ব্যবহার ১৪৫০ থেকে ১২০০ খ্রী: পূ: মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই লিপি গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের লিপির সাথে কিয়দংশ সাদৃশ্যযুক্ত, যদিও কিছু স্থানীয় বৈচিত্র্য এর মধ্যে দেখা যায়।

এই লিপি Linear A লিপির ক্রমোন্নয়ন মাত্র নয়, ইহা হাইরোগ্লিফিকের থেকেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র্য কিন্তু ৮৭ টি চিহ্ন সম্বলিত এই লিপির বহু ভাবলেখ (ideograms) Linear A লিপির সাথে সাদৃশ্য যুক্ত।

ক্রীটিয়ানরা এই লিপি সমতল মৃৎফলকে উৎকীর্ণ করত। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল এই যে Papyrus-এর ব্যবহার জানা সত্ত্বেও কেন তারা মৃৎফলকে লিখত। এর দুটি সম্ভাব্য উত্তর পাওয়া যায়। প্রথমতঃ Papyrus মূলতঃ মিশর থেকে আমদানী করতে হত, এতে খরচ হত অনেক বেশি, যেখানে মাটি ছিল অনেক সস্তা। দ্বিতীয়তঃ ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণী Papyrus নষ্ট করে ফেলত, কিন্তু মৃৎ ফলক ছিল এধরনের যাবতীয় ভীতিমুক্ত। তাই আজও ক্রীটের যাদুঘরে Linear B লিপি সম্বলিত মৃৎফলক সংরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।

ইভান্স নোসাসের রাজপ্রাসাদ থেকে প্রায় চার হাজার লিপি উৎকীর্ণ মৃৎফলক উদ্ধার করেছেন। এর আনুমানিক সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী।

Linear B লিপির উপর এত বেশি গুরুত্ব দেবার কারণ হল এই যে, অধিকাংশ সংরক্ষিত লিপিই এই ধারা অনুসরণ করে। ভাষার দুর্বোধ্যতার কারণে এখনও পর্যন্ত কোন ক্রীটয়ান চিহ্নই পুরোপুরি পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যদিও ক্রীট লিপি পাঠোদ্ধারের জন্য অসংখ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার অধিকাংশই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ব্যর্থতার অন্যতম একটি প্রধান কারণ হল, এই লিপিকে সম্পূর্ণ গ্রীক লিপিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ভাষাটি গ্রীক ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। দ্বিতীয় কারণটি হল মিনোয়ান ভাষাতত্ত্বকে সাইপ্রিয়ান লিপি দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ক্রীট লিপির পাঠোদ্ধারে সাইপ্রিয়ান লিপির প্রয়োগ সম্পূর্ণ অবাস্তব।

প্রাথমিক পর্বে মনে করা হত যে, ক্রীটিয়ান লিপি প্রাচীন প্রাচ্যের লিপির সাথে বহুলাংশে সম্পর্কযুক্ত। যেমন : হাইরোগ্লিফিক Hillite, ব্যাবিলনীয়ান, Sinaitic ইত্যাদি। তবে ইহা বিশেষ ভাবে ফিনিশিয়ান ও মিশরীয় হাইরোগ্লিফিক লিপির সাথে সাদৃশ্য যুক্ত।

প্রথম শব্দের প্রথম চিহ্নটি সাইপ্রিয়ান 'ta' চিহ্নের অনুরূপ। দ্বিতীয় চিহ্নটি হাইরোগ্লিফিক Hittite চিহ্ন এবং Proto-Indian পদাংশ yâ এর সাথে অভিন্ন। আর তৃতীয় চিহ্নটি সাইপ্রিয়ান 'na' চিহ্নের সাথে সাদৃশ্য যুক্ত। ফলস্বরূপ প্রথম শব্দটি এভাবে পড়া যেতে পারে — ta — yâ —n(a)

দ্বিতীয় লাইনের প্রথম শব্দটিও শুরু হয়েছে একই ধরনের চিহ্ন দিয়ে, যা সাইপ্রিয়ান চিহ্ন 'ta' ও সময় বিশেষে 'i'এর অনুরূপ। তৃতীয় চিহ্নটি একটি পা (leg)-এর চিত্রকে উপস্থাপিত করেছে, যা মিশরীয় চিহ্ন " " এর অনুরূপ এবং b-কে নির্দেশ করে।

এইভাবে দেখা যায় যে এই লিপি এমন চিহ্নের মধ্যে সীমায়িত যা প্রায়শঃই হাইরোগ্লিফিক Hittite, Proto-Indian এবং Cuneiform Babylonian লিপিতে দেখা যায়।

নোসাসে প্রাপ্ত লিপির প্রথম চিহ্নটি একটু ভিন্ন:— Viz, yâ. এই ভাবে এই লিপির একটি শব্দ 'Patru' মূলতঃ ব্যাবিলন থেকে সংগৃহীত। তাই ক্রীট লিপির উপর ব্যাবিলনীয় প্রভাব দৃঢ়তর।

ক্রীট লিপির পাঠোদ্ধারে ব্যাবিলনীয় প্রভাব এক বিস্ময়কর অধ্যায়। প্রচুর ব্যাবিলনীয়ান 'Cylinder Seal' ক্রীটে পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও ক্রীটে প্রতিপাদক সর্বনাম (Demonstrative Pronoun) 'nat' পাওয়া গিয়েছে, যা হাইরোগ্লিফিক Hittite-এ পাওয়া যায় না। এই ভাবে বিভিন্ন যোগসূত্রের মাধ্যমে এই ভাষা দুটি ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষার মধ্যবর্তী স্থান দখল করে।

গ্রীসের থীবসে এরকমই একটি লিপি পাওয়া গিয়েছে, যাকে আপাত ভাবে ইন্দো ইউরোপীয়ান বলা যেতে পারে।

এর প্রথম চিহ্নটি ফিনিশিয়ান লিপি থেকে গৃহীত, যেখানে এর স্বরধ্বনি 'ta','t'; দ্বিতীয় চিহ্নটি ফিনিশিয়ান চিহ্ন ℊ কে স্মরণ করায়, যা 'r' কে নির্দেশ করে। এরপর একটি হাতের চিত্র পাওয়া যায়, যাকে 'i' হিসাবে পড়া হয়। ক্রীটিয়ান লিপির এই চিহ্ন মূলতঃ কোন

শহরের নামের আগে ব্যবহৃত হয়, যা শাসনকার্যের কেন্দ্র অথবা দেশের কেন্দ্র।

এই ক্রীট লিপি নির্দেশ করে যে, জনগোষ্ঠী সমরূপ ছিল। ইতিপূর্বেই থীব্‌স নগর থেকে প্রাপ্ত লিপির উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য একটি লিপি Cadmeion থেকে পাওয়া গিয়েছে, Bedrich Horozny -এর প্রতিলিপি করতে সমর্থ হয়েছেন। Hi --- La — n (â) / hu — ri -- vâ - n -- la -- hu - ra/

এই ভাবে ক্রীট লিপি আলোচনা প্রসঙ্গে নোসাস ফলকের উল্লেখ করা যেতে পারে, যার থেকে মিনোয়ান ক্রীটের বিস্তৃত বিববণ পাওয়া যায়, জানা যায় ক্রীটের কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থা তথা অর্থনীতির রূপরেখা, জনসংখ্যা, রাজপ্রাসাদ, শাসনব্যবস্থা কিংবা জিউস, হেরা, এথিনা ইত্যাদি দেবদেবীর কথা।

এই সমস্ত ফলকের মধ্যে উন্নতমানের সাহিত্য আশা করা অন্যায়। "They are simply administrative crumbs from the rich man's table" কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ অব্দের নোসাসের বাসিন্দারা আদিতে গ্রীক ছিলেন। লিপিগুলি এদেরই জ্ঞানপিপাসার পরিমার্জিত রূপ।

পরিশেষে, একথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিনোয়ান ক্রীটের লিপি সংক্রান্ত অধিকাংশ গবেষণাই প্রাথমিক উৎসের (Primary Source) অপ্রতুলতা ও দুর্বোধ্যতার কারণে প্রাথমিকোত্তর উৎসের (Secondary Source) উপর ভিত্তি করে বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তির দ্বারা একথাই বলা যায় যে, বহু ভাষার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত মিনোয়ান লিপির সাহিত্যমূল্য বিশেষ না থাকলেও এই লিপির মাধ্যমে তৎকালীন মিনোয়ান ক্রীটের সমাজ ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদির এক সার্বিক রূপচিত্র পাওয়া যায়, যার ঐতিহাসিক মূল্য অসীম তথা অনস্বীকার্য।

প্রাসঙ্গিকতা ও আদর্শ নিষ্ঠার আলোকে ইসলামে নারীর অবস্থান

শুকুর আলি মণ্ডল

বর্তমান ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো নারীর সামাজিক অবস্থানে নতুন চেতনা সৃষ্টি করেছে। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্যের যে শৃঙ্খল নারীজাতিকে দীর্ঘদিন শোষিত নিষ্পেষিত করে রেখেছিল বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো নারীজাতিকে সেই অবস্থানে থেকে নিঃসন্দেহে অনেকটাই মুক্তি দিয়েছে বা দিতে পেরেছে। কিন্তু তথাপিও এই প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার কাঠামোর মধ্যে ধর্ম এখনও একটি বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক শক্তি এবং আমাদের সামাজিক চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে সমাজে নারীর অবস্থান বিশ্লেষনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। ইসলাম সেইরূপ একটি ধর্ম যা সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার হজরত মহম্মদের মৃত্যুর ১২৫ বছরের মধ্যেই ইসলামীয় সামজ সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার আওতায় প্রবেশ করে এবং সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান ধারণা পরিপুষ্ট মানসিকতা নিয়েই ইসলামীয় সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।[১] দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে মুসলিম সমাজ এখনও এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাবিত। তাই বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে নতুন সামাজিক চেতনা নারী সমাজের মধ্যে গড়ে উঠেছে মুসলিম নারী সমাজও, সমাজে তাদের অবস্থন কোরাণের আত্মিক শক্তির আলোকে পুনর্মূল্যায়নের দাবী অবশ্যই রাখতে পারে।

ইসলামীয় মতাদর্শের আকর গ্রন্থ হিসাবে যে গ্রন্থকে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে তা হলো পবিত্র কোরাণ ও দ্বিতীয় গ্রন্থটি পবিত্র হাদিশ। পবিত্র কোরাণ মূলত সমাজের অবহেলিত এবং বঞ্চিত মানুষের অবস্থার কথাই তুলে ধরেছে এবং হজরত মহম্মদ তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত সংকীর্ণ ক্ষুদ্রচেতা অমানবিক প্রথার মধ্যে যথার্থই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করেছেন। 'মানব জাতির সাম্যভাব' এবং 'বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ' — কোরাণ-এ এই দুই মূলনীতির প্রায়োগিক দিকের প্রতি হজরত মহম্মদ সর্বদাই জোর দিয়েছে। যেমন বলা যায় হজরত মহম্মদ যখন মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন তখনই তিনি সংগ্রামরত মুসলমান এবং অ-মুসলমান, আরব এবং অ-আরববাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সাম্যের নীতিই প্রয়োগ করেছিলেন।[২] যাইহোক ইসলামের আবির্ভাবের দুইশতকের মধ্যেই হজরত মহম্মদের সাম্য নীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার আবর্তে সীমাবদ্ধ হতে

থাকে। এমনকি হজরত মহম্মদ এবং তাঁর অগ্রণী সাহাবাদের নামে প্রচারিত এবং আরোপিত অনেক বিশ্বাস, প্রথা, রীতিনীতি এবং মতামত যা আমরা দেখতে পাই তা নারীর অবমূল্যায়নের দিকটিকেই নির্দেশিত করে, অথচ এই সমস্ত অধিকাংশ বিশ্বাস পরম্পরা কৃত্রিম এবং সংযোজন বলেই মনে হয়। কিন্তু তথাপিও ঐ সব বিশ্বাস বা ঐতিহ্য সমাজে নির্ভরযোগ্য সংগ্রহ হিসাবে স্থান দখল করে আছে এই উদ্দেশ্যে যে যাতে ইসলামের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতকে প্রচলিত বিশ্বাস, ট্রাডিশন প্রভৃতিকে প্রকৃত সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।[৩] অথচ কোরাণের মূলনীতি বা আত্মিক শক্তিকে উপেক্ষা করে মুসলিম সমাজের ক্ষমতালিপ্সা রক্ষণশীল মৌলবাদী রাজনীতিবিদরা সমাজে নারীর অবস্থান নির্ণয়ে এই দুটি গ্রন্থকেই তাদের অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে থাকে, যদিও এই দুই গ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে বার বার নারী-পুরুষের সমাজ অবস্থানের কথা তো বলা হয়েছেই এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[৪]

আমাদের এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে আকরগ্রন্থ পবিত্র কোরাণের দুটি দিক আছে নরম্যাটিভ আদর্শ নিষ্ঠা এবং কনটেস্কটচুয়াল প্রাসঙ্গিকতার দিক।[৫] কোরাণে ঈশ্বর যা ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি সমাজে ব্যবহারিক জীবনের সত্বার কথাও সমানভাবেই বলা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র তা ঐশী হোক বা না হোক, কখনই তার সময়ের ইতিহাস সংস্কৃতি আদর্শ, ঐতিহ্য এবং সামাজিক আচার প্রথা ব্যতিরেকে উদ্ভব হয়নি এবং ইসলামীয় মতাদর্শের মহান গ্রন্থ কোরাণও তার ব্যতিক্রম নয়। আর এটাই হচ্ছে কোরাণের প্রাসঙ্গিকতার দিক। সুতরাং যখন মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থানের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়, তখন সেই সময়ের সংস্কৃতির, ঐতিহ্য, প্রচলিত বিশ্বাস, আচার প্রথার বলিষ্ঠ ভূমিকাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কোরাণের মূল উপাদানের মধ্যে আদর্শনিষ্ঠার তত্ত্বের ক্ষেত্রটির উল্লেখ যেমন দরকার তেমনি তার প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রটিকেও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনায় অনুসন্ধান করেই তবে নারীর অবস্থানের যথার্থতা নির্ণয় সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ধর্মবেত্তাগন প্রাসঙ্গিকতা এবং আদর্শনিষ্ঠা উভয় আলোকে নারীর অবস্থানকে বোঝার চেষ্টা করেননি। তাঁরা যদি পুনরায় আকর গ্রন্থ পবিত্র কোরাণের উদ্ভবের সময়ের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে স্মরণ করে পবিত্র কোরাণ অধ্যয়ন ও সঠিক ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হতেন তাহলে বোধ করি এটা খুব কষ্টকর হোতো না, সমাজ নারীর অবস্থান নির্ণয়ে, বর্তমান সময় কোন দৃষ্টিভঙ্গির দাবী রাখে।[৬]

ইসলাম অনুসারী সমাজব্যবস্থায় আরবীয় ধ্যান-ধারণার প্রভাব বিদ্যমান। হজরত মহম্মদের জীবিত অবস্থায় কোরাণ, হাদীস এবং বিশেষত মুসলিম আমলে সংগৃহীত প্রাচীন তথ্যাবলী থেকে জানা যায় প্রাক্-ইসলামীয় অবস্থায় আরবের অনেক গোত্রের ভিতর বহুবিবাহ প্রথা এবং হজরত মহম্মদের সময়ে সমাজ জীবনে নারীর স্থান ছিল অত্যন্ত অমানবিক, অসম্মানজনক, দুর্বিসহ। 'হামসায়'[৭] প্রাক্-ইসলামী আরবের অনেক তথ্য রয়েছে যার থেকে জানা যায় কন্যাদের জীবন্ত সমাধিস্থ করা একটি সম্মানজনক কাজ এবং এই কাজটি কোরাইশ এবং কিন্দাহ গোষ্ঠীর মধ্যে অধিক ছিল।[৮] ইসলামী জামানার প্রারম্ভ কালে স্ত্রীলোকদের মানমর্যাদাকে গৃহের আসবাবপত্রের সমতুল্য মনে করা হতো। বিশেষত বন্দী হওয়া স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে তো

কোন বাধাই ছিল না।[৯]

অবশ্য তাই বলে স্ত্রীলোকের উচ্চমর্যাদা ছিল না একথা বলা যায় না। *কিতাব-আল-আগানি*-তে এ সম্পর্কে অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেমন 'তাই' গোত্রের 'অওস' এর কন্যাদের বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখযোগ্য।[১০] সাধারণভাবে মুসলিম আমলের গোড়ার দিকে আরবের স্ত্রীলোক তার নিকটতম পুরুষ-আত্মীয় অর্থাৎ পিতা, ভ্রাতা, এবং স্বামীর নিকট বাধ্য থাকত এবং অন্যান্য বিষয় সম্পত্তির উপর অধিকারের মতো তাদের উপরও সেই অধিকার কায়েম করত। বস্তুত বিবাহ, সম্পত্তির এবং অন্যান্য বিষয়ে কোনো বিধিবদ্ধ আইন বা নীতিগত বাধ্যবাধকতা ছিল না। এমন কি কোনো গোত্রের লোক যদি নিজ গোত্রের বিবাহিতা স্ত্রীর সতীত্ব হানি করত, সে কোনো বে-আইনি বা অপমানজনক কাজ করছে বলে মনে করা হতো না এবং কবিরা প্রায়ই তাদের অপহৃতা প্রিয়ার জন্য গর্ববোধ করত। *হিন্দ-বিন-আতাবার* কাহিনীতে কোরেশ গোত্রের ফকিহ্-এর বিবাহের ঘটনা উল্লেখযোগ্য।[১১] হজরত মহম্মদ পূর্ব আরব সমাজে ক্রয়-বিক্রয় প্রথার মাধ্যমেও বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল এবং চুক্তিবদ্ধ বিবাহের ক্ষেত্রে প্রদত্ত অর্থে নারীর কোনো অধিকার ছিল না। প্রাক-ইসলামী পর্বে আরবদের আর্থিক অবস্থাই কেবল স্ত্রী সংখ্যা নির্ণয় করত; দেশের আইন বা দেশাচারে স্ত্রী সংখ্যা নির্দিষ্ট করার কোন বিধান ছিল না এবং এমন-কি অধিক সংখ্যায় স্ত্রী রাখা সামাজিক প্রতিপত্তিও গৌরবের নিদর্শন ছিল।[১২] 'জাহোলিয়া' আমলে বিবাহ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ এত নগণ্য ছিল যে ব্যক্তি তার পিতার বিধবা স্ত্রী অর্থাৎ বিমাতার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ছিল এবং হয় সে নিজেই তাকে বিবাহ করতো নয়তো অন্যের সাথে বিবাহ দিত। প্রসঙ্গক্রমে আবুল আরসির ঘটনা স্মরণ করতে পারি।[১৩] প্রাক্-ইসলামি আমলে 'মূতা' বিবাহ নামে এক বিবাহের প্রচলন ছিল যা আরবী বাগধারা বা বাকভঙ্গিগত অর্থ হয় 'আনন্দ উপভোগ' বা 'উপভোগের জন্য পুরুষাকার' ; আর এই বিবাহ প্রসঙ্গে 'উম্মে খারিজা' এবং 'হিমিরাইট সেইয়ে' দের কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। [১৪]

প্রাক-ইসলামী যুগে নারীজাতির প্রতি আরবীয় ধ্যান ধারণার পাশাপাশি অন্যান্য দেশের সমাজেও নারীজাতির অবস্থান প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য। সীরিয়, ফিনিসীয়, জাতি সমূহের মধ্যে বহু বিবাহ পশুত্বে পরিণত হয়েছিল। এমনকি প্রাচীন জাতি সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সভ্য ও সংস্কৃতিমনা এথেন্সবাসীদের মধ্যে নারী ছিল পণ্য বিশেষ, যা অন্যের বিক্রয় যোগ্য, হস্তান্তর এবং উইলযোগ্য।[১৫]

বহু বিবাহ ছাড়াও শর্ত সাপেক্ষ ও অস্থায়ী বিবাহ প্রচলিত ছিল। [১৬] তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রাক্-ইসলামী যুগে এবং হজরত মহম্মদের সময়েও আরব জাতি এবং তার পার্শ্ববর্তী জাতি সমূহের মধ্যেও এখন বহু প্রথা, সামাজিক, ধর্মীয় আচার-আচরণ প্রচলিত ছিল যা নারী জাতিকে পণ্যছাড়া অন্য কিছু ভাববার অবকাশ রাখেনি। ইতিহাসের এরূপ এক চরম মূহুর্তে ইসলামীয় মতাদর্শ নারী জাতির সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সন্দেহ নাই।

সভ্যতার ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে পুরুষের প্রাধান্য সকল সময়েই লক্ষণীয়। নারী, পুরুষের অধীনস্থ কিম্বা নারী, পুরুষের তুলনায় অবমানের, সম্ভবত এই ধারণা থেকেই অসাম্য

তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে।[৭] ইসলামীয় মতাদর্শের আকর গ্রন্থ কোরাণের আলোকে মুসলিক নারীর অবস্থান সম্পর্কে কোন কোন উলেমা এবং মুসলিম আইনবেত্তাগণ নির্দিষ্ট ভাবেই মনে করেন কোরাণ সমাজে নারীর অবমানের স্থানই নির্দেশ করেছে। আবার ইসলাম বিষয়ক বিশেজ্ঞদের মধ্যে কিছু কিছু উদার আধুনিক মনস্ক ব্যক্তি আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন পবিত্র গ্রন্থ কোরাণ সমাজে নারী পুরুষের সাম্য অবস্থানের কথাই নির্দেশ করেছ।[৮]

কোরাণীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী পুরুষ উভয়েই একই জীবন্ত সত্ত্বা 'নফ্‌স' (Nafs) থেকে সৃষ্টি বলে সূরা ৪:১; ১৬:৭২; ৭:১৯০ উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও ইসলামীয় পণ্ডিতগণ 'নফ্‌স' এই শব্দটি বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। সুরা ২:২৮৮ তে বলা হয়েছে Lahunna mithul Ladhi 'alayhına' অর্থাৎ নারী ও পুরুষের অধিকার সমান।[১০] সুরায় বলা হয়েছে নারী পুরুষ একে অপরের আচ্ছাদন অর্থাৎ পরিপূরক। মৌলানা মহঃ আলি বলেছেন — সুরা ৩৩:৩৫ এ অন্তত দশবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে নারী পুরুষের সমকক্ষ গুন অর্জন করতে পারে।[১১] মৌলনা কারী মহম্মদ তোয়েব, চিফ্‌ অফ্‌ দার-অল-উলুম দেওবন্দ, মনে করেন কোরাণ নারীকে সমাজে সমান অবস্থান তো বটেই এমন কি অনেক ক্ষেত্রে উচ্চে স্থান দিয়েছেন যেমন জ্ঞানদীপ্ত আয়েশা সম্পর্কে হজরত মহম্মদ স্বয়ং বলেছেন কোরাণের 'ওহী'র অর্থ অর্ধেকটা আমার সকল সাহাবাদের কাছ থেকে আর বাকী অর্ধেকটা আয়েশার কাছ থেকে অর্জন করা উচিত।[১২]

কোরাণের ৪:৩৪ সুরায় খুব নগণ্যভাবে হলেও পুরুষের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তৎকালীন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত অবশ্য বিচার্য্য।[১৩] হজরত মহম্মদের সময়ের সামাজিক পরিকাঠামোয় পরিপূর্ণ লিঙ্গ সাম্য মেনে নেওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়, যেখানে অমরা বর্তমান শতাব্দীর মাত্র ৬০ এর দশকে সার্বজনীন মানবিক অধিকার ঘোষণা করতে পেরেছি।[১৪] যাই হোক সুরা ৪:৩৪ এ 'ফাদিলাৎ' Fadilat শব্দটির ইংরাজি অনুবাদ Excellence, Supenority অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, লিঙ্গ প্রাধান্যের ক্ষেত্রে, নারী পুরুষের কর্তত্বাধীন, এই অর্থে নয়। মধ্যযুগীয় ৭ম শতাব্দীর সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদ অর্জন রক্ষণাবেক্ষণ এবং কর্মসম্পাদনের অগ্রগামী শ্রেণী হিসাবে পুরুষের প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল[১৫] যা সুস্পষ্ট ভাবেই কোরাণের প্রাসঙ্গিকতার দিক। প্রসঙ্গত মনে রাখা উচিত নারীর 'ডোমেস্‌টিক ওয়ারক্‌'-এর দিকটি এক্ষেত্রে অবহেলিত থেকেছে। যদিও কোরাণে ৫৩:৩৯ সুরায় নারীর ব্যবহারিক জীবনের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে — Laysalil ınsaneilla mas'a অর্থাৎ একজন তাই লাভ করবে যা সে অর্জন করবে।[১৬] এছাড়া সুরা ৪৫:২২; ২:২২৮; ২:২৮৬; ৩৩:৩৫; ৩:১৯৫; ২:২৫; ৩:১৬১; ১৬:৫১ প্রভৃতি ৫৩:৩৯ সুরার প্রতিধ্বনি মাত্র। আবার সুরা 'পিসা'য় Men are qAwwAM[১৭] i.e. maintainers, or managers of family affairs বলা হয়েছে এবং যা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কোরাণের প্রাসঙ্গিকতার দিকটিকেই তুলে ধরে, আদর্শ নিষ্ঠার নয়। সুরতাং পুরুষের আধিপত্য সম্পৃক্ত সুরাগুলি অধ্যয়নের সাথে সাথে সুরা ২:২৮১; ২:২৮৬; ২:২৫; ৩:১৬১; ১৬:৫১ ইত্যাদি সুরাগুলির গভীর অধ্যয়ন, অনুশীলন প্রয়োজন এবং কোরাণ যে নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে আদর্শ এবং ব্যবহারিক দিক থেকে অসাম্য নয়, বরং সাম্যের কথাই বার বার উল্লেখ করেছে তা স্পষ্ট।[১৮]

নারী পুরুষের সাম্য বা অসাম্য বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৪:৩৪ সুরা অবলম্বন করেই মৌলবাদী গোঁড়া উলেমাগণ নারীর প্রতি পুরুষের আধিপত্যের যে দাবী করে তা পরিপ্রেক্ষিতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই। বিখ্যাত কোরণীয় টীকাকার জামাখসারী সুরাটির প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে সা'দ বিন রাবী তাঁর স্ত্রী হাবিবা বিন জায়েদকে দৈহিক আঘাত করা ; আবু বকরের কন্যা আসমা'র প্রতি স্বামীর দৈহিক আঘাত এবং ভালো সংখ্যার একদল মহিলার তাঁর বাড়ীতে এসে স্বামীদের আঘাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ ইত্যাদি ঘটনায় তিনি স্বামীদের প্রতিও সমআচরণের কথা বলেছিলেন।[২৮] কিন্তু মদিনাবাসী বিশেষত ওমর হজরত মহম্মদকে অনুরোধ করলেন তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য এবং মানবদরদী হজরত মহম্মদ বুঝলেন তাঁর এই বক্তব্য সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এই কারণে তৎকালীন গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাই পুরুষ আধিপত্যে সরব এবং এটা সম্পূর্ণই প্রাসঙ্গিকতার দিক আদর্শ নিষ্ঠার দিক নয়। জামাখসারী মনে করেন ৪: ৩৪ সুরা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তার সাথে পুরুষের পূর্ণ কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ, আনুগত্য বা শোষণের বা আঘাতের কোন সম্পর্ক নেই, এটি একটি সাময়িক ব্যবস্থা। কারণ এই সুরা একটু বিশ্লেষণেই এর আদর্শ নিষ্ঠার দিকটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ৪:৩৪ সুরায় আরবী শব্দটি, জামাখ-সারী, অল-রাজী, আহমদ আলি প্রভৃতি বিখ্যাত ইসলামীয় পণ্ডিতগণের মতে "আল্লার প্রতি আজ্ঞানুবর্ত্তী"[৩০] তার কথা বলা হয়েছে, অন্য কারুর প্রতি নয়। পাকিস্তানের বিদগ্ধ কোরাণীয় টাকাকার মৌলানা পারভেজ সাহেবও ৪:৩৪ সুরা ব্যাখ্যায় নারী পুরুষের সম অবস্থানের কথা বলেছেন। মৌলানা ওমর আহমদ ওসামানী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন ৪:৩৪ সুরায় বলা হয়েছে —bima fadal Allahu b'aduhum 'ala b'din (altlha has made some of them to excell others) নিশ্চয়ই নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যের বিষয়টি বলা হয়নি; যদি তাই হতো তাহলে বলা থাকত — bima fadda-lahum `alayhinna [ He made them (i.e. men) Superior to them (i.e. Women)] কিম্বা আরো নির্দিষ্ট ভাবে বলা থাকত — bima faddalar rijala `alannisa' অর্থাৎ Excelled men over women.[৩১] আরো উল্লেখযোগ্য নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে হজযাত্রার উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য।[৩১] কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় যখন গোঁড়া উলেমা এবং আইনবেত্তাগণ সুরাটির প্রাসঙ্গিকতার দিকটি অবজ্ঞা করে আদর্শনিষ্ঠার দিকটি একমাত্র গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। কিছু কিছু ধর্মান্ধ যুক্তিহীন, মৌলবাদী অসহিষ্ণু ধর্মবেত্তাগণ সুরা ২:২২৮ এর lirrijala `alayhinna darajatun অর্থাৎ Men are degree above them(women)[৩২] অংশটি ব্যবহার করে অত্যন্ত নির্লজ্জের মতো সুরার আগের অংশটি চেপে গিয়ে নারী পুরুষের কর্তৃত্বাধীন এটাই প্রচার করে থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে গোঁড়া ধর্মবেত্তাগণ কোরাণের মূল আদর্শ উদার চেতা আধুনিক মনস্ক (মডার্ন লিবারেল) ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের মতো ব্যাখ্যার দ্বারা লঘু করার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ করে থাকেন। নিঃসন্দেহে এরূপ ক্ষেত্রে বিষয়গুলি অবশ্যই পুংখানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের দাবী রাখে। কিন্তু এর অর্থ কখনই এটা হতে পারে না যে কয়েকজন উলেমা তাঁরাই ইসলামীয় মতাদর্শের আকর গ্রন্থ কোরাণের মূল নীতির শেষ এবং চরম বিশ্লেষক। মুসলিম সমাজের সৈয়দ আমীর আলি, বিখ্যাত কবি দার্শনিক মহঃ ইকবাল,

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ আলি, শাহওয়ালিউল্লাহ এবং আবদুহ্ এর মতো প্রগতিশীল চিন্তানায়করা কোরাণের মূল নীতি ব্যাখ্যায় সমাজে নারীর অবস্থান নির্ণয়ে যে মূল্যায়ন করেছেন, তা কি তাঁদের তফ্‌সীর বায় আল রায় কোরাণের অপব্যাখ্যা মাত্র ? অন্তত এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে দ্বিতীয় কোনো মত শোনা যায়নি।[৩৪] যাই হোক এটা অবশ্য স্বীকার্য্য যে কোরাণ কোন ক্ষেত্রেই— তা তিনি যত বড় উলেমাই হোন, ধর্মবেত্তা হোন বা শাস্ত্রজ্ঞ হোন, কিম্বা রাজনীতিক ক্ষমতা সম্পন্ন খালিফাই হোন— নিজের পছন্দ মতো ব্যাখ্যা অনুমোদন করেনি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে কোরাণীয় অর্থের বিশ্লেষণে কেউ চিন্তা যুক্তি, বুদ্ধি, উপলব্ধি, স্বজ্ঞা কোন কিছুই প্রয়োগ করতে পারবে না। কারণ কোরাণে ৪৭:২৪ সুরায় পরিস্কার বলা হয়েছে হৃদয়কে আবদ্ধ করো না।

৭ম শতাব্দীতে ইসলাম সামাজিক এবং রাজনৈতিক উভয়দিক থেকেই প্রাক্-ইসলামীয় চিন্তা ধারার ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইসলামের বিকাশের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতকের মধ্যেই প্রাক্-ইসলামীয় সমাজ ব্যবস্থার অনেক 'ধ্যান-ধারণা' এক 'বৈশিষ্ট্য' ইসলামীয় সমাজ কাঠামোয় পুনরায় দৃঢ়ভাবে স্থান দখল করে নিয়েছে।[৩৫] তবে একথা অনস্বীকার্য যে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে দাঁড়িয়েও বিশ্বের অগ্রগণ্য ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের অসাম্যের বিষয়টি সুক্ষ্ম বা স্থূল যেভাবেই হোক যা আজও বিদ্যমান, তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামীয় মতাদর্শে তা নিশ্চয়ই আশা করা যায় না, বরং ভেবে অবাক হতে হয় মধ্যযুগীয় চিন্তা ভাবনার পরিবেশ থেকে উৎসারিত ইসলামীয় আদর্শ কিভাবে অংশত হলেও কিছু কালের জন্যও প্রচলিত হয়েছিল। এবং সম্ভবত এই জন্যই বিভিন্ন মনীষীগণ[৩৬] ইসলামীয় আদর্শে নারীর অবস্থানের বিষয়টি অত্যান্ত দৃঢ়তার সাথে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে বিশ্লেষণ করেছেন।

সুতরাং পরিবর্তনশীল সৃষ্টিশীল সামাজিক পরিকাঠামোয় সমাজ বিভাজনের নিয়মের পাশাপাশি, ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতার দিকগুলিকে সমান ভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।[৩৭] এবং ইসলামের আকর গ্রন্থ কোরাণের বিশ্লেষণে বিশেষ বিশেষ কতকগুলো সুরা নির্ধারিত করে প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি অবহেলা করে কেবলমাত্র আদর্শ নিষ্ঠার বিষয়টি বিশ্লেষণে নারীর অবস্থানের যথার্থ মূল্যায়ণের সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না।

সূত্র নির্দেশ

1. Asghar Ali Engineer, *The rights of women in Islam*, Sterling publishers pvt. Ltd. 1992, P.-V. N. Delhi,
2. S.T. Lokhandwala, *The Position of women under Islam*, Institute of Islamic Studies, Bombay, (Islamic perspective) p.9-10; Md. Akram Khan, Mostofacharit, Mohamodi Book Agency, Cal. 1934, p.726.
3. *Ibid* - 2, p. 17.
4. *Ibid* 1. p.43. 5. *Ibid* 1, p.10.
6. *Ibid* 1, p.VI B. Aisha Lemu and Fatima Heeren, *Women in Islam, Islamic Dimension*, Mumbai, New Crescent Publishing co Rept. 1997. p-30.
7. Ruben Levy. *Social Structure of Islam*, Cambridge 1955. Bengali Edition by Dr. Golam Rasul , Mollick Brothers Cal 1995. p.45; (b) Reynold A Nicholson, *A Literary History of the Arabs*, Kitab Bhavan, New Delhi 1994(repntd.) p-79.

8. (a) *Ibid* 7a P.45-46, (b) Ameer Ali, The Spirit of Islam: Chatto and Windus London 1922. p. 228; (c) *Sarat Chandra Chattopadhya Sarat Shohitya Samagrah*. Ananda Publishers, Calcutta, 1392(Bangala) p -1950 (d) *Ibid* 7(b) p.90
9 *Ibid* 7a. p.46.
10. (a) *Ibid* 7a, p.46-47. 7b p.87-89; 8a. p 248-49; (b) Muhammad Abdur Rahim *Nari*. Adhunik prokashani. Dacca. 1977 p.47.
11. *Ibid* 7a, P48. *Ibid* 7b, P.82.
12. (a) *Ibid* 7a. P-49.54 (b) Ahamad Ali, Al Islam. No. 8th and 9th 29 upper Circular Road, Cal- 1915. P.499-500. (c) MD. Akram Khan. Mostofa Charit. Mohamadi Book Agency Cal- 1934. p.178-179. (d) Muhamad Abdullah. *Bharat Varsha*. No Baisakha 1332(Bangla) p.709.
13. a) *Ibid*-7a. p-58; *Ibid*-12b, p.500, *Ibid*-12c, p.179; *Ibid* - 12d, p-709; (b) Rahula Sankrityayan, *Islam Dharmer Ruprekha*, Chirayat prokashan pvt Ltd Cal 1997(Bengali Edition) p.3.
14. *Ibid* 7a, p.72-73; Ibid- 8b p.227
15. *Ibid* 8b, p.222-223.
16. *Ibid* 8d. p.227 17. *Ibid* 0 1, p.41.
18. *Ibid* 1, p.40
19.(a) *Ibid* 1. p.42-43, (b) Board of Researchers. *Scientific Indications in the Holy Quran*, Islamic Ioundation. Bangladesh, Dhaka. 2nd edn 1995, p.112; (c) Yusuf Ali *The Holy uran*, Amana corp. Mary land, 1983. p.178, Note 501, (d) Muhammad Ali. *The Holy Quran*, Ahmadiyya Buildings. Lahore. 1916, p.198, Note 531; (e) Nazhat Afza *The posion of women in Islam* . *Islamic Dimensions*- Mumbai 1995, p.19
20. *Ibid* 1. p 44.
21. *Ibid* 1. p.44. *Ibid* 19c p.1116. Note 3719.
22. *Ibid* 1. p.43.
23. *Ibid* 8b. p.240. *Ibid* - 13b, p.8.
24. *Ibid* 2a. p.3
25. (a) *Ibid* 1. p 45. *Ibid*-10b, p.33. *Ibid* 2a, p 22: *Ibid* 19c. p.90; note-255; *Ibid* 19d. p.221.note 568. (B) Rafiq Zakari. *Muhamad and The Quran*, penguin Books India New Delhi 1991. p.115.
26.(a) *Ibid* 1. p.45, *Ibid*-19c, p 1449; (B) S.A.H.A. Nadwi. *Status of women in Islam* Academy of Islamic Research and publication Lucknow. p.2nd edn. 1995. p.12; *Ibid* 19c, p.23. *Ibid*-12b, p.502; *Ibid* 10b; p.27
27. *Ibid* 1, p.46. *Ibid* 19c, p.190, note 545; *Ibid* 19b. p.211. note 568;
28 (a) B. B Aisha Lemu and Fatima Heeren, *Women in Islam(Islamic Dimension)* new crescent publishing co. Delhi, rept. 1997. p.48-49; (b) *Ibid* 10b, p.23; *Ibid* 12b, p.428; *Ibid* 12b, p.708, 711.
29. *Ibid* 2a, p.22-23
30. *Ibid* 1. p.49. ibid 2a. p.22-23. *Ibid* 19c. p.1115. note 3710: *Ibid* 19c. p.221. note 569
31. *Ibid* 1, p.51 32. *Ibid* 12c, p.726.
33. *Ibid* 1, p.53. *Ibid* 19c. p.21. *Ibid* 19c. p.90. note 255
34. *Ibid* 1. p.3
35 (a) *Ibid* 1, p.57; (b) Shirley Guthrie, *Arab Social life in the middle Ages*, saqu Books London, 1995. p.166
36. *Ibid* 26b, p.15. *Ibid* 19c. p. 25, *Ibid* 12d, p.709
37. *Ibid* 12d, p.708,717. *Ibid* 28d. 28a, p.48-49

নানকার বিদ্রোহের স্বরূপ, কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণ ও পরিণতি

এ. টি. এম. আতিকুর রহমান

নানকার বিদ্রোহ একটি ব্যতিক্রমী কৃষক বিদ্রোহ। বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় কৃষকরা এতে অংশ নেয়। এ কৃষকদের পরিচিতি ছিল নানকার হিসেবে। নান শব্দের অর্থ রুটি। রুটি বা খাওয়ার বিনিময়ে জমিদার এক খণ্ড জমি নানকারদের দিয়ে দিতেন। সে জমি থেকে নানকারদের নিজের খাবার উৎপন্ন করে নিতে হতো। একই সঙ্গে তাকে পালন করতে হতো জামিদারের অনির্ধারিত আদেশ-নির্দেশ। নানকারের জীবন ও শ্রমশক্তির উপর জমিদারের ছিল সীমাহীন অধিকার। নানকার প্রজার গোটা পরিবারের উপর জমিদারের অধিকারের সীমা বিস্তৃত ছিল। প্রজাকে যখন তখন জমিদার জমি থেকে, ভিটে থেকে উচ্ছেদ করতে পারতো।[১] তাই জমিদারের ইচ্ছে অনিচ্ছায় সম্মতি দিয়ে চলা ছিল নানকার প্রজার প্রজাস্বত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র শর্ত।[২] নানকার প্রজাদের এ ধরনের ব্যবস্থা নানকার প্রথা হিসেবে পরিচিত। এ প্রথা ছিল মুগল আমলের অনুরূপ এক ধরনের ভূমিদাস প্রথা।[৩] বলা চলে এ প্রথা প্রায় আদিম দাস প্রথার অনুরূপ। এ বর্বর প্রথার বিরুদ্ধেই বর্তমান শতকের দুই, তিন ও চারের দশকে সিলেটে নানকারদের বিদ্রোহ পরিচালিত হয়।

সিলেটের নানকার প্রজারা শতশত বছর ধরে নির্বিবাদে নানকার প্রথা মেনে চলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে বৃটিশদের যুদ্ধায়োজন সিলেটের সমাজমানসে যে প্রভাব ফেলে একেবারে অন্ত্যজ শ্রেণী হলেও নানকারদের নিঃস্তরঙ্গ জীবনে তা কিছুটা আলোড়ন তৈরি করে। পরে যুদ্ধোত্তরকালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন তাদের পরিবর্তনকে আরও তরান্বিত করে। এ আন্দোলনের নেতাদের অসম্মতি সত্ত্বেও ভারতের বিভিন্ন স্থানে জনগণ সহিংস হয়ে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এ সময় সাধারণ মানুষের অসন্তোষ চেপে রাখার দীর্ঘদিনের অভ্যস্থ ধারার পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনের এ ঢেউ নানকার সমাজকেও নাড়া দেয়। সম্ভবত এর ফলেই ১৯২২ সালে সুনামগঞ্জের সুখাইর গ্রামে নানকার প্রজারা সর্ব প্রথম উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ করেন যা সুখাইর বিদ্রোহ হিসেবে পরিচিত। এ সময় নানকারদের মধ্যে গোষ্ঠীগত ও শ্রেণীগত চেতনার উন্মেষ লক্ষ করা যায়। তারা শুধু নিজেদের অঞ্চলে বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ রাখেনি। আত্মীয়তার সূত্রে দূরবর্তী গৌরারঙ্গ, বোয়ালজুর প্রভৃতি গ্রামগুলোতেও তারা বিদ্রোহের খবর পৌঁছে দেয়। ফলে সে অঞ্চলের জমিদারদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এ বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন নানকার ব্রজবাসী দাস।[৪] নানাকার ছাড়া সমাজের অন্যকোন

শ্রেণী এর সঙ্গে একাত্ম হয়নি। এক বছরের বেশি সময় এ বিদ্রোহ স্থায়ী হয়েছিল; পরে রাষ্ট্রযন্ত্র ও জমিদারদের সমবেত আক্রমণের মুখে বিদ্রোহ ভেঙে পরে।

সুখাইর বিদ্রোহের প্রায় এক দশক পরে ১৯৩১-৩২ সালে কুলাউরা অঞ্চলের নানকাররা বিদ্রোহ করে স্বসমাজের সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। সমকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 'আইন অমান্য' আন্দোলনসূত্রে এ বিদ্রোহের ব্যাপ্তি। এ সময় কংগ্রেস প্রভাবিত জাতীয় আন্দোলনের মঞ্চ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার ধ্বনি ওঠে। এ বিষয়ে সিলেটের স্থানীয় আন্দোলনসূত্রে নানকাররা বুঝতে শেখে স্বাধীনতার অর্থ নিজের উপর নিজের অধিকার। এ বোধ তাদের জমিদারী বোগর খাটার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে অনুপ্রাণিত করে। এতে তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 'আইন অমান্য' আন্দোলনকে জমিদারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় উচ্চবিত্ত নেতৃত্ব তাদের প্রয়াসে বাধা দেয়। এতে তারা বিদ্রোহী হয়। পরে কংগ্রেস 'আইন অমান্য' আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে নানকারদের বিদ্রোহেও ভাটা পড়ে। জমিদারদের দমন-পীড়নের মুখে এক বছরের মধ্যে বিদ্রোহের অবসান ঘটে। এ বিদ্রোহের ব্যাপ্তি বেশি না হলেও রাজনৈতিক ও শ্রেণী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য লক্ষণীয়।[৫] অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের একাংশের মধ্যে এ বিদ্রোহের প্রভাব পড়ে।

কুলাউরা বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে একই পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠিত হয় ভানুবিলের কৃষক বিদ্রোহ। মওলবী বাজারের ভানুবিলে প্রধানত মণিপুরী কৃষকরা বাস করতেন। সিলেটের অন্যান্য অঞ্চলের নানকারদের মত দীর্ঘদিন ধরে তারাও চরম নির্যাতিত ছিল। 'আইন অমান্য' আন্দোলনসূত্রে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩২ সালে তারা জমিদারদের খাজনা ও সরকারী ট্যাক্স দেয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন।[৬] এতে জমিদার ও সরকার তাদের বিরুদ্ধে দমননীতির আশ্রয় নেয়। প্রথমাবস্থায় দমননীতির বিরুদ্ধে কৃষকরা কংগ্রেসী 'ব্যবস্থাপত্র' অনুযায়ী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। পরে দমননীতির তীব্রতা বাড়লে তারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সক্রিয় প্রতিরোধ শুরু করেন। পরিবর্তিত অবস্থান থেকে কৃষকদের সরাতে না পেরে কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব নিজেদের বিদ্রোহ থেকে সরিয়ে নেন। অবশ্য নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসা কংগ্রেস কর্মীদের অনেকে কৃষকদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের আন্তরিকতার বন্ধন ছিন্ন করতে পারেননি। তারা কৃষকদের সঙ্গে মিলে সক্রিয় প্রতিরোধে যুক্ত থাকেন। নিম্নবর্গীয় কৃষক বিদ্রোহের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য অংশের এ সংযোগকালেই এর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে কমিউনিস্ট পার্টির। কমিউনিস্ট মতবাদে আকৃষ্ট মত্তবলী বাজারের যুবনেতা কংগ্রেস কর্মী দ্বারিকা গোস্বামীর মাধ্যমে এ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কলকাতা থেকে কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জী ভানুবিল পরিদর্শনে আসেন। তবে এ যোগাযোগ সত্ত্বেও বিদ্রোহে কোন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টি বিদ্রোহকে বিপ্লবী অভ্যুত্থানে পরিণত করার কোন প্রয়াস চালিয়ে ছিল বলেও জানা যায় না।[৭] সঙ্গত কারণেই ভানুবিল বিদ্রোহের তীব্রতা ক্রমে কমতে শুরু করে। ১৯৩৫ সালে বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

২

ভানুবিল কৃষক বিদ্রোহের পরে কমিউনিস্ট মতবাদে আকৃষ্ট সিলেটের কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এ যোগাযোগের ফলে ১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি কলকাতার পটুয়াটোলা লেনের এক মেসে গঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির সিলেট জেলা সংগঠন। লালা শরদিন্দু দে, চঞ্চল শর্মা, দীনেশ চৌধুরী, দিগেন দাশগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ(সম্পাদক) ও অমরেন্দ্র পাল (বিকল্প সদস্য) জেলা কমিটির অন্তর্ভুক্ত হন।[৮] এ কমিটি প্রগতিশীল কংগ্রেস কর্মীদের অবলম্বন করে দ্রুত সিলেটে পার্টি বিস্তারের কার্যক্রম শুরু করে। একই বছর সর্বভারতীয় পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক সংগঠন 'নিখিল ভারত কিষাণ সভা' গঠিত হলে এর শাখা হিসেবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 'সুরমা উপত্যাকা প্রাদেশিক কৃষক সভা' গঠিত হয়। এক বছরের মধ্যে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক কৃষক সভাব প্রথম সম্মেলন হয় সুনামগঞ্জের বেহেলী গ্রামে।[৯] সিলেটে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভা গঠিত হওয়ার পর থেকে সংগঠন দুটোর সঙ্গে নানকার বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। বলা যায় কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কৃষকসভার পরিচালনায় নানকার বিদ্রোহ সংগঠিত আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

কৃষক সভার পরিচালনায় ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে প্রায় সিলেটের সর্বত্র সংগঠিত কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর মধ্যে সুনামগঞ্জের ভাটিপাড়ার রফিনগর, সিলেট সদরের রণিকেলী ও ভাদেশ্বর এবং করিমগঞ্জের বাহাদুরপুর অঞ্চলগুলোতে আন্দোলনের রূপ ছিল নানকার বিদ্রোহ।[১০] বিদ্রোহের ফলে এ সকল এলাকার প্রথম দিকে জমিদাররা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তবে কৃষক সভা আন্দোলনকে জঙ্গী করতে উৎসাহী না হওয়ায় পরে নানকাররা পিছিয়ে পড়ে। অবশ্য এ সময় কৃষক সভার পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রেরণ, সভা-সমাবেশের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রতিবাদ, শহরে শহরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রভৃতির মাধ্যমে আন্দোলনের কর্মসূচি অব্যহত থাকে।[১১] এতে নানকারদের পক্ষে জনমত গড়ে উঠলেও তাদের নানকারী জীবনে কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নানকারদের উল্লেখযোগ্য কোন আন্দোলন বা বিদ্রোহের খবর জানা যায় না।

৩

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতের সর্বত্র বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ লড়াইয়ে নেমেছিলেন।[১২] এ সময়ে কৃষক আন্দোলন ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬ সালে প্রায় সমগ্র ভারতে একই সময়ে কৃষক আন্দোলনের বিকাশ প্রথমবারের মত লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।[১৩] এ পর্যায়ে বাংলার নানা অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তর বাংলায় বিভিন্ন জেলায় তে-ভাগার দাবিতে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়।[১৪] এ আন্দোলন ছিল কৃষক সভার সরাসরি তত্ত্বাবধানে। ১৯৪৬ সালেই কৃষক সভার প্রাদেশিক সম্মেলনে তে-ভাগার দাবিতে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত হয়।[১৫] এ সূত্রে সিলেটেও কৃষক সভা এবং কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তে-ভাগা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। তবে তা ফলপ্রসূ হয়নি। সিলেট অঞ্চলের বর্গাচাষীরা বেশি নিপীড়িত না হওয়ায় তে-ভাগার দাবি তেমন জনপ্রিয় হয়নি। অবশ্য এতদ্ সত্ত্বেও তে-ভাগা আন্দোলন প্রয়াস সিলেটের কৃষক সমাজের আন্দোলনমুখী প্রবণতা ও চিন্তা চেতনাকে আরও শানিত করে। এ অবস্থায় এতদ্

অঞ্চলের কৃষক সমাজের সর্বাধিক নির্যাতিত অংশ নানকারদের বিদ্রোহ-আন্দোলনের আগের ধারাকে অবলম্বন করে কৃষক সভার প্রয়াস আন্দোলন গড়ার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত করে।[১৬]

তে-ভাগা আন্দোলন শুরুর কালে জোয়াদ আলী, আবদুস সোবহান, নঈম উল্লাহ প্রমুখ নানকার নেতারা স্ব উদ্যোগেই আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে সম্ভবত নানকারদের উদ্যোগ-আয়োজন লক্ষ করে কৃষক সভা তে-ভাগা আন্দোলনের প্রয়াস বাদ দিয়ে লাউতা বাহাদুরপুরে নানকারদের প্রকাশ্য সভা আহ্বান করে। বৃদ্ধ নানকার তৈয়ব আলী এতে সভাপতিত্ব করেন। কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন জেলা সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাস সভায় যোগ দিয়েছিলেন।[১৭] এ সভার পর থেকে জমিদারী অত্যাচার ও নানকার প্রথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে অব্যাহত প্রচার কাজ চলে। ১৯৪৬ সালের মধ্যভাগে লাউতা বাহাদুরপুরের নানকাররা যথেষ্ট সংগঠিত হয়। লাউতা গ্রামের শেষ প্রান্তে তারা একটি ঘর তৈরি করে সেখানে আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপন করে। পরে ঘরটি কৃষক সমিতির অফিস হিসেবে পরিচিত হয়।[১৮] এ অফিসকে কেন্দ্র করে নানকারদের আন্দোলন ক্রমে বিস্তৃত হতে থাকে। এ পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির কাছে নানকার সমাজের ব্যাপক বিদ্রোহের সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়। কৃষক সভা সিলেটের বালাগঞ্জ থানার নিজবুরুঙ্গা গ্রামে নানকার আন্দোলনের কর্মী-সংগঠকদের এক সম্মেলন আহ্বান করে । এ সম্মেলনে ইতঃপূর্বে কৃষকসভার গৃহীত তে-ভাগা আন্দোলনের কর্মসূচির বদলে নানকারদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে সুরমা উপত্যকা প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক রোহিনী দাস আগেকার নানাকর আন্দোলন ও বিদ্রোহের বর্ণনা সংবলিত *নানকার বিদ্রোহ* নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। এ পুস্তক এবং উপযুক্ত সম্মেলন পরবর্তী পর্যায়ে সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে নানকার বিদ্রোহের বিস্তৃতিতে বিশেষ প্রভাব রাখে।[১৯]

১৯৪৬ সালের শেষের দিকে সিলেটের প্রায় সর্বত্র নানকার আন্দোলন জোরদার শুরু হয়। এ সময় লাউতা বাহাদুরপুরেরর নানকারদের উপর জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে। আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার জন্য এ পর্যায়ে গঠিত হয় বিভিন্ন কমিটি ও উপকমিটি। সাধারণ নানকার, কৃষক কর্মী এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি নিয়ে এ সময় একটি সমন্বিত কর্মোপযোগী কমিটি গঠিত হয়।[২০] নজিব আলী সভাপতি এবং অজয় ভট্টাচার্য এ কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কমিটি নানকার প্রথার পুরোপুরি উচ্ছেদসহ সর্বশ্রেণীর কৃষক-প্রজার স্বার্থ সংবলিত দাবিনামা তৈরি করে সংঘবদ্ধ ও সক্রিয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কৃষকদের কাছে আহ্বান জানায়। এ পর্যায়ে নানকারদের বেগারী বন্ধের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারিতে শত শত নানকার বেগারী বন্ধের দাবিতে বাহাদুরপুরে মিছিল বের করে। পরে তারা নিজেদের বেগারী বন্ধ করে দেয়। এ সময় স্বল্প ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক লোকজন নানকারদের সমর্থন করায় তারা আরও উজ্জীবিত হয়ে আন্দোলন তীব্র করে। খাজনা দেয়া কৃষকরা নানকারদের সমর্থনে অত্যাচারী জমিদারদের খাজনা বন্ধ করে দেয়। কোন কোন স্থানে জমিদারের চাষাবাদও বন্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষ এ সময় আন্দোলনের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়।[২১]

১৯৪৭ সালের এপ্রিলের মধ্যে নানকার আন্দোলনসূত্রে লাউতা বাহাদুরপুর অঞ্চলে

কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার ভিত্তি যথেষ্ট সুদৃঢ় হয়। কৃষক সভার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ অঞ্চল থেকে দূরবর্তী কানিশালী গ্রামে আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। অল্প সময়ের মধ্যে সেখান থেকে গোপালগঞ্জ থানার ঢাকা-দক্ষিণ, ফুলবাড়ি, রাণিকেলী, ভাদেশ্বর, আমুরা; বড়লেখা থানার দক্ষিণভাগ, বালাগঞ্জ থানার বোয়ালজুর, ফেচুগঞ্জ থানার মাউরাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিয়ানী বাজারসহ পার্শ্ববর্তী সবকটি অঞ্চল বিদ্রোহীদের আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। তবে সম্মিলিত আক্রমণ থেকে আন্দোলন টিকিয়ে রাখার জন্য এ সময় নানকারও প্রতি আক্রমণে সচেষ্ট হয়। ফলে বিদ্রোহী অঞ্চলগুলো সংঘর্ষের ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত হয়। সংঘর্ষপূর্ণ কিছু অঞ্চলে অচিরেই জমিদাররা নমনীয় হয়। তারা পরিস্থিতি লক্ষ করে নানকারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকে। অঞ্চলগুলোর মধ্যে বিয়ানী বাজারের জলঢুপ, সুপাতলা, দাসগ্রাম, বড়লেখার সাহবাজপুর, ছোটলেখা, পাণিধার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[২২] এভাবে গোটা সিলেট অঞ্চলে নানকার বিদ্রোহ যখন ক্রম পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে সে সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আপসে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি সামনে আসে। সিলেটে অনুষ্ঠিত হয় 'গণ ভোট'।

সিলেটের 'গণ ভোট' ছিল একটি স্পর্শকাতর বিষয়। 'গণ ভোটের' ফলাফলের ভিত্তিতে সিলেট পাকিস্তান অথবা ভারতভুক্ত হওয়ার কথা। এতদ্ অঞ্চলের বেশিরভাগ হিন্দু চাইতেন সিলেট ভারতভুক্ত হোক। আবার বেশিরভাগ মুসলমান চাইতেন পাকিস্তানভুক্ত হোক। নানকারদের বেশিরভাগ মুসলমান। সাধারণভাবে তারাও ছিলেন সিলেটকে পাকিস্তানভুক্ত করার পক্ষে। তাদের অনুভূতি বিবেচনায় না এনে কমিউনিস্ট পার্টির সিলেট শাখা গণ ভোটের সময় সিলেটকে ভারতভুক্ত করার লক্ষ্যে প্রচার চালায়।[২৩] এতে বিক্ষুব্ধ হয় অনেক নানকার ও কৃষক সভার মুসলমান কর্মী-সংগঠক। 'গণ ভোট'-এর প্রচারকালীন সময়েই কৃষকসভার কর্মী ইসমাইল আলী মুসলিম লীগে যোগ দেন। তাকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের একাংশ নানকার আন্দোলনকে কমিউনিস্টদের প্রভাবমুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার প্রয়াস চালায়। তবে এ প্রয়াস আংশিক সাফল্য পেলেও নানকারদের কমিউনিস্ট প্রভাবমুক্ত করা সম্ভব হয়নি।[২৪] ফলে কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও দেশভাগের পরপর কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনটি পুনরুজ্জীবিত করতে সমর্থ হয়।

৪

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপর দেশটির নতুন সরকার নানকার বিরোধী অবস্থান নেয়। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে নানকার অন্দোলনের নেতা অজয় ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করা হয়। একই সঙ্গে কৌশল হিসেবে পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন মুসলিমলীগ নানকারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টিও নীতি পরিবর্তন করে। পার্টি মুসলিমলীগের সহায়তায় আলোচনা-সমঝোতার মাধ্যমে নানকারদের কিছু দাবি আদায়ের সিদ্ধান্ত নেয়।[২৫] কমিউনিস্ট নেতা বারীন দত্ত, রোহিনী দাস, সুরত পাল, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহন করেন।[২৬] এ সময় ইসমাইল আলীর প্রচেষ্টায় মুসলিমলীগ কর্মী মহলে নানকারদের দাবির প্রতি সমর্থন তৈরি হয়েছিল। তবে এতদ্‌সত্ত্বেও সরকার বা জমিদাররা

সমঝোতার পথে না গিয়ে দমন-পীড়নের মাধ্যমেই নানকার বিদ্রোহ দমনে প্রয়াসী ছিলেন। দেশভাগের দু'-তিন মাসের মধ্যে আগেকার আসাম সরকারের মামলাসূত্রে পাকিস্তান সরকার বিনা নোটিশে নানকার কর্মীদের গ্রেফতার শুরু করে। তবে গ্রেফতার, ঘরছাড়া করা, মারপিট বা হাঙ্গামা করেও সরকার বা জমিদার নানকারদের বিদ্রোহী প্রবণতা কমাতে পারেনি।[২৭] ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে দমন-পীড়নের মাত্রা নানকারদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেলে তারা বিভিন্ন স্থানে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতি আক্রমণ শুরু করেন। এ সময় লাউতা বাহাদুরপুর, ঢাকা-দক্ষিণ, দক্ষিণ ভাগ, ভাদেশ্বর প্রভৃতি বিদ্রোহী অঞ্চলগুলোতে বেশ কিছু জমিদার ও তাদের অনুগত লোকজন নানকারদের হাতে লাঞ্ছিত হন। এ পর্যায়ে কানিশালী গ্রামের জমিদার কুটু মিয়া, ছালাম মিয়া ও ফজই মিয়া নানকারদের হাতে জুতোপেটা হয়ে ঢাকা শহরে মুসলিম লীগ নেতাদের কাছে বিচার দাবি করেন।[২৮] প্রায় কাছাকাছি সময়ে নানকারদের সহায়তা করার জন্য গঠিত কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের এক যুক্ত কমিটির পক্ষে বারীণ দত্ত ও ডা. আবদুল মজিদকে দিয়ে সরকারের ডেপুটেশন প্রেরণ করা হয়। ডেপুটেশন সরকারের কাছে নানকার আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে তাদের ন্যায্য দাবি মেনে নিতে অনুরোধ করেন। ডেপুটেশন নানকার প্রসঙ্গে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের জন্যও সরকারের কাছে দাবি জানায়। এ পরিস্থিতিতে একটি আপসমূলক অবস্থা তৈরিতে সরকার সক্রিয় হয়। মুসলিম লীগ দলীয় ব্যবস্থা পরিষদ সদস্য মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন, আওলাদ হোসেন ও আবদুল বারীকে নিয়ে সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করে।[২৯]

সরকারী তদন্ত কমিটি অতি দ্রুত আন্দোলনের এলাকাগুলো পরিদর্শন করে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামত পর্যালোচনা করে কমিটি সরকারের কাছে নানকারদের 'বেগারী' বন্ধের সুপারিশ করে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্ব মাসে ঢাকায় জমিদার, নানকার ও সরকারী প্রতিনিধিদের ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নানকারদের অর্ধেক জমিতে জোত স্বত্বের স্বীকৃতি দিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অর্ধেক জমিদেয়ায় লাউতা বাহাদুরপুরের নানকার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত কমিউনিস্ট নেতা চিত্তরঞ্জন দাস চুক্তিতে স্বাক্ষরদানে বিরত থাকেন।[৩০] চুক্তিতে অসন্তুষ্ট হলেও এসময় কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি। বলা যায় এ সময় কমিউনিস্টরা নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদের কৌশল অবলম্বন করেন। চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে-বিপক্ষেও তাদের কোন ভূমিকা লক্ষ করা যায়নি।[৩১] তাই নানকারদের জন্য অসন্তোষজনক চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার ও জমিদার পক্ষ গড়িমসি করা শুরু করলেও বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ ছাড়া জোরদার কোন আন্দোলন এ সময় গড়ে উঠেনি।

৫

নানকার আন্দোলনের উপযুক্ত পর্যায়ে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এ কংগ্রেসে রণদীভের 'সশস্ত্র সংগ্রামের' থিসিস গৃহীত হওয়ার পর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত পূর্ববাংলা তথা সিলেটের কমিউনিস্ট পার্টি জঙ্গী গণ-আন্দোলনের নীতি গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের অক্টোবরে পার্টি প্রভাবিত সিলেট জেলা কৃষক সম্মেলনে সরকারী দমন নীতি মোকাবেলায় জঙ্গী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত

নেয়া হয়। রণদীভে লাইনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।[৩২]

ইতঃ পূর্বে লাউতা বাহাদুরপুর থেকে অত্যাচারিত হয়ে সরে আসা কিছু সংখ্যক নানকার ও কৃষকসভার কর্মী দাসের বাজার এবং সানেশ্বর অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জেলা সম্মেলনের পরে তারা উজ্জীবিত হয়ে সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। এ সময় সানেশ্বর অঞ্চল আন্দোলনের নতুন কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিয়ানী বাজার, বড়লেখা ও গোপলগঞ্জ থানার এক বিস্তীর্ণ নিম্নাঞ্চল ছিল সানেশ্বর। দেশভাগের পূর্বকালেই এ অঞ্চলে নানকার আন্দোলন সংগঠিত রূপ লাভ করেছিল। নতুন পরিস্থিতিতে আন্দোলনে ভিন্ন উপাদান যুক্ত হওয়ায় বিশেষ করে জঙ্গী কৃষক আন্দোলনের আহ্বান এ অঞ্চলের মানুষকে উদ্দীপিত করে। ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি ও রক্ষীদল গঠনের কাজ চলতে থাকে। এ সময় নানকার-কৃষকদের আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেয়া হয়। এ পর্যায়ে জনতার মনোবল পূর্বের যে কোন সময়ের চাইতে অনেক বেশি বৃদ্ধিপায়।[৩৩]

তবে সত্য যে, তা রাষ্ট্রশক্তি ও জমিদারদের সববেত শক্তি মোকাবেলা করার মত ছিলনা। তাই লক্ষ করা যায় ১৯৪৯ সালের আগস্টে তারা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে সাফল্য পেলেও পরে সংগঠিত হতে পারেনি। এ সময় তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের তীব্রতাও ছিল প্রচণ্ড। পার্শ্ববর্তী এলাকার হিন্দু-মুসলমান জমিদার, সরকারী দল, পুলিশ, আনসার ও ইপি আর বাহিনী সমবেতভাবে আন্দোলন দমনে সচেষ্ট হয়। লুঠতরাজ, মারপিট, ধর্ষণ, চালিয়ে আন্দোলনের অঞ্চলগুলোতে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়।[৩৪] এ পর্যায়ে কমিউনিস্ট বিরোধী বিভিন্ন কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করে আন্দোলন স্তিমিত করতে সরকার উদ্যোগী হয়। ব্যপক ধ্বংসযজ্ঞ ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরির ফলে আন্দোলনের এলাকা স্থানীয় কর্মীশূন্য হয়ে পড়ে। অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক প্রচারণা চালিয়ে জমিদার ও সরকারী দল স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে আংশিক আন্দোলন বিরোধী মনোভাব তৈরিতে সক্ষম হয়। একই সঙ্গে সরকারী দল সভা-সমাবেশ করে নানকারদের হিতৈষী সেজে নানকার প্রথা উচ্ছেদের দাবি তুলে। এ সকল সভায় মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন।[৩৫] আন্দোলন ভীতি এবং জনতার মধ্যে ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট প্রভাব লক্ষ্য করে সরকারী দল এ ধরনের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এ নীতি যথেষ্ট কার্যকর হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে আন্দোলনে কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে। ১৯৫০ সালের শুরুতে জঙ্গী আন্দোলন বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নীতিও পরিবর্তিত হয়। ফলে জঙ্গী নানকার আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যমে ভাটা পড়ে। একই বছর মুসলিম লীগ সরকার নানকার প্রথা উচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন প্রনয়ণ করে।[৩৬] এ আইনে নানকাররা পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হলেও পরে আর কোন আন্দোলন গড়ে উঠেনি।

সূত্রনির্দেশ

১. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ* (১ম খণ্ড), মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ-১৫-১৮।

২. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (২য় খণ্ড), মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ-২০৬।

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ-২০৪।

৪. অজয় ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ-৩৭-৪৫।

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ-৪৬-৫২।
৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ-৬৬।
৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১০।
৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ-৭৬।
৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ-৯২, বারীণ দত্ত, *সংগ্রাম মুখর দিনগুলি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ-৪৭। বারীণ দত্ত আবদুস সালাম নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি সিলেটে কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা- সংগঠক। সংগ্রাম মুখর দিনগুলি গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন, ১৯৩৬ সালে, প্রাদেশিক কৃষক সভার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
১০. অজয় ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ-১০৯-১০।
১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১১৫।
১২. কুনাল চট্টোপাধ্যায়, *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ-২।
১৩. সুনীল সেন, *ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায়*, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ-৪।
১৪. কুনাল চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ-১।
১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ-২২।
১৬. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ*,(২য় খণ্ড), মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ-১০২।
১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১১৮।
১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১২৬-২৭।
১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৩১-৩২।
২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৩৩-৩৪।
২১. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ-২১২-১৩।
২২. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ* (২য় খণ্ড), পৃ-২২৮-২৯।
২৩. শ্যামলেশ দাশ, *শ্রীহট্টের গণভোট—ভারত ইতিহাসের কলঙ্ক*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ-৯। বলা প্রয়োজন, প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মণিসিংহ গণভোটে কৃষক সভার ভূমিকাকে নিরপেক্ষ বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে কৃষক সভা স্বাধীনভাবে জনগণকে ভোট দেয়ার পরামর্শ দেয় এবং এতে বিভেদ এড়ানো সম্ভব হয়। সূত্র : মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ-১৩২।
২৪. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ-২১৪।
২৫. *প্রাগুক্ত*।
২৬. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ* (২য় খণ্ড), পৃ-২৫৬।
২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৬২।
২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৭৩,২৭৫।
২৯. বারীন দত্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ-৫৮।
৩০. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ-২১৯।
৩১. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ* (২য় খণ্ড), পৃ-২৯৬।
৩২. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ* (৩য় খণ্ড), মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ-৪৬।
৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ-৫৪।
৩৪. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ-২৪১।
৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৫১,২৫২।
৩৬. *প্রাগুক্ত*।

কমনওয়েলথ দেশগুলির ডাকটিকিটের ইতিহাস

প্রবার কুমার লাহা

ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর উদ্ভব হয় ব্রিটিশ উপনিবেশিক স্বার্থরক্ষার তাগিদে। ১৯৩১ সালে States of Westministers অনুগত দেশগুলি ব্রিটেন সহ কানাডা, অস্ট্রিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইউনিয়ান অফ সাউথ আফ্রিকা নিয়ে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ গঠিত হয়েছিল। ব্রিটেন ব্যতীত বাকী দেশগুলি ছিল ডোমিনিয়ান স্ট্যাটস, ৪৮টি দেশ এর সদস্য। এব্যতীত নির্ভরশীল ও ভুক্ত (Dependencies and Associated States) রাষ্ট্রগুলির সংখ্যা হল যথাক্রমে — অস্ট্রিয়ার ৬টি, নিউজিল্যাণ্ড ৪টি, ব্রিটেনের ১৯টি, মোট ২৯টি। সদস্য সঙ্গী হল মূল সদস্য রাষ্ট্র —

১. Antigua & Barbupa., ২. অস্ট্রেলিয়া, ৩. বাহামাস, ৪. বাংলাদেশ, ৫. ব্রাজিল,৬. Barbodos, ৭. Botswana ,৮. Brunei, ৯. কানাডা, ১০. সাইপ্রাস, ১১. ঘানা, ১২. গ্রেনেডা, ১৩. Goyana, ১৪. কেনিয়া, ১৫.. Jamaica, ১৬. শ্রীলঙ্কা, ১৭. কিরিবটি, ১৮. মালয়েশিয়া, ১৯. পেরু, ২০. নিউজিল্যাণ্ড, ২১. গ্রেট ব্রিটেন, ২২. ভারত, ২৩. সিঙ্গাপুর, ২৪. নাইজেরিয়া, ২৫. কাম্পু নিউগিনি, ২৬. Lisotho ২৭. Macawi ২৮. মালটা, ২৯. Mauritious ৩০. সেন্ট খিস্টোনার ও ৩১. Seychellfs ৩২. Saint Lucia ৩৩. Sierra Leone ৩৪. Howpercs ৩৫. Saint Vincent and the grenadines ৩৬. দ্বীপপুঞ্জ, ৩৭. সুইজিল্যাণ্ড, ৩৮. Tonga ৩৯.Tanzania ৪০. Tuvalu ৪১. উগাণ্ডা, ৪২.Trinidad and Tobago ৪৩. Vanuata ৪৪. Western Samoa ৪৫.Zamlia ৪৬. Zimbabue ৪৭. Guineana ৪৮. Hondercus

নির্ভরশীল ও সংযুক্তভুক্ত সদস্য দেশগুলি হল :—

ক. অস্ট্রেলিয়া —

১. অস্ট্রেলিয়ান আট্রারলেন্টিক টেরিটরি ২.Christmas দ্বীপপুঞ্জ ৩. Cocosckeelingi দ্বীপপুঞ্জ ৪. কোরাল সি দ্বীপ অঞ্চল ৫. Hearp and Mcdonalp দ্বীপপুঞ্জ ৬. Norfolk দ্বীপপুঞ্জ

খ. New Zealand —

১. কুক দ্বীপপুঞ্জ, ২. Nive ৩. Ross Dependency ৪. Tokelau

গ. United Kingdom —

১.Angaila ২. Bermuda ৩. St. Helena ৪. Tristan ৫. Tristan Dagunha ৬. South Georgia and Sooth ৭. Sandwich ৮. Turks and Caicos ৯. ব্রিটিশ আটলান্টিক অঞ্চল ১০. ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ওসান অঞ্চল ১১. ব্রিটিশ ভার্জীন দ্বীপ ১২. Channel দ্বীপ ১৩. ফকল্যাণ্ড দ্বীপ ১৪.

হং কং ১৫. Cayman ১৬.Isle of Man ১৭. Pitcairn দ্বীপ ১৮. Montserrat

এ প্রবন্ধে CWN-এর নিম্নলিখিত দেশগুলির ডাকটিকিটের ইতিহাস সম্পর্কে রূপরেখা দেওয়া হবে মাত্র। সব দেশগুলির আলোচনা থাকছে না।

Negrisembilan, Pahany, Perak, সিঙ্গাপুর রাজ্যগুলি নিয়ে Federal Malaystates নামে একটি রাজ্য গঠিত হয় ০১.৭.১৮৯৬ তারিখে। তৃতীয় যুগের ডাকটিকিটের চিত্রায়নে ছিল রাজন্য ব্যক্তিত্বরা ১৯০০ বাদ ১৯০০ জাতি (১৯০৪-১৯২২), পোস্টেজ ডিও স্ট্যাম্প (১৯২৪)।

ডাকটিকিট প্রকাশমালাটি সমৃদ্ধ Tapping Reller, ফেড়ারেশন। রাষ্ট্রপুঞ্জ, প্রতীক, মানবাধিকার, মানচিত্র, বিদ্যুৎ, জনজীবন চিত্রায়নে।

মালয়েশিয়া

ফেডারেশন অফ মালয়েশিয়া ১৯৬৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর স্থাপিত হয়, এর গঠনপ্রণালী ছিল পূর্বতন মালয়েশিয়া ফেড়ারেশনের রাজ্য সিঙ্গাপুর ও প্রাক্তন উপনিবেশগুলি Colonies in Borneo, Sabah Lnorth Borneo ও Saraweh নিয়ে। সিঙ্গাপুর ৯ আগস্ট ১৯৬৫ সালে ফেড়ারেশন ত্যাগ করে।

ডাকটিকিট প্রকাশনার বৈশিষ্ট্যগুলি হলঃ যে প্রকাশসুদ্ধ— স্বাধীনতা,(১৯৬৪), পক্ষী সিরিজ (১৯৬৫), কৃষি, প্রভৃতি। নকথা ও সাইজের বৈচিত্রতা — ত্রিকোণ ডাকটিকিট — মালায়ন সৌধ(১৯৬৬), লম্বা ধরনের ডাকটিকিট — কেবল পথ মানচিত্র(১৯৬৭), উপগ্রহ (১৯৭০), গোলাকার — ব্যাক্তি কমপ্লেক্স (১৯৭১-১৫ মে), চতুর্কোণ কোণাকুনি — ১৯৭১ এর ২৩ সেপ্টেম্বর — বিমান অবতরন, সাইজ ৫৯ ৩৩ মি. মি. নকশাকার — ইউনিয়ন আর্ট নিসম, কুয়ালালামপুর, যুসম ডাকটিকিট — (১) পাসোসিক মানচিত্র, সাইন ৬৫×৩৬ মি. মি. (২) মালানোথিয়া সাইজ ৩.৫×৩২ মি.মি. প্রকাশকাল ১৯৭১।
বৃহৎ স্ট্যাম্প — কুওয়ালামপুরে ফেড়ারেশন চুক্তি স্মরণে, প্রকাশ হয় — ১৯৭৪, সাইজ ৩৭× ২৭ মি. মি. প্রভৃতি। প্রচলিত ছিল ১৯৬৬, ১৯৭২ সালে পোস্টেজ ডিউজ স্ট্যাম্প। তবে ব্যক্তিত্ব ডাকটিকিট একার্থ নামে মাত্র।

Guyana

এটি ছিল পূর্বতন ব্রিটিশ Gyyana স্বাধীন হয় ১৯৬৬ সালে। ২৬ মে, ১৯৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত দুটি ডাকটিকিটের চিত্রায়নে ছিল — পতাকা ও মানচিত্র এবং অস্ত্র। লিপির ভাষা হল ইংরাজী। প্রকাশনাকে দুটি স্তরে বিভক্ত করা যায় — বিষয়মুখী এবং ব্যক্তিত্ব বিষয়ক।

ঘানা

এই দেশটি হল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। পূর্বে ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। ৬ মার্চ, ১৯৫৭তে ডোমিনিয়ান মর্য্যাদা প্রাপ্ত।

ডোমিনিয়ান মর্যাদা প্রাপ্ত যুগ (১৯৫৭ সাল থেকে) — বিষয়মুখী প্রকাশনাসুদ্ধ

ছিল রাষ্ট্রসংঘ, প্রাণী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, শিশু, ওলিম্পিক গেমস্ (১৯৬৪), ফুটবল, আফ্রিকান লীগ (১৯৬৬), শান্তি, আনবিক বোমা, ব্যাংক, প্রভৃতি।
ব্যক্তিত্ব ডাকটিকিট প্রকাশনায় স্থান পেয়েছেন — Drkwame (৩বার ১৯৬২,৬৩,৬৪) রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ (১৯৬১), প্রমুখেরা।

কেনিয়া

১৯৬৪ সালে এই দেশটি প্রজাতন্ত্র প্রাপ্ত হয়। তখন লিপির ভাষা ছিল (ইংরাজী) এই সময় থেকে ডাকটিকিট প্রকাশনায় সমৃদ্ধ হয়েছে— গ্রাম, সামুদ্রিক জীব, স্বাধীনতা সংগ্রাম ক্রীড়া, ফুল, পাখী প্রভৃতি বিষয়মুখীনতায়।

লেসোথো

এখানকার ডাকটিকিট প্রকাশনার বৈশিষ্ট্যগুলি হল:—
১. পোস্টেজ ডিউটি স্ট্যাম্প — ১৯৬৬-৬৭, ১৯৭৬,
২. প্রকাশিত হয়েছিল একাধিক বার দ্বিতীয় (১৯৬৭-৬৮ ৩বার) এবং প্রথম (১৯৭৫) ডাকটিকিটগুলি।
৩. প্রকাশিত ত্রিকোণ, ডাকটিকিটে চিত্রিত হয় (১৯৬৭)
৪. বিষয়মুখী ডাক টিকিট মালায় চিত্রাবলীতে সমৃদ্ধ ছিল— বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, পাখী প্রজাপতি, হীরাখনি, টেলিফোনের শতবর্ষ, প্রাণী মাছ প্রভৃতি।

হংকং

১৯৬০ সাল পর্যন্ত এটি ছিল সহযোগী রাষ্ট্র। ডাকটিকিটের চিত্রায়নে মূলতঃ ছিল — রাণী ভিক্টোরিয়া (১৮৬২-১৯০০), সপ্তম এডওয়ার্ড(১৯০০-১৯৩৭), রাজা ষষ্ঠ জর্জ(১৯৩৭-১৯৫২), দ্বিতীয় এলিজাবেথ(১৯৫৩,৭৩,৭৫,৭৮ ৪বার), চীনা মুখোস, ড্রাগন, উৎসব, পাখী, ডাকব্যবস্থা, ঘোড়া প্রভৃতি। লিপির ভাষা ছিল ইংরাজী।

মালাওয়াই

প্রকাশিত ডাকটিকিটগুলি বিষয় ভাবনায় ছিল — প্রজাপতি, পাখী, রাষ্ট্র, বিশ্বশ্রম সংস্থা, প্রাণী, মুদ্রা প্রভৃতি। পাশাপাশি প্রচলিত ছিল ১৯৬৭,৭১,৭৫-৭৮ সালগুলিতে প্রকাশিত পোস্টেজ, ডিউট স্ট্যাম্প।

মাল্টা

ব্রিটিশ পরিবার রাজ একাধিকবার ডাকটিকিটে এসেছেন। বিষয়মুখী ভাবনায় রয়েছে মা ও শিশু, চিত্রকলা, শ্রমজীবী মানুষ, দেবদূত, যীশু প্রভৃতি।

মরিশাস

এটি ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশের ফলে ব্রিটিশ নৃপতি ও রানীরাই বিভিন্ন সময়ের ডাকটিকিট প্রকাশনায় এসেছেন, তিন প্রকারের ব্যবহার্য ডাকটিকিট প্রচলিত ছিল — Express Delivery স্ট্যাম্প(১৯০৪), Postage Duty stamp (১৯৩৩—৫৪, ৬৬-৬৯) ফিসক্যাল স্ট্যাম্প(১৮৮৯,১৮৯০)

সিয়েরা নেপন

দেশটি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের ব্রিটিশ উপনিবেশ। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত প্রথম ডাকটিকিটে চিত্রায়ন ছিল রাণী ভিক্টোরিয়ার মুখমণ্ডল। এরপরে সালগুলি — ১৮৯৩,১৮৯৬,১৮৯৭ তে প্রকাশ পায় ঐ একই চিত্রায়নে বিভিন্ন রঙ, মূল্যের ডাকটিকিট। ডাকটিকিট প্রকাশমালায় বিভিন্ন ধরনের সাইজের বৈচিত্র্য বক্র, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোলাকার, নকশাকৃত স্বতন্ত্রতার দাবী রাখে।

সেইকেল্লেস

ব্রিটিশ কলোনী বলে ১৯৭৬ সালের আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ ডাকটিকিট ব্যবহৃত হয়েছে। ২৯.৬.১৯৭৬ তারিখে প্রকাশিত ডাকটিকিটের চিত্রায়নে ছিল মহিলা।

সিঙ্গাপুর

এই দেশটি ছিল ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত মালাএশিয়ার ভুক্ত। ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ তারিখে স্বাধীন হলে মালয়েশিয়ার ডাকটিকিটের উপব ওভারপ্রিন্ট করে সিঙ্গাপুর লিখে তা ব্যবহৃত হয়। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় নব সংবিধান শীর্ষক ডাকটিকিট।

নিউজিল্যাণ্ড

এই দেশের ডাকটিকিট প্রকাশনার বৈশিষ্ট্যগুলি হল:-

১. ১৮৫৫ এর ১৮ জুলাই প্রথম রাণী ভিক্টোরিয়ার ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়।

২. ব্রিটিশ রাজন্যবর্গ ডাকটিকিটে চিত্রায়নে এসেছে। তাদের রাজত্বকালে।

৩. লিপিতে ইংরাজী ভাবার ব্যবহার ।

৪. ডাকটিকিট কাগজে ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের টাইপ, বক্র, রাজমুকুট জলছাপ চিহ্নিত।

৫. বিষয়মুখী ভাবনা সম্প্রসারিত হয়েছিল — মানচিত্র, গাছ, বন, মাতৃত্ব, শিশু ও মা, উপগ্রহ, শিক্ষা, দ্রষ্টব্য স্থান, বিশ্বসংস্থা সম্পদ, অস্ত্র, স্বাস্থ্য, পাখী সিরিজ (১৯০৭-১৮৯৮) প্রভৃতি।

পাপুয়া নিউগিনি

অষ্ট্রেলিয়ার অধীনে এটি দ্বীপপুঞ্জ। লিপির ভাষা ব্যবহারে কেবলমাত্র ইংরাজী। ডাকটিকিট প্রকাশ তালিকার রয়েছে — পাখী, বন্যপ্রাণী, পতাকা, ফুল, সংস্কৃতি, বিমান, গাছ(১৯৫২), জেল, পুরান, রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ(১৯৭৪,১৯৭৭- ২বার),

উগান্ডা

এই দেশটি ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল ১৮৯৫-১৯০২ সাল পর্যন্ত। ডাকটিকিট লিপির ভাষার ব্যবহার হল ইংরাজী।

গ্রেনাডাই অব সেন্ট ভিনসেন্ট— এই দেশটি তিনটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত—Bequia, Mustique, Canouanunion. লিপির ভাষা ছিল ইংরাজী। প্রকাশিত ডাকটিকিটে চিত্রিত হয়েছে মানচিত্র, গ্রাম, ডাকঘর, পাখী প্রভৃতি।

সেন্ট লুসিয়া— ব্রিটিশ উপনিবেশিক কালে ১৮৬০-১৯৫৪ ব্রিটিশ স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হত, চিত্রিত থাকত ব্রিটিশ রাজন্যবর্গ। ১৯৬০-১৯৬৪ সালের মধ্যে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ৫বার ডাক টিকিটে স্থান পেয়েছেন।

মন্ত্রী শাসিত সরকারে ১৯৬০ সালের ১ জানুয়ারি 'নব সংবিধান' শীর্ষক ডাকটিকিট প্রকাশ পায়। প্রকাশ পায় ১৮.১২.১৯৬০ তারিখে 'ডাকটিকিট শতবর্ষের' ডাকটিকিট।

সহযোগী রাষ্ট্র (Associate Statehood) হিসাবে ১৯৬৭-এর ৭ মার্চ প্রকাশিত প্রথম ডাকটিকিট হল 'মানচিত্র' চিত্রিত।

সলোমন আইল্যাণ্ডস্

এই ব্রিটিশ উপনিবেশিক এই দেশটির ডাকটিকিট প্রকাশনা চারটি ভাগে বিভক্ত :- ব্রিটিশ যুগ (১৯০৭-১৯৬১) স্বায়ত্বশাসিত সরকার যুগ (২.১.১৯৭৬ — ৬.৭.১৯৭৮৯) স্বাধীনতা যুগ (৭.৭.১৯৭৮ থেকে)

তাঞ্জানিয়া (টাঙ্গানিকা)

পূর্বতন এটি জার্মানীর উপনিবেশ থাকাকালীন অক্টোবর, ১৮৯০— জুলাই, ১৮৬০ পর্যন্ত জার্মানীর ডাকটিকিট ব্যবহৃত হত। পরিশেষে ছিল এরপরে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসাবে। স্বাধীন যুগ(১৯৬১ সাল থেকে)-এর ডাকটিকিট প্রকশনায় ছিল বন্যপ্রাণী। গ্রাম, শিল্প, স্বাস্থ্য, শ্রমিক, প্রভৃতি।

ডাকটিকিট প্রকাশনায় ধারায় রয়েছে — দ্বীপপুঞ্জ চিত্র, ফুল, সমুদ্র, রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও যুবরাজ ফিলিপ। লিপির ভাষা ইংরাজী। নকশাকার হলেন G. Drunmond, J. Cooter, I. Oliver.

টোঙ্গা

এই দেশটি লিপির ভাষা ব্যবহার হল ইংরাজীতে। ১৮৮৬-১৯৬১ সাল পর্যন্ত ডাকটিকিট প্রকাশনায় চিত্রিত ছিল একাধিকবার যথাক্রমে রাজ প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জ রাণী Saloti ১৮ বার। ১৯৬১ সালের পর ডাকটিকিট প্রকাশনার বৈশিষ্ট্য ছিল যে বিষয়মুখী ডাকটিকিট প্রকাশ ধারায়

Trinidad and Tobago

১৮৪৭ সাল পর্যন্ত এটি ছিল ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য। ১৮৪৮ সালে এটি জয় কারেন বা ব্রিটিশ উপনিবেশ।

সাউথ আফ্রিকা

কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে ১৯১০ সালে 'ইউনিয়ন অফ সাউথ আফ্রিকা' গঠিত হয়। এই অঞ্চলগুলি ছিল— Cape of Good Hope, Natal ও Transvaal.

৪.১১.১৯৯০ সালে H.S. Wilkinson (যিনি PCR সঙ্গে যুক্ত ছিলেন) নকথাকৃত ইউনিয়ন সংসদ উদ্বোধন ডাকটিকিট প্রকাশলায়। পরে প্রকাশ পায় রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের ডাকটিকিট। এখানেও ১৯১৪-১৯৬১ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বছরগুলি প্রকাশ পায় বাকী ডাকমাশুল ডাকটিকিট। ডাকটিকিটের লিপিটি ইংরাজী ও স্পেনিস ভাষায় লিপি।

ডাকটিকিট বিষয়বস্তু প্রকাশনায় রয়েছে—

১. বিষয়মুখী - ফুল, পাখী, দ্রষ্টব্যস্থান(১৯৬১) প্রগতিচক্র, পতাকা, অস্ত্র, জাতীয় পতাকা, উৎসব, ১৯৫৪ সালে প্রায় ৮টি বন্যপ্রাণী সিরিজ, ১৯৩৩ তে নারী, স্বর্ণখনি, ১৯৩৭ তে ৫টি ঐতিহাসিক স্থান, গ্রামের দৃশ্য, গাছ, যুদ্ধভাবনা(১৯৪১), দেশী সংস্কৃতি(১৯২৭), শান্তি প্রভৃতি।

২. ব্যক্তিত্ব— মাটিন লুথার কিং, Botha, Smurts, Hertzog (৬বার), রাজা ষষ্ঠ জর্জ(১৯৪৭) , যুবরানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ(১৯৪৭), ১৯৫৩- রাণী মদম্যাদাম রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড(১৯৩৫-৩৬),C.J.Langen Hoven, প্রমুখেরা।

কমনওয়েলথ দেশগুলির ডাকটিকিটের মূল্যায়নে প্রতিভাত হয়েছে যথাক্রমে— মূলত ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ব্রিটিশ রাজা বা রাণীর প্রতিকৃতি, বিভিন্ন রঙ ও মূল্যের ডাকটিকিট প্রকাশ, বিভিন্ন ধরনের ডাকটিকিট প্রকাশনা, স্বাধীন হওয়ার পর দেশীয় ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে, লিপির ভাষা ব্যবহারে ইংরাজীর মূখ্য প্রাধান্য, সাইজের বৈচিত্র্যময়তা, কতিপয় দেশের অত্যাধিক মাত্রায় ব্রিটিশ রাজা বা রাণীর বন্দনা লক্ষ্যণীয়। এককথায় উপনিবেশিক মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা উপজাতির রাজনৈতিক অবস্থান

স্নেহাশিস্ ঘোষ

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণে, মিজোরামের পশ্চিমে, বার্মার পূর্ব-উত্তরে ও বন্দর নগরী চট্টগ্রামের পূর্বে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব ২১.৩৫, এবং ২৩.৪৫ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯১.৪৫ এবং ৯২.৫০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ৫.০৯৫ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলাদেশ নামে রাষ্ট্রের অন্তর্গত। বর্তমানে যা তিনটি জেলায় বিভক্ত। 'খাগড়াছড়ি, বান্দরবন ও রাঙামাটি। তিনটি জেলাতে ছড়িয়ে আছে জাতিগত ভাবে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় বারোটি সম্প্রদায়। চাকমা সম্প্রদায় তাদের মধ্যে সংখ্যা ও সচেতনতায় অগ্রগণ্য। *ইতিহাস অনুসন্ধানের* ৭ম সংখ্যায় চাকমা উপজাতির উদ্ভব ও আদি পরিচিতি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেছিলাম। এক্ষেত্রে চাকমারা কোন সময় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় সেই আলোচনাই এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের অবস্থিতি প্রথম দেখা যায় ষোড়শ শতকে পর্তুগীজ নাবিক ডি. ব্যারোসের মানচিত্রে। ঐ মানচিত্রে 'চাকোমাস' বলে একটি রাজ্যের অবস্থিতি লক্ষ করা যায়। পরবর্তী কালে ব্লখম্যানের মানচিত্রেও এই রাজ্যের অবস্থান লক্ষ করা যায়। এই চাকোমাস রাজ্যটি চাকমা রাজ্য হিসাবে ধরে নিলেও তৎকালীন সময়ে তাদের কোনো রাজনৈতিক কার্যপদ্ধতি পৃথক ভাবে পাওয়া যায় না। তাই সে সময়কার চট্টগ্রামের ইতিহাসের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করতে হয়। আমরা জানি যে চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন আরাকান বাংলা ও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিবাদ বর্তমান ছিল। সরকারী নথিপত্রেও আছে যে চট্টাগ্রাম বিভিন্ন সময় চুক্তি বা যুদ্ধের দ্বারা বিভিন্ন শাসকের হাত বদল হয়। প্রাচীন কোন একটা সময় এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ছিল তা জানতে পারা যায়। কিন্তু খ্রীষ্টিয় নবম শতাব্দীতে আরাকানের এক বৌদ্ধ রাজা তা দখল করেন এবং ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত তা মোটামুটি আরাকানের অধিকারেই থাকে।[১] ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ তা দখল করলে মোঘলদের অধিকারে আসে। মধ্যবর্তী সময়ে তা কখনও ত্রিপুরা রাজ, কখনও গৌড় রাজের হস্তগত হয় এটাও সত্য। কবে ত্রিপুরার ইতিহাসে আছে যে চট্টগ্রাম মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লেও এর পার্বত্যময় এলাকা মুসলিম এক্তিয়ারে ছিল না। এবং বর্তমান কালে যে প্রদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ তা তৎ-পরবর্তী অনেক কাল পর্যন্ত ত্রিপুরার হস্তগত ছিল।[২] আশ্চর্য যে ঐ ত্রিপাক্ষিক সংগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম দখলের কথা বা চাকমাদের ওপর বিজয়ের

কথা কোনও বিবরণে লেখা হয় নি। তাহলে কি ধরে নিতে হয় যে দীর্ঘদিন ঐ অঞ্চলে কারা বসবাস করত সে সম্বন্ধে ত্রিপুরা বাংলা বা আরাকান অজ্ঞাত ছিল ? এ ব্যাপারে একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে চাকোমাস নামে একটি রাজ্য আরাকানের শাসনাধীনে ছিল। কারণ সে সময়ে আরাকান রাজ নিজেকে "The lighest and the most powerful king of Arakan, of Chakomas and of Bengal." বলে পরিচয় দিয়েছেন। * কিন্তু অসুবিধা হল যে এর পূর্বে বা পরে চাকমাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই চাকমাদের বসতি পার্বত্য-চট্টগ্রামে গড়ে উঠেছিল। হয়ত বিভিন্ন সময় তা পরিবর্তিত হতে পারে, এমনও হতে পারে যে একদিকে ত্রিপুরা, অন্যদিকে বাংলা, আর একদিকে আরাকান এই ত্রিমুখী শক্তিদের মধ্যে তারা অস্তিত্বের জন্যই বড় শক্তিগুলির বশ্যতা বা সখ্য বজায় রেখে চলেছে; আবার কখনও সুযোগ বুঝে নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। মুসলিম বশ্যতা বা সখ্যর প্রমাণ আমরা বহু চাকমা রাজার খাঁ উপাধি ও মুদ্রা গ্রহণে বুঝতে পারি। ইংরেজ সরকারের রেভেনিউ বোর্ড ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট (লুইন) ১৪৯৯ নং পত্রে লিখেছেন — পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজগণ ঝুমিয়া কুকি। এবং অপরাপর অধিবাসীদের সম্মতিক্রমে নিযুক্ত হতেন। সাধারণতঃ যেরূপ দেশের ভূপতি কর্তৃক হয়ে থাকে এখানে সেরূপ নয়। তারা সকলেই স্বাধীন ছিলেন। ১০৭৭ মঘী বা ১৭১৫ খ্রী: পর্যন্ত মোঘল সরকারকে তারা রাজস্ব বা খাজনা দেয় নি, অর্থাৎ মোঘল অধিকারের কয়েক বছর যে চাকমা রাজারা স্বাধীন ছিলেন তা অনুধাবন করা যায়। কিন্তু কীভাবে এই স্বাধীনতা লাভ তা জানা যায় না।[৪]

আসলে মোঘল বা তৎপরবর্তী সময়ে চাকমা রাজা খাঁ উপাধি গ্রহণ বা কার্পাস প্রদান করলেও তাদের প্রবর্তিত ভূমি ব্যবস্থা যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমান ছিল না এটা সুস্পষ্ট বলা যেতে পারে। আভ্যন্তরীণ শাসনে তাঁরা স্বাধীনই ছিলেন।

আধুনিক কালের গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয় প্রাচীনকাল থেকে চাকমা রাজারা যে ইতিহাসের কথা বলা হয় তা ঠিক নয়। যদিও চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায় চাকমাদের প্রাচীন ইতিহাসের এক দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন তাঁর লেখা পুস্তক *History of the Chakma Raj family*-তে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে সপ্তদশ শতাব্দীতে চাকমারা যখন বাঙালী বা আরাকানী মগদের সাথে অস্তিত্বের সংগ্রামে লিপ্ত, তখনই তাদের চিক্ বা দলপতির অবির্ভাব ঘটে, যিনি একজন দক্ষ যোদ্ধা বা সামরিক প্রধান হিসেবে আবির্ভূত হন। এরও পরবর্তী কালে তিনি রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। চাকমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কারো জমি নিজস্ব না থাকায় (যেহেতু ঝুম চাষে অভ্যস্ত) দলপতি ক্রমশ জমির মালিকানাতেও হস্তক্ষেপ করে এইভাবে চাকমা দলপতির কোন জমি সম্পত্তি বা বংশ সূত্র না থাকলেও তারা সমাজের প্রধান হয়ে দাঁড়ায় । তবে এক্ষেত্রে তাকে যে কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় না তা নয়। চিকের কার্য্যে বাধা দান বা বিরোধিতার জন্য কোনও গোষ্ঠী প্রতিনিধিকে প্রাণও দিতে হয়। চাকমা দলপতি তখন থেকেও নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী বা অন্যান্য উপজাতিদের মধ্য থেকে নিজস্ব প্রতিরক্ষা বা রক্ষী বাহিনী গড়ে তোলেন।

অতএব ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত চাকমাদের যেটুকু ইতিহাস জানা যায় তাতে এটা পরিষ্কার যে ভারতের কোন কেন্দ্রীভূত শাসনের সরাসরি রাজনৈতিক প্রভাব কখনই পার্বত্য চট্টগ্রামে পড়েনি। হয়ত এমন হতে পারে যেহেতু তা চট্টগ্রামের মধ্যেই ছিল, তাই পৃথক ভাবে এর অস্তিত্ব কেউ খুঁজে দেখেনি। বিশেষ করে চাকমা জনগোষ্ঠীর যে সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তারা যখন থেকেই হোক কিছুটা স্বাধীন ভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করত। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের রাজনৈতিক অবস্থান ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর আগে খুঁজে না পাওয়া গেলেও তারা পরবর্তী কালে যে এ অঞ্চলে নিজেদের মতই বসবাস করত এটা বুঝতে পারা যায়।

সূত্র নির্দেশ

১. জে. বি. কিন্ডারসলে, *এ্যনুয়াল রিপোর্ট অন দ্য সার্ভে এণ্ড সেটেলম্যান্ট আপারেশনস্ ইন দ্য ডিস্ট্রিকট অব চিটাগাঙ্গ*, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস, আলিপুর ১৯৩৯, পৃ- ২১।

২. কলিপ্রসন্ন সেন (সম্পা) *শ্রী রাজমালা* (ত্রিপুরা রাজ্য বর্গের ইতিবৃত্ত), তৃতীয় শহর, রাজমালা কার্যালয় থেকে প্রকাশিত , ১৩৪১ ত্রিপুরা, পৃ- পূর্বভাষ।

৩. এইচ হসটেন,'জেস্যুইট লেটার্স ফ্রম বেঙ্গল আরাকান এণ্ড বার্মা', *বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেসেন্ট*, ভল্যুম ৩০, পার্ট ১, জুলাই সেপ্টেম্বর ১৯২৫, কলকাতা, হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, পৃ- ৬১-৬২।

৪. সতীশচন্দ্র ঘোষ, *চাকমা জাতির ইতিহাস*, ১৭ নং ঢাকা পট্টি, কলকাতা, ১৯০৯, পৃ-১৪।

৫. ডব্লু. ই. ম্যাঁ, 'পলিটিক্যাল সিস্টেমস্ ইন দ্য চিটাগঙ্গ হিল ট্রাকটস্, বাংলাদেশ : এ কেস স্ট্যাডি', সি. ভি. এফ্ হ্যামেনডর্ফ, *এশিয়ান হাইল্যাণ্ড সোসাইটিস্*, স্টারলিং পাবলিশিং, দিল্লী ১৯৮১, পৃ-২১৬-১৭।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রত্যন্ত এলাকায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি

স্বপ্না ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)

ভারতবর্ষের নিকটতম প্রতিবেশী বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌম সমাজের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রশাসকদের যে সংযোগ ও সংঘাত ঘটেছিল তার ইতিহাস আমাদের অনেকের কাছেই অপরিচিত। অপরিচিত ও অবহেলিত ইতিহাসে থেকে গেছে বর্মা বা আধুনিক মিয়াংমার ইতিহাসের ঐ একই পর্ব। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে যে চিত্র আমাদের কাছে বার বার ধরা দিয়েছে তা হলো এই অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই বিচ্ছিন্নতাবাদের মূল কারণ খুঁজে পাওয়া যায় ঔপনিবেশিক নীতির অনুশীলনে । বর্তমান প্রবন্ধে দক্ষিণপূর্ব বাংলাদেশের পটভূমিতেই উপরোক্ত বিষয়টি আলোচনার উপর দেওয়া হয়েছে।

প্রবন্ধের মূল বক্তব্যে প্রবেশ করার পূর্বে বর্ণনা করি যে কোন দেশের মূল ভূখণ্ড বা ইংরেজিতে যাকে বলে মেইনল্যাণ্ড — তার সঙ্গে প্রত্যন্ত এলাকা অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে ফ্রন্টিয়ার এরিয়া — তার পার্থক্য। ভৌগোলিক পার্থক্য তো পরিভাষা দুটির মধ্যেই ফুটে উঠেছে। অন্যান্য পার্থক্য গুলি বর্ণনা করি: মূলখণ্ডের ধর্ম সাধারণত হয় কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টধর্ম ইত্যাদি) প্রত্যন্ত এলাকাতে দেখা যায় প্রকৃতিপূজারকদের, অথবা উপরোক্ত ধর্মগুলির যে কোনও একটি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম হয়, তাহলে অন্য আরেকটি ধর্মকে সংখ্যালঘিষ্ঠের ধর্ম হিসেবে দেখতে পাই।

মূলখণ্ডে যেখানে দেখা যায় নদী উপত্যাকায় ধানচাষ, প্রত্যন্ত এলাকায় দেখা যায় ঝুমচাষ। মূলখণ্ডে দেখি প্রতিষ্ঠিত ভাষা, প্রত্যন্ত উপভাষা। মোটামুটিভাবে এইভাবে অত্যন্ত সরল উপায়ে এই দ্বৈধতা বা ইংরেজিতে যাকে বলি ডাইকটমি বর্ণনা করলাম। কিন্তু কোনও ভাবেই এই স্ট্রাকচারকে আমরা স্থানকালজয়ী বলতে পারি না। এর অনেক ব্যতিক্রমও আছে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এই দ্বৈধতা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আধুনিক যুগেও বহু বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ এই দ্বৈধতাকে সামনে রেখে উপজাতি সমাজের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে আসেন। দুটি অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ এফ. কে. লেমান-এর *দ্য স্ট্রাকচার অব্ দ্য চিফ সোসাইটি* এবং এ্যাডমণ্ড লীচ-এর *দ্য পলিটিক্যাল সিস্টেম অব্ হাইল্যাণ্ড বার্মা*।[১]

পার্বত্য চট্টগ্রাম নামক অঞ্চলটিকে ১৮৬০ সালে চট্টগ্রাম জেলা থেকে আলাদা করা

হয়। এই আলাদা করে নেওয়ার মধ্যে দিয়েই শুরু হয় ব্রিটিশ শাসকদের পৃথকীকরণের নীতি। ১৮৬৬ সালের পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক তিনটি পরিবর্তনের মধ্যে ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সাব-ডিভিশন, কক্সবাজার সাব-ডিভিশন এবং শংগু সাব-ডিভিশন। প্রত্যন্ত এলাকায় পরোক্ষ শাসনের যে বীজ উনবিংশ শতাব্দীতেই পার্বত্য চট্টগ্রামে উপ্ত হয়েছিল তারই রূপান্তরে এই শতাব্দীর বিশ/ত্রিশ-এর দশকে চীফদের [২] অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি আঞ্চলিক এককে ভাগ করা; এই আঞ্চলিক এককগুলি ছিল যথাক্রমে চাকমা সার্কেল, বমং সার্কেল, মং সার্কেল এবং ঘাস মহল। ঘাস-মহল-এর ধারণার পেছনে মূল্যবান অবদান ছিল লভিন সাহেবের। তিনি এই ঘাস-মহলকে আবার তিনটি সার্কেল থেকে আলাদা করে তার দেখাশুনার কাজ দিয়েছিলেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা ডেপুটি কমিশনারকে। এই প্রত্যন্ত এলাকায় পরোক্ষ শাসনকে [৩] ঔপনিবেশিকদের শক্ত হাতের মুঠোয় নিতে হয়েছিল আরও একটি কারণে; এই কারণটি হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্তে নিরন্তর উত্তেজনা এবং উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে লুসাইদের আক্রমণ। ব্রিটিশদের কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। চাকমা, মার্মা ত্রিপুরীদের নিয়ে বাহিনী গড়ে লুসাইদের ঠাণ্ডা করতে হয়।

প্রত্যন্ত এলাকার ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের লক্ষ্যগুলি ছিল খুব পরিষ্কার: প্রথমতঃ মূল ভূ-খণ্ড থেকে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিকে বিচ্ছিন্ন রাখা, দ্বিতীয়তঃ পূর্বে উল্লিখিত দ্বৈধতাগুলিকে জিয়িয়ে রাখা, তৃতীয়তঃ প্রত্যন্ত এলাকার শাসনকে কেন্দ্রনির্ভর না করে স্বায়ত্তশাসনের প্রচলন করা, চতুর্থতঃ এই স্বায়ত্তশাসনকে এমনভাবে নির্দেশিত করা যাতে চীফদের ক্ষমতার গৌরব বিদ্যমন থাকে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা হ্রাস পায়। [৪] সর্বশেষে এইভাবে সমাজের জ্ঞাতিকুটুম্ব নির্ভর ব্যবস্থা (ইংরেজি কিনশিপ) পরিবর্তিত হয়ে আবির্ভূত হয় এক অঞ্চলভিত্তিক ব্যবস্থা।[৫] অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসনে মৌজা ব্যবস্থা প্রচলনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৮৯২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে রুলস কার্যকরী হয় তার চাপে কৌম সমাজের পরিযান (ইংরেজি মাইগ্রেশন) প্রকৃত পক্ষেই সীমিত হয়, প্রত্যেক উপজাতি অর্থাৎ ট্রাইব যাতে তাদের আঞ্চলিক সীমার মধ্যেই থাকে, অন্যত্র না যায়। [৬] সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। ঝুমিয়াদের বলা হলো যে তার ঝুমক্ষেত্র পরিবর্তন করলে তাদের নিজের মৌজার হেডম্যানকে যেমন কর দিতে হবে, তেমনি নতুন ঝুমক্ষেত্র যে অঞ্চলে, সেই অঞ্চলের মৌজা হেডম্যানকেও অর্ধেক ঝুমকর দিতে হবে।[৭]

পার্বত্য হালচাষের প্রবর্তন ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের আরেকটি উদ্দেশ্য। এই হালচাষে[৮] উৎসাহ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসকদের আরও একটি উদ্দেশ্য সাধন হলো।

হেডম্যান, কারবারি তথা গ্রামে গ্রামে হেডম্যানদের এজেন্টরা বিস্তীর্ণ হালচাষ যোগ্য জমি নিষ্কর করে দেওয়া হয়। এতে ঐ ব্যক্তিবর্গ প্রসাশকদের উপর প্রসন্নও থাকতেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে, বিশেষতঃ প্রশাসনিক ইতিহাসে ১৯০০ সালের রেগুলেশন[৯] একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই রেগুলেশন চালু করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে ক্রমবর্ধমান অপরাধমূলক কাজকর্ম বন্ধ করা। মাদকদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র দেখাতে চায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখা এবং সুপারিন্টেন্ডেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তবে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের পক্ষে ব্রিটিশ প্রশাসকদের মুখ্য যুক্তি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'বহির্ভূত' (excluded) এরিয়া ঘোষণা করা, যাতে কিনা এই অঞ্চলে পাহাড়িয়ারা বাঙালি

ব্যবসায়ী, মহাজন প্রভৃতি শোষকদের দ্বারা শোষিত না হন। কিন্তু ১৯০০ সালের রেগুলেশন গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে বাঙালি ব্যবসায়ীদের এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের অনুগ্রহপুষ্ট ব্যবসায়ীদের কারণ মোটেই দমন করা যায়নি। কারণ ব্রিটিশ প্রশাসকরা যে মধ্যস্বত্ব ভোগী সামাজিক শ্রেণী (সরকারি, হেডম্যান, মোজা প্রধান এজেন্ট) সৃষ্টি করেছিলেন তাদের ক্ষমতা একটুও হ্রাস করা হয়নি, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন বাঙালি। সিদ্ধার্থ চাকমা[১০] তাঁর গ্রন্থের শেষে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের যে অধ্যায়গুলি উল্লেখ করেছেন, তাতে এক ঝলক দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় যে — ১৯০০ সালের বিশেষ রেগুলেশন প্রশাসকরা করেছিলেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে পাহাড়িয়াদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে নয়া সুপারিন্টেন্ডেন্টের অত্যধিক ক্ষমতাবৃদ্ধি দেশজ কৌম নেতাদের কাছে মোটেই মনে প্রাণে গ্রহণ যোগ্য হয়নি। ডাচ ঐতিহাসিক এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশারদ অধ্যাপক ভেলাম ভান সোন্দেল[১১] তাঁর মূল্যবান গবেষণায় পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দেন যে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের মাধ্যমে পার্বতের অধিবাসীদের মধ্যে এ বিচ্ছিন্নতাই আত্মপ্রকাশ করে। সংরক্ষিত বন এর নীতিও উপজাতিদের পরিযান সঙ্কুচিত করে। ১৯০০-এর রেগুলেশনের দুটি উদ্দেশ্য ছিল বহিরাগত বাঙালিদের পর্বতে অবাধ অনুপ্রবেশ রোধ করা। সেন্দেল তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে "একদিকেকর্তৃপক্ষ যেমন পর্বতে বাঙালিদের অভিবাসন রদ করে দেয়, অন্যদিকে বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে হালচাষি গুর্খা ও সাঁওতালদের আগেকার ট্রাইবাল জমিগুলিতে বসতির বন্দোবস্ত করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্বতবাসীদের ভূমিকা সংক্রান্ত অধিকার রক্ষায় যত না উৎসাহী ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহী ছিল ঔপনিবেশিক ভাল অঙ্কের রাজস্বলাভ করতে।[১২] জার্মান নৃতত্ত্ববিদ্ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশারদ ভন্দ গাং মে-ও অত্যন্ত নৈপুণ্যের সহিত তাঁর গবেষণায় ১৯০০ সালের রেগুলেশনের ব্যর্থতা তুলে ধরেছেন। তিনি একথাও খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন যে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের ফলে পার্বত্য চট্টগামের দেশজ কাঠামোও অনেকাংশে নষ্ট হয়।

এই রেগুলেশনের মধ্য দিয়ে প্রদত্ত স্বায়ত্তশাসন যদিও বাস্তবায়িত হয়না, তবুও প্রশাসনিক ব্যর্থতা দেখা দিলে বলা হয় — হেড্ম্যান ও চাষীরা ব্যর্থ হয়েছেন। পরোক্ষ শাসন[১৩] বা indirect rule-এর ব্যর্থতার কথা উচ্চারিত হয়না।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বর্মা অর্থাৎ আধুনিক মিয়াংমাতেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা এই একই নীতি অনুসরণ করে প্রত্যন্ত এলাকাকে মূল ভূখন্ড থেকে আলাদা করে রেখেছিলেন। তাই ঐ দেশের প্রশাসনিক অভিযানেও দেখা যায় "বার্মা প্রপার" এবং "ফ্রন্টিয়ার" বা "একসক্লুডেড" এরিয়া এই পরিভাষাগুলি। পৃথকীকরণের একই নীতি প্রশাসকরা অনুসরণ করেছিলেন বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার মধ্যে, বিশেষভাবে শানরাজ্যে।

সেখানেও শানরাজ্যের সোবোয়াদের (শান প্রধান) স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার নামে তাদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়।[১৪] পরে বিভিন্নভাবে অবশ্য রাষ্ট্রনেতাগণ (যেমন আউংসান উনু প্রভৃতি) ঔপনিবেশিক নীতির কুফল বুঝে নানাভাবে প্রতিকারের চেষ্টা করেন।

উপসংহারে একথা বলা যায় যে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আজ যে বিচ্ছিন্নতাবাদ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের অবশ্যই ইতিহাসের

দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। মূল ভূখণ্ড প্রত্যন্ত এলাকা ও ঔপনিবেশিক প্রশাসন — এই তিন বিন্দুর একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক বিচার করতে হবে। পৃথকীকরণের নীতির সুফল ও কুফল বিবেচনা করতে হবে। জাতি রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় পৃথকীকরণের নীতিকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখে ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা বিশেষভাবেই কাম্য ।

সূত্র-নির্দেশ

১. এফ. কে লেমান, *দ্য স্ট্রাকচার অফ্ দ্য চিন সোসাইটি,* ফার্মা কে এল অন বিহাফ অফ দ্য ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আইজল, ১৯৮০; ই. আর. লীচ, *পলিটিক্যাল সিস্টেম অফ্ হাইল্যাণ্ড বার্মা,* লণ্ডন, ১৯৫৪।

২. পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসের অনেকটাই জুড়ে আছেন এই চীফ বা রাজারা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলস্রোতের সঙ্গে যাতে চীফরা যুক্ত হতে না পারেন, তার জন্যেও বহু প্রচেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টারই বহিঃপ্রকাশ এই অঞ্চলের প্রতি পৃথকীকরণের নীতি।

৩. এই পরোক্ষ শাসনের উদ্দেশ্যই ছিল পৃথকীকরণ।

৪. ভন্দগাং মে প্রণীত (মূল জার্মান ভাষায়) বর্তমান লেখিকা অনূদিত *পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌম সমাজ একটি আর্থ সামাজিকইতিহাস,* ফার্মা কে এল এম, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, কলিকাতার পক্ষে ১৯৬৬ গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

৫. ভেলাম ভান সেন্দেল রচিত, স্বপ্না ভট্টাচার্য অনূদিত, 'জুম্মাদের অবিষ্করণ: দক্ষিণ পূর্ব বাংলাদেশের রাষ্ট্র সংগঠন ও জাতিগোষ্ঠী রূপায়ণের আলেখ্য।' প্রকাশিত, ভেলাম ভান সেন্দেল ও এলেন বল সম্পাদিত *বাংলার বহুজাতি বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ,* নয়া উদ্যোগ, ইন্টারন্যাশনল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, দিল্লীর পক্ষে ১৯৯৮, পৃ-১০২-১৫১ দ্রষ্টব্য।

৬. *পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌমসমাজ,* পৃ- ৮৭।

৭. *পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌমসমাজ,* পৃ- ৮৭।

৮. *পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌমসমাজ,* পৃ-৭৯-৮৩।

৯. উল্লেখ্য আজও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের প্রসঙ্গ উঠলে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের উল্লেখ করা হয়। রেগুলেশনের বিবরণ দ্রষ্টব্য: সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রসঙ্গ : *পার্বত্য চট্টগ্রাম,* নাথ ব্রাদার্স পরিবেশিত, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ-১৪০-১৬২।

১০. সিদ্ধার্থ চাকমা, *পূর্বোক্ত,* পৃ-১৪০-১৬২।

১১. ভেলাম সেন্দেল (অনুবাদ স্বপ্না ভট্টাচার্য)- প্রবন্ধ ছাড়াও একই গ্রন্থে ভেলাম সেন্দেল (অনুবাদ রুমা চট্টোপাধ্যায়-এর ''জাতির হয়ে কে বলে ? জাতীয়তাবাদী শূণ্যগর্ভ বক্তৃতা এবং সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের প্রতিবাদ', প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১২. ভন্দগাং মে. *পূর্বোক্ত,* পৃ- ৮৮-৮৯। আরও দ্রষ্টব্য পিটার বেরট কি, রিসোর্স ডেভোলপমেন্ট অ্যাণ্ডএথনিক কনফ্লিক্ট ইন বাংলাদেশ : দ্য কেস অফ্ চাকমাস ইন দ্য চিটাগঙ হিলট্রক্টস, প্রকাশিত ধীরেন্দ্র বাজপেয়ী ও যোগেন্দ্র মালিক সম্পাদিত *রিলিজিয়াস অ্যাণ্ড এথনিক মানরিটি পলিটিক্স ইন সাউথ এশিয়া* মনোহর ১৯৮৯, পৃ- ১৩৯-১৭৩।

১৩. ভন্দগাং মে. পৃ- ৮৯।

১৪. নিকোলস টারিং সম্পাদিত, *দ্য কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ সাউথ ইষ্ট এশিয়া,* কেমব্রিজ ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৯২, পৃ-৩০৫- ৩০৬ দ্রষ্টব্য।

থাই ইতিহাসে নারী ও বারবণিতা পেশা বিবর্তনে ধর্মীয় প্রভাব : একটি পর্যালোচনা

লিপি ঘোষ

আধুনিক বিশ্বে যে সকল দেশ বারবণিতা পেশার আধিক্যের জন্য পরিচিত, থাইল্যাণ্ড তার অন্যতম। আধুনিকযুগের ইতিহাসে এই পেশার উদ্ভবে অর্থনীতি যখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ঐতিহাসিক পর্যায়ে ধর্ম এবং আচার অনুষ্ঠানের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। থাই-সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বির্বতনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ লক্ষ করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে থাই-সমাজে বারবণিতা পেশার উদ্ভব ও ক্রমবির্বতনে ধর্মীয় প্রভাবের বিষয়টি আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের দিক সমূহ আলোচিত হবে।

প্রথমতঃ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, থাই-সমাজের পল্লবগ্রাহী ধর্মীয় মূল্যবোধ। এক অর্থে এই প্রকার মূল্যবোধ সমাজে এক প্রকার পরস্পর বিরোধিতার জন্ম দেয় কিন্তু একই সঙ্গে এই পরস্পর বিরোধিতা সমূহেরও বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। উদাহারণ স্বরূপ থাই-রা পুরো মাত্রায় নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ হলেও তাঁরা কখনোই বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রিক আচার-আচরণ বা নীতিনিয়মের বেড়াজালে পূর্ণমাত্রায় আবদ্ধ থাকেন না। এই কারণেই সমাজবিজ্ঞানীরা অনেকেই মনে করেন যে থাইদের প্রকৃত বৌদ্ধ না বলে একটি ধর্মীয় পদ্ধতির অনুগামী বলাই শ্রেয়। এই ধর্মীয় পদ্ধতি বলতে একটি পল্লবগ্রাহী ভিন্নধর্মী ধর্মীয় ঐতিহ্যের সমাগম (amalgamation of many different religious traditions) বোঝায়। উল্লেখ্য এই প্রকার ধর্মীয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধর্মের নিজস্ব ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি দেখা যায়। অর্থাৎ অন্যাথায় এই ধরণের ধর্মীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধর্মীয় চাহিদা মেটানোর একটা প্রবণতা দেখা যায়। উদাহারণ স্বরূপ থাইল্যাণ্ডের ধর্মে উৎপাদন বিষয়ক আচার-অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় চরিত্রের কিন্তু পালাপার্বন সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের চরিত্র বৌদ্ধ।

এইপ্রকার ধর্মীয় পদ্ধতির অপর এক বৈশিষ্ট্য বিদেশী উপকরণের অনুপ্রবেশ। সব মিলিয়ে এই ধর্মায়ণ পদ্ধতি নমনীয় চরিত্রের এবং এই কারণেই বিদেশী ধর্মের ধর্মীয় প্রভাবের অনুপ্রবেশ সহজেই ঘটে। এইরূপ ধর্মীয় পদ্ধতির প্রেক্ষাপটেই বর্তমান প্রবন্ধে থাইল্যাণ্ডে বারবণিতা পেশার উদ্ভবে ধর্মের প্রভাবের বিষয়টি আলোচিত হবে।

* * *

ঘটনার কালানুক্রম বিচার করে ঠিক কোন্ সময়ে থাইল্যাণ্ডে এই বারবণিতা পেশার

উদ্ভব হয় সে বিষয়ে সুনিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। 'গণিকা' শব্দটির প্রথম লিখিত উল্লেখ পাওয়া যায় রাজা প্রথম রামের সময়ে (১৭৮২-১৮০৯) সংকলিত দেশীয় আইনের মধ্যে। ধারণা করা হয়, থাইল্যাণ্ডের প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ক্রীতদাস প্রথার মধ্য দিয়েই জন্ম নেয় এই পেশাটি। নারী ক্রীতদাসরা তাঁদের প্রভুদের মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর ইচ্ছানুসারে অন্যান্য পুরুষদের মনোরঞ্জনেও বাধ্য হতেন।

এই প্রবন্ধের আলোচিত বিষয় বারবণিতা পেশার উদ্ভবে ধর্মীয় প্রভাব— এই প্রশ্নটি আলোচনা প্রসঙ্গে একাধারে হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম কিরূপে বারবণিতা পেশার বিকাশে প্রভাব বিস্তার করে সেই বিষয়টি আলোচিত হবে।

প্রাচীন থাইল্যাণ্ডের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে প্রাচীনযুগে সমাজের উচ্চতম বর্গের পর্যায়ে পুরুষ বনাম নারীর সম্পর্ক ছিল প্রভু প্রনাম ভৃত্যের সম্পর্কের অনুরূপ। এইরূপ সম্পর্কের বিষয়টি থাই-রাজসভা ও পরিপার্শ্বিকের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রতীয়মান ছিল। বস্তুত থাই-রাজারা হিন্দুধর্মের যেসকল চিন্তা ও ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তার অন্যতম ছিল সমাজে পুরুষের আধিপত্য। নারী রাজসভায় সর্বদাই পুরুষের মনোরঞ্জনের একটি উপচারণ রূপেই বিবেচিত হতেন।

থাইল্যাণ্ডের প্রথম দুই গুরুত্বপূর্ণ রাজত্ব পর্বে — সুখোথাই ও আয়ুথিয়ায় থেরাবাদ বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃত ছিল। সুখোথাই রাজ্য কালছে থাই সংস্কৃতির মূল আধার বলা হয়। সুখোথাই যুগের (১২৯২-১৩৫০ খৃ.) শিলালিপি অধ্যয়নে জানা যায় যে ১২শ শতাব্দী নাগাদ প্রাচীন তাই ধর্মব্যবস্থার মধ্য দিয়েই থেরাবদী বৌদ্ধধর্মরে বিবর্তন ঘটে। উল্লেখ্য থেরাবদা কেন্দ্রীয় ধর্মশক্তি রূপে বিকশিত হলেও বৌদ্ধধর্মের অন্যানর গোষ্ঠী এবং হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় পূজাপদ্ধতি রাজতন্ত্রের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এই কারনেরই সমযুগীয় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতই থাইল্যাণ্ডেও রাজা রামখাম হ্যাং-র রাজ দরবারে ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত একটি ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীকে সক্রিয় দেখা যায়।

১২৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রাম খাম হ্যাং র মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র এবং পৌত্রের শাসনকালেও রাজা স্বয়ং বৌদ্ধ হলেও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে প্রতিনিয়ত সংযোগের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত হিন্দুধর্ম পূর্ণমাত্রায় প্রবাব বিস্তার করে।

সুখোথাই রাজ্যের সমান্তরাল পর্যায়েই উত্থান ঘটে আয়ুথিয়ার। ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামাধিপতি এই রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর সমযুগীয় শিলালিপি পাঠে জানা যায় রাজা রামাধিপতি যথেষ্টমাত্রায় হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এইসময়ে বৌদ্ধধর্ম কোনো রাজ সমর্থন পায় নি এবং আয়ুথিয়ার রাজা ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় কর্তৃত্বশীল হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভবিত হন।

এই আয়ুথিয়া যুগের ধর্মী বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে এই সময়ে তাই সভ্যতা ক্রমেই সুখোথাই যুগের তুলনায় আদি 'তাই' সংস্কৃতি মুক্ত হয়ে ওঠে এবং একইসঙ্গে বৌদ্ধ রীতি নিয়মের বিপরীতে আচার অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সমূহ অধিকতর মাত্রায় গ্রহণ করে। এই আয়ুথিয়া সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দুধর্মীয় চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ক্রীতদাস প্রথা। এবং ক্রীতদাস প্রথাটিই প্রত্যক্ষরূপে বারবণিতা পেশা উদ্ভবের প্রশ্নটির সঙ্গে সম্পর্কিত।

এই যুগে প্রাপ্ত বিবিধ উপাদান থেকে জানা যায় যে রাজাদের ক্রীতদাসী মহীষী থাকতেন। এই সকল ক্রীতদাসী রাজমহিষীদের বাদ দিয়ে সাধারণ ভাবে ক্রীতদাসী রমণীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। মেয়েদের ক্রীতদাসীরূপে বিক্রয় করার প্রথা সমকালীন থাই সমাজে অবাধ হয়ে ওঠে। প্রাচীন থাই আইন বিধিতে বলা হয় Women are like buffaloes and males belong to real human beings. (অর্থাৎ নারী হল গাভীর তুল্য এবং প্রকৃত মনুষ্য হল পুরুষই)। প্রসঙ্গতর উল্লেখ্য, মনুপ্রভাবিত হিন্দুধর্মের সমযুগীয় বাব ধারায়ও মেয়েদের গাভীর সঙ্গে তুলনা করা হত।

অর্থাৎ নারীর এই সামাজিক মর্যাদার বিষয়টি ধর্মীয় প্রভাবে প্রাচীন থাইল্যাণ্ডে নারীর মর্যাদাহীনতাই নির্দেশ করে। এহেন পরিমণ্ডলে প্রাচীন শ্যামদেশে গণিকাদের বিষয়ে জানা যায় যে এদের বেশীর ভাগই ছিলেন 'বন্দিনী নারী'(Stationed Women)। সমযুগীয় শ্যামদেশীয় আইনে একজন ক্রীতদাস একই সঙ্গে 'ব্যক্তি' এবং 'বস্তু' — দুই ভাবেই বিবেচিত হতেন। এবং একটি 'বস্তু' হিসাবে একজন ক্রীতদাসকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অন্যত্র বিক্রয় করা যেত। নারী ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে তাদের মালিক ক্রীতদাসী নারীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিবেচনা না করেই তাদের অন্যত্র বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করতেন। একজন ক্রীতদাসীকে ১,০০,০০০ কড়ি থেকে ১,২০,০০০ কড়ি পর্যন্ত দামে বিক্রয় করা যেত। এই সকল ক্রীতদাসীদের একটি বৃহৎ অংশকে পতিতালয়ে প্রেরণের পূর্বে কোন পতিতা মহিলার নিকট নিযুক্ত করা হত।

নারীপুরুষের অসমমর্যাদার অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল — থাই সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক। উল্লেখ্য বারবণিতা পেশার উদ্ভবের বিষয়টি আলোচনা করতে আমাদের সমাজের সাধারণ পরাকাষ্ঠায় নারীর অমর্যাদার বিষয়টি বুঝতে হয়। ১৩৬১-র দেশীয় আইন অনুসারে থাই সমাজে তিনপ্রকার ভার্যার উপস্থিতি দেখা যায় —
প্রধান ভার্যা (mia klang muang) মধ্যমা ভার্যা (mia klang nok) এবং দাসী ভার্যা (mia klang thasi) অর্থাৎ পুরুষের বহুবিবাহ প্রাচীন কালে থেকেই থাই সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং এই বিষয়টির সামাজিক মাত্রা ও বিস্তারের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে একাধিক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক থাই সমাজে একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত করা যায়। এই ধরনের সামাজিক বৈশিষ্ট্যই পরবর্তীকালে পতিতাবৃত্তির উদ্ভব ও বিকাশের সহায়ক শক্তিরূপে বিকশিত হয়।

বহু বিবাহ ব্যতীত উপপত্নী রাখার প্রথাও প্রাচীন তাই সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হিন্দু সমাজের মতই থাই সমাজেও যেসকল পুরুষের যতবেশী সংখ্যক উপপত্নী থাকতো তাঁর সামাজিক মর্যদাও ততবেশী বলে মনে করা হত। অর্থাৎ উপপত্নী প্রথাটি সমাজে পুরুষের মানমর্যাদার প্রতীক রূপে বিবেচিত হত।

বস্তুতর প্রাচীনযুগের থাই দেশীয় সাধারণ আইন হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রত্যক্ষরূপে প্রভাবিত ছিল বলা যায়। আয়ুথিয়া যুগের নাগরিক আইন বহুমাত্রায় ধর্মশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ এবং মনু নির্দেশিত আইনের উপর আধারিত ছিল। ঐতিহাসিকরা সাধারণভাবে সকলেই একমত যে শ্যামদেশের দেশীয় আইন হিন্দুধর্মীয় আইন দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

সব মিলিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত আইনের পরিকাঠামোর মধ্যে থাই সমাজেও তার প্রতিবেশীরাষ্ট্র ভারতবর্ষের মত সামাজিক নারীর স্থান ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। এবং এইরূপ সমাজে যেখানে সাধারণ বাবে নারীর স্থান ছিল নিম্নে এবং ক্রীতদাস প্রথা ছিল স্বাভাবিক। এহেন সমাজ ব্যবস্থায় বারবণিতা পেশার উদ্ভবের ইতিহাস ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক।

হিন্দুধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্ম কিরূপে থাই সমাজে নারীর স্থান নির্দেশ করে ? যৌন সম্পর্ক তথা বারবণিতা পেশা বিষয়েই বা বৌদ্ধদর্শন কি বলে — এই প্রবন্ধে দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। বৌদ্ধধর্ম যে থাই সমাজে নারীর স্থানকে অধস্থন পর্যায়ের নির্দেশ করে সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই।

বৌদ্ধদর্শন মূলতর কর্মভিত্তিক জন্ম নির্দেশ করে। কর্ম অর্থাৎ একজন মানুষের অতীত জীবনের শারিরীক, মৌখিক এবং ব্যবহারিক কর্মফল তার বর্তমান জীবনে সামাজিক মর্যাদা, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ এবং শক্তির মাপকাঠি নির্দেশ করে। অনুরূপভাবে বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয় অতীতের কর্মই মানুষের বর্তমান জীবনের লিঙ্গ নির্দেশ করে, অর্থৎ কোনো মানুষ যদি নারী রূপে জন্মগ্রহণ করে, তার অর্থ পূর্বজীবনে সে তার কর্মফলের ফলে কমমাত্রায় পূণ্য সঞ্চয় করেছে এবং তারফলেই বর্তমান জীবনে সে নারী জন্ম লাভ করেছে।

থাই সমাজেও এই বৌদ্ধ দর্শনের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুখোথাই যুগের শুরু বা চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই বিভিন্ন জাগতিক পরিমণ্ডল বিষয়ক উপাদান অধ্যয়নে দেখা যায় যে নারীপুরুষের অসম মর্যাদার বিষয়টি বারংবার উল্লিখিত হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ বৌদ্ধধর্ম এই থাই সমাজে যৌনসম্পর্কের বিষয়ে কি বলে ? এই প্রশ্নটি আলোচনীয়। সমাজ বিজ্ঞানীরা বৌদ্ধধর্মে যৌন সম্পর্কে বিধিনিয়মের প্রশ্নটি তথা থাই সমাজে ব্যাবহারিক প্রয়োগের বিষয়টি বারংবার আলোচনা করেন। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে বৌদ্ধধর্মে একটি নির্দিষ্ট নিয়মই সমাজে সাধারণ যৌন সম্পর্ক নির্দেশ করে : এটি হল শোষন-বিরোধ (non- exploitation) বা সামাজিক শোষন থেকে বিরত থাকা। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম বিভি বিষয়ক অনুরূপ নির্দে দিলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াই দেখা যায় 'বৌদ্ধধর্ম অন্যান্য যেকোন ধর্মের তুলনায় অনেক বেশী নমণীন এবং স্থিতিস্থাপক বা অন্যন্য যেমন ইসলাম অথবা খ্রীষ্টধর্মের মত বৌদ্ধধর্ম কখনই প্রত্যক্ষরূপে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে অনুপ্রবেশ করে না। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম মনের বিকাশ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এই প্রকার উদারতা কিন্তু এক অর্থে সামাজিক শৈথিল্য নির্দেশও করে এবং এরফলেই সামাজিক অবক্ষয় বিষয়ে কোন কঠোর নির্দেশ স্থাপনে ব্যার্থ এই ধর্ম।

একই কারণে সমাজে ভোগবাহের বিকাশ ও মানুষের লোভের ক্রমবিকাশ দমনেও ব্যার্থ বৌদ্ধধর্ম। থাই সমাজেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এইদেশে অতীতে হিন্দুধর্মের প্রভাবে যখন বারবণিতা পেশার বিকাশ ঘটে বর্তমান যুগে ভোগবাদ একপ্রকার যৌন সম্পর্কের আনন্দের উপর আধাতির। যায় মূলে আছে অর্থ, কাম এবং জাগতিক আনন্দের তত্ত্বগুলি। ফলে এই প্রকার সাংস্কৃতিক যৌনসম্পর্কের প্রেক্ষাপটে থাইল্যাণ্ডে বিকাশ সহজতর হয়।

সুতরাং সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে উপসংহারে বলা যায় যে থাইল্যাণ্ডের সমাজে

বারবণিতা পেশার ক্রমবিকাশ ধর্মের একটি অনবদ্য ভূমিকা অস্বীকাব করা যায় না। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয় ধর্মেরই স্বাভাবিক ও সামাজিক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ফলে কোনো একটি ধর্মের প্রভাবকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলা যায় না, বরং উভয়ধর্মের পারস্পরিক প্রভাবেই এই দেশে বারবণিতা পেশার বিকাশ সম্ভবপর হয় বা ধর্ম এই পেশার বিকাশে একটি সহায়ক শক্তি রূপে বিকশিত একথা অনস্বীকার্য্য।

সূত্রনির্দেশ

১. Norman Jacobs, *Modernisation Without Development: Theiland as an Asian Care Study*, New York, 1974.

২. A.B. Griswold and Prasertna Nagara, "On kingship & Society at Sukhodaya." in Skinner & Kirsch ed. *Chenge & Persistesce in Thai Society*, London, 1975.

৩. Lipi Ghosh, *Evolution of Prostitutior in Thailand : An overview.* in *Proceding of the Sixth International Conference on Thai Studies.* Theme V, Chiangnir October, 1996.

৪. Wathince Boon Chalaksi and Philip Guest, *Prostitution in Thailand,* Bangkoh, 1998.

৫. Arnold Wright ed. *Twentieth Century Impressions of Sism.* London, 1908.

৬. Anna Leonowens, *The Ramasce of Harens Virginia. 1872*

৭. Malcom Smith. *A Physician at the Court of Sidm,* London, 1946.

৮. Craig J. Roynolds, "A Nineteenth Century Thai Buddhist Defense of polygamy and same remarks on the Social History of Women in Thailand". *Paper* Preprented at the *I.A.H.A.Conference* in Bangkole, 1991.

৯. Sanitsuda Ekachai "Buddhism and the Sexsud Society", *The Journey.* New Zealand, Vol XIVI, No. 255, Section iii, p.p. 1-3.

১০. Mayuree Rathanawanna thip " Female Inferiority or Buddhist Society", *Nation,* Bangkole, 29 August, 1990.

ভারত-থাই সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কয়েকটি দিক : একটি পর্যালোচনা

শোভনা মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক রয়েছে। এই সব নানাবিধ সম্পর্কের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক একটি। এই বিষয়টির কার্যকারিতার শিকড় অনেক গভীর পর্যন্ত প্রসারিত।[১] বাণিজ্য বা ধর্মপ্রচার অথবা অন্য কোন কারণে একদেশের মানুষ যখন অন্য দেশে যায় তখন উভয়েই পরস্পরের সাংস্কৃতিক সান্নিধ্যে আসে এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এভাবেই ঘটে সাংস্কৃতিক বিনিময়।[২] বর্তমান প্রবন্ধে ভারতবর্ষ ও থাইল্যাণ্ডের এই সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কয়েকটি দিক আলোচিত হবে। ভারতবর্ষ বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অন্য দিকে থাইল্যাণ্ডে রয়েছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। এবং রাজা সর্বদাই থাই রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকেন। বর্তমান রাজা ভূমিবল আদুল্যাতেজ ১৯৪৬ সাল থেকে রাজপদে সমাসীন। অর্থাৎ এই থাইরাজার রাজত্বকাল ও ভারতীয় স্বাধীনতা প্রায় সমসাময়িক। সেজন্য মুখ্যতঃ বিগত এই পঞ্চাশ বছরকাল আলোচ্য প্রবন্ধের সময়কাল রূপে চিহ্নিত।

মানব সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই উপস্থিত সংস্কৃতি।[৩] নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, সংস্কৃতি হ'ল একটি সংঘবদ্ধ সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের অভিন্ন আচরণ, প্রথা এবং বিশ্বাস।[৪] সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মধ্যে মূল যে ভাব নিহিত আছে তা হ'ল পরিবেশ থেকে গ্রহণের ক্ষমতা।[৫] এক কথায়, সংস্কৃতি হ'ল মূল্যবোধের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উপলব্ধি।[৬] এখানে মূল্যবোধ বলতে পরিবর্তনকে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রহণ করা এবং তাকে নিজেদের সংস্কৃতির ধারাবাহিক মূলস্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়াকেই বোঝায়। দর্শন, সূক্ষ্ম শিল্পকলা, ধর্ম, সাহিত্য, পোষাক, খাদ্যাভ্যাস নিয়েই সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।[৭]

উপরি উক্ত কাঠামোর প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষ ও থাইল্যাণ্ডের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মুখ্য দুটি দিক আলোচিত হবে। প্রথম দিকটি ধর্মীয় বা ধর্মভিত্তিক সম্পর্কের কথা এবং দ্বিতীয় দিকটি গোষ্ঠীতত্ত্বভিত্তিক সম্পর্কের দিক। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষ ও থাইল্যাণ্ডের নৈকট্য ও সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ধর্ম ও ভারত - থাই সাংস্কৃতিক সম্পর্ক :

সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে 'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি। 'ধৃ' শব্দের অর্থ ধারণ করা। ধর্ম ধারণ করে আছে কোন দেশের বা কোন জাতির গোটা সমাজ কাঠামোকে, তার সার্বিক সাংস্কৃতিক

বৈশিষ্ট্যকে। ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার পূর্বে ভারতীয় ধর্ম বলতে হিন্দুধর্মকেই বোঝাতো। কিন্তু ভারতের মাটিতে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ এবং বৈষ্ণবের মতো ধর্মও জন্ম নিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী বহির্বিশ্বেও। বৌদ্ধধর্মের বিশ্বপ্রসারী এই মানচিত্রে থাইল্যাণ্ডও একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমে ভারত-থাই সম্পর্কের বৌদ্ধ এবং পরবর্তীতে হিন্দু প্রভাবের দিকগুলি আলোচিত হবে।

কলিঙ্গ যুদ্ধের পর মগধ সম্রাট অশোক যুদ্ধনীতি ত্যাগ করে ধর্মপ্রচারের নীতি গ্রহণ করেন। সেই উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্মের শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচারে পাঠিয়েছিলেন উত্তরা ও সোনাকে সুবর্ণভূমিতে।[৯] এ ব্যাপারে অবশ্য মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতিতে ভারতের তুলনায় সিংহলের অবদান অনেক বেশী। তবে একটি বিষয় সুনিশ্চিত যে থাইরাজা রামাখামহ্যাং-এর সময় থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতির শিখরে পৌঁছায়।[১০]

থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূপে স্বীকৃত। যেখানে হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের বৌদ্ধই দেখা যায়। প্রথা, রীতিনীতি, সাবেকীয়ানা বা উৎসব উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রেও ভারতীয়দের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। কলানুশীলন, চিত্রশিল্প ও স্থাপত্যরীতিতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেখা যায়।[১১] বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জাতকের কাহিনী অবলম্বন করা হয়েছে। ভারতীয় অজন্তা-গুহাচিত্রের অনুরূপ। পাঁচশত সাতচল্লিশটি জাতক গল্প অনুসৃত চিত্রশিল্প সেখানে দেখা যায়।

থাইল্যাণ্ডকে বলা হয় 'পীতবস্ত্রের দেশ'।[১২] বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের পরিধানবস্ত্রের রঙ হলুদ। থাইল্যাণ্ডে মোট জনসংখ্যার চুরানব্বই শতাংশই থেরাবাদী সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ।[১৩] এঁদের অনেকেই ঐ বিশেষ পোষাক পরিহিত। তাঁদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার জন্যই এই নাম করণ।

বিশ্বের সব বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে বুদ্ধগয়া হ'ল Land of Lord Buddha. তাঁদের কাছে বুদ্ধগয়া পূণ্যভূমি এবং দর্শনীয় স্থান। ১৯৫৭ সালে সেখানে গৌতমবুদ্ধের জন্মের ২৪৯৯ বছর পর আড়াই হাজার বুদ্ধজয়ন্তী বর্ষপূর্তি উৎসব পালিত হয়। ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো থাইল্যাণ্ডের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরও আমন্ত্রণ জানান।[১৪]

শুধুমাত্র ঐ একবারই থাইল্যাণ্ডের বর্তমান রাজা ভূমিবল আদুল্যাতেজ ভারতবর্ষে আসেন। তিনি সেসময় বিশ্বভ্রাতৃত্বের জন্য আহ্বান জানান। এই সময় থাই সরকার ভারত সরকারের সর্বপ্রকার সহযোগিতায় থাই বৌদ্ধমঠ নির্মাণের প্রয়াস নেন। এই স্থানটি বুদ্ধগয়ার প্রায় দু'শ মিটারের মতো দূরত্বে অবস্থিত। এই মঠ নির্মাণের জন্য থাই সরকার নিরানব্বই বছরের লীজ ৪.৫৭ একর জমি ভারত সরকারের কাছ থেকে সংগ্রহ করে।[১৫]

এই মন্দিরের কাজের জন্য থাই রাজা অর্থ সাহায্য দেন এবং থাই সরকার বুদ্ধের আড়াই হাজারতম জন্ম জয়ন্তীর জন্য পৃথক তহবিল খোলেন।[১৭]

১৯৭০ সালের পর থেকে প্রতি বছর ভারতে বার্ষিক বৌদ্ধ সংঘের সম্মেলন হয়। এতেও অর্থ সাহায্য দেয়। এই সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় সব দেশ থেকে বৌদ্ধভিক্ষুরা আসেন।[১৮]

বৌদ্ধধর্ম যেমন থাইল্যাণ্ডের সমাজ জীবনে বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক

প্রভাব ফেলেছিল তেমনি হিন্দুধর্মও থাই-সংস্কৃতি অনেক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করেছিল। প্রশ্ন হ'ল হিন্দুরা কবে এবং কিভাবে ঐ দেশে পৌঁছে ছিল ? এটা বলা অত্যন্ত কঠিন ব্রাহ্মণরা কবে থাইল্যাণ্ডে গিয়েছিল। কম্বুজ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে শ্যামদেশ যখন ছিল অর্থাৎ অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে ভারতীয় হিন্দুরা সেখানে গিয়েছিল। এই কম্বুজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচরণ ছিল সেজন্য মনে করা হয় তৎকালীন থাইল্যাণ্ডে ভারত থেকে পরোক্ষ পথে কম্বুজ দিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবেশ করে। আবার অনেকে মনে করেন ইতিহাসে অনুল্লিখিত কোন সময় হয়ত ভারত থেকে সরাসরিই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থাইল্যাণ্ডে পৌঁছেছিল। তবে, এই দুই তত্ত্বের মধ্যে প্রথমটির গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশী।[১৯]

তকুঅপা (Takuapa) শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে শ্যামদেশে বিষ্ণুমন্দির তৈরী হয়।[২০] ১৮২১ সালে একজন ব্রাহ্মণ বলেন যে, তাঁর পরিবারের শ্যামদেশে বসবাসকারী তিনি পঞ্চম প্রজন্মের ব্যক্তি। তিনি আরও বলেন যে, তাঁরা রামেশ্বর অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূল সংলগ্ন অঞ্চল থেকে এসেছেন। আবার, Wales নামক সমাজতাত্ত্বিক বলেন যে, বেনারস থেকে হিন্দুরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণরা শ্যামদেশে এসে বসবাস স্থাপন করেন। অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণ উভয় ভারত থেকেই ব্রাহ্মণরা শ্যামদেশে যান।[২১]

থাইল্যাণ্ডের ইতিহাস জানার বহুবিধ উপাদানের একটি হ'ল শিলালিপি। দ্বারাবতী রাজত্বে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দীর শিলালিপি পাওয়া যায়, যা পালি ও মন(Mon) ভাষায় লেখা। আবার শ্রীবিজয় রাজত্বে প্রাপ্ত লিপি অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা, যার ভাষা সংস্কৃত ও খামের।[২২] বৈদিক ব্রাহ্মণরা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর আশপাশের কোন সময় থাইদেশে হিন্দু ব্রাহ্মণরা গিয়েছিলেন এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত।

নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে, দক্ষিণ ভারত থেকে ভারতীয় হিন্দুরা খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম অধ্যায়ে থাইল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন।[২৩]

আয়ুথিয়া রাজত্বকাল থেকে হিন্দু বিশ্বাস এবং হিন্দু রীতিনীতি ও উৎসবের অনুকরণ ও ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। হিন্দু ও ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা, জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা থেকে শুরু করে ভারতীয় মশলাদার সুস্বাদু খাবারও থাই জনজীবনের ভীষণ জনপ্রিয়।[২৪]

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'উৎসব একলার নহে।'[২৫] উৎসব যখন সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবার এবং থাইল্যাণ্ডে যখন ভারতীয় প্রভাব মূল পর্যন্ত প্রোথিত তখন থাইল্যাণ্ডের উৎসবের সঙ্গে ভারতীয় উৎসবের সাদৃশ্য থাকাই স্বাভাবিক। উদাহরণ হিসাবে 'সোংক্রান'-এর কথা বলা যায়।[২৬] এটা ভারতীয় দোল উৎসবের মতো। পার্থক্য হ'ল রঙের উৎসব দোল। কিন্তু থাইল্যাণ্ডে রঙ ব্যবহার করা হয় না। সেখানে জল ও ফুল দিয়ে এই উৎসব পালিত হয়। লয়ক্রাথং হ'ল কলাপাতার ভেলা ভাসানো, আলোর প্রদীপে সজ্জিত ভেলা ভাসানো এই উৎসবটি ভারতীয় দীপাবলীর সমরূপী। সঙ্গে ভারতীয় ছট পুজো বা হরিদ্বারের গঙ্গায় ভেলা করে প্রদীপ ভাসানোর ব্যাপারটির সাদৃশ্য বেশী। ভারতীয় নবান্ন উৎসব থাইল্যাণ্ডের 'রেকনা'।[২৮] প্রসঙ্গতঃ বলা যায় ভারতের মতো থাইল্যাণ্ডেও প্রধান খাদ্যশস্য ধান এবং প্রধান খাদ্য ভাত। থাইল্যাণ্ড ও ভারতের মতো কৃষিমাতৃক দেশ। প্রয়োজন বৃষ্টির। আরাধনা করা হয় বরুণ বা বৃষ্টির দেবতাকে। উৎসবটির নাম ঋরুণসত্র।[২৯] আত্মার জন্য সিদ্ধি সারদা।[৩০]

এই সকল উৎসবই থাইল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুকরণে। বৈদিক যুগে ভারতে রাজ্যাভিষেক এবং রাজসূয় যজ্ঞ প্রচলিত ছিল। থাইল্যাণ্ডের রাজারা আজও সেই রীতি পালন করেন। কিন্তু তাঁরা হিন্দু নন। অর্থাৎ থাইল্যাণ্ডে হিন্দুরীতিগুলি বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। এর আরও একটা নিদর্শন প্রতিফলিত হয় তা হ'ল 'চুলাকান্থা মঙ্গলা' অনুষ্ঠানে।[৩১]

ভারত-থাই সাংস্কৃতিক সম্পর্কে গোষ্ঠীতন্ত্র :

সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে গোষ্ঠীতন্ত্র একটা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারতীয়দের থাইদেশে গিয়ে বসতি স্থাপন, জীবিকার্জন এবং থাইদের ভারতে আগমণ, বসতি স্থাপন ও রাজত্বের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক সম্পর্কটা গড়ে ওঠে।

থাইরা ভারতে এসেছিল ১২২৮ খ্রীস্টাব্দে কিন্তু ভারতীয়রা তার বহু পূর্বেই থাইল্যাণ্ডে গিয়েছিল। চীনের দক্ষিণ অংশ থেকে আগত তাই বংশোদ্ভূত আহোমরা ১২২৮ খ্রীস্টাব্দে আসামের উচ্চ উপত্যকায় বসতি এবং রাজনৈতিক ভূখণ্ড স্থাপন করে। এঁরা ছয়শত বৎসরের অধিক সময় ধরে এখানে রাজত্ব করেছেন। তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবকে কাজে লাগান। তাই আহোম প্রভাব উত্তর পূর্ব আসামের জনসমাজে আজও সুস্পষ্ট। উত্তর-পূব ভারতেব সামাজিক জীবনে এবং ধর্মীয় রীতি ও প্রথাগত ক্ষেত্রে তাইদের সাংস্কৃতিক প্রভাব দেখা যায়।[৩২]

অন্যান্য যেসব তাই গোষ্ঠী রয়েছে তারা পরবর্তী সময় আসামে এসেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল খামতি, ফাকে, তুরোও, খামিয়াং, আইতোন এবং নোরা। এরা মূলত আসামের উত্তরাংশে বসতি বিস্তার করেছে। এদের গোষ্ঠীগত নামের সঙ্গে 'তাই' শব্দটি সংযোজিত করে এরা নিজেদের গোষ্ঠীর নাম বলে। যেমন — তাই-তুরোঙ্, তাই-খামতি ইত্যাদি। এরা নিজেদের গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। এদের ধর্ম ফ্রা-লুং এবং বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্ম।[৩৩]

অন্যদিকে, পার্বত্য সমভূমি অঞ্চলে যারা থাকে তায়া হিন্দুসভার প্রভাবে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে। যদিও এদের পুরুষানুক্রমিক ধর্ম ফ্রা লুং।[৩৪] আধুনিক ইতিহাস গবেষকদের একাংশের মতে, আহোমরা নতুন ধরনের ধর্ম আন্দোলন করছে যা খানিকটা বৈষ্ণবদের মতো — একেশ্বরবাদী।[৩৫]

অনুরূপ তাই গোষ্ঠীর ভারতে বসবাসের বিপরীত চালচিত্রটা হল থাইল্যাণ্ডে ভারতীয় গোষ্ঠীর বসবাস। থাইল্যাণ্ডে ইক্ষু বাগিচায় কর্মরত শ্রমিকের অধিকাংশই ভারতীয়। থাইল্যাণ্ডে ভারতীয়রা অন্যতম পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন ড্রাইভারী, প্রহরী, দোকানদার, কৃষিকাজ, হকার বা দালালের জীবিকাকে। এছাড়া থাই প্রবাসী ভারতীয়রা ব্যবসাও করেন। পাঞ্জাবী সিন্ধী, গুজরাটী, এমনকি বিড়লা বা থাপার সম্প্রদায়রা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে ব্যবসা স্থাপন করেছেন। এঁরা মূলত সূতীবস্ত্র বিপণন, সূচী শিল্প, স্টেশনারী দ্রব্য, ওষুধ, ধান ও ধানজাত দ্রব্য, কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য, পর্যটন, খবরের কাগজ, মূল্যবান পাথর ইত্যাদির কুটির ও ভারী শিল্পের ব্যবসা করেন। বর্তমানে প্রশাসকদের ভূমিকাতেও ভারতীয়দের দেখা যায়।[৩৬]

সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন ভারতীয় পুরুষরা যেমন থাইল্যাণ্ডের নারী বিবাহ করেন

তেমনি যদি থাই পুরুষরা ভারতীয় কন্যা বিবাহ করতেন তাহলে হয়ত থাই-সংস্কৃতির মধ্যে ভারতীয়ত্ব অনেক বেশী প্রকট হোত। কিংবা তাদের সংস্কৃতির সাবেকী রূপটি সম্পূর্ণই বিসর্জিত হোত।[৩৭]

সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে ভারত থাই-সাংস্কৃতি সম্পর্কে দুটি, আধার— ধর্ম এবং জাতি বা গোষ্ঠী। গোষ্ঠীগত সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল বিষয় কারণ তার সঙ্গে রাজনীতি বিষয়টা প্রায়শই জড়িত হয়ে পড়ে। কিন্তু সুস্থ ধর্মকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দুটি দেশের মধ্যে হার্দ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে তুলনা মূলক ভাবে অধিকতর কার্যকারী ছিল। বিগত দিনের মতো আগামী দিনেও এই সুস্থ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অটুট থাকবে এবং বর্তমান সঙ্কটময় বিশ্ব পরিবেশে ভারতবর্ষ একটি নিকট-বন্ধু রাষ্ট্র হিসাবে থাইল্যাণ্ডকে পাবে — এই আশা করা যায়।

সূত্রনির্দেশ

১.Braisted Paul J(ed). *Cultural Affairs and Foreign Relations* Columbia Book Pablishers, Washington, 1968, P. X.

২. Shuster N. George — "The Nature and development of U.S. Cultural Relation" in Braisted Part I J (ed) *Ibid*, P.1.

৩. Mahanta Ananda , *Study of Human Culture : A Theoretical Approach,* Omsons Pablications, New Delhi, 1987, p. 20.

৪. Sanyal Batuk, Sasadhar " *Culture, An Introduction.* Asia Publishing House, Bombay, 1962, p. 38-39.

৫. Mahanta Ananda , *Op. cit*, p.41

৬. Sanyal Batuk Sasadhar. *Op. Cit* p.44 এই বইতে তিনি লিখেছেন, " Culture is a realization of values in theory and Practice."

৭. *Ibid*- p 45

৮. দেব আশুতোষ, *বাংলা শব্দবোধক অভিধান*, দেব সাহিত্য কুটির, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ- ৭৩৭।

৯. Jerms Watdi Promsak, *Thai Art with Indian Influence*, Abhinav Publications, New Delhi,1979, p.17.

১০. Jha Ganganath, *Foreign policy of Thailand,* Radiant Publishers, New Delhi, 1979, p.16.

১১. Jerms Watdi Promsak , *op. cit*. p. 79.

১২. *Ibid*. p.15

১৩. Sahai Sachchidananda- " Buddhism Today In Thailand", Seminar Paper, *The Buddist Linkage In India-Thailand Cultural Relations.* Presented in International Seminar and Festival In India, Organised by Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 1997. p.18.

১৪. *Ibid*. p.18.

১৫. Ghosh Lipi, Thai Buddhists In The land of the Land of Buddha. *Dhammalok Journal*, Vol- I, Calcutta, Oct. 1996. p.73.

১৬. *Ibid*, p 74.
১৭. *Ibid*, p.74
১৮. *Ibid*, p.75.
১৯. Dowee Warn Dawee, *Brahmanism In South-East Asia* Sterling Publishers Pvt. Ltd. New Delhi, 1982, P.102.
২০. *Ibid*, p.103.
২১. *Ibid*, p.105.
২২. Bose Phanindranath, *The Indian Colony of Siam*, Punjab Oriental Sanskrit Book Depot, Lahore, 1927, p.3
২৩. K.A. Nilkanta Sastri , As found in the forward part of the book by Subramamniam Tipprajapuram Narayanswami, *The Pallavas of Kanchi In South-East Asia*. The Swadesamitram Ltd. Madras, 1904, P. X.
২৪. Ghosh Lipi, "Indo-Thai Cultural Internations and Impacts A Historical Profile", A unpublished paper presented to the Seminar on Thailand as a part of Thai Festival in India organised by Jawaharlal Nehru University and India - International Centre, New Delhi, August 1997, p.6. (এর পর থেকে Indo-Thai Cultural Interactions)
২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ধর্ম*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯১৮, পৃ.৯।
২৬. Dawee Dawee warn- *op. cit*. p. 244.
২৭. *Ibid*, p.246.
২৮. *Ibid*, p.248.
২৯. Ghosh Lipi, " Indo- Thai Cultural Interactions, *op. cit*. p. 7.
৩০. *Ibid*, p.7.
২১. *Ibid*, p.7.
৩২. Guha Amalendu, " Ahom Political System", in Surjit Sinha(ed)_ *Tribal Politics and State System In Pre-Colonial Eastern and North Eastern India*.Calcutta, 1987, p. 145
৩৩. Gogoi Padmeswar, *The Tai And Tai Kingdoms* Department of Publications, Guahati, Univ. Guahati. 1968, p. 1-2.
৩৪. Ghosh Lipi, "Ethnicity, Religion and Identity, Question. A North East Indian Profile" in Girin Phukan and N. L. Dutta(ed) *Politics of Identity and Nation Building in North East india*. South Asian Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1997, p. 86.
৩৫. *Ibid*, p.86.
৩৬. Dubey T. N. *India and Thailand (A brief History)*, H.K. Publihers and Distributors, Delhi, 1990, p. 68-70
৩৭.*Ibid*, p.91.

থাই রাজতন্ত্র ও বৌদ্ধধর্ম : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

তপতী রায় চৌধুরী

যে কোন দেশেই রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন, সবকিছু মিলেয়ে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যায়। ধর্মের ভূমিকাকে যেকোনো দেশের ইতিহাস রচনাকালে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি সমতটে অবস্থিত এই দাবি করতে পারেন সম্ভবত একমাত্র বৌদ্ধেরা। [১] আমাদের বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য দেশ অর্থাৎ থাইল্যাণ্ডে (যার পূর্ব নাম শ্যাম) বৌদ্ধধর্ম সর্বসাধারণের ধর্ম হলেও হিন্দু, মুসলমান ধর্মের অস্তিত্ব ও প্রভাব এদেশে ছিল। ভারতে বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের নমনীয় মনোভাব অন্যান্য ধর্মদর্শনের সাথে সংমিশ্রণের পথকে প্রশস্ত করেছিল। থাইল্যাণ্ডেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এখানেও বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্ম ও দর্শন দ্বারা যথেষ্ঠ প্রভাবিত হয়েছিল। আলোচ্য রচনায় থাইল্যাণ্ডে সুখোথাই ও আয়ুথিয়া যুগে (১২৫৩-১৫২৯ খ্রীঃ) বৌদ্ধধর্মের প্রসার, প্রভাব এবং এর বিস্তারে রাজতন্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

পৃথিবীর প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের পূর্বে রক্তের সম্পর্কের (Kinship) মত ধর্মও পরিবার ও গোষ্ঠী জীবনের সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রক্তের সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হয়ে পরায় ধর্মই মানুষকে এক নতুন বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন বলেছেন : 'ধর্ম হল রক্তের বন্ধনের প্রতীক চিহ্ন; একতার, শুদ্ধতার, কর্তব্যসমূহের প্রকাশক' (Religion was the seal and sign of common blood, the epression of its oneness. its sanctity, its obligation) প্রকৃতিপূজারী আদিম মানুষ প্রাকৃতিক শক্তি সমূহকে ভয় করত এবং নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে বশ করার জন্য গোষ্ঠীর প্রধানতম ব্যক্তিকে মেনে চলত। গোষ্ঠীপতিই প্রধান পুরোহিত হিসাবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করে। এইভাবে ধর্মভয়ই আদিমযুগে আনুগত্যের জন্ম দেয়। ধর্ম এই আনুগত্যবোধ বিকাশ করে রাষ্ট্র গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। অধ্যাপক গেটেল বলেছেন — 'রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের প্রাথমিক ও সর্বাপেক্ষা সংকটময় আনুগত্যের শিক্ষা দিতে পেরেছিল' ("In the earliest, religion alone could subordinate barbaric anarchy and teach reverence and obedience") সুতরাং প্রখ্যাত ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক ই. ডুরখেইম কে অনুসরণ করে বলা যায় "A religion is a unified system of beliefs and practiices . . . which unit into one single

moral community called a church all those who adhere to them"[২]

সুতরাং বলা যায় রাষ্ট্রগঠনের আদি পর্যায় থেকে ধর্ম জনগনের আনুগত্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করেছে, এক্ষেত্রে থাইল্যাণ্ড ব্যতিক্রম নয়। বিশেষতঃ সুখোথাই ও আয়ুথিয়া যুগে এবং তার পরবর্তীকালে রাজকীয় নিয়ম নীতি অনেকাংশে বৌদ্ধ দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কারণ থাইল্যাণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসী থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্ম মতের 'কর্মবাদ' (যদিও হিন্দুদর্শনেও ক্রমবর্তমানে মানুষ পূর্বজন্মের সুকর্মের দ্বারাই এই জন্মে রাজপদ লাভ করেছে। এইরূপ সৎকর্মের অধিকারী রাজাকে বোধিসত্ত্ব বা ভবিষ্যৎ বুদ্ধ হিসাবে প্রচার করা হয়। বৌদ্ধ আদর্শ অনুসারে রাজা হলেন 'চক্রবর্তী' (Universal ruler) অর্থাৎ যিনি সৌভাগ্যের জন্যই রাজ্যশাসন করছেন এবং বুদ্ধত্ব অর্জন করতে চলেছেন। বৌদ্ধধর্মের এই এই আদর্শ রাজতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশগুলির মত থাইল্যাণ্ডেও রাজতন্ত্র বৌদ্ধ আদর্শের দ্বারা একপ্রকার বৈধতা অর্জন করেছিল। প্রত্যেক থাইবাসী পরিবার, গ্রাম, মন্দির ও রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রদান করে বাধ্যতামূলকভাবে। রাজতন্ত্রের প্রতি তাদের আনুগত্য বহুলাংশেই স্বতঃস্ফূর্ত।[৩]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, থাইল্যাণ্ডের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ (Patrimonial society) । এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম মানুষের সামাজিক কর্তব্য নির্ধারণ করে এবং সামাজিক বিধিবিধানগুলিকে ধর্মীয় বিশুদ্ধতা প্রদান করে সাধারণ মানুষকে ইহা মান্য করতে সাহায্য করে। থাইল্যাণ্ডের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ব্যবস্থা নৈতিকতার উপর নির্ভরশীল। থাই দর্শন অনুসারে রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়েছে এই নৈতিক বিধানগুলি তুলে ধরার উদ্দেশ্যে। থাইরা বিশ্বাস করে নৈতিকতা যেকোন বিষয়কে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। তাদের বিশ্বাস যদি রাজারা নৈতিকতা মান্য করেন তাহলে রাজ্যে শান্তি, সুখ, ও একতা বজায় থাকবে।[৪] থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্ম বিরাজিত ধর্ম ব্যবস্থার সাথে কোনরূপ বিবাদে লিপ্ত না হয়ে তাদের ধর্মীয় আদর্শের কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।[৫] অপরদিকে রাজারাও এই ধর্মকে সমর্থন করায় এবং পিতৃতান্ত্রিক থাই সমাজ ব্যবস্থার ধর্মীয় বিধান রাজতন্ত্রকে সমর্থন করায় থাই সমাজে ধর্ম ও রাজনীতি আধ্যাত্মিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হওয়ার পূর্বে থাইবাসীরা জড়োপসনা (animism) করত। সুখোথাই যুগের (১২৫৩-১৩৫০ খ্রী.) একটি প্রস্তর লেখ থেকে জানা যায় যে, থাইবাসীরা ফ্রা খা পুং পি (Pra Kha Pung Pi) বা পর্বতের উপাসন করত। থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্ম ঠিক কবে প্রসারিত হতে শুরু করেছিল তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না উপযুক্ত ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে। তবে Pong Tuk, Phra Pathom নামক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের দ্বারা খ্রীস্ট্রীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমান পাওয়া যায়। Pong Tuk ও Phra Pathom এ যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, মধ্য ও দক্ষিণ থাইল্যাণ্ডে খ্রীস্ট্রীয় প্রথম তিন শতকে ভারতীয়দের সহায়তায় থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের বিস্তার হয় এই দেশে।[৬]

যদিও উল্লেখ্য যে, খ্রীস্ট্রীয় ত্রয়োদশ শতকে থাইল্যাণ্ডের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত

হয়। ইহা বাস্তবায়িত হতে পেরেছিল চীনের দক্ষিনাঞ্চল থেকে আগত থাইদের সামরিক শৌর্যের দ্বারা। থাইরাই বৌদ্ধধর্মের বিস্তারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কিন্তু ইতিপূর্বেই থাইল্যাণ্ডের উত্তরে বসবাসকারী বহিরাগত মনরা দাভিরাবতী (Dvaravati) রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং ইহা খ্রীস্ট্রীয় সপ্তম শতকেই বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে থাইল্যাণ্ডের একটি প্রাদেশিক রাজ্যের রাজধানী 'নাখোন পাথোম'- এই খ্রীস্ট্রপূর্ব ২৬৭-২২৭ অব্দে মৌর্য সম্রাট অশোক প্রেরিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা গিয়েছিলেন এবং এখানেই অবস্থিত রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে উচু বৌদ্ধ সৌধ।

খ্রীস্ট্রীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে উত্তর মেনাস অঞ্চলে কাম্বোডিয়ার রাজনৈতিক আধিপত্য দুর্বল হয়ে পড়ায় থাইরা খামের রাজ্যের অনুগত হিসাবে শ্যামের উত্তর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। আনুমানিক ১২২০ খ্রীস্ট্রাব্দে থাইরা 'খামের রাজ্যের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে সুখোথাইকে কেন্দ্র করে প্রথম স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই বংশের প্রথম রাজা ছিলেন ইন্দ্রাদিত্য, এবং তারপর অতি অল্পকালের জন্য রাজা হন তার জেষ্ঠপুত্র বানমুয়াং (Ban Muang)। স্বল্পায়ু বানমুয়াং এর পর সুখোথাই লিপির স্রষ্টা রাজা রামাখামহ্যাং রাজা হন।

রামাখামহ্যাং সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে বৌদ্ধধর্মকে রাস্ট্রীয় ধর্মের মর্যদা দান করেন। জনগণকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বৌদ্ধধর্মের প্রচারেও বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার শাসনতন্ত্র বুদ্ধের নৈতিক উপদেশ অনুসারে পরিচালিত হয়। তিনি বৌদ্ধধর্মের সমর্থক হলেও ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্ধ্বে থাকায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপর কোন ধর্মীয় অত্যাচার হয়নি। সহজ স্বাভাবিক পরিবেশে বৌদ্ধধর্ম তার আধিপত্য বিস্তার করে।

থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্মের বিকাশে শ্রীলঙ্কা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লো থাই এর উদ্যোগে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীলঙ্কা থেকে থাইল্যাণ্ডে আসেন বৌদ্ধধর্মীয় বিধানগুলির সংস্কারের উদ্দেশ্যে। বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রীতির জন্য লো থাই 'ধর্মরাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৩৪৭ সালে লো থাই এর পুত্র লু থাই (১৩৪৭-৬৮ খ্রী.) সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি শ্রীসূর্যবংশরামা রাজা মহারাজাধিরাজ (দ্বিতীয় ধর্মরাজ) উপাধি গ্রহণ করেন। সিংহাসনে আরোহনের পূর্বেই ত্রিভূমিকথা বা বৌদ্ধ বিশ্বতত্ত্ব ( ) সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। লু থাই এর রাজত্বকালেই এর থাই সামন্ত প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে আয়ুথিয়ায় স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, যেকোন ধর্মই যেকোন দেশের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সমর্থন অর্জন করতে পারে যখন সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য থাকে সর্বব্যাপক।[৭] ঐতিহাসিক ডনাল্ড. ই. স্মিথ এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, সেই দেশের সাধারণ মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে ঐ বিশেষ ধর্মের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকবে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের চেয়েও তাদের প্রভাব বেশী হবে।

থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্ম স্মিথ কথিত উক্ত বৈশিষ্ট্য গুলি অর্জন করেছিল। থাইল্যাণ্ডের মোট ২৭০০০ বৌদ্ধ মন্দিরের মধ্যে বেশীরভাগই গ্রামে অবস্থিত। এই বৌদ্ধ মন্দিরগুলি বিশ্রামাগার, সংবাদ মাধ্যম এবং স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা যেত। শহরে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত

বড় মন্দিরগুলি উক্ত দায়িত্বগুলি পালন করত বৃহদায়তনে। ধর্ম ও শিক্ষাব্যবস্থায় মধ্যযুগের ইউরোপের মঠগুলির মত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যদিও ১৮৮৭ সালে শিক্ষাদপ্তর স্থাপিত হয়েছে থাইল্যাণ্ডে তবুও বৌদ্ধ মঠগুলিই প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে আজও চিহ্নিত হয়। ১৯৭৩ সালে গ্রামে বৌদ্ধ মন্দিরগুলির দ্বারা পরিচালিত প্রায় ৯০০০ শিক্ষায়তন রয়েছে।[৮] বহু সন্ন্যাসীই সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে গৃহীর জীবন যাপন করায় লৌকিক সমস্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, ফলে সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও তারা বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে মধ্যস্থতা করতেন। এইভাবে তাদের সাথে সাধারণ মানুষের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এছাড়া দৈনিক ভিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের সাথে মঙ্কদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

যাইহোক সুখোথাই রাজাদের মত আয়ুথিয়ার রাজারাও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৩৫৩ সালে আয়ুথিয়ায় Wat Buddhaisharya নামক মন্দির স্থাপন করা হয় নতুন রাজধানী স্থাপনের ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে। রামাধিপতির পর রামেশ্বর অল্পকালের জন্য রাজা হন। তিনি বরমোরাজ নাম ধারণ করেন। তার আঠার বছর ব্যাপী রাজত্বকালে সুখোথাই আয়ুথিয়ার অধীন রাজ্যে পরিণত হয়।

ইতিমধ্যে চতুর্দশ শতকে শ্রীধর্মরাজ নামক রাজার রাজত্বকালে সমসাময়িকভাবে সুখোথাই -এর গৌরব পূর্ণস্থাপিত হয়। এই সময় তিনি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন মহাযান ধর্মাবলম্বী, বুদ্ধপাদ সুখোথাই লেখ থেকে জানা যায় যে, সুখোথাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারালেও এখানে ধর্মীয় গৌরব হানি হয়নি।

১৩৭৪ খ্রীস্ট্রাব্দে বরমোরাজ- এর মৃত্যুর পর ১৩৯৫ খ্রীস্ট্রাব্দে রামেশ্বরদেব আয়ুথিয়ার সিংহাসনে আরোহন করেন এবং তাঁর পরবর্তী রাজারা যথাক্রমে দ্বিতীয় বরমোরাজ (১৪২৪-৪৮ খ্রী.), বরমোরাজ ত্রিলোকনাথ (১৪৪৮-৮৮ খ্রী.) ও দ্বিতীয় রামাধিপতি (১৪৯১-১৫২৯ খ্রী.) বৌদ্ধধর্মের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা বজায় রাখেন।

বর্তমান থাইল্যাণ্ডের চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমান থাইরাজা ভূমিবল আদূল্যতেজ বৌদ্ধধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রূপে আজও শুধু দেশেই নয় বিদেশী বহুরাষ্ট্রের সাথে এই ধর্মকে কেন্দ্র করে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। ভারতে ১৯৫৭ সালে বুদ্ধগয়ার প্রধান স্তূপের দক্ষিণ পশ্চিমে একটি মঠ নির্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করেছেন বর্তমান থাই রাজা, বুদ্ধের মূর্তিটি অর্থাৎ যেটি এই মঠে প্রতিস্থাপিত, সেটি দান করেছেন রাজা ভূমিবল আদূল্যতেজের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী থানম চিত্তিকাচরণ।

সুতরাং সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে উপসংহারে বলা যায় যে, থাইল্যাণ্ডে রাজনৈতিক ও ধর্মীয়জীবন পরস্পরের পরিপূরক হওয়ায় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধর্মে পরিণত হয়। বৌদ্ধধর্ম রাজাদের জনহিতকর কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ধর্মকে কেন্দ্র করে রাজা ও প্রজার ঐক্যের পথও প্রশস্ত হয়। এইভাবে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক একতা থাই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিশেষত্ব দান করেছে।

সূত্র নির্দেশ

১. গৌতম নিয়োগী, ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ-৫।

২.Louis Schneider. *The Sociology of Religion and The Limitation of Intellectualism, Thon wiky and sons, INC, New York, 1970.*

৩. Chitra Ghosh. *The World of Thai Womn.* Best Books, Calcutta, 1990, p.-2.

৪. Lipi Ghosh, 'Prostitution in Thailand: Religion as a factor in its Historical evolution' Unpublished Seminar paper, Indian History congress, 1998.

৫.Jacobs Norman. *Hodernization without Development · Thailand as an Asian case study,* Praeger publishers, New York, 1971, p.-211.

৬. Sukumar Sengupta *Buddhism in South East Asia.* University Library, ATishe memorial publishing society, calcutta, 1994, p-53

৭. Donald E. Smith, *Religion and politics in Burma,* N.J. University Press, 1956, p.-16.

৮. *Thailand into 80s,* the Published by office of the Prime Minister, Kingdom of Thailand, Royal Thai Government, 1979, p-. 47.

৯. Lipi Ghosh. *Thai Buddhist in the land of Buddha, Dhammaloka Journal* vol 1, Oct. 1996. p-. 74.

না হওয়া অথচ কল্পনা সম্ভব ইতিহাস

(সংক্ষিপ্তসার)

সাবির আহ্‌মেদ

সমাজ বিজ্ঞানের অন্যতম ব্যস্ত শাখা ইতিহাস। ইতিহাসের মূল উদ্দেশ্য হল অতীতের ঘটনার ব্যাখ্যা সহ উপস্থাপন। সম্প্রতি পশ্চিমে এক না হওয়া কল্পনাশ্রয়ী ইতিহাসের আলোচনা হচ্ছে যা ইতিহাসবিদরা Counterfactual Historv নামে অভিহিত করেন। যে ঘটনা ঘটেনি, ঘটতে পারতো। যদি ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষের দেশ ভাগ আটকানো যেত ? যদি ১৭৫৭-এ সিরাজদৌল্লা ইংরাজের হাতে পরাজিত না হতো ? তাহলে কী হতো ?

ইতিহাস চর্চায় এই কল্পনাশ্রয়ী নতুন ইতিহাস রচনাবিদদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম J.C. Squire, Geoffery Hawthorn এবং Naile Furguson

ভারতবর্ষে এই ধরনের ইতিহাস চর্চাবিদ্‌দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের। যিনি তাঁর লেখা স্বপ্ন লব্ধ ভারতের ইতিহাস গ্রন্থে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে ইংরাজদের হারিয়ে মারাঠাদের জয়ের গৌরব কাহিনী রচনা করেছেন! প্রসঙ্গত M S. Elphinstone ও যদুনাথ সরকারের মুঘল নীতি নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্কের প্রশ্নটি সুবিদিত।

এই কাল্পনিক ইতিহাস অবশ্যই ত্রুটিমুক্ত নয়। ইতিহাস ঘটনার অনিবার্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু এই কাল্পনিক ইতিহাস অবান্তর ও অসার।